সিমোন
দ্য বোভোয়ার

দ্বিতীয় লিঙ্গ

অনুবাদ

হুমায়ুন আজাদ

পরিবর্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ

আগামী প্রকাশনী

সূ চি প ত্র

সিমোন দ্য বোভোয়ার ও নারীবাদ — ৭
ভূমিকা — ১৭
দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা — ৩১

প্রথম খণ্ড

তথ্য ও কিংবদন্তি

ভাগ ১

নিয়তি

১ জীববিজ্ঞানের উপাত্ত — ৩৫
২ মনোবিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ — ৫৩
৩ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ — ৬৩

ভাগ ২

ইতিহাস

১ যাযাবর — ৬৯
২ ভূমির আদিকৃষকেরা — ৭৩
৩ পিতৃতান্ত্রিক কাল ও ধ্রুপদী মহাযুগ — ৮৫
৪ মধ্যযুগব্যাপী থেকে আঠারো শতকের ফ্রান্স পর্যন্ত — ৯৭
৫ ফরাশি বিপ্লব থেকে : চাকুরি ও ভোট — ১০৭

ভাগ ৩

কিংবদন্তি

১ স্বপ্ন, ভয়, প্রতিমা — ১২৩
২ পাঁচজন লেখকে নারীকিংবদন্তি — ১৬১
(১) মঁতেরলঁ বা ঘৃণার রুটি — ১৬১
(২) ডি এইচ লরেন্স বা শিশ্নের গর্ব — ১৬৪
(৩) ক্লদেল এবং প্রভুর দাসী — ১৬৬
(৪) ব্রেতোঁ বা কবিতা — ১৬৮
(৫) স্তেঁদাল বা বাস্তবের রোম্যান্টিক — ১৬৯
(৬) সারসংক্ষেপ — ১৭১
৩ কিংবদন্তি ও বাস্তবতা — ১৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড

আজ নারীর জীবন

ভাগ ৪

গঠনের বছরগুলো

১ শৈশব ১৮৩
২ তরুণী ২১০
৩ কামদীক্ষা ২২৫
৪ নারীসমকামী ২৪৩

ভাগ ৫

পরিস্থিতি

১ বিবাহিত নারী ২৫২
২ মা ২৭৫
৩ সামাজিক জীবন ২৮৬
৪ বেশ্যারা ও হেতাইরারা ২৯৮
৫ প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য ৩১৩
৬ নারীর পরিস্থিতি ও চরিত্র ৩২৭

ভাগ ৬

যাথার্থ্য প্রতিপাদন

১ আত্মরতিবতী ৩৪৬
২ প্রণয়িনী নারী ৩৫৬
৩ অতীন্দ্রিয়বাদী ৩৬৭

ভাগ ৭

মুক্তির অভিমুখে

১ স্বাধীন নারী ৩৭১
উপসংহার ৩৯১

সিমোন দ্য বোভোয়ার ও নারীবাদ

লন্ডন থেকে একটু দূরে এপিং বনভূমির কাছের এক পল্লীর গরিব কৃষকপরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন এক তরুণী, ফরাশি বিপ্লবের থেকেও বিপ্লবাত্মক, ১৭৯১-এ মাত্র ৩২ বছর বয়সে, মাত্র ৬ সপ্তাহে লিখেছিলেন ১৩ পরিচ্ছেদের একটি পারমাণবিক, এখন অমর, বই : *দি ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্স্ অফ ওম্যান*, বেরিয়েছিলো ১৭৯২-এ। সেদিন বিশ্বের একটি বড়ো পরিবর্তন ঘটেছিলো। লেখক মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট্, এক সময় নিন্দিত, এখন বন্দিত নারীবাদের জননীরূপে। জননী? শব্দটি ঠিক হলো? নারীবাদ কি জরায়ু থেকে উৎপন্ন? এ-প্রথাগত অভিধাটি আজো ব্যবহৃত হয়, তাঁর ক্ষেত্রেও হয়। মননশীল কিন্তু আবেগাতুর, বিয়েবিরোধী কিন্তু প্রেম ও পুরুষের জন্যে কাতর, একই সঙ্গে অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু, মেরি নারীবাদের জোয়ান অফ আর্ক, যিনি দেখা দিয়ে, জয় ক'রে, হয়েছিলেন ট্র্যাজেডি। ১৫৭ বছর পরে দেখা দেন আরেক নারী, এবার ইংল্যান্ডে নয়, ফ্রান্সে, ১৯৪৯-এ দু-খণ্ডে বেরোয় তাঁর ১০০০-এরও বেশি পৃষ্ঠার বই : *ল্য দ্যজিয়েম সেক্স : দি সেকেন্ড সেক্স / দ্বিতীয় লিঙ্গ*। তিনি সিমোন দ্য বোভোয়ার। তিনিও বন্দিত বিশশতকের নারীবাদের জননীরূপে; তাঁর বইয়ের পংক্তির পর পংক্তি থেকে জন্মেছে আধুনিক নারীবাদের বিচিত্র ধারা, অনুপ্রাণিত হয়েছেন পঞ্চাশ-ষাট ও পরের দশকগুলোর নারীবাদীরা। অ্যালিস শোয়ার্জার, দ্য বোভোয়ারের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী, লিখেছেন, 'পঞ্চাশ ও ষাটের তমসায়, যখন নব নারী-আন্দোলন দেখা দেয় নি, তখন *দ্বিতীয় লিঙ্গ* ছিলো এক গুপ্ত সংকেতবিধির মতো, যার সাহায্যে আমরা নতুন নারীরা পরস্পরের কাছে বার্তা পাঠাতাম। আর সিমোন দ্য বোভোয়ার নিজে, তাঁর জীবন ও তাঁর কর্ম, ছিলেন এবং আছেন এক প্রতীক হয়ে।' জননী হওয়ার কোনো ইচ্ছে তাঁর ছিলো না; মেরি তবু দুটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন, দ্বিতীয়টি জন্ম দিতে গিয়ে চ'লে গিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে, মাত্র ৩৮ বছর বয়সে। দ্য বোভোয়ার সন্তানে ও বিয়েতে বিশ্বাস করেন নি; মননশীলতায় তিনি মেরির থেকে প্রায়-বিপরীত মেরুর, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মননশীলতার প্রতিমূর্তি; কিন্তু ভেতরে ভেতরে মিল আছে তাঁদের; দ্য বোভোয়ার জাঁ-পল সার্ত্রের সাথে ৫১ বছর কাটিয়েছেন প্রেমবন্ধুত্বের সম্পর্কে, অন্য প্রেমেও পড়েছেন, মননশীল বই লেখার ফাঁকে অন্য প্রেমিককে লিখেছেন কাতর পত্র, গর্ভপাত করেছেন। দুজনেই তিরষ্কৃত ও নন্দিত হয়েছেন বই প্রকাশের পর; বিরোধীরা মেরিকে বলেছে 'পেটিকোটপরা হায়েনা', 'দার্শনিকতাপরায়ণ সর্পিণী'; আর দ্য বোভোয়ারের বইয়ের একটি অংশ পত্রিকায় বেরোলে এক ফরাশি লেখক চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি লেখিকার যৌনাঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ পেয়েছেন, এবং বই বেরোনোর পর ক্যাথলিকদের ধর্মীয় দুর্গ ভ্যাটিকান তাঁর বই 'অনৈতিক' ব'লে নিষিদ্ধ করে, এক মার্কিন সাংবাদিক অপভাষায় লেখেন লেখিকার যা দরকার, তা হচ্ছে একটা উৎকৃষ্ট সঙ্গম। মেরি প্রচণ্ড বিদ্রোহী, তিনি ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন পুরুষের সভ্যতাকে, মুক্তি দিতে চেয়েছেন বন্দী নারীকে; দ্য বোভোয়ার প্রাজ্ঞ, সুধীর,

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কাব্যিক, ব্যাখ্যা ও উদ্ঘাটন করেছেন, অদৃশ্য জীবাণুর মতো পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর ভেতরে ঢুকে তাকে জীর্ণ করেছেন। মেরি নারীবাদের জোয়ান অফ আর্ক হ'লে সিমোন দ্য বোভোয়ার নারীবাদের আইনস্টাইন। পুরুষের সাথেই তুলনা করতে হলো; তা-ই করতে হচ্ছে, কেননা দ্য বোভোয়ার, এবং সব নারীবাদীই, চান পুরুষের সাথে সাম্য; কেননা পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় সার্বভৌম পুরুষই প্রকাশ করে মানবপ্রজাতির সে-বৈশিষ্ট্য, যাকে দ্য বোভোয়ার বারবার বলেন– 'ট্র্যান্সেন্ডেন্স' : সীমাতিক্রমণতা, আর নারীকে আটকে রাখা হয়েছে 'ইমানেন্স'-এ : সীমাবদ্ধতায়।

পুরোনাম সিমোন লুসি-এর্নেস্তিন-মারি-বেরত্রাঁ দ্য বোভোয়ার, বিশ্ববিখ্যাত তিনি সিমোন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) নামে; তিনি দিয়ে গেছেন চিরকালের শ্রেষ্ঠ নামগুলোর একটি। দ্য বোভোয়ার জন্মেছিলেন প্যারিসে, ১৯০৮-এর ৯ জানুয়ারি, মঁৎপারনাসের কাফে দ ল রঁতঁদের ওপরে। বাবা জর্জে বেরত্রাঁ দ্য বোভোয়ার ছিলেন আইনজীবী, মা ফ্রাঁসোয়া ব্রাসেয়ো; দুজন ছিলেন দু-রকম। দ্য বোভোয়ার ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান, আরেকটি বোন ছিলো তাঁর; তাঁকে অনেকটা পুত্ররূপেই পালন করেন পিতা। তিনি লিখেছেন, 'বাবা গর্বের সাথেই বলতো : সিমোনের মগজ পুরুষের; সে পুরুষের মতো চিন্তা করে; সে পুরুষ।' তিনি বেড়ে ওঠেন প্যারিসের চতুর্দশ 'আরোঁদিসমাঁ' বা এলাকায়, যেখানে থেকেছেন প্রায় সারা জীবন। মা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক, বাবা সন্দেহবাদী, বিশ্বনাগরিক, প্যারিসীয়; এবং অল্প বয়সেই বোভোয়ার বুঝতে পেরেছিলেন চারপাশের পরিস্থিতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) পরিবারের আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে উঠলে দ্য বোভোয়ার দেখতে পান কী দুঃসহ ক্লান্তিকর গৃহস্থালির কাজ করতে হয় তাঁর মাকে– যে-ক্লান্তির মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন তিনি *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ; তখনই স্থির করেন কখনো গৃহিণী বা মা হবেন না। *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ এক তরুণীর কথা বলেছেন তিনি, যে মায়ের ক্লান্তিকর একঘেয়ে গৃহস্থালির কাজ দেখে ভয় পায় যে সেও একদিন বাঁধা পড়বে ওই নির্মম নিরর্থক নিয়তিতে, তখনই সে ঠিক ক'রে ফেলে সে কখনো মা আর গৃহিণী হবে না; ওই তরুণী দ্য বোভোয়ার নিজেই। ১৯২৯-এ ২১ বছর বয়সে সরবনে দর্শনে এগ্রিগেশন পরীক্ষায় পাশ করেন তিনি; ফ্রান্সে এ-পর্যন্ত তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে লাভ করেন এ-ডিগ্রি। পরীক্ষায় জাঁ-পল সার্ত্র হন প্রথম, তিনি দ্বিতীয়, এবং জড়িয়ে পড়েন প্রেমে, বন্ধুত্বে, এক ব্যতিক্রমী সম্পর্কে, যাঁরা কখনো পরস্পরকে ছেড়ে যান নি, কিন্তু অন্য কারো সাথে না জড়ানোর, শুদ্ধ একনিষ্ঠ দেহ ও মনের সতীত্বের বাধ্যবাধকতায়ও থাকেন নি। সার্ত্রের সাথে দেখা হওয়ার পর বোভোয়ারের জীবন বদলে যায় চিরকালের মতো, এ-সাক্ষাৎ বিশশতকের এক শ্রেষ্ঠ ঘটনা, হয়তো বদলে গিয়েছিলো সার্ত্রের জীবনও, কেননা দ্য বোভোয়ার অস্তিত্ববাদী দর্শনের 'অপর' বা 'আদার' হয়ে থাকার মতো নারী ছিলেন না।

কিশোরী বোভোয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যে-ত্রাতার, রাজকুমারের, তাকে তিনি পান সার্ত্রের মধ্যে, এক সুদর্শন রাজকুমারের বদলে এক দার্শনিক। বোভোয়ার লিখেছেন : 'পনেরো বছর বয়সে আমি কল্পনা করেছিলাম যে-ভাবাদর্শ, সার্ত্র হুবহু মিলে যান তার সাথে : তিনি আত্মার এমন সঙ্গী, যাঁর মধ্যে আমি পেয়েছি আমার সমস্ত রিপু, যেগুলো

এতো উত্তপ্ত হয়ে উঠতো যে পৌঁছোতো ভাস্বরতায়। তাঁর সাথে আমি অংশীদার হ'তে পারতাম সব কিছুর।' এখানে সম্মানসূচক সর্বনাম ব্যবহারের কারণ হচ্ছে ৫১ বছর প্রেমে, মানসিক ও শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার পরও তাঁরা পরস্পরকে সম্বোধন করতেন 'আপনি' সর্বনামে। অদ্ভুত লাগে, তাহলে তাঁদের প্রেম, চুম্বন, সঙ্গমও ছিলো দার্শনিক– এক ধরনের *বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস* ? একসাথে ছিলেন ৫১ বছর, ১৯২৯-এ পরিচয় হওয়ার সময় থেকে ১৫ এপ্রিল ১৯৮০তে সার্ত্রের মৃত্যু পর্যন্ত। ঘনিষ্ঠতার পর তাঁরা তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে ভাবেন, ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেন অস্তিত্ববাদী রীতিতে, সিদ্ধান্তে পৌঁছেন অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্যে কখনো কখনো ধরা দেবেন 'অনিশ্চিত' বা 'আকস্মিক' বা 'ঘটনাচক্রজাত' বা 'কন্টিঞ্জেন্ট' প্রেমের কাছে, যা অনিবার্য নয়, নিতান্ত আকস্মিক, যা তাঁরা দুজনেই করেছেন, এবং জানিয়েছেন পরস্পরকে। সার্ত্র অবশ্য লুকোচুরি করেছেন। বিয়ে তাঁদের জন্যে সুবিধাজনক হতো আর্থিকভাবে, কিন্তু তাঁরা তা বেছে নেন নি; কেননা বিয়ে, এমনকি একত্রবাস, মানুষের জন্যে ক্ষতিকর, তাতে 'এক' আরেককে পরিণত করতে চায় 'অপর'-এ, এক হয়ে উঠতে চায় কর্তা, অপরকে পর্যবসিত করতে চায় কর্মে। সার্ত্র একটি মেয়ে দত্তক নিয়েছিলেন, দ্য বোভোয়ার তাও নেন নি; তিনি যেমন নিজের জরায়ু থেকে একটি নকল দ্য বোভোয়ার প্রসব করতে চান নি, তেমনি চান নি সার্ত্রের একটি প্রতিলিপি। ১৯৩০-এর দশকের জন্যে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো খুবই অসামাজিক, অপ্রথাগত, এতে দ্য বোভোয়ারের পরিবারে নানা গোলমাল দেখা দিয়েছিলো। তাঁরা একসাথেও থাকতেন না, লিভটুগেদার করতেন না, কেননা এটাও এক ধরনের বিয়ে, যা ধ্বংস করে মানুষকে; তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্বল্পকাল একসাথে ছিলেন। পৃথকভাবে থাকতেন তাঁরা, সাধারণত হোটেলে, সন্ধ্যায় দেখা করতেন, পড়তেন ও সমালোচনা করতেন পরস্পরের লেখা। যখন বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তাঁরা সাহিত্যজগতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে তাঁদের পক্ষে; তখন তাঁরা সকলের চোখ এড়ানোর জন্যে কাফের পর কাফে বদলাতে থাকেন। বোভোয়ার বেছে নিয়েছিলেন নারীদের জন্যে প্রথাগত পেশাই, শিক্ষকতা; বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, খুবই ক্ষুদ্র এলাকায়, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত মার্সেই ও রোয়েঁ-এ *লিসে* অর্থাৎ ফরাশি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দর্শন পড়াতেন কোন কোন প্লাতো আরিস্ততল? ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন প্যারিসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি দেখা দেন অস্তিত্ববাদী আন্দোলনের এক প্রধান রূপে।

তিনি ঘটনা বর্ণনা করতে, দার্শনিক তত্ত্ব তৈরি করতে, এবং স্মৃতিচারণ করতে পছন্দ করতেন, যা তিনি নিন্দে করেছেন *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ সীমাবদ্ধ, গৃহবন্দী, নারীদের এক প্রিয় ব্যাপার ব'লে; তিনি বর্ণনা করেছেন ছোটো মেয়ে বোভোয়ার মায়ের সাথে ভোরবেলা যাচ্ছে খ্রিস্টের নৈশভোজের পর্ব উদযাপনে, মাসে; এর মধুর স্মৃতি সত্ত্বেও স'রে আসেন তিনি ধর্ম থেকে, দেখতে পান ধর্ম একটা ধাপ্পা; বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন তাঁর বিদ্যালয়, ক্যুর আদেলি দেসির, কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, এবং কৈশোরেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন ধর্মে; এটা তাঁর ক্যাথলিক মা ও তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করে একটি দেয়াল। মগজ থাকলে হৃদয় থাকবে না কাম থাকবে না, এটা কোনো কথা নয়; বরং

দেখা গেছে মগজি নারীরা প্রেমে-কামে অদ্বিতীয়, এটাও এক সৃষ্টিশীলতা; ১৫ বছর বয়সে তাঁর মনে হয় তিনি প্রেমে পড়েছেন খালাতো ভাই শাঁপিনেলের, যে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় ফ্রান্সের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখার সাথে। তাঁর মা ওসব বইয়ের আপত্তিকর পাতাগুলো পিন দিয়ে আটকে রাখতেন। শাঁপিনেলের সাথে প্রেম তেতো হয়ে ওঠে, যখন শাঁপিনেলে তার বোহেমীয় জীবন ছেড়ে বিয়ে করে এক ধনী নারীকে, যে নিয়ে আসে একটা বড়ো মাপের পণ। পণের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ; ফ্রান্সে এটা ছিলো, এবং তিক্তভাবে ছিলো দ্য বোভোয়ারের মনে।

তিনি নিজের মধ্যে মিলিয়েছিলেন কর্ম ও জ্ঞানকে; তাই তিনি থেকেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্রে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) তিনি নাটশি অবরোধের বিরুদ্ধে ফরাশি প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন; এ-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন *লে মাঁদারেঁ* (১৯৫৪) উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাস উপস্থাপন করে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান সিদ্ধান্তগুলো, দেখান লেখকদের কীভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হয় সময়ের কাছে। দ্য বোভোয়ার সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন একগুচ্ছ উপন্যাস দিয়ে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *ল'এঁভিতে* (১৯৪৩: সে থাকতে এসেছে); এটিতে ব্যক্ত হয়েছে যে-দর্শন, তা দেখা যায় *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ। এটিতে এক দম্পতির সাথে আরেকটি তরুণী বাস করে দীর্ঘকাল ধ'রে, এতে তাদের সম্পর্ক কী সূক্ষ্মভাবে ভেঙে পড়ে, তার রূপ দেখিয়েছেন তিনি; এবং *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ যা দেখিয়েছেন পাতায় পাতায়, একটি সত্তার সাথে আরেকটি সত্তার সম্পর্কের সমস্যা, যাতে একটি সত্তা মৌলরূপে হয়ে ওঠে খাদক, অন্যটি হয়ে ওঠে খাদ্য, শিকারী ও শিকার, এর বিকাশ ঘটে এ-উপন্যাসেই। এর ঘটনা এসেছে বোভোয়ার ও সার্ত্রের ব্যক্তিগত জীবন থেকেই, নিজেদের জীবনকে তিনি পরিণত করেন উপন্যাসে : সার্ত্রের তরুণী ছাত্রী, ওলগা কোসাকিউইজ, থাকতো তাঁদের সাথে, থাকার মধ্যে ছিলো একটা প্রথাবিরোধী চুক্তি, যা রূপ নেয় উপন্যাসে। দ্বিতীয় উপন্যাসে, *অন্যদের রক্ত*-এ, আর ব্যক্তিগত জীবন নয়, বিষয় হয় দার্শনিক সমস্যা; এর নায়িকা হেলেন বেরত্রাঁ যখন দেখে একটি ছোটো ইহুদি মেয়েকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে গেস্টাপোরা, সে তখন অংশ নেয় ফ্রান্সে জর্মন অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধসংগ্রামে, এবং বিশ্বাস পোষণ করে যে হিটলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার একটিই উপায় : হিংস্রতা। যে-অমানবিক হত্যাযজ্ঞ ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, তাতে মৃত্যুর প্রতি নিবদ্ধ হয় তাঁর সংবেদনশীলতা, এবং তিনি লেখেন *সব মানুষই মরণশীল* (১৯৪৬)। এর নায়ক অমর, সে তেরো থেকে বিশশতক পর্যন্ত সাতটি শতাব্দী ভ্রমণ করে; এবং উপন্যাসটি বুঝিয়ে দেয় যে অমরতা কোনো সমাধান নয়, মৃত্যু থেকেই উঠে আসে জীবনের অর্থ।

১৯৪৯-এ বেরোয় তাঁর *ল্য দ্যজিয়েম সেক্স : দ্বিতীয় লিঙ্গ*, পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় অপর, অপ্রয়োজনীয়, খাদ্য, রুদ্ধ, সীমাবদ্ধ, বিকলাঙ্গ, দাসী ও কামসামগ্রির স্তরে থাকার জন্যে দণ্ডিত নারীর পরিস্থিতি সম্পর্কে অদ্বিতীয় গ্রন্থ; ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ও শিল্পসৌন্দর্যে যা অতুলনীয়।

দ্বিতীয় লিঙ্গ-এর পর বোভোয়ার আবার ফিরে আসেন উপন্যাসে; লেখেন তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস *লে মাঁদারেঁ* (১৯৫৪; দি ম্যান্ডারিন্স্ : মন্ত্রীরা)। ফরাশি

মাঁদারেঁ শব্দটি নেয়া হয়েছে সংস্কৃত 'মন্ত্রিণ' থেকে, তবে এটা এখন ঠিক মন্ত্রী বোঝায় না, বোঝায় শিক্ষিত অভিজাতদের। এটির জন্যে তিনি পান *প্রি গঁকুর* পুরস্কার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফরাশি বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে তাদের 'ম্যান্ডারিন' মর্যাদা ছেড়ে রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলো, এটি তার বিবরণে পূর্ণ। অনেকে মনে করে এটি লিখিত সার্ত্র, কামু্য, ও তাঁর নিজের সম্পর্ক নিয়ে, তবে দ্য বোভোয়ার তা স্বীকার করেন না, যদিও উপন্যাসের ঘটনাগুলোর সাথে মিল আছে তাঁদের জীবনের। তিনি চারটি দার্শনিক বইও লিখেছেন: এর একটি *পুর ওঁয়ে মরাল দ্য ল'আমবিগুইতে* (১৯৪৭; দ্ব্যর্থবোধকতার নীতিশাস্ত্র)। ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন দুটি : *ল লঁগ মার্শ : এসে সিইর ল চিন* (১৯৪৭: দীর্ঘ যাত্রা); এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিয়ে *ল'আমেরিক অো জুর দ্য জুর* (১৯৪৮; আমেরিকা, দিনের পর দিন)। তারপর বোভোয়ার লিখতে শুরু করেন স্মৃতিকথা, ভঙ্গিতে যেগুলো অভিনব; তাঁর আত্মজৈবনিক বই চারটি : *মেমোয়ার দ্য'ওঁয়ে জোন ফিই রাঁজে* (১৯৫৮; কর্তব্যপরায়ণ কন্যার স্মৃতিকথা), *ল ফর্স দ্য ল'আজ* (১৯৬০; যৌবনকাল, এটি উৎসর্গ করেন সার্ত্রের নামে), *ল ফোর্স দে শোজে* (১৯৬৩; অবস্থার চাপ), এবং *তু কঁৎ ফে* (১৯৭২; সব কলা ও করা হয়ে গেছে)। এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার পেরিয়ে হয়ে উঠেছে ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ফরাশি বুদ্ধিজীবীদের জীবন ও মননের চিত্র। নারীবাদ ছাড়া তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয় জরায়ণ ও মৃত্যু; হাসপাতালে মায়ের মৃত্যু নিয়ে লেখেন *ওঁয়ে মর্ৎ ত্রে দুসে* (১৯৬৪; একটি খুব সহজ মৃত্যু), বৃদ্ধদের প্রতি সমাজের ঔদাসীন্য সম্পর্কে লেখেন *ল ভেইয়িস* (১৯৭০; বৃদ্ধকাল)। ১৯৮১তে লেখেন সার্ত্রের শেষ জীবনের বেদনাদায়ক বিবরণ *ল সেরেমোনি দে অদিয়* (বিদায় : সার্ত্রের প্রতি চিরবিদায়)।

দ্বিতীয় লিঙ্গ সম্পর্কে কথা বলার আগে একটি ব্যাপার সম্পর্কে ভাবতে চাই, যা নারী ও পুরুষের জন্যে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এবং ছিলো দ্য বোভোয়ারের জন্যেও, তা হচ্ছে প্রেম ও শরীর। শেষ জীবনে তাঁর এমন একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিলো যেনো তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অকম্প্র মূর্তি, তাতে কোনো কামনা বাসনা হাহাকার অশ্রু নেই, তা কখনো কাঁপে না; তবে তিনি কোনো মর্মরে গঠিত মোমবাতি ছিলেন না। জ্ঞানের সাথে প্রেম কাম ক্রন্দনের কোনো বিরোধ নেই, বরং জ্ঞানীরা, সৃষ্টিশীলেরাই প্রেম কাম হাহাকারে হ'তে পারেন অদ্বিতীয়, আর সৃষ্টিশীল নারীরা প্রেমেকামে যে-চূড়ো ছোঁয়, তা পারে না একান্ত নারীধর্মী, সীমাবদ্ধ, পতিদের পরিচারিকা, ও কামসামগ্রি স্ত্রীরা। তারা ক্লান্ত সব কিছুতে, প্রেমেও, কামেও। প্রেম এবং কামও সৃষ্টিশীল ব্যাপার, তার জন্যে প্রতিভা দরকার, তা শুধু যৌনাঙ্গের উত্তেজনা নয়, যদিও ওটা অবশ্যই থাকা দরকার, এবং সঙ্গে দরকার তীব্র মানবিক প্রতিভা। এটা দেখতে পাই সব প্রধান নারী ও পুরুষের মধ্যেই, দেখতে পাই মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটে, যিনি কাঁপতেন প্রেমে ও কামে, দেখতে পাই সিমোন দ্য বোভোয়ারে। জাঁ-পল সার্ত্রের সাথে তিনি চিরসঙ্গীত্বে ছিলেন, তাতে অন্য প্রেমিকের জন্যে প্রেমে মন দুলতে, দেহে পুলক লাগতে তাঁর বাধে নি।

মেরি ছিলেন তীব্র প্রেমিকা, হয়তো প্রেমিকের পদতলে চুমো খেতে খেতে স্বপ্ন দেখতেন নারীমুক্তির; আমাদের বন্দিনী বিপ্লবী রোকেয়ার কথা জানা যায় না, তবে

তাঁর চিঠিগুলো ভ'রে আছে কামহতাশার দীর্ঘশ্বাসে, কান পাতলেই সেগুলোর হাহাকার শোনা যায়। একটি বহুমূত্রগ্রস্ত বুড়োকে নিয়ে তাঁর দিনরাত্রিগুলোর কথা ভেবে আমরা শিউরে উঠি। দ্য বোভোয়ার অন্য বিশ্বের, সার্ত্রের সাথে ছিলো তাঁর আমৃত্যু সম্পর্ক, চুক্তি ছিলো তাঁরা নিতে পারবেন অন্যান্য প্রেমিকপ্রেমিকা। সার্ত্রের অনেক নারী ছিলো। বোভোয়ারও নিয়েছেন প্রেমিক, তাঁদের কথা তিনি লিখেছেনও; লিখেছেন নেলসন আলগ্রেন এবং পরে ক্লদ লাঁজমান নামে আরেকজনের কথা; সমকামী সম্পর্কও তাঁর ছিলো। সম্প্রতি জানা গেছে মননশীলতার চূড়ান্তরূপ, রূপসী, দ্য বোভোয়ার ছিলেন পল্লীর রাখালী মেয়ের থেকেও আবেগপরায়ণ, রমণীয় ছিলেন অনারীবাদীরূপে, যে-'চিরন্তনী নারী'কে তিনি বাতিল করেছিলেন, সেটি টিকিয়ে রেখেছিলেন নিজেরই ভেতরে। ভাবতে কি পারি একটি পুরুষের জন্যে দ্য বোভোয়ার কাঁদছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বা ভাবছেন তাঁর কাপড় ইস্ত্রি করার কথা, তার জন্যে রান্নার বা ঘর সাজানোর কথা? ক-বছর আগে বেরিয়েছে বোভোয়ারের প্রেমপত্র *বিলাভেড শিকাগো ম্যান : লেটার্স টু নেলসন আলগ্রেন ১৯৪৭-৬৪*। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ১৭ বছর ধ'রে লেখা ৩০৪টি চিঠি। কে আলগ্রেন? এক গৌণ মার্কিন ঔপন্যাসিক। কাতর এসব চিঠি মনে করিয়ে দেয় জন মিডেলটন মারিকে লেখা বিরহিণী ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্ডের চিঠিগুলোকে, যা উদ্ধৃত ক'রে দ্য বোভোয়ার দেখিয়েছেন প্রেমিকা কতোটা পাগল থাকে প্রেমিককে তার প্রিয় জিনিশটি, এমনকি বক্ষবন্ধনিটি, দেখানোর জন্যে। তাঁর চিঠিগুলোতে যা বিস্ময়কর, তা হচ্ছে প্রেমিকের প্রতি তাঁর অতিশয় আনুগত্য; প্রেমিককে তিনি ডেকেছেন 'কুমির', 'পশু' ও 'আমার প্রিয়তম স্বামী'; নিজেকে বলেছেন 'তোমার অনুগত আরব স্ত্রী', যে-আরব স্ত্রীর শোচনীয় রূপ এঁকেছেন তিনি *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ। তিনি যখন লিখছিলেন *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, তখনই আলগ্রেনের কাছে লিখছিলেন কোমল, কাতর, পল্লীবালার চিঠি; ১৯৪৯-এর এক সন্ধ্যায় আলগ্রেনকে লিখেছেন, 'হায় বিধাতা! নারীরা যতো বই লিখেছে ও নারীদের সম্বন্ধে যতো বই লেখা হয়েছে, আমি সব পড়েছি এবং আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমি আমার আপন পুরুষ চাই!' ১৭ বছর ধ'রে দ্য বোভোয়ার ইংরেজিতে, মাঝেমাঝে মধুর ভুল ইংরেজিতে, আলগ্রেনকে লিখেছেন প্রেমপত্র। তিনি রূপসী ছিলেন, তবে আলগ্রেনের সাথে দেখা হওয়ার আগে রূপ নিয়ে ভাবেন নি। ১৯৪৩-এ তাঁর একটি দাঁত প'ড়ে যায়, তিনি সেটি বাঁধান নি, কেননা তা 'খুবই ব্যয়বহুল ও ক্লান্তিকর ও নিরর্থক'; কিন্তু ১৯৪৮-এ, তিনি লিখেছেন, 'তোমার জন্যে সপ্তাহে তিনবার আমি গেছি দন্তচিকিৎসকের কাছে।' তিনি চেয়েছিলেন যাতে আলগ্রেন 'পায় সম্পূর্ণ হাসিসহ একটি মেয়ে'। তাঁদের দেখা হয় ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে; দ্য বোভোয়ার ৩৯, আলগ্রেন ৩৮। এর বারো বছর আগে বেরিয়েছিলো আলগ্রেনের প্রথম উপন্যাস, তাতে টাকা বা খ্যাতি কিছুই আসে নি; ১৯৪৯-এ বেরোয় তাঁর *সোনালি বাহুর পুরুষ*, এটা তাকে কিছুটা অর্থ ও খ্যাতি এনে দেয়। দ্য বোভোয়ার তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'আমার চমৎকার, বিস্ময়কর, ও প্রিয় স্থানীয় তরুণ', 'আমার মূল্যবান, প্রিয়তম শিকাগোর পুরুষ' এবং 'আমার প্রিয়তম স্বামী'। তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন আলগ্রেন; তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন বছরখানেক। বোভোয়ার লিখেছেন ; 'আমি এখন

বুঝি ওটা ছিলো বোকামি, কেননা কোনো বাহুই উষ্ণ নয়, যখন তা থাকে সমুদ্রের ওপারে।' তিনি প্যারিস ছাড়তে পারতেন, কিন্তু সার্ত্রকে নয়। আলগ্রেনকে লিখেছেন, 'তোমার সাথে আমৃত্যু দিনরাত কাটিয়ে আমি সুখ পাবো শিকাগোতে, প্যারিসে বা চিচিকাস্টেনেঙ্গোতে; তোমাকে আমি দেহে ও হৃদয়ে ও আত্মায় যতোটা ভালোবাসি, তার চেয়ে বেশি ভালোবাসা সম্ভব নয়। কিন্তু যে আমার সুখের জন্যে সব কিছু করেছে, তাকে আঘাত দেয়ার থেকে বরং আমি ম'রে যাবো।' ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যতো পুরুষের সাথে ঘুমিয়েছেন, তার থেকে বেশি ঘুমিয়েছেন নারীদের সাথে। সার্ত্রের সাথে তাঁর যৌনজীবন টিকেছে ন-বছর। বোভোয়ার লিখেছেন : 'তিনি সবখানেই উষ্ণ, প্রাণবন্ত পুরুষ, কিন্তু শয্যায় নয়। শিগগিরই বুঝতে পেরেছিলাম, যদিও আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না; এবং প্রেমিকপ্রেমিকা হিশেবে চালিয়ে যাওয়াকে একটু একটু ক'রে মনে হ'তে থাকে নিরর্থক, এবং এমনকি অশ্লীল।'

বিশশতকের প্রথমার্ধ ছিলো নারীদের জন্যে এক অন্ধকার সময়, মুক্তির কথা স্তব্ধ হয়ে গেছে, নারীদের ধাক্কিয়ে আবার ঢুকোনো হচ্ছে ঘরসংসারে, বড়ো ক'রে তোলা হয়েছে 'নারী চিরন্তনী'কে, ওই অন্ধকারের মধ্যে দিব্য অদ্দনের মতো দেখা দেয় দ্য বোভোয়ারের *ল্য দ্যজিয়েম সেক্স* (১৯৪৯; দ্বিতীয় লিঙ্গ); এটি হয়ে ওঠে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় নারীর পরিস্থিতির এক ধ্রুপদী দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিক ভাষ্য, হয়ে ওঠে নবনারীদের মূলগ্রন্থ। *ল্য দ্যজিয়েম সেক্স*কে আপাতদৃষ্টিতে খুবই ভিন্ন মনে হয় মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌টের *ভিন্ডিকেশন* থেকে, অনেক জটিল অনেক প্রাজ্ঞ এ-বই মেরির বইটি থেকে, মেরির বইয়ের ক্রোধ ও আক্রমণ নেই এতে, এমনকি তিনি কোনো দাবিও জানান নি, তিনি ব্যাখ্যা ও উদ্‌ঘাটন করেছেন নারীর পরিস্থিতি, তবে এতে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে সে-চিন্তাভাবনা, যার উন্মেষ ঘটেছিলো মেরির বইতে। মেরির আক্রমণের একটি বিষয় 'চিরন্তনী নারী' ধারণা, যা পিতৃতন্ত্রের ধর্মে দর্শনে সাহিত্যে এবং সব কিছুতে এক ধ্রুব ব্যাপার ব'লে গৃহীত, মেরি তা বাতিল ক'রে দেন; দ্য বোভোয়ারেরও প্রধান বিষয় এটিই, তবে তিনি মেরির মতো আক্রমণ করেন নি, ধর্ম পুরাণ মনোবিজ্ঞান সাহিত্য ঘেঁটে দেখান এর অসারত্ব। তিনি বলেছেন, 'বিধানকর্তারা, পুরোহিতেরা, দার্শনিকেরা, লেখকেরা, এবং বিজ্ঞানীরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে নারীর অধীন অবস্থান স্থির হয়েছে স্বর্গে এবং মর্ত্যে এটা সুবিধাজনক। পুরুষের উদ্ভাবিত ধর্মগুলোতে প্রতিফলিত হয় আধিপত্যের এ-বাসনা।'

তাঁর বিষয় সভ্যতায় নারীর পরিস্থিতি; এটা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'অস্তিত্ববাদী নীতিশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে'। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আমরা মানুষ, কেননা আমরা পেরিয়ে যাই প্রকৃতিকে; মানুষ হওয়ার অর্থ ক্রমশ হয়ে ওঠা, বিকশিত হওয়া, আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা; জীবনের মূল্য শুধু বেঁচে থাকায় নয়, বরং জীবনকে নিরন্তর বিকশিত করার মধ্যে। মানবমণ্ডলিতে আছে দুটি লিঙ্গ : পুরুষ ও নারী; এর মাঝে পুরুষ 'বদলে দেয় পৃথিবীর মুখমণ্ডল, সে নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করে, আবিষ্কার করে, সে গঠন করে ভবিষ্যতের রূপ'; আর এটাই তাকে ভিন্ন ক'রে তোলে পশুর থেকে। আমাদের সংজ্ঞা কী? কর্ম ও আকাঙ্ক্ষাই সংজ্ঞায়িত করে আমাদের। প্রজননের মাধ্যমে কেউ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না, হয়ে উঠতে হয় সৃষ্টি ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে; তিনি

বলেছেন, 'স্ত্রীলিঙ্গ তার প্রজাতির শিকার।' পুরুষ নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয় নিরর্থক জৈবিক পুনরাবৃত্তির কবল থেকে, নিরন্তর চেষ্টা করে নিজের জন্যে অধিকতর স্বাধীনতা সৃষ্টির। কিন্তু নারী? নারীর শোচনীয় ট্র্যাজেডি হচ্ছে ইতিহাসব্যাপী তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষের অধিকার থেকে, তাকে মানুষ হয়ে উঠতে দেয়া হয় নি। তিনি ব্যবহার করেছেন দুটি ধারণা : আত্ম (সেল্ফ) ও অপর (আদার), যে-দুটিকে তিনি মানবিক চেতনার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁর মতে, প্রতিটি চেতনা বিরূপ অন্য প্রতিটি চেতনার প্রতি: একটি চেতনা নিজেকে ক'রে তোলে কর্তা, প্রয়োজনীয় বা অবধারিত, আর সে অন্য চেতনাকে ক'রে তোলে কর্ম, অপ্রয়োজনীয়, আকস্মিক। নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পারস্পরিকতা রক্ষা করা হয় নি, পুরুষ নারীকে ক'রে তুলেছে চিরন্তন 'অপর', তাকে ক'রে তুলেছে কর্ম, কখনো কর্তা হয়ে উঠতে দেয় নি। তাই নারী হয়ে আছে প্রকৃতি, রহস্যময়ী, অ-মানুষ; মানুষ হিশেবে তার মূল্য নেই, তার মূল্য অমূর্ত ধারণার প্রতিরূপ হিশেবে। নারী যতো দিন নারী হয়ে থাকবে, ততো দিন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। তিনি অসামান্যরূপে ব্যাখ্যা করেছেন কিংবদন্তি বা পুরাণে এবং সাহিত্যে নারীর ভাবমূর্তি; আক্রমণ করেছেন উৎপাদিত অসার নারীভাবমূর্তিকে। বলেছেন, 'পুরুষের দাসী না হ'লেও নারী সব সময়ই আশ্রিত থেকেছে পুরুষের; এ-দুটি লিঙ্গ কখনো পৃথিবীকে সমভাবে ভোগ করে নি।' তিনি অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যবহার করেছেন, তাঁর দর্শন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নাও হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা নির্ভুল। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই পুরুষ নিজেকে ক'রে তুলেছে মানুষের পরম রূপ, অর্থাৎ পুরুষই মানুষ, আর নারী নিতান্তই নারী; পুরুষ হচ্ছে মানুষকে মাপার মানদণ্ড, নারীকে ওই মানদণ্ডে মেপে ঘোষণা করা হয়েছে নিকৃষ্ট ব'লে। *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এর প্রথম খণ্ডে তিনি অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন পুরুষের পক্ষপাতিত্বের; দেখিয়েছেন, 'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং হয়ে ওঠে'; অর্থাৎ পিতৃতন্ত্র ছাঁচে ঢালাই ক'রে উৎপাদন করে একটি উপভোগ্য বস্তু : নারী। পুরুষ নিজেকে ক'রে তুলেছে প্রভু; তিনি বলেছেন, 'বহু শব্দ অনেক সময় ব্যবহৃত হয় চরম আক্ষরিক অর্থে, যেমন *ফ্যালাস* (শিশ্ন) শব্দটি বুঝিয়ে থাকে মাংসের সে-উত্থান, যা নির্দেশ করে পুরুষকে; তারপর এগুলোকে সম্প্রসারিত করা হয় সীমাহীনভাবে এবং দেয়া হয় প্রতীকী অর্থ, তাই শিশ্ন এখন বুঝিয়ে থাকে পৌরুষ ও তার পরিস্থিতি।' পুরুষতন্ত্র এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে যে শিশ্নই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। ধনাত্মকতা ও ঋণাত্মকতার, বা বৈপরীত্যের যে-ধারণা পরে প্রধান হয়ে ওঠে ভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ও অন্যান্য বিদ্যায়, তা তিনি চমৎকারভাবে প্রয়োগ করেন নারী ও পুরুষ ব্যাখ্যায়; দেখান যে পুরুষতন্ত্র তৈরি করেছে একরাশ বিপরীত ধারণা, যার একটি ধনাত্মক বা প্রয়োজনীয় বা কর্তা, আরেকটি ঋণাত্মক বা অপ্রয়োজনীয় বা কর্ম, যেমন : পুংলিঙ্গ : স্ত্রীলিঙ্গ, সংস্কৃতি : প্রকৃতি, মানুষ : পশু, উৎপাদন : প্রজনন, সক্রিয় : অক্রিয়; এগুলোর মধ্যে প্রথমটি শুভ, বিপরীতটি অশুভ, এবং পুরুষতন্ত্র প্রথমটি রেখেছে নিজের জন্যে, বিপরীতটি নারীর জন্যে। তিনি বাতিল করেছেন 'চিরন্তনী নারীত্ব'কে; তবে তিনি পুরুষকেই মানবমণ্ডলির প্রতিনিধি হিশেবে গ্রহণ করেছেন, এবং নারীর জন্যে চেয়েছেন পুরুষেরই গুণ, যেমন বহু আগে অন্ধকারতম

অঞ্চলের এক নারীবাদী, রোকেয়া, পুরুষকে প্রচণ্ড আক্রমণ, নিন্দা, পরিহাসের পর বলেছিলেন, 'আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ।' রোকেয়া পুরুষকে বলেছেন অপদার্থ দুশ্চরিত্র পাপিষ্ঠ শয়তান পাশবিক, দ্য বোভোয়ার এমন তিরস্কার করেন নি; রোকেয়া বলেছিলেন, 'পুরুষদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে– একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই'; দ্য বোভোয়ার *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এর শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, 'বিদ্যমান বিশ্বের মাঝে মুক্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে পুরুষকেই। এ-পরম বিজয় লাভের জন্যে, এক দিকে, এটা দরকার যে পুরুষ ও নারীরা তাদের প্রাকৃতিক পার্থক্যকরণের সাহায্যে ও মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করবে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ।' রোকেয়ায় এ-ভ্রাতৃত্ববোধ নেই, রয়েছে একটা বিরোধ, কিন্তু দ্য বোভোয়ার চেয়েছেন নারী ও পুরুষের সাম্য ও প্রীতিপূর্ণ বিকাশ।

১৭৯২-এ মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের *ভিন্ডিকেশন*-এর পর থেকে অনেকেই কাজ করেন, বাস্তবে ও তাত্ত্বিকভাবে, নারীমুক্তির জন্যে; গ'ড়ে তোলেন একটি মৌলিক চিন্তাধারা, যাকে আজ বলা হয় 'নারীবাদ'; তার মধ্যে যেমন রয়েছেন রামমোহন রায়, লুসি স্টোন, কেডি স্ট্যান্টন, সুজ্যান অ্যান্থনি, ফ্যানি রাইট, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্টুয়ার্ট মিল, হেনরিক ইবসেন, বেগম রোকেয়া, রোসা লুক্সেমবার্গ, ভার্জিনিয়া উল্ফ, এবং আরো অনেকে, যাঁরা বাস্তবিক ও তাত্ত্বিকভাবে তৈরি করেন নারীমুক্তির আন্দোলন। বিশশতকে নারীবাদের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক সিমোন দ্য বোভোয়োর; তিনি যখন *দ্বিতীয় লিঙ্গ* লেখেন, তখন তিনি ছিলেন একা, তখন ভুলেই যাওয়া হয়েছিলো নারীকে; তবে দু-দশকের মধ্যেই অন্ধকার কাটে, দেখা দেয় নারীবাদের 'দ্বিতীয় ঢেউ' বা নবনারীবাদ, বেরোয় বেটি ফ্রিডানের *ফেমনিন মিস্টিক* (১৯৬৩), কেইট মিলেটের *সেক্সুয়াল পলিটিক্স* (১৯৬৯); দেখা দেন জারমেইন গ্রিয়ার, মেরি এলমান, সান্দ্রা গিলবার্ট, ফাতিমা মেরনিসি, নওএল এল সাদাওয়ি, এলেন সিক্সো, ল্যুস ইরিগার, ক্রিস্তেভা, টাইগ্রেস অ্যাটকিন্সন, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, শিলা রোওবোথাম এবং বিশ্ব জুড়ে আরো অজস্র, যাঁরা বদলে দেন পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারার চরিত্র; এবং তাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে ঋণী সিমোন দ্য বোভোয়ারের কাছে। নারীবাদ আর কোনো পশ্চিমি প্রপঞ্চ নয়, এটা বিশ্বজনীন।

নারীবাদের বিশশতকের প্রধান প্রবক্তা, সিমোন দ্য বোভোয়ার কি ছিলেন নারীবাদী? প্রশ্নটিই হাস্যকর মনে হ'তে পারে; এমন যে খ্রিস্ট কি ছিলেন খ্রিস্টান, মার্ক্স কি ছিলেন মার্ক্সবাদী? দ্য বোভোয়ার যখন, ১৯৪৯-এ, *দ্বিতীয় লিঙ্গ লেখেন*, তাঁর মনে হয়েছিলো সমাজতন্ত্রই নারীকে মুক্তি দেবে তার দাসত্ব থেকে, তাই তখন তিনি নিজেকে মনে করেছেন একজন সমাজতন্ত্রবাদী, নারীবাদী নয়। কিন্তু এক সময় তাঁর ভুল ভাঙে, দেখতে পান সমাজতন্ত্র নারীকে মুক্তি দিচ্ছে না, ওটিও একটি পুংতন্ত্র। ১৯৭২-এ তিনি যোগ দেন ফ্রান্সের এমএলএফ-এ (নারীমুক্তি আন্দোলন), এবং প্রথমবারের মতো নিজেকে নারীবাদী ব'লে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, '১৯৭০-এ এমএলএফ (নারীমুক্তি আন্দোলন) স্থাপিত হওয়ার আগে ফ্রান্সে যে-সব

নারীসংঘ ছিলো, সেগুলো ছিলো সাধারণত সংস্কার ও আইনপন্থি। তাদের সাথে জড়িত হওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার হয় নি। তুলনায় নবনারীবাদ আমূলবাদী।... *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এর শেষভাগে বলেছিলাম আমি নারীবাদী নই, কেননা আমি বিশ্বাস করতাম যে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সাথে আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যাবে নারীর সমস্যা। নারীবাদী বলতে আমি বোঝাতাম শ্রেণীসংগ্রামনিরপেক্ষভাবে বিশেষ নারীসমস্যা নিয়ে লড়াইকে। আমি আজো একই ধারণা পোষণ করি। আমার সংজ্ঞায় নারীবাদীরা এমন নারী– বা এমন পুরুষ– যাঁরা, সংগ্রাম করছেন নারীর অবস্থা বদলের জন্যে, সাথে থাকছে শ্রেণীসংগ্রাম; এবং তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামনিরপেক্ষভাবেও, সমাজের সমস্ত বদলের ওপর নির্ভর না ক'রে, নারীর অবস্থা বদলের জন্যে সংগ্রাম করতে পারেন। আমি বলবো এ-অর্থেই আমি আজ নারীবাদী, কেননা আমি বুঝতে পেরেছি যে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগে নারীর পরিস্থিতির জন্যে আমাদের লড়াই করতে হবে, এখানে এবং এখনই।'

সিমোন দ্য বোভোয়ারের মৃত্যু হয় ১৪ আগস্ট, ১৯৮৬তে, প্যারিসে; তখন তিনি হয়ে উঠেছিলেন নারীর সাম্য ও অধিকারের সংগ্রামের বিশ্বজনীন প্রতীক।

ল্য দ্যজিয়েম সেক্স : দ্বিতীয় লিঙ্গ বই হিশেবে কেমন? বলবো কি এটি আমার পড়া শ্রেষ্ঠ গদ্য বইগুলোর একটি; বলবো কি, যদিও এ-দুটির মধ্যে তুলনা চলে না, এটি *ওয়ার অ্যান্ড পিস*-এর থেকেও উৎকৃষ্ট? কেনো বলবো না? তলস্তয় পৌরাণিক, অনেকাংশে ক্ষতিকর ও অতিমূল্যায়িত; আর দ্য বোভোয়ার ভবিষ্যতের। তত্ত্ব, দর্শন, ব্যাখ্যা প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলেও থাকে এর অনন্য শিল্পিতা, সৌন্দর্য; অজস্র উৎকৃষ্ট কবিতার রূপক, উপমা, চিত্রকল্প জড়ো হয়ে আছে এ-বইয়ে, এর বর্ণনাগুলোতে আছে এমন নিবিড়তা, যা ক্ষণেক্ষণে মন ও ইন্দ্রিয়গুলোকে দেয় পরম শিহরণ, যদিও মূল আমি পড়ি নি। আমি অনুবাদ করেছি এইচ এম পার্শলির অসামান্য ইংরেজি অনুবাদটি থেকে, তবে পুরোটা অনুবাদ করি নি, তাহলে হাজার পাতায় পৌঁছোতে হতো; অনুবাদ করেছি আমার প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো। আমি আন্তরিক থাকতে চেয়েছি পার্শলির প্রতি, যেমন তিনি চেয়েছেন দ্য বোভোয়ারের প্রতি; কোথাও ভাবানুবাদ করি নি, মূলের মতোই উপস্থাপন করতে চেয়েছি বক্তব্য। অনুবাদে ভুগেছি নানা সমস্যায়, তার মধ্যে আছে পরিভাষা; তবে তা বড়ো নয়, ভঙ্গিটিই প্রধান সমস্যা। এবং সমস্যা সর্বনামের : ইংরেজিতে সর্বনামের পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ রূপ রয়েছে, এবং রয়েছে বস্তু ও অবস্তুবাচক সর্বনাম, কিন্তু বাঙলা সর্বনাম লিঙ্গনিরপেক্ষ, এটা নারীবাদীদের কাছে সুখের হ'লেও অনুবাদকের জন্যে বড়োই অসুখের;'হি', 'সি'র বিচিত্র রূপের, এবং 'ইট'-এর কাজ শুধু 'সে' বা 'তা' দিয়ে কুলোনো যায় না; তাই অনেক সময় সর্বনামের বদলে বিশেষ্যই ব্যবহার করছি। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করা হলো অনেক কিছু, এবং বাড়লো একশো পাতার মতো; এবং আর বাড়বে না।

৪ শ্রাবণ ১৪০৮ : ১৯ জুলাই ২০০১ হুমায়ুন আজাদ
১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা

ভূমিকা

নারী সম্পর্কে একটি বই লেখা নিয়ে আমি দীর্ঘকাল ধ'রে দ্বিধায় ছিলাম। বিষয়টি বিরক্তিকর, বিশেষ ক'রে নারীদের কাছে; এবং এটা নতুন নয়। নারীবাদ নিয়ে কলহে প্রচুর কালির অপচয় হয়েছে, এবং এখন সম্ভবত এ নিয়ে আর কিছু না বলাই ভালো। তবে এখনো এ-সম্পর্কে কথা ওঠে, কেননা গত শতকে এ-সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ বাজেকথা বলা হ'লেও তা সমস্যাটিকে একটুও আলোকিত করে নি। কোনো সমস্যা কি আছে আদৌ? যদি থাকে, সেটি কী? সত্যিই কি আছে নারীরা? চিরন্তন নারীত্বে বিশ্বাস করেন এমন লোক এখনো আছেন, যাঁরা আপনার কানে ফিসফিস ক'রে বলবেন : 'এমনকি রাশিয়ায়ও নারীরা এখনো নারী'; এবং অন্য পণ্ডিতজনেরা– কখনো কখনো একই ব্যক্তি– দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন : 'নারী তার পথ হারিয়ে ফেলছে, নারী বিলুপ্ত।' কিন্তু যদি আজো থেকে থাকে নারী, যদি তারা থাকে চিরকাল, তারা থাকুক এটা বাঞ্ছিত হোক বা না হোক, তাই ভাবতে ইচ্ছে করে পৃথিবীতে তারা অধিকার ক'রে থাকবে কোন স্থান, তাদের স্থান কী হওয়া উচিত? একটি স্বল্পায়ু সাময়িকপত্র সম্প্রতি প্রশ্ন করেছে, 'কী হয়েছে নারীদের?'

কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন করা দরকার : নারী কী? *'তোতা মিউলিয়ের ইন ইউতেরো'*, একজন বলেন, 'নারী হচ্ছে জরায়ু'। তবে কোনো কোনো নারী সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রসজ্ঞরা ঘোষণা করেন যে তারা নারী নয়, যদিও অন্য নারীদের মতো তারাও জরায়ুসম্বলিত। সবাই এ-সত্যটি স্বীকার করে যে মানব প্রজাতির ভেতরে স্ত্রীলিঙ্গরা রয়েছে; চিরদিনের মতো আজো তারা মানবমণ্ডলির অর্ধেক। তবুও আমাদের বলা হয় যে নারীত্ব বিপন্ন; আমাদের বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হয় নারী হ'তে, নারী থাকতে, নারী হয়ে উঠতে। তাই মনে হয় যে প্রতিটি স্ত্রীলিঙ্গ মানুষই নারী নয়; নারীরূপে বিবেচিত হ'তে হ'লে তার থাকতে হবে সে-রহস্যময় ও বিপন্ন বৈশিষ্ট্য, যাকে বলা হয় নারীত্ব। এটা কি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য, যা নিঃসৃত হয় ডিম্বাশয় থেকে? অথবা এটা কি কোনো প্লাতোয়ী সারবস্তু, কোনো দার্শনিক কল্পনার সামগ্রি? কোনো কোনো নারী এ-সারসত্তার প্রতিমূর্তি হওয়ার জন্যে ব্যগ্রভাবে চেষ্টা করলেও এর উৎপাদন অসম্ভব।

ধারণাবাদ তার অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারে নি। জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান আর স্বীকার করে না চিরস্থির অপরিবর্তনীয় গুণাবলির অস্তিত্ব, যা নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যেগুলো চাপিয়ে দেয়া হয় নারী, ইহুদি, বা নিগ্রোদের ওপর। বিজ্ঞান কোনো বৈশিষ্ট্যকে আংশিকভাবে কোনো *পরিস্থিতি*র ওপর নির্ভরশীল ব'লে গণ্য করে। আজ যদি নারীত্ব না থাকে, তাহলে তা কখনো ছিলো না। তবে *নারী* শব্দটির কি কোনো বিশেষ অর্থ নেই? যাঁরা বিশ্বাস করেন যুক্তিবাদ ও নামবাদী দর্শনে, তাঁদের

কাছে নারী হচ্ছে সে-সব মানুষ, যাদের *স্বেচ্ছাচারীভাবে* নির্দেশ করা হয় *নারী* শব্দটি দিয়ে। অনেক মার্কিন নারী মনে করে যে নারী ব'লে আর কিছু নেই; কোনো পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি যদি নিজেকে নারী ব'লে মনে করে, তাহলে তার বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দেয় মনোসমীক্ষণের, যাতে সে এ-আবিষ্টতা থেকে মুক্ত করতে পারে নিজেকে। *আধুনিক নারী : বিলুপ্ত লিঙ্গ* নামে একটি বই সম্পর্কে ডরোথি পার্কার লিখেছেন : 'যে-সব বই নারীকে নারী হিশেবে বিচার করে, সেগুলোর প্রতি আমি ন্যায়ানুগ হ'তে পারি না... আমার ধারণা আমাদের সবাইকে, পুরুষ ও নারীদের, গণ্য করতে হবে মানুষ হিশেবে।' তবে নামবাদ একটি অসুষ্ঠু মতবাদ; আর নারীবাদবিরোধীদের এটা দেখিয়ে দিতে কোনোই কষ্ট হয় নি যে নারীরা পুরুষ নয়। নারী অবশ্যই, পুরুষের মতোই, একজন মানুষ; তবে এ-ঘোষণা বিমূর্ত। সত্য হচ্ছে প্রতিটি বাস্তব মানুষ সব সময়ই এক একলা, পৃথক সত্তা। চিরন্তন নারীত্ব, কৃষ্ণ আত্মা, ইহুদি চরিত্র ইত্যাদি ধারণা অস্বীকার করার অর্থ এ নয় যে আজ ইহুদি, নিগ্রো, ও নারীদের অস্তিত্ব নেই; এমন অস্বীকার এদের মুক্তি নির্দেশ করে না, নির্দেশ করে বাস্তবতা থেকে পলায়ন। কয়েক বছর আগে একজন বিখ্যাত নারী লেখক লেখিকাদের একগুচ্ছ ছবির মধ্যে তাঁর ছবি অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেন নি; তিনি চান পুরুষদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ'তে। তবে এ-সুবিধা পাওয়ার জন্যে তিনি খাটান তাঁর স্বামীর প্রভাব! যে-নারীরা নিজেদের পুরুষ ব'লে দাবি করে, তারা নির্ভর করে পুরুষদের বিবেচনা ও শ্রদ্ধাবোধের ওপরই। ট্রটস্কিপন্থি এক তরুণী, যে দাঁড়িয়ে ছিলো হৈহল্লাপূর্ণ এক জনসভার মঞ্চে, নিজের দেহের ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও যে ঘুষোঘুষির জন্যে ছিলো প্রস্তুত, তার কথা আমার মনে পড়ছে। সে অস্বীকার করছিলো তার নারীসুলভ দুর্বলতা; তবে সে এটা করছিলো এক উগ্র পুরুষের প্রতি প্রেম থেকে, যার সমকক্ষ সে হ'তে চেয়েছিলো। অনেক মার্কিন নারীর স্পর্ধার প্রবণতা প্রমাণ করে যে তারা তাড়িত হচ্ছে তাদের নারীত্ববোধ দিয়ে। সত্য হচ্ছে, চোখ খোলা রেখে একটু ঘুরতে গিয়েই দেখা যায় মানবমণ্ডলি দু-শ্রেণীর মানুষে বিভক্ত, যাদের পোশাক, মুখমণ্ডল, শরীর, হাসি, হাঁটাচলার ভঙ্গি, আগ্রহ, এবং পেশা সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন। সম্ভবত এসব ভিন্নতা বাহ্যিক, হয়তো এগুলো লোপ পেয়ে যাবে। তবে যা নিশ্চিত, তা হচ্ছে যে এসব সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান।

যদি নারী হিশেবে কাজ করা নারীর সংজ্ঞা তৈরির জন্যে যথেষ্ট না হয়, যদি আমরা তাকে 'চিরন্তন নারীত্ব' ধারণা দিয়েও ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করি, এবং যদি আমরা, আপাতত, স্বীকার ক'রে নিই যে নারীরা আছে, তাহলে আমাদের একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তেই হয় : নারী কী?

প্রশ্নটি করাই, আমার কাছে, একটি প্রাথমিক উত্তর নির্দেশ করা। আমি যে এ-প্রশ্নটি করছি, এটাই তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো পুরুষই কখনো পুরুষ মানুষের উৎকট পরিস্থিতি সম্পর্কে একখানা বই লিখতে উদ্যত হবে না। কিন্তু আমি যদি নিজেকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই, সবার আগে আমাকে বলতে হবে : 'আমি একজন নারী'; পরবর্তী সমস্ত আলোচনা রচিত হবে এ-সত্যের ওপর ভিত্তি ক'রে। পুরুষ কখনোই নিজেকে কোনো এক বিশেষ লিঙ্গের সদস্য হিশেবে উপস্থাপিত ক'রে শুরু করে না; সে যে পুরুষ, এটা বলা বাহুল্য। *পুরুষ* ও *নারী* শব্দ দুটি প্রতিসমরূপে ব্যবহৃত হয়

শুধু গঠন হিশেবেই, যেমন আইনের কাগজপত্রে। বাস্তবে এ-দু-লিঙ্গের সম্পর্ক দুটি বৈদ্যুতিক মেরুর সম্পর্কের মতো নয়, কেননা পুরুষ ধনাত্মক ও নিরপেক্ষ উভয়ই নির্দেশ করে, যা দেখা যায় *ম্যান* শব্দটির সাধারণ ব্যবহারে, এটা বোঝায় সমগ্র মানবমণ্ডলি; আর সেখানে নারী নির্দেশ করে শুধুই নেতিবাচকতা। কোনো বিমূর্ত আলোচনার মাঝে পুরুষদের মুখে শোনা যায় এমন বিরক্তিকর কথা : 'তুমি নারী ব'লেই এমন কথা ভাবছো'; কিন্তু আমি জানি আত্মরক্ষার জন্যে আমার একমাত্র উত্তর হচ্ছে : 'এটা সত্য ব'লেই আমি একথা ভাবছি', এটা ব'লে আলোচনা থেকে আমি সরিয়ে নিই আমার মন্ময় সত্তাকে। এমন উত্তর দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না যে : 'তুমি পুরুষ ব'লেই উল্টোটা ভাবছো', তার কারণ পুরুষ হওয়া কোনো অস্বাভাবিকতা নয়। পুরুষ পুরুষ ব'লেই ঠিক; নারী হওয়াই অঠিক। এটা অনেকটা এমন : প্রাচীনদের কাছে ধ্রুব উল্লম্ব ব'লে একটা ব্যাপার ছিলো, যার সাথে তুলনা ক'রে তারা নির্দেশ করতো তির্যককে, ঠিক তেমনি রয়েছে এক ধ্রুব মনুষ্যশ্রেণী, পুরুষ। নারীর রয়েছে ডিম্বাশয়, জরায়ু : এ-অস্বাভাবিকতাগুলো তাকে বন্দী ক'রে রাখে তার মন্ময়তার মধ্যে, আবদ্ধ রাখে তাকে তার নিজের স্বভাবের সীমার মধ্যে। মাঝেমাঝেই বলা হয় যে নারী চিন্তা করে তার লালাগ্রন্থির সাহায্যে। পুরুষ চমৎকারভাবে ভুলে যায় যে তার দেহসংস্থানেও রয়েছে লালাগ্রন্থি, যেমন অণ্ডকোষ; এবং এগুলো থেকে নিঃসৃত হয় হরমোন। সে নিজের শরীরের কথা ভাবে পৃথিবীর সাথে এক প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক পাতিয়ে রেখে, এবং মনে করে যে এটা সে অনুধাবন করছে বস্তুগতভাবে; আর সে নারীর শরীরকে মনে করে একটি প্রতিবন্ধকতা, একটি কারাগার। 'নারী বিশেষ কিছু গুণাবলির অভাবেই নারী,' বলেছেন অ্যারিস্ততল, 'আমরা মনে করবো যে নারীপ্রকৃতি প্রাকৃতিকভাবেই ত্রুটিগ্রস্ত।' সেইন্ট টমাস ঘোষণা করেছেন নারী হচ্ছে 'বিকৃত পুরুষ', একটি 'আকস্মিক' সত্তা। এটাই প্রতীকিত হয়েছে *আদিপুস্তক*-এ, বোসোর মতে যেখানে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদমের 'একটি সংখ্যাতিরিক্ত অস্থি' থেকে।

এভাবে মানবজাতি হচ্ছে পুরুষ এবং পুরুষেরা নারীকে নারী হিশেবে সংজ্ঞায়িত করে না, করে পুরুষের সাথে তুলনা ক'রে; নারীকে গণ্য করা হয় না কোনো স্বায়ত্তশাসিত সত্তা রূপে। মিশেলে লিখেছেন : 'নারী, আপেক্ষিক সত্তা...।' *রাপোর দ্য'ইউরিয়েল*-এ বেন্দা লিখেছেন : 'নারীর শরীরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও পুরুষের শরীর নিজেই অর্থ প্রকাশ করে, অন্যদিকে নারীর শরীর একলা নিজে তাৎপর্যহীন... পুরুষ নারীকে বাদ দিয়েও ভাবতে পারে নিজের কথা। নারী পুরুষ ছাড়া নিজের সম্পর্কে ভাবতে পারে না।' নারী তা-ই, পুরুষ যা ঘোষণা করে; এজন্যেই তাকে বলা হয় শুধু 'লিঙ্গ', যা দিয়ে বোঝানো হয় যে নারী পুরুষের কাছে শুধুই একটি লৈঙ্গিক প্রাণী। পুরুষের কাছে নারী লিঙ্গ, চরম লিঙ্গ, তার কম নয়। পুরুষের সাথে তুলনা ক'রে তাকে সংজ্ঞায়িত ও পৃথক করা হয়, নারীর সাথে তুলনা ক'রে পুরুষকে সংজ্ঞায়িত করা হয় না। নারী হচ্ছে আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়, যেখানে পুরুষ হচ্ছে প্রয়োজনীয়। পুরুষ হচ্ছে কর্তা, পুরুষ হচ্ছে পরম– নারী হচ্ছে অপর।

অপর ধারণাটি চেতনার মতোই একটি আদিম ধারণা। আদিমতম সমাজে, প্রাচীনতম পুরাণে পাওয়া যায় এক ধরনের দ্বৈততা– আত্ম ও অপরের দ্বৈততা। এ-

দ্বৈততা শুরুতে দু-লিঙ্গের বিভাজনের সাথে জড়িত ছিলো না; এটা নির্ভরশীল ছিলো না কোনো বাস্তব সত্যের ওপরও। গ্রানেতের চৈনিক চিন্তাধারা ও দিউমেজিলের পূর্ব ভারত ও রোম সম্পর্কিত রচনায় এটা দেখানো হয়েছে। শুভ ও অশুভ, সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ, ডান ও বাম, বিধাতা ও লুসিফার প্রভৃতি বিপরীতার্থক শব্দবন্ধে শুরুতে নারী-উপাদান যতোটা ছিলো বরুণ-মিত্রা, ইউরেনাস-জিউস, সূর্য-চন্দ্র, এবং দিন-রাত্রি প্রভৃতি শব্দযুগলে নারী-উপাদান তার চেয়ে বেশি ছিলো না। মানুষের চিন্তাধারায় অপর একটি মৌল ধারণা।

কোনো গোত্রই কখনো নিজের বিপরীতে অপর ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত না ক'রে নিজেকে এক বা আত্ম হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করে না। যদি তিনজন সহযাত্রী ট্রেনের এক কামরায় ওঠার সুযোগ পায়, এটাই কামরার অন্য যাত্রীদের বৈরী 'অপর'-এ পরিণত করার জন্যে যথেষ্ট। সংকীর্ণদের চোখে নিজের গ্রামের অধিবাসী নয় এমন সব মানুষই 'অপরিচিত' ও সন্দেহজনক; এক দেশের মানুষের কাছে ভিন্ন দেশে বাস করে এমন সব মানুষই 'বিদেশি'; ইহুদিবিরোধীদের কাছে ইহুদিরা 'ভিন্ন', মার্কিন বর্ণবাদীদের কাছে নিগ্রোরা 'নিকৃষ্ট', ঔপনিবেশিকদের কাছে ওই দেশের অধিবাসীরা 'নেটিভ', বিশেষাধিকারভোগীদের কাছে সর্বহারারা 'নিম্ন শ্রেণী'।

বিভিন্ন ধরনের আদিম সমাজ সম্পর্কিত এক জ্ঞানগর্ভ রচনার শেষে লেভি-স্ট্রাউস পৌঁচেছেন নিম্নরূপ উপসংহারে : 'প্রাকৃত অবস্থা থেকে সংস্কৃত অবস্থায় যাত্রা চিহ্নিত হয়ে থাকে মানুষের বিশেষ সামর্থ্য দিয়ে, যা জৈবিক সম্পর্কগুলোকে একগুচ্ছ বৈপরীত্যের পরম্পরারূপে দেখতে পারে; দ্বৈততা, পর্যায়ক্রম, বৈপরীত্য, এবং প্রতিসাম্য, সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে, এতো বেশি প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে না, যাকে সমাজ-বাস্তবতার মৌল ও জরুরি উপাত্ত ব'লে ব্যাখ্যা করতে হবে।' মানব সমাজ যদি হতো কোনো *মিটজাইন* বা সংহতি ও বন্ধুত্বের ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠা সাহচর্য, তাহলে এসব প্রপঞ্চ হতো অবোধগম্য। সব কিছু সহজ হয়ে ওঠে যদি আমরা হেগেলকে অনুসরণ ক'রে দেখি যে চেতনার নিজের ভেতরেই রয়েছে অন্য সব চেতনার বিরুদ্ধে বিরোধিতা; বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় কর্তা– সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে অপরিহার্যরূপে, যার বিপক্ষে আছে অপর, অপ্রয়োজনীয়, কর্ম।

তবে অপর চেতনা, অপর অহং, জ্ঞাপন করে একটি পারস্পরিক দাবি। এক দেশের অধিবাসী পাশের দেশে গিয়েই আহত বোধ করে যে ওই দেশের অধিবাসীদের কাছে সে গণ্য হচ্ছে 'আগন্তুক' ব'লে। আসলে বিভিন্ন গোত্র, জাতি, ও শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ, উৎসব, ব্যবসা, চুক্তি, ও প্রতিযোগিতার প্রবণতা হচ্ছে অপর-এর ধ্রুব তাৎপর্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা, এবং তার আপেক্ষিকতাকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলা; ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় ব্যক্তি ও দলকে বাধ্য করা হয় তাদের সম্পর্কের পারস্পরিকতা স্বীকার ক'রে নিতে। তাহলে এটা কী ক'রে ঘটলো যে দু-লিঙ্গের পারস্পরিকতা স্বীকৃত হলো না, বৈপরীত্যসূচক একটি ধারণাই হয়ে উঠলো অপরিহার্য, এর সাথে সম্পর্কিত ধারণাটিকে অস্বীকার করা হলো, এবং অন্য ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হলো বিশুদ্ধ অপরত্ব রূপে? এটা কেনো হলো যে নারী বিরোধিতা করে না পুরুষের সার্বভৌমত্বের? কোনো কর্তাই স্বেচ্ছায় হ'তে চায় না কর্ম, অপ্রয়োজনীয়; অপর কখনো নিজেকে অপর

রূপে সংজ্ঞায়িত ক'রে একককে প্রতিষ্ঠিত করে না। একই অপরকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে নিজেকে এক রূপে সংজ্ঞায়িত করার জন্যে। অপর যদি নিজের এক হওয়ার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে না পারে, তখন তাকে অনুগত হয়ে মেনে নিতে হয় বিরোধীর দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর ক্ষেত্রে এ-আনুগত্য কেমন ক'রে ঘটলো?

এমন আরো অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে বিশেষ কোনো একটি ধারণা অন্য ধারণার ওপর কিছু সময়ের জন্যে আধিপত্য করতে পেরেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা ঘটে সংখ্যার অসমতার জন্যে– সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের শাসন চাপিয়ে দেয় সংখ্যালঘুদের ওপর, বা চালায় অত্যাচার। কিন্তু নারীরা মার্কিন নিগ্রো বা ইহুদিদের মতো সংখ্যালঘু নয়; পৃথিবীতে যতো পুরুষ আছে নারীও আছে ততোই। আবার, দুটি গোত্র শুরুতে ছিলো স্বাধীন; তারা হয়তো জানতোও না একে অপরের কথা, বা হয়তো তারা স্বীকার ক'রে নিতো পরস্পরের স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে শক্তিমানরা পরাভূত করে দুর্বলদের। ইহুদিদের ছড়িয়ে পড়া, আমেরিকায় দাসত্বপ্রথা প্রবর্তন, সাম্রাজ্যবাদের দিগ্বিজয় এর উদাহরণ। এসব ক্ষেত্রে *নির্যাতিতরা অন্তত তাদের স্মৃতিতে বহন করেছে আগের দিনের কথা; সম্মিলিতভাবে* তারা ধারণ করেছে এক অতীত, এক ঐতিহ্য, কখনো এক ধর্ম বা এক সংস্কৃতি।

বেবেল নারী ও সর্বহারার মধ্যে যে-সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, তা এখানে ঠিক যে এরা কখনোই কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠি বা মানবমণ্ডলীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র যৌথ একক গঠন করে নি। সর্বহারারা চিরকাল ছিলো না, তবে নারী সব সময়ই ছিলো। নারীরা তাদের দেহসংস্থান ও শারীরবৃত্ত অনুসারেই নারী। ইতিহাস ভ'রেই নারীরা ছিলো পুরুষের অধীন, তাই তাদের অধীনতা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ফল নয় বা তা কোনো সামাজিক বদল নয়– এটা এমন কোনো ব্যাপার নয় যা *সংঘটিত* হয়েছে। বিশেষ সময়ে কোনো অবস্থা ঘটানো হ'লে অন্য কোনো সময়ে তা বিলুপ্ত করা সম্ভব, যা প্রমাণ করেছে হাইতির নিগ্রোরা ও অন্যরা; তবে এটা মনে হ'তে পারে যে কোনো প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। সত্য হচ্ছে কোনো কিছুর প্রকৃতিই চিরন্তন নয়। যদি অপ্রয়োজনীয় মনে হয় নারীকে, যে কখনো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে না, এটা এজন্যে যে নারী নিজেই পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ। সর্বহারারা বলে 'আমরা'; নিগ্রোরাও বলে। নিজেদের কর্তা বিবেচনা ক'রে তারা বুর্জোয়াদের, শাদাদের রূপান্তরিত ক'রে 'অপর'-এ। কিন্তু নারীবাদীদের কিছু সম্মেলন বা এ-ধরনের কিছু বিক্ষোভে ছাড়া নারীরা বলে না 'আমরা'; পুরুষেরা বলে 'নারীরা', আর নারীরাও নিজেদের নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করে এ-একই শব্দ। তারা কখনো অকৃত্রিমভাবে কর্তার মনোভাব গ্রহণ করে না। সর্বহারারা রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, হাইতিতে ঘটিয়েছে নিগ্রোরা, ইন্দো-চীনে এর জন্যে সংগ্রাম করছে ইন্দো-চীনারা; কিন্তু নারীরা কখনো প্রতীকী বিক্ষোভের বেশি কিছু করে নি। তারা তা-ই লাভ করেছে, যা পুরুষ তাদের দিতে চেয়েছে; তারা কিছুই নেয় নি, তারা শুধু পেয়েছে।

এর কারণ হচ্ছে নারীদের এমন কোনো বাস্তব সম্বল নেই, যার সাহায্যে তারা নিজেদের সংগঠিত করতে পারে একটি একককে, যা পারে তাদের সাথে সম্পর্কিত একককটির মুখোমুখি দাঁড়াতে। তাদের নিজেদের কোনো অতীত নেই, ইতিহাস নেই,

ধর্ম নেই; এবং সর্বহারাদের মতো তাদের নেই কোনো কর্ম ও স্বার্থের সংহতি। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে পুরুষদের মধ্যে; বাসগৃহ, গৃহস্থালি, আর্থিক অবস্থা, ও সামাজিক মর্যাদার সূত্রে তারা দৃঢ়ভাবে জড়িত থাকে কোনো পুরুষের সঙ্গে– পিতা বা স্বামীর সঙ্গে– যা তারা থাকে না কোনো নারীর সঙ্গে। যদি তারা বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে তারা ওই শ্রেণীর পুরুষের সাথে সংহতি বোধ করে, সর্বহারা নারীর সাথে করে না; যদি তারা শাদা হয়, তাহলে তারা শাদা শ্রেণীর পুরুষের সাথে সংহতি বোধ করে, নিগ্রো নারীর সাথে করে না। সর্বহারারা শাসকশ্রেণীকে হত্যা করার প্রস্তাব করতে পারে; এবং উগ্র কোনো ইহুদি বা নিগ্রো স্বপ্ন দেখতে পারে যে তার হাতে এসেছে আণবিক বোমা, এবং মানবমণ্ডলিকে সে ক'রে তুলেছে ইহুদি বা নিগ্রো; কিন্তু নারী পুরুষনিধনযজ্ঞের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। যে-বন্ধন তাকে বেঁধে রাখে তার পীড়নকারীর সাথে, অন্য কিছুর সাথে তার তুলনা হয় না। লিঙ্গ বিভাজন একটি জৈবিক সত্য, এটা মানব ইতিহাসের কোনো ঘটনা নয়। নারী ও পুরুষ এক আদিম *মিটজাইন*-এ (সাহচর্য, সহবসবাস) পরস্পরের বিপরীতে বিন্যস্ত; নারী এটাকে ভাঙে নি। যুগল হচ্ছে এক মৌল ঐক্য, যার দু-অর্ধেককে একত্রে গেঁথে দেয়া হয়েছে, এবং লিঙ্গের রেখা ধ'রে সমাজে ফাটল ধরানো অসম্ভব। এখানেই পাওয়া যাবে নারীর মৌল বৈশিষ্ট্য : নারী অপর এমন এক সমগ্রতায়, যার দুটি উপাদান পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়।

মনে করতে পারি যে এ-পারস্পরিকতা নারীর মুক্তিকে সহজতর করতে পারতো। হারকিউলিস যখন ওমফালের পায়ের কাছে ব'সে তাকে সাহায্য করেছিলো সুতো কাটায়, তখন তাকে বন্দী ক'রে রেখেছিলো ওমফালের জন্যে তার কামনা; কিন্তু ওমফালে কেনো অর্জন করতে পারে নি স্থায়ী ক্ষমতা? জেসনের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মিডিয়া হত্যা করেছিলো তাদের সন্তানদের; এ-নির্মম উপকথাটি নির্দেশ করে যে সন্তানদের প্রতি জেসনের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মিডিয়া জেসনের ওপর বিস্তার করেছিলো এক ভয়াবহ প্রভাব। *লাইসিসট্রাটায়* আরিস্তোফানেস প্রমোদের সাথে এঁকেছেন একদল নারীর চিত্র, যারা পুরুষদের কাম পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে লাভ করতে চায় সামাজিক সুবিধা; তবে এটা নাটকমাত্র। সেবিন নারীদের উপকথায় দেখা যায় ধর্ষণকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্যে তারা বন্ধ্যা থাকার যে-পরিকল্পনা করেছিলো, তারা তা ত্যাগ করে অনতিবিলম্বে। যৌন কামনা ও সন্তান লাভের বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে পুরুষ নির্ভরশীল হয় নারীর ওপর, কিন্তু সত্য হচ্ছে যে পুরুষের প্রয়োজন মিটিয়ে নারী কখনো সামাজিক মুক্তি লাভ করে নি।

প্রভু ও দাস সম্পর্কিত হয় পারস্পরিক প্রয়োজনে; এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা আর্থনীতিক, এবং এটা দাসকে মুক্ত করে না। প্রভুর সঙ্গে দাসের যে-সম্পর্ক, তাতে প্রভু গুরুত্বই দেয় না যে দাস তার প্রয়োজন, কেননা নিজের কাজ দিয়েই নিজের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা তার আছে; অন্য দিকে দাস থাকে অধীন অবস্থায়, আশায় ও ভয়ে, এবং সব সময়ই সচেতন থাকে যে তার প্রভু প্রয়োজন। যদিও প্রয়োজনটা দুজনেরই, তবু এটা সব সময় কাজ করে উৎপীড়কের পক্ষে ও উৎপীড়িতের বিপক্ষে। এজন্যেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিতে বিলম্ব ঘটেছে।

পুরুষের দাসী না হ'লেও নারী সব সময়ই আশ্রিত থেকেছে পুরুষের; এ-দুটি লিঙ্গ কখনো পৃথিবীকে সমভাবে ভোগ করে নি। নারী আজো ভীষণভাবে প্রতিবন্ধকতাগ্রস্ত, যদিও বদলাতে শুরু করেছে তার পরিস্থিতি। কোনোখানেই তার আইনগত মর্যাদা পুরুষের সমান নয়, এবং অধিকাংশ সময়ই এটা তার জন্যে অসুবিধাজনক। যদিও কখনো তার অধিকার আইনগতভাবে স্বীকার ক'রে নেয়াও হয়, তবু দীর্ঘকালের প্রথার ফলে তার বাস্তবায়ন ঘটে না। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ দুটি জাতের মতো; অন্য সব কিছু সমান থাকলেও পুরুষ পায় ভালো চাকুরি, বেশি বেতন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে তাদের সাফল্যের সুযোগও বেশি। শিল্পকারখানা ও রাজনীতিতে পুরুষ পায় অনেক বেশি পদ, তারাই দখল ক'রে নেয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো। এ ছাড়াও তারা উপভোগ করে প্রথাগত মর্যাদা, কেননা বর্তমান পবিত্রভাবে রক্ষা করে অতীতকে– এবং অতীতে পুরুষেরাই সৃষ্টি করেছে সব ইতিহাস। এখন নারীরা পৃথিবীর কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে শুরু করেছে, তবে পৃথিবী এখনো পুরুষের অধিকারে– এ-সম্পর্কে পুরুষ সন্দেহহীন এবং নারীদেরও সন্দেহ সামান্য। অপর হওয়া প্রত্যাখ্যান করা, এ-লেনদেনে অংশীদার হ'তে অস্বীকার করা– নারীর জন্যে এটা হবে উচ্চবর্ণের সাথে মৈত্রী তাদের যে-সব সুবিধা দিয়েছে, সে-সব পরিত্যাগ করা। সার্বভৌম পুরুষ অধীন নারীকে দেয় আর্থিক নিরাপত্তা এবং প্রতিপাদন করে তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা। এটা সত্য যে প্রতিটি ব্যক্তি যেমন প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, তেমনি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে বস্তু হয়ে ওঠার প্রলোভনও কাজ করে তার মধ্যে। এটা এক অশুভ পথ, কেননা এ-পথ যে ধরে– অক্রিয়, বিলুপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত সে– সে এর পর হয়ে ওঠে অন্যের ইচ্ছের প্রাণী। তবে এটা সহজ পথ; এ-পথ ধরলে খাঁটি অস্তিত্ব লাভের যন্ত্রণাগুলো থাকে না। নিজের সুস্পষ্ট শক্তির অভাবেই নারী কর্তার ভূমিকা লাভের দাবি জানাতে ব্যর্থ হয়, কেননা পুরুষের সাথে বন্ধনটাকেই সে চায়, পারস্পরিকতা চায় না, এবং অপর হিশেবে নিজের ভূমিকা নিয়ে সে অধিকাংশ সময়ই থাকে তুষ্ট।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : এসব শুরু হয়েছিলো কীভাবে? সহজেই চোখে পড়ে যে লিঙ্গের দ্বৈততা, যে-কোনো দ্বৈততার মতোই, সৃষ্টি করে বিরোধ। এবং এতে যে জয়ী হয়, সে-ই ধারণ করে চরম মর্যাদা। কিন্তু পুরুষ কেনো প্রথম থেকেই জয়ী? এটা সম্ভবপর মনে হয় যে নারী হয়তো জয়ী হ'তে পারতো; বা ওই বিরোধের পরিণতি হ'তে পারতো ফলাফলহীন। এটা কীভাবে হলো যে পৃথিবী সব সময়ই থেকেছে পুরুষের অধিকারে এবং পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে এই সম্প্রতি? এ-পরিবর্তন কি ভালো জিনিশ? এর ফলে কি পুরুষ ও নারী পৃথিবীকে পাবে সমানভাবে?

প্রশ্নগুলো নতুন নয়, এবং এগুলোর উত্তর মাঝেমাঝেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু নারী যেহেতু অপর, তাই পুরুষেরা যে-সব উত্তর দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। এসব উত্তর দেয়া হয়েছে সুস্পষ্টভাবে পুরুষের স্বার্থ থেকে। সতেরো শতকের একজন স্বল্পপরিচিত নারীবাদী, পলাঁ দ্য লা বার, এটা প্রকাশ করেছেন এভাবে : 'পুরুষেরা নারী সম্পর্কে যা কিছু লিখেছে, তার সবই সন্দেহজনক, কেননা পুরুষ একই সঙ্গে বিচারক ও বিবাদী।' সবখানে, সব সময়, পুরুষেরা এটা বোধ ক'রে

সন্তোষ প্রদর্শন করেছে যে তারাই সৃষ্টির প্রভু। 'সমস্ত প্রশংসা বিধাতার... যিনি আমাকে নারী ক'রে সৃষ্টি করেন নি,' ইহুদিরা প্রাতকালীন প্রার্থনায় একথা বলে, যখন তাদের স্ত্রীরা প্রতিবাদহীন স্বরে বলে : 'সমস্ত প্রশংসা বিধাতার, যিনি আমাকে তাঁর অভিলাষ অনুসারে সৃষ্টি করেছেন।' যে-সব আশীর্বাদ লাভের জন্যে প্লাতো দেবতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে যে তাঁকে মুক্ত মানুষ হিশেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, দাস হিশেবে নয়; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, নারীরূপে নয়। তবে পুরুষের পক্ষে এ-সুবিধা পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করা সম্ভব হতো না যদি না তারা বিশ্বাস করতো যে এটা প্রতিষ্ঠিত পরম ও শাশ্বত ভিত্তির ওপর; তারা চেষ্টা করেছে তাদের প্রাধান্যকে অধিকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার। 'যাঁরা আইন প্রণয়ন ও সংকলন করেছেন, তাঁরা পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা সুবিধা দিয়েছেন নিজেদের লিঙ্গকে, এবং বিচারকেরা এ-আইনগুলোকে উন্নীত করেছেন নীতির স্তরে.' এটা পলাঁ দ্য লা বার থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি।

বিধানকর্তারা, পুরোহিতেরা, দার্শনিকেরা, লেখকেরা, এবং বিজ্ঞানীরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে নারীর অধীন অবস্থান স্থির হয়েছে স্বর্গে এবং মর্ত্যে এটা সুবিধাজনক। পুরুষের উদ্ভাবিত ধর্মগুলোতে প্রতিফলিত হয় আধিপত্যের এ-বাসনা। হাওয়া ও প্যান্ডোরার উপকথায় পুরুষ নারীর বিরুদ্ধে নেমেছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তারা ব্যবহার করেছে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে, যা দেখা যায় আরিস্ততল ও সেইন্ট টমাস থেকে উদ্ধৃতিতে। প্রাচীন কাল থেকেই ব্যঙ্গকারেরা ও নীতিবাগীশেরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ ক'রে এসেছে নারীর দুর্বলতা দেখিয়ে দেখিয়ে। ফরাশি সাহিত্য ভ'রে নারীর বিরুদ্ধে যে-বর্বর অভিযোগ করা হয়েছে, তার সাথে আমরা পরিচিত। এ-বৈরিতা কখনো কখনো হয়তো সত্য, এবং অধিকাংশ সময়ই ভিত্তিহীন; তবে এগুলো কমবেশি সফলভাবে গোপন ক'রে রাখার চেষ্টা করে নিজেকে ঠিক ব'লে প্রতিপন্ন করার বাসনা। যেমন মঁতেইন বলেছেন, 'অপর লিঙ্গটিকে ক্ষমা করার থেকে একটির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা সহজ।' অনেক সময় কী ঘটছে, তা বেশ স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, রোমান আইন নারীর অধিকার খর্ব করতে গিয়ে বলেছে 'নারীর মূঢ়তা, স্থিতিহীনতার' কথা; এ-সময় দুর্বল হয়ে পড়ছিলো পারিবারিক বন্ধন, আর এতে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো পুরুষ উত্তরাধিকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার। নারীকে অভিভাবকের অধীনে রাখার জন্যে ষোড়শ শতকে আবেদন করা হয়েছিলো সেইন্ট অগাস্টিনের কর্তৃত্বের প্রতি, যিনি ঘোষণা করেছিলেন 'নারী এমন জীব, যে সিদ্ধান্তগ্রহণসক্ষম নয় স্থিরও নয়'; এটা ঘটেছিলো এমন সময়ে যখন মনে করা হয়েছিলো যে একলা নারী নিজের সম্পত্তি দেখাশোনা করতে সমর্থ। নারীর নির্ধারিত ভাগ্য কতোটা খামখেয়ালিপূর্ণ ও অন্যায্য, তা স্পষ্ট বুঝেছিলেন মঁতেইন : 'নারী যখন তার জন্যে প্রণীত বিধিবিধান মানতে অস্বীকার করে, তখন সে একটুও ভুল করে না, কেননা নারীর সাথে আলোচনা না ক'রেই পুরুষেরাই প্রণয়ন করে এসব বিধিবিধান। ষড়যন্ত্র আর কলহের যে এতো ছড়াছড়ি, এটা কোনো বিস্ময় নয়।' কিন্তু তিনি নারীর পক্ষে যোদ্ধা হয়ে ওঠেন নি।

বেশ পরে, আঠারো শতকে, সত্যিকারভাবে গণতান্ত্রিক পুরুষেরা ব্যাপারটিকে বস্তুগতভাবে দেখতে শুরু করেন। আরো অনেকের মতো দিদেরো দেখাতে চেয়েছেন

যে পুরুষের মতো নারীও মানুষ। পরে জন স্টুয়ার্ট মিল ঐকান্তিকভাবে দাঁড়িয়েছেন নারীর পক্ষে। এ-দার্শনিকেরা দেখিয়েছেন অসাধারণ নিরপেক্ষতা। উনিশ শতকে নারীবাদী কলহ আবার হয়ে ওঠে দলভুক্তদের কলহ। শিল্পবিপ্লবের একটি পরিণতি ছিলো যে নারী প্রবেশ করে উৎপাদনমূলক শ্রমে, এবং এখানেই নারীবাদীদের দাবি তাত্ত্বিক এলাকা পেরিয়ে লাভ করে আর্থনীতিক ভিত্তি, আর তাদের বিরোধীরা হয়ে ওঠে আরো বেশি আক্রমণাত্মক। যদিও তখন ভূম্যধিকার বেশ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তবু বুর্জোয়ারা আঁকড়ে থাকে পুরোনো নৈতিকতা, যা পারিবারিক সংহতির মধ্যেই দেখতে পায় ব্যক্তিমালিকানার নিশ্চয়তা। নারীর মুক্তি এক সত্যিকার হুমকি হয়ে দেখা দেয় ব'লে নারীকে আবার আদেশ দেয়া হয় ঘরে ফেরার। এমনকি শ্রমজীবীদের মধ্যেও পুরুষেরা নারীর মুক্তি ঠেকাতে চেষ্টা করে, কেননা তারা নারীকে দেখতে শুরু করে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে– বিশেষ ক'রে এজন্যে যে নারীরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলো কম মজুরিতে কাজ করতে।

এরপর নারীর নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্যে নারীবাদবিরোধীরা আগের মতো শুধু ধর্ম, দর্শন, ও ধর্মতত্ত্বের নয়, তারা সাহায্য নিতে শুরু করে বিজ্ঞানের– জীববিদ্যা, নিরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির। নারীকে তারা সর্বোচ্চ যা দিতে সম্মত হয়, তা হচ্ছে 'ভিন্নতার মধ্যে সাম্য'। ওই লাভজনক সূত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ; এটা উত্তর আমেরিকার নিগ্রোদের জন্যে প্রণীত জিম ক্রো আইনের 'সমান, তবে পৃথক' সূত্রের মতোই। সবাই জানে এ-তথাকথিত সাম্যপরায়ণ বিচ্ছিন্নকরণের ফল হচ্ছে চরমতম বৈষম্য। যে-সাদৃশ্য এখানে দেখানো হলো, এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, কেননা যখনই কোনো জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, বা লিঙ্গকে নিকৃষ্ট অবস্থানে ঠেলে দেয়া হয়, তখন তার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা হয় একই পদ্ধতিতে। 'চিরন্তনী নারী' কথাটি 'কৃষ্ণ আত্মা' এবং 'ইহুদি চরিত্র' ধারণারই সমতুল্য। এটা সত্য যে ইহুদিদের সমস্যাটি অন্য দুটি থেকে ভিন্ন– ইহুদিবিরোধীদের কাছে ইহুদিরা নিকৃষ্ট নয়, তারা শত্রু, যাদের পৃথিবীতে টিকে থাকতে দেয়া যাবে না, নিশ্চিহ্নীকরণই তাদের জন্যে নির্ধারিত নিয়তি। কিন্তু নারী ও নিগ্রোর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে গভীর সাদৃশ্য। এরা উভয়ই আজকাল মুক্তি পাচ্ছে একই ধরনের অভিভাবকত্ব থেকে এবং আগের প্রভুশ্রেণীটি চাচ্ছে 'তাদের নিজের জায়গায় রাখতে'– অর্থাৎ তাদের জন্যে নির্ধারিত স্থানটিতে রাখতে। উভয় ক্ষেত্রেই আগের প্রভুরা মুখর হয়ে ওঠে কমবেশি আন্তরিক স্তুতিতে, তারা প্রশংসায় মুখর হয় 'ভালো নিগ্রো'র গুণাবলির, তার সুপ্ত, শিশুসুলভ, প্রফুল্ল আত্মার, অর্থাৎ অনুগত নিগ্রোর; অথবা সে-নারীর গুণাবলির, যার রয়েছে 'প্রকৃত নারীত্ব', অর্থাৎ লঘু, বালখিল্য, দায়িত্বহীন– অনুগত নারীর। উভয় ক্ষেত্রেই আধিপত্যশীল শ্রেণীটি নিজের যুক্তিকে দাঁড় করায় এমন সব ব্যাপারের ওপর, যেগুলো সৃষ্টি করেছে তারা নিজেরাই। জর্জ বার্নার্ড শ এর সারকথা বলেছেন এভাবে, 'মার্কিন শাদারা কালোদের ঠেলে নামিয়ে দেয় জুতোপালিশকারী বালকদের স্তরে, এবং এ থেকে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে কালোরা জুতো পালিশ করা ছাড়া আর কিছুর উপযুক্ত নয়।' এ-দুষ্টচক্রের দেখা পাওয়া যায় সদৃশ সমস্ত পরিস্থিতিতে; যখন কোনো ব্যক্তিকে (বা একদল ব্যক্তিকে) রাখা হয় নিকৃষ্ট পরিস্থিতিতে, তখন তাকে নিকৃষ্টই মনে হয়।

কিন্তু *হওয়া* ক্রিয়াটির তাৎপর্য ঠিকমতো বোঝা দরকার; প্রতারণার উদ্দেশ্যেই একে দেয়া হয় অনড় মূল্য, যদিও এটি নির্দেশ করে 'এক জিনিশ থেকে আরেক জিনিশ হওয়ার' গতিশীল হেগেলীয় অর্থ। হ্যাঁ, সব কিছু মিলিয়ে নারী আজ পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট; এর অর্থ হচ্ছে এ ছাড়া নারীর অন্য কিছু হওয়ার উপায় ছিলো না। প্রশ্ন হচ্ছে : এ-অবস্থা কি চলতে থাকবে?

অনেক পুরুষই আশা করে যে এটা চলবে; সবাই যুদ্ধে ক্ষান্ত হয় নি। রক্ষণশীল বুর্জোয়ারা নারীর মুক্তির মধ্যে আজো দেখতে পায় তাদের নৈতিকতা ও স্বার্থের প্রতি হুমকি। কিছু পুরুষ ভয় পায় নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে। সম্প্রতি এক ছাত্র *হেবদো-লাতিন*-এ লিখেছে : 'প্রতিটি ছাত্রী, যে চিকিৎসাবিদ্যা বা আইন পড়ে, হরণ করে আমাদের একটি ক'রে চাকুরি।' পৃথিবীতে নিজের অধিকার সম্পর্কে তার মনে কখনো কোনো প্রশ্ন জাগে নি। আর আর্থিক স্বার্থই সব নয়। উৎপীড়ন উৎপীড়নকারীদের যে-সব সুফল দেয়, তার একটি হচ্ছে তাদের মধ্যে অধমটিও নিজেকে গণ্য করে শ্রেষ্ঠতর ব'লে; এভাবে দক্ষিণের একটি 'গরিব শাদা'ও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে একথা ভেবে যে সে 'নোংরা কালা আদমি' নয়– আর ধনশালী শাদারা এ-গর্বটিকে সুচতুরভাবে লাগায় নানা কাজে।

একইভাবে, পুরুষের মধ্যে চরম অধমটিও নারীদের তুলনায় নিজেকে মনে করে একটি নরদেবতা। এম দ্য মঁতেরলঁর পক্ষে নারীদের সামনে নিজেকে নায়ক মনে করা ছিলো খুবই সহজ, পুরুষদের মধ্যে পুরুষ হিশেবে অভিনয় ক'রে সে তা মনে করতে পারে নি, যদিও বহু নারী ওই কাজ করেছে তার থেকে অনেক বেশি ভালোভাবে। ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে *ফিগারো লিত্তেরের*-এর একটি রচনায় ক্লদ মারিয়াক, যাঁর মহৎ মৌলিকত্বের সবাই অনুরাগী, নারী সম্বন্ধে লিখতে পেরেছিলেন : 'আমরা শুনতে থাকি বিনম্র উদাসীনতার স্বর[৮]. তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবীর মধ্যে, এটা ভালোভাবে জেনেই যে তাঁর বোধশক্তি কমবেশি উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করে এমন চিন্তাভাবনা, যা আসে আমাদের থেকেই।' এটা সুস্পষ্ট যে-বক্তাটির কথা বলা হয়েছে, তিনি মারিয়াকের নিজের চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত করেন না, কেননা তাঁর যে নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে এটা কারো জানা নেই। এমন হ'তে পারে যে ওই নারীটি পুরুষের মধ্যে উৎসারিত চিন্তাভাবনাই প্রতিফলিত করেন, তবে পুরুষের মধ্যেও এমন অনেক আছে যারা অন্যদের চিন্তাভাবনা আত্মসাৎ করেছে; প্রশ্ন করতে পারি যে ক্লদ মারিয়াকের পক্ষে কি পাওয়া সম্ভব ছিলো না এরচেয়ে আকর্ষণীয় কথোপকথন, যা তাঁকে প্রতিফলিত না ক'রে প্রতিফলিত করে দেকার্ত, মার্ক্স, বা জিদকে। যা সত্যিই অসামান্য এখানে, তা হচ্ছে যে *আমরা* ব্যবহার ক'রে তিনি নিজেকে ক'রে তুলেছেন সেইন্ট পল, হেগেল, লেনিন, ও নিটশের সমতুল্য, এবং তাঁদের মহিমার উচ্চতা থেকে অবজ্ঞার সাথে তিনি তাকান সে-নারীর ঝাঁকের দিকে, যাঁরা একই সমতলে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথোপকথনের সাহস করেন। আমি একাধিক নারীকে জানি, যাঁরা অস্বীকার করতেন মারিয়াকের 'বিনম্র উদাসীনতার স্বর'-এর পীড়ন সহ্য করতে।

এ-উদাহরণটি নিয়ে আমি একটু বেশি সময় কাটিয়েছি, কেননা পুরুষালি প্রবণতা এটিতে দেখানো হয়েছে প্রতিপক্ষকে শক্তিহীন ক'রে তোলার মতো অকপটভাবে।

কিন্তু পুরুষ আরো অনেক সূক্ষ্ম উপায়ে লাভবান হয় নারীর অপরত্ব থেকে। যারা ভুগছে হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষায়, এখানে তাদের জন্যে রয়েছে এক অলৌকিক মলম, আর একথা সত্য যারা নিজেদের পৌরুষ নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাদের থেকে আর কেউ নারীর প্রতি বেশি আক্রমণাত্মক, বা বিদ্বেষপরায়ণ নয়। আজকাল অধিকাংশ পুরুষ আর নারীকে নিকৃষ্ট ব'লে গণ্য করে না; তাদের মধ্যে এখন গণতন্ত্রের আদর্শ কাজ করে, তাই সব মানুষকে সমান মনে না ক'রে কোনো উপায় নেই।

পরিবারের মধ্যে থেকে শিশু ও যুবকের চোখে নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের একই সামাজিক মর্যাদা আছে ব'লে মনে হয়। পরে কামনা ও প্রেমময় ওই যুবক উপলব্ধি করে তার কাম্য ও প্রেমাস্পদ নারীটির প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা; বিয়ের মধ্যে নারীকে সে শ্রদ্ধা করে স্ত্রী ও মা হিশেবে, এবং দাম্পত্য জীবনের বাস্তব ঘটনাবলিতে নারীটি পুরুষটির কাছে দেখা দেয় এক স্বাধীন মানুষরূপে। তাই পুরুষটি মনে করতে পারে লিঙ্গ দুটির মধ্যে আর কোনো অধীনতা নেই এবং সব মিলিয়ে পার্থক্য সত্ত্বেও নারী তার সমান। তবে সে গুটিকয় নিকৃষ্টতা লক্ষ্য করে– তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে কোনো পেশার জন্যে নারীর অযোগ্যতা; সে মনে করে এর মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক কারণ। যখন সে নারীর সঙ্গে থাকে সহযোগিতামূলক ও সদাশয় সম্পর্কে, তখন তার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিমূর্ত সাম্যের নীতি, এবং যে-সব অসাম্য রয়েছে, সেগুলোর ওপর ভিত্তি ক'রে সে তার মনোভঙ্গি গঠন করে না। কিন্তু যখন সে বিরোধে লিপ্ত হয় নারীর সাথে, তখন পরিস্থিতি উল্টে যায় : তখন তার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে বিরাজমান অসাম্য, এবং এমনকি এর মধ্যেই সে পায় বিমূর্ত সাম্যকে অস্বীকার করার যৌক্তিকতা।

অনেক পুরুষ যেনো সরল বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ক'রে থাকে যে নারী পুরুষের সমান এবং তাদের শোরগোল করার কিছু নেই, এবং একই সময়ে তারা বলে নারীরা কখনোই পুরুষের সমান হয়ে উঠতে পারবে না; তাদের দাবি নিষ্ফল। পুরুষের পক্ষে সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণের গুরুত্ব বোঝা বেশ কঠিন, কেননা এটাকে নগণ্য মনে হয় বাহ্যিকভাবে, কিন্তু এটা নারীর মধ্যে সৃষ্টি করে এমন গভীর নৈতিক ও মননগত প্রভাব যে মনে হয় ওগুলো উদ্ভূত হয়েছে তার মৌল স্বভাব থেকে। সবচেয়ে সহানুভূতিশীল পুরুষেরাও নারীর বাস্তব পরিস্থিতি পুরোপুরি বুঝতে পারে না। আর যে-পুরুষেরা নিজেদের সুবিধাগুলো রক্ষা করার জন্যে ব্যগ্র, তাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই; তারা ওগুলোর পরিমাণ নিজেরাও পরিমাপ করতে পারে না। নারীর ওপর যতো আক্রমণ চালানো হয়, সেগুলোর সংখ্যা ও ভয়াবহতা দেখে ভয় পেলে চলবে না, আর 'খাঁটি নারী'র বন্দনার ফাঁদে পড়লেও আমাদের চলবে না।

নারীবাদীদের যুক্তিগুলোও কম সন্দেহের চোখে বিচার করলে চলবে না, কেননা অনেক সময়ই তাঁদের বিতর্কিত লক্ষ্য তাঁদের বঞ্চিত করে প্রকৃত মূল্য থেকে। 'নারী সমস্যা'টিকে যদি তুচ্ছ ব'লে মনে হয়, তার কারণ হচ্ছে পুরুষালি উগ্রতা একে পরিণত করেছে একটি 'ঝগড়া'য়; এবং ঝগড়ারত মানুষ কখনো ঠিকমতো যুক্তি প্রয়োগ করে না। অনেকে বলে আদমের পর সৃষ্টি হয়েই নারী পরিণত হয়েছে একটি গৌণ সত্তায়; অন্যরা বলে এর উল্টো যে আদম ছিলো একটি অসমাপ্ত খসড়া এবং

বিধাতা যখন হাওয়াকে সৃষ্টি করেন তখনই তিনি সফল হন বিশুদ্ধভাবে মানুষ সৃষ্টিতে। নারীর মস্তিষ্ক ক্ষুদ্রতর; হ্যাঁ, কিন্তু সেটি তুলনামূলকভাবে বৃহৎ। খ্রিস্টকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হয়েছিলো; হ্যাঁ, তা হয়তো তাঁর মহত্তর বিনয়ের জন্যে। প্রতিটি যুক্তিই সাথেসাথে নির্দেশ করে তার বিপরীতকে, এবং দুটিই অধিকাংশ সময় বিভ্রান্তিকর। ব্যাপারটি বুঝতে চাইলে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এসব বাঁধাপথ থেকে; বাদ দিতে হবে উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, সাম্য প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণা, যেগুলো দূষিত করেছে এ-বিষয়ের প্রতিটি আলোচনাকে। আমাদের শুরু করতে হবে নতুনভাবে।

বেশ, কিন্তু কীভাবে আমরা উপস্থাপন করবো প্রশ্নটি? আর আমরা এটি উপস্থাপনের কে? পুরুষ একই সাথে বিচারক ও বিবাদী; আর নারীও তাই। আমাদের দরকার একটি দেবদূত– পুরুষও নয় নারীও নয়– কিন্তু কোথায় পাবো দেবদূত? তারপর, এ-বিষয়ে দেবদূতের কথা বলার যোগ্যতা খুবই কম, কেননা দেবদূত এ-সমস্যার মৌলিক সত্যগুলো সম্বন্ধে অজ্ঞ। উভলিঙ্গকে দিয়েও কোনো কাজ হবে না, কেননা এ-ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হবে খুবই উৎকট; উভলিঙ্গ কোনো সম্পূর্ণ পুরুষ ও সম্পূর্ণ নারীর মিলিত রূপ নয়, বরং সে গঠিত প্রত্যেকের অংশবিশেষে; তাই সে নারীও নয় পুরুষও নয়। আমার মনে হয় কিছু নারী আছেন, যাঁরা নারীর পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্যে সবচেয়ে যোগ্য। আমরা যেনো এ-কূটতর্ক দিয়ে বিভ্রান্ত না হই যে এপিমেনিদেস যেহেতু ছিলেন ক্রিটের অধিবাসী, তাই তিনি অবশ্যই ছিলেন মিথ্যেবাদী; কোনো রহস্যময় কারণ পুরুষ ও নারীকে সরল বিশ্বাসে বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে কাজ করতে বাধ্য করে না, তাদের পরিস্থিতিই তাদের সত্যসন্ধানে উদ্যোগী করে। আজকালকার নারীদের অনেকেই নিরপেক্ষ হ'তে সমর্থ। আমরা আমাদের আদর্শান্ধ অগ্রজাদের মতো নই; খেলায় আমরা অনেকটা জিতেই গেছি। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক বিতর্কগুলোতে অবিচলভাবে মেনে নেয়া হয়েছে যে লিঙ্গের সাম্য এখন হয়ে উঠছে এক বাস্তবতা, এবং আমরা অনেকেই আমাদের নারীত্বের মধ্যে কোনো অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা বোধ করি নি। বিশেষ কিছু সমস্যা আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে কিছু সমস্যাকে মনে হয় বেশি জরুরি; এবং এই নিরাসক্তির জন্যে আশা করতে পারি যে আমাদের মনোভাব হবে বস্তুনিষ্ঠ। পুরুষদের থেকে নারীর বিশ্বকে আমরা জানি অনেক বেশি অন্তরঙ্গভাবে, কেননা আমাদের শেকড় রয়েছে এর ভেতরেই, একটি মানুষের কাছে নারী হওয়ার অর্থ কী, তা আমরা জানি পুরুষের থেকে অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে; এবং আমাদের কাছে এ-জ্ঞানই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলেছি আছে কিছু অধিকতর জরুরি সমস্যা, কিন্তু নারী হওয়া জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে, সে-সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে এটা আমাদের বিরত করে না। আমাদের দেয়া হয়েছে কী কী সুবিধা এবং কী কী দেয়া হয় নি? আমাদের অনুজাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে কী ভাগ্য, কোন দিকে তারা এগোবে? এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে আমাদের সময়ে নারীদের সম্পর্কে নারীদের লেখা বইগুলোতে সাধারণত অধিকারের দাবি বেশি জানানো হয় না, বরং চেষ্টা করা হয় বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝাতে। আমরা যখন অতিরিক্ত বিতর্কের যুগ পেরিয়ে আসছি, তখন আরো অনেক কিছুর সাথে এ-মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণেরও একটি উদ্যোগরূপে

উপস্থাপিত করা হচ্ছে এ-বইটি।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কোনো মানবিক সমস্যা পক্ষপাতহীন মনে আলোচনা করা অসম্ভব। যেভাবে উপস্থাপন করা হয় প্রশ্নগুলো, নেয়া হয় যে-দৃষ্টিকোণ, তাতে থাকে স্বার্থের আপেক্ষিকতা; সব বৈশিষ্ট্যই নির্দেশ করে মূল্য, এবং তথাকথিত সব বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার পেছনেই থাকে বিশেষ নৈতিক পটভূমি। মূলসূত্রগুলো গোপন ক'রে রাখার চেষ্টা না ক'রে শুরুতেই সেগুলো খোলাখুলি ব'লে দেয়াই ভালো। এতে প্রতি পাতায় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না *উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ভালো, মন্দ, অগ্রগতি, প্রতিক্রিয়া,* এবং এমন আরো অনেক শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে কী অর্থে। নারী সম্পর্কিত কিছু বই জরিপ করলেই দেখতে পাই যে বারবার নেয়া হয় একটি দৃষ্টিকোণ, সেটি হচ্ছে জনগণের মঙ্গল, জনগণের স্বার্থ; আর তাতে সমাজের মঙ্গল বলতে সব সময়ই বোঝান তারা সমাজকে যেভাবে রাখতে বা গড়তে চায়, সে-ব্যাপারটি। আমরা বিশ্বাস করি যা নিশ্চিত করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত মঙ্গল, তাই শুধু জনগণের মঙ্গল; আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিচার করবো এ-অনুসারে যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ওগুলো কতোটা বাস্তব সুবিধা দিতে সমর্থ। ব্যক্তিগত স্বার্থের ধারণাকে আমরা ব্যক্তিগত সুখের ধারণার সাথে গুলিয়ে ফেলতে চাই না, যদিও এটি আরেক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। ভোটাধিকারী নারীর থেকে কি হারেমের নারীরা বেশি সুখী নয়? গৃহিণী কি বেশি সুখী নয় কর্মজীবী নারীর থেকে? তবে *সুখী* শব্দটি ঠিক কী বোঝায়, তা অস্পষ্ট; আর এর মুখোশের আড়ালে কতোটা আছে সত্যিকার মূল্য, তা আরো অস্পষ্ট। অন্যের সুখ পরিমাপের কোনো সম্ভাবনা নেই, এবং আমরা যে-পরিস্থিতিকে সুখী বলতে চাই, তাকে সুখী ব'লে বর্ণনা করা সব সময়ই সহজ।

বিশেষ ক'রে যাদের দণ্ডিত করা হয়েছে নিশ্চল নিরুদ্যমতায়, তাদের সাধারণত সুখী ব'লে ঘোষণা করা হয় এ-অজুহাতে যেনো নিশ্চল থাকার মধ্যেই আছে সুখ। আমরা প্রত্যাখ্যান করি এ-ধারণা, কেননা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অস্তিত্ববাদী নীতিবিদ্যার। প্রতিটি কর্তাই কাজ করে নিজের সীমা অতিক্রমের লক্ষ্যে; সে অন্যান্য মুক্তি অর্জনের ধারাবাহিক প্রয়াসের মধ্য দিয়েই শুধু অর্জন করে মুক্তি। বর্তমান অস্তিত্বের কোনো যৌক্তিকতা থাকে না, যদি না তা সম্প্রসারিত হ'তে পারে অনির্দিষ্ট মুক্ত ভবিষ্যতে। যতোবারই সীমাতিক্রমণ প্রবণতা পিছু হ'টে পরিণত হয় অন্তর্ভবতায়, নিশ্চলতায়, ততোবারই অস্তিত্ব অধঃপতিত হয় *'এঁ-সোয়ে'*– বিশেষ অবস্থায় জীবনের পাশবিক বশ্যতায়– এবং মুক্তি পর্যবসিত হয় সীমাবদ্ধতায় ও আকস্মিক ঘটনাচক্রে। কর্তা যদি এতে সম্মতি দেয়, তাহলে এ-অধঃপতন নির্দেশ করে তার নৈতিক ত্রুটি; এটা যদি চাপিয়ে দেয়া হয় তার ওপর, তাহলে দেখা দেয় হতাশা ও পীড়ন। উভয় ক্ষেত্রেই এটা এক চরম অশুভ। প্রতিটি মানুষ, যে প্রতিপন্ন করতে চায় তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা, অনুভব করে যে মুক্তভাবে কাজ করার জন্যে তার অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে নিজেকে অতিক্রম করার এক অসংজ্ঞায়িত প্রয়োজন।

এখন, যা উৎকটভাবে লক্ষণীয় করে নারীর পরিস্থিতি, সেটি হচ্ছে যে নারী– অন্যান্য মানুষের মতো এক স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সত্তা– দেখতে পায় সে বাস করছে এমন এক বিশ্বে, যেখানে পুরুষ তাকে বাধ্য করে অপর-এর অবস্থানে থাকতে।

তারা তাকে একটি বস্তু হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, পর্যবসিত করতে চায় আকস্মিক ঘটনাচক্রে, কেননা তার অস্তিত্বের সীমাতিক্রমণতা ছায়াবৃত ও চিরকালের জন্যে সীমাতিক্রান্ত হয় আরেকটি অহং *(নীতিচেতনা)* দিয়ে, যেটি অপরিহার্য ও সার্বভৌম। নারীর নাটক ঘটে প্রতিটি কর্তার (অহং) মৌল আকাঙ্খার– যে সব সময় আত্মকে গণ্য করে অপরিহার্য ব'লে– এবং সে-পরিস্থিতির চাপের বিরোধের মধ্যে, যেখানে নারী হচ্ছে অপ্রয়োজনীয়। নারীর পরিস্থিতির মধ্যে কোনো মানুষ কীভাবে লাভ করতে পারে সিদ্ধি? তার সামনে খোলা আছে কোন কোন রাস্তা? কোনগুলো বন্ধ? পরাশ্রিত অবস্থার মধ্যে কী ক'রে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব স্বাধীনতা? কী পরিস্থিতি সীমিত করে নারীর স্বাধীনতা এবং সেগুলো পেরোনো যায় কীভাবে? এগুলোই হচ্ছে সে-সব মৌল প্রশ্ন, যেগুলোর ওপর আমি কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করবো। এর অর্থ হচ্ছে আমি ব্যক্তির ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী সুখের শর্তে নয়, বরং মুক্তির শর্তে।

যদি আমরা বিশ্বাস করতাম নারীর নিয়তি অবধারিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, বা আর্থনীতিক শক্তি দিয়ে, তাহলে স্পষ্টত এ-সমস্যা হতো তাৎপর্যহীন। এখন থেকে সবার আগে আমি আলোচনা করবো যে-আলোকে নারীকে দেখা হয় জীববিদ্যায়, মনোবিজ্ঞানে, ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে। তারপর আমি দেখাতে চেষ্টা করবো ঠিক কীভাবে আকার দেয়া হয়েছে 'খাঁটি নারী' ধারণাটিকে– কেনো নারীকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে অপর-রূপে, এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর ফল কী হয়েছে। তারপর আমি বিশ্বকে বর্ণনা করবো নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে, যে-বিশ্বে অবশ্যই বাস করতে হবে নারীকে; এবং এভাবে আমরা মনে মনে ছবি আঁকতে সমর্থ হবো তাদের পথের বিপদগুলোর, যার মুখোমুখি হ'তে হবে তাদের এ-যাবৎ তাদের জন্যে নির্ধারিত এলাকা থেকে মুক্তির প্রয়াস চালাতে গিয়ে, যখন তারা পোষণ করে মানবজাতির পূর্ণ সদস্য হওয়ার আকাঙ্খা।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

আজকের নারীরা ন্যায়সঙ্গতভাবে বর্জন করতে পারে নারীত্বের কিংবদন্তিটি; সুনির্দিষ্ট উপায়ে দৃঢ়ভাবে তারা ঘোষণা করতে শুরু করছে তাদের স্বাধীনতা; কিন্তু পরিপূর্ণরূপে মানুষের জীবন যাপনে তারা সহজে সমর্থ হচ্ছে না। পুরুষদের জগতে নারীদের দ্বারা লালিত হয়ে তাদের স্বাভাবিক নিয়তি হচ্ছে বিয়ে, যা বাস্তবে আজো বোঝায় পুরুষের অধীনতা; তার কারণ পুরুষের মর্যাদা আদৌ লুপ্ত হচ্ছে না, তা আজো দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ় আর্থনীতিক ও সামাজিক ভিত্তির ওপর। তাই আমাদের নারীর প্রথাগত নিয়তি ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করতে হবে বিশেষ যত্নের সাথে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো নারী কীভাবে যায় তার শিক্ষানবিশির ভেতর দিয়ে, কীভাবে সে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার অবস্থানের, কী ধরনের বিশ্বে সে আটকে আছে, কী তার মুক্তির উপায়। তাহলেই শুধু আমরা বুঝতে পারবো নারীর সমস্যাগুলো, যারা দুর্বহ অতীতের উত্তরাধিকারী, যারা চেষ্টা করছে এক নতুন ভবিষ্যৎ তৈরির। যখন আমি ব্যবহার করি *নারী* বা *নারীত্ব* শব্দগুলো, তখন আমি অবশ্যই কোনো অপরিবর্তনীয় আদিরূপের প্রতি ইঙ্গিত করি না; আমার বহু মন্তব্যের শেষে পাঠকদের বুঝে নিতে হবে 'শিক্ষা ও রীতিনীতির বর্তমান অবস্থায়' পদটি। শাশ্বত সত্য ঘোষণা এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং আমরা বর্ণনা করতে চাই সে-সাধারণ ভিত্তি, যা আছে প্রতিটি নারী অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে।

প্রথম খণ্ড

তথ্য ও কিংবদন্তি

ভাগ ১

নিয়তি

পরিচ্ছেদ ১

জীববিজ্ঞানের উপাত্ত

নারী? খুবই সরল, বলেন সরল সূত্রের অনুরাগীরা : সে একটি জরায়ু, ডিম্বাশয়; সে একটি মেয়েলোক– এ-শব্দই তার সংজ্ঞার জন্যে যথেষ্ট। পুরুষের মুখে *স্ত্রীলিঙ্গ* কথাটি অবমাননাকর শোনায়, তবু পুরুষ তার পাশবিক স্বভাব সম্পর্কে লজ্জিত হয় না; বরং কেউ যদি তার সম্পর্কে বলে : 'সে পুরুষ!', তখন সে গর্ব বোধ করে। 'স্ত্রীলিঙ্গ' শব্দটি অমর্যাদাকর, এ-কারণে নয় যে এটি জোর দেয় নারীর পাশবিকতার ওপর, বরং এজন্যে যে এটি তাকে বন্দী ক'রে রাখে তার লিঙ্গের মধ্যে; আর এমনকি নিরীহ বোবা পশুর মধ্যেও লিঙ্গ ব্যাপারটি যে পুরুষের কাছে ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর মনে হয়, তার মূলে আছে নারী, যে পুরুষের মনে জাগিয়ে রাখে এক অস্বস্তিকর বৈরিতা। সে জীববিদ্যার মধ্যে খুঁজে পেতে চায় তার ভাবাবেগের যৌক্তিকতা। *স্ত্রীলিঙ্গ* শব্দটি মনে জাগিয়ে তোলে একরাশ ভীতিকর চিত্রকল্প– একটি বিশাল, গোল ডিম্বাণু প্লাবিত ও নপুংসক করছে একটি ক্ষিপ্র শুক্রাণুকে; দানবিক ও স্ফীত রানী পতঙ্গ শাসন করছে পুরুষ দাসদের; আরাধনাকারী নারী ম্যান্টিস ও মাকড়সা, প্রেমে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর, ভেঙে চুরমার ক'রে খেয়ে ফেলছে তাদের সঙ্গীদের; কামোন্মত্ত কুকুরী তার পেছনে দূষিত গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে ছুটে চলছে গলিপথ দিয়ে; বানরী অশ্লীলভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে পাছা এবং তারপর পালিয়ে যাচ্ছে ছেনালিপনার সাথে; এবং অত্যুৎকৃষ্ট বন্যপ্রাণী – বাঘিনী, সিংহিনী, চিতাবাঘিনী– ক্রীতদাসীর মতো ধরা দিচ্ছে তাদের পুরুষদের রাজকীয় আলিঙ্গনের তলে। পুরুষ নারীর ওপর চাপিয়ে দেয় নিষ্ক্রিয়, আগ্রহী, চতুর, নির্বোধ, উদাসীন, কামুক, হিংস্র, নিচ প্রভৃতি বিশেষণ। এবং সত্য ঘটনা হচ্ছে সে স্ত্রীলিঙ্গ। তবে আমরা যদি মামুলি কথা অনুসারে চিন্তা করা বাদ দিই, তখন অবিলম্বে উত্থাপিত হয় দুটি প্রশ্ন : প্রাণীজগতে স্ত্রীলিঙ্গ কী বোঝায়? আর নারীর মধ্যে প্রকাশ পায় কোন বিশেষ ধরনের স্ত্রীলিঙ্গ?

পুরুষ ও নারী দু-ধরনের সত্তা, বিশেষ প্রজাতির মধ্যে যাদের পৃথক করা হয় তাদের প্রজনন ভূমিকা অনুসারে; তাদের সংজ্ঞায়িত করা যায় শুধু পরস্পরসম্পর্কিত ভাবেই। তবে প্রথমেই এটা মনে রাখতে হবে যে বিশেষ প্রজাতিকে দুটি লিঙ্গে বিভক্ত করার ব্যাপারটি সব সময় সুনির্দিষ্ট নয়।

প্রকৃতিতে এটা সর্বজনীনভাবে প্রকাশিত নয়। প্রাণীদের কথা যদি বলি, এটা সুবিদিত যে এককোষী আণুবিক্ষণিক রূপসমূহে– ইনফিউসোরিয়া, অ্যামিবা, স্পোরোজোয়ান, এবং এ-জাতীয়তে– সংখ্যাবৃদ্ধি যৌনতা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। প্রতিটি কোষ বিশ্লিষ্ট ও উপবিশ্লিষ্ট হয় নিজে নিজেই। বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যেও যৌনতা ছাড়াই বংশবৃদ্ধি ঘটতে পারে, কখনো এটা ঘটতে পারে বিশ্লিষ্টীকরণ প্রণালিতে, অর্থাৎ একটি দুই বা বহু টুকরো হয়ে, যেগুলো পরে হয়ে ওঠে একেকটি নতুন প্রাণী, এবং কখনো ঘটতে পারে পৃথকীকরণ প্রণালিতে, অর্থাৎ কুঁড়ি পৃথক হয়ে গ'ড়ে তোলে নতুন প্রাণী। মিষ্টি পানির হাইড্রা, স্পঞ্জ, পোকা, টিউনিকেইট প্রভৃতিতে কুঁড়ি পৃথকীকরণ বেশ পরিচিত উদাহরণ। অসঙ্গম বংশবিস্তারে কুমারী স্ত্রীটির ডিম পুরুষের দ্বারা নিষিক্ত না হয়েই বিকশিত হয় ভ্রূণরূপে; তাই নাও থাকতে পারে পুরুষের ভূমিকা। মৌমাছিতে সঙ্গম ঘটে, কিন্তু ডিম পাড়ার সময় সেগুলো নিষিক্ত হ'তেও পারে, নাও হ'তে পারে। অনিষিক্ত ডিমগুলোর বিকাশের ফলে জন্মে পুরুষ মৌমাছি এবং জাবপোকার বেলা পুরুষ অনুপস্থিত থাকে প্রজন্মপরম্পরায়, এবং অনিষিক্ত ডিমগুলো থেকে জন্মে স্ত্রীলিঙ্গ জাবপোকা। অসঙ্গম বংশবিস্তারের প্রক্রিয়াটি কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সমুদ্রশল্য, তারামাছ, ব্যাং, এবং অন্যান্য প্রজাতির ওপর। এককোষী প্রাণীদের (প্রোটোজোয়া) মধ্যে অবশ্য দুটি কোষ মিলে গঠন করতে পারে জাইগোট বা ভ্রূণাণু, আর মৌমাছিতে নিষিক্তকরণ দরকার হয় যদি ডিমগুলো জন্ম দিতে চায় স্ত্রী মৌমাছি। জাবপোকার ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই আবির্ভূত হয় শরৎকালে এবং এ-সময়ে উৎপাদিত ডিম খাপ খাইয়ে নেয় শীতের সাথে।

অতীতে কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী এসব ঘটনা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে এমনকি যে-সব প্রজাতি সঙ্গমহীন বংশবিস্তারে সমর্থ, সেগুলোর ক্ষেত্রেও প্রজাতির বলিষ্ঠতা নবায়নের জন্যে মাঝেমাঝে দরকার পড়ে নিষিক্তীকরণ– দুটি সত্তার বংশানুক্রমিক উপাদান মিশিয়ে নবযৌবন অর্জন। এ-প্রকল্প অনুসারে জীবনের সবচেয়ে জটিল রূপগুলোতে যৌনতাকে মনে হয় এক অপরিহার্য ব্যাপার; শুধু নিম্ন প্রাণীসত্তাগুলোই পারে যৌনতা ছাড়া বংশবিস্তার করতে; এবং এখানেও একটা বিশেষ সময়ের পর নিঃশেষিত হয়ে পড়ে প্রাণশক্তি। তবে এখন মোটামুটিভাবে এ-প্রকল্প পরিত্যাগ করা হয়েছে; গবেষণার ফলে এটা প্রতিপন্ন হয়েছে যে উপযুক্ত অবস্থায় কোনো লক্ষণীয় অবক্ষয় ছাড়াই চলতে পারে সঙ্গমহীন বংশবিস্তার।

শুক্র ও ডিম, এ-দু-রকম জননকোষ উৎপাদন অবধারিতভাবে বোঝায় না যে থাকতেই হবে দুটি পৃথক লিঙ্গ; সত্য হচ্ছে যে ডিম ও শুক্র, দুটি অত্যন্ত পৃথক প্রজনন কোষ, উভয়ই উৎপাদিত হ'তে পারে একই ব্যক্তির দ্বারা। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বংশবিস্তারের দুটি রীতি সহাবস্থান করে প্রকৃতিতে, তারা উভয়ই বিশেষ বিশেষ প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ, এবং জননকোষকে দুটি ভাগে পৃথক করার ব্যাপারটি নিতান্তই আকস্মিক। তাই বিভিন্ন প্রজাতিকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ব'লে নির্দেশ করা পর্যবেক্ষণের ন্যূনতম সত্য মাত্র।

ব্যাখ্যা না ক'রেই অধিকাংশ দর্শনে এ-ব্যাপারটিকে গ্রহণ করা হয়েছে স্বতসিদ্ধ ব'লে। প্লাতোয়ী উপকথা অনুসারে শুরুতে ছিলো পুরুষ, নারী, ও উভলিঙ্গ। প্রতিটি

ব্যক্তির ছিলো দুটি মুখ, চারটি বাহু, চারটি পা, এবং দুটি সংযুক্ত শরীর। এক সময়ে তাদের বিশ্লিষ্ট করা হয় দু-ভাগে; এবং সেই থেকে এক ভাগ পুনরায় মিলিত হ'তে চায় আরেক ভাগের সাথে। পরে দেবতারা ঘোষণা করে যে বিসদৃশ দুই অর্ধাংশ যোগ ক'রে সৃষ্টি করা হবে নতুন মানুষ। তবে এ-গল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয়েছে প্রেম; শুরুতেই স্বীকার ক'রে নেয়া হয়েছে লিঙ্গবিভাজন। আরিস্ততলও ব্যাখ্যা করেন নি এ-বিভাজনকে; কেননা যদি বস্তু ও গঠনকে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হয় সব কাজে, তাহলে সক্রিয় ও অক্রিয় নীতিকে দুটি ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিতে পৃথক করার দরকার পড়ে না। তাই সেইন্ট টমাস নারীকে ঘোষণা করেন 'আকস্মিক' সত্তা ব'লে, পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বোঝায় যৌনতার আকস্মিক বা সংযত প্রকৃতি। তবে যুক্তির প্রতি হেগেলের সংরাগ অসত্য ব'লে গণ্য হতো যদি তিনি এর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যার উদ্যোগ না নিতেন। তাঁর মতে যৌনতা নির্দেশ করে সে-মাধ্যমটিকে, যা দিয়ে কর্তা অর্জন করে বিশেষ এক জাতিতে অন্তর্ভুক্তির বোধ। 'কর্তার জাতিবোধ সমতাবিধান করে তার ব্যক্তিগত বাস্তবতার অসম বোধের, আর নিজের প্রজাতির কারো সাথে মিলিত হয়ে সে তার মধ্যে বোধ করতে চায় নিজেকে, সম্পূর্ণ করতে চায় নিজেকে, এবং এভাবে সে নিজের প্রকৃতিতে একীভূত করতে চায় জাতিকে এবং তাকে করতে চায় অস্তিত্বশীল। এই হচ্ছে সঙ্গম' (*প্রকৃতির দর্শন*, খণ্ড ৩, উপপরিচ্ছেদ ৩৬৯)। হেগেল পরে বলেন যে মিলনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে প্রথমে থাকতে হবে লৈঙ্গিক ভিন্নতা। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমরা মনে করতে পারি যে বংশবিস্তারের প্রপঞ্চটি রয়েছে প্রাণীর সত্তার মধ্যেই। তবে আমাদের সেখানেই থামতে হবে। প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে লৈঙ্গিক ভিন্নতার দরকার পড়ে না। তবে একথা সত্য যে প্রাণীদের মধ্য এ-ভিন্নতা এতো ব্যাপক যে একে অস্তিত্বের যে-কোনো বাস্তবসম্মত সংজ্ঞার মধ্যেই গ্রহণ করতে হয়। একথা সত্য শরীর ছাড়া মন এবং অমর মানুষ অসম্ভব, কিন্তু অসঙ্গমী ও উভলৈঙ্গিক সমাজের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি।

দুটি লিঙ্গের ভূমিকা সম্পর্কে পুরুষ পোষণ ক'রে এসেছে বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস। প্রথম দিকে সেগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিলো না, সেগুলো প্রকাশ করতো শুধু সামাজিক কিংবদন্তি। দীর্ঘকাল ধ'রে ধারণা করা হতো, এবং আজো কোনো কোনো আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাস করা হয় যে গর্ভসঞ্চারে পুরুষের কোনো ভূমিকা নেই। পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মা সজীব জীবাণুরূপে মায়ের শরীরে ঢোকে ব'লে মনে করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর উদ্ভবের সাথে পুরুষ ব্যগ্রভাবে দাবি জানাতে থাকে বংশধরদের ওপর। জন্মদানে মায়ের একটি ভূমিকা স্বীকার ক'রে নেয়াও দরকার হয়, তবে এটুকু স্বীকার ক'রে নেয়া হয় যে সে শুধু ধারণ ও লালন করে একলা পিতার দ্বারা সৃষ্ট সজীব বীজটিকে। আরিস্ততল মনে করতেন ভ্রূণ উদ্ভূত হয় শুক্রাণু ও ঋতুস্রাবের রক্তের মিলনে, যাতে নারী সরবরাহ করে অক্রিয় বস্তু, আর পুরুষ দান করে শক্তি, সক্রিয়তা, গতি, জীবন। হিপ্পোক্রাতিস পোষণ করতেন একই রকম ধারণা; তাঁর মতে বীজ দু-ধরনের, দুর্বল বা নারীধর্মী, সবল বা পুরুষধর্মী। আরিস্ততলের তত্ত্ব মধ্যযুগ ধ'রে চলেছে এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত টিকে আছে।

সতেরো শতকের শেষের দিকে হারভে সঙ্গমের পরপরই হত্যা ক'রে দেখেন মাদি কুকুরদের এবং জরায়ুর শৃঙ্গে তিনি দেখতে পান ছোটো ছোটো থলে, যেগুলোকে তিনি ডিম ব'লে মনে করেন, তবে ওগুলো আসলে ছিলো ভ্রূণ। ডেনমার্কের শবব্যবচ্ছেদ-বিজ্ঞানী স্টেনো নারীর জননগ্রন্থির নাম দেন ডিম্বাশয়, যাকে আগে বলা হতো 'নারীর অণ্ডকোষ'; সেগুলোর ওপর দেখতে পান ছোটো ছোটো স্ফীতি। ১৬৭৭ অব্দে ফন গ্রাফ এগুলোকে ডিম ব'লে মনে করেছিলেন, এবং এখন এগুলোকে বলা হয় গ্রাফীয় ডিম্বথলি। ডিম্বাশয়কে তখনও মনে করা হতো পুরুষের গ্রন্থির সদৃশ ব'লে। তবে একই বছরে আবিষ্কৃত হয় 'শুক্রাণু অণুজীব' এবং এটা প্রমাণিত হয় যে এগুলো প্রবিষ্ট হয় নারীর জরায়ুতে; তবে মনে করা হয় সেখানে এগুলো নিতান্তই লালিত হয় এবং সেখানেই উদ্ভূত হয় নতুন সন্তাটি। ১৬৯৪-এ একজন ওলন্দাজ, হার্টসাকের, ছবি আঁকেন শুক্রাণুর মধ্যে গুপ্ত এক 'মনুষ্যপ্রাণীর', এবং ১৬৯৯-এ আরেক বিজ্ঞানী বলেন যে তিনি দেখতে পেয়েছেন শুক্রাণু লোম ঝরিয়ে চলছে, যার নিচে আবির্ভূত হয়েছে একটি মানুষ। তিনি তার ছবিও আঁকেন। এসব কল্পিত প্রকল্পে নারীর কাজ হচ্ছে এক সক্রিয় সজীব নীতিকে লালন করা। এসব ধারণা সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নি, তবে উনিশ শতকেও এগুলোর পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করা হতো। অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার ক'রে ১৮২৭ অব্দে ফন বায়েরের পক্ষে গ্রাফীয় ডিম্বথলির মধ্যে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম। অল্প কালের মধ্যেই সম্ভব হয় ডিমের বিদারণ পর্যবেক্ষণ করা– অর্থাৎ কোষ বিভাজনের মধ্য দিয়ে বিকাশের সূচনা-স্তরগুলো দেখা; এবং ১৮৩৫-এ আবিষ্কৃত হয় সারকোড, পরে যাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। এর মধ্য দিয়েই ধরা পড়তে থাকে কোষের আসল প্রকৃতি। ১৮৭৯ অব্দে পর্যবেক্ষণ করা হয় তারামাছের ডিমের ভেতরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ, এবং এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি জননকোষের কেন্দ্র, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সমতুল্যতা। নিষিক্ত ডিমের ভেতরে তাদের মিলনের প্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে উদ্ঘাটন করেন বেলজিয়ামের প্রাণীবিজ্ঞানী ভ্যান বেনেডেন।

তবে আরিস্ততলের ধারণাগুলো একেবারে বাতিল হয়ে যায় নি। হেগেল ধারণা পোষণ করতেন যে প্রয়োজনেই দুটি লিঙ্গ ভিন্ন, একটি সক্রিয় এবং অপরটি অক্রিয়, এবং অবশ্যই স্ত্রীলিঙ্গটিই অক্রিয়। 'তাই এ-পার্থক্যের পরিণতিরূপে পুরুষ হচ্ছে সক্রিয় নীতি আর নারী হচ্ছে অক্রিয় নীতি, কেননা সে তার সংহতির মধ্যে থাকে অবিকশিত' (হেগেল, *প্রকৃতির দর্শন*)। এমনকি ডিম্বাণু সক্রিয় নীতিরূপে গৃহীত হওয়ার পরও পুরুষেরা এর শান্ততার বিপরীতে শুক্রাণুর সজীব গতিশীলতাকে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেছে। আজকাল অনেক বিজ্ঞানী দেখিয়ে থাকেন এর বিপরীত প্রবণতা। অসঙ্গম বংশবিস্তার সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন শুক্রাণুর ভূমিকা নিতান্তই এক শারীর-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াসাধকের। এটা দেখানো হয়েছে যে অনেক প্রজাতিতে কোনো এসিডের উদ্দীপনায় বা একটা সূচের খোঁচায়ও ডিমের বিদারণ ঘটতে পারে এবং বিকাশ ঘটতে পারে ভ্রূণের। এটা ভিত্তি ক'রে প্রস্তাব করা হয়েছে যে শুক্রাণু গর্ভসঞ্চারের জন্যে জরুরি নয়, এটা বড়োজোর একটি ভ্রূণকে গজিয়ে তুলতে সাহায্য করে; সম্ভবত ভবিষ্যতে প্রজননে পুরুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

বিপুল সংখ্যক প্রজাতিতে পুরুষ ও নারী সহযোগিতা করে প্রজননে। তাদের পুরুষ ও নারী হিশেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় প্রধানত তাদের উৎপাদিত জননকোষ– যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম, অনুসারে। কিছু নিম্নপর্যায়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীতে যে-কোষগুলো মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে, সেগুলো অভিন্ন; এবং এ-সমজননকোষতার ঘটনাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তারা নির্দেশ করে জননকোষের মৌলিক সাম্য। সাধারণভাবে জননকোষগুলো পৃথক, তবে তাদের সাম্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য। দু-লিঙ্গেই একই ধরনের আদিকালীন জীবাণু কোষ থেকে বিকশিত হয় শুক্রাণু ও ডিম। আদিকালীন কোষ থেকে স্ত্রীলিঙ্গের ভেতরে বিকশিত অপুষ্ট ডিম্বকোষ ও পুরুষের ভেতরে উদ্ভূত অপুষ্ট শুক্রকোষ প্রধানত ভিন্ন হয় প্রোটোপ্লাজমে, কিন্তু সংঘটিত প্রপঞ্চগুলো একই ধরনের। ১৯০৩ অব্দে জীববিজ্ঞানী অ্যাঙ্গেল মত প্রকাশ করেন যে আদিকালীন জীবাণু কোষটি নিস্পৃহ, এবং যে-ধরনের জননগ্রন্থিতে এটি থাকে, অণ্ডকোষে বা ডিম্বাশয়ে, সে-অনুসারে এটি বিকশিত হয় শুক্রাণু বা ডিমরূপে। তবে এটা যাই হোক, প্রত্যেক লিঙ্গের আদিকালীন জীবাণু কোষেই থাকে একই সংখ্যক ক্রোমোসোম (যা ধারণ করে বিশেষ প্রজাতিটির বৈশিষ্ট্য), যা পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে একই প্রক্রিয়ায় হ্রাস পায় অর্ধেক সংখ্যায়। বিকাশের এ-প্রক্রিয়াগুলোর শেষে (পুরুষের ক্ষেত্রে একে বলা হয় শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া, আর নারীর ক্ষেত্রে বলা হয় ডিম্বাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া) জননকোষগুলো পূর্ণবিকশিত হয়ে রূপ নেয় শুক্রাণু ও ডিমের; কিছু ব্যাপারে তাদের মধ্যে থাকে বিপুল পার্থক্য, তবে সাদৃশ্য থাকে এতে যে এদের প্রত্যেকে ধারণ করে এক প্রস্থ সমমূল্যের ক্রোমোসোম।

আজকাল এটা ভালোভাবেই জানা যে সন্তানের লিঙ্গ নির্ণীত হয় গর্ভাধানের সময় ক্রোমোসমের সংগঠন দিয়েই। প্রজাতি অনুসারে এ-কাজটি সম্পন্ন ক'রে থাকে পুরুষ জননকোষ অথবা নারী জননকোষ। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এ-কাজটি করে শুক্রাণু, যাতে উৎপাদিত হয় সমসংখ্যক দু-ধরনের উপাদান, এক ধরনের উপাদানে থাকে একটি X ক্রোমোসোম (যা থাকে সব ডিমেই), আরেক ধরনের উপাদানে থাকে একটি Y ক্রোমোসোম (যা থাকে না ডিমে)। X ও Y ক্রোমোসোম ছাড়াও শুক্রাণু ও ডিমে থাকে সমানসংখ্যক এ-ধরনের উপাদান। যখন শুক্রাণু ও ডিম মিলিত হয়ে গর্ভসঞ্চার ঘটে, তখন নিষিক্ত ডিমটিতে থাকে পূর্ণ দুই প্রস্থ ক্রোমোসোম। যদি গর্ভসঞ্চার ঘটে কোনো X বাহী শুক্রাণু দিয়ে, তাহলে নিষিক্ত ডিমটিতে থাকে দুটি X ক্রোমোসোম, এবং এটি পরিণত হয় স্ত্রীলিঙ্গে (XX)। যদি Y বাহী শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হয় ডিমটি, তাহলে ডিমটিতে উপস্থিত থাকে মাত্র একটি X ক্রোমোসোম, এবং এটি হয় পুংলিঙ্গ (XY)। পাখি ও প্রজাপতির বেলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, যদিও রীতিটি থাকে একই; ডিমই ধারণ করে X বা Y, তাই ডিমই নির্ধারণ করে সন্তানের লিঙ্গ। মেন্ডেলের সূত্র দেখিয়েছে যে বংশানুক্রমে পিতা ও মাতার ভূমিকা সমান। ক্রোমোসোমগুলো ধারণ করে বংশানুক্রমের নিয়ন্ত্রকগুলো (জিন), এবং এগুলো সমপরিমাণে থাকে ডিমে ও শুক্রাণুতে।

এ-পর্যায়ে যা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করার কথা, তা হচ্ছে যে জননকোষের কোনো একটিকে অপরটি থেকে উৎকৃষ্ট মনে করতে পারি না; যখন তারা মিলিত হয়

তখন উভয়েই নিষিক্ত ডিমের মধ্যে হারিয়ে ফেলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য। প্রচলিত রয়েছে দুটি সাধারণ অনুমান, যে-দুটি অন্তত জৈবিক স্তরে স্পষ্টভাবে ভুল। প্রথমটি, অর্থাৎ নারীর অক্রিয়তার ব্যাপারটি, ভুল ব'লে প্রমাণিত হয় এ-ঘটনা থেকে যে নব জীবনের উদ্ভব ঘটে দুটি জননকোষের মিলনের ফলে; জীবনের স্ফুলিঙ্গ এ-দুটির কোনোটিরই একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ডিমের কেন্দ্রটি শুক্রাণুর কেন্দ্রের মতোই এক জীবন্ত সক্রিয়তার এলাকা। দ্বিতীয় ভুল অনুমানটি অবশ্য প্রথমটির বিরোধী। এটির মতে প্রজাতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয় নারীর দ্বারা, পুরুষ নীতি নিতান্তই এক বিস্ফোরক ও অস্থায়ী প্রকৃতির। তবে সত্য হচ্ছে ভ্রূণ বহন করে পিতা ও মাতা উভয়েরই জীবাণু, এবং মিলিতভাবে সে-দুটিকে সঞ্চারিত ক'রে দেয় সন্তানসন্ততির ভেতরে, যাদের কেউ পুরুষ কেউ নারী। এটা যেনো এক উভলিঙ্গ জীবাণু প্রাণরস, যা পুরুষ ও নারীকে পেরিয়ে বেঁচে থাকে যখন তারা উৎপাদন করে সন্তান।

এসব বলার পর আমরা চোখ দিতে পারি শুক্রাণু ও ডিমের গৌণ পার্থক্যগুলোর ওপর। ডিমের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর রয়েছে ভ্রূণ লালনপালনের শক্তি; এটি সংরক্ষণ ক'রে এমন বস্তু, যা দিয়ে ভ্রূণটি গঠন করে প্রস্তুতি। পরিণামে ডিমটি হয়ে ওঠে বিশাল, সাধারণত গোলাকার ও তুলনামূলকভাবে প্রকাণ্ড। পাখির ডিমের আকার সুপরিচিত; কিন্তু নারীর ডিম অনেকটা আণুবিক্ষণিক, আকারে মুদ্রিত যতিচিহ্নের সমান (ব্যাস .১৩২–.১৩৫ মিমি), তবে পুরুষের শুক্রাণু আরো অনেক ছোটো (দৈর্ঘ্য .০৪–.০৬ মিমি), এতো ছোটো যে এক ঘনমিলিমিটারে থাকতে পারে ৬০,০০০টি। শুক্রাণুর রয়েছে সুতোর মতো একটি লেজ ও ছোটো, চ্যাপ্টা ডিম্বাকার মাথা, যাতে থাকে ক্রোমোসোমগুলো। এর ওপর নেই কোনো জড়বস্তুর ভার; এটি পুরোপুরি জীবন্ত। এর পুরো কাঠামোই গতিশীল। আর সেখানে ডিমটি, ভ্রূণের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৃহৎ, স্থিতিশীল; নারীর দেহাভ্যন্তরে বন্দী বা বাহ্যিকভাবে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় এটি অক্রিয়ভাবে অপেক্ষায় থাকে নিষিক্ত হওয়ার। পুংজননকোষটিই একে খুঁজে বের করে। শুক্রাণুটি সব সময়ই একটি নগ্ন কোষ; আর প্রজাতি অনুসারে ডিমটি কোনো খোল বা ঝিল্লিতে সংরক্ষিত থাকতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু সব সময়ই যখন শুক্রাণু ডিমের সংলগ্ন হয় তখন চাপ প্রয়োগ করে ডিমের ওপর, কখনো কখনো ঝাঁকুনি দেয়, এবং গর্ত ক'রে ঢোকে এর ভেতরে। খ'সে পড়ে লেজটি এবং বৃদ্ধি পায় মাথা, গঠন করে পুংকেন্দ্রপরমাণু, এবং এটি এগিয়ে চলে ডিম কেন্দ্রপরমাণুর দিকে। এ-সময়ে ডিমটি দ্রুত তৈরি করে একটি ঝিল্লি, যা ভেতরে অনুপ্রবেশে বাধা দেয় অন্য শুক্রাণুদের। ডিমের থেকে অনেক ছোটো ব'লে শুক্রাণু উৎপাদিত হয় অনেক বেশি পরিমাণে; তাই ডিমের অনুরাগপ্রার্থী অসংখ্য।

তাই ডিম, তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যে, কেন্দ্রপরমাণুতে, সক্রিয়; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অক্রিয়; নিজের ভেতরে আটকানো এর সংহত ভর জাগিয়ে তোলে রাত্রির অন্ধকার ও অন্তর্মুখি নিদ্রাতুরতার বোধ। প্রাচীনদের কাছে গোলকের গঠন নির্দেশ করতো সীমাবদ্ধ বিশ্বকে, অনুপ্রবেশঅসম্ভব অণুকে। গতিহীন, ডিমটি অপেক্ষায় থাকে; এর বিপরীতে শুক্রাণুটি– মুক্ত, হালকাপাতলা, ক্ষিপ্র– জ্ঞাপন করে অস্তিত্বের অধীরতা ও অস্থিরতা। তবে এ-রূপককে বেশি দূর ঠেলে নেয়া ঠিক হবে না। ডিমকে অনেক সময় তুলনা

করা হয়েছে অন্তর্ভবতার সাথে আর শুক্রাণুকে সীমাতিক্রমণতার সাথে; বলা হয়েছে শুক্রাণু যখন বিদ্ধ করে ডিমকে, তখন হারিয়ে ফেলে তার সীমাতিক্রমণতা, চলনশীলতা; যখন এটি হারিয়ে ফেলে তার লেজ, এক নিশ্চল ভর একে গ্রাস ক'রে অবরুদ্ধ করে, নপুংসক করে। এটা ঐন্দ্রজালিক কাজ, খুবই উদ্বিগ্নকর, যেমন সব অক্রিয় কাজই উদ্বিগ্নকর, আর সেখানে পুংজননকোষের কাজগুলো যুক্তিসঙ্গত; এটি হচ্ছে গতি, যা স্থানকাল দিয়ে পরিমাপ করা যায়। এসব ধারণা মনের খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। পুং ও স্ত্রী জননকোষ সংমিশ্রিত হয় নিষিক্ত ডিমে; তারা উভয়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে সৃষ্টি করে এক নতুন পূর্ণাঙ্গতা। এটা মিথ্যে কথা যে ডিমটি লুব্ধতার সাথে গিলে ফেলে শুক্রাণুটি, এবং এও একই রকম মিথ্যে যে শুক্রাণুটি বিজয়ীর মতো জোরপূর্বক দখল করে ডিমটির এলাকা, কেননা সংমিশ্রণের ফলে উভয়েই হারিয়ে ফেলে স্বাতন্ত্র্য। যান্ত্রিক মনের কাছে গতিকে এক মহান যৌক্তিক প্রপঞ্চ ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কাছেও এটা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া জননকোষের মিলনের পেছনে কী কী শারীর-রাসায়নিক ক্রিয়া কাজ করে, তা আমরা বিস্তৃতভাবে জানি না। তবে দুটি জননকোষের তুলনা থেকে আমরা পৌঁছোতে পারি একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে। জীবনের রয়েছে দুটি পরস্পরসম্পর্কিত গতিময় বৈশিষ্ট্য : অতিক্রম ক'রেই শুধু একে রক্ষা করা যায়, আবার একে রক্ষা করলেই শুধু এ পেরিয়ে যেতে পারে নিজেকে। এ-দুটি হেতু সব সময়ই কাজ করে একসঙ্গে, এবং এদের পৃথক করার চেষ্টা খুবই অবাস্তব কাজ। এ-জননকোষ দুটি যখন মেশে পরস্পরের সাথে, তখনই তারা নিজেদের অতিক্রম ও স্থায়ী করে; কিন্তু নিজের গঠনের মধ্যেই ডিমটি বুঝতে পারে ভবিষ্যৎ চাহিদাগুলো, একে গঠন করা হয়েছে এমনভাবে যে এর মাঝে দেখা দেবে যে-জীবন, তা পোষণ করতে হবে তাকে। শুক্রাণুটি নিজের জাগানো ভ্রূণটিকে বিকশিত করার মতো কোনো সম্পদই ধারণ করে না। আবার, ডিমটি এমনভাবে স্থান বদলে করতে পারে না যাতে জ্ব'লে উঠতে পারে একটি নতুন জীবন, কিন্তু শুক্রাণুটি পারে এবং ভ্রমণ করে। ডিমটির দূরদৃষ্টি ছাড়া নিষ্ফল হতো শুক্রাণুর আগমন; তবে শুক্রাণুর উদ্যোগ ছাড়া ডিমটিও চরিতার্থ করতে পারতো না তার জীবন্ত সম্ভাবনা।

তাই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি জননকোষ দুটি পালন করে মূলত অভিন্ন ভূমিকা; একত্রে তারা সৃষ্টি করে একটি জীবন্ত সত্তা, যার মধ্যে তারা দুজনেই লুপ্ত হয় এবং অতিক্রম ক'রে যায় নিজেদের।

এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে যদি সিদ্ধান্ত নিই যে নারীর স্থান হচ্ছে গৃহ, তাহলে তা হবে গোঁয়ার্তুমি; তবে গোঁয়ার্তুমিপূর্ণ পুরুষ আছে অনেক। আলফ্রেড ফুইলি, তাঁর *ল্য তাঁপেরমাঁ এৎ ল্য কারাকতের* বইতে, নারীর সংজ্ঞা তৈরি করেছেন সর্বতোভাবে ডিম ভিত্তি ক'রে, পুরুষের সংজ্ঞা তৈরি করেছেন শুক্রাণু ভিত্তি ক'রে; এবং সন্দেহজনক তুলনার ওপর ভিত্তি ক'রে তৈরি করেছেন একরাশ অনুমানসিদ্ধ সুগভীর তত্ত্ব। প্রশ্ন হচ্ছে এসব সন্দেহজনক ধারণা প্রকৃতির কোন দর্শনের অংশ; নিশ্চিতভাবেই বংশানুক্রম সূত্রের অংশ নয়, কেননা এসব সূত্রানুসারে নারী ও পুরুষ একইভাবে উদ্ভূত হয় একটি ডিম ও একটি শুক্রাণু থেকে। আমি অনুমান করতে পারি যে এসব ঝাপসা মনে আজো ভাসে মধ্যযুগের পুরোনো দর্শনের টুকরো, যা শেখাতো যে মহাবিশ্ব হচ্ছে

এক অণুবিশ্বের অবিকল প্রতিবিম্ব– ডিমকে কল্পনা করা হতো একটি ছোটো নারী ব'লে, আর নারীকে এক বিরাট ডিমরূপে। এসব ঘোর, সে-আলকেমির যুগ থেকেই যা সাধারণত পরিত্যক্ত, উৎকট উদ্ভটভাবে আজকের উপাত্তের বৈজ্ঞানিক যথাযথতার বিপরীত, আধুনিক জীববিদ্যার সাথে মধ্যযুগের প্রতীকের কোনো মিল নেই। কিন্তু আমাদের তত্ত্বপ্রস্তাবকেরা বিষয়টিকে ঠিকমতো দেখেন না। এটা স্বীকার করতে হবে যে ডিম থেকে নারী খুবই দূরের পথ। অনিষিক্ত ডিমে এমনকি স্ত্রীলিঙ্গতার ধারণাও প্রতিষ্ঠিত হয় না। হেগেল ঠিকই বলেছেন যে লৈঙ্গিক সম্পর্ককে জননকোষের সম্পর্কের কাছে ফেরানো যাবে না। তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে নারীসত্তাকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিচার করা।

অনেক উদ্ভিদে ও কিছু প্রাণীতে (যেমন শামুকে) দু-ধরনের জননকোষের উপস্থিতির জন্যে দু-ধরনের ব্যক্তির দরকার পড়ে না, কেননা প্রতিটি ব্যক্তিই উৎপাদন করে ডিম ও শুক্রাণু উভয়ই। এমনকি যখন লিঙ্গরা পৃথক, তখনও তাদের পার্থক্য এমন নয় যে তাদের পৃথক প্রজাতির ব'লে মনে হ'তে পারে। পুং ও স্ত্রীলিঙ্গদের বরং মনে হয় একই সাধারণ ভিত্তিমূলের বৈচিত্র্য ব'লে। দুটি লিঙ্গের ভ্রূণবিকাশের সময় যে-গ্রন্থি থেকে পরে গোনাড বা জননগ্রন্থি গঠিত হয়, শুরুতে সেটি থাকে অভিন্ন; বিশেষ এক স্তরেই গ'ড়ে ওঠে অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয়; একইভাবে অন্যান্য যৌন প্রত্যঙ্গেরও প্রথমে থাকে একটি আদি অভিন্ন পর্ব; এ-সময়ে ভ্রূণের বিভিন্ন অংশ, যেগুলো পরে ধারণ করে সুস্পষ্ট পুরুষ বা নারীর গঠন, সেগুলো পরীক্ষা ক'রেও ভ্রূণের লিঙ্গ বোঝা সম্ভব নয়। এটা আমাদের উভলিঙ্গতা ও লিঙ্গভিন্নতার মাঝামাঝি অবস্থা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। অনেক সময়ই একটি লিঙ্গ ধারণ করে অন্য লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যসূচক কিছু প্রত্যঙ্গ; এর উদাহরণ ভাওয়া ব্যাং, যাতে পুরুষটির ভেতরে থাকে একটি অবিকশিত ডিম্বাশয়, যা নিরীক্ষামূলক অবস্থায় ডিম উৎপাদন করতে পারে। প্রজাতির মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে সমান ও শুরু থেকে একইভাবে বিকশিত পুং ও স্ত্রীলিঙ্গীয়রা মূলত সমতুল্য। প্রত্যেকেরই রয়েছে প্রজনন গ্রন্থি– ডিম্বাশয় ও অণ্ডকোষ– যাদের ভেতরে সমতুল্য প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয় জননকোষ। এ-গ্রন্থিগুলো লিঙ্গানুসারে কম-বেশি জটিল নালির ভেতর দিয়ে নিঃসরণ ঘটায় তাদের উৎপাদিত বস্তু; স্ত্রীলিঙ্গে ডিম্বনালির ভেতর দিয়ে সরাসরি বাইরে বেরোতে পারে ডিম; বা বহিষ্কৃত হওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্যে থাকতে পারে অবসারণী অথবা জরায়ুর মধ্যে; পুংলিঙ্গে বীর্য রক্ষিত হ'তে পারে বাইরে বা থাকতে পারো কোনো কামপ্রত্যঙ্গ, যা দিয়ে এটা ঢুকিয়ে দেয়া হয় নারীদেহে। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত থাকে এক সমরূপ সম্পর্কে।

স্ত্রীলিঙ্গ বা নারীর সাধারণভাবে সিদ্ধ কোনো সংজ্ঞা দেয়া অত্যন্ত কঠিন। নারীকে ডিমবহনকারী ও পুরুষকে শুক্রাণুবহনকারী ব'লে সংজ্ঞায়িত করা যথেষ্ট নয়, কেননা জননকোষের সাথে জীবটির সম্পর্ক বেশ অনিয়ত। আবার, সব মিলিয়ে জীবটির ওপর সরাসরি বিশেষ প্রভাব নেই জননকোষের পার্থক্যের।

জীবন জটিলতম রূপ পরিগ্রহ করে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হয় সবচেয়ে অগ্রসর ও বিশিষ্ট। সেখানে পরিপোষণ ও সৃষ্টি বাস্তবায়িত হয় লিঙ্গপার্থক্যের

মধ্যে; এ-গোত্রে, মেরুদণ্ডীদের মধ্যে, জননীই সন্তানদের সাথে রক্ষা করে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক, আর জনক তাদের প্রতি দেখায় কম আগ্রহ। স্ত্রীলিঙ্গ জীব সম্পূর্ণরূপে মাতৃত্বের সাথে খাপ খাওয়ানো ও মাতৃত্বসহায়ক, আর কামের উদ্যোগ গ্রহণই হচ্ছে পুংলিঙ্গের বিশেষ অধিকার।

স্ত্রীলিঙ্গ তার প্রজাতির শিকার। বছরের বিশেষ বিশেষ সময় জুড়ে, প্রত্যেক প্রজাতির জন্যে যা নির্দিষ্ট, তার সম্পূর্ণ জীবন নিয়ন্ত্রিত থাকে এক লৈঙ্গিক চক্র (ঋতুচক্র) দিয়ে, বিভিন্ন প্রজাতিতে যার স্থিতিকাল ও ঘটনাপরম্পরা ভিন্ন। এ-চক্রের আছে দুটি পর্ব : প্রথম পর্বে ডিমগুলো (প্রজাতি অনুসারে যাদের সংখ্যা বিভিন্ন) পরিপক্ব হয় এবং পুরু ও নালিময় হয় জরায়ুর আভ্যন্তর আবরণ; দ্বিতীয় পর্বে (যদি নিষিক্ত না হয়) ডিমগুলো লুপ্ত হয়, ভেঙে পড়ে জরায়ুর প্রাসাদ, এবং বস্তুরাশি প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে আসে, নারী ও বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের স্তন্যপায়ীদের বেলা যাকে বলা হয় ঋতুস্রাব। যদি গর্ভসঞ্চার ঘটে, তাহলে দ্বিতীয় পর্বের স্থানে দেখা দেয় গর্ভ। ডিমনিঃসরণের (প্রথম পর্বের শেষে) কাল *ওয়েস্ট্রাস* বা গর্ভসঞ্চারকাল নামে পরিচিত এবং এটা হচ্ছে কামোত্তেজনা বা সঙ্গমের কাল।

স্ত্রীলিঙ্গ স্তন্যপায়ীদের কামাবেগ সাধারণত অক্রিয়; সে প্রস্তুত ও অপেক্ষমাণ থাকে পুরুষটিকে গ্রহণ করার জন্যে। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে কখনো কখনো– যেমন কোনো কোনো পাখির ক্ষেত্রে– নারীটি পুরুষটির প্রতি সনির্বন্ধ আবেদন জানায়, তবে সে ডাকাডাকি, প্রদর্শনী, ইঙ্গিতপূর্ণ ছলাকলার বেশি কিছু করে না। সে পুরুষটির ওপর সঙ্গম চাপিয়ে দিতে পারে না। পুরুষটিই সিদ্ধান্ত নেয় পরিশেষে। পাখি আর স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে পুরুষটিই জোর ক'রে সঙ্গম করে, আর অধিকাংশ সময় নারীটি আত্মসমর্পণ করে উদাসীনভাবে, এমনকি বাধাও দেয় পুরুষটিকে।

এমনকি যখন নারীটি ইচ্ছুক, বা উত্তেজকও থাকে, তখনও পুরুষটিই *নেয়* তাকে, সে *নীত* হয়। শব্দটি অনেক সময় ব্যবহৃত হয় আক্ষরিকার্থে, কেননা বিশেষ কোনো প্রত্যঙ্গের সাহায্যেই হোক বা বেশি বলের ফলেই হোক, পুরুষটি দখল করে তাকে এবং ধ'রে রাখে বিশেষ আসনে; পুরুষটিই সম্পন্ন করে সঙ্গমের আন্দোলনগুলো; এবং, পতঙ্গ, পাখি, ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে পুরুষটি বিদ্ধ করে নারীটিকে। এ-বিদ্ধকরণের ফলে ধর্ষিত হয় তার অভ্যন্তরতা, সে একটি দেয়ালের মতো, যাকে ভেঙেচুরে ভেতরে ঢোকা হয়েছে। এতে পুরুষ তার প্রজাতির ওপর কোনো পীড়ন করছে না, কেননা নিয়ত নতুন হয়েই শুধু টিকে থাকতে পারে কোনো প্রজাতি, এবং শুক্রাণু ও ডিম মিলিত না হ'লে প্রজাতিটি ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু নারী, যার ওপর ভার দেয়া হয়েছে ডিম রক্ষার, সে তা নিজের ভেতরে ঢেকে রাখে, এবং তার শরীর, ডিমকে আশ্রয় দিতে গিয়ে রক্ষা করে পুরুষের উর্বরায়ণের কর্ম থেকে। তার শরীর হয়ে ওঠে একটি প্রতিরোধ, যাকে ভেঙেচুরে ঢুকতে হয়, আর তাকে বিদ্ধ ক'রে পুরুষ লাভ করে সক্রিয়তার মধ্যে আত্মসিদ্ধি।

পুরুষের আধিপত্য প্রকাশ পায় সঙ্গমের আসনেই– প্রায় সব প্রাণীতেই পুরুষটি থাকে নারীটির *ওপর*। এবং পুরুষটি ব্যবহার করে যে-প্রত্যঙ্গটি, সেটি একটি জড় বস্তু; কিন্তু এটি এখানে দেখা দেয় উত্তেজিত অবস্থায়– এটি একটি হাতিয়ার– আর

এ-কর্মে নারী প্রত্যঙ্গটি থাকে জড় আধারের স্বভাবে। পুরুষটি পাত করে তার বীর্য, নারীটি গ্রহণ করে। এভাবে, যদিও নারীটি প্রজননে পালন করে মূলত সক্রিয় ভূমিকা, সে *বশ্যতা* স্বীকার করে সঙ্গমে, যা আক্রমণ করে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে এবং বিদ্ধকরণ ও আভ্যন্তর গর্ভাধানের মধ্য দিয়ে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় এক বিরুদ্ধ বস্তু। যদিও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নারী কাম বোধ করতে পারে, কিন্তু সে যেহেতু কামাবেগের সময় চায় পুরুষ, তাই সে কামের অভিজ্ঞতাকে এক আভ্যন্তর ঘটনা হিশেবেই বোধ করে, পৃথিবী ও অন্যদের সাথে কোনো বাহ্যিক সম্পর্ক রূপে নয়।

তবে স্তন্যপায়ী নারী ও পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এখানে : শুক্রাণু, যার ভেতর দিয়ে পুরুষটির জীবন সম্প্রসারিত হয় আরেকজনের মধ্যে, ওই মুহূর্তেই তার কাছে হয়ে ওঠে অচেনা এবং বিচ্ছিন্ন হয় তার শরীর থেকে; তাই পুরুষটি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সে-মুহূর্তেই ঠিকঠাক ফিরে পায় যখন সে অতিক্রম ক'রে যায় এটির সীমা। ডিমটি, অন্য দিকে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে নারীর শরীর থেকে যখন সেটি পূর্ণ বিকশিত হয়ে থলি থেকে বেরিয়ে এসে পড়ে ডিম্বনালিতে; কিন্তু বাইরের কোনো জননকোষ দিয়ে নিষিক্ত হ'লে এটা আবার প্রথিত হয়ে সংযোজিত হয় জরায়ুতে। প্রথম ধর্ষিত হয়ে, তারপর বৈরী হয়ে– নারী, আংশিকভাবে, হয়ে ওঠে নিজের থেকে ভিন্ন আরেকজন। সে তার পেটের ভেতরে বহন করে ভ্রূণ যে-পর্যন্ত না সেটি পৌঁছে বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে, যা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন– গিনিপিগ জন্মে প্রায় প্রাপ্তবয়স্করূপে, ক্যাঙ্গারু জন্মে প্রায় ভ্রূণরূপেই। অন্যের ভাড়া খেটে, গর্ভধারণের কাল ভ'রে যে ফায়দা লোটে তার ওপর, নারী একই সময়ে হয়ে ওঠে নিজে এবং নিজের থেকে ভিন্ন আরেকজন; আর জন্মের পর সে নবজাতককে পান করায় নিজের বুকের দুধ। তাই এটা স্পষ্ট নয় ঠিক কখন এ-নতুন সত্তাটিকে গণ্য করা যেতে পারে স্বায়ত্তশাসিত ব'লে : গর্ভসঞ্চারের মুহূর্তে, জন্মের মুহূর্তে, বুকের দুধ ছাড়ানোর মুহূর্তে? লক্ষণীয় যে নারীটি পৃথক ব্যক্তিসত্তারূপে দেখা দেয় যতোবেশি স্পষ্টভাবে, জীবন তার পার্থক্যের ওপর ততোবেশি কর্তৃত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে। মাছ ও পাখি, যারা বিকাশের আগেই নিজেদের ভেতর থেকে বের ক'রে দেয় ভ্রূণ, স্ত্রীলিঙ্গ স্তন্যপায়ীদের থেকে কম দাসত্বে বন্দী থাকে শাবকদের কাছে। যে-সময়গুলোতে মুক্ত থাকে মাতৃত্বের দাসত্ব থেকে, তখন স্ত্রীলিঙ্গটি মাঝেমাঝেই সমান হয়ে উঠতে পারে পুংলিঙ্গ জীবটির; অশ্বী অশ্বের মতোই দ্রুতগামী, শিকারী কুকুরীর ঘ্রাণশক্তি পুরুষ কুকরের মতোই তীক্ষ্ণ, বানরীও দেখায় বানরের সমান বুদ্ধিমত্তা। তবে এ-স্বাতন্ত্র্যেকে দাবি করা হয় না নিজের ব'লে; প্রজাতির মঙ্গলের জন্যে স্ত্রীলিঙ্গটি ত্যাগ করে এ-দাবি। প্রজাতি তার কাছে দাবি করে এ-ত্যাগস্বীকার।

পুংলিঙ্গের ভাগ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী প্রজন্মের দিকে তার সীমাতিক্রমণের মধ্যে সে নিজেকে দূরে রাখে, এবং নিজের মধ্যে রক্ষা করে নিজের স্বাতন্ত্র্য। পতঙ্গ থেকে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত এ-বৈশিষ্ট্যটি স্থির। কামনা ও তৃপ্তির মধ্যে রয়েছে দূরত্ব, পুরুষটি তা কাটিয়ে ওঠে সক্রিয়ভাবে; সে নারীটিকে ঠেলে, খুঁজে বের করে, ছোঁয়, শৃঙ্গার করে, এবং বিদ্ধ করার আগে তাকে ত্যাগ করে। এ-কাজে ব্যবহৃত প্রত্যঙ্গগুলো অধিকাংশ সময়ই নারীর থেকে পুরুষে উৎকৃষ্টতর রূপে বিকশিত হয়েছে। এটা লক্ষ্য

করার মতো যে-জীবনপ্রণোদনা উৎপাদন করে বিপুল পরিমাণ শুক্রাণু, তা-ই পুংলিঙ্গে প্রকাশ পায় উজ্জ্বল পালকভারে, দ্যুতিময় আঁশ, শিং, শিংয়ের শাখা, কেশরে, তার কণ্ঠধ্বনিতে, তার প্রাণোচ্ছলতায়। আমরা আর বিশ্বাস করি না যে কামোত্তেজনার সময় পুংলিঙ্গ সাজে যে-'বিয়ের সাজসজ্জা'য়, সেগুলোর, বা তার প্রলুব্ধকর ঠাটঠমকের আছে কোনো নির্বাচনমূলক তাৎপর্য; তবে এগুলো প্রতীয়মান করে জীবনশক্তি, যা পুংলিঙ্গের মধ্যে উদ্ভিন্ন হয় অপ্রয়োজনীয় ও চমকপ্রদ মহিমায়। এ-জৈবনিক অতিপ্রাচুর্য, যৌনমিলনের উদ্দেশ্যে এসব কর্মকাণ্ড, আর সঙ্গমের সময় স্ত্রীলিঙ্গের ওপর তার ক্ষমতার আধিপত্যশীল দৃঢ় ঘোষণা– এ-সবই পুরুষটির জীবন্ত সীমাতিক্রমণতার স্বাধিকার জ্ঞাপন। এ-ক্ষেত্রে হেগেল পুরুষের মধ্যে দেখেছেন যে-আত্মগত উপাদান, তা ঠিকই, আর নারীটি মোড়া থাকে নিজের প্রজাতিতে। আত্মগততা ও পৃথকতা নির্দেশ করে বিরোধ। কামোত্তেজিত পুংলিঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আক্রমণাত্মকতা; একে কামসঙ্গী লাভের প্রতিযোগিতা ব'লে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা স্ত্রীলিঙ্গের সংখ্যা প্রায় পুংলিঙ্গের সমানই; বরং একে ব্যাখ্যা করতে হবে যুদ্ধ করার ইচ্ছের প্রতিযোগিতা হিশেবে। সঙ্গম একটি দ্রুত কর্ম এবং এতে পুরুষের শক্তি ক্ষয় হয় খুবই কম। সে পিতাসুলভ কোনো সহজাত প্রবর্তনাই দেখায় না। অধিকাংশ সময়ই সে সঙ্গমের পরই বর্জন করে স্ত্রীলিঙ্গটিকে। যখন সে কোনো পরিবার সংঘের– একপতিপত্নীক পরিবার, হারেম, বা যূথের প্রধান হিশেবে স্ত্রীলিঙ্গটির কাছে থাকে, সে পালন ও রক্ষা করে সারাটি গোষ্ঠিকেই; খুব কম সময়েই সে কোনো শাবকের প্রতি পোষণ করে বিশেষ আগ্রহ।

যেমন প্রায় সব পশুর ক্ষেত্রে তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও নারীপুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান, পশ্চিমে লৈঙ্গিক অনুপাত হচ্ছে যেখানে ১০৫.৫টি পুরুষ আছে নারী আছে ১০০টি। দুটি লিঙ্গেরই ভ্রূণগত বিকাশ ঘটে একইভাবে; তবে, নারী ভ্রূণে আদিম জীবাণুজাত এপিথেলিয়াম (যা থেকে বিকাশ ঘটে অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয়ের) বেশি সময় ধ'রে থাকে নিরপেক্ষ, তাই এটি দীর্ঘতর সময় ধ'রে থাকে হরমোনের প্রভাবে। এর ফলে অনেক সময়ই এর বিকাশ সম্পূর্ণ উল্টে যেতে পারে। এজন্যেই হয়তো অধিকাংশ ছদ্মউভলিঙ্গ জিনের ধাচ-অনুসারে নারী, যারা পরে পুরুষে পরিণত হয়। মনে করতে পারি যে পুংলিঙ্গ সূচনায়ই তার রূপ পরিগ্রহ করে, আর স্ত্রীলিঙ্গ ভ্রূণ তার নারীত্ব গ্রহণ করে বেশ ধীরে; তবে ভ্রূণজীবনের এ-আদিপ্রপঞ্চ সম্পর্কে আমরা আজো বেশ কমই জানি, তাই নিশ্চিতভাবে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।

হরমোনের রাসায়নিক সূত্র বা শরীরসংস্থান দিয়ে নারীকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। তার ভূমিকাগত বিকাশই নারীকে বিশেষভাবে পৃথক করে পুরুষ থেকে।

পুরুষের বিকাশ তুলনামূলকভাবে সরল। জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত তার বৃদ্ধির প্রায় পুরোটাই নিয়মিত; পনেরো-ষোলো বছর বয়সে শুরু হয় তার শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং চলে বুড়ো বয়স পর্যন্ত; এর উদ্ভবের সাথে উৎপাদন শুরু হয় সে-হরমোনের, যা গ'ড়ে তোলে তার দেহের পুরুষসূচক বৈশিষ্ট্য। এ-সময় থেকে পুরুষের যৌনজীবন সাধারণত সমন্বিত হয় তার ব্যক্তিক অস্তিত্বের সাথে : কামনায় ও সঙ্গমে প্রজাতির দিকে তার সীমাতিক্রমণতা অভিন্ন হয়ে ওঠে তার আত্মগততার সাথে– সে

হচ্ছে তার শরীর।

নারীর কাহিনী অনেক বেশি জটিল। তার ভ্রূণজীবনেই সরবরাহ শুরু হয়ে যায় ওসাইট বা অপুষ্ট ডিম্বাণুর, ডিম্বাশয় ধারণ করে প্রায় ৪০,০০০ অপরিণত ডিম। এদের প্রতিটি থাকে একটি ক'রে ফলিকল বা থলিতে, এবং এগুলোর মধ্যে হয়তো ৪০০টি পৌঁছে পরিণতিতে। জন্ম থেকেই প্রজাতিটি কবলিত করে নারীকে এবং তার মুঠো ক্রমশ শক্ত করতে থাকে। ওসাইটগুলো হঠাৎ বৃদ্ধি পায় ব'লে পৃথিবীতে আসার সময়ই নারী লাভ করে এক ধরনের বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতা; তারপর এক সময় ডিম্বকোষটি হ্রাস পেয়ে হয়ে ওঠে আগের আকারের পাঁচ ভাগের একভাগ, বলা যায় যেনো স্থগিত করা হয় শিশুটির শাস্তি। যখন বিকাশ ঘটতে থাকে তার শরীরের, তখন তার কামসংশ্রয়টি থাকে প্রায় স্থিতিশীল; কিছু ফলিকল আয়তনে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরিণতি লাভ করে না। বালিকার বিকাশ বালকের বিকাশের মতোই; একই বয়সে বালিকা কখনো কখনো বেশি লম্বা থাকে বালকের থেকে এবং তার ওজন হয় বেশি। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় প্রজাতিটি পুনরায় তোলে তার দাবি। ডিম্বাশয়ের নিঃসরণের প্রভাবে বিকাশমান ফলিকলের সংখ্যা বাড়ে, ডিম্বাশয়টি লাভ করে বেশি রক্ত এবং আকারে বাড়ে, পরিপক্বতা লাভ করে একটি ফলিকল, ঘটে ডিমনিঃসরণ, এবং শুরু হয় ঋতুস্রাবচক্র; কামসংশ্রয় ধারণ করে তার চূড়ান্ত আকার ও গঠন, শরীর ধারণ করে রমণীয় রূপরেখা, এবং প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তঃক্ষরণের ভারসাম্য।

এসব সংঘটন রূপ নেয় এক সংকটের। নারীর শরীর প্রতিরোধ ছাড়াই প্রজাতির হাতে নিজের অধিকার তুলে দেয় না, আর এ-যুদ্ধ দুর্বলকর ও ভয়ঙ্কর। বয়ঃসন্ধির আগে ছেলে ও মেয়ের মৃত্যুর হার সমান; চোদ্দো থেকে আঠারো বছর বয়সে যেখানে ১২৮টি মেয়ে মারা যায় সেখানে ছেলে মারা যায় ১০০টি; এবং আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সের মধ্যে যেখানে ১০৫টি মেয়ে মারা যায় সেখানে ছেলে মারা যায় ১০০টি। এ-সময়ে মাঝামাঝে দেখা দেয় পাণ্ডুরোগ, যক্ষ্মা, মেরুদণ্ডবক্রতা, অস্থিপ্রদাহ। অনেক ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি ঘটে অস্বাভাবিকভাবে অকালে, চার বা পাঁচ বছর বয়সে। অনেকের বেলা আবার বয়ঃসন্ধি ঘটেই না, তারা থেকে যায় শিশুসুলভ এবং ভোগে ঋতুস্রাবের বিশৃঙ্খলায় (রজঃরোধ বা ঋতুযন্ত্রণায়)। কিছু কিছু নারীর মধ্যে বৃক্কসংলগ্ন গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত রস ক্ষরণের ফলে দেখা দেয় পুরুষসূচকচিহ্ন।

এসব অস্বাভাবিকতা নিজের প্রজাতির ওপর ব্যক্তিসত্তার বিজয় নির্দেশ করে না; মুক্তির কোনো পথ নেই, যেহেতু এটা দাসত্বে বন্দী করে ব্যক্তিকে, তাই প্রজাতিটি একে যুগপৎ সমর্থন ও পরিতোষণ করে। এ-দ্বৈততা প্রকাশ পায় ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াকর্মের স্তরে, যেহেতু নারীর প্রাণশক্তির মূল রয়েছে ডিম্বাশয়ে, যেমন পুরুষের রয়েছে তার অণ্ডকোষে। উভয় লিঙ্গেই খোজা ব্যক্তিসত্তা শুধুমাত্র বন্ধ্যা নয়; সে ভোগে প্রত্যাবৃত্তিতে, সে অধঃপতিত হয়। ঠিকমতো গঠিত না হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ জীবটিই হয় নিঃস্ব এবং হয়ে পড়ে ভারসাম্যহীন; এটি বাড়তে ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে শুধু তখনই যদি বাড়ে ও সমৃদ্ধি লাভ করে তার কামপ্রত্যঙ্গসংশ্রয়। আবার অনেক প্রজননগত প্রপঞ্চ তার জীবনের প্রতি নির্বিকার এবং হয়ে উঠতে পারে নানা বিপদের উৎস। স্তনগ্রন্থি, যার বিকাশ শুরু হয় বয়ঃসন্ধির সময়, নারীর ব্যক্তিগত কোনো

কাজেই আসে না : জীবনের যে-কোনো সময়ে সেগুলো কেটে ফেলে দেয়া যায়। ডিম্বাশয়ের কিছু নিঃসরণ কাজ করে ডিমের কল্যাণে, সাহায্য করে তার পরিণতি লাভে এবং জরায়ুকে গ'ড়ে তোলে তার চাহিদা অনুসারে; জীবটিকে সব মিলিয়ে ধরলে দেখা যায় এগুলো শৃঙ্খলার বদলে সৃষ্টি করে ভারসাম্যহীনতা– নারী নিজের চাহিদা অনুসারে নিজেকে না গ'ড়ে নিজেকে খাপ খাওয়ায় ডিমের চাহিদার সাথে।

বয়ঃসন্ধি থেকে ঋতুবন্ধ পর্যন্ত নারী হচ্ছে তার ভেতরে অভিনীত এক নাটকের রঙ্গমঞ্চ এবং তার সাথে সে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ঋতুস্রাবকে বলে 'অভিশাপ'; সত্যিই ঋতুস্রাবচক্র একটি বোঝা, এবং ব্যক্তিটির দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক নিরর্থক বোঝা। আরিস্ততলের সময়ে বিশ্বাস করা হতো যে প্রত্যেক মাসে রক্তস্রাব ঘটে এ-কারণে যে যদি গর্ভসঞ্চার হয়, তাহলে ওই রক্তে গ'ড়ে উঠবে শিশুর রক্তমাংস; এবং এ-পুরোনো বিশ্বাসের মধ্যে সত্যটা এখানে যে নারী বারবার অঙ্কন করে গর্ভধারণের ভিত্তিমূলের রূপরেখা। নিম্নস্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারচক্র সীমিত থাকে বিশেষ ঋতুতে, এবং এর সাথে কোনো রক্তস্রাব ঘটে না; সর্বোচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ীদের (বানর, বনমানুষ, এবং মানবপ্রজাতি) ক্ষেত্রেই শুধু প্রতি মাসে কম-বেশি যন্ত্রণার সাথে ঘটে রক্তক্ষরণ। যে-গ্রাফীয় থলি ডিমগুলোকে ঢেকে রাখে, প্রায় চোদ্দো দিনে তার একটি আয়তনে বাড়ে ও পরিপক্ব হয়, এর ফলে নিঃসরণ ঘটে ফোলিকিউলিন (এস্ট্রিন) হরমোনের। ডিম্বনিঃসরণ ঘটে মোটামুটিভাবে চোদ্দো দিনের দিন : একটি থলি ডিম্বাশয়ের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরোতে শুরু করে এবং ভেঙে বেরিয়ে যায় (এতে সামান্য রক্তক্ষরণ ঘটে), ডিমটি গিয়ে পড়ে ডিম্বনালিতে; এবং ক্ষতটি পরিণত হয় হলুদ বস্তুতে। হলুদ বস্তুটি নিঃসরণ ঘটাতে শুরু করে প্রোজেসটেরোন হরমোন, যা ঋতুচক্রের দ্বিতীয় পর্বে কাজ করতে থাকে জরায়ুর ওপর। জরায়ুর দেয়াল-আস্তরণ হয়ে ওঠে পুরু ও গ্রন্থিল ও রক্তনালিতে পূর্ণ, একটি নিষিক্ত ডিমকে গ্রহণ করার জন্যে জরায়ুর ভেতর তৈরি করে একটি দোলনা। কোষের এ-বিস্তার যেহেতু উল্টোনো অসম্ভব, তাই ডিম্বনিষিক্তি না ঘটলে এ-সৌধ টিকিয়ে রাখা হয় না। নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ীতে এ-আবর্জনা ক্রমশ বেরিয়ে যায়; কিন্তু নারী ও অন্যান্য উচ্চস্তন্যপায়ীতে এ-পুরু দেয়াল-আস্তরণ (এন্ডোমেট্রিয়াম) হঠাৎ ভেঙে পড়ে, খুলে যায় রক্তনালি ও রক্তের এলাকা, এবং রক্তিম বস্তুরাশি রক্তপ্রবাহরূপে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর যখন প্রত্যাবৃত্ত হয় হলুদ বস্তু, তখন আবার গ'ড়ে ওঠে জরায়ুর আস্তরণের ঝিল্লি এবং শুরু হয় চক্রের আরেক ডিম্বথলীয় পর্ব।

এ-জটিল প্রক্রিয়া, যা আজো তার নানা এলাকায় রহস্যপূর্ণ, চলে নারীর সম্পূর্ণ সত্তাটিকে জড়িয়ে। অধিকাংশ নারী– শতকরা ৮৫জনেরও বেশি– ঋতুস্রাবের সময় ভোগে কম-বেশি যন্ত্রণায়। ঋতুস্রাব শুরুর আগে বাড়ে নারীর রক্তচাপ এবং পরে যায় কমে; বাড়ে ধমনীর স্পন্দন ও মাঝেমাঝে শরীরের তাপ, তাই মাঝেমাঝেই দেখা দেয় জ্বর; তলপেট ব্যথা করে; কখনো কখনো দেখা দেয় কোষ্ঠকাঠিন্য ও তারপর উদরাময়; মাঝেমাঝে দেখা দেয় যকৃতে প্রদাহ; অনেকের গলা জ্বালা করে ও অনেকে কানে কম শোনে চোখে কম দেখে; ঘাম বাড়ে, এবং রক্তস্রাবের শুরুতে দেখা দেয় একটা দুর্গন্ধ *সুই গেনেরিস*, যা খুবই তীব্র এবং থাকতে পারে সারা ঋতুচক্র ভ'রে।

বৃদ্ধি পায় মৌলবিপাকের হার। রক্তের লাল কণিকা হ্রাস পায়। আক্রান্ত হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, তার ফলে মাথা ধরে মাঝেমাঝেই, বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র; কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে অসচেতন নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়, দেখা দেয় খেঁচুনিপূর্ণ প্রতিবর্ত, যার ফলে ঘটে মেজাজের খামখেয়ালিপনা। এ-সময়ে নারী হয় স্বাভাবিকের থেকে বেশি আবেগপরায়ণ, বেশি বিচলিত, বেশি খিটখিটে, এবং তার দেখা দিতে পারে মারাত্মক মানসিক বিকলন। ঋতুস্রাবের সময়ই নারী তার শরীরকে তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে অনুভব করে এক অবোধ্য, বিরোধী জিনিশ হিশেবে; এটা এমন এক একগুঁয়ে ও বাহ্যিক জীবনের শিকার, যে প্রতিমাসে তার ভেতরে তৈরি করে ও ভেঙে ফেলে একটি দোলনা; প্রতিমাসেই সব কিছু প্রস্তুত করা হয় একটি শিশুর জন্যে, তারপর নিঃসরণ ক'রে দেয় রক্তিম ধারায়। নারী, পুরুষের মতোই, নিজের শরীর; তবে তার শরীর তার নিজের থেকে ভিন্ন এক জিনিশ।

নারী অভিজ্ঞতা অর্জন করে আরো গভীর এক বিচ্ছিন্নতাবোধের, যখন ঘটে গর্ভাধান এবং বিশ্লিষ্ট ডিম এসে পড়ে জরায়ুতে ও বিকশিত হ'তে থাকে। এটা সত্য যে স্বাস্থ্য ভালো থাকলে গর্ভধারণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এটা মায়ের জন্যে ক্ষতিকর নয়; তখন তার ও ভ্রূণের মধ্যে ঘটে কিছু পারস্পরিক ক্রিয়া, যা তার জন্যে বেশ উপকারী। তবে সামাজিক প্রয়োজন থাকলেও গর্ভধারণ অবসাদের কাজ, যা শারীরিকভাবে নারীর ব্যক্তিগত কোনো উপকারে আসে না, বরং তার কাছে দাবি করা হয় বড়ো রকমের ত্যাগস্বীকার। প্রথম মাসগুলোতে মাঝেমাঝেই দেখা দেয় ক্ষুধাহীনতা ও বমনপ্রবণতা, যা কোনো গৃহপালিত স্ত্রীলিঙ্গ পশুতে দেখা যায় না; এটা নির্দেশ করে আক্রমণকারী প্রজাতির বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহ। প্রসবের সময় মাঝেমাঝে ঘটে নানা মারাত্মক দুর্ঘটনা বা গর্ভধারণের কালে তার মধ্যে ঘটে নানা বিকলন; আর নারীটি যদি শক্তিশালী না হয়, যদি না নেয়া হয় স্বাস্থ্যগত সাবধানতা, তাহলে বারবার গর্ভধারণের ফলে নারীটি হয়ে ওঠে অকালে বৃদ্ধ, বা ঘটে মৃত্যু, যা গ্রামের দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে। প্রসবের ব্যাপারটি যন্ত্রণাদায়ক ও ভয়ঙ্কর। এ-সংকটের সময় দেখা যায় যে নারীর শরীরটি সব সময় প্রজাতি ও ব্যক্তি উভয়েরই জন্যে সুবিধাজনক রীতিতে কাজ করে না; নবজাতকের মৃত্যু ঘটতে পারে,বা এটি জন্ম নিতে গিয়ে হত্যা করতে পারে মাকে বা তার মধ্যে জন্মাতে পারে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি। বলা হয়ে থাকে যে নারীর 'তলপেটে আছে দুর্বলতা'; এবং এটা সত্য যে তাদের অভ্যন্তরে থাকে এক বিরূপ উপাদান– তার মর্মস্থানে প্রজাতির এক ধারাবাহিক দংশন।

পরিশেষে নারী তার প্রজাতির লৌহমুষ্টি থেকে মুক্তি পায় আরেক গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে : সেটি হচ্ছে ঋতুবন্ধ, বয়ঃসন্ধির যা বিপ্রতীপ, যা দেখা দেয় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে। কমতে কমতে থেমে যায় ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াকলাপ, যার ফলে হ্রাস পায় নারীটির জীবনশক্তি। দেখা দেয় উত্তেজনার নানা চিহ্ন, যেমন, উচ্চ রক্তচাপ, মুখের হঠাৎ তপ্ত রক্তিমাভা, বিচলন, এবং কখনো কখনো কামাবেগ বৃদ্ধি। অনেক নারীর শরীরে এ-সময় বাড়ে মেদ; অনেকে হয়ে ওঠে পুরুষধর্মী। অনেকের মধ্যে স্থাপিত হয় এক নতুন অন্তঃক্ষরণের ভারসাম্য। নারী এখন মুক্তি পায় তার নারীপ্রকৃতি কর্তৃক তার ওপর চাপিয়ে দেয়া দাসত্ব থেকে, কিন্তু তাকে খোজার

সাথে তুলনা করা যায় না, কেননা তার জীবনশক্তি নষ্ট হয়ে যায় নি। তাছাড়াও, সে আর শিকার নয় বিপর্যয়কর শক্তিরাশির; সে হচ্ছে নিজে, সে আর তার শরীর এখন অভিন্ন। কখনো কখনো বলা হয় যে বিশেষ বয়সে নারী হয়ে ওঠে 'একটি তৃতীয় লিঙ্গ'; এবং সত্য হচ্ছে এ-সময়ে তারা পুরুষ না হ'লেও তারা আর নারীও নয়। নারীশারীরবৃত্ত থেকে এ-মুক্তি কখনো কখনো প্রকাশ পায় তার স্বাস্থ্যে, ভারসাম্যে, বলিষ্ঠতায়, যা আগে তার ছিলো না।

প্রধান লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও নারীর আছে কতকগুলো অপ্রধান লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, যা হরমোনের ক্রিয়ার ফলে প্রত্যক্ষভাবে কিছুটা কম-বেশি প্রথমটিরই পরিণতি। সাধারণত নারী পুরুষের থেকে খাটো ও কম ভারি, তার কঙ্কাল অনেক বেশি ভঙ্গুর, এবং গর্ভধারণ ও প্রসবের প্রয়োজনে শ্রোণীদেশ বৃহত্তর; তার সংযোগী কলাতন্তুরাশি জমায় বেশি মেদ আর তার দেহরেখা পুরুষের থেকে বেশি গোলগাল। সাধারণভাবে আকৃতি– গঠন, ত্বক, চুল– দু-লিঙ্গে স্পষ্টভাবে ভিন্ন। নারীর মধ্যে পেশিশক্তি অনেক কম, প্রায় পুরুষের তিন ভাগের দু-ভাগ, ফুসফুস ও শ্বাসনালি ছোটো ব'লে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তিও কম। তার স্বরযন্ত্র তুলনামূলকভাবে ছোটো, এর ফলে নারীর কণ্ঠস্বর উচ্চ। নারীর রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম এবং তাতে হিমোগ্লোবিন, লাল কণিকা, কম; তাই নারীরা কম বলিষ্ঠ এবং পুরুষের থেকে বেশি ভোগে রক্তাল্পতায়। তাদের ধমনীর স্পন্দন বেশি দ্রুত, তাদের সংবহনতন্ত্র কম সুস্থিত, তাই সহজেই গাল রাঙা হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে অস্থিতিশীলতা নারীর সংস্থানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ-সুস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবই রয়েছে নারীর আবেগপরায়ণতার মূলে, যা জড়িয়ে আছে তার রক্তসংবহনের ওঠানামার সাথে– হৃৎপিণ্ডের কম্পন, গাল রাঙা হয়ে ওঠা ইত্যাদি– আর এজন্যেই নারী দেখিয়ে থাকে নানা উত্তেজনা, যেমন অশ্রুপাত, উন্মত্ত হাস্য, এবং নানা স্নায়বিক সংকট।

চারিত্রিক এসব বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলোই উদ্ভূত হয় নিজের প্রজাতির কাছে নারীর অধীনতার কারণে; এবং এখানেই আমরা পাই এ-জরিপের সবচেয়ে চমকপ্রদ উপসংহার : উদাহরণস্বরূপ, নারী সব স্তন্যপায়ী স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে এমন একজন, যে সবচেয়ে গভীরভাবে বিচ্ছিন্ন (তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাহ্যিক শক্তির শিকার), এবং যে এ-বিচ্ছিন্নবোধকে প্রতিরোধ করে সবচেয়ে প্রচণ্ডভাবে; আর কারো মধ্যেই প্রজননের কাছে দাসত্বের ব্যাপারটি এতো বেশি কর্তৃত্বব্যঞ্জক নয় বা আর কেউ এতো অনিচ্ছায় গ্রহণ করে না একে। বয়ঃসন্ধি ও ঋতুবন্ধের সংকট, মাসিক 'অভিশাপ', দীর্ঘ ও অনেক সময় কষ্টকর গর্ভধারণ, বেদনাদায়ক ও অনেক সময় ভয়ঙ্কর সন্তানপ্রসব, অসুখ, অপ্রত্যাশিত রোগের লক্ষণ ও জটিলতা– এসব হচ্ছে মানব স্ত্রীলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য। তার সাথে তুলনায় পুরুষ পেয়েছে অসীম সুবিধা : ব্যক্তি হিশেবে তার কামজীবন তার অস্তিত্বের বিরোধী নয়, এবং জৈবিকভাবে এর বিকাশ নিয়মিত, এর কোনো সংকট নেই এবং সাধারণত নেই কোনো দুর্ঘটনা। গড়ে নারী বাঁচে পুরুষেরই সমান, বা বেশি; কিন্তু তারা অসুস্থ থাকে বেশি, এবং অনেক সময় তাদের নিজেদের ওপর থাকে না তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ।

এ-জৈবিক ব্যাপারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ইতিহাসে এগুলো পালন করে

প্রধান ভূমিকা এবং হয়ে ওঠে তার পরিস্থিতির এক অত্যাবশ্যক উপাদান। আমাদের পরবর্তী আলোচনা ভ'রে এগুলোকে আমরা সব সময় মনে রাখবো। কেননা, শরীর যেহেতু বিশ্বকে উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের হাতিয়ার, তাই বিশ্বকে এক ধরনে উপলব্ধি করলে যেমন মনে হবে অন্য ধরনে উপলব্ধি করলে মনে হবে খুবই ভিন্ন জিনিশ ব'লে। এজন্যেই আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি জৈবিক সত্যগুলো; এগুলো নারীকে বোঝার অন্যতম চাবি। তবে আমি স্বীকার করি না যে এগুলো তার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছে এক চিরস্থির ও অবধারিত নিয়তি। কোনো লৈঙ্গিক স্তরক্রম সৃষ্টির জন্যে এগুলো যথেষ্ট নয়; এগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে না নারী কেনো অপর; এগুলো নারীকে চিরকালের জন্যে অধীন ভূমিকায় থাকার দণ্ডে দণ্ডিত করে না।

মাঝেমাঝেই মনে করা হয়েছে যে শুধু শরীরসংগঠনেই খুঁজতে হবে এসব প্রশ্নের উত্তর : দু-লিঙ্গেরই কি ব্যক্তিগত সাফল্যের সুযোগ সমান? প্রজাতির মধ্যে কোনটি পালন করে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা? তবে মনে রাখতে হবে যে এসব পার্থক্যের মধ্যে প্রথমগুলো অন্যান্য স্ত্রীলিঙ্গের সাথে তুলনায় অনেক ভিন্ন নারীর বেলা; পশু প্রজাতিতে এগুলো স্থির এবং তাদের চিরস্থিরতার ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়– শুধু পর্যবেক্ষণ সংকলন ক'রেই সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারি অশ্বী অশ্বের সমান দ্রুতগামী কি না, বা বুদ্ধির পরীক্ষায় পুরুষ শিম্পাঞ্জি ছাড়িয়ে যায় কি না তাদের স্ত্রীলিঙ্গদের– কিন্তু মানবপ্রজাতি চিরকাল ধ'রে আছে পরিবর্তনশীল অবস্থায়, হয়ে উঠছে চিরকাল ধ'রে।

কিছু বস্তুবাদী পণ্ডিতপ্রবর সমস্যাটি আলোচনা করেছেন বিশুদ্ধ অনড় রীতিতে; মনোদৈহিক সমান্তরলতার তত্ত্ব দিয়ে প্রভাবিত হয়ে তাঁরা পুরুষ ও নারী প্রাণীসত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন গাণিতিক তুলনা– এবং তাঁরা কল্পনা করেছেন যে এসব পরিমাপ সরাসরিভাবে নির্দেশ করে দুটি লিঙ্গের ভূমিকাগত সামর্থ্য। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্কের ধ্রুব ও আপেক্ষিক ওজন সম্পর্কে বিস্তৃত তুচ্ছ আলোচনায় নিয়োজিত থেকেছে প্রচুর ছাত্র– সব কিছু সংশোধনের পর পৌচেছে অসিদ্ধান্তমূলক ফলাফলে। তবে যা এসব সতর্ক গবেষণার আকর্ষণীয়তা নষ্ট করে, তা হচ্ছে মস্তিষ্কের ওজন ও বুদ্ধিমত্তার মাত্রার মধ্যে কোনো রকম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। এবং পুরুষ ও নারী হরমোনের রাসায়নিক সূত্রের মানসিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও একই রকমে হতবুদ্ধি হ'তে হয়।

এ-পর্যেষণায় আমি দ্ব্যর্থতাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করি মনোদৈহিক সমান্তরলতার ধারণা, কেননা এটা এমন এক মতাদর্শ যার ভিত্তিমূলকে দীর্ঘকাল ধ'রে পুরোপুরিভাবে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি যে আদৌ এর উল্লেখ করছি, তার কারণ হচ্ছে এর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দেউলেত্ব সত্ত্বেও আজো অনেকের মনে এটা প্রেতের মতো আনাগোনা করে। আমি সে-সব তুলনামূলক সংশ্রয়কেও প্রত্যাখ্যান করি, যেগুলো ধ'রে নেয় যে মূল্যবোধের আছে একটা *প্রাকৃতিক* স্তরক্রম বা মানদণ্ড– যেমন, একটা বিবর্তনমূলক স্তরক্রম। নারীশরীর কি পুরুষের শরীরের থেকে অধিকতর বালধর্মী বা বালধর্মী নয়, এটা কি কম-বেশি বানরের দেহের সদৃশ ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা নিরর্থক। এসব নিবন্ধ, যেগুলো একটা অস্পষ্ট প্রাকৃতবাদকে মিশ্রিত করে আরো অস্পষ্ট কোনো নীতিশাস্ত্র বা নন্দনতত্ত্বের সাথে, সেগুলো খাঁটি শব্দবাচালতা মাত্র। মানবপ্রজাতির নারী

ও পুরুষের মধ্যে আমরা তুলনা করতে পারি শুধু মানবিক পরিপ্রেক্ষিতে। তবে পুরুষের সংজ্ঞা দেয়া হয় এমন একজনরূপে, যে চিরস্থির নয়, সে তা যা সে সৃষ্টি করে নিজেকে। মারলিউ-পোন্তি যথার্থই বলেছেন যে মানুষ কোনো প্রাকৃতিক প্রজাতি নয় : সে একটি ঐতিহাসিক ধারণা। নারী কোনো পরিসমাপ্ত বাস্তবতা নয়, বরং সে এক হয়ে ওঠা, এবং তার হয়ে ওঠার সাথেই তুলনা করতে হবে পুরুষকে; অর্থাৎ সংজ্ঞায়িত করতে হবে তার *সম্ভাবনারাশিকে*।

তবু এটা বলা হবে যে শরীর যদি কোনো *বস্তু* নাও হয়, তবে এটা একটি পরিস্থিতি, আমি আলোচনায় নিয়েছি এ-দৃষ্টিভঙ্গিই– হাইডেগার, সার্ত্র, ও মারলিউ-পোন্তির দৃষ্টিভঙ্গি : এটা বিশ্বের ওপর আমাদের অধিকার বিস্তারের হাতিয়ার, আমাদের প্রকল্পের জন্যে এটা একটি সীমাবদ্ধকর উপাদান। নারী পুরুষের থেকে দুর্বল, তার পেশিশক্তি কম, তার লাল রক্তকণা কম, ফুসফুসের শক্তি কম, সে দৌড়োয় পুরুষের থেকে ধীরে, তুলতে পারে কম ওজন, পুরুষের সাথে কোনো খেলায়ই পেরে ওঠে না; সে পুরুষের সাথে মারামারিতে পারে না। এসব দুর্বলতার সাথে যোগ করতে হবে তার অস্থিতিশীলতাকে, তার নিয়ন্ত্রণের অশক্তি, এবং তার ভঙ্গুরতা : এগুলো সত্য। পৃথিবীর ওপর তার অধিকার তাই সীমিত; কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে তার দৃঢ়তা কম ও স্থিরতা কম, তাই সাধারণত সে ওগুলো বাস্তবায়নের জন্যে কম সামর্থ্যসম্পন্ন। অন্যভাবে বলা যায় যে পুরুষের তুলনায় তার ব্যক্তিজীবন কম ঐশ্বর্যপূর্ণ।

নিশ্চয়ই এসব সত্য অস্বীকার করা যায় না– তবে এগুলোর নেই কোনো বিশেষ তাৎপর্য। একবার যদি আমরা গ্রহণ করি মানবিক পরিপ্রেক্ষিত, শরীরকে ব্যাখ্যা করি অস্তিত্বের ভিত্তিতে, তাহলে জীববিজ্ঞান হয়ে ওঠে এক বিমূর্ত বিজ্ঞান; যখন শারীরবৃত্তিক তথ্য (উদাহরণস্বরূপ, পেশীয় নিকৃষ্টতা) অর্থ গ্রহণ করে, তখন এ-অর্থকে দেখা হয় সম্পূর্ণ পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ব'লে; এ-'দুর্বলতা' প্রকাশ পায় শুধু পুরুষ কোন লক্ষ্য নির্দেশ করছে, তার আছে কী কী হাতিয়ার, এবং সে কী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করছে, তার আলোকে। যদি সে বিশ্বকে অধিকার করতে না চায়, তাহলে বস্তুর ওপর *অধিকারের* ধারণার কোনো তাৎপর্য থাকে না; এ-অধিকারের কাজে যখন ন্যূনতম বলের থেকে বেশি শারীরিক বলের সম্পূর্ণ প্রয়োগ দরকার হয় না, তখন বলের পার্থক্যগুলো বাতিল হয়ে যায়; যেখানে হিংস্রতা রীতিবিরোধী, সেখানে পেশিশক্তি আধিপত্যের ভিত্তি হ'তে পারে না। সংক্ষেপে *দুর্বলতার* ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে শুধু অস্তিত্ব, অর্থনীতি ও নৈতিক বিবেচনা অনুসারে। বলা হয়েছে যে মানবপ্রজাতিটি অ-প্রাকৃতিক, এটা ঠিক মন্তব্য নয়, কেননা মানুষ সত্য অস্বীকার করতে পারে না; তবে সে যেভাবে তাদের সাথে আচরণ করে সে-অনুসারেই প্রতিষ্ঠা করে তাদের সত্য : তার কাজের মধ্যে প্রকৃতি যতোখানি জড়িত প্রকৃতি তার কাছে ততোখানি বাস্তব– বাদ দেয়া হচ্ছে না এমনকি তার নিজের প্রকৃতিকেও। নিজের প্রজাতির কাছে নারীর দাসত্ব কম-বেশি প্রচণ্ড, সেটা ঘটে সমাজ তার কাছে কতোগুলো সন্তানপ্রসব চায়, সে-অনুসারে। উচ্চস্তরের পশুদের বেলা এটা সত্য যে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ব্যাপারটি স্ত্রীলিঙ্গের থেকে পুংলিঙ্গের পশুটিই জ্ঞাপন করে

প্রবলতরভাবে, কিন্তু মানবপ্রজাতিতে ব্যক্তির 'সম্ভাবনা' নির্ভর করে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর।

আবার এখানে মানবিক পরিস্থিতিকে অন্য কোনো পরিস্থিতিতে পর্যবসিত করা যাবে না; প্রথমত মানুষদের একক ব্যক্তিসত্তারূপে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না; পুরুষেরা ও নারীরা কখনো পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয় নি; যুগলটি হচ্ছে এক আদি *মিটজাইন*, এক মৌল সমবায়; এবং কোনো বৃহৎ যৌথতায় এটা সব সময়ই দেখা দিয়েছে একটি স্থায়ী বা অস্থায়ী উপাদানরূপে।

এমন এক সমাজে প্রজাতির কাছে কোনটি বেশি দরকারি, পুরুষ না নারী? জননকোষের স্তরে, সঙ্গম ও গর্ভধারণের জৈবিক ভূমিকার স্তরে, আমরা যেমন দেখেছি পুরুষনীতি রক্ষণের জন্যে সৃষ্টি করে, নারীনীতি সৃষ্টির জন্যে রক্ষণ করে; তবে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন রূপে এ-শ্রমবিভাজনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য কী? এ-সহযোগিতা চূড়ান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে সে-প্রজাতিতে, যাতে শাবকেরা দুধ ছাড়ার পর দীর্ঘকাল ধ'রে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে অসমর্থ; এখানে পুরুষটির সহায়তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যে-সব জীবন সে জন্ম দিয়েছে, তাকে ছাড়া সে-সব জীবন রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় না। একটি পুরুষ প্রতিবছর গর্ভবতী করতে পারে অনেকগুলো নারীকে; তবে সন্তানদের জন্মের পর তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, শত্রুদের থেকে তাদের রক্ষা করার জন্যে, তাদের চাহিদা মেটানোর জন্যে প্রকৃতি থেকে সামর্থ্য ছিনিয়ে আনার জন্যে প্রতিটি নারীর দরকার পড়ে একটি পুরুষ।

এভাবে জীববিজ্ঞানের সত্যগুলো আমাদের দেখতে হবে অস্তিত্বের স্বরূপগত, আর্থনীতিক, সামাজিক, ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেশের আলোকে। প্রজাতির কাছে নারীকে দাসত্বে বন্দী করা আর তার শক্তির নানা রকম সীমাবদ্ধতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য; নারীর শরীর পৃথিবীতে তার পরিস্থিতির মধ্যে একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। তবে তাকে নারী হিশেবে সংজ্ঞায়িত করার জন্যে তার শরীরই যথেষ্ট নয়; একজন সচেতন ব্যক্তি তার নিজের কাজের ভেতর দিয়ে যা প্রকাশ করে, তা ছাড়া আর কোনো সত্যিকার জীবন্ত বাস্তবতা নেই। আমাদের সামনে যে-প্রশ্নটি : নারী কেনো অপর?, তার উত্তর দেয়ার জন্যে জীববিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। আমাদের দায়িত্ব কীভাবে ইতিহাসব্যাপী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নারীর প্রকৃতি, তা আবিষ্কার করা; আমাদের খুঁজে বের করার বিষয় হচ্ছে মানবজাতি কী ক'রে তুলেছে নারীকে।

পরিচ্ছেদ ২

মনোবিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ

মনোদেহতত্ত্বের থেকে মনোবিশ্লেষণ যে প্রচণ্ড অগ্রগতি লাভ করেছে তা এ-দৃষ্টিতে যে মানবিক তাৎপর্য গ্রহণ না ক'রে কোনো কারণই মানসিক জীবনে জড়িত হয় না; জীববিজ্ঞানীরা যে-দেহ-বস্তু বর্ণনা করেন, তা যে আসলেই অস্তিত্বশীল, এমন নয়, আছে সেই দেহটি বিষয়ী যা যাপন করে। নারী ততোখানি নারী যতোখানি সে নিজেকে নারী মনে করে। তার আছে জৈবিকভাবে অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য, তবে সেগুলো তার সত্য, অভিজ্ঞ পরিস্থিতির অংশ নয় : তাই এতে প্রতিফলিত হয় না ডিমের গঠন, বরং জৈবিকভাবে বিশেষ গুরুতপূর্ণ নয় এমন একটি প্রত্যঙ্গ, যেমন ভগাঙ্কুর, এতে পালন করে প্রধান পর্যায়ের ভূমিকা। প্রকৃতি নারীকে সংজ্ঞায়িত করে না; তার আবেগগত জীবনে প্রকৃতির সাথে নিজের মতো ক'রে কাজ করতে গিয়ে সে নিজেই সংজ্ঞায়িত করে নিজেকে।

এ-পরিপ্রেক্ষিতে গ'ড়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ সংশ্রয়, যার পুরোটাকে আমি সমালোচনা করতে চাই না, শুধু দেখতে চাই নারীবিশ্লেষণে এর অবদানটুকু। মনোবিশ্লেষণবিদ্যাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা সহজ কাজ নয়। সব ধর্মের মতোই– যেমন খ্রিস্টধর্ম বা মার্ক্সবাদ– কিছু অনড় ধারণার ভিত্তির ওপর এটা প্রদর্শন ক'রে থাকে এক বিব্রতকর নমনীয়তা। বহু শব্দ অনেক সময় ব্যবহৃত হয় চরম আক্ষরিক অর্থে, যেমন *ফ্যালাস* (শিশ্ন) শব্দটি বুঝিয়ে থাকে মাংসের সে-উত্থান, যা নির্দেশ করে পুরুষকে; তারপর এগুলোকে সম্প্রসারিত করা হয় সীমাহীনভাবে এবং দেয়া হয় প্রতীকী অর্থ, তাই শিশ্ন এখন বুঝিয়ে থাকে পৌরুষ ও তার পরিস্থিতি। যদি আপনি এ-মতবাদকে আক্রমণ করেন, তাহলে মনোবিশ্লেষক প্রতিবাদ করেন যে আপনি ভুল বুঝেছেন এর মূলচেতনাকে; আর আপনি যদি প্রশংসা করেন এর মূলচেতনার, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে বন্দী করতে চান ওই মতবাদে। মতবাদের কোনো গুরুত্ব নেই, কেউ কেউ বলেন, মনোবিশ্লেণ হচ্ছে একটি পদ্ধতি; কিন্তু পদ্ধতির সাফল্য মতবাদীর বিশ্বাসকে দৃঢ়তর ক'রে তোলে। সব সত্ত্বেও কোথায় পাওয়া যাবে মনোবিশ্লেষণের প্রকৃত মুখাবয়ব যদি না পাওয়া যায় মনোবিশ্লেষকদের মধ্যে? কিন্তু এঁদের মধ্যেও আছেন বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, যেমন আছেন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ও মার্ক্সবাদীদের মধ্যে; এবং একাধিক মনোবিশ্লেষক ঘোষণা করেছেন 'মনোবিশ্লেষণের নিকৃষ্টতম শত্রু হচ্ছে মনোবিশ্লেষকেরা'। মধ্যযুগীয় বিদ্যাধর্মীয় যথাযথতা সত্ত্বেও যা প্রায়ই হয়ে ওঠে পণ্ডিতিসুলভ, রয়ে যায় বহু অস্পষ্টতা, যেগুলো দূর করা দরকার।

সার্ত্র ও মারলিউ-পোন্তি যেমন লক্ষ্য করেছেন যে 'যৌনতা অস্তিত্বের সাথে সম-বিস্তৃত', এ-প্রস্তাবটিকে দুটি অত্যন্ত ভিন্ন উপায়ে বোঝা সম্ভব; এটা বোঝাতে পারে যে অস্তিত্বশীলের প্রতিটি অভিজ্ঞতারই রয়েছে একটি যৌন তাৎপর্য, বা প্রতিটি যৌন প্রপঞ্চেরই আছে একটি আস্তিত্বিক তাৎপর্য। এ-দুটি বিবৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব, তবে প্রায়ই আমরা একটি থেকে পিছলে গিয়ে পড়ি আরেকটিতে। এ-ছাড়াও, যখনই 'যৌন'কে ভিন্ন করা হয় 'যৌনাঙ্গীয়' থেকে, তখনই যৌনতার ধারণাটি হয়ে ওঠে খুবই অস্পষ্ট।

ফ্রয়েড নারীর নিয়তির প্রতি কখনো বেশি আগ্রহ দেখান নি; তিনি পুরুষের নিয়তি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণকে সামান্য সংশোধন ক'রে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন নারীর নিয়তির সাথে। এর আগে যৌনবিজ্ঞানী মারানোঁ বলেছিলেন যে 'বিশেষ শক্তি হিশেবে, আমরা বলতে পারি লিবিডো পুরুষধর্মী শক্তি। আমরা পুলক সম্পর্কেও একথাই বলবো।' তাঁর মতে, যে-সব নারী পুলক অনুভব করে, তারা 'পুরুষধর্মী' নারী; কামপ্রণোদনা 'একমুখি' আর নারী এগিয়েছে এর মাত্র অর্ধেক পথে। ফ্রয়েড কখনো এতোটা চরমে যান নি; তিনি স্বীকার করেন যে পুরুষের মতো নারীর কামও পুরোপুরি বিকশিত; তবে তিনি বিশেষভাবে এ নিয়ে কাজ করেন নি। তিনি লিখেছেন : 'সারসত্তায় লিবিডো অবিরত ও নিয়মিতভাবে পুরুষ, তা পুরুষের মধ্যেই দেখা যাক বা দেখা যাক নারীর মধ্যে।' তিনি স্বীকার করেন না যে নারী-লিবিডোর আছে নিজস্ব মৌলিক স্বভাব, তাই তাঁর কাছে একে মনে হবে সাধারণ মানবলিবিডোর এক জটিল বিকৃতি ব'লে। তাঁর মতে এটা শুরুতে দু-লিঙ্গে অভিন্নভাবে বিকশিত হয়– প্রতিটি শিশু প্রথমে যায় মুখগহ্বর পর্বের ভেতর দিয়ে, যা তাকে নিবদ্ধ করে মায়ের স্তনের প্রতি, এবং তারপর যায় পায়ু পর্বের ভেতর দিয়ে; পরিশেষে পৌছে কামপ্রত্যঙ্গ পর্বে, যখন ভিন্ন হয়ে ওঠে দুটি লিঙ্গ।

ফ্রয়েড এছাড়াও প্রকাশ করেছেন একটি তথ্য, যার গুরুত্ব এখনো ভালোভাবে অনুধাবন করা হয় নি : সেটা হচ্ছে পুরুষের কাম যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে স্থিত শিশ্নে, সেখানে নারীর রয়েছে দুটি সুস্পষ্ট পৃথক কামসংশ্রয় : একটি ভগাঙ্কুরীয়, যা বিকশিত হয় শৈশবে, আরেকটি যোনীয়, যার বিকাশ ঘটে বয়ঃসন্ধির পর। কোনো ছেলে যখন পৌছে তার কামপ্রত্যঙ্গ পর্বে, তখন সম্পূর্ণ হয় তার বিকাশ; তবে তাকে পেরিয়ে যেতে হয় তার স্বতঃকামী প্রবণতা, যাতে সুখ আত্মগত, থেকে বিষমকামী প্রবণতার দিকে, যাতে সুখ জড়িত হয় অন্য কোনো বস্তুর সাথে, যা সাধারণত নারী। বয়ঃসন্ধির কালে একটি আত্মপ্রেমমূলক পর্বের ভেতর দিয়ে ঘটে এ-উত্তরণ। কিন্তু শিশ্ন থাকে, যেমন শৈশবে ছিলো, কামের সুনির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গ। নারীর লিবিডোও আত্মপ্রেমমূলক একটি পর্ব পেরিয়ে এগোয় বস্তুর দিকে, সাধারণত পুরুষের দিকে; তবে এ-প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি জটিল, কেননা নারীকে ভগাঙ্কুরীয় সুখ থেকে পৌছোতে হয় যোনীয় সুখের দিকে। পুরুষের আছে মাত্র একটি কামপ্রত্যঙ্গ পর্ব, কিন্তু নারীর আছে দুটি; তার একটি বড়ো ঝুঁকি আছে যে সে তার কামবিকাশের শেষ পর্যায়ে নাও পৌছোতে পারে, থেকে যেতে পারে শিশুপর্বে, এবং তার মধ্যে দেখা দিতে পারে মনোবিকলন।

স্বতঃকামী পর্বে থাকা অবস্থায় শিশু কমবেশি জড়িত হয় কোনো বস্তুর সাথে।

বালক জড়িত হয় তার মায়ের সাথে এবং নিজেকে অভিন্ন ক'রে তুলতে চায় পিতার সাথে; এ-ধৃষ্টতা তাকে ভীত করে, সে ভয় পেতে থাকে যে শাস্তি হিশেবে পিতা হয়তো তার অঙ্গচ্ছেদ করবে। এভাবে ইডিপাসগূঢ়ৈষা থেকে তার মধ্যে দেখা দেয় খোজাগূঢ়ৈষা। পিতার প্রতি বাড়ে তার হিংস্রতা, তবে একই সময়ে বালক আত্মস্থ ক'রে নেয় পিতার কর্তৃত্ব; এভাবে বালকের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে সুপার ইগো, অধি অহং, যা দমন করে তার অজাচারী প্রবণতা। এগুলো দমিত হয়, গূঢ়ৈষাটি ধ্বংস হয়, এবং পুত্র মুক্তি পায় পিতার ভীতি থেকে। এ-সময় সে নৈতিক উপদেশের সাহায্যে মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত করে পিতাকে। সুপার ইগো অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, কেননা ইডিপাসগূঢ়ৈষাকে প্রতিরোধ করা হয় কঠোরভাবে।

ফ্রয়েড প্রথমে বালিকার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন পুরোপুরি একইভাবে, পরে বিকাশের এ-নারীরূপের নাম দিয়েছেন তিনি ইলেক্ট্রাগূঢ়ৈষা; তবে এটা স্পষ্ট যে তিনি একে এর নিজের ওপর ভিত্তি ক'রে সংজ্ঞায়িত করার বদলে বর্ণনা করেছেন পুংলিঙ্গের বিন্যাসের অনুকরণে। তিনি এ-দুয়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য : বালিকা প্রথমে বোধ করে মায়ের প্রতি সংবন্ধন, কিন্তু বালক কখনোই তার পিতার প্রতি কামানুরাগ বোধ করে না। বালিকার এ-সংবন্ধন নির্দেশ করে যে তার ভেতরে টিকে আছে মুখ-পর্ব। তারপর বালিকা পিতার সাথে অভিন্ন ভাবতে শুরু করে নিজেকে; তবে পাঁচ বছর বয়সের দিকে সে আবিষ্কার করে দু-লিঙ্গের দেহসংস্থানের পার্থক্য; তার শিশ্ন নেই ব'লে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এবং অর্জন করে খোজাগূঢ়ৈষা– সে কল্পনা করতে থাকে যে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং এ-ভাবনা তাকে পীড়িত করতে থাকে। তখন সে তার পুরুষসুলভ অভিমান ছেড়ে দিয়ে মায়ের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে তোলে নিজেকে এবং প্রেমে প্রলুব্ধ করতে চায় পিতাকে। এভাবে খোজাগূঢ়ৈষা ও ইলেক্ট্রাগূঢ়ৈষা পরস্পরকে করে শক্তিশালী। তার হতাশার অনুভূতি হয় তীব্র, কেননা পিতাকে ভালোবেসে বৃথাই সে চায় পিতার মতো হ'তে; আবার, তার মনস্তাপ বাড়িয়ে তোলে তার প্রেম, কেননা পিতার ভেতরে জাগিয়ে তোলা প্রীতির সাহায্যেই শুধু সে ক্ষতিপূরণ করতে পারে নিজের নিকৃষ্টতার। ছোটো বালিকা তার মায়ের প্রতি পোষণ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতার বোধ। তারপর তার মধ্যেও গ'ড়ে ওঠে সুপার ইগো, দমিত হয় অজাচারী প্রবণতাগুলো; তবে তার সুপার ইগো বেশি শক্তিশালী নয়। তার কামপ্রত্যঙ্গগুলোর বিকাশের মতোই বালিকার সম্পূর্ণ কামনাট্যটি তার ভাইদের থেকে অনেক বেশি জটিল। এর পরিণতিতে সে বিরূপ হয়ে উঠতে পারে খোজাগূঢ়ৈষার প্রতি এবং অস্বীকার করতে পারে তার নারীত্ব, ধারাবাহিকভাবে কামনা করতে পারে একটি শিশ্ন, নিজেকে অভিন্ন বোধ করতে পারে পিতার সাথে। এ-প্রবণতা তাকে রেখে দেয় ভগাঙ্কুরীয় পর্বে, তাকে ক'রে তোলে কামশীতল, বা লিপ্ত করতে পারে সমকামে।

এ-দৃষ্টিকোণের বিরুদ্ধে যে-দুটি অত্যাবশ্যক আপত্তি তোলা যেতে পারে, তার উৎস হচ্ছে এ-ঘটনা যে ফ্রয়েড একে দাঁড় করিয়েছেন এক পুরুষভিত্তিক কাঠামোর ওপর। তিনি ধ'রে নিয়েছেন যে নারী অনুভব করে সে একটি অঙ্গচ্ছেদ-করা পুরুষ। তবে অঙ্গচ্ছেদের ধারণাটি জ্ঞাপন করে তুলনা ও মূল্যায়ন। অনেক মনোবিশ্লেষক আজকাল স্বীকার করেন যে অনেক মেয়ে শিশ্ন নেই ব'লে মনস্তাপে ভুগতে পারে, তবে

তারা বিশ্বাস করে না শিশ্নটি কেটে নেয়া হয়েছে তাদের শরীর থেকে; আবার এ-মনস্তাপও সকলের নয়। একটা সরল দেহসংস্থানগত তুলনা থেকে এর উৎপত্তি ঘটতে পারে না; আসলে বহু বালিকাই অনেক দেরিতে আবিষ্কার করে পুরুষের দেহসংগঠন। ছোটো ছেলে তার শিশ্ন দিয়ে অর্জন করে জীবন্ত অভিজ্ঞতা, এটা তার কাছে হয়ে ওঠে গর্বের বস্তু; তবে এ-গর্ব বোঝায় না যে তার বোনেরা এতে বোধ করে অপমান, কেননা তারা পুরুষাঙ্গটিকে চেনে শুধু তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে– এ-উপবৃদ্ধি, মাংসের এই ছোটো দণ্ডটি শুধু তাদের মনে জাগাতে পারে ঔদাসীন্য, এমনকি ঘেন্না। বালিকার লালসা, যখন থাকে, জন্ম নেয় পৌরুষের এক পূর্ববর্তী মল্যায়ন থেকে। ফ্রয়েড একে ধ'রে নিয়েছেন স্বতঃসিদ্ধ ব'লে। অন্যদিকে, ইলেক্ট্রাগূঢ়ৈষা ধারণাটি খুবই অস্পষ্ট, কেননা নারী লিবিডোর কোনো প্রাথমিক বর্ণনা দিয়ে এটাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি। এমনকি ছেলেদের মধ্যেও সুস্পষ্ট কোনো কামপ্রত্যঙ্গগত ইডিপাসগূঢ়ৈষা সাধারণ ঘটনা নয়; আর কিছু ব্যতিক্রম বাদে একথা বলা যায় না যে পিতাই হচ্ছে শিশুকন্যার কামোত্তেজনার উৎস। নারীকামের একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে যে ভগাঙ্কুরীয় সুখ সীমাবদ্ধ বিশেষ স্থানে; আর বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি সময়েই শুধু যোনীয় অনুভূতির সাথে শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিতে থাকে কয়েকটি কামোত্তেজক এলাকা। তাই দশ বছর বয়সের কন্যাকে পিতা চুমো খেলে ও আদর করলে তার ভেতর জেগে ওঠে ভগাঙ্কুরীয় সুখ, এটা হচ্ছে বাজে কথা। পিতার সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটি উদ্ভূত হয়েছে সমাজ থেকে, যা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন ফ্রয়েড।

অ্যাডলার বিতর্কে লিপ্ত হন ফ্রয়েডের সাথে, কেননা তিনি তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা দেখতে পান এখানে যে এটি মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করতে চায় শুধু কাম ভিত্তি ক'রে; তিনি মনে করেন কামকে সমন্বিত করতে হবে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের সাথে। ফ্রয়েডের কাছে মানুষের সমস্ত আচরণই তার কামনাবাসনার ফল– অর্থাৎ সুখান্বেষণের ফল– কিন্তু অ্যাডলারের কাছে মানুষের আছে কিছু লক্ষ্য; যৌন কামনার বদলে তিনি দেখতে পান অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা। তিনি বুদ্ধিমত্তাকে এতো বড়ো জায়গা দেন যে তাঁর চোখে কাম লাভ করে শুধু একটা প্রতীকী মূল্য। তাঁর মতে মানবনাট্যকে সংহত ক'রে আনা যায় তিনটি মৌল উপাদানে : প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে *ক্ষমতার ঈপ্সা*, যার সঙ্গে থাকে এক *হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষা*, এর ফলে যে-বিরোধ বাঁধে তাতে *বাস্তবতা থেকে পলায়নের* জন্যে ব্যক্তিটিকে প্রয়োগ করতে হয় হাজারো কূটচাল। নারীর মধ্যে হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষা এমন রূপ নেয় যে লজ্জায় সে প্রত্যাখ্যান করে তার নারীত্ব। শিশ্নের অভাবে ঘটে না এ-গূঢ়ৈষা, ঘটে নারীর সমগ্র পরিস্থিতির ফলে; বালিকা যদি শিশ্নের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে, তাহলে সে এটিকে ঈর্ষা করে বালকদের লাভ করা সুযোগসুবিধার প্রতীক হিশেবে। পরিবারে পিতা অধিকার ক'রে থাকে যে-স্থান, পুরুষদের সর্বজনীন আধিপত্য, তার নিজের শিক্ষা – সব কিছু তার মনে সৃষ্টি করে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের বোধ। পরে, সে যখন অংশ নেয় যৌন সম্পর্কে, সঙ্গমের আসনের মধ্যে সে দেখতে পায় এক নতুন অবমাননা যে নারী শোয় পুরুষের নিচে। সে প্রতিক্রিয়া জানায় 'পুরুষালি প্রতিবাদ'-এর সাহায্যে : হয়তো সে নিজেকেই পুরুষায়িত ক'রে তুলতে চায়, বা সে তার নারীসুলভ অস্ত্রগুলো দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে পুরুষের

বিরুদ্ধে। মাতৃত্বে সে তার সন্তানের মধ্যে পায় একটা কিছু, যা শিশ্নের সমতুল্য। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হ'লে ধ'রে নিতে হয় যে নারী হিশেবে সে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়েছে তার ভূমিকা; এবং স্বীকার ক'রে নিয়েছে নিজের নিকৃষ্টতা। পুরুষের তুলনায় সে অনেক গভীরভাবে নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত।

যে-তাত্ত্বিক ভিন্নতা পার্থক্য নির্দেশ করে অ্যাডলার ও ফ্রয়েডের মধ্যে, এখানে আমি সে-সম্পর্কে আর বিস্তৃত আলোচনায় যাবো না, তাঁদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভবপরতাগুলোও আলোচনা করবো না; তবে একথা বলা যেতে পারে যে যৌন কামনাভিত্তিক ব্যাখ্যা আর অভিপ্রায়ভিত্তিক ব্যাখ্যার কোনোটিই যথেষ্ট নয়, কেননা প্রতিটি কামনাই নির্দেশ করে কোনো অভিপ্রায়, কিন্তু কামনার মধ্য দিয়েই বোঝা সম্ভব অভিপ্রায়কে– তাই অ্যাডলারীয়বাদ ও ফ্রয়েডীয়বাদের একটা সমন্বয় সম্ভবত সম্ভব। সব মনোবিশ্লেষকই সাধারণভাবে গ্রহণ ক'রে থাকেন যে-স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাবটি, সেটি হচ্ছে : কিছু নির্ধারিত উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার সাহায্যেই ব্যাখ্যা করতে হবে মানবোপাখ্যান। এবং সব মনোবিশ্লেষকই নারীর জন্যে নির্দিষ্ট করেন একই ভাগ্য। তার নাটক রূপায়িত হয় তার 'পুরুষধর্মী' ও 'নারীসুলভ' প্রবণতার সংঘাতের মধ্য দিয়ে, প্রথমটি প্রকাশ পায় ভগাঙ্কুরীয় সংশ্রয়ে, দ্বিতীয়টি যোনীয় কামে। শৈশবে সে নিজেকে অভিন্ন ক'রে তোলে পিতার সঙ্গে; তারপর পুরুষের তুলনায় বোধ করে এক ধরনের হীনম্মন্যতা এবং মুখোমুখি হয় এক উভয়-সংকটের : তাকে জ্ঞাপন করতে হয় তার স্বাধীনতা এবং হয়ে উঠতে হয় পুরুষধর্মী; এটা তার হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষার সঙ্গে মিলেমিশে তার মধ্যে তৈরি করে মানসিক চাপ, ফলে দেখা দেয় বিকলন,– অথবা তাকে প্রণয়াকুল অধীনতার মধ্যে লাভ করতে হয় সুখী পরিপূর্ণতা। এ-সমাধান সহজ হয়ে ওঠে সার্বভৌম পিতার প্রতি তার ভালোবাসার ফলে। প্রেমিক বা স্বামীর মধ্যে সে খোঁজে পিতাকেই, তাই তার যৌন প্রেম মিলেমিশে যায় তার পরাধীন হওয়ার বাসনার সাথে। মাতৃত্বে সে লাভ করে এর ক্ষতিপূরণ, কেননা এটা তাকে দেয় এক নতুন ধরনের স্বাধীনতা। এ-নাটক যেনো ধারণ করে নিজের এক ধরনের শক্তি, এক ধরনের গতিশীলতা; প্রতিটি ও সমস্ত বিকৃতিসাধক ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা ধীরভাবে এগোয় নিজের যাত্রাপথে, এবং প্রতিটি নারী অক্রিয়ভাবে ভেসে যায় এর সাথে।

নিজেদের তত্ত্বের পক্ষে উপাত্তগত প্রমাণ পেতে মনোবিশ্লেষকদের সামান্যও কষ্ট হয় নি। আমরা জানি যে বহু কাল ধ'রে টলেমীয় পদ্ধতি অনুসারে গ্রহগুলোর অবস্থান ব্যাখ্যা করা গেছে সহজেই, শুধু ব্যাখ্যা করার জন্যে যখন-তখন কোনো-না-কোনো সূক্ষ্ম জটিলতা যোগ করতে হয়েছে; এবং ইডিপাস গূঢ়ৈষার ওপর আরেকটি বিপ্রতীপ ইডিপাস গূঢ়ৈষা চাপিয়ে দিয়ে, সব উদ্বেগের মধ্যে কামনা আরোপ ক'রে সে-সব তথ্যকে সমন্বিত করা হয়েছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে, যেগুলো সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করে তাঁর তত্ত্বের বৈধতার। সব মনোবিশ্লেষকই সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যাখ্যান করেন *বাছাই*-এর ধারণাটি এবং এর সাথে সম্পর্কিত মূল্যের ধারণাটি, এবং এখানেই নিহিত এ-সংশ্রয়ের সহজাত দুর্বলতা। অস্তিত্বশীলের স্বাধীন বাছাই থেকে বাধ্যবাধকতা ও নিষিদ্ধকরণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফ্রয়েড তাদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হন– তিনি সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে গণ্য করেন। তিনি মূল্যের ধারণাটির বিকল্পে চেষ্টা

করেছেন কর্তৃত্বের ধারণাটি গ্রহণ করতে; তবে তিনি *মোজেস অ্যান্ড মনোথিজম*-এ স্বীকার করেছেন যে কর্তৃত্বের ব্যাপারটির কোনো ব্যাখ্যা তাঁর নেই। অজাচার, উদাহরণস্বরূপ, নিষিদ্ধ, কেননা পিতা একে নিষিদ্ধ করেছেন– কিন্তু তিনি কেনো একে নিষিদ্ধ করলেন? এটা এক রহস্য। সুপার ইগো আত্মস্থ ক'রে নেয় এক স্বেচ্ছাচারী স্বৈরাচার থেকে উদ্ভূত বিধান ও নিষেধ, এবং সেখানে আছে প্রবৃত্তিগত প্রেষণাগুলো, কেনো আছে তা অবশ্য আমরা জানি না : এ-বাস্তবতা দুটি সম্পর্কহীন, কেননা নৈতিকতাকে মনে করা হয় কামের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব'লে। মানুষের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি থেকে সমাজে ঢোকার কোনো পথ নেই; তাদের মিলন ঘটানোর জন্যে ফ্রয়েড বাধ্য হয়েছিলেন কিছু অদ্ভুত গল্প বানাতে, যেমন বানিয়েছেন তিনি *টোটেম ও ট্যাবু*তে। অ্যাডলার স্পষ্ট দেখেছেন যে শুধু সামাজিক পরিস্থিতিতে খোজাগূঢ়ৈষা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; তিনি মূল্যায়নের সমস্যার মধ্যে খুঁজেছিলেন এর সমাধান, কিন্তু তিনি সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধের উৎস খোঁজেন নি ব্যক্তির মাঝে, যার ফলে তিনি ভুল করেন কামের গুরুত্ব বিচারে।

জীবনে কাম নিশ্চিতভাবেই পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; বলা যেতে পারে কাম থাকে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত ক'রে। শরীরবিজ্ঞান থেকে আমরা জেনেছি যে অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয়ের সক্রিয়তা সাধারণভাবে সমন্বিত হয় শরীরের সক্রিয়তার সাথে। মানুষ কামজ, মানুষ এক যৌন শরীর, এবং অন্যান্য মানুষ, যারা নিজেরাও যৌন শরীর, এর পরিণতিরূপে তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কে সব সময়ই জড়িয়ে থাকে কাম। কিন্তু শরীর ও কাম যদি হয় অস্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ, তাহলে অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত ক'রেই আবিষ্কার করা যেতে পারে এদের তাৎপর্য। এ-পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে মনোবিশ্লেষণ অব্যাখ্যাত সত্যকে গ্রহণ করে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে। উদাহরণস্বরূপ, বলা হয় যে পাছার কাপড় তুলে উবু হয়ে ব'সে প্রস্রাব করতে বালিকা লজ্জা পায়– কিন্তু কোথা থেকে আসে এ-লজ্জা? এবং পুরুষ তার শিশ্নের জন্যে গর্বিত কি না বা তার গর্ব শিশ্নে প্রকাশিত হয় কি না, এ-প্রশ্ন করার আগে জেনে নেয়া দরকার যে গর্ব কী এবং কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা কীভাবে মূর্ত হ'তে পারে কোনো বস্তুতে। মনোবিশ্লেষকেরা মনে করেন মানুষ সম্বন্ধে প্রধান সত্য হচ্ছে তার নিজের শরীর এবং তার গোষ্ঠির সহবাসীদের শরীরের সাথে তার সম্পর্ক; কিন্তু যে-প্রাকৃতিক বিশ্ব তাকে ঘিরে আছে, তার বস্তুরাশির প্রতি মানুষের রয়েছে এক আদিম ঔৎসুক্য এবং তাকে সে আবিষ্কার করতে চায় কাজে, খেলায়, এবং 'গতিময় কল্পনা'র সমস্ত অভিজ্ঞতায়। মানুষ বস্তুগতভাবে একাত্ম হ'তে চায় সম্পূর্ণ বিশ্বের সাথে, তাকে বুঝতে চায় সব দিকে। মাটি কেটে বাঁধ বাঁধা, গর্ত খোঁড়া প্রভৃতি আলিঙ্গন, সঙ্গমের মতোই মৌলিক কাজ; এবং তাঁরা প্রতারিত করেন নিজেদের যাঁরা এগুলোতে যৌন প্রতীক ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না। গর্ত, নরম পিচ্ছিল কাদা, গভীর ক্ষত, কাঠিন্য, শুদ্ধতা প্রভৃতি হচ্ছে প্রধান বাস্তবতা; এবং এগুলোর প্রতি মানুষের যে-আগ্রহ, তা লিবিডোর আদেশে ঘটে না। শুদ্ধতা নারীর কুমারীত্বের প্রতীক ব'লে পুরুষ শুদ্ধতার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না; বরং শুদ্ধতার প্রতি তার অনুরাগের ফলেই সে মূল্যবান মনে করে কুমারীত্বকে। কাজ, যুদ্ধ, খেলা, শিল্পকলা নির্দেশ করে বিশ্বের সাথে জড়িত হওয়ার উপায়, যাকে

অন্য কিছুতে পর্যবসিত করা সম্ভব নয়; এগুলো প্রকাশ করে সে-সব গুণ, যেগুলো সংঘর্ষে আসে যৌনতার প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যের সাথে। যুগপৎ ওগুলোর আলোকে ও এসব যৌন অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রতিটি ব্যক্তি প্রয়োগ করে তার বাছাই করার ক্ষমতা। তবে শুধু অস্তিত্বের স্বরূপবিষয়ক একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ, সত্তাসম্পর্কিত একটি সাধারণ বোধ, আমাদের সাহায্য করে এ-বাছাইয়ের ঐক্য পুনরুদ্ধার করতে।

এ-বাছাইয়ের ধারণাটিকেই, বস্তুত, মনোবিশ্লেষণ প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাখ্যান করে নিয়ন্ত্রণবাদ ও 'যৌথ অচৈতন্য'-এর নামে; এবং ধারণা করা হয় যে এ-অচৈত্যনই মানুষকে সরবরাহ করে প্রাকগঠিত চিত্রকল্প ও একটা সর্বজনীন প্রতীক। এভাবেই এটা ব্যাখ্যা করে স্বপ্নের, উদ্দেশ্যহীন কার্যকলাপের, চিত্তবৈকল্যজাত স্বপ্নাবিভাবের, রূপকের, এবং মানুষের নিয়তির পর্যবেক্ষিত সাদৃশ্যগুলো। 'শরীরসংস্থানই নিয়তি', বলেছেন ফ্রয়েড; আর এ-পদটিকেই প্রতিধ্বনিত করে মারলিউ-পোন্তির এ-পদটি : 'শরীর হচ্ছে সাধারণত্ব।'

প্রতীক স্বর্গ থেকে নেমে আসে নি আবার রসাতলের গভীরতা থেকেও উঠে আসে নি– একে, ভাষার মতোই, বিশদভাবে নির্মাণ করা হয়েছে মানুষের সে-বাস্তবতা দ্বারা যা যুগপৎ *মিটজাইন* ও বিচ্ছিন্নতা; এবং এটাই ব্যাখ্যা করে কেনো ব্যক্তিক উদ্ভাবনেরও একটি স্থান আছে, যা মতবাদের কথা বিবেচনা না ক'রে বাস্তবিকভাবে মেনে নিতে হয় মনোবিশ্লেষণকে। শিশ্নের ওপর যে-ব্যাপক মূল্য আরোপ করা হয়েছে, আমাদের পরিপ্রেক্ষিত সাহায্য করে সেটা বুঝতে। অস্তিত্বের একটি সত্য থেকে প্রস্থান না ক'রে এটা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব : সেটি হচ্ছে *বিচ্ছিন্নতার* প্রতি বিষয়ীর প্রবণতা। তার স্বাধীনতা তার মধ্যে সঞ্চার করে যে-উদ্বেগ, তা তাকে পরিচালিত করে বস্তুর মধ্যে নিজেকে খুঁজে দেখতে; এটা নিজের থেকে এক ধরনের পলায়ন। এ-প্রবণতা এতো মৌলিক যে মায়ের দুধ ছাড়ার সাথেসাথেই, যখন সে পৃথক হয়ে যায় অখণ্ড থেকে, শিশু বাধ্য হয় নিজের বিচ্ছিন্ন সত্তাকে দর্পণে এবং পিতামাতার দৃষ্টিপাতের মধ্যে দেখতে। আদিম মানুষেরা বিচ্ছিন্নতা বোধ করে মানায়, টোটেমে; সভ্য মানুষেরা তাদের স্বতন্ত্র আত্মায়, তাদের অহংয়ে, তাদের নামে, তাদের সম্পত্তিতে, তাদের কাজে। শিশুর বেলা শিশ্ন নিজের অবিকল নকল হিশেবে কাজ করতে সমর্থ– এটা তার কাছে একই সঙ্গে এক পৃথক জিনিশ ও সে নিজে; এটা একটি খেলনা, একটি পুতুল, এবং তার নিজের মাংস; আত্মীয়রা আর সেবিকারা এটির প্রতি এমন আচরণ করে যে মনে হয় এটি এক ছোট্ট মানুষ। তাই দেখা সহজ কীভাবে এটি শিশুর জন্যে হয়ে ওঠে 'একটি *বিকল্প সত্তা* সাধারণত বেশি চতুর, বেশি বুদ্ধিমান, এবং বেশি ধূর্ত' (এলিস বার্লি, *লা ভি এঁতিম দ্য ল'আঁফাঁ : শিশুর অন্তরঙ্গ জীবন*, পৃ ১০১)। শিশ্নধারী শিশ্নকে একই সাথে গণ্য করে নিজেকে ব'লে এবং অন্য কেউ ব'লে, কেননা প্রস্রাব ও পরে শিশ্নের দাঁড়ানোর ব্যাপারগুলো স্বেচ্ছাকৃত ও অস্বেচ্ছাকৃত কর্মের মাঝামাঝি প্রক্রিয়া, এবং যেহেতু এটিকে মনে হয় চপল এবং আনন্দের এক বাহ্যিক উৎস ব'লে। ব্যক্তির বিশেষ সীমাতিক্রমণতা মূর্ত হয় শিশ্নে এবং এটা গর্বের এক উৎস। শিশ্নকে এভাবে পৃথক ক'রে রেখে পুরুষ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাথে সমন্বিত করতে পারে এটির থেকে উৎসারিত জীবনকে। এটা দেখা সহজ যে শিশ্নের

দৈর্ঘ্য, প্রস্রাবের বেগ, দাঁড়ানোর ও বীর্যপাতের শক্তি শিশ্নধারীর কাছে হয়ে ওঠে তার নিজের যোগ্যতার মানদণ্ড।

এভাবে শিশ্নের মধ্যে সীমাতিক্রমণতা মূর্ত হয়ে ওঠা একটি ধ্রুবক; এবং নিজের সীমাতিক্রমণতা অনুভব করার জন্যে শিশুর কাছেও এটা যেহেতু একটি ধ্রুবক– যার সীমাতিক্রমণতা খর্ব করে পিতা– তাই আমরা ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করি 'খোজাগূঢ়ৈষা' নামের ফ্রয়েডীয় ধারণাটিকে। কোনো *বিকল্প সত্তা নেই* ব'লে বালিকা কোনো বস্তুতে বোধ করে না বিচ্ছিন্নতা এবং সে তার সংহতি পুনরুদ্ধার করতে পারে না। এজন্যে সে তার সমস্ত সত্তাকে পরিণত করে একটি বস্তুতে, নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করে অপর রূপে। সে বালকের সাথে তুলনার যোগ্য কি অযোগ্য, তা সে জানুক বা না জানুক, সেটা গৌণ; গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যদি সে তা নাও জানে, তবু শিশ্নের অভাব তাকে বাধা দেয় নিজেকে একটি যৌনসত্তা হিশেবে ভাবতে। এর পরিণাম অনেক। কিন্তু যে-ধ্রুবকগুলোর কথা আমি বলেছি, এজন্যে সেগুলো কোনো চিরস্থির নিয়তি প্রতিষ্ঠা করে না– শিশ্ন যে এতো মহিমা ধারণ করে, তার কারণ হচ্ছে এটি হয়ে ওঠে অন্যান্য এলাকায় প্রয়োগ করা আধিপত্যের প্রতীক। নারী যদি নিজেকে কর্তা হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো, তাহলে সেও উদ্ভাবন করতো শিশ্নের সমতুল্য কিছু; আসলে, পুতুল, যা হচ্ছে ভবিষ্যতে যে শিশু আসবে, সে-প্রতিশ্রুতির প্রতিমূর্তি, তাও হয়ে উঠতে পারে শিশ্নের থেকে বেশি মূল্যবান সম্পদ। সত্য হচ্ছে শুধু মোট পরিস্থিতির ফলেই একটি দেহগত সুবিধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি সত্যিকার মানবিক সুবিধা। মনোবিশ্লেষণ তার সত্যগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শুধু ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে।

সে একটি নারী, একথা ব'লে নারীকে যতোটা সংজ্ঞায়িত করা যায়, তার থেকে নিজের নারীত্ব সম্পর্কে নারীর চেতনা দিয়ে নারীকে বেশি সন্তোষজনকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, কেননা সে এ-চেতনা অর্জন করে নিজের সমাজের পরিস্থিতি থেকে, যে-সমাজের সে একজন সদস্য। অবচেতনা ও সম্পূর্ণ মনোজীবনকে আত্মস্থ ক'রে মনোবিশ্লেষণের বিশেষ ভাষাই নির্দেশ করে যে ব্যক্তির নাটকটি উন্মোচিত হয় তারই ভেতরে– *গূঢ়ৈষা, প্রবণতা* প্রভৃতি শব্দ এ-ই জ্ঞাপন করে। কিন্তু জীবন হচ্ছে বিশ্বের সাথে একটি সম্পর্ক, এবং প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে চারপাশের বিশ্বে নিজের বাছবিচার দিয়ে। আমরা যে-সব প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত, সেগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্যে তাই আমাদের তাকাতে হবে বিশ্বের দিকে। মনোবিশ্লেষণ বিশেষভাবে ব্যর্থ নারী কেনো অপর, তা ব্যাখ্যা করতে। কেননা ফ্রয়েড নিজেই স্বীকার করেছেন যে শিশ্নের মর্যাদা ব্যাখ্যা করা হয় পিতার সার্বভৌমত্ব দিয়ে, এবং, আমরা দেখেছি, তিনি স্বীকার করেছেন পুংলিঙ্গের আধিপত্যের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ।

সুতরাং আমরা মনোবিশ্লেষণপদ্ধতিকে মেনে নিতে অস্বীকার করি, তবে এ-বিজ্ঞানের সব অবদান আমরা অস্বীকার করি না, বা অস্বীকার করি না এর কিছু অন্তর্দৃষ্টির উর্বরতাকে। প্রথমে, কামকে বিদ্যমান কিছু ব'লে গণ্য ক'রে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ করতে চাই না। এ-দৃষ্টিভঙ্গির দারিদ্র্য ধরা পড়ে নারীলিবিডো বর্ণনায়; আমি আগেই বলেছি মনোবিশ্লেষকেরা একে কখনো সরাসরি বিচার করেন নি, শুধু পুরুষ লিবিডো থেকে একটু স'রে এসে বর্ণনা করেছেন একে। 'অক্রিয়

লিবিডো'র ধারণাটি বিভ্রান্তিকর, কেননা পুরুষ ভিত্তি ক'রে লিবিডোর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে একটি প্রেষণা, একটি শক্তি হিশেবে। আমরা বাস্তবতাকে আরো বেশি ক'রে ধারণ করতে পারবো যদি লিবিডোকে 'শক্তি'র মতো অস্বচ্ছ শব্দ দিয়ে সংজ্ঞায়িত না ক'রে কামের তাৎপর্যকে সম্পর্কিত করি মানুষের অন্যান্য প্রবণতা– নেয়া, ধরা, খাওয়া, তৈরি করা, আনুগত্য স্বীকার করা প্রভৃতির সাথে। কামসামগ্রিগুলোর গুণাবলি শুধু সঙ্গমের সময় নয়, সাধারণভাবেও বিচার করা আমাদের দায়িত্ব। এমন অনুসন্ধান ছাড়িয়ে যাবে মনোবিশ্লেষণের কাঠামো, যার বিবেচনায় কাম অপর্যবসেয়।

উপরন্তু, নারীনিয়তির সমস্যাটি আমি তুলবো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে : আমি নারীকে স্থাপন করবো এক মূল্যবোধের বিশ্বে, এবং তার আচরণকে দেবো এক স্বাধীনতার মাত্রা। আমি বিশ্বাস করি নিজের সীমাতিক্রমণতা জ্ঞাপন ও বস্তু হিশেবে তার বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে কোনটিকে নিতে হবে, তা বাছাই করার শক্তি তার আছে; সে পরস্পবিরোধী উদ্যমের খেলার পুতুল নয়; সে নৈতিক মানদণ্ডে সমাধান করে বিচিত্র মূলবোধের সমস্যা। মূল্যবোধের বদলে আধিপত্যকে, বাছাইয়ের বদলে উদ্যমকে গ্রহণ ক'রে মনোবিশ্লেষণ উপহার দিয়েছে এক *এরসাৎজ*– নৈতিকতার এক বিকল্প– স্বাভাবিকতার ধারণা। এ-ধারণা বিশেষ কার্যকর চিকিৎসাবিদ্যায়, কিন্তু মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক উদ্বেগজাগানো মাত্রায় এটি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বর্ণনামূলক ছককে প্রস্তাব করা হচ্ছে সূত্ররূপে; এবং এটা সুনিশ্চিত যে একটি যান্ত্রিকতাবাদী মনোবিজ্ঞান স্বীকার ক'রে নিতে পারে না নৈতিক উদ্ভাবনের ধারণাকে; কড়াকড়ির মধ্যে এটা বিবরণ দিতে পারে শুধু *কম*-এর এবং কখনোই বিবরণ দিতে পারে না *বেশি*র; কড়াকড়ির মধ্যে এটা স্বীকার করতে পারে শুধু নিয়ন্ত্রণকে, কখনোই স্বীকার ক'রে নিতে পারে না সৃষ্টিকে। যদি কোনো বিষয়ী তার সমগ্রতার মধ্যে সে-বিকাশ দেখাতে না পারে, যাকে গণ্য করা হয় স্বাভাবিক ব'লে, তাহলে বলা হবে যে তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেছে, এবং এ-রুদ্ধতাকে ব্যাখ্যা করা হবে একটি ন্যূনতারূপে, একটি নেতিরূপে, কখনোই একে ইতিবাচক সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করা হবে না। এটাই, আরো বহু কিছুর সঙ্গে, মহাপুরুষদের মনোবিশ্লেষণকে ক'রে তোলে মর্মান্তিক : আমাদের বলা হয় যে এই-এই সংক্রম, এই-ওই উদ্গতি তাঁদের মধ্যে সংঘটিত হয় নি; জ্ঞাপন করা হয় না যে হয়তো নিজেদের জন্যে যথাযথ কারণবশত তাঁরা এ-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে রাজি হন নি। তাই মনোবিশ্লেষকেরা কখনোই একটি অসত্য চিত্রের বেশি কিছু দেন না; এবং অসত্যের জন্যে স্বাভাবিকতা ছাড়া আর কোনো মানদণ্ড পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নারীনিয়তি সম্পর্কে তাঁদের বিবৃতি এর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। মনোবিশ্লেষকেরা যে-অর্থে বুঝে থাকেন পরিভাষাটি, এক কাঠামোতে মাতা বা পিতার সাথে 'নিজেকে অভিন্ন বোধ করা' হচ্ছে *নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা*, এটা হচ্ছে কারো নিজের অস্তিত্বের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশের থেকে বাইরের কোনো মূর্তিকে বেশি পছন্দ করা, এটা হচ্ছে সত্তা সত্তা খেলা। আমাদের কাছে নারীদের দেখানো হয় দু-ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ দ্বারা প্ররোচিতরূপে। স্পষ্টত পুরুষ পুরুষ খেলা নারীর জন্যে হবে এক হতাশার উৎস; তবে নারী নারী খেলাও এক মতিবিভ্রম : নারী হওয়ার অর্থ বস্তু হওয়া, *অপর* হওয়া– এ-সত্ত্বেও তার হালছাড়া ভাবের মধ্যেও অপর থেকে যায় কর্তা।

নারীর জন্যে সত্যিকার সমস্যা হচ্ছে বাস্তবতা থেকে এসব পলায়নকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সীমাতিক্রমণতার মধ্যে আত্মসিদ্ধি খোঁজা। তাই যা করতে হবে, তা হচ্ছে দেখতে হবে যাকে বলা হয় পুরুষসুলভ ও মেয়েলি প্রবণতা, তার ভেতর দিয়ে তার জন্যে খোলা আছে কী কী পথ। এমনকি অ্যাডলারও মনে করেন ক্ষমতা লাভের ঈপ্সা একটা উদ্ভট ধরনের শক্তি; সীমাতিক্রমণতার সবগুলো পরিকল্পনাকে তিনি বলেন 'পুরুষসুলভ প্রতিবাদ'। যখন কোনো বালিকা গাছে চড়ে, অ্যাডলারের মতে সে দেখাতে চায় যে সে বালকদের সমকক্ষ; এটা তাঁর মনে পড়ে না যে বালিকাটি গাছে চড়তে পছন্দ করে। মায়ের কাছে তার শিশু 'শিশ্নের সমতুল্য কিছু'র থেকে ভিন্ন জিনিশ। ছবি আঁকা, লেখা, রাজনীতি করা– এগুলো হচ্ছে নিতান্তই 'উদ্গাতি'; আমরা মনে করি এসব কাজ করা হয় এসব কাজ করার জন্যেই। এটা অস্বীকার করা হচ্ছে মানবিক সব ইতিহাসের অসত্যীকরণ।

পাঠক এ-বিবরণ ও মনোবিশ্লেষকদের বিবরণের মধ্যে এক ধরনের সমান্তরলতা লক্ষ্য করবেন। সত্য হচ্ছে যে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে– পুরুষ ও নারী মনোবিশ্লেষকেরা উভয় শ্রেণীই যা গ্রহণ করেছেন– বিচ্ছিন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণকে গণ্য করা হয় নারীধর্মী ব'লে, আর বিষয়ী যে-আচরণের সাহায্যে জ্ঞাপন করে তার সীমাতিক্রমণতা, তাকে গণ্য করা হয় পুরুষধর্মী ব'লে। ডোনাল্ডসন, নারীর এক ঐতিহাসিক, মন্তব্য করেছেন যে : 'পুরুষ হচ্ছে একজন পুংলিঙ্গ মানুষ, নারী হচ্ছে একজন স্ত্রীলিঙ্গ মানুষ', এ-সংজ্ঞাগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে বিষমরূপে; এবং বিশেষভাবে মনোবিশ্লেষকদের মধ্যেই পুরুষকে সংজ্ঞায়িত করা হয় একজন মানুষ হিশেবে এবং নারীকে স্ত্রীলিঙ্গ হিশেবে– যখনই সে মানুষরূপে আচরণ করে তখনই বলা হয় যে সে পুরুষের অনুকরণ করছে। আমাদের কাছে নারী হচ্ছে এমন একজন মানুষ, যে মূল্যবোধের বিশ্বে খুঁজছে মূল্যবোধ, এবং এ-বিশ্বটির আর্থ ও সামাজিক সংগঠন জানা অত্যাবশ্যক। আমরা নারীর সমগ্র পরিস্থিতির ওপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে নারীকে বিচার করবো অস্তিত্ববাদী পরিপ্রেক্ষিতে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বটি প্রকাশ করেছে কিছু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সত্য। মানুষ কোনো পশুপ্রজাতি নয়, এটি এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। মানব সমাজ এক অর্থে প্রকৃতির বিরোধী; এটা অক্রিয়ভাবে প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করে না, বরং নিজের পক্ষে হাতে তুলে নেয় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ। এ-দখলকর্মটি অন্তর্গত, মন্ময় কাজ নয়; বাস্তব কাজের ভেতর দিয়ে বস্তুগতভাবে এটা সম্পন্ন করা হয়।

তাই নারীকে শুধু একটি লৈঙ্গিক প্রাণী হিশেবে বিবেচনা করা যেতে পারে না, কেননা জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সেগুলোরই রয়েছে গুরুত্ব, যেগুলো কর্মকাণ্ডে পরিগ্রহ করে বাস্তব মূল্য। নারীর আত্মচেতনাকে শুধুই তার কাম দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায় না : এটা প্রতিফলিত করে এমন এক পরিস্থিতি, যা নির্ভরশীল সমাজের আর্থনীতিক সংগঠনের ওপর, যেটা আবার নির্দেশ করে মানবমণ্ডলি অর্জন করেছে প্রযুক্তিগত বিবর্তনের কোন পর্যায়। আমরা দেখেছি জৈবিকভাবে নারীর দুটি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : বিশ্বে তার আয়ত্তি পুরুষের থেকে কম বিস্তৃত, এবং সে তার প্রজাতির কাছে অধিকতর দাসত্বে বন্দী।

কিন্তু আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে এসব সত্য ধারণ করে বেশ ভিন্ন মূল্য। মানুষের ইতিহাসে বিশ্বের ওপর অধিকার কখনোই নগ্ন শরীর দিয়ে সংজ্ঞায়িত হয় নি : হাত, তার বিরোধসমর্থ বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে, হয়ে ওঠে হাতিয়ারের পূর্বরূপ, যা বৃদ্ধি করে ক্ষমতা; প্রাক-ইতিহাসের অতিপ্রাচীন দলিলেও মানুষকে দেখা যায় সশস্ত্ররূপে। যখন ভারি লাঠি উঁচিয়ে ধ'রে দূরে রাখা হতো বন্যপশুদের, তখনও নারীর শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতো সুস্পষ্ট নিকৃষ্টতারূপে : যদি হাতিয়ারটি ব্যবহারের জন্যে দরকার হতো একটু বেশি শক্তি, তাহলে এটাই দেখিয়ে দিতো সে শোচনীয়ভাবে শক্তিহীন। তবে কৌশল হয়তো লোপ ক'রে দিতো পুরুষ ও নারীর পেশিগত অসাম্য : বিশেষ প্রয়োজনেই উৎকৃষ্টতার অভাব পূরণ করা হয় প্রাচুর্য দিয়ে, এবং খুব বেশি থাকা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার থেকে ভালো নয়। তাই আধুনিক অনেক যন্ত্র চালানোর জন্যে দরকার পড়ে পেশিশক্তির অতিসামান্য অংশ; এবং যা ন্যূনতম দরকার, তা যদি নারীর সামর্থ্যের থেকে বেশি না হয়, তাহলে সে হয়ে ওঠে, এ-কাজের ক্ষেত্রে, পুরুষের সমান। আজ অবশ্য একটি বোতাম টিপেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বিপুল শক্তি। বিভিন্ন দেশের প্রথানুসারে মাতৃত্বের ভার এখন ধারণ করে বিভিন্ন রকম গুরুত্ব : এটা দুমড়েমুচড়ে যাওয়ার মতো হয় যদি নারীটি বাধ্য হয় ঘনঘন

গর্ভধারণে ও কারো সাহায্য ছাড়াই সন্তান লালনপালনে; কিন্তু সে যদি স্বেচ্ছায় সন্তান ধারণ করে এবং গর্ভধারণের কালে যদি সমাজ এগিয়ে আসে তার সাহায্যে ও উদ্যোগী থাকে সন্তানের কল্যাণের ব্যাপারে, তাহলে মাতৃত্বের ভার হয় লঘু এবং কাজের অবস্থাগুলোর সুবিধামতো বিন্যাস ক'রে পুষিয়ে নেয়া যায়।

এ-পরিপ্রেক্ষিতেই এঙ্গেলস নারীর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে*, এবং দেখিয়েছেন যে এ-ইতিহাস প্রধানত নির্ভর করেছে কৌশলের ওপর। প্রস্তর যুগে, যখন যৌথভাবে জমির মালিক ছিলো গোত্রের সমস্ত সদস্য, আদিম কোদাল ও নিড়ানির অবিকশিত অবস্থার জন্যেই কৃষির সম্ভাবনা ছিলো সীমিত, তাই নারীর শক্তি ছিলো উদ্যানপালনের উপযুক্ত। আদিম এ-শ্রমবিভাজনে দুটি লিঙ্গ গ'ড়ে তুলেছিলো দুটি শ্রেণী, এবং এ-দুটি শ্রেণীর মধ্যে ছিলো সাম্য। পুরুষ যখন শিকার করে ও মাছ ধরে, নারী তখন থাকে বাড়িতে; তবে গৃহস্থালির কাজের মধ্যেও থাকে উৎপাদনশীল শ্রম– হাঁড়িপাতিল তৈরি, তাঁত বোনা, বাগান করা– এবং ফলত আর্থনীতিক জীবনে নারী পালন করে বৃহত্তর ভূমিকা। তামা, টিন, ব্রোঞ্জ, ও লোহা আবিষ্কার ও লাঙলের উদ্ভবের ফলে কৃষিকর্মের সীমা বৃদ্ধি পায়, এবং বনপরিষ্কার ও জমি চাষের জন্যে দরকার হয়ে পড়ে নিরবচ্ছিন্ন শ্রম। তখন পুরুষ আদায় ক'রে নেয় অন্য পুরুষের শ্রম, যাদের সে পরিণত করে দাসে। দেখা দেয় ব্যক্তিগত মালিকানা : দাসের ও জমির প্রভু, পুরুষ হয়ে ওঠে নারীরও মালিক। এটা ছিলো 'নারীজাতির ঐতিহাসিক মহাপরাজয়'। নতুন হাতিয়ার আবিষ্কারের ফলে পুরোনো শ্রমবিভাজন বিপর্যস্ত ক'রে এটা ঘটে। 'সে-একই কারণ, যা নারীকে দেয় গৃহের কর্তৃত্ব– যেমন, গৃহস্থালিতে তার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া– সেই একই কারণ পুরুষকে দেয় আধিপত্য; কেননা এর পর নারীর গৃহস্থালির কাজ পুরুষের উৎপাদনশীল কাজের পাশে হয়ে ওঠে তুচ্ছ– পরেরটি হয় সব কিছু, আগেরটি হয়ে ওঠে তুচ্ছরূপে গৌণ।' তখন মাতৃ-কর্তৃত্ব নিজের অধিকার তুলে দেয় পিতৃ-কর্তৃত্বের কাছে, কেননা পিতার কাছে থেকে পুত্র পেতে থাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার; আগের মতো আর নারীর কাছে থেকে তার গোত্র পায় না সম্পত্তির উত্তরাধিকার। এখানেই আমরা দেখতে পাই সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তি ক'রে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উদ্ভব। এ-ধরনের পরিবারে নারী হয় পরাভূত। নিজের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পুরুষ, আরো অনেক কিছুর সাথে, নিজেকে লিপ্ত করে কামলীলায়– সে সঙ্গম করতে থাকে দাসীর বা বারবনিতার সাথে বা করতে থাকে বহুবিবাহ। যেখানে সম্ভব হয়, স্ত্রীরা প্রতিশোধ নিতে থাকে অসতীত্বের মধ্য দিয়ে– বিয়ে তার স্বাভাবিক সার্থকতা লাভ করে ব্যভিচারে। যে-গার্হস্থ্য দাসীত্বে বন্দী নারী, তার বিরুদ্ধে এটাই তার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়; এবং এ-আর্থনীতিক পীড়ন থেকেই উদ্ভূত হয় সামাজিক পীড়ন, যা ভোগ করতে হয় তাকে। যে-পর্যন্ত না এই দু-লিঙ্গ আইনে সমান অধিকার পাবে, সে-পর্যন্ত সাম্য পুনপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না; কিন্তু এ-সমানাধিকারের জন্যে দরকার সাধারণ শ্রমে নারীর অংশগ্রহণ। 'তখনই শুধু নারীর মুক্তি ঘটতে পারে, যখন সে বৃহৎ সামাজিক মাত্রায় অংশ নিতে পারবে উৎপাদনে এবং গৃহস্থালির কাজে অংশ নেবে খুবই কম মাত্রায়। এবং এটা সম্ভব হয়েছে শুধু আধুনিক কালের বৃহৎ শিল্পে, যেটা শুধু

ব্যাপক হারে নারীশ্রম কাজেই লাগায় না, বরং এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে চায়...'

তাই নারীর নিয়তি ও সমাজতন্ত্রের নিয়তি পরস্পরের সাথে গভীরভাবে বাঁধা, যা বেবেলের নারী সম্পর্কিত মহাগ্রন্থেও দেখানো হয়েছে। 'নারী ও সর্বহারা,' তিনি বলেন, 'উভয়ই উৎপীড়িত।' উভয়কেই মুক্ত করতে হবে আর্থনীতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে, যা ঘটবে শিল্পযন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সংঘটিত সামাজিক অভ্যুত্থানের ফলে। নারীর সমস্যাকে পরিণত করা হয়েছে শ্রমে তার সামর্থ্যের সমস্যার পর্যায়ে। যখন কৌশল ছিলো তার সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন প্রভাবশালী থেকে, যখন সে তা ব্যবহার করতে পারে নি তখন সিংহাসনচ্যুত হয়ে, আধুনিক কালে নারী পুনরুদ্ধার করে পুরুষের সাথে তার সাম্য। প্রাচীন পুঁজিবাদী পিতৃসুলভ শাসনের প্রতিরোধের ফলে অনেক দেশেই এ-সাম্য বাস্তবায়িত হ'তে পারছে না; যখন এ-প্রতিরোধ ভেঙে পড়বে, তখন এটা বাস্তবায়িত হবে, সোভিয়েত প্রচার অনুসারে যা ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এবং যখন সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তখন আর কেউ পুরুষ বা নারী থাকবে না, সবাই হবে সমান মর্যাদার শ্রমিক।

এঙ্গেলস যে-চিন্তাধারার রূপরেখা তৈরি করেছেন, তা যদিও আমাদের আলোচিত চিন্তাধারাগুলো থেকে নির্দেশ করে অগ্রগতি, তবু এটা আমাদের হতাশ করে– সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোকেই এখানে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। সব ইতিহাসের বাঁক নেয়ার বিন্দু হচ্ছে গোষ্ঠিগত মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণের পথটুকু, এটা কীভাবে ঘটেছে তা এতে কোনোভাবেই নির্দেশ করা হয় নি। এঙ্গেলস নিজে *পরিবারের উদ্ভব*-এ ঘোষণা করেছেন যে 'বর্তমানে আমরা এ-সম্বন্ধে কিছুই জানি না'; ঐতিহাসিক বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে তিনি শুধু অজ্ঞই নন, এমনকি তিনি কোনো ব্যাখ্যাও দেন নি। একইভাবে, এটাও স্পষ্ট নয় যে ব্যক্তিগত মালিকানাই অবধারিতভাবে নারীদের বন্দী করেছে দাসত্বে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এমন সব ঘটনাকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মেনে নিয়েছে যেগুলোর ব্যাখ্যা দরকার : এঙ্গেলস আলোচনা না ক'রেই ধ'রে নিয়েছেন যে স্বার্থের বন্ধনই পুরুষকে গ্রথিত করে সম্পত্তির সাথে; কিন্তু এ-স্বার্থ, যা সামাজিক সংস্থাসমূহের উৎস, তার উৎস কোথায়? তাই এঙ্গেলসের বিবরণ অগভীর, এবং যে-সব সত্য তিনি প্রকাশ করেছেন, সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাচক্রজাত, আকস্মিক। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সীমা পেরিয়ে না গিয়ে আমরা ওগুলোর অর্থ নির্ণয় করতে পারি না। আমরা যে-সব সমস্যা তুলেছি, এটা সেগুলোর সমাধান দিতে পারে না, কেননা এগুলোর বিষয় সম্পূর্ণ মানুষ, শুধু সে-বিমূর্তকরণ : *হোমো ওএকোনোমিকাস* নয়।

উদাহরণস্বরূপ, এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাটি বোধগম্য হ'তে পারে শুধু অস্তিত্বশীলের আদি অবস্থার প্রসঙ্গে। কেননা এটা বোঝা যায় যে প্রথমে এমন একটা অবস্থা ঘটেছিলো, যখন অস্তিত্বশীল নিজের অস্তিত্বের স্বায়ত্তশাসন ও পার্থক্য ঘোষণার জন্যে নিজেকে মনে করেছিলো একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা। এ-ঘোষণা থেকে গিয়েছিলো মন্ময়, অন্তর্গত, বৈধতাহীন, যতো দিন তার এটা বস্তুগতভাবে বাস্তবায়নের কৌশলগত উপায় ছিলো না। উপযুক্ত হাতিয়ার ছাড়া বিশ্বের ওপর সে নিজের কোনো ক্ষমতা বোধ করে নি, প্রকৃতিতে ও নিজের গোত্রে লুপ্ত অবস্থায় সে নিজেকে বোধ

করেছে অক্রিয়, সন্ত্রস্ত, অবোধ্য শক্তিরাশির ক্রীড়নক। কঠিন ও উৎপাদনশীল শ্রমের অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্রোঞ্জ আবিষ্কারই মানুষকে সমর্থ করে নিজেকে স্রষ্টা হিশেবে আবিষ্কার করতে; প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পর সে আর তাকে ভয় পায় নি, এবং নানা বাধা পেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সে সাহস পায় নিজেকে স্বায়ত্তশাসিত সক্রিয় শক্তি হিশেবে দেখার এবং ব্যক্তি হিশেবে আত্মসিদ্ধি অর্জনের।

আবার, তার নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঘোষণাই সম্পত্তি ব্যাখ্যার জন্যে যথেষ্ট নয় : প্রতিটি সচেতন ব্যক্তি ঝুঁকি, সংগ্রাম, এবং একক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রয়াস চালাতে পারে নিজেকে সার্বভৌমত্বে উন্নীত করার।

সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার ফলেই ঘটেছে নারী উৎপীড়ন, এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোও অসম্ভব। এখানেও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। তিনি দেখেছেন যে নারীর পেশিগত দুর্বলতা প্রকৃত নিকৃষ্টতার ব্যাপার হয়ে ওঠে শুধু ব্রোঞ্জ ও লৌহ হাতিয়ারের সম্পর্কে এসে; কিন্তু তিনি দেখেন নি যে শ্রমের সীমিত সামর্থ্যই নারীর জন্যে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে ওঠে অসুবিধাজনক। নারীর অসামর্থ্য তার বিনাশ ডেকে আনে, কেননা পুরুষ নারীকে বিবেচনা করেছে তার সমৃদ্ধিলাভ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু কেনো নারী উৎপীড়িত হয়েছে, এ-পরিকল্পনাও তা ব্যাখ্যা করার জন্যে যথেষ্ট নয়, কেননা দু-লিঙ্গের মধ্যে শ্রমবিভাজন হয়ে উঠতে পারতো একটা প্রীতির সম্পর্ক। যদি মানুষের চেতনায় না থাকতো অপর নামে একটি আদি ধারণা এবং অপর-এর ওপর আধিপত্যের একটি আদি আকাঙ্খা, তাহলে ব্রোঞ্জের হাতিয়ার উদ্ভাবনের ফলে নারীপীড়ন ঘটতো না।

এঙ্গেলস এ-পীড়নের বিশেষ ধরনটিও ব্যাখ্যা করেন নি। দু-লিঙ্গের বৈরিতাকে তিনি দিতে চেয়েছেন শ্রেণীসংগ্রামের রূপ, তবে এ-উদ্যোগে তিনি ছিলেন নিরুদ্যম; তাঁর তত্ত্ব একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। এটা সত্য যে লিঙ্গানুসারে শ্রমবিভাজন ও পরিণামে পীড়ন মনে জাগিয়ে তোলে শ্রেণী অনুসারে সমাজবিভাজনের ধারণাটি, তবে এ-দুটিকে গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব। এক দিকে, শ্রেণীবিভক্তির কোনো জৈবিক ভিত্তি নেই। আবার, শ্রমিক তার অতিপরিশ্রমের মধ্যেও প্রভুর বিপরীতে সচেতন থাকে নিজের সম্বন্ধে; এবং সর্বহারারা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সব সময়ই পরখ ক'রে নিয়েছে তাদের অবস্থা, এবং শোষকদের জন্যে তৈরি ক'রে রেখেছে একটি হুমকি। এবং তারা চেয়েছে একটি শ্রেণী হিশেবে নিজেদের অবলুপ্তি। ভূমিকায় আমি দেখিয়েছি নারীর পরিস্থিতি কতো ভিন্ন।

যা আরো গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে সরল বিশ্বাসে নারীকে শুধু শ্রমিক হিশেবে গণ্য করা যায় না; কেননা তার প্রজননগত ভূমিকা তার উৎপাদন সামর্থ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত জীবনে যতোটা সামাজিক অর্থনীতিতেও তার থেকে কম নয়। কোনো কোনো পর্বে, সত্যিই, ভূমিকর্ষণের থেকে সন্তান প্রসব অনেক বেশি উপকারী। এঙ্গেলস সমস্যাটিকে উপেক্ষা করেছেন শুধু এ-মন্তব্য ক'রে যে সমাজতান্ত্রিক জনগোষ্ঠি লোপ করবে পরিবার প্রথাকে– এটা নিশ্চিতভাবেই একটি বিমূর্ত সমাধান। আমরা জানি উৎপাদনের অব্যবহিত প্রয়োজন ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্কের অদলবদলের ফলে কতো ঘনঘন এবং কতো মৌলভাবে সোভিয়েত

রাশিয়াকে বদলাতে হয়েছে পরিবার সম্বন্ধে তার নীতি। তবে পরিবার প্রথা লোপ করা মানেই নারীর মুক্তি নয়। স্পার্টা ও নাটশি শাসনের উদাহরণ প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত হ'তে পারে নারী।

নারীর অবস্থা যে-সমস্যা তুলে ধরে, তাতে খুবই বিব্রত বোধ করবে একটি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা, যা স্বাধীনতা খর্ব না ক'রে সমর্থন করে ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লুপ্ত না ক'রে ব্যক্তির ওপর দেয় দায়িত্ব। গর্ভধারণকে কোনো দায়িত্ব, কোনো কাজ, বা সামরিক পেশার মতো কোনো *পেশার* সাথে সমীকরণ খুবই অসম্ভব নাগরিকদের চাকুরির বিধিমালার থেকে সন্তানের জন্যে দাবি নারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে অনেক তীব্রভাবে– কোনো রাষ্ট্রই কখনো বাধ্যতামূলক সঙ্গমের বিধান দেয় নি। সঙ্গমে ও মাতৃত্বে নারীর জন্যে জড়িত থাকে সময় ও শক্তির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। যৌক্তিক বস্তুবাদ বৃথাই চেষ্টা করে কামের এ-নাটকীয় বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করতে; কেননা কামপ্রবৃত্তিকে কোনো বিধিমালার অধীনে আনা অসম্ভব। সত্যিই, যেমন ফ্রয়েড বলেছেন, এটা নিশ্চিত নয় যে এটা নিজের ভেতরেই বহন করে কি না নিজের সন্তুষ্টির অস্বীকৃতি। যা নিশ্চিত, তা হচ্ছে এটা সমাজের সাথে সংহতির অনুমতি দেয় না, কেননা কামে আছে সময়ের বিরুদ্ধে এক বিশেষ মুহূর্তের দ্রোহ, আছে সর্বজনীনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির দ্রোহ।

নারীকে প্রসবে সরাসরি বাধ্য করার কোনো উপায় নেই : যা সম্ভব, তা হচ্ছে তাকে ফেলতে হবে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে তার জন্যে মাতৃত্বই একমাত্র পরিণতি– আইন বা লোকাচার দিতে পারে বিয়ের আবশ্যিক বিধান, নিষিদ্ধ করতে পারে জন্মনিয়ন্ত্রণ, বিবাহবিচ্ছেদকে করতে পারে অবৈধ। এসব প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক বিধিনিষেধ আজ আবার ফিরিয়ে আনছে সোভিয়েত ইউনিয়ন; রাশিয়া পুনরুজ্জীবিত করছে বিয়ের পিতৃশাসনমূলক ধারণাকে। এটা করতে গিয়ে সে নারীকে আবার নির্দেশ দিচ্ছে নিজেকে কামসামগ্রি ক'রে তুলতে : সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় রাশিয়ার নারী নাগরিকদের অনুরোধ করা হয়েছে তাদের কাপড়চোপড়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে, প্রসাধন ব্যবহার করতে, স্বামীদের বশে রাখার জন্যে ছেনালিপনার আশ্রয় নিয়ে তাদের কামাগ্নি জাগিয়ে রাখতে। এ-ঘটনা স্পষ্ট নির্দেশ করে যে নারীকে শুধু একটি উৎপাদনের শক্তি হিশেবে গণ্য করা অসম্ভব : পুরুষের জন্যে সে কামের সঙ্গী, প্রসবকারিণী, কামসামগ্রি– এক অপর, যার ভেতর দিয়ে পুরুষ খোঁজে নিজেকে। নারীর অবস্থা বোঝার জন্যে আমাদের তাকাতে হবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ পেরিয়ে, যা পুরুষ ও নারীকে আর্থ এককের বেশি কিছু ব'লে গণ্য করে না।

একই কারণে আমরা ফ্রয়েডের যৌন অদ্বৈতবাদ ও এঙ্গেলসের আর্থনীতিক অদ্বৈতবাদ উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করি। মনোবিশ্লেষক নারীর সমস্ত সামাজিক দাবিকে বিশ্লেষণ করেন 'পুরুষসুলভ প্রতিবাদ' ব'লে; অন্য দিকে, মার্ক্সবাদীর কাছে নারীর কাম কম-বেশি জটিল, পরোক্ষভাবে, প্রকাশ করে তার আর্থনীতিক পরিস্থিতি। তবে 'ভগাঙ্কুরীয়' ও 'যোনীয়' ধারণাগুলো, 'বুর্জোয়া' বা 'সর্বহারা' ধারণাগুলোর মতোই বাস্তব নারীকে সার্বিকভাবে ব্যক্ত করতে সমান অসমর্থ। মানুষের আর্থনীতিক ইতিহাসের তলে যেমন থাকে, তেমনি সব ব্যক্তিগত নাটকের তলে আছে এক

অস্তিত্ববাদী ভিত্তি, যা আমাদের পূর্ণরূপে বুঝতে সাহায্য করে সত্তার সে-বিশেষ রূপকে, যাকে আমরা বলি মানবজীবন। মানুষের সম্পূর্ণ বাস্তবতার সাথে জড়িত না করা হ'লে কাম ও প্রযুক্তি কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না। এ-কারণেই ফ্রয়েডের সুপার-ইগোর নিষেধগুলো আর ইগোর উদ্যমগুলোকে ঘটনাচক্রজাত ব'লে মনে হয়, এবং এঙ্গেলসের নারীর ইতিহাসের বিবরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশগুলো রহস্যময় ভাগ্যের খেয়ালখুশিতে ঘটেছে ব'লে মনে হয়। আমাদের নারী আবিষ্কারের উদ্যোগে জীববিজ্ঞান, মনোবিশ্লেষণ, ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কিছু কিছু অবদানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করবো না; তবে আমরা ধারণা পোষণ করবো যে শরীর, কামজীবন, ও প্রযুক্তির সম্পদগুলো মানুষের জন্যে ততোটাই আছে, তাদের সে যতোটা উপলব্ধি করে নিজের অস্তিত্বের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে। পেশিশক্তির, শিশ্নের, হাতিয়ারের মূল্য সংজ্ঞায়িত হ'তে পারে শুধু এক মূল্যবোধের বিশ্বে; এটা নিয়ন্ত্রিত হয় সে-মৌল পরিকল্পনা দিয়ে, যার সাহায্যে মানুষ খোঁজে সীমাতিক্রমণতা।

ভাগ ২

ইতিহাস

পরিচ্ছেদ ১

যাযাবর

এটা চিরকালই পুরুষের বিশ্ব; এবং এ-ঘটনা ব্যাখ্যার জন্যে যে-সব কারণ প্রস্তাব করা হয়েছে এ-পর্যন্ত, তার কোনোটিই যথেষ্ট নয়। তবে লৈঙ্গিক স্তরক্রম কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তা আমরা বুঝতে পারবো যদি অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকে বিচার করি প্রাগৈতিহাসিক গবেষণা ও জাতিবিকাশতত্ত্বের তথ্যগুলো। আগেই আমি বলেছি যখন মানুষের দুটি দল একত্রে থাকে, তখন একটি চায় অপরটির ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে। যদি উভয়েরই থাকে এ-চাপ প্রতিরোধের শক্তি, তাহলে তাদের মধ্যে স্থাপিত হয় পারস্পরিক সম্পর্ক, কখনো শত্রুতার, কখনো মিত্রতার, সব সময়ই থাকে এক উত্তেজনার অবস্থা। যদি একটি কোনো উপায়ে লাভ করে বিশেষ সুযোগ, পায় কিছু সুবিধা, তাহলে সেটিই আধিপত্য করে অপরটির ওপর, এবং চেষ্টা করে তাকে অধীনে রাখতে। তাই বোঝা যায় পুরুষ চাইবে নারীর ওপর আধিপত্য করতে; কিন্তু কী সুবিধা তাকে সাহায্য করেছে নিজের ইচ্ছে বাস্তবায়নে?

মানবজাতিবিদেরা মানবসমাজের আদিম রূপের যে-সব বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলো পরস্পরবিরোধী। প্রাককৃষি পর্বে নারীর পরিস্থিতি কী ছিলো, সে-সম্পর্কে ধারণা করা বিশেষভাবেই কঠিন। নারীকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো, এবং বোঝা বইতে হতো নারীকেই। নারীকে এ-কাজের ভার দেয়া হতো হয়তো এ-কারণে যে দুর্গম পথে চলার সময় আক্রমণকারী পশু বা মানুষের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পুরুষকে মুক্ত রাখতে হতো তার হাত; তার ভূমিকা ছিলো অধিকতর ভয়ঙ্কর এবং এর জন্যে দরকার হতো বেশি শক্তি। তবে এও দেখা গেছে অনেক সময় অনেক নারী হতো শক্তসমর্থ, এবং তারা অংশ নিতো যোদ্ধাদের অভিযানে। নারী যে পুরুষের মতোই হিংস্র ও নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিতো, তা বোঝার জন্যে হিরোদোতাসের গল্প ও ডাহোমির আমাজনদের সাম্প্রতিক কাহিনী আমরা স্মরণ করতে পারি; তবুও সে-লাঠি ও বন্যপশুর যুগে পুরুষের অধিকতর শক্তি নিশ্চয়ই ছিলো প্রচণ্ডভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নারী যতোই শক্তিশালী হোক-না-কেনো বিরূপ বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার প্রজননের

দাসত্ব ছিলো একটা ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা। গর্ভধারণ, প্রসব, ও ঋতুস্রাব কমাতো তাদের কাজের সামর্থ্য এবং কখনো কখনো খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্যে তাদের ক'রে তুলতো সম্পূর্ণরূপে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। মানবপ্রজাতির আদি সময়টা ছিলো অত্যন্ত কঠিন; সংগ্রহকারী, শিকারী, ও মৎস্যজীবী মানুষেরা জমি থেকে পেতো খুবই সামান্য শস্য, তার জন্যেও লাগতো কঠোর শ্রম; গোষ্ঠির সম্পদের জন্যে জন্ম দিতে হতো বেশি সন্তান; নারীর অতি-উর্বরতা তাকে বিরত রাখতো সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে, যদিও সে অনির্দিষ্ট মাত্রায় সৃষ্টি করতো নতুন চাহিদা। প্রজাতির স্থায়িত্বের জন্যে তাকে দরকার ছিলো, আর সে অতিশয় উদারভাবেই একে স্থায়িত্ব দিয়েছে; তাই পুরুষকেই ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হয়েছে প্রজনন ও উৎপাদনের মধ্যে। এমনকি সে-সময়েও যখন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো সন্তান জন্মদান, যখন মাতৃত্ব ছিলো খুবই ভক্তির ব্যাপার, তখনও দৈহিক শ্রমই ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর নারীদের কখনো প্রথম স্থানটি নেয়ার অনুমতি দেয়া হয় নি। আদিম যাযাবরদের কোনো স্থায়ী সম্পত্তি বা এলাকা ছিলো না, তাই উত্তরপুরুষের জন্যেও কিছু সংরক্ষণের কথা তারা ভাবে নি; সন্তান তাদের কাছে মূল্যবান সম্পদ ছিলো না, ছিলো বোঝা। শিশুহত্যা সাধারণ ঘটনা ছিলো যাযাবরদের মধ্যে, এবং বহু নবজাতক, যারা হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যেতো, মারা যেতো যত্নের অভাবে।

তাই যে-নারী জন্ম দিতো, সে বোধ করতো না সৃষ্টির গৌরব; সে নিজেকে মনে করতো দুর্বোধ্য শক্তিরাশির খেলার পুতুল; এবং সন্তানপ্রসবের যন্ত্রণাদায়ক অগ্নিপরীক্ষাকে তার মনে হতো এক অপ্রয়োজনীয় বা বিঘ্নকর দুর্ঘটনা। সন্তানপ্রসব ও স্তন্যদান কর্ম নয়, এগুলো প্রাকৃতিক কাজ; এতে কোনো পরিকল্পনা নেই; এজন্যেই নারী এতে নিজের অস্তিত্বকে সগৌরবে ঘোষণার কোনো কারণ দেখে নি– অক্রিয়ভাবে সে বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়েছে তার জৈবিক নিয়তির। মাতৃত্বের সাথে মেলানো সম্ভব ব'লে তার ভাগ্যে পড়েছে গৃহস্থালির কাজ, যা তাকে বন্দী ক'রে ফেলেছে পুনরাবৃত্তি ও সীমাবদ্ধতায়। এগুলো পুনরাবৃত্ত হয় দিনের পর দিন একই রূপে, যা অপরিবর্তিতরূপে চলেছে শতাব্দীপরম্পরায়; এগুলো নতুন কিছুই সৃষ্টি করে নি।

পুরুষের ব্যাপারটি মৌলভাবে ভিন্ন; সে রক্ষা করেছে নিজের দলকে, শ্রমিক মৌমাছির মতো জৈবপ্রক্রিয়ায় সরল জৈবিক আচরণ দিয়ে নয়, বরং সে-সব কর্ম দিয়ে, যা অতিক্রম ক'রে গেছে তার পাশব স্বভাব। সময়ের আদি থেকে *হোমো ফাবের* হচ্ছে আবিষ্কারক : ফল পাড়া ও পশু বধের জন্যে যে-লাঠি ও গদা দিয়ে সে নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করেছে, তাই পরে হয়ে উঠেছে বিশ্বের ওপর তার অধিকার বিস্তারের হাতিয়ার। সমুদ্রে সে যে-মাছ ধরেছে, তা বাড়িতে নিয়ে আসার মধ্যেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে নি : প্রথমে তাকে জলের রাজ্য জয় করার জন্যে গাছের গুঁড়ি খুঁড়ে তৈরি করতে হয়েছে ক্যানো; বিশ্বের সম্পদ লাভের জন্যে সে অধিকার করেছে বিশ্বটিকেই। এসব কাজের মধ্যে সে পরখ ক'রে নিয়েছে তার শক্তি; সে স্থির করেছে লক্ষ্য এবং তৈরি করেছে সেখানে পৌছোনোর পথ; সংক্ষেপে, অস্তিত্বশীল হিশেবে সে লাভ করেছে আত্মসিদ্ধি। রক্ষা করার জন্যে সে সৃষ্টি করেছে; সে বর্তমানকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেছে, সে খুলেছে ভবিষ্যৎকে। এ-কারণেই মাছধরা ও শিকারের

অভিযানগুলোর ছিলো পবিত্র চরিত্র। তাদের সাফল্য উদযাপিত হতো উৎসব ও বিজয়োল্লাসের মধ্য দিয়ে, এবং এভাবে পুরুষ স্বীকৃতি দিয়েছে তার মানবিক গুণকে। আজো সে তার এ-গর্ব প্রকাশ করে যখন সে নির্মাণ করে একটি বাঁধ বা একটি আকাশচুম্বি অট্টালিকা বা একটি আণবিক চুল্লি। সে শুধু বিশ্বকে যেভাবে পেয়েছে সেভাবে রাখার জন্যে কাজ করে নি; সে সীমা ভেঙে বেরিয়ে গেছে, সে ভিত্তি স্থাপন করেছে নতুন ভবিষ্যতের।

আদিমানুষের কর্মের ছিলো আরেকটি মাত্রা, যা তাকে দিয়েছে পরম গৌরব : অধিকাংশ সময়ই এটা ছিলো ভয়ঙ্কর। রক্ত যদি হতো কোনো পুষ্টিকর তরল পদার্থ, তাহলে তা দুধের থেকে বেশি মূল্য পেতো না; তবে শিকারী কোনো কশাই ছিলো না, কেননা বন্যপশুর সাথে লড়াইয়ে তার ছিলো ভয়ঙ্কর ঝুঁকি। নিজের গোত্রের, যার সে ছিলো অন্তর্ভুক্ত, তার মর্যাদা বাড়ানোর জন্যে যোদ্ধা বিপন্ন করতো নিজের জীবন। এবং এর মধ্যে সে নাটকীয়ভাবে প্রমাণ করতো যে পুরুষের জন্যে জীবনই পরম মূল্যবান নয়, বরং এর বিপরীতে একে ব্যবহার করতে হবে সে-সব লক্ষ্য সাধনে, যা জীবনের থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নিকৃষ্টতম যে-অভিসম্পাতে অভিশপ্ত হয় নারী, তা হচ্ছে সে পরিত্যক্ত হয় যুদ্ধের সমতুল্য এসব হঠাৎ আক্রমণে অংশগ্রহণ থেকে। কেননা জীবন সৃষ্টি ক'রে নয়, বরং বিপন্ন ক'রে পুরুষ উন্নীত হয় পশুর উর্ধ্বে; এ-কারণেই মানবমণ্ডলির মধ্যে সে-লিঙ্গকেই দেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব, যে-লিঙ্গ জন্ম দেয় না, বরং হত্যা করে।

এখানেই আমরা পাচ্ছি পুরো রহস্যের চাবি। জৈবিক স্তরে কোনো প্রজাতি টিকে থাকে শুধু নিজেকে নতুনভাবে সৃষ্টি ক'রে; কিন্তু এ-সৃষ্টি শুধু একই জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটায় অধিকতর ব্যক্তির মধ্যে। কিন্তু পুরুষ জীবনের পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত করে যখন সে অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে সীমাতিক্রমণ ক'রে যায় জীবনের; এ-সীমাতিক্রমণ দিয়ে সে সৃষ্টি করে এমন মূল্যবোধ, যা হরণ করে বিশুদ্ধ পুনরাবৃত্তির সমস্ত মূল্য। পশুর মধ্যে পুরুষটির স্বাধীনতা ও ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নিরর্থক, কেননা তাতে কোনো লক্ষ্য জড়িত নেই। নিজের প্রজাতির প্রতি দায়িত্ব পালন ছাড়া সে আর যা কিছু করে, তার সবই তুচ্ছ। আর সেখানে মানব পুরুষ নিজের প্রজাতির প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বদলে দেয় পৃথিবীর মুখমণ্ডল, সে নতুন যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করে, সে উদ্ভাবন করে, সে গঠন করে ভবিষ্যতের রূপ। পুরুষ নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পায় নারীর নিজের সহযোগিতার সমর্থন। কেননা নারী নিজেও এক অস্তিত্বশীল, সেও বোধ করে পেরিয়ে যাওয়ার প্রবর্তনা, এবং তার লক্ষ্য শুধু নিতান্তই পুনরাবৃত্তি করা নয়, বরং একটি ভিন্ন ভবিষ্যতের দিকে সীমাতিক্রমণ– অন্তরের অন্তস্তলে নারী বোধ করে পুরুষের দাম্ভিকতার নিশ্চিত প্রমাণ। সে পুরুষের সাথে যোগ দেয় সে-সব উৎসবে, যা উদযাপন করে পুরুষের সাফল্য ও বিজয়। নারীর দুর্ভাগ্য সে জীবনের পুনরাবৃত্তির জন্যে জৈবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত, যদিও তার মতেই জীবন নিজের মধ্যে বহন করে না জীবনলাভের কারণ, যে-কারণগুলো জীবনের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রভু ও দাসের সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করার জন্যে যে-সব যুক্তি দিয়েছেন হেগেল,

সেগুলো বেশি ভালোভাবে কাজ করে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সত্য হচ্ছে যে নারী কখনো পুরুষের মূল্যবোধের বিপরীতে সৃষ্টি করে নি নারীর মূল্যবোধ; পুরুষের সুযোগসুবিধা সংরক্ষণের জন্যে পুরুষই উদ্ভাবন করেছে ওই বিচ্যুতি। পুরুষ সৃষ্টি করেছে নারীর জন্যে এক এলাকা– জীবনের রাজ্য, সীমাবদ্ধতার রাজ্য– নারীকে সেখানে বন্দী ক'রে রাখার জন্যে। কিন্তু লিঙ্গনিরপেক্ষভাবেই প্রতিটি অস্তিত্বশীল চায় সীমাতিক্রমণের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে– নারীদের বশ্যতাই হচ্ছে এ-বিবৃতির প্রমাণ। পুরুষ যে-অধিকারে অস্তিত্বশীল হয়েছে, সে-একই অধিকারে আজ নারীরা দাবি করে অস্তিত্বশীল হিশেবে নিজেদের স্বীকৃতি এবং অস্তিত্বকে অধীন করতে চায় না জীবনের, মানবসত্তাকে অধীন করতে চায় না তার পাশবিকতার।

অস্তিত্ববাদী পরিপ্রেক্ষিত আমাদের বুঝতে সমর্থ করেছে কীভাবে আদিম যাযাবরদের জৈবিক ও আর্থনীতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলো পুরুষাধিপত্য। স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে, তার প্রজাতির শিকার; আর মানব জাতি সব সময়ই চেষ্টা করেছে তার বিশেষ নিয়তি থেকে মুক্তি পাওয়ার। জীবনসংরক্ষণ পুরুষের জন্যে হয়েছে একটি সক্রিয় কর্ম এবং হাতিয়ার আবিষ্কারের মাধ্যমে একটি কর্ম পরিকল্পনা; কিন্তু মাতৃত্বের মধ্যে নারী, পশুর মতোই, দৃঢ়ভাবে বাঁধা রয়েছে তার দেহের সাথে। পুরুষ চেয়েছে কালপরম্পরায় নিজেকে শুধু পুনরাবৃত্ত না করতে : চেয়েছে বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ভবিষ্যৎ গড়তে। পুরুষের কর্মকাণ্ড মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে গিয়ে অস্তিত্বকেই একটি মূল্যবোধে পরিণত করেছে; এ-কর্মকাণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছে জীবনের বিভ্রান্ত শক্তিগুলোর ওপর; এটাই পরাভূত করেছে প্রকৃতি ও নারীকে।

ভূমির আদিকৃষকেরা

এইমাত্র আমরা দেখেছি যে আদিম যাযাবরদের মধ্যে নারীর ভাগ্য ছিলো খুবই কঠিন, এবং কোনো সন্দেহ নেই যে-নিষ্ঠুর অসুবিধাগুলো বিকল ক'রে রেখেছিলো নারীকে, সেগুলো দূর করার কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয় নি। তবে পরে পিতৃসুলভ স্বৈরাচারের উদ্যোগে বলপ্রয়োগ ক'রে নারীকে যেমন পীড়ন করা হয়েছে, তেমন পীড়নও করা হয় নি। কোনো সংস্থা দূর করে নি দু-লিঙ্গের অসাম্য; আসলে কোনো সংস্থাই ছিলো না– ছিলো না সম্পত্তি, ছিলো না উত্তরাধিকার, ছিলো না আইন। ধর্ম ছিলো ক্লীব : উপাসনা করা হতো কোনো অলিঙ্গ টোটেমের।

সংস্থা ও আইন দেখা দেয় যখন যাযাবররা বসতি স্থাপন ক'রে হয়ে ওঠে কৃষিজীবী। পুরুষকে আর বিরূপ প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় না; বিশ্বের ওপর সে যে-রূপ চাপিয়ে দিতে চায়, তার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করে, ভাবতে শুরু করে বিশ্ব ও নিজের সম্পর্কে। এ-সময়ে লৈঙ্গিক পার্থক্য প্রতিফলিত হয় মানবগোষ্ঠির সংগঠনে, এবং এটি ধারণ করে এক বিশেষ রূপ। কৃষিসমাজে নারীকে মাঝেমাঝে ভূষিত করা হতো এক অসাধারণ মর্যাদায়। কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় সন্তান যে-নতুন গুরুত্ব অর্জন করে, মূলত তার সাহায্যেই ব্যাখ্যা করতে হবে এ-মর্যাদাকে। বিশেষ এলাকায় বসতি স্থাপন ক'রে পুরুষ তার ওপর প্রতিষ্ঠা করে নিজের মালিকানা, এবং সম্পত্তি দেখা দেয় যৌথরূপে। সম্পত্তির জন্যে দরকার পড়ে তার মালিকের থাকবে উত্তরপুরুষ, এবং মাতৃত্ব হয়ে ওঠে এক পবিত্র ভূমিকা।

বহু গোত্র বাস করতো সংঘের অধীনে, তবে এর অর্থ এ নয় যে নারীরা থাকতো সাধারণভাবে সব পুরুষের অধিকারে– এখন আর মোটেই মনে করা হয় না যে অবাধ যৌনতা কখনো ছিলো সাধারণ রীতি– তবে পুরুষ ও নারী ধর্মীয়, সামাজিক, ও আর্থনীতিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করতো শুধু একটি দল হিশেবে : তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিলো নিতান্তই এক জৈবিক সত্য। বিবাহ– একপতিপত্নীক, বহুপত্নীক, বা বহুস্বামীক– তার রূপ যা-ই হোক-না-কেনো, ছিলো একটা ঐহিক আকস্মিকতা, এটা কোনো অতীন্দ্রিয় বন্ধন সৃষ্টি করতো না। এটা স্ত্রীটিকে কোনো দাসত্ববন্ধনে জড়াতো না, কেননা সে তখনো যুক্ত থাকতো তার নিজের গোত্রের সাথে।

এখন, অনেক আদিম মানবগোষ্ঠিই অজ্ঞ ছিলো সন্তান জন্মদানে পিতার ভূমিকা সম্বন্ধে (অনেক ক্ষেত্রে একে আজো সত্য ব'লে মনে হয়); সন্তানদের তারা মনে করতো তাদেরই পিতৃপুরুষদের প্রেতাত্মার পুনর্জন্মগ্রহণ ব'লে, যে-প্রেতাত্মারা বাস

করতো কোনো গাছে বা প্রস্তরে, কোনো পবিত্র স্থানে, এবং নেমে এসে ঢুকতো নারীদের শরীরে। অনেক সময় মনে করা হতো যে এ-অনুপ্রবেশ যাতে সহজ হয়, তার জন্যে নারীদের কুমারী থাকা ঠিক হবে না; তবে অন্যান্য জনগোষ্ঠি বিশ্বাস করতো যে এটা নাক দিয়ে বা মুখ দিয়েও ঘটতে পারে। তা যা-ই হোক, এতে সতীত্বমোচন ছিলো গৌণ, এবং অতীন্দ্রিয় প্রকৃতির কারণে খুব কম সময়ই এটা ছিলো স্বামীর বিশেষাধিকার।

তবে সন্তান জন্মদানের জন্যে মা ছিলো সুস্পষ্টভাবে আবশ্যক; মা-ই ছিলো সে-জন, যে নিজ দেহের ভেতরে জীবাণুটিকে রক্ষা করতো ও তার পুষ্টি যোগাতো, সুতরাং তার মাধ্যমেই গোত্রের জীবন বিস্তার লাভ করতো দৃশ্যমান বিশ্বে। এভাবে সে পালন করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অধিকাংশ সময়ই শিশুরা অন্তর্ভুক্ত হতো তাদের মায়ের গোত্রে, ধারণ করতো গোত্রের নাম, এবং পেতো গোত্রের অধিকার ও সুযোগসুবিধা, বিশেষ ক'রে গোত্রের অধিকারে যে-জমি থাকতো, তা ব্যবহারের অধিকার। সংঘের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা পেতো নারীদের কাছে থেকে : নারীদের মাধ্যমে ভূমি ও শস্যের মালিকানা নিশ্চিত করা হতো গোত্রের সদস্যদের মধ্যে, এবং বিপরীতভাবে এ-সদস্যরা তাদের মায়েদের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো এই বা ওই এলাকার জন্যে। আমরা তাই অনুমান করতে পারি যে এক অতীন্দ্রিয় অর্থে মৃত্তিকার মালিক ছিলো নারীরা : ভূমি ও তার শস্যের ওপর নারীদের ছিলো অধিকার, যা ছিলো যুগপৎ ধর্মীয় ও আইনগত। নারী ও ভূমির মধ্যে বন্ধন ছিলো মালিকানার থেকেও ঘনিষ্ঠ, কেননা মাতৃধারার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই ছিলো নারীকে মৃত্তিকার সাথে সত্যিকারভাবে সমীভূত করা; উভয়ের মধ্যেই জীবনের চিরস্থায়িত্ব– যা ছিলো মূলত প্রজনন– লাভ করা হতো তার ব্যক্তিক মূর্তপ্রকাশদের, অবতারদের জন্মদানের মাধ্যমে।

যাযাবরদের কাছে সন্তানের জন্মকে নিতান্ত আকস্মিক ঘটনার বেশি কিছু মনে হতো না, এবং মৃত্তিকার সম্পদের কথা ছিলো তাদের অজানা; কিন্তু কৃষিজীবী বিস্মিত হতো উৎপাদনশীলতার রহস্যে, যা দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠতো তার হলরেখায় ও মাতার শরীরের ভেতরে : সে বুঝতে পারতো সেও জন্মেছে ওই পশু ও শস্যের মতো, সে চাইতো তার গোত্র জন্ম দিক আরো পুরুষ, যারা তার গোত্রকে স্থায়িত্ব দেয়ার সাথে ভূমির উর্বরতাকেও দেবে স্থায়িত্ব; প্রকৃতিকে তার মনে হতো মায়ের মতো : ভূমি হচ্ছে নারী এবং নারীর ভেতরে বাস করে সে-একই দুর্বোধ্য শক্তিগুলো, যেগুলো বাস করে মাটির গভীরে। এ-কারণেই কৃষিকাজের ভার অনেকটা দেয়া হতো নারীর ওপর; পিতৃপুরুষদের প্রেতাত্মাদের যে ডেকে আনতে পারে নিজের শরীরের ভেতরে, তার সে-শক্তিও থাকার কথা যা দিয়ে সে রোপন করা জমিতে ফলাবে ফল ও শস্য। উভয় ক্ষেত্রেই কোনো সৃষ্টিশীল কাজের ব্যাপার ছিলো না, ছিলো ইন্দ্রজালের ব্যাপার। এ-পর্যায়ে শুধু মাটির শস্যরাজি সংগ্রহের মধ্যে পুরুষ আর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে নি, তবে সে তখনো নিজের শক্তিকে বুঝতে পারে নি। নিজেকে অক্রিয় বোধ ক'রে, যে-প্রকৃতি নির্বিচারে ঘটাতো জীবন ও মৃত্যু, তার ওপর নির্ভরশীল থেকে দ্বিধান্বিতভাবে সে দাঁড়িয়ে ছিলো কৌশল ও যাদুর মধ্যে। একথা সত্য, কম বা বেশি স্পষ্টভাবে সে

বুঝতে পারে যৌনকর্মের এবং যে-সব কৌশলে সে ভূমিকে আবাদযোগ্য ক'রে তুলছে, তার কার্যকারিতা। এ-সত্ত্বেও সন্তান ও শস্যকে দেবতাদের দান ব'লেই মনে করা হতো এবং বিশ্বাস করা হতো যে নারীর শরীর থেকে বয়ে আসা রহস্যময় প্রবাহগুলো এ-বিশ্বে নিয়ে আসে জীবনের রহস্যময় উৎসে নিহিত সম্পদরাশি।

এসব বিশ্বাসের মূল খুবই গভীরে প্রোথিত এবং আজো টিকে আছে ভারতি, অস্ট্রেলীয়, ও পলিনেশীয় অনেক গোত্রের মধ্যে। অনেক গোত্রে বন্ধ্যা নারীকে ভয়ঙ্কর মনে করা হয় বাগানের জন্যে, অনেক গোত্রে মনে করা হয় যে ফলন হবে প্রচুর যদি ফসল কাটে গর্ভবতী নারী; আগে ভারতে রাতের বেলা নগ্ন নারীরা জমির চারদিকে লাঙল চালাতো ইত্যাদি। এক উপবিষ্ট অস্তিত্বের মধ্যে বন্দী ক'রে মাতৃত্ব ধ্বংস করে নারীকে; তাই এটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে যখন সে থাকে চুলোর ধারে তখন পুরুষ শিকার করে, মাছ ধরে, এবং যুদ্ধ করে। আদিম মানুষদের উদ্যান ছিলো ছোটো, সেগুলোর অবস্থান ছিলো গ্রামের সীমার মধ্যেই; এবং তাদের কৃষিকাজ ছিলো একটা গৃহস্থালির কাজ; এবং প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ব্যবহারেও খুব বেশি শক্তির দরকার পড়তো না। অর্থনীতি ও ধর্ম কৃষিকাজের ভার ছেড়ে দিয়েছিলো নারীর হাতে। যখন গার্হস্থ্যশিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে, তাও হয় তাদের জন্যে দুর্ভাগ্য : তারা মাদুর বোনে ও কাঁথা শেলাই করে এবং বানায় হাঁড়িপাতিল। তাদের মধ্য দিয়েই গোত্রের জীবন সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত হতো; সন্তান, পশু, শস্য, হাঁড়িপাতিল, দলের সব ধরনের সমৃদ্ধি নির্ভর করতো তাদের শ্রম ও ঐন্দ্রজালিক শক্তির ওপর– তারা ছিলো সমাজের আত্মা। এ-শক্তি পুরুষের মনে জাগাতো ভয়মেশানো ভক্তি, যা প্রতিফলিত হতো তাদের উপাসনায়। সমগ্র বিরুদ্ধ প্রকৃতির সারসংক্ষেপ ঘটেছিলো নারীতে।

যেমন ইতিমধ্যেই আমি বলেছি, পুরুষ কখনো অপর-এর কথা না ভেবে নিজের সম্পর্কে ভাবে না; সে বিশ্বকে দেখে দ্বৈততার প্রতীকে, যা প্রথমত যৌন ধরনের নয়। কিন্তু পুরুষের থেকে ভিন্ন হয়ে, যে-পুরুষ নিজেকে নির্দেশ করে পুরুষ ব'লেই, স্বাভাবিকভাবেই নারীকে নির্দেশ করা হয় অপর ব'লে; অপর হচ্ছে নারী। যখন নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি পায়, তখন সে পুরোপুরিভাবে নির্দেশ করে অপর-এর এলাকা। তারপর দেখা দিতে থাকে সে-দেবীরা, যাদের মধ্য দিয়ে পুজো করা হয় উর্বরতার ধারণাকে। সুসায় পাওয়া গেছে মহাদেবীর, মহামাতার আদিতম মূর্তি, যার বস্ত্র দীর্ঘ এবং কেশবিন্যাস উচ্চ, অন্যান্য মূর্তিতে যাকে আমরা দেখতে পাই মিনারের মুকুটশোভিত। ক্রিটে খননকার্যের ফলে এমন কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে। কখনো কখনো সে স্থূল ও অবনত, কখনো কখনো তন্বী ও দণ্ডায়মান, কখনো বস্ত্রপরিহিত এবং প্রায়ই নগ্ন, তার দুই বাহু চেপে আছে তার স্ফীত স্তনযুগলের নিচে। সে স্বর্গের রাণী, তার প্রতীক কপোত; সে নরকেরও সম্রাজ্ঞী, যখন সে হামাগুড়ি দিয়ে চলে তখন সাপ তার প্রতীক। সে আবির্ভূত হয় পর্বতে ও অরণ্যে, সমুদ্রে, ঝরনাধারায়। সবখানেই সে সৃষ্টি করে জীবন; যদিও সে হত্যা করে, তবু সে আবার জীবন দেয় মৃতকে। চপলা, বিলাসিনী, প্রকৃতির মতো নির্মম, একই সাথে প্রসন্ন ও ভয়ঙ্করী সে রাজত্ব করে সমগ্র অ্যাজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, ফ্রিজিয়া, সিরিয়া, আনাতোলিয়ায়, সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায়। ব্যাবিলনিয়ায় তাকে বলা হতো ইশতার, সেমেটীয়রা বলতো আস্তারতে, এবং গ্রিকরা

বলতো গাইয়া, বা সিবিলে। মিশরে তাকে আমরা দেখতে পাই আইসিস রূপে। পুরুষ দেবতারা ছিলো তার অধীনে।

সুদূর স্বর্গ ও নরকের পরম দেবীপ্রতিমা, নারী সব পবিত্র সত্তার মতোই মর্ত্যে পরিবৃত ছিলো ট্যাবুতে, সে নিজেই ট্যাবু; সে ধারণ করতো যে-শক্তি, তারই জন্যে তাকে দেখা হতো এক ঐন্দ্রজালিক, অভিচারিণীরূপে। প্রার্থনায় তার আবাহন করা হতো, কখনো সে হয়ে ওঠে যাজিকা, যেমন হতো প্রাচীন কেল্টদের ড্রুইডদের মধ্যে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে অংশ নেয় গোত্রীয় শাসনকর্মে, এমন কি হয় একক শাসক। এ-সুদূর যুগগুলো আমাদের জন্যে কোনো সাহিত্য রেখে যায় নি। কিন্তু পিতৃতন্ত্রের মহাপর্বগুলো তাদের পুরাণ, কীর্তিস্তম্ভ, ও ঐতিহ্যধারার মধ্যে সংরক্ষণ করেছে সে-সময়ের স্মৃতি, যখন খুবই মহিমান্বিত অবস্থান অধিকার ক'রে ছিলো নারীরা। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে, *ঋগ্বেদ*-এর যুগের উঁচু অবস্থান থেকে নারীর পতন ঘটতে থাকে ব্রাহ্মণ্য যুগে, এবং *ঋগ্বেদ*-এর যুগে পতন ঘটেছিলো পূর্ববর্তী আদিম স্তর থেকে। ইসলামপূর্ব যুগে বেদুইন নারীরা উপভোগ করতো কোরানে প্রদত্ত মর্যাদার থেকে অনেক উচ্চতর মর্যাদা। নিওবি, মিডিয়ার মহামূর্তিগুলো এমন এক যুগের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, যখন মাতারা গর্ববোধ করতো তাদের সন্তানদের নিয়ে, মনে করতো সন্তানেরা একান্তভাবে তাদেরই সম্পদ। এবং হোমারের কাব্যে অ্যান্ড্রোমাকি ও হেকিউবার ছিলো এমন গুরুত্ব, যা ধ্রুপদী গ্রিস আর নারীকে দেয় নি।

এসব তথ্য এমন অনুমানের দিকে এগিয়ে দেয় যে আদিম কালে সত্যিই ছিলো নারীরাজত্বের একটা যুগ : মাতৃতন্ত্র। বাখোফেনের প্রস্তাবিত এ-প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন এঙ্গেলস, এবং মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণকে তিনি বলেছিলেন 'নারীজাতির ঐতিহাসিক মহাপরাজয়'। তবে নারীর সে-স্বর্ণযুগ আসলে একটি কিংবদন্তি মাত্র। একথা বলা যে নারী ছিলো অপর, এর অর্থ হচ্ছে দু-লিঙ্গের মধ্যে কখনোই পারস্পরিক সম্পর্ক বিরাজ করে নি : ভূমি, মাতা, দেবী–পুরুষের চোখে সে কোনো সঙ্গী প্রাণী ছিলো না; তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিলো মানবিক এলাকার *বাইরে*, সুতরাং সে ছিলো ওই এলাকার *বাইরের*। সমাজ চিরকালই থেকেছে পুরুষের; রাজনীতিক শক্তি চিরকালই থেকেছে পুরুষের হাতে। 'সর্বসাধারণ বা সামাজিক কর্তৃত্ব সর্বদাই থাকে পুরুষের অধিকারে,' আদিম সমাজ বিষয়ক এক গবেষণার শেষ দিকে ঘোষণা করেছেন লেভি-স্ট্রাউস।

পুরুষের কাছে সব সময়ই সহকর্মী হচ্ছে আরেকজন পুরুষ, আরেকজনও তারই মতো, যার সাথে গ'ড়ে ওঠে তার পারস্পরিক সম্পর্ক। সমাজের মধ্যে এক রূপে বা অন্য রূপে গ'ড়ে ওঠে যে-দ্বৈততা, তাতে এক দল পুরুষ বিপক্ষে যায় আরেক দল পুরুষের; নারীরা হয় তাদের সম্পত্তির অংশ, যা থাকে দু-দল পুরুষেরই দখলে এবং যা তাদের মধ্যে বিনিময়ের একটি মাধ্যম। নারী কখনোই নিজের পক্ষ থেকে পুরুষের বিপরীতে একটি পৃথক দল গ'ড়ে তোলে নি। তারা কখনোই পুরুষের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ ও স্বায়ত্তশাসিত সম্পর্কে আসে নি। 'বিয়ের মধ্যে থাকে যে পারস্পরিক বন্ধন, তা পুরুষেরা ও নারীরা স্থাপন করে না, বরং নারীর মাধ্যমে তা স্থাপিত হয় পুরুষদের ও পুরুষদের মধ্যে, নারীরা তাতে থাকে শুধু প্রধান ব্যাপার,' বলেছেন লেভি-স্ট্রাউস।

নারীটি যে-সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তার বংশধারা নির্দেশের রীতি যাই হোক-না-কোনো, তাতে নারীর প্রকৃত অবস্থার কোনো বদল ঘটে না; তা মাতৃধারাই হোক, বা পিতৃধারাই হোক, বা উভয়ধারাই হোক, বা অভিন্ন ধারাই হোক, সে সব সময়ই থাকে পুরুষদের অভিভাবকত্বে। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে বিয়ের পর নারী থাকবে কার কর্তৃত্বে, পিতার না বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার– এমনকি এ-কর্তৃত্ব সম্পসারিত হ'তে পারে নারীর সন্তানদের পর্যন্ত– না কি সে থাকবে তার স্বামীর কর্তৃত্বে। 'নারী, নিজের দিক দিয়ে, কখনোই তার ধারার প্রতীকের থেকে বেশি কিছু নয়... মাতৃধারার বংশধারা হচ্ছে নারীটির পিতা বা ভ্রাতার অভিভাবকত্ব, যা পেছনের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে গিয়ে পৌঁছে ভাইয়ের গ্রামে,' এটা লেভি-স্ট্রাউস থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি। সে নিতান্তই অভিভাবকত্বের মধ্যস্থতাকারী, সে অভিভাবক নয়। সত্য হচ্ছে বংশধারার রীতি অনুসারে সম্পর্ক নির্ণীত হয় দুটি দলের পুরুষের মধ্যে, দুটি লিঙ্গের মধ্যে নয়।

বাস্তবিকভাবে নারীর প্রকৃত অবস্থা এক বা অন্য ধরনের কর্তৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত নয়। এমন হ'তে পারে যে মাতৃধারার পদ্ধতিতে তার অবস্থান অতি উচ্চে; তবু আমাদের সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কোনো গোত্রের প্রধান বা রাণীরূপে কোনো নারী থাকলেই বোঝায় না যে সেখানে নারীরাই সার্বভৌম : মহান ক্যাথেরিনের সিংহাসন আরোহণের ফলে রাশিয়ার কৃষক নারীর ভাগ্যের কোনো বদল ঘটে নি; এবং এমন পরিস্থিতিতে নারী প্রায়ই বাস করে শোচনীয় অবস্থায়। উপরন্তু, এমন ঘটনা খুবই দুর্লভ যেখানে স্ত্রীটি বাস করে তার গোত্রের সঙ্গে, আর তার স্বামীকে দেয়া হয় তার সাথে স্বল্পকালীন, এমনকি সংগোপন সাক্ষাতের অনুমতি। অধিকাংশ সময়ই সে যায় স্বামীর ঘর করার জন্যে, এটি এমন ঘটনা যা পুরুষের প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্যে যথেষ্ট।

অধিকতর ব্যাপক পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থায় পরস্পরসংবদ্ধ হয় দু-রকম কর্তৃত্ব, একটি ধর্ম, আর অপরটি গ'ড়ে ওঠে পেশা ও ভূমিচাষ ভিত্তি ক'রে। ঐহিক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিয়ের আছে এক বিশাল সামাজিক গুরুত্ব, এবং দাম্পত্য পরিবার, ধর্মীয় তাৎপর্যহীন হয়ে পড়লেও, মানবিক স্তরে যাপন করে এক তীব্র জীবন। এমনকি যে-সব জনগোষ্ঠিতে বিরাজ করে মহাযৌনস্বাধীনতা, সেখানেও যে-নারী পৃথিবীতে একটি শিশু আনে, তাকে বিবাহিত হওয়া সঙ্গত; সে একলা নিজের সন্তান নিয়ে একটি দল গঠনে অসমর্থ। এবং তার ভাইয়ের ধর্মীয় তত্ত্বাবধান অপ্রতুল : একটি স্বামীর উপস্থিতি দরকার। তার সন্তানের ব্যাপারে পুরুষটির প্রায়ই থাকে গুরুদায়িত্ব। তারা তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় না, তবুও তাকেই তাদের ভরণপোষণ ও লালনপালন করতে হয়। স্বামী ও স্ত্রীর, পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্থাপিত হয় সঙ্গমের, কর্মের, অভিন্ন স্বার্থের, প্রীতির বন্ধন।

অতীন্দ্রিয় ও আর্থনীতিক বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য একটি অস্থির ব্যাপার। পুরুষ প্রায় সর্বদাই তার ভ্রাতষ্পুত্রের থেকে নিজের পুত্রের সাথে অনেক বেশি দৃঢ়ভাবে লগ্ন থাকে; যখন সময় আসে সে নিজেকে পিতা হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই বেশি পছন্দ করে। এ-কারণেই বিবর্তন যখন পুরুষকে আত্মসচেতনতা ও নিজের ইচ্ছে প্রয়োগের পর্যায়ে নিয়ে আসে, তখন প্রতিটি সমাজ পিতৃতান্ত্রিক রূপ ধারণ করতে থাকে। তবে

একথাটিকে গুরুত্ব দিতে হবে যে এমনকি যখন সে বিহ্বল ছিলো জীবনের, প্রকৃতির, ও নারীর রহস্যের মুখোমুখি, তখনও সে কখনো শক্তিহীন ছিলো না; যখন, নারীর ভয়ঙ্কর ইন্দ্রজালে সন্ত্রস্ত হয়ে, সে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করে অপরিহার্যরূপে, তখনও সে-ই নারীকে প্রতিষ্ঠিত করে এই রূপে এবং এভাবে এ-স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সে-ই কাজ করে অপরিহার্যরূপে। নারীর উর্বরতাশক্তি সত্ত্বেও পুরুষই থেকেছে নারীর প্রভু, যেমন পুরুষই মালিক উর্বর ভূমির; যার ঐন্দ্রজালিক উর্বরতার সে প্রতিমূর্তি, সে-প্রকৃতির মতো পুরুষের অধীনে, অধিকারে, শোষণের মধ্যে থাকাই নারীর নিয়তি। পুরুষের কাছে সে পায় যে-মর্যাদা, তা তাকে দিয়েছে পুরুষই; পুরুষ প্রণাম করে অপরকে, উপাসনা করে দেবী মাতার। তবে এভাবে নারীকে যতো শক্তিশালীই ব'লেই মনে হোক, সে এটা লাভ করেছে শুধু পুরুষের মনের ভাবনার মধ্য দিয়েই।

পুরুষ যতো মূর্তি তৈরি করেছে, সেগুলোকে যতোই করাল মনে হোক-না-কোনো, আসলে সেগুলো পুরুষেরই অধীন; এবং এ-কারণে সেগুলোকে ধ্বংস করার শক্তিও সব সময় রয়েছে তার আয়ত্তে। আদিম সমাজে ওই অধীনতা স্বীকার করা হয় না এবং খোলাখুলিভাবে প্রয়োগ করা হয় না, তবে ঘটনার প্রকৃতি অনুসারে এর আছে অব্যবহিত অস্তিত্ব; এবং পুরুষ যখনই অর্জন করবে স্পষ্টতর আত্মসচেতনতা, যখনই সে সাহস পাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও প্রতিরোধ করতে, তখনই প্রয়োগ করা হবে একে।

নারীর মধ্যে বহুবার পুনর্জন্ম নিতো যে-টোটেমি পিতৃপুরুষ, পশু বা বৃক্ষবাসী কারো নামে সে ছিলো এক পুরুষনীতি; নারী পিতৃপুরুষের অস্তিত্বকে স্থায়িত্ব দিতো দেহে, কিন্তু তার ভূমিকা ছিলো শুধুই পুষ্টিসাধনের, তা কখনো সৃষ্টিশীল ছিলো না। কোনো এলাকায়ই নারী সৃষ্টি করতো না; সন্তান ও অন্ন দিয়ে সে রক্ষা করতো গোত্রের জীবন, তবে এর বেশি কিছু নয়। সীমাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে ধ্বংস হয় নারী, সে পুনর্জন্ম ঘটাতে থাকে শুধু সমাজের স্থিত বৈশিষ্ট্যের, আর আটকে থাকে তাতেই। তখন পুরুষ এগিয়ে যায় সে-সব কর্মকাণ্ডে, যা সমাজকে খুলে দেয় প্রকৃতি ও অন্য মনুষ্যমণ্ডলির দিকে। পুরুষের যোগ্য কাজ ছিলো যুদ্ধ, শিকার, মাছধরা; সে লুণ্ঠন ক'রে সম্পদ নিয়ে এসে দান করতো নিজের গোত্রকে; যুদ্ধ, শিকার, ও মাছধরা বোঝাতো অস্তিত্বের প্রসারণ, অস্তিত্বকে বিশ্বের দিকে প্রসারিত ক'রে দেয়া। পুরুষ একাই থাকতো সীমাতিক্রমণতার প্রতিমূর্তি। তখনও তার পৃথিবী-নারীর ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করার বাস্তব উপায় ছিলো না; তখনও সে পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস করে নি– তবে এর মাঝেই পুরুষের মনে বাসনা জাগে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার।

আমার মতে এ-বাসনার মধ্যেই খুঁজতে হবে বহির্বিবাহ নামক প্রসিদ্ধ প্রথাটির গভীরপ্রোথিত কারণ, যে-প্রথা মাতৃধারার সমাজগুলোতে যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পুরুষ যদি জন্মদানে তার ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞও থাকে, তবু বিয়ে তার জন্যে এক বিশাল গুরুত্বের ব্যাপার : বিয়ের মধ্য দিয়েই সে অর্জন করে পুরুষের মর্যাদা, এবং একখণ্ড জমি হয় তার। গোত্রটির সাথে সে জড়িত তার মায়ের মাধ্যমে, তার মাধ্যমে সে জড়িত তার পূর্বপুরুষদের ও তার সমস্ত কিছুর সাথে; কিন্তু তার সমস্ত ঐহিক

ভূমিকায়, কর্মে, বিবাহে, সে মুক্তি পেতে চায় এ-বৃত্ত থেকে, সীমাবদ্ধতার ওপর জ্ঞাপন করতে চায় সীমাতিক্রমণতা, সে উন্মুক্ত করতে চায় এক ভবিষ্যৎ, যা খুবই ভিন্ন সে-অতীতের থেকে, যার গভীরে লুপ্ত তার মূল। বিভিন্ন সমাজে স্বীকৃত সম্পর্কের রীতি অনুসারে অজাচার নিষিদ্ধকরণ নেয় বিভিন্ন রূপ, তবে আদিম কাল থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এটা ধারণ ক'রে আছে একই অর্থ : পুরুষ তা অধিকার করতে চায় সে যা *নয়,* সে তার সাথে মিলন চায় যাকে মনে হয় তার নিজেকে থেকে *অপর*। সুতরাং স্ত্রী তার স্বামীর মানার অংশী হবে না, তাকে হ'তে হবে স্বামীর কাছে অপরিচিত, এবং এভাবে তার গোত্রের কাছে অপরিচিত। আদিম বিবাহ অনেক সময় অনুষ্ঠিত হয়, সত্যিকার বা প্রতীকী, অপহরণের মধ্য দিয়ে, এবং নিশ্চিতভাবেই অপরের ওপর যে-হিংস্রতা চালানো হয়, তা-ই হচ্ছে ওইজনের বিকল্পতার অতিশয় স্পষ্ট ঘোষণা। বলপ্রয়োগ ক'রে নিজের স্ত্রীকে গ্রহণ ক'রে যোদ্ধা দেখায় যে সে অপরিচিতদের সম্পদ নিজের অধিকারে আনতে এবং জন্মসূত্রে তার জন্যে নির্ধারিত হয়েছে যে-নিয়তি, তার সীমা ভেঙে ফেলতে সমর্থ। বিচিত্র রীতিতে স্ত্রী-ক্রয়– কর দান, সেবা দান– যদিও কম নাটকীয়, তবুও তার তাৎপর্য একই।

অল্প অল্প ক'রে পুরুষ কাজ করতে থাকে তার অভিজ্ঞতা অনুসারে, এবং তার প্রতীকী উপস্থাপনে, যেমন তার বাস্তব জীবনে, যা জয়লাভ করে তা হচ্ছে পুরুষ-নীতি। চেতনা জয়ী হয় জীবনের ওপর, সীমাতিক্রমণতা জয়ী হয় সীমাবদ্ধতার ওপর, কৌশল জয় লাভ করে ইন্দ্রজালের ওপর, এবং যুক্তি জয় লাভ করে কুসংস্কারের ওপর। মানুষের ইতিহাসে নারীর অবমূল্যায়ন হয়ে ওঠে একটি আবশ্যক পর্ব, কেননা নারীর মর্যাদা তার সদর্থক মূল্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিষ্ঠিত পুরুষের দুর্বলতার ওপর। নারীতে মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকৃতির বিশৃঙ্খলাকর রহস্যগুলো, আর তখনই পুরুষ মুক্তি পায় নারীর অধিকার থেকে, যখন সে নিজেকে মুক্ত করে প্রকৃতি থেকে। লৌহ যুগ থেকে ব্রোঞ্জ যুগে অগ্রগতি তার শ্রমের মাধ্যমে তাকে সমর্থ করে মাটির ওপর তার প্রভুত্ব স্থাপনে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। কৃষক মৃত্তিকার বাধাবিঘ্নের অধীন, বীজের অঙ্কুরোদ্গামের অধীন, ঋতুর অধীন; সে অক্রিয়, সে প্রার্থনা করে, সে প্রতীক্ষা করে; এ-কারণেই একদা টোটেমি প্রেতাত্মারা ভিড় জমিয়েছিলো পুরুষের বিশ্বে; কৃষক তার চারপাশের এ-শক্তিগুলোর চপলতার অধীন। যন্ত্রকুশল পুরুষ, এর বিপরীতে, নিজের নকশা অনুসারে তৈরি করে তার যন্ত্রপাতি; তার পরিকল্পনা অনুসারে তার হাত দিয়ে একে সে গঠন করে; অক্রিয় প্রকৃতির মুখোমুখি হয়ে সে জয় করে প্রকৃতির প্রতিরোধ এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে তার সার্বভৌম ইচ্ছা। যদি সে নেহাইয়ের ওপর তার আঘাত দ্রুততর করে, তাহলে কম সময়ের মধ্যে সে তৈরি করে তার হাতিয়ার, আর সেখানে কোনো কিছুই শস্যের পেকে ওঠাকে ত্বরান্বিত করতে পারে না। সে যা তৈরি করছে, তা তৈরিতে সে নিজের দায়িত্ব বুঝতে পারে : তার দক্ষতায় বা অপটুতায় এটি তৈরি হবে বা ভাঙবে; সতর্ক, চতুর, সে তার দক্ষতাকে এমন এক উৎকর্ষের স্তরে নিয়ে যায় যে সে তাতে গর্ববোধ করে : দেবতাদের অনুগ্রহের ওপর তার সাফল্য নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে নিজের ওপর। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে সে তার সহচরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে, সে তার সাফল্যে

অনুপ্রাণিত হয়। এবং যদিও সে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কিছুটা জায়গা দেয়, তবু সে বোধ করে যে যথাযথ কৌশল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধ গ্রহণ করে দ্বিতীয় স্থান এবং বাস্তব স্বার্থগুলো প্রথম স্থান। সে দেবতাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। তবে সে তাদের নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যেমন সে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনে তাদের থেকে; সে তাদের হাতে ছেড়ে দেয় অলিম্পীয় স্বর্গের ভার এবং পার্থিব এলাকাটি রাখে নিজের হাতে। মহাদেবতা প্যান ম্রিয়মাণ হয়ে উঠতে থাকে, যখন বেজে ওঠে প্রথম হাতুড়ি ঘায়ের শব্দ এবং শুরু হয় পুরুষের রাজত্ব।

পুরুষ বুঝতে পারে তার শক্তি। তার সৃষ্টিশীল বাহুর সাথে তার তৈরি বস্তুর সম্বন্ধ থেকে সে বুঝতে পারে কার্যকারণ : বপন করা বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটতে পারে, আবার নাও পারে, কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে পান দেয়ার সময়, যন্ত্রপাতি তৈরির সময় ধাতু সব সময়ই সাড়া দেয় একই ভাবে। যন্ত্রপাতির জগতটিকে বোঝা সম্ভব স্পষ্ট ধারণা অনুসারে : এখন দেখা দিতে পারে যৌক্তিক চিন্তা, যুক্তি, ও গণিত। সম্পূর্ণ বর্জন করা হয় বিশ্ব সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধারণা। নারীর ধর্ম আবদ্ধ ছিলো কৃষির রাজত্ব কালের সাথে, অপর্যবসেয় সময়কালের, আকস্মিকতার, সুযোগের, প্রতীক্ষার, রহস্যের রাজত্ব কালের সাথে; *হোমো ফাবের*-এর রাজত্বকাল হচ্ছে স্থান অনুসারে সময়কে নিয়ন্ত্রণের, প্রয়োজনীয় ফলাফলের, পরিকল্পনার, কর্মের, যুক্তির রাজত্বকাল। এমনকি যখন সে জমিতে কাজ করে, তখনও সে এতে কাজ করে যন্ত্রকুশল পুরুষরূপে; সে আবিষ্কার করে যে মাটিকে উর্বর করা যায়, জমিকে পতিত রাখা ভালো, এই-এই বীজ ব্যবহার করতে হবে এই-এইভাবে। সে শস্যকে ফলতে বাধ্য করে; সে খাল খোঁড়ে, জল সেঁচে বা নিষ্কাশন করে, সে রাস্তা বানায়, মন্দির তৈরি করে : সে সৃষ্টি করে এক নতুন বিশ্ব।

যে-সব মানবগোষ্ঠি থেকে যায় দেবী মহামাতার নিয়ন্ত্রণে, যারা রক্ষা ক'রে চলে মাতৃধারার শাসন, তারা বন্দী হয়ে পড়ে সভ্যতার আদিম স্তরে। নারীকে ততোটা মাত্রায়ই ভক্তি করা হতো, পুরুষ যতোটা হয়ে পড়েছিলো নিজের ভয়ের দাস : পুরুষ নারীকে ভক্তি করতো প্রেমে নয়, ত্রাসে। পুরুষ তার নিয়তি অর্জন করতে পারতো শুধু নারীকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে। তারপর থেকে পুরুষ সার্বভৌমরূপে স্বীকার করে শুধু সৃষ্টিশীল শক্তি, আলো, মনন, শৃঙ্খলা প্রভৃতি পুরুষ-নীতিকেই। দেবী মহামাতার পাশে দেখা দেয় আরেকটি দেবতা, পুত্র বা প্রেমিক, যে তখনো ছিলো দেবী মহামাতার অধীনে, কিন্তু সব বৈশিষ্ট্যেই সে দেবী মহামাতার মতো, এবং তার সহচর। সেও প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে এক উর্বরতা নীতির, বৃষরূপে দেখা দেয় মিনোতাউর, নীল নদী উর্বর ক'রে তোলে মিশরের নিম্নাঞ্চল। সে মারা যায় শরতে এবং পুনর্জীবন লাভ করে বসন্তে, যখন তার অবেধ্য কিন্তু সান্ত্বনাহীনভাবে শোকাতুর স্ত্রী-মাতা নিজের শক্তি নিয়োগ ক'রে খুঁজে পায় তার মৃতদেহ এবং পুনর্জীবন দেয় তাকে। এ-যুগলকে আমরা প্রথম আবির্ভূত হ'তে দেখি ক্রিটে, এবং তারপর দেখতে পাই ভূমধ্যসাগরীয় সমস্ত উপকূলে : মিশরে এটা আইসিস ও হোরাস, ফিনিশিয়ায় আস্তারতে ও অ্যাডোনিস, এশিয়া মাইনরে সিবিলে ও আত্তিস, এবং হেলেনি গ্রিসে এটা রিয়া ও জিউস।

এবং এর পরই সিংহাসনচ্যুত করা হয় মাহামাতাকে। মিশরে, যেখানে নারীর

পরিস্থিতি থাকে অসাধারণভাবে অনুকূল, সেখানে নাট, যে হয় আকাশমণ্ডলের প্রতিমূর্তি, এবং আইসিস, উর্বরতার প্রতিমূর্তি, নীলনদের পত্নী এবং ওসিরিস রয়ে যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবী, কিন্তু তবুও সেখানে রা, যে দেবতা সূর্যের, আলোর, পৌরুষ শক্তির, সে হয়ে ওঠে পরম প্রধান। ব্যাবিলনে ইশতার হয়ে ওঠে বেল-মার্দুকের পত্নী মাত্র। বেল-মার্দুক সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সামঞ্জস্যবিধানকারী। সেমিটিদের দেবতাও পুরুষ। যখন সর্বশক্তি নিয়ে দেখা দেয় জিউস, তখন ক্ষমতাহীন হয়ে ওঠে গাইয়া, রিয়া, ও সিবিলে। দিমিতার থাকে একটি দ্বিতীয় মর্যাদার দেবী। বৈদিক দেবতাদের পত্নী আছে, কিন্তু স্বামীদের মতো পুজো পাওয়ার অধিকার তাদের নেই। রোমীয় জুপিটারের সমকক্ষ তো নেই কেউই।

তাই পিতৃতন্ত্রের বিজয় কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিলো না, আর তা প্রচণ্ড কোনো বিপ্লবের ফলও ছিলো না। মানবজাতির সূচনা থেকেই নিজেদের জৈবিক সুবিধা পুরুষকে দিয়েছে নিজেদের সর্বেসর্বা ও সার্বভৌমরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা; তারা এ-অবস্থান কখনো ছেড়ে দেয় নি; তারা একদা তাদের স্বাধীন অস্তিত্বের একটি অংশ ছেড়ে দিয়েছিলো প্রকৃতি ও নারীর কাছে; কিন্তু পরে তারা তা আবার অধিকার ক'রে নেয়। অপর-এর ভূমিকা পালনের জন্যে দণ্ডিত নারী এছাড়াও দণ্ডিত হয় শুধু অনিশ্চিত শক্তি ধারণে : দাসী অথবা দেবী, নারী কখনো নিজের ভাগ্য নিজে বেছে নেয় নি। 'পুরুষ দেবতা সৃষ্টি করে; নারীরা তাদের পুজো করে,' বলেছেন ফ্রেজার; পুরুষই ঠিক করে তাদের পরম দেবতা পুরুষ হবে না স্ত্রী হবে; পুরুষ নারীর জন্যে যা ঠিক করেছে, নারীর অবস্থা সব সময়ই হয়েছে তা-ই; নারী কখনোই তার নিজের বিধান আরোপ করে নি।

তবে যদি নারীর শক্তির মধ্যে থাকতো উৎপাদনশীল শ্রম, তাহলে হয়তো পুরুষের সাথে নারীও জয়ী হতো প্রকৃতির ওপর; তাহলে মানবপ্রজাতি দেবতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতো পুরুষ ও নারী উভয়েরই মধ্য দিয়ে; কিন্তু নারী নিজের জন্যে হাতিয়ারের প্রতিশ্রুত সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে নি। এঙ্গেলস নারীর মর্যাদাহানির একটি অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র : একথা বলা যথেষ্ট নয় যে ব্রোঞ্জ ও লোহা আবিষ্কার উৎপাদনের শক্তিগুলোর ভারসাম্য নষ্ট করেছিলো গভীরভাবে এবং এর ফলেই নারী পতিত হয়েছিলো নিম্নাবস্থানে; নারী যে-পীড়ন ভোগ করেছে, তা ব্যাখ্যার জন্যে এ-নিম্নতার ধারণা যথেষ্ট নয়। নারীর জন্যে যা ছিলো দুর্ভাগ্যজনক, তা হচ্ছে সে শ্রমিকের সহকর্মী না হওয়ার ফলে সে বাদ প'ড়ে যায় মানবিক *মিটজাইন* থেকেও। নারী দুর্বল এবং তার উৎপাদন শক্তি কম, এটা তার বাদ পড়া ব্যাখ্যা করতে পারে না; নারী যেহেতু পুরুষের কর্মপদ্ধতি ও চিন্তারীতিতে অংশ নেয় নি, যেহেতু নারী দাসত্বের বন্ধনে রয়ে গেছে জীবনের রহস্যময় প্রক্রিয়ার কাছে, তাই পুরুষ নারীর মধ্যে নিজের মতো কোনো সত্তাকে দেখতে পায় নি। যেহেতু সে গ্রহণ করে নি নারীকে, তার চোখে যেহেতু নারীকে মনে হয়েছে *অপর*-এর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব'লে, তাই পুরুষের পক্ষে নারীর পীড়নকারী ছাড়া আর কিছু হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। পুরুষের ক্ষমতা লাভের ও সম্প্রসারণের ঈপ্সা নারীর অশক্তিকে পরিণত করেছে একটি অভিসম্পাতে।

নতুন কৌশলগুলো খুলে দিয়েছিলো যে-সব সম্ভাবনা, পুরুষ চেয়েছিলো সেগুলো চূড়ান্তরূপে বাস্তবায়িত করতে : সে কাজে লাগাতে থাকে দাসশ্রমশক্তি, সহকর্মী পুরুষদের সে পরিণত করে দাসে। নারীদের শ্রমের থেকে দাসদের শ্রম যেহেতু ছিলো অনেক বেশি কার্যকর, তাই গোত্রের মধ্যে নারী যে-আর্থনীতিক ভূমিকা পালন করতো, তা সে হারিয়ে ফেলে। নারীর ওপর সীমিত কর্তৃত্বের থেকে দাসের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে প্রভু পেতো তার সার্বভৌমত্বের অনেক বেশি আমূল স্বীকৃতি। তার উর্বরতার কারণে পুরুষ তাকে ভক্তি ও ভয় করতো ব'লে, পুরুষের কাছে সে *অপর* ছিলো ব'লে, এবং *অপর*-এর উদ্বেগজাগানো চরিত্রের সে অংশী ছিলো ব'লে, নারী এক রকমে তার ওপর নির্ভরশীলতায় আবদ্ধ রাখতো পুরুষকে, এবং একই সময়ে সে নির্ভরশীল থাকতো পুরুষের ওপর; *প্রকৃতপক্ষে* সে উপভোগ করতো প্রভু-দাসের সম্পর্কের পারস্পরিকতা, এবং এভাবে সে এড়িয়ে যায় দাসত্বকে। এবং দাস কোনো ট্যাবু দিয়ে সুরক্ষিত ছিলো না, দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ একটি পুরুষ ছাড়া সে আর কিছু ছিলো না, ভিন্ন নয় তবে নিকৃষ্ট : তার প্রভুর সাথে তার সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রকাশ পেতে বহু শতাব্দী কেটি যায়। সুসংগঠিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দাস ছিলো মানুষের মুখধারী এক ভারবাহী পশু; প্রভু তার ওপর প্রয়োগ করতো স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব, যা মহিমান্বিত করতো তার গর্বকে– এবং সে দাঁড়ায় নারীর বিরুদ্ধে। পুরুষ যা কিছু অর্জন করে, তা অর্জন করে নারীর বিরুদ্ধে, পুরুষ যতো শক্তিশালী হয়, ততো পতন ঘটে নারীর।

বিশেষ ক'রে, সে যখন হয়ে ওঠে ভূমির মালিক, তখন সে দাবি করে নারীরও মালিকানা। আগে সে আবিষ্ট ছিলো মানা দিয়ে, ভূমি দিয়ে; এখন তার আছে একটি আত্মা, তার আছে কিছুটা ভূমি; নারীর থেকে মুক্তি পেয়ে এখন সে নিজের জন্যে দাবি করে নারী এবং উত্তরপুরুষ। সে চায় যে সাংসারিক কাজকর্ম সবই হবে তার নিজের, এর অর্থ হচ্ছে সব কর্মীর মালিক হবে সে নিজে : সুতরাং সে দাস ক'রে তোলে তার স্ত্রী ও সন্তানদের। উত্তরাধিকারী তার প্রয়োজন, যাদের মধ্য দিয়ে দীর্ঘায়িত হবে তার পার্থিব জীবন, কেননা সে তাদের হাতে দিয়ে যাবে তার সম্পত্তি; এবং মৃত্যুর পর তার আত্মার শান্তির জন্যে তারা পালন করবে নানা কৃত্যানুষ্ঠান। ব্যক্তিমালিকানার ওপর স্থাপিত হয় গৃহদেবতাপ্রথা, এবং উত্তরাধিকারী সম্পন্ন করে এমন একটি কাজ, যা একই সঙ্গে আর্থনীতিক ও অতীন্দ্রিয়। তাই যেদিন কৃষিকাজ আর ঐন্দ্রজালিক কর্ম থাকে না, হয়ে ওঠে এক সৃষ্টিশীল কাজ, পুরুষ বুঝতে পারে সে এক সৃষ্টিশীল শক্তি, সেদিন একই সাথে সে অধিকার দাবি করে নিজের সন্তান ও শস্যের ওপর।

আদিম কালে মাতৃধারার স্থানে পিতৃধারার প্রতিষ্ঠার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভাবাদর্শগত বিপ্লব ঘটে নি; তারপর মাতা পতিত হয় ধাত্রী ও দাসীর শ্রেণীতে, কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকে পিতার হাতে, যা সে অর্পণ ক'রে যায় উত্তরাধিকারীদের হাতে। সন্তান উৎপাদনে পুরুষের ভূমিকা তখন বোঝা হয়ে গেছে, তবে এছাড়াও দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করা হয় যে শুধু পিতাই জন্ম দেয়, মা শুধু তার দেহের ভেতরে প্রাপ্ত জীবাণুটির পুষ্টি যোগায়, যেমন এস্কিলুস বলেছেন *ইউমেনিদেস*-এ। আরিস্ততল বলেছেন নারী বস্তুমাত্র, আর সেখানে পুরুষ-নীতি হচ্ছে গতি, যা 'উৎকৃষ্টতর ও অধিক

স্বর্গীয়'। উত্তরপুরুষকে একান্তভাবে নিজের ক'রে নিয়ে পুরুষ অর্জন করে পৃথিবীর ওপর আধিপত্য ও নারীর ওপর প্রভুত্ব। যদিও প্রাচীন পুরাণে ও গ্রিক নাটকে এটাকে দেখানো হয়েছে একটি প্রচণ্ড সংগ্রামের পরিণতি হিশেবে, কিন্তু আসলে পিতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিলো একটি ক্রমসংঘটিত পরিবর্তন। পুরুষ শুধু তাই পুনরায় জয় ক'রে নেয়, যা একদা ছিলো তারই অধিকারে, সে আইনপদ্ধতিকে ক'রে তোলে বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো যুদ্ধ হয় নি, কোনো জয় ছিলো না, পরাজয় ছিলো না।

তবে এ-প্রাচীন কিংবদন্তিগুলোর আছে সুগভীর অর্থ। যে-মুহূর্তে পুরুষ দৃঢ়ভাবে নিজেকে ঘোষণা করে কর্তা ও স্বাধীন ব্যক্তিরূপে, তখনই দেখা দেয় অপর ধারণাটি। সেদিন থেকেই অপর-এর সাথে সম্পর্কটি হয় নাটকীয় : অপর-এর অস্তিত্ব হচ্ছে একটি হুমকি, একটি বিপদ। প্রাচীন গ্রিক দর্শন দেখিয়েছে যে বিকল্পতা, অপরত্ব হচ্ছে নেতির মতোই জিনিশ, তাই অশুভ। অপরকে উত্থাপন করাই হচ্ছে এক ধরনের ম্যানিকীয়বাদ সংজ্ঞায়িত করা। এ-কারণেই ধর্মগুলো আর আইনের বিধানগুলো এতো বৈরী আচরণ করে নারীর সাথে। মানবজাতি যে-সময়ে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে পুরাণ ও আইন, তখন চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা : পুরুষই বিধিবদ্ধ করতে থাকে নানা বিধান। নারীকে অধীন অবস্থান দেয়া তাদের জন্যে ছিলো খুবই স্বাভাবিক, তবু ভাবতে পারি যে পুরুষ সন্তান ও গবাদিপশুর প্রতি যতোটা সদয়তা দেখিয়েছে, তা সে দেখাতে পারতো নারীর প্রতিও– কিন্তু একটুও দেখায় নি। নারীপীড়নের বিধিবিধান প্রণয়ন করতে করতে বিধানকর্তারা ভয় পায় নারীকে। নারীর ওপর এক সময় আরোপ করা হয়েছিলো যে-দুটি বিপরীত শক্তি, তার থেকে এখন তার জন্যে রাখা হয় শুধু অশুভ বৈশিষ্ট্যগুলো : একদা পবিত্র, এখন সে হয় দূষিত। আদমের সহচরীরূপে দেয়া হয়েছিলো যে-হাওয়াকে, সে সম্পন্ন করে মানবজাতির বিনাশ; পৌত্তলিক দেবতারা যখন মানুষের ওপর চরিতার্থ করতে চেয়েছিলো প্রতিহিংসা, তখন তারা উদ্ভাবন করেছিলো নারী; এবং নারীজীবদের মধ্যে প্রথম জন্ম নিয়েছিলো যে, সেই প্যান্ডোরা মানুষের জন্যে খুলে দিয়েছিলো সমস্ত দুর্ভোগগুলো। তাই নারী অশুভের কাছে উৎসর্গিত। 'আছে এক শুভ নীতি, যা সৃষ্টি করেছে শৃঙ্খলা, আলোক, ও পুরুষ; এবং এক অশুভ নীতি, যা সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা, অন্ধকার, ও নারী,' বলেছেন পিথাগোরাস। মনুর বিধানে নারী গর্হিত সত্তা, যাকে ক'রে রাখতে হবে দাসী। লেভিটিকাস নারীকে তুলনা করেছে গৃহপতির ভারবাহী পশুর সাথে। সোলোনের বিধানে নারীকে কোনো অধিকার দেয়া হয় নি। রোমান বিধি তাকে রেখেছে অভিভাবকের অধীনে, তার মধ্যে দেখেছে 'মূঢ়তা'। গির্জার বিধান তাকে নির্দেশ করেছে 'শয়তানের প্রবেশপথ' ব'লে। কোরানে নারীকে করা হয়েছে প্রচণ্ড তিরস্কার।

এবং তবুও শুভর দরকার অশুভ, ভাবের দরকার বস্তু, এবং আলোর দরকার অন্ধকার। পুরুষ জানে তার বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে, তার জাতিকে স্থায়িত্ব দেয়ার জন্যে নারী অপরিহার্য; নারীকে তার দিতে হবে সমাজে একটি অবিচ্ছেদ্য স্থান : পুরুষ যে-শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে, নারী তা যতোটা মেনে চলবে, তাকে ততোটা মুক্ত করা হবে তার আদিকলঙ্ক থেকে। এ-ধারণাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে

মনুর বিধানে : 'বৈধ বিবাহের মাধ্যমে নারী অর্জন করে তার স্বামীর গুণাবলি, নদী যেমন সমুদ্রে হারায় নিজেকে, এবং মৃত্যুর পর তাকে স্থান দেয়া হয় একই স্বর্গে।' একইভাবে বাইবেলেও অঙ্কিত হয়েছে 'সতীনারী'র এক প্রশংসিত চিত্র (প্রবাদ ২১, ১০-৩১)। খ্রিস্টধর্ম মাংসকে ঘৃণা করলেও শ্রদ্ধা করে পবিত্র কুমারীকে, সতী ও অনুগত স্ত্রীকে। ধর্মসাধনে সহচরী হিশেবে নারী পালন করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ভূমিকা : ভারতে ব্রাহ্মণী, রোমে ফ্ল্যামিনিকা উভয়ই তাদের পতিদের মতো পবিত্র। যুগলের মধ্যে পুরুষটিই প্রাধান্য করে, তবে প্রজননের জন্যে, জীবন নির্বাহের জন্যে, এবং সমাজের শৃঙ্খলার জন্যে দরকার হয় পুরুষ ও নারী নীতির মিলন।

অপর-এর, নারীর, এ-পরস্পর বিপরীত মূল্যই প্রতিফলিত হবে তার বাকি ইতিহাসে; আমাদের কাল পর্যন্ত তাকে রাখা হবে পুরুষের ইচ্ছের অধীনে। তবে এটা হবে দ্ব্যর্থক : সম্পূর্ণরূপে অধিকারে ও নিয়ন্ত্রণে এনে নারীকে নামিয়ে দেয়া হবে বস্তুর পর্যায়ে; তবে পুরুষ যাই জয় ও অধিকার করে, তাকেই আবৃত ক'রে দিতে চায় নিজের গৌরবে; পুরুষের কাছে মনে হয় যে অপর এখনো ধারণ ক'রে আছে তার কিছুটা আদিম ইন্দ্রজাল। কী ক'রে স্ত্রীকে একইসঙ্গে দাসী ও সঙ্গিনী করা যায়, এ-সমস্যাটিকে সে সমাধান করার চেষ্টা করবে; আর মানসিকতার বিবর্তন ঘটতে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে; এবং ঘটাতে থাকবে নারীর নিয়তিরও বিবর্তন।

পরিচ্ছেদ ৩

পিতৃতান্ত্রিক কাল ও ধ্রুপদী মহাযুগ

নারী সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলো সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার আগমনে, এবং শতাব্দী পরম্পরায় তার ভাগ্য জড়িয়ে আছে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার সঙ্গে : তার ইতিহাসের বড়ো অংশই জড়িত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিষয়সম্পত্তির ইতিহাসের সাথে। এ-প্রথার মৌলিক গুরুত্ব বোঝা যায় সহজে যদি একথা মনে রাখি যে মালিক তার অস্তিত্ব স্থানান্তরিত, বিচ্ছিন্ন, করে তার সম্পত্তির মধ্যে; সে একে নিজের জীবনের থেকেও বেশি মূল্য দেয়; এটা প্রবাহিত হয় এ-মরজীবনের সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে, এবং শরীর মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও টিকে থাকে– ঘটে অমর আত্মার পার্থিব ও বস্তুগত একত্রীভবন। তবে এ-বেঁচে থাকা সম্ভব হয় যদি সম্পত্তি থাকে মালিকের হাতে : মৃত্যুর পরও এটা তার হ'তে পারে যদি এটা তাদের অধিকারে থাকে, যাদের মধ্যে সে নিজেকে প্রক্ষেপিত দেখতে পায়, যারা *তার*। সুতরাং পুরুষ নারীর সাথে তার দেবতা ও সন্তান ভাগাভাগি ক'রে নিতে রাজি নয়। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার কালে পুরুষ সম্পত্তির মালিকানা ও দানের সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নেয় নারীর কাছে থেকে।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে, তার কাছে এটা যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়েছিলো। যখন স্বীকার করা হয় যে নারীর সন্তানেরা আর তার নয়, ওই স্বীকৃতি অনুসারেই নারীটি যে-দল থেকে এসেছে, তার সাথে সন্তানদের কোনো বন্ধন থাকে না। বিয়ের মাধ্যমে নারী আর এক গোত্রের কাছে থেকে আরেক গোত্রের ঋণগ্রহণ নয় : সে যে-গোত্রে জন্মেছিলো সে-গোত্র থেকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে আনা হয় তাকে, এবং অন্তর্ভুক্ত করা হয় স্বামীর দলে; স্বামী তাকে কেনে যেমন কেউ কেনে গোয়ালের জন্যে পশু বা দাস; স্বামী তার ওপর চাপিয়ে দেয় তার গৃহদেবতাদের; এবং নারীটির গর্ভের সন্তানেরা অন্তর্ভুক্ত হয় স্বামীর পরিবারের। যদি নারী উত্তরাধিকারী হতো, তাহলে সে পিতার পরিবারের বেশ কিছু সম্পত্তি হস্তান্তরিত করতো স্বামীর পরিবারে; তাই সযত্নে তাকে বাদ দেয়া হয় উত্তরাধিকার থেকে। উল্টোভাবে, যেহেতু নারী কিছুর মালিক নয়, সে মানুষের মর্যাদাও পায় না; সে নিজেই হয়ে ওঠে পুরুষের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তির অংশ : প্রথমে পিতার, পরে স্বামীর। কঠোর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পিতা জন্মের মুহূর্ত থেকে পুত্র ও কন্যা সন্তানদের হত্যা করতে পারে; কিন্তু পুত্রের বেলা সমাজ অস্বাভাবিকভাবে খর্ব করে তার ক্ষমতা : প্রতিটি সুস্থ নবজাতক পুত্রকে বাঁচতে দেয়া হয়, অন্যদিকে শিশুকন্যাদের অরক্ষিত রাখার রীতি ছিলো খুবই ব্যাপক। আরবদের মধ্যে শিশুহত্যা ছিলো ব্যাপক : জন্মের সাথে সাথেই কন্যাশিশুদের গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হতো। শিশু কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখা ছিলো পিতার বিশেষ

মহানুভবতা; এমন সমাজে পুরুষের বিশেষ দয়ায়ই নারী বেঁচে থাকতে পারে, পুত্রের মতো বৈধভাবে নয়। প্রসবের পর প্রসূতির অশৌচের কাল হয় দীর্ঘতর যদি শিশুটি হয় মেয়ে : হিব্রুদের মধ্যে, *লেভিটিকাস* নির্দেশ দিয়েছে পুত্র জন্ম নিলে যতো দিন অশৌচ পালন করতে হবে কন্যা জন্ম নিলে অশৌচ পালন করতে হবে তার থেকে দু-মাস বেশি। যে-সব সমাজে 'রক্তের মূল্য'-এর প্রথা আছে, সেখানে নিহত ব্যক্তিটি স্ত্রীলিঙ্গের হ'লে মূল্য হিশেবে দাবি করা হয় অল্প মুদ্রা : পুংলিঙ্গের সাথে তুলনায় তার মূল্য ততোটা একজন স্বাধীন পুরুষের তুলনায় একটি দাসের মূল্য যতোটা।

যখন সে কিশোরী হয়ে ওঠে, তার ওপর থাকে তার পিতার সমস্ত কর্তৃত্ব; যখন তার বিয়ে হয়, তখন তার পিতা সে-কর্তৃত্ব কড়ায়গণ্ডায় হস্তান্তরিত করে স্বামীর হাতে। স্ত্রী যেহেতু দাসের মতো, ভারবাহী পশুর মতো, বা অস্থাবর সম্পত্তির মতো স্বামীর সম্পত্তি, তাই পুরুষ স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতে পারে যতো ইচ্ছে ততো স্ত্রী; শুধু আর্থনীতিক বিবেচনার ফলেই বহুবিবাহ থাকে বিশেষ সীমার মধ্যে। স্বামী নিজের খেয়ালে ছেড়ে দিতে পারে স্ত্রীদের, সমাজ তখন তাদের কোনোই নিরাপত্তা দেয় না। অন্যদিকে, নারীকে রাখা হয় কঠোর সতীত্বের মধ্যে। ট্যাবু থাকা সত্ত্বেও মাতৃধারার সমাজে মেনে নেয়া হয় আচরণের ব্যাপক স্বাধীনতা; বিবাহপূর্ব কুমারীত্ব সেখানে বিশেষ দরকার হয় না, এবং ব্যভিচারকেও বিশেষ কঠোরতার সাথে শাসন করা হয় না। এর বিপরীতে, যখন নারী হয়ে ওঠে পুরুষের সম্পত্তি, স্বামী চায় স্ত্রীটি হবে কুমারী এবং সে কঠোর দণ্ডের ভয় দেখিয়ে স্ত্রীর কাছে দাবি করে সম্পূর্ণ সতীত্ব। কোনো উপপতির সন্তানকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে চরম অপরাধ : তাই দোষী স্ত্রীকে হত্যা করার সমস্ত অধিকার আছে গৃহস্বামীর। যতোদিন ব্যক্তিমালিকানা প্রথা টিকে থাকবে, স্ত্রীর অসতীত্বকে ততোদিন গণ্য করা হবে রাজদ্রোহিতার মতো অপরাধ ব'লে। আইনের সমস্ত বিধি, যেগুলো আজো ব্যভিচারের ক্ষেত্রে মেনে চলে অসাম্য, সবগুলোই যুক্তি দাঁড় করায় স্ত্রীর মহাঅপরাধের ওপর, যে পরিবারের মধ্যে নিয়ে আসে একটি জারজ। এবং যদিও নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অধিকার অগাস্টাসের কাল থেকেই বিলুপ্ত, নেপোলিয়নি বিধি আজো জুরির অধিকার অর্পণ করে স্বামীর হাতে, যে নিজেই প্রয়োগ করেছে ন্যায়বিচার।

যখন স্ত্রীটি একই সময়ে অন্তর্ভুক্ত হতো পৈতৃক গোত্রে ও দাম্পত্য পরিবারের, তখন সে দু-ধরনের বন্ধনের মধ্যে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারতো; এ-বন্ধন দুটি ছিলো বিশৃঙ্খল ও এমনকি পরস্পরবিরোধী, যার একটি স্ত্রীটিকে রক্ষা করতো অন্যটি থেকে : উদাহরণস্বরূপ, প্রায়ই সে নিজের পছন্দমতো স্বামী গ্রহণ করতে পারতো, কেননা বিয়ে ছিলো একটা ঐহিক ঘটনা মাত্র, যা সমাজের মৌল সংগঠনের ক্ষতি করতো না। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে তার পিতার সম্পত্তি, যে তার সুবিধামতো মেয়েকে বিয়ে দিতো। তারপর স্বামীর চুলোর সাথে জড়িয়ে থেকে সে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তির বেশি কিছু হতো না এবং হতো সে-গোত্রের অস্থাবর সম্পত্তি, যাতে ফেলা হয়েছে তাকে।

যখন পরিবার ও ব্যক্তিমালিকানানির্ভর উত্তরাধিকার প্রশ্নহীনভাবে থাকে সমাজের ভিত্তি, তখন নারী থাকে সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ। এটা ঘটে মুসলমান জগতে। এর

সংগঠন সামন্ততান্ত্রিক; অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্রই বিভিন্ন গোত্রকে সমন্বিত ও শাসন করার মতো শক্তি অর্জন করে নি : পিতৃতান্ত্রিক প্রধানের ক্ষমতা খর্ব করার মতো কারো শক্তি নেই। আরবরা যখন রণলিপ্সু ও বিজয়ী ছিলো তখন সৃষ্টি হয়েছিলো ধর্মটি, সেটি নারীকে করেছে প্রচণ্ড অবজ্ঞা। কোরান ঘোষণা করেছে : 'পুরুষ নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ কেননা আল্লা তাকে বিশেষ গুণ দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বে ভূষিত করেছে এবং এজন্যে যে তারা নারীদের উপঢৌকন দেয়'; সেখানে নারীদের কখনো প্রকৃত ক্ষমতা ছিলো না অতীন্দ্রিয় মর্যাদাও ছিলো না। বেদুইন নারী কঠোর পরিশ্রম করে, সে হাল চাষ করে ও বোঝা বহন করে : এভাবে সে তার স্বামীর সাথে স্থাপন করে একটা পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক; সে মুখ খোলা রেখে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। বোরখায় ঢাকা ও অবরোধবাসিনী মুসলমান নারী আজো অধিকাংশ সামাজিক স্তরে একধরনের দাসী।

তিউনিশিয়ার এক আদিম পল্লীর ভূগর্ভস্থ এক গুহার ভেতরে ব'সে থাকা চারটি নারীকে আমি দেখেছিলাম, তাদের কথা আমার মনে পড়ছে : বৃদ্ধা এক চোখ কানা দাঁতহীন স্ত্রীটি, যার মুখমণ্ডল ভীষণভাবে বিধ্বস্ত, একটি ছোট্ট মালশার ওপরে তীব্র ঝাঁজালো ধুঁয়োর মধ্যে রাঁধছিলো ময়দার পিণ্ড; আরো দুটি স্ত্রী, কিছুটা কম বয়সের, কিন্তু একই রকমে বিধ্বস্ত, শিশু কোলে নিয়ে ব'সে ছিলো, একজন বুকের দুধ দিচ্ছিলো শিশুকে; আর তাঁতের সামনে ব'সে রেশম, সোনা, আর রুপোতে অলঙ্কৃত প্রতিমার মতো এক তরুণী বুনছিলো পশম। আমি যখন সেই বিষাদাচ্ছন্ন গুহা– সীমাবদ্ধতা, জরায়ু, ও সমাধির রাজ্য– ছেড়ে বারান্দা দিয়ে ওপরে দিনের আলোর দিকে এলাম, তখন দেখলাম পুরুষটিকে, সে পরেছে শুভ্র পোশাক, অত্যন্ত সুসজ্জিত, মুখে হাসি, ঝলমলে। সে বাজার থেকে ফিরছিলো, যেখানে সে অন্যান্য পুরুষের সাথে বিশ্বের নানা কথা বলেছে; সে যে-বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত, যে-বিশ্ব থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, তার সে-বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এ-বিশ্রামস্থলে সে কয়েক ঘণ্টা কাটাবে। ওই বৃদ্ধা জীর্ণ নারীদের জন্যে, আর ওই তরুণীটির জন্যে, যে ওই বৃদ্ধাদের মতোই দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাবে, এ-ধোঁয়াচ্ছন্ন গুহা ছাড়া আর কোনো বিশ্ব নেই; এ-গুহা থেকে তারা বেরোয় শুধু রাতে, নিঃশব্দে, বোরখায় ঢেকে।

বাইবেলের সময়ের ইহুদিদের ছিলো এ-আরবদের মতো একই প্রথা। গৃহপতিরা ছিলো বহুবিবাহকারী; আর তারা খেয়ালখুশি মতো ছেড়ে দিতে পারতো স্ত্রীদের; বিয়ের সময় তরুণী স্ত্রীকে অবশ্যই হ'তে হতো কুমারী, নইলে বিধান ছিলো কঠোর শাস্তির; ব্যভিচার ঘটলে স্ত্রীকে হত্যা করা হতো পাথর ছুঁড়ে; স্ত্রীকে রাখা হতো গৃহস্থালির কাজের মধ্যে বন্দী, যেমন প্রমাণ করে বাইবেলের সতী ভার্যার চিত্র : 'সে চায় পশম ও শণ... সে রাত থাকতে ওঠে... রাতেও তার প্রদীপ নেভে না... সে আলস্যের অন্ন গ্রহণ করে না।' যদিও সে সতী ও পরিশ্রমী, কিন্তু অনুষ্ঠানাদিতে সে অশুচি, ট্যাবুতে ঢাকা; বিচারালয়ে তার সাক্ষ্য গৃহীত হয় না। *ইক্লিজিয়াসটেস* নারী সম্পর্কে প্রকাশ করেছে জঘন্যতম ঘৃণা : 'আমি নারীকে মৃত্যুর থেকেও বিষাক্ত দেখি, যার মন হচ্ছে ফাঁদ ও জাল, এবং তার হাত হচ্ছে পাশ... সহস্রের মধ্যে আমি অন্তত একটি পুরুষ পেয়েছি; কিন্তু ওই সবগুলোর মধ্যেও আমি একটি নারী পাই নি।' ধর্মের বিধান না হ'লেও সামাজিক প্রথা ছিলো যে স্বামীর মৃত্যু হ'লে বিধবাটি তার ভাইদের

কোনো একজনের কাছে বিয়ে বসবে।

প্রাচ্যদেশীয় অনেক সমাজে *লেভিরেট* নামে একটি প্রথা আছে। সব ব্যবস্থায়ই, যেখানে নারী থাকে কারো অভিভাবকত্বে, সেখানে একটি সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয় যে কী করতে হবে বিধবাদের নিয়ে? চরম সমাধান হচ্ছে তাদের স্বামীর সমাধিতে উৎসর্গ করা। তবে ভারতেও এ-বিধান এমন ধ্বংসযজ্ঞকে অত্যাবশ্যক ক'রে তোলে নি; মনুর বিধানে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার বেঁচে থাকার অনুমতি আছে। সমারোহপূর্ণ আত্মহত্যাগুলো কখনোই অভিজাতদের একটা ঢঙ ছাড়া বেশি কিছু ছিলো না। সাধারণত বিধবাদের তুলে দেয়া হতো স্বামীর উত্তরাধিকারীদের হাতে। লেভিরেট প্রথা অনেক সময় রূপ নেয় একপত্নীবহুস্বামী বিয়ের; বিধবার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা দূর করার জন্যে একটি পরিবারের সব ভাইকে করা হতো একটি নারীর স্বামী, এ-প্রথা গোত্রকে স্বামীর সম্ভাব্য বন্ধ্যাত্বের সমস্যা থেকেও রক্ষা করতো। সিজারের এক বিবরণে পাওয়া যায় যে ব্রিটানিতে পরিবারের সব পুরুষের থাকতো কয়েকটি সাধারণ স্ত্রী।

সর্বত্র অবশ্য পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা চরমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ব্যাবিলনে হাম্মুরাবির বিধানে নারীদের দেয়া হয়েছিলো কিছু অধিকার; সে পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ পেতো, এবং তার বিয়ের সময় পিতা পণ দিতো। পারস্যে বহুবিবাহ ছিলো সামাজিক রীতি; সেখানে চাওয়া হতো যে স্ত্রী হবে স্বামীর একান্ত বাধ্য, বিয়ের বয়স হ'লে তার পিতা ঠিক করতো পাত্র; তবে অধিকাংশ প্রাচ্য সমাজের তুলনায় সেখানে স্ত্রী পেতো অনেক বেশি মর্যাদা। অজাচার নিষিদ্ধ ছিলো না, এবং ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হতো প্রায়ই। স্ত্রী পালন করতো সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব– ছেলেদের সাত বছর বয়স, আর মেয়েদের বিয়ে পর্যন্ত। পুত্র অযোগ্য হ'লে সে স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশ পেতো; আর সে যদি হতো 'সুবিধাপ্রাপ্ত স্ত্রী', তাহলে পেতো অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের কর্তৃত্ব এবং যদি স্বামী কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র না রেখে মারা যেতো, তাহলে ব্যবসা চালানোর দায়িত্বও পেতো। বিয়ের বিধান স্পষ্টভাবে নির্দেশ করতো যে গৃহস্বামীর উত্তরপুরুষ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রচলিত ছিলো পাঁচ ধরনের বিয়ে : (১) নারীর যদি পিতামাতার সম্মতিতে বিয়ে হতো, তাহলে তাকে বলা হতো 'সুবিধাপ্রাপ্ত স্ত্রী'; তার সন্তানেরা হতো তার স্বামীর। (২) যদি নারীটি পিতামাতার একমাত্র সন্তান হতো, তাহলে তার প্রথম সন্তানকে পাঠিয়ে দেয়া হতো তার পিতামাতার কাছে, যাতে সে তাদের মেয়ের স্থান নিতে পারে; এর পর স্ত্রীটি হতো 'সুবিধাপ্রাপ্ত স্ত্রী'। (৩) যদি কোনো পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যেতো, তার পরিবার পণ দিয়ে বিয়ের মাধ্যমে বাইরে থেকে গ্রহণ করতো কোনো নারীকে, তাকে বলা হতো 'পোষ্য স্ত্রী'; তার অর্ধেক সন্তান হতো মৃতের, অর্ধেক হতো তার জীবিত স্বামীর। (৪) নিঃসন্তান কোনো বিধবা যদি বিয়ে বসতো, তাকে বলা হতো 'বাঁদী স্ত্রী'; তার সন্তানদের অর্ধেক দিতে হতো তার মৃত স্বামীকে। (৫) যদি কোনো নারী পিতামাতার সম্মতি ছাড়া বিয়ে বসতো, তাহলে সে পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো না, যতো দিন না তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হয়ে নিজের মাকে তার পিতার কাছে 'সুবিধাপ্রাপ্ত স্ত্রী' হিশেবে দান করতো; এর আগেই স্বামী মারা গেলে তাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব'লে গণ্য করা হতো এবং রাখা হতো কারো কর্তৃত্বে। প্রত্যেক পুরুষই যাতে উত্তরাধিকারী রেখে যেতে

পারে পোষ্য স্ত্রী ও বাঁদী স্ত্রীর প্রথা সে-ব্যবস্থা করে, ওই সন্তানদের সাথে সে যদিও রক্তের সম্পর্কে জড়িত নয়। আমি ওপরে যা বলছিলাম এটা সেকথা প্রমাণ করে; পুরুষেরা যাতে মৃত্যুর পরও পৃথিবীতে ও পাতাললোকে অর্জন করতে পারে অমরতা, সে-জন্যেই পুরুষেরা উদ্ভাবনা করেছিলো এ-সম্পর্কটি।

মিশরেই শুধু নারীরা ছিলো সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায়। দেবী মাতারা স্ত্রী হওয়ার পরেও রক্ষা করতো তাদের মর্যাদা; দম্পতি ছিলো ধর্মীয় ও সামাজিক একক; নারীদের মনে করা হতো পুরুষের সঙ্গী ও পরিপূরক। তার ইন্দ্রজাল এতো কম বৈরি ছিলো যে এমনকি অজাচারের ভীতিকেও জয় করা হয়েছিলো এবং নির্দ্বিধায় সম্মিলিত করা হয়েছিলো বোন ও স্ত্রীকে। নারীদের ছিলো পুরুষদের মতো একই অধিকার, বিচারালয়ে ছিলো একই ক্ষমতা; নারী উত্তরাধিকারী হতো, সম্পত্তির মালিক হতো। এ-অসাধারণ সৌভাগ্যজনক পরিস্থিতি অবশ্য আকস্মিকভাবে ঘটে নি : এটা ঘটেছে এ-কারণে যে প্রাচীন মিশরে ভূসম্পত্তির মালিক ছিলো রাজা এবং উচ্চবর্ণের পুরোহিত ও সৈনিকেরা; সাধারণ মানুষেরা শুধু ভূমি ব্যবহার করতে এবং তার শস্য ভোগ করতে পারতো– ভূমি থাকতো মালিকদের সাথে অচ্ছেদ্য। উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্পত্তির বিশেষ মূল্য ছিলো না, এবং ভাগ ক'রে দিতে কোনো অসুবিধা হতো না। উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তি না থাকায় নারী রক্ষা করতে পারতো মানুষের মর্যাদা। বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সে বিয়ে করতো এবং বিধবা হয়ে গেলে আবার নিজের ইচ্ছেমতো বিয়ে করতো। পুরুষেরা বহুবিবাহ করতো; সব সন্তানই যদিও ছিলো বৈধ, তবু একজনই থাকতো প্রকৃত স্ত্রী, যে একা স্বামীর সাথে ধর্মকর্মে সঙ্গী ছিলো ও বৈধভাবে বিবাহিত ছিলো; অন্যরা ছিলো অধিকারহীন দাসী মাত্র। বিয়ের ফলে প্রধান স্ত্রীর মর্যাদা বদল ঘটতো না : সে মালিক থাকতো তার সম্পত্তির এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারতো। যখন ফারাও বোখোরিস ব্যক্তিমালিকানা প্রবর্তন করে, তখন নারীরা এতো শক্তিশালী অবস্থানে ছিলো যে সে তাদের উৎখাত করতে পারে নি; বোখোরিস সূচনা করে চুক্তির কালের, এবং বিয়ে হয়ে ওঠে একটি চুক্তি।

ছিলো তিন ধরনের বিয়ের চুক্তি : একটি ছিলো দাসীত্বমূলক বিয়ে; নারীটি হতো পুরুষটির সম্পত্তি, তবে অনেক সময় নির্দেশিত থাকতো যে পুরুষটির আর কোনো উপপত্নী থাকবে না; একই সময়ে বৈধ স্ত্রীকে গণ্য করা হতো পুরুষটির সমান, এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তিতে ছিলো তাদের সমান অধিকার; প্রায়ই বিবাহবিচ্ছেদের সময় স্বামীটি স্ত্রীকে কিছু অর্থ দিতে সম্মত হতো। এ-প্রথা থেকে পরে উদ্ভূত হয় এক ধরনের চুক্তি, যা বিশেষভাবে সুবিধাজনক ছিলো স্ত্রীটির জন্যে : স্বামীটি স্ত্রীটির ওপর পোষণ করতো এক কৃত্রিম আস্থা। ব্যভিচারের দণ্ড ছিলো কঠোর, কিন্তু উভয় পক্ষেরই ছিলো বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা। এসব চুক্তি প্রয়োগ প্রবলভাবে হ্রাস করে বহুবিবাহ; নারীরা সম্পদের ওপর একচেটে অধিকার ভোগ করে ও উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়ে যায় তাদের সন্তানদের, যার ফলে দেখা দেয় একটি ধনিকতান্ত্রিক শ্রেণী। টলেমি ফিলোপাতের আদেশ জারি করে যে নারীরা আর তাদের স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে না, এটা তাদের পরিণত করে চিরঅপ্রাপ্তবয়স্ক মানুষে। তবে এমনকি যখনও তাদের ছিলো একটি বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত মর্যাদা, প্রাচীন

বিশ্বে যা ছিলো অনন্য, তখনও নারীরা সামাজিকভাবে পুরুষের সমতুল্য ছিলো না। ধর্মে ও শাসনকার্যে অংশী হয়ে তারা রাজপ্রতিভূ হিশেবে কাজ করতে পারতো, তবে ফারাও ছিলো পুরুষ; পুরোহিত ও সৈনিকেরা ছিলো পুরুষ; বাইরের কর্মকাণ্ডে তারা পালন করতো গৌণ ভূমিকা; এবং পারিবারিক জীবনে তাদের কাছে দাবি করা হতো পারস্পরিকতাহীন আনুগত্য।

গ্রিকদের রীতি ছিলো অনেকটা প্রাচ্যদেশের মতোই; তবে তাদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিলো না। কিন্তু কেনো, তা অজ্ঞাত। এটা সত্য যে একটা হারেম রাখা সব সময়ই ব্যয়বহুল : এটা সম্ভব মহিমামণ্ডিত সলোমনের পক্ষে, *আরব্যরজনী*র সুলতানদের পক্ষে, সেনাপতি, ধনিকদের পক্ষে, যারা মত্ত হ'তে পারতো কোনো বিশাল হারেমের বিলাসব্যসনে; গড়পরতা মানুষ তিন-চারটি স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলো; চাষীদের খুব কম সময়ই থাকতো দুটির বেশি স্ত্রী। এছাড়াও– মিশর বাদে, যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তিমালিকানাধীন বিষয়সম্পত্তি ছিলো না– উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তিকে অখণ্ডিত রাখার জন্যে পৈতৃক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেয়া হয় বিশেষ অধিকার। এর ফলে স্ত্রীদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে একটা স্তরক্রম, অন্যদের তুলনায় প্রধান উত্তরাধিকারীর মাতা লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। যদি স্ত্রীর নিজের থাকতো কোনো সম্পত্তি, যদি সে পেতো কোনো পণ, তাহলে স্বামীর কাছে সে গণ্য হতো একজন ব্যক্তি হিশেবে : স্বামীটি স্ত্রীর সাথে জড়িত হতো এক ধর্মীয় ও একান্ত বন্ধনে।

সন্দেহ নেই এ-পরিস্থিতির ফলেই মাত্র একটি স্ত্রীকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রথা গ'ড়ে উঠেছিলো। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে গ্রিক নাগরিকেরা বাস্তবে ছিলো বহুবিবাহী, কেননা তারা তাদের কামনা চরিতার্থ করতে পারতো নগরের বেশ্যাদের সাথে এবং তাদের গাইনিকিউমের দাসীদের সাথে। 'আত্মার সুখের জন্যে আমাদের আছে গণিকা,' বলেছেন দিমোসথিনিস, 'কামসুখের জন্যে আছে উপপত্নী, এবং পুত্রলাভের জন্যে আছে স্ত্রীরা।' স্ত্রী যখন রুগ্ন, অসুস্থ, গর্ভবতী, বা প্রসবের পর সেরে উঠতে থাকতো, তখন গৃহস্বামীর শয্যায় স্ত্রীর বদলে স্থান পেতো উপপত্নী; তাই গাইনিকিউম আর হারেমের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিলো না। অ্যাথেন্সে স্ত্রী বন্দী থাকতো অবরোধের মধ্যে, বন্দী থাকতো কঠোর আইনের বিধানে, এবং তাদের ওপর চোখ রাখতো বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটরা। সে সারাজীবনভর থাকতো চির-অপ্রাপ্তবয়স্ক, থাকতো একজন অভিভাবকের কর্তৃত্বে; সে তার পিতা হ'তে পারতো, স্বামী হ'তে পারতো, স্বামীর উত্তরাধিকারী হ'তে পারতো, আর এসবের অবর্তমানে অভিভাবক হতো রাষ্ট্র, যার প্রতিনিধিত্ব করতো সরকারি কর্মকর্তারা। এরা ছিলো তার প্রভু, এবং কোনো বস্তুর মতো সে ছিলো তাদের অধিকারে; আর অভিভাবকদের কর্তৃত্ব প্রসারিত ছিলো তার শরীর ও সম্পত্তি পর্যন্ত। অভিভাবক ইচ্ছেমতো কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করতে পারতো : পিতা তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারতো বা মেয়েকে দত্তক দিতে পারতো; স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে আরেক স্বামীর কাছে হস্তান্তরিত করতে পারতো। তবে গ্রিক আইন স্ত্রীর জন্যে একটা পণের ব্যবস্থা করতো, যা ব্যয় হতো তার ভরণপোষণে এবং বিয়ে ভেঙে গেলে সেটার সবটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হতো; আইন বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দিতো স্ত্রীকে; তবে এগুলোই ছিলো তাকে দেয়া সমাজের

একমাত্র নিশ্চয়তা। সমস্ত ভূসম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতো পুত্ররা।

পুরুষপরম্পরা অনুসারে উত্তরাধিকারভিত্তিক সমাজে একটি সমস্যা দেখা দেয়, তা হচ্ছে যদি কোনো পুরুষের উত্তরাধিকারী না থাকে তখন ভূসম্পত্তির কী ব্যবস্থা হবে। গ্রিকরা *এপিক্লেরেৎ* নামে একটি প্রথা তৈরি করে : নারী উত্তরাধিকারীকে অবশ্যই তার পিতার পরিবারের জ্যেষ্ঠতম আত্মীয়কে বিয়ে করতে হতো; এভাবে পিতা তার জন্যে যে-সম্পত্তি রেখে যেতো, তা থেকে যেতো একই দলের সন্তানদের মধ্যে। *এপিক্লেরে* নারী উত্তরাধিকারী ছিলো না– ছিলো পুরুষ উত্তরাধিকারী উৎপাদনের উপায় মাত্র। এ-প্রথা তাকে নিক্ষেপ করে পুরুষের দয়ার তলে, কেননা তাকে যান্ত্রিকভাবে দান করা হতো পরিবারের প্রথম জন্মপ্রাপ্ত পুরুষটির কাছে, যে অধিকাংশ সময়ই হতো বৃদ্ধ।

যেহেতু নারীপীড়নের কারণ নিহিত পরিবারকে স্থায়িত্ব দেয়ার ও উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তি অখণ্ড রাখার বাসনার মধ্যে, তাই নারী পরিবার থেকে যতোখানি মুক্তি পায় ততোখানি মুক্তি পায় পরাধীনতা থেকে; যদি কোনো সমাজ ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ করার সাথে পরিবার প্রথাও অস্বীকার করে, তাহলে তাতে নারীর ভাগ্য বেশ উন্নত হ'তে বাধ্য। স্পার্টায় প্রচলিত ছিলো সংঘব্যবস্থা, এবং এটাই ছিলো একমাত্র গ্রিক নগর, যেখানে নারীর অবস্থা ছিলো প্রায় পুরুষের অবস্থার সমান। মেয়েদের লালনপালন করা হতো ছেলেদের মতো; স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে বন্দী থাকতো না; আর স্বামী স্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারতো চুপিসারে, রাতের বেলা; এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার এতো কম ছিলো যে সুসন্তান জন্মানোর প্রয়োজনে অন্য যে-কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের দাবি করতে পারতো। যখন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তি লোপ পায়, তখন ব্যভিচারের ধারণাও লোপ পায়; সব সন্তানের মালিক হয় নগর; আর নারীদের তখন উৎসাহের সঙ্গে এক প্রভুর দাসী ক'রে রাখা হয় না; বা, উল্টোভাবে, বলা যায় যে নাগরিকদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিশেষ পূর্বপুরুষ না থাকায় তাদের মালিকানায় কোনো নারীও থাকে না। নারীদের ভোগ করতে হয়েছে মাতৃত্বের দাসত্বশৃঙ্খল, যেমন পুরুষদের ভোগ করতে হয়েছে যুদ্ধের দাসত্বশৃঙ্খল; তবে এ-নাগরিক দায়িত্ব পূরণের বাইরে তাদের স্বাধীনতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় নি।

যে-মুক্ত নারীদের কথা বলা হলো, তাদের ও পরিবারের দাসীদের পাশাপাশি গ্রিসে ছিলো বেশ্যারাও। প্রাচীন মানুষেরা অতিথিবৎসল বেশ্যাবৃত্তিও পালন করতো– অচেনা অতিথিদের আপ্যায়ন করা হতো নারী দিয়ে, নিঃসন্দেহে এর ছিলো অতীন্দ্রিয় যৌক্তিকতা– এবং ছিলো ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তি, যার লক্ষ্য ছিলো উর্বরতার রহস্যময় শক্তি সবার মঙ্গলের জন্যে অবারিত ক'রে দেয়া। প্রথাটি প্রচলিত ছিলো ধ্রুপদী মহাযুগে। হিরোদোতাস বর্ণনা করেছেন যে খ্রিপূ পঞ্চম শতকে ব্যাবিলনের প্রতিটি নারী বাধ্য ছিলো জীবনে একবার মুদ্রার বিনিময়ে মাইলিত্তার মন্দিরে কোনো অচেনা পুরুষের কাছে দেহদানে, যে-অর্থ সে দান করতো মন্দিরে; তারপর সে ঘরে ফিরে যেতো সতীজীবন যাপনের জন্যে। আধুনিক কালেও ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত ছিলো মিশরের নর্তকীদের মধ্যে ও ভারতের বাঈজিদের মধ্যে, যারা ছিলো সম্ভ্রান্ত অভিজাত গায়িকা ও নর্তকী। তবে সাধারণত মিশরে, ভারতে, পশ্চিম এশিয়ায় ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তি পরিণত

হয় বৈধ ভাড়াটে বেশ্যাবৃত্তিতে, কেননা যাজকতন্ত্র দেখতে পায় যে ব্যবসাটা বেশ লাভজনক। এমনকি হিব্রুদের মধ্যেও ভাড়াটে বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত ছিলো।

গ্রিসে, বিশেষ ক'রে সমুদ্র-উপকূল ধ'রে, দ্বীপগুলোতে, ও ভ্রমণকারীতে পরিপূর্ণ নগরগুলোতে, ছিলো অনেক মন্দির, যেখানে পাওয়া যেতো পিন্ডারের ভাষায় 'আগন্তুকদের প্রতি আতিথ্যপরায়ণ যুবতীদের'। তাদের উপার্জিত অর্থ যেতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে– অর্থাৎ, পুরোহিতদের কাছে ও পরোক্ষভাবে তাদের ব্যয়নির্বাহের জন্যে। বাস্তবে ছিলো– কোরিন্থ ও অন্যান্য স্থানে– নাবিকদের ও ভ্রমণকারীদের কামক্ষুধা মেটানোর ভণ্ডামো, এবং এটা পরিণত হয়েছিলো অর্থগৃধ্নু বা ভাড়াটে বেশ্যাবৃত্তিতে। সোলোন একে পরিণত করে বেশ্যাবৃত্তির প্রতিষ্ঠানে। সে এশীয় ক্রীতদাসী কিনতে থাকে এবং তাদের আটকে রাখে অ্যাথেন্সে অবস্থিত ভেনাসের মন্দিরের কাছাকাছি 'সংকেতস্থল'-এ, যেগুলো বন্দর থেকে বেশি দূরে ছিলো না। এর পরিচালনার ভার ছিলো *পর্নোব্রোপোই*-এর হাতে, যারা পালন করতো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিচালনার দায়িত্ব। প্রতিটি মেয়ে মজুরি পেতো, আর শুদ্ধ লাভটুকু যেতো রাষ্ট্রের কোষে। পরে খোলা হয় ব্যক্তিমালিকানাধীন বেশ্যালয়, *কাপেইলিয়া*, যাতে একটি লাল উষ্কি ব্যবহৃত হতো ব্যবসার চিহ্ন হিশেবে। অনতিপরেই ক্রীতদাসী ছাড়াও নিম্ন শ্রেণীর গ্রিক নারীদেরও গ্রহণ করা হয় সেখাকার বাসিন্দা হিশেবে। ওই 'সংকেতস্থল'গুলোকে এতো আবশ্যক গণ্য করা হয় যে সেগুলো স্বীকৃতি পায় শরণলাভের অলঙ্ঘনীয় স্থান ব'লে। তবে বেশ্যারা ছিলো মর্যাদাহীন, তাদের কোনো সামাজিক অধিকার ছিলো না, তাদের সন্তানদের অব্যাহতি দেয়া হতো তাদের ভরণপোষণ থেকে, তাদের পরতে হতো নানা রঙের একটি বিশেষ পোশাক, সাজতে হতো কুসুমস্তবকে, এবং কুঙ্কুম দিয়ে চুল রাঙাতে হতো।

ওই 'সংকেতস্থল'-এর নারীরা ছাড়াও ছিলো স্বাধীন বারবনিতারা, যাদের ফেলা যায় তিনটি শ্রেণীতে : পতিতারা, যারা ছিলো আজকের অনুমতিপ্রাপ্ত বেশ্যাদের মতো; বাঈজিরা, যারা ছিলো নর্তকী ও বংশীবাদক; এবং অভিজাত গণিকারা, বিলাসিনী নারীরা, যাদের অধিকাংশই আসতো কোরিন্থ থেকে, যারা গ্রিসের সুবিখ্যাত পুরুষদের সাথে গ'ড়ে তুলতো স্বীকৃত সম্পর্ক, পালন করতো আধুনিক কালের 'বিশ্বরমণীর' মতো ভূমিকা। প্রথম শ্রেণীটি সংগৃহীত হতো মুক্তিপ্রাপ্ত নারীদের ও নিম্ন শ্রেণীর গ্রিক মেয়েদের মধ্য থেকে; তারা শোষিত হতো দালালদের দ্বারা এবং যাপন করতো দুর্বিষহ জীবন। দ্বিতীয় শ্রেণীটি গায়িকা হিশেবে প্রতিভার জন্যে কখনো কখনো ধনাঢ্য হয়ে উঠতো; এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত লামিয়া, যে ছিলো মিশরের এক টলেমির উপপত্নী, পরে যে হয় টলেমিকে পরাস্তকারী মেসিদনিয়ার রাজা দিমিত্রিয়াস পোলিওরকেতেসের উপপত্নী। তৃতীয় ও শেষ শ্রেণীটির অনেকে গৌরব অর্জন করেছে তাদের প্রেমিকদের সাথে। নিজেদের ও তাদের ভাগ্যকে স্বাধীনভাবে চালানোর অধিকারী ছিলো তারা, ছিলো বুদ্ধিমান, সুসংস্কৃত, কলানিপুণ; তাদের সঙ্গদানের মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ ছিলো যারা, তাদের কাছে তারা গণ্য হতো ব্যক্তিরূপে। তারা যেহেতু মুক্তি পেয়েছিলো পরিবার থেকে এবং বাস করতো সমাজের প্রান্তিক এলাকায়, তারা মুক্তি পেয়েছিলো পুরুষ থেকেও; তাই পুরুষদের কাছে তারা গণ্য হতো সহচর,

প্রায় সমতুল্য, মানুষ হিশেবে। আস্পাসিয়া, ফ্রাইনে, লায়াসের মধ্যে রূপ লাভ করেছিলো পরিবারের শ্রদ্ধেয় মাতার ওপর স্বাধীন নারীর শ্রেষ্ঠত্ব।

এসব উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, গ্রিসের নারীদের পরিণত করা হয়েছিলো আধা-ক্রীতদাসীতে, যাদের এমনকি অভিযোগ করার স্বাধীনতাও ছিলো না। ধ্রুপদী মহাযুগে নারীদের কঠোরভাবে অবরুদ্ধ ক'রে রাখা হতো গাইনিকিউমে, নারীমহলে; পেরিক্লেস বলেছিলো সে-ই শ্রেষ্ঠ নারী, যার সম্পর্কে পুরুষেরা সবচেয়ে কম কথা বলে। প্লাতো রাষ্ট্রপরিচালনায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার ও মেয়েদের মানবিক শিক্ষা দেয়ার প্রস্তাব দিলে আরিস্তোফানেস তীব্র গালিগালাজ করেন তাঁকে। তবে জেনোফোনের মতে স্বামী ও স্ত্রীরা ছিলো পরস্পরের অচেনা, এবং সাধারণত স্ত্রীদের হ'তে হতো সদাসজাগ গৃহিণী– সতর্ক, মিতব্যয়ী, মৌমাছির মতো পরিশ্রমী, এক আদর্শ তত্ত্বাবধায়ক। নারীদের এ-হীনাবস্থা সত্ত্বেও গ্রিকরা ছিলো প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষী। প্রাচীন প্রবচনরচয়িতা-দের থেকে ধ্রুপদী লেখকেরা পর্যন্ত, নারী ছিলো ধারাবাহিক আক্রমণের বিষয়; তবে তারা চরিত্রহীনতার জন্যে আক্রান্ত হতো না– কেননা এদিকে প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রণে ছিলো নারী– এবং আক্রান্ত হতো না তাদের কামক্ষুধার জন্যেও; বিয়ে যে-বোঝা ও ঝামেলা চাপিয়ে দেয় পুরুষদের ওপর, তারই জন্যে আক্রান্ত হতো নারীরা। দজ্জাল স্ত্রী ও বিবাহিত জীবনের দুঃখযন্ত্রণার বিরুদ্ধে গ্রিক নাগরিকদের সমস্ত ক্ষোভ রূপায়িত হয়েছে জানতিপ্পির মধ্যে।

রোমে পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধই নির্ধারণ ক'রে দেয় নারীর ইতিহাস। এত্রুস্কান সমাজ ছিলো মাতৃধারার, এবং সম্ভবত রাজতন্ত্রের কালেও রোমে প্রচলিত ছিলো মাতৃধারা ব্যবস্থায় গোত্রবহির্ভূত বিবাহ : লাতিন রাজারা উত্তরাধিকারসূত্রে একে অন্যের হাতে ক্ষমতা দেয় নি। এটা নিশ্চিতভাবে ঠিক যে তারকুইনের মৃত্যুর পরই প্রতিষ্ঠিত হয় পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব; কৃষিসম্পত্তি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি– সুতরাং পরিবার– হয় সমাজের ভিত্তির একক। নারীকে শক্তভাবে জড়িত করা হয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তির সাথে এবং তাই পরিবারের বংশের সাথে। গ্রিক নারীদের যতোটুকু নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিলো, রোমের আইন সেটুকু থেকেও বঞ্চিত করে নারীদের; সে যাপন করে আইনগতভাবে সামর্থ্যহীনের ও দাসত্বের জীবন। তাকে বাদ দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে, তার জন্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয় সমস্ত 'পুরুষসুলভ' পদ; এবং সামাজিক জীবনে সে হয় স্থায়ীভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাকে রাখা হয় একজন অভিভাবকের কর্তৃত্বে।

নারীর প্রথম অভিভাবক ছিলো তার পিতা; পিতার অনুপস্থিতিতে পুরুষ আত্মীয়রা পালন করতো এ-দায়িত্ব। যখন নারীর বিয়ে হতো, সে চ'লে যেতো স্বামীর হাতে; ছিলো তিন ধরনের বিয়ে : *কনফেরাতিও*, এতে দম্পতিটি *ফ্লেমেন দায়ালিস*-এর সামনে জুপিটারের বেদিমূলে উৎসর্গ করতো একটি আটার পিঠে; *কোএম্পতিও*, এটা ছিলো এক কাল্পনিক বিক্রয়, যাতে কৃষিজীবী পিতা স্বামীর কাছে বিক্রি করতো মেয়েকে; এবং *উসুস*, এটা ছিলো এক বছরব্যাপী সহবাসের ফল। এসবই ছিলো *'মানু'*, যার অর্থ হচ্ছে পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবকের বদলে স্বামীর কর্তৃত্ব লাভ; স্ত্রী হয়ে উঠতো তার কোনো কন্যার মতোই, এবং এরপর স্ত্রীর দেহ ও সম্পত্তির ওপর

স্বামীর থাকতো পূর্ণ অধিকার। কিন্তু যেহেতু রোমের নারীরা একই সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিলো পিতার ও স্বামীর বংশে, তাই দ্বাদশ বিধি আইনের কাল থেকে দেখা দেয় বিরোধ, যা ছিলো তাদের আইনগত মুক্তির মূলে। আসলে *মানু* সম্বলিত বিয়ে নারীর পৈতৃক অভিভাবকদের সর্বস্বান্ত ক'রে তোলে। পৈতৃক অভিভাবকদের রক্ষার জন্যে প্রবর্তিত হয় *সিনে মানু* নামে এক ধরনের বিয়ে; এতে নারীর সম্পত্তি থেকে যায় তার অভিভাবকের কর্তৃত্বে, স্বামী শুধু পায় নারীটির দেহের অধিকার। এমনকি এ-ক্ষমতাও স্বামীকে ভাগ ক'রে নিতে হতো স্ত্রীর পিতার সাথে, যার ছিলো কন্যার ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। গার্হস্থ্য বিচারপরিষদকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো সে-সব বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার, যেগুলোর ফলে স্বামী ও পিতার মধ্যে বিরোধ বাঁধতে পারতো; এ-বিচারপরিষদ স্ত্রীকে অনুমতি দিতো পিতার পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি বা স্বামীর পক্ষ থেকে পিতার প্রতি পুনর্বিচার প্রার্থনার; এবং নারী এদের কারো অস্থাবর সম্পত্তি ছিলো না। এছাড়াও, যদিও পরিবারসংস্থা ছিলো খুবই শক্তিশালী, পিতা ও গৃহস্বামী সবার কাছে সে গণ্য হতো নাগরিক ব'লে। তার কর্তৃত্ব ছিলো অসীম; সে ছিলো স্ত্রী ও সন্তানদের নিরঙ্কুশ শাসক; তবে এরা তার সম্পত্তি ছিলো না; বরং সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যে সে নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের জীবন : স্ত্রী, যে পৃথিবীতে আনতো সন্তান এবং যার গৃহস্থালির কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো খামারের কাজ, সে ছিলো দেশের জন্যে অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং তাকে ভক্তি করা হতো গভীরভাবে।

এখানে আমরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য লক্ষ্য করি, যার মুখোমুখি হবো আমরা ইতিহাসের ধারাব্যাপী : বিমূর্ত অধিকার নারীর বাস্তব পরিস্থিতি নির্দেশের জন্যে যথেষ্ট নয়; এটা বড়ো অংশে নির্ভর করে তার আর্থনীতিক ভূমিকার ওপর; এবং অনেক সময় বিমূর্ত অধিকার ও বাস্তব ক্ষমতার ভিন্নতা ঘটে ব্যস্তানুপাতিকভাবে। আইনে গ্রিক নারীদের থেকে বেশি দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে রোমের নারীরা অনেক বেশি গভীরভাবে অঙ্গীভূত ছিলো সমাজের সাথে। গাইনিকিউমে গুপ্ত থাকার বদলে গৃহে সে বসতো বসতবাড়ির কেন্দ্রস্থলে; সে দাসদের কাজ পরিচালনা করতো; সে সন্তানদের শিক্ষা দেখাশুনো করতো, এবং বিশেষ বয়স পর্যন্ত তাদের প্রভাবিত করতো। সে স্বামীর সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতো শ্রম, তাকে গণ্য করা হতো সম্পত্তির সহমালিক। স্যাবাইন নারী লুক্রেতিয়া ও ভার্জিনিয়ার মতো কিংবদন্তি থেকে বোঝা যায় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো ইতিহাসে; কোরিওলানাস আত্মসমর্পণ করেছিলো তার মা ও স্ত্রীর অনুনয়ের কাছে; রোমান গণতন্ত্রের বিজয় অনুমোদন ক'রে লুকিনিয়াসের আইন তৈরি হয়েছিলো তার স্ত্রীর প্রেরণায়। 'সর্বত্র পুরুষেরা শাসন করে নারীদের ওপর,' বলেছিলেন কাতো, 'আর আমরা যারা শাসন করি সব মানুষকে, তারাই শাসিত হই আমাদের নারীদের দিয়ে।'

নারী পেয়েছিলো তার স্বাধীনতার একটি নিশ্চয়তাও : পিতা তাকে পণ দিতে বাধ্য ছিলো। বিয়ে ভেঙে গেলে এ-পণ তার পুরুষ আত্মীয়দের কাছে ফেরত যেতো না, এবং এটা তার স্বামীর অধিকারেও কখনো থাকতো না; নারীটি যে-কোনো সময় বিবাহচ্ছেদের মাধ্যমে এটা স্বামীর কাছে থেকে ফেরত চাইতে পারতো, ফলে তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা ছাড়া স্বামীর কোনো উপায় থাকতো না। প্লউতুসের মতে, 'পণ

গ্রহণ ক'রে, সে বিক্রি ক'রে দিয়েছে তার ক্ষমতা।' প্রজাতন্ত্রের সমাপ্তি থেকে মাতাও সন্তানদের কাছে পিতার সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে; কর্তৃত্ব লাভ ক'রে বা স্বামী যদি হতো দুরাচারী, সে পেতো সন্তানদের অধিকার। হাদ্রিয়ানের কালে সেনেটের একটি আইনে তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়– যদি তার তিনটি সন্তান থাকে এবং তাদের কেউ সন্তানহীন মারা যায়– যদি তারা মৃত্যুর আগে ইচ্ছেপত্র রেখে না যায়, তাহলে তাদের প্রত্যেকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার সে পায়। মার্কুস অউরেলিউসের শাসনকালে রোমন পরিবারের বিবর্তন পূর্ণতা লাভ করে : ১৭৮ অব্দ থেকে, পুরুষ আত্মীয়দের ওপর জয়ী হয়ে, সন্তানেরা হয় তাদের মায়ের উত্তরাধিকারী; তারপর থেকে পরিবার গ'ড়ে ওঠে *কনইউক্কতিও সাঙ্গিউনিস*-এর ভিত্তির ওপর; এবং মায়ের মর্যাদা হয় পিতার সমান; কন্যারা উত্তরাধিকারী হয় ভাইদের মতোই।

তবে ওপরে আমি যে-বর্ণনা দিয়েছি, তার বিরোধী একটি প্রবণতা দেখতে পাই রোমান আইনের ইতিহাসে; পরিবারের মধ্যে নারীদের স্বাধীন ক'রেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাকে আবার নিয়ে নেয় নিজের কর্তৃত্বে; এটা তাকে আইনগত অধিকারহীন ক'রে তোলে নানাভাবে।

এটা সত্য যদি নারী হয় ধনী ও স্বাধীন, তাহলে সে লাভ করে এক পীড়াদায়ক গুরুত্ব; তাই দরকার হয়ে পড়ে তার কাছে থেকে এক হাত দিয়ে তা ফিরিয়ে নেয়া, অন্য হাত দিয়ে তাকে যা দেয়া হয়েছে। যখন হানিবল হুমকি দিচ্ছিলো রোম আক্রমণের, তখন রোমের নারীদের বিলাসিতা নিষিদ্ধ ক'রে গৃহীত হয় ওপ্পিয়ান আইন; বিপদ কেটে গেলে রোমের নারীরা ওই আইন বাতিলের দাবি জানায়। এক বক্তৃতায় কাতো এটা রাখার দাবি করেন; কিন্তু ময়দানে মাতৃদের উপস্থিতিতে দিনটি যায় তাঁর বিপক্ষে। পরে কঠোরতর নানা আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তাতে তারা সফল হয় নি; এগুলো ধাপ্পাবাজির থেকে বেশি কিছু করতে পারে নি। শুধু বিজয়ী হয় সেনেটের ভেল্লেয়ীয় আইন, যাতে নারীদের নিষিদ্ধ করা হয় অন্যদের 'মাধ্যস্থ করা'– অর্থাৎ অন্যদের সাথে চুক্তি করা নিষিদ্ধ করা হয়– যা তাকে বঞ্চিত করে প্রায় সব আইনসঙ্গত অধিকার থেকে। এভাবে যখন নারী লাভ করছিলো সম্পূর্ণ মুক্তি, তখনই দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করা হয় তার লৈঙ্গিক নিকৃষ্টতা, যাতে পাই পুরুষপ্রাধান্যের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের এক অসাধারণ উদাহরণ, যে সম্পর্কে আমি বলেছি : যখন কন্যা, স্ত্রী, বা বোন হিশেবে খর্ব করা হয় নি নারীর অধিকার, তখন লিঙ্গানুসারে অস্বীকার করা হয় পুরুষের সাথে তার সাম্য; প্রভুত্বমূলক দাম্ভিক রীতিতে অভিযুক্ত করা হয় 'মূঢ়তা, লিঙ্গের দুর্বলতা'কে।

সত্য হচ্ছে যে মাতৃরা তাদের নতুন স্বাধীনতার বিশেষ সদ্ব্যবহার করতে পারে নি; তবে এও সত্য যে একে একটি সদর্থক ব্যাপারে পরিণত করার অধিকার তাদের দেয়া হয় নি। এ-দুটি বিরোধী প্রবণতার ফলাফল– একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতা, যা নারীকে মুক্ত করে পরিবার থেকে এবং স্থিতিমূলক প্রবণতা, যা ব্যক্তি হিশেবে তার স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করে– তার পরিস্থিতিকে ক'রে তোলে ভারসাম্যহীন। উত্তরাধিকারসূত্রে সে সম্পত্তি লাভ করতে পারতো, পিতার সাথে সন্তানদের ওপর তার ছিলো সমান অধিকার, সে সাক্ষ্য দিতে পারতো। পণপ্রথার কল্যাণে সে মুক্তি পেতো

দাম্পত্য পীড়ন থেকে, নিজের ইচ্ছেয় সে বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ করতে পারতো; তবে সে মুক্তি পেয়েছিলো শুধু নেতিবাচক রীতিতে, কেননা তার শক্তিকে প্রয়োগ করার মতো কোনো বাস্তব কাজ তাকে দেয়া হয় নি। আর্থনীতিক স্বাধীনতা থেকে যায় বিমূর্ত, কেননা এটা কোনো রাজনীতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করে না। এভাবে এমন ঘটে যে *কর্ম* করার সমান সামর্থ্যের অভাবে রোমের নারীরা শুধু *বিক্ষোভ প্রদর্শন করে* : তুমুল কোলাহলের মধ্যে জড়ো হয় তারা নগর ভ'রে, বিচারালয় অবরোধ করে, ষড়যন্ত্রের ইন্ধন জোগায়, প্রতিবাদ করে, গৃহযুদ্ধ বাঁধায়; শোভাযাত্রার সময় তারা খুঁজে বের করে দেবমাতার মূর্তি এবং টাইবারের তীর ধ'রে তাকে বহন করে, এভাবে তারা রোমে চালু করে প্রাচ্য দেবদেবীদের; ১১৪ অব্দে দেখা দেয় ভূষিত কুমারীদের কেলেঙ্কারি এবং তাদের সংঘকে নিষিদ্ধ করা হয়।

যখন পরিবারের বিলুপ্তি পারিবারিক জীবনের প্রাচীন গুণাবলিকে নিরর্থক ক'রে তোলে ও বাতিল ক'রে দেয়, তখন আর নারীর জন্যে থাকে না কোনো প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা, কেননা বাইরের জীবন ও তার নৈতিকতা তার কাছে রয়ে যায় অগম্য। নারীরা বেছে নিতে পারতো দুটি সমাধানের একটি : তাদের পিতামহীদের মূল্যবোধকে একগুঁয়েভাবে শ্রদ্ধা ক'রে যেতে পারতো বা কোনো মূল্যবোধকেই স্বীকার না করতে পারতো। প্রথম শতকের শেষ দিকে ও দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে আমরা দেখতে পাই যে প্রজাতন্ত্রের কালে যেমন তারা ছিলো তাদের স্বামীদের সঙ্গী ও সহযোগী তেমনভাবেই জীবন চালাচ্ছে বহু নারী : প্লোতিনা অংশী ছিলেন ত্রাজানের গৌরব ও দায়িত্বের; সাবিনা তাঁর জনহিতকর কাজের সাহায্যে নিজেকে এতোটা বিখ্যাত ক'রে তোলেন যে জীবৎকালেই মূর্তিতে মূর্তিতে তাঁকে দেবীত্বে উন্নীত করা হয়; তাইবেরিউসের অধীনে আমিলিউস স্কারুসের মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে অস্বীকার করেন সেক্সতিনা, এবং পোম্পোনিউস লাবিউসের মৃত্যুর পর পাস্কিয়া; সেনেকার সাথে নিজের রগ কেটে ফেলেন পাউলিন; অনুজ প্লিনি বিখ্যাত ক'রে তুলেছেন আরিয়ার *'এতে ব্যথা লাগছে না,' পায়েতুস'*কে; অনিন্দ্য স্ত্রী ও অনুরক্ত মাতা হিশেবে ক্লদিয়া রিউফিনা, ভার্জিনিয়া, ও সুলপিকিয়াকে প্রশংসা করেছেন মার্তিয়াল। তবে বহু নারী ছিলো, যারা মাতৃত্ব অস্বীকার করেছিলো এবং বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো। আইন তখনও নিষিদ্ধ করেছে ব্যভিচারকে, তাই অনেক মাতৃ এতো দূর পর্যন্ত গিয়েছিলো যে তারা বেশ্যা হিশেবে তাদের নাম লিখিয়েছে, যাতে তারা চালিয়ে যেতে পারে তাদের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা।

ওই সময় পর্যন্ত লাতিন সাহিত্য সব সময়ই নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, কিন্তু তার পর ব্যঙ্গলেখকেরা উঠে-প'ড়ে লাগে তাদের বিরুদ্ধে। আদি প্রজাতন্ত্রে রোমের নারীদের পৃথিবীতে একটা স্থান ছিলো, তবে বিমূর্ত অধিকার ও আর্থনীতিক মুক্তির অভাবে তারা শৃঙ্খলিত ছিলো; পতনের কালের রোমের নারীরা ছিলো ভ্রান্ত মুক্তির উৎপাদন, তাদের ছিলো শূন্যগর্ভ স্বাধীনতা এমন এক বিশ্বে, যেখানে পুরুষেরা ছিলো সর্বময় প্রভু : নারী মুক্ত ছিলো– কিন্তু অহেতুক।

পরিচ্ছেদ ৪

মধ্যযুগব্যাপী থেকে আঠারো শতকের ফ্রান্স পর্যন্ত

নারীর অবস্থার বিবর্তন কোনো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ছিলো না। যখন ঘটতো বড়ো ধরনের বহিরাক্রমণ, তখন সন্দেহ দেখা দিতো সব সভ্যতা সম্বন্ধেই। রোমন আইন নিজেই পড়ে এক নতুন ভাবাদর্শের, খ্রিস্টধর্মের, প্রভাবে; এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধ'রে বর্বররা সফল হয় তাদের আইন চাপিয়ে দিতে। আর্থনীতিক, সামাজিক, ও রাজনীতিক পরিস্থিতিকে একেবারে উল্টে দেয়া হয়; এর প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় নারীর পরিস্থিতিতে।

খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শ নারীপীড়নে কম ভূমিকা পালন করে নি। সন্দেহ নেই সুসমাচারে আছে একটু সদয়তার শ্বাস, যা প্রসারিত যেমন নারীদের প্রতি তেমনি কুষ্ঠরোগীদের প্রতিও; এবং সে-হীনজনেরাই, দাসেরা ও নারীরা, চরম সংরাগে আঁকড়ে ধরেছিলো এ-নতুন আইন। আদিখ্রিস্টীয় পর্বে নারীদের বেশ কিছুটা মর্যাদা দেয়া হতো, যখন তারা আত্মসমর্পণ করতো গির্জার দাসত্বের কাছে; পুরুষের পাশাপাশি শহিদ হিশেবে তারাও সাক্ষ্য দিতো। কিন্তু উপাসনায় তারা নিতে পারতো শুধু গৌণ স্থান, 'ডিকনিস'রা অধিকার পেতো শুধু রোগীর সেবা ও দরিদ্রদের সাহায্য করার মতো অযাজকীয় কাজের। আর বিয়েকে যদি ধরি এমন একটি প্রথা ব'লে যাতে দরকার পারস্পরিক বিশ্বস্ততা, তাহলে স্পষ্ট দেখা যায় যে স্ত্রীকে পুরোপুরি অধীন করা হয় স্বামীর : সেইন্ট পলের মাধ্যমে বর্বরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নারীবিদ্বেষী ইহুদি ঐতিহ্য।

সেইন্ট পল নারীদের আদেশ দেন আত্মবিলোপের ও সতর্কতার সাথে চলার; তিনি পুরোনো ও নতুন উভয় টেস্টামেন্ট অনুসারে নারীকে ক'রে তোলেন পুরুষাধীন। 'যেহেতু নারীর থেকে পুরুষ নয়; কিন্তু পুরুষের থেকে নারী। নারীর জন্যে পুরুষ সৃষ্টি হয় নি; কিন্তু নারী পুরুষের জন্যে।' এবং আরেক স্থানে : 'কেননা স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর মাথা, যেমন খ্রিস্ট হচ্ছে গির্জার মাথা... সুতরাং গির্জা যেমন খ্রিস্টের অধীনে, তেমনি নারীরা সব কিছুতে তাদের স্বামীদের অধীনে।' যে-ধর্মে দেহকে মনে করা হয় অভিশপ্ত, সেখানে নারীরা হয়ে ওঠে শয়তানের ভয়াবহতম প্রলোভন। তারতুলিয়ান লিখেছেন : 'নারী, তুমি শয়তানের প্রবেশদ্বার। তুমি এমন একজনকে নষ্ট করেছো, যাকে শয়তানও সরাসরি আক্রমণ করার সাহস করতো না। তোমার জন্যেই ঈশ্বরের পুত্রকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে; তোমাকে সব সময় থাকতে হবে শোকে এবং ছিন্নবস্ত্রে।' সেইন্ট অ্যাম্ব্রোস : 'আদমকে পাপে প্রলুব্ধ করেছিলো হাওয়া এবং আদম

প্রলুব্ধ করে নি হাওয়াকে। এটা ন্যায়সঙ্গত ও ঠিক যে নারী তাকে মানবে প্রভু ও মালিক হিশেবে, যাকে সে পাপিষ্ঠ করেছিলো।' এবং সেইন্ট জন ক্রাইসোস্টম : 'বন্যপশুদের মধ্যেও নারীদের মতো ক্ষতিকর কাউকে পাওয়া যায় না।' চতুর্থ শতকে যখন গির্জীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়, বিয়েকে গণ্য করা হয় মানুষের নৈতিক দুর্বলতার প্রতি একটি স্বীকৃতিরূপে, যা খ্রিস্টীয় শুদ্ধতার সাথে অসমঞ্জস। 'এসো আমরা হাতে তুলে নিই কুড়োল এবং বিয়ের নিষ্ফল গাছকে কেটে ফেলি গোড়া থেকে,' লিখেছেন সেইন্ট জেরোম। গ্রেগরি ৬-এর সময় থেকে, যখন পুরোহিতদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় কৌমার্যব্রত, অধিক প্রচণ্ডতার সাথে জোর দেয়া হ'তে থাকে নারীপ্রকৃতির ভয়ঙ্করতার ওপর : গির্জার সব পিতাই নিন্দা করেন নারীর হীনতাপূর্ণ অশুভ প্রকৃতির। সেইন্ট টমাস এ-ঐতিহ্যের প্রতিই ছিলেন বিশ্বস্ত, যখন তিনি ঘোষণা করেন যে নারী হচ্ছে শুধু এক 'আকস্মিক' ও অসম্পূর্ণ সত্তা, এক ধরনের অশুদ্ধ পুরুষ। 'পুরুষ নারীর ওপরে, যেমন খ্রিস্ট মানুষের ওপরে,' তিনি লিখেছেন। 'এটা অপরিবর্তনীয় যে নারীর নিয়তিই হচ্ছে পুরুষের অধীনে বাস করা, এবং তার প্রভুর কাছে থেকে সে কোনো কর্তৃত্ব পায় নি।' তাছাড়া, গির্জীয় বিধি পণ ছাড়া নারীর জন্যে আর কোনো বৈবাহিক সুবিধার ব্যবস্থা করে নি, ফলে নারী হয়ে ওঠে আইনগতভাবে অযোগ্য ও শক্তিহীন। পুরুষসুলভ পেশাগুলোই শুধু তার জন্যে বন্ধ হয়ে যায় না, এমনকি বিচারালয়ে তার সাক্ষ্য দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়, এবং তার প্রামাণিক সাক্ষ্যেরও কোনো গুরুত্ব থাকে না। গির্জার পিতাদের প্রভাব কিছুটা পড়েছিলো সম্রাটদের ওপরও। জাস্টিনিয়ানের বিধান নারীকে স্ত্রী ও মাতা হিশেবে মর্যাদা দেয়, কিন্তু তাকে এ-ভূমিকারই অধীন ক'রে রাখে; লিঙ্গের জন্যে নয়, পরিবারের মধ্যে তার পরিস্থিতির জন্যেই নারী অর্জন করে আইনগত অযোগ্যতা। বিবাহবিচ্ছেদ নিষিদ্ধ হয় এবং বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'তে হয় প্রকাশ্যে। সন্তানদের ওপর মাতার কর্তৃত্ব পিতার সমানই থাকে; স্বামী মারা গেলে সে হয় সন্তানদের বৈধ অভিভাবক। সেনেটের ভেল্লিয়ীয় বিধি সংশোধন করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে নারী তৃতীয় পক্ষের মঙ্গলের জন্যে চুক্তি করতে পারে; তবে সে তার স্বামীর পক্ষে চুক্তি করতে পারতো না; তার পণ হয়ে ওঠে অচ্ছেদ্য– এটা হয় উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের প্রাপ্য বিষয়সম্পত্তি এবং তার জন্যে নিষিদ্ধ করা হয় এটা বিক্রি বা হস্তান্তরিত করা।

এসব আইন বর্বরদের অধিকৃত এলাকাগুলোতে সংস্পর্শে আসে জর্মনীয় প্রথার। শান্তিকালে জর্মনদের কোনো দলপতি থাকতো না, পরিবার ছিলো এক স্বাধীন সমাজ, যাতে নারীরা সম্পূর্ণভাবে ছিলো পুরুষের অধীন, তবে তাকে ভক্তি করা হতো, কিছু অধিকারও তার ছিলো। বিয়ে ছিলো একপতিপত্নীক; এবং ব্যভিচারের শাস্তি ছিলো কঠোর। যুদ্ধকালে স্ত্রী স্বামীর সাথে যেতো যুদ্ধে, জীবনে ও মৃত্যুতে তার সাথে ভাগ্যের অংশী হয়ে, জানিয়েছেন তাসিতুস। নারীর নিকৃষ্টতার কারণ ছিলো তার দৈহিক দুর্বলতা, ওটি নৈতিক ছিলো না, এবং যেহেতু নারীরা ভূমিকা পালন করতো যাজিকার ও দৈবজ্ঞার, তাই তারা হয়তো ছিলো পুরুষদের থেকে শিক্ষিত।

এসব প্রথাই চলে মধ্যযুগে, নারী থাকে চূড়ান্তরূপে পিতা ও স্বামীনির্ভর। ফ্র্যাংকরা রক্ষা করতো না জর্মনীয় সতীত্ববোধ : বহুবিবাহের প্রচলন ছিলো; সম্মতি ছাড়া

নারীকে বিয়ে দেয়া হতো; ছেড়ে দেয়া হতো স্বামীর খেয়ালখুশিতে; এবং তাকে গণ্য করা হতো চাকরানি ব'লে। আইন তাকে রক্ষা করতো জখম ও তিরষ্কার থেকে, তবে সেটা পুরুষের সম্পত্তি ও তার সন্তানদের মাতা হিশেবে। রাষ্ট্রযন্ত্র যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, একই বদল ঘটে যেমন ঘটেছে রোমে : অভিভাবকত্ব হয় রাষ্ট্রীয়, তা নিরাপত্তা দেয় নারীকে, তবে চলতে থাকে তার দাসীত্ব।

আদিমধ্যযুগের বিধ্বংসী উৎপ্লব থেকে যখন উদ্ভূত হয় সামন্তবাদ, নারীর অবস্থা হয়ে ওঠে অতিশয় অনিশ্চিত। সামন্তবাদ গোলমাল পাকিয়ে তোলে সার্বভৌমত্ব ও সম্পদের কর্তৃত্বের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত অধিকার ও ক্ষমতার মধ্যে। এজন্যেই এ-ব্যবস্থায় একবার উন্নতি আবার অবনতি ঘটে নারীর অবস্থার। প্রথমে, নারীর ছিলো না কোনো ব্যক্তিগত অধিকার, যেহেতু তার ছিলো না রাজনীতিক ক্ষমতা; এর কারণ হচ্ছে একাদশ শতক পর্যন্ত সামাজিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত ছিলো শুধু জোরের ওপর; ফিফ ছিলো সামরিক জোরে অধিকৃত ভূসম্পত্তি, যে-শক্তি নারীদের ছিলো না। পরে, পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে নারী উত্তরাধিকারী হ'তে পারতো; তবে স্বামীই ছিলো ওই ফিফের রক্ষক ও অধিকারী, এবং আয়ের প্রাপক; নারী ছিলো ওই ফিফেরই একটা অংশ।

সামন্তরাজ্য আর পারিবারিক ব্যাপার ছিলো না; এর মালিক ছিলো সামন্তাধিপ, এবং সে ছিলো নারীরও মালিক। সামন্তাধিপ নারীর স্বামী ঠিক করতো, এবং তার সন্তানদের মালিক হতো, স্বামী মালিক হতো না, আর সন্তানদের নিয়তি হতো এই যে তারা হয়ে উঠতো সামন্তাধিপের দাস, যারা রক্ষা করতো তার ধনসম্পদ। তার ওপর একটি স্বামী চাপিয়ে দিয়ে তার নিরাপত্তা বিধানের জন্যে নারী হতো সামন্তরাজ্যের ও সামন্তরাজ্যের প্রভুর দাসী : খুব কম সময়ই এসেছে যখন নারীর ভাগ্য এর থেকে বেশি নির্মম ছিলো। উত্তরাধিকারিণী– এটা বোঝাতো ভূমি ও দুর্গ। বারো বা তার কম বয়সে তাকে বিয়ে দেয়া হতো কোনো ব্যারনের সাথে। বেশি বিয়ে মানেই ছিলো বেশি সম্পত্তি, তাই ঘনঘন রদ হতো বিয়ে, গির্জা যা ভণ্ডামোর সাথে অনুমোদন করতো। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও দূরতম সম্পর্কিত দুজনের বিয়ের বিরুদ্ধে যে-নিষেধ ছিলো, তাতে সহজেই পাওয়া যেতো বিয়ে রদের অজুহাত। একাদশ শতকের অনেক নারী এভাবে ত্যাজ্য হয়েছে চার পাঁচবার ক'রে।

বিধবা হলে নারীর কাছে প্রত্যাশা হতো যে সে অবিলম্বে ধরবে একটি নতুন প্রভু। *শাঁসোঁ দ্য জেস্ত*-এ দেখতে পাই যে শার্লেমেন স্পেনে নিহত তার ব্যারনদের সব বিধবাকে দলবেঁধে বিয়ে করছে; এবং অনেক মহাকাব্যে পাওয়া যায় যে রাজা বা ব্যারন স্বেচ্ছাচারিতার সাথে হস্তান্তরিত ক'রে দিচ্ছে মেয়েদের ও বিধবাদের। স্ত্রীদের চুল ধ'রে টেনে পেটানো হতো, কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। নাইটদের আকর্ষণ ছিলো না নারীর প্রতি; তাদের অশ্বকেই তাদের কাছে মনে হতো বেশি মূল্যবান। *শাঁসোঁ দ্য জেস্ত*-এ তরুণীরাই সব সময় প্রণয়ে উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তাদের কাছে চাওয়া হতো একপক্ষীয় একনিষ্ঠতা। কঠোর শারীরিক কাজের মধ্যে রূঢ়ভাবে লালনপালন করা হতো বালিকাদের, এবং দেয়া হতো না কোনো শিক্ষা। বড়ো হয়ে তারা শিকার করতো বন্যপশু, বিপজ্জনক তীর্থযাত্রা করতো, প্রভু রাজ্যের

বাইরে থাকলে রক্ষা করতো ফিফ। এ-প্রভুপত্নীদের কেউ কেউ পুরুষদের মতোই হতো লোলুপ, দুরাচারী, নিষ্ঠুর, স্বেচ্ছাচারী; তাদের হিংস্রতার নানা ভয়াবহ গল্প ছড়িয়ে আছে। তবে এগুলো ব্যতিক্রম; সাধারণত প্রভুপত্নীরা জীবন কাটাতো চরকা কেটে, উপাসনা ক'রে, পতির অপেক্ষায় থেকে, এবং অবসাদে ম'রে গিয়ে।

দ্বাদশ শতকে মিদিতে 'নাইটসুলভ প্রেম'-এর আবির্ভাব হয়তো নারীর ভাগ্যকে একটু কোমল ক'রে তুলেছিলো, এর উদ্ভব যেভাবেই হোক, প্রভুপত্নী ও তার তরুণ ভৃত্যের সম্পর্ক থেকেই হোক বা হোক কুমারীউপাসনা থেকে বা হোক সাধারণ ঈশ্বরপ্রীতি থেকে। ভদ্র প্রেমের ব্যাপারটি কখনো বাস্তবে ছিলো কি না সন্দেহ, তবে এটা নিশ্চিত যে গির্জা ত্রাতার মাতৃপুজোকে এমন এক স্তরে উন্নীত করেছিলো যে বলা যায় এয়োদশ শতকে ঈশ্বরকে পরিণত করা হয়েছিলো নারীতে। অভিজাত নারীদের স্বচ্ছল জীবনে সুযোগ আসে আলাপচারিতার, ভদ্র আচরণের, এবং ঘটে কবিতার বিকাশ। আকুইতেনের এলিনোর ও নাভারের ব্লাঁশের মতো বিদুষীরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন কবিদের, এবং সংস্কৃতির বিপুল বিকাশ নারীদের দেয় এক নতুন মর্যাদা। নাইটসুলভ প্রেমকে অনেক সময় প্লাতোয়ী প্রেম ব'লে গণ্য করা হয়েছে; কিন্তু সত্য হচ্ছে সামন্ত স্বামীরা ছিলো কর্তৃত্বপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী, এবং স্ত্রীরা খুঁজতো পরকীয় প্রেমিক; নাইটসুলভ প্রেম ছিলো অপরিহার্য লোকাচারের বর্বরতার এক ধরনের ক্ষতিপূরণ। যেমন এঙ্গেলস বলেছেন : 'প্রেম, শব্দটির আধুনিক অর্থে, উদ্ভূত হয়েছিলো প্রাচীন কালে প্রথাবদ্ধ সমাজের বাইরে। যৌন প্রেমের খোঁজে যেখানে থামে প্রাচীন কাল সেখানেই শুরু হয় মধ্যযুগ : ব্যভিচার।' যে-পর্যন্ত বিবাহপ্রথা টিকে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত প্রেম ধরবে ওই রূপই।

তবে সামন্তবাদ যখন শেষ হয়ে আসে, তখন নাইটসুলভ প্রেম নয়, ধর্ম নয়, কবিতাও নয়, অন্য কিছু কারণ কিছুটা প্রতিষ্ঠা দেয় নারীদের। রাজকীয় ক্ষমতা বাড়ার সাথে সামন্ত প্রভুরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে তাদের কর্তৃত্ব, হারিয়ে ফেলে তাদের ভৃত্যদের বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা এবং তাদের সন্তানদের সম্পদ খরচের অধিকার। যখন থেকে ফিফ রাজাকে সামরিক সাহায্য দেয়ার বদলে অর্থ দিতে শুরু করে, তখন থেকে এটা হয়ে ওঠে নিছক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটি সম্পত্তি, এবং দু-লিঙ্গকে সমভাবে না দেখার আর কোনো কারণ থাকে না। ফ্রান্সে কুমারী ও বিধবা নারীদের ছিলো পুরুষদের মতো সমস্ত অধিকার; ফিফের স্বত্বাধিকারী হিশেবে নারী বিচারকার্য করতো, চুক্তিতে স্বাক্ষর করতো, আইন জারি করতো। এমনকি সে সামরিক দায়িত্বও পালন করতো, পরিচালনা করতো সৈন্য ও যুদ্ধে অংশ নিতো : জোয়ান অফ আর্কের আগেও ছিলো নারী সৈনিক, এবং যদিও এ-তরুণী বিস্ময় জাগিয়েছিলো, সে কোনো কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করে নি।

এতো সব ব্যাপার সম্মিলিত হয়েছিলো নারীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে ওগুলো একসাথে লোপ করা হয় নি। শারীরিক দুর্বলতা আর বিবেচনার বিষয় ছিলো না, তবে বিবাহিত নারীর অধীনতা সমাজের কাছে মঙ্গলজনক ব'লে মনে হয়। তাই সামন্তবাদ চ'লে যাওয়ার পরেও বৈবাহিক কর্তৃত্ব টিকে থাকে। দেখতে পাই একই অসঙ্গতি, যা টিকে আছে আজো : যে-নারী সমাজের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংহত, তারই সুযোগসুবিধা

সবচেয়ে কম। নাগরিক সামন্তবাদে বিয়ে তা-ই রয়ে যায়, যা ছিলো সামরিক সামন্তবাদে : স্বামী তখনও ছিলো স্ত্রীর অভিভাবক। যখন বুর্জোয়ারা দেখা দেয়, তারাও মেনে চলে একই আইন; মেয়ে ও বিধবার পুরুষের মতো একই অধিকার; কিন্তু বিয়ে হ'লেই নারী হয়ে ওঠে প্রতিপাল্য, যাকে পেটানো যায়, যার আচারব্যবহারের ওপর সারাক্ষণ চোখ রাখতে হবে, এবং যার টাকাপয়সা যথেচ্ছ ব্যয় করা যাবে। একলা নারীর দক্ষতা স্বীকার করা হয়েছে; তবে সামন্তবাদের কাল থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত বিবাহিত নারীকে পরিকল্পিতভাবে বলি দেয়া হয়েছে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির কাছে। স্বামী যতো ধনী হতো স্ত্রী ততো বেশি নির্ভরশীল হতো স্বামীর ওপর; স্বামী নিজেকে যতো বেশি মনে করতো সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতাশীল, গৃহপতি হিশেবে সে হতো ততো বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ। অন্যদিকে, সাধারণ দারিদ্র্য দাম্পত্যবন্ধনকে ক'রে তোলে পারস্পরিক বন্ধন। সামন্তবাদ নারীকে মুক্ত করে নি, ধর্মও করে নি। মধ্যযুগের উপাখ্যান ও উপকথাগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে শ্রমজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ও কৃষকদের এমন এক সমাজ, যাতে স্ত্রীকে পেটানোর শারীরিক জোর ছাড়া স্ত্রীর ওপর স্বামীর আর কোনো জোর ছিলো না; তবে স্ত্রীটি জোরের বিরুদ্ধে আশ্রয় নিতো ছলনার, এবং এভাবে দম্পতিটি বাস করতো সাম্যের মধ্যেই। তখন ধনী নারী তার আলস্যের মূল্য শোধ করতো অধীনতা দিয়ে।

মধ্যযুগেও নারীর ছিলো কিছু সুযোগসুবিধা, কিন্তু ষোড়শ শতকে কিছু আইন করা হয়, যা টিকে থাকে প্রাচীন ব্যবস্থাব্যাপী; সমস্ত লোকাচার বিলুপ্ত হয়েছিলো এবং কিছুই আর চুলোর সাথে নারীকে বেঁধে রাখার পুরুষের বাসনা থেকে নারীকে রক্ষা করতে পারে নি। এ-বিধান নারীর জন্যে নিষিদ্ধ করে 'পুরুষসুলভ' পদ, তাকে বঞ্চিত করে সমস্ত নাগরিক যোগ্যতা থেকে, কুমারীকালে তাকে রাখে পিতার কর্তৃত্বে, পরে তার বিয়ে না হ'লে যে তাকে পাঠিয়ে দিতো সন্ন্যাসিনীদের মঠে, এবং আর যদি বিয়ে হতো, তাহলে তাকে ও তার সম্পত্তিকে ও তার সন্তানদের পুরোপুরি রাখতো স্বামীর কর্তৃত্বে। স্বামীকে দায়ী করা হতো স্ত্রীর সমস্ত ঋণভার ও আচরণের জন্যে, এবং জনশাসনমূলক কর্তৃপক্ষ ও তার পরিবারের কাছে অপরিচিতদের সাথে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো না। কাজে ও মাতৃত্বে সহযোগীর থেকে একটি দাসী ব'লেই তাকে মনে হতো : সে সৃষ্টি করতো যে-সব জিনিশ, মূল্য, মানুষ, সেগুলো তার সম্পদ হতো না, হতো পরিবারের, সুতরাং সে-পুরুষটির, যে ছিলো পরিবারের প্রধান। অন্যান্য দেশেও নারীর অবস্থা ভালো ছিলো না : তার কোনো রাজনীতিক অধিকার ছিলো না এবং লোকাচার ছিলো কঠোর। ইউরোপি সব আইনগত বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো গির্জীয় আইন, রোমীয় আইন, ও জর্মনীয় আইনের ভিত্তির ওপর– যার সবগুলোই ছিলো নারীবিরূপ। সব দেশেই ছিলো ব্যক্তিমালিকানা ও পরিবার এবং এগুলো চালানো হতো এসব সংস্থার দাবি অনুসারে।

এ-সব দেশেই পরিবারের কাছে 'সতীনারী'দের দাসীত্বের অন্যতম ফল ছিলো বেশ্যাবৃত্তির অস্তিত্ব। ভণ্ডামোর সাথে সমাজের প্রান্তে লালিত বেশ্যারা সমাজে পালন করতো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। খ্রিস্টধর্ম এদের ওপর বর্ষণ করেছে প্রচণ্ড তিরস্কার, কিন্তু মেনে নিয়েছে এক অপরিহার্য অশুভ ব'লে। সেইন্ট অগাস্টিন ও

সেইন্ট টমাস উভয়েই বলেছেন বেশ্যাবৃত্তি বিলোপের অর্থ নীতিভ্রষ্টতা দিয়ে সমাজকে বিপর্যস্ত করা : 'প্রাসাদের কাছে পয়ঃপ্রণালি যেমন নগরের কাছে বেশ্যারা তেমন।' আদিমধ্যযুগে লোকাচার এতো লাম্পট্যপূর্ণ ছিলো যে বেশ্যাদের দরকারই পড়তো না; কিন্তু যখন প্রতিষ্ঠিত হয় বুর্জোয়া পরিবার এবং কঠোর একপতিপত্নীক বিয়ে নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়, তখন পুরুষদের প্রমোদ খুঁজতে হয় ঘরের বাইরে।

বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে শার্লেমেনের, এবং পরে ফ্রান্সে চার্লস ৯-এর, এবং আঠারো শতকে অস্ট্রিয়ায় মারিয়া তেরেসার সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয় একইভাবে। সমাজসংস্থাই বেশ্যাবৃত্তিকে দরকারি ক'রে তোলে। যেমন শপেনহায়ার সাড়ম্বরে বলেছিলেন : 'একপতিপত্নীক বিয়ের বেদিতে বেশ্যারা হচ্ছে নরবলি।' লেকি, ইউরোপি নৈতিকতার ঐতিহাসিক, একই ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন কিছুটা ভিন্নভাবে : 'চূড়ান্ত রকমের পাপ, তারাই হচ্ছে সদগুণের শ্রেষ্ঠতম অভিভাবক।' গির্জা এবং রাষ্ট্র একইভাবে নিন্দা করেছে ইহুদিদের সুদের কারবার ও বেশ্যাদের বিবাহবহির্ভূত কামের; কিন্তু আর্থিক ফটকাবজি ও বিয়ের বাইরের প্রেম ছাড়া সমাজ চলতে পারে নি; তাই এসব কাজ ছেড়ে দেয়া হয় হীনবর্ণদের ওপর, যাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা হয় ঘেটোতে বা নিষিদ্ধপল্লীতে। ইহুদিদের মতো বেশ্যাদেরও বাধ্য করা হয় পোশাকের ওপর পরিচয়সূচক চিহ্ন ধারণ করতে; পুলিশের কাছে তারা ছিলো অসহায়; তাদের অধিকাংশের জীবন ছিলো কঠিন। তবে অনেক বেশ্যা ছিলো স্বাধীন; অনেকে বেশ ভালো আয় করতো। যেমন ঘটেছিলো গ্রিক অভিজাত গণিকাদের কালে বীরত্বব্যঞ্জকতার কালের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নারীর সামনে খুলে দিয়েছিলো সুযোগসুবিধার নানা দরোজা, যা দিতে পারতো না 'সতীনারী'র জীবন।

ফ্রান্সে অবিবাহিত নারীর অবস্থা ছিলো একটু অদ্ভুত : দাসীত্বে আবদ্ধ স্ত্রীর সাথে তার স্বাধীনতা ছিলো চমকপ্রদভাবে বিপরীত; সে ছিলো একজন অসামান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তবে আইন তাকে যা দিয়েছিলো, লোকাচার তাকে বঞ্চিত করে তার সব কিছু থেকে; তার ছিলো সব নাগরিক অধিকার– তবে এগুলো ছিলো বিমূর্ত ও শূন্যগর্ভ; তার আর্থনীতিক স্বাধীনতা ছিলো না, সামাজিক মর্যাদাও ছিলো না; সাধারণত বয়স্ক অবিবাহিত কন্যাটি জীবন কাটিয়ে দিতো পিতার পরিবারের ছায়ায় বা তার মতোদের সাথে যোগ দিতো সন্ন্যাসিনীদের মঠে, যেখানে সে আনুগত্য ও পাপ ছাড়া আর কোনো রকমের স্বাধীনতার দেখা পেতো না– যেমন অবক্ষয়ের কালের রোমের নারীরা স্বাধীনতা পেয়েছিলো শুধু পাপের মধ্য দিয়ে। নেতিবাচকতা তখনও ছিলো নারীর নিয়তি, যেহেতু তাদের মুক্তি ছিলো নেতিবাচক।

এমন অবস্থায় নারীর পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা নেয়া, বা নিতান্ত তার উপস্থিতি জ্ঞাপন করাও ছিলো স্পষ্টতই বিরল। শ্রমজীবী শ্রেণীদের মধ্যে আর্থনীতিক পীড়ন দূর ক'রে দিয়েছিলো লিঙ্গের অসাম্য, তবে এটা ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেছিলো সব সুযোগ থেকে; অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে নারীরা ছিলো চোখ রাঙানির তলে : নারীর ছিলো শুধু পরগাছার জীবন; তার কোনো শিক্ষা ছিলো না; শুধুমাত্র অত্যন্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই সে পারতো কোনো বাস্তব পরিকল্পনা নিতে ও বাস্তবায়িত করতে। রাণীদের ও রাজপ্রতিভূদেরই ছিলো এ-দুর্লভ সুখ : তাদের সার্বভৌমত্ব তাদের উন্নীত

করতো নিজেদের লিঙ্গ থেকে ওপরে। ফ্রান্সে সালিক আইন নারীদের নিষিদ্ধ করে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে; তবে স্বামীদের পাশে থেকে, বা স্বামীদের মৃত্যুর পরে, তারা কখনো কখনো মহাভূমিকা পালন করেছে, যেমন, পালন করেছেন সেইন্ট ক্লোতিলদা, সেইন্ট রাদেগোঁদ, এবং কাস্তিলের ব্লাঁশ। সন্ন্যাসিনীদের মঠে বাস নারীদের মুক্ত করতো পুরুষ থেকে : কিছু মঠাধ্যক্ষা ছিলেন খুবই ক্ষমতাশালী। এলোইজ মঠাধ্যক্ষা হিশেবে যতোটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ততোটা খ্যাতিই অর্জন করেছিলেন প্রেমের জন্যে। যে-অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক তাদের জড়িয়ে রাখতো ঈশ্বরের সাথে, তার থেকে নারী-আত্মা লাভ করতো সব প্রেরণা ও পুরুষ-আত্মার শক্তি; এবং সমাজ তাদের প্রতি যে-ভক্তি দেখাতো, তা তাদের শক্তি যোগাতো কঠিন সব কাজ সম্পন্ন করতে। জোয়ান অফ আর্কের দুঃসাহসিক কাজে রয়েছে কিছুটা অলৌকিকতা; এছাড়া এটা ছিলো এক সংক্ষিপ্ত ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসাহসিক কাজ। তবে সিয়েনার সেইন্ট ক্যাথেরিনের কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ; এক স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে বাস ক'রে সিয়েনায় তিনি অর্জন করেন মহাসুখ্যাতি তাঁর সক্রিয় হিতসাধনের সংকল্পের মধ্য দিয়ে। ঐশ্বরিক অধিকার বলে রাণীরা এবং উজ্জ্বল গুণাবলির জন্যে সন্তরা লাভ করতেন এমন সামাজিক সমর্থন, যা তাদের সমর্থ করতো পুরুষের সমান হয়ে কাজ করতে। এর বিপরীতে অন্য নারীদের কাছে চাওয়া হতো বিনীত নিশ্চুপতা।

মোটামুটিভাবে, মধ্যযুগের পুরুষ নারী সম্পর্কে পোষণ করতো বিরূপ ধারণা। প্রণয়াবেদনমূলক কবিতার কবিরা প্রেমকে ক'রে তুলেছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন; *রম্যাঁ দ্য লা রোজ*-এ তরুণদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে দয়িতাদের তুষ্টিতে আত্মনিয়োগ করার জন্যে। তবে এ-সাহিত্যের (ত্রুবাদুরদের সাহিত্য দিয়ে অনুপ্রাণিত) বিপরীতে ছিলো বুর্জোয়াপ্রেরণার সাহিত্য, যাতে নারীদের আক্রমণ করা হয়েছে হিংস্রভাবে : উপকথা, রম্যোপাখ্যান, এবং গাথায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে আলস্যের, ছেনালিপনার, এবং কামুকতার। তাদের নিকৃষ্টতম শত্রু ছিলো যাজকেরা, যারা দোষ চাপাতো বিয়ের ওপর। গির্জা বিয়েকে পরিণত করেছিলো এক পবিত্র ভাবগম্ভীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, আবার তা নিষিদ্ধ করেছিলো খ্রিস্টীয় *অভিজাত*দের জন্যে : 'নারী নিয়ে ঝগড়া'র মূলেই ছিলো একটা অসঙ্গতি। বহু যাজক নারীদের দোষত্রুটি, বিয়ের মধ্যে পুরুষের শহিদত্বের যন্ত্রণা, ও আরো বহু কিছু সম্পর্কে লিখেছে 'বিলাপ' ও তীব্র ভর্ৎসনা; এবং তাদের বিরোধীপক্ষ দেখাতে চেয়েছে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব। এ-ঝগড়া চলেছে পঞ্চদশ শতক ধ'রে, যতোদিন না আমরা দেখতে পাই প্রথম একজন নারী তাঁর লিঙ্গের পক্ষে কলম ধরেছেন, যখন ক্রিস্তিন দ্য পিসাঁ তাঁর *এপিত্র ও দিয়ো দ'আমুর*-এ চালান যাজকদের বিরুদ্ধে এক প্রাণবন্ত আক্রমণ। পরে তিনি মত দেন যে যদি বালিকাদের ঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া হতো, তাহলে তারাও ছেলেদের মতো 'বুঝতে পারতো সব কলা ও বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা'। ওই সাহিত্যিক যুদ্ধের ফলে নারীদের অবস্থার কোনোই বদল ঘটে নি; ওই 'ঝগড়া' ছিলো এমন এক প্রপঞ্চ, যা সামাজিক প্রবণতাকে বদলে দেয় নি, বরং ঘটিয়েছে তার প্রতিফলন।

পনেরো শতকের শুরু থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নারীর আইনগত মর্যাদা থাকে অপরিবর্তিত, তবে সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোতে তার বাস্তব পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে।

লিঙ্গ নির্বিশেষে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যে ইতালীয় রেনেসাঁস ছিলো একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অনুকূল পর্ব। নারীরা হয় ক্ষমতাশালী রাজ্ঞী, সামরিক যোদ্ধা, এবং নেত্রী, শিল্পী, লেখক, ও সুরস্রষ্টা। এ-নারীদের অধিকাংশই চেতনা, রীতিনীতি, ও অর্থসম্পদে ছিলেন স্বাধীন অভিজাত গণিকা, এবং তাঁদের অপরাধ ও প্রমত্ত আনন্দোৎসবগুলো পরিণত হয়েছে কিংবদন্তিতে। পরের শতাব্দীগুলোতে যে-নারীরা মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন ওই সময়ের কঠোর সাধারণ নৈতিকতা থেকে, মর্যাদা ও ধন অনুসারে তাঁরা ভোগ করেন একই স্বাধীনতা। ক্যাথেরিন দ্য মেদিচি, এলিজাবেথ, ইসাবেলা প্রমুখ রাণী এবং তেরেসা ও ক্যাথেরিনের মতো সন্তরা দেখিয়েছিলেন অনুকূল পরিস্থিতিতে নারীরা কী অর্জন করতে পারে; তবে এঁদের ছাড়া নারীদের ইতিবাচক অর্জন ছিলো খুবই কম, কেননা ষোড়শ শতক ভ'রেও তাদের দেয়া হয় নি শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা।

সতেরো শতকে অবকাশপ্রাপ্ত নারীরা নিজেদের নিয়োগ করেন শিল্পসাহিত্য চর্চায়, উচ্চ সামাজিক স্তরে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে ব'লে তাঁরা সালঁগুলোতে পালন করতে থাকেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফ্রান্সে মাদাম দ্য রঁবিয়ে, মাদাম দ্য সেভিঁয়ে, ও অন্যান্য বিপুল খ্যাতিলাভ করেন, এবং অন্যত্র রাণী ক্রিস্তিন, দ্য গুরমান, ও অন্যান্য ছিলেন সমান বিখ্যাত। এসব গুণ ও মর্যাদার ভেতর দিয়ে উচ্চ শ্রেণীর বা খ্যাতিমান নারীরা ঢুকতে শুরু করেন পুরুষের জগতে, শেষে মাদাম দ্য মাইয়ঁতেঁনঁর মধ্যে দেখতে পাই সে-পরিস্থিতিতে একজন কুশলী নারীর পক্ষে দৃশ্যের আড়ালে থেকে কতোটা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। এবং আরো কিছু ব্যক্তিত্ব বাইরের জগতে খ্যাতি লাভ ক'রে মুক্তি পেয়েছিলেন বুর্জোয়া পীড়ন থেকে; দেখা দেয় তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত একটি প্রজাতি : অভিনেত্রী। মঞ্চে প্রথম নারী দেখা গিয়েছিলো ১৫৪৫-এ। এমনকি সতেরো শতকের শুরুতেও অধিকাংশ অভিনেত্রীই ছিলেন অভিনেতাদের স্ত্রী, কিন্তু পরে তাঁরা কর্ম ও ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন হয়ে ওঠেন। নিনোঁ দ্য লেঁক্ল ছিলেন অভিজাত গণিকার পরম প্রতিমূর্তি, যিনি তাঁর স্বাধীনতা ও মুক্তিকে নিয়ে গিয়েছিলেন চূড়ান্তে, যা অনুমোদিত ছিলো না নারীদের জন্যে।

আঠারো শতকে বাড়তে থাকে নারীস্বাধীনতা। লোকাচার তখনও ছিলো কঠোর : বালিকারা পেতো সামান্য শিক্ষা; তার সাথে কথা না ব'লেই তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হতো বা পাঠিয়ে দেয়া হতো সন্ন্যাসিনীদের মঠে। উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীটি স্ত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেয় কড়া নৈতিকতা। তবে বিশ্বরমণীরা যাপন করতো অত্যন্ত কামময় জীবন, এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীটি সংক্রামিত হয়েছিলো এসব উদাহরণ দিয়ে; সন্ন্যাসিনীদের মঠ বা গৃহ কিছুই আর দমন করতে পারতো না নারীদের। আবারও, এসব স্বাধীনতার বড়ো অংশই ছিলো বিমূর্ত ও নঞর্থক : বিনোদন খোঁজার বেশি কিছু ছিলো না। তবে বুদ্ধিমান ও উচ্চাভিলাষীরা সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন। সালঁ অর্জন করে নতুন গৌরব; নারীরা লেখকদের দিতেন নিরাপত্তা ও প্রেরণা, সৃষ্টি করতেন তাঁদের পাঠক; তাঁরা পড়তেন দর্শন ও বিজ্ঞান, এবং পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের জন্যে স্থাপন করেন গবেষণাগার। রাজনীতিতে মাদাম দ্য পঁপাদর ও মাদাম দু বার-এর নাম দুটি নির্দেশ করে নারীর ক্ষমতা : তাঁরাই আসলে চালাতেন রাষ্ট্র। অভিনেত্রীরা ও নাগরালি

করা নারীরা উপভোগ করতেন বিপুল খ্যাতি। এভাবে প্রাচীন ব্যবস্থা জুড়ে যে-নারীরা কিছু করতে চাইতেন, তাঁদের জন্যে সাংস্কৃতিক মণ্ডলই ছিলো সবচেয়ে সুগম্য। তবে তাঁদের কেউই দান্তে বা শেক্সপিয়রের উচ্চতায় পৌঁছোন নি, এর কারণ তাঁদের পরিস্থিতির সাধারণ নিম্নতা। *এ রুম অফ ওয়ান্স ঔন*-এ ভার্জিনিয়া উল্ফ্ শেক্সপিয়রের এক কল্পিত বোনের তুচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত জীবনের সাথে তুলনা করেছেন শেক্সপিয়রের শিক্ষা ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জীবনের। মাত্র আঠারো শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক নারী, মিসেস আফ্রা বেন, একজন বিধবা, পুরুষের মতো লিখে অর্জন করেন জীবিকা। অন্যরা অনুসরণ করেন তাঁর উদাহরণ, তবে এমনকি উনিশ শতকেও তাঁদের অনেকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হতেন। তাঁদের এমনকি 'একটি নিজের ঘরও' ছিলো না; অর্থাৎ তাঁদের ছিলো না সে-বস্তুগত স্বাধীনতা, যা আন্তর মুক্তির অন্যতম আবশ্যক শর্ত। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ বলেছেন ইংল্যান্ডে নারী লেখকেরা সব সময়ই জাগিয়েছেন শত্রুতা।

সামাজিক ও মননশীল জীবনের মৈত্রির ফলে ফ্রান্সে অবস্থা ছিলো কিছুটা অনুকূল; তবে, সাধারণভাবে, জনমত ছিলো 'নীলমুজোদের' প্রতি বিরূপ। রেনেসাঁস থেকেই উচ্চবংশীয় ও বুদ্ধিমান নারীরা, এরাসমুস ও অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে, নারীদের পক্ষে লিখে এসেছেন। নারীর শত্রুরা অবশ্য চুপ ছিলো না। তারা আবার জাগিয়ে তোলে মধ্যযুগের পুরোনো যুক্তিগুলো, এবং প্রকাশ করে *বর্ণমালা*, যার প্রতিটি অক্ষরে নির্দেশ করা হয় নারীর একেকটি দোষ। নারীদের মূর্খতাকে আক্রমণ করার জন্যে দেখা দেয় এক ধরনের লম্পট সাহিত্য– *কাবিনে সাতিরিক* ইত্যাদি– আর ধার্মিকেরা নারীদের অবজ্ঞা করার জন্যে উদ্ধৃত করতে থাকে সেইন্ট পলকে, গির্জার পিতাদের ও ধর্মযাজকদের।

নারীদের সাফল্যই তাদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলে নতুন আক্রমণ : *প্রেসিওজ* নামের আক্রান্ত নারীরা জনমতকে বিরূপ ক'রে তোলেন; *প্রেসিওজ রিদিকিল ও ফাম সভাঁতে*দের করতালি দিয়ে সমর্থন জানানো হতো, যদিও মলিয়ের নারীদের শত্রু ছিলেন না : তিনি জোর ক'রে বিয়ে দেয়াকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন, দাবি করেন তরুণীর হৃদয়ানুভূতির স্বাধীনতা এবং স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা। বোসে প্রচারণা চালাতেন নারীদের বিরুদ্ধে, বোইলো লেখেন প্রহসন। পোলাঁ দ্য ল বার, ওই সময়ের প্রধান নারীবাদী, ১৬৭৩-এ প্রকাশ করেন *দ্য লেগালিতে দে দো সেক্স্*। পুরুষেরা, তিনি মনে করেন, তাদের বিপুল শক্তিকে ব্যবহার করে নিজেদের লিঙ্গকে সুবিধা দেয়ার জন্যে, এবং নারী অভ্যাসবশত সায় দেয় তাদের অধীনতার প্রতি। তারা কখনো সুযোগ পায় নি– স্বাধীনতাও নয় শিক্ষাও নয়। তাই তাদের অতীতের কাজ দিয়ে তাদের বিচার করা যাবে না, তিনি যুক্তি দেন, এবং কিছুই নির্দেশ করে না যে তারা পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট। তিনি নারীর জন্যে দাবি করেন প্রকৃত শিক্ষা।

এ-বিষয়েও দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো আঠারো শতক। কিছু লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নারীদের আত্মা অমর নয়। রুশো নারীদের বলি দেন স্বামী ও মাতৃত্বের কাছে, এভাবে তিনি কথা বলেন মধ্যবিত্তের পক্ষে। 'নারীর সমস্ত শিক্ষা হ'তে হবে পুরুষাপেক্ষী,' তিনি বলেন; '... নারীকে তৈরি করা হয়েছিলো পুরুষের অধীন হওয়ার জন্যে এবং তার অবিচার সহ্য করার জন্যে।' আঠারো শতকের

গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবাদর্শ অবশ্য ছিলো নারীর প্রতি অনুকূল; অধিকাংশ দার্শনিকের কাছেই মানুষ ব'লে মনে হতো নারীকে, যারা শক্তিশালী লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তদের সমতুল্য। ভলতেয়ার নারীর ভাগ্যের অবিচারকে নিন্দা করেছেন। দিদরো মনে করতেন নারীর নিকৃষ্টতার বেশির ভাগই সমাজের *তৈরি*। হেলভেতিউ দেখান যে নারীর শিক্ষার উদ্ভটত্বই সৃষ্টি করে নারীর নিকৃষ্টতা। তবে মার্সিয়ে হচ্ছেন সেই একক পুরুষ, যিনি তাঁর *তাবলো দ্য পারিতে* ক্ষুব্ধ বোধ করেছেন শ্রমজীবী নারীর দুর্দশায় এবং নারীশ্রম সম্পর্কে তুলেছেন মৌলিক প্রশ্ন। নারীকে পুরুষের সমান শিক্ষা দেয়া হ'লে নারী হবে পুরুষের সমতুল্য, এটা বিবেচনা ক'রে কঁদরসে চেয়েছেন নারীরা প্রবেশ করুক রাজনীতিতে। 'আইন দ্বারা নারীকে যতো বেশি দাসত্বে বন্দী করা হয়েছে,' তিনি বলেন, 'ততো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তাদের সাম্রাজ্য...'

পরিচ্ছেদ ৫

ফরাশি বিপ্লব থেকে : চাকুরি ও ভোট

এটা প্রত্যাশা করা খুবই স্বাভাবিক ছিলো যে বিপ্লব বদলে দেবে নারীর ভাগ্য। কিন্তু এটি তেমন কিছুই করে নি। মধ্যবিত্তের বিপ্লব শ্রদ্ধাশীল ছিলো মধ্যবিত্তের সংস্থাগুলো ও মূল্যবোধের প্রতি, এবং এটা সম্পন্ন হয়েছিলো প্রায়-পুরোপুরিই পুরুষদের দ্বারা। এ-সত্যটির ওপর জোর দেয়া দরকার যে প্রাচীনব্যবস্থা ভ'রে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলোর নারীরাই স্ত্রীলিঙ্গদের মধ্যে উপভোগ করেছে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা। তারা ব্যবসা চালাতে পারতো এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সব আইনগত অধিকার তাদের ছিলো। তাদের বস্তুগত স্বাধীনতা তাদের অধিকার দিতো বিপুল স্বাধীন আচরণের : জনগণের নারী বাইরে যেতে পারতো, যেতে পারতো সরাইখানায়, পুরুষদের মতো ইচ্ছেমতো সম্ভোগ করতে পারতো নিজেদের দেহ; তারা ছিলো স্বামীদের সহচর ও সমান। লৈঙ্গিক স্তরে নয়, তারা পীড়ন ভোগ করতো আর্থনীতিক স্তরে। পল্লীতে চাষীনারীরা খামারের কাজে বেশ বড়ো অংশ নিতো; তাদের গণ্য করা হতো ভৃত্য ব'লে; অনেক সময় তারা স্বামী ও পুত্রদের সাথে ব'সে খেতে পেতো না, যদিও খাটতো তাদের থেকে বেশি, এবং তাদের অবসাদের সঙ্গে যুক্ত হতো মাতৃত্বের বোঝা। তবে প্রাচীন কৃষিসমাজের মতোই পুরুষের কাছে তারা দরকারি ছিলো ব'লে মর্যাদা পেতো স্বামীর কাছে; ঘরে তাদের ছিলো প্রবল কর্তৃত্ব। তবে সাধারণ মানুষেরা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় নি এবং তার ফলও ভোগ করে নি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের কথা বলতে গেলে, তাদের কিছু প্রবল উৎসাহে কাজ করেছেন মুক্তির পক্ষে, যেমন মাদাম রোলাঁ এবং লুসিল দেসমুলিঁ। এঁদের মধ্যে একজন ঘটনাক্রমের ওপর ফেলেছিলেন গভীর প্রভাব, তিনি শার্লৎ কোর্দা, যখন তিনি আততায়িত করেন মারাৎকে। নারীদের কিছু বিক্ষোভও প্রদর্শিত হয়েছিলো, অলিম্প দ্য গজে ১৭৮৯-এ প্রস্তাব করেছিলেন 'নারীর অধিকার ঘোষণা', যেটি সমতুল্য ছিলো 'মানবাধিকার ঘোষণা'র, যাতে তিনি পুরুষের সমস্ত সুযোগসুবিধা লোপের দাবি করেন; এবং অবিলম্বে শেষ হন বধ্যমঞ্চে। তখন নানা ক্ষীণায়ু সাময়িকী বেরোয়, এবং কিছু নারী চালান রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের নিষ্ফল প্রয়াস।

১৭৯০-এ উত্তরাধিকার লাভে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের বিশেষ অধিকার লোপ পায়; এ-ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা সমান হয়ে ওঠে। ১৭৯২-এ গৃহীত হয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন; এতে শিথিল হয় বৈবাহিক দাসত্ব। তবে এগুলো ছিলো তুচ্ছ বিজয়। মধ্যবিত্ত নারীরা পরিবারে এতো খাপ খেয়ে গিয়েছিলো যে তারা নিজেদের মধ্যে লিঙ্গ হিশেবে কোনো সংহতি বোধ করে নি; তারা অধিকারের দাবি আরোপ করার মতো কোনো স্বতন্ত্র

জাত ছিলো না : আর্থনীতিকভাবে তারা যাপন করতো পরগাছার অস্তিত্ব। আর্থিক ক্ষমতা যখন আসে শ্রমিকদের হাতে, তখন শ্রমজীবী নারীদের পক্ষে সম্ভব হয় এমন সব অধিকার ও সুবিধা আদায় ক'রে নেয়া, যা কখনো সম্ভব হয় নি ওই পরগাছা নারীদের, অভিজাত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, পক্ষে অর্জন করা।

বিপ্লবের সময় নারীরা পেয়েছিলো এক ধরনের নৈরাজ্যমূলক মুক্তি। কিন্তু সমাজ যখন আবার সংগঠিত হয়, নারী নতুনভাবে আবদ্ধ হয় কঠোর দাসত্ববন্ধনে। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রান্স এগিয়ে ছিলো অন্যান্য দেশ থেকে; কিন্তু আধুনিক ফরাশি নারীর দুর্ভাগ্য এই যে তার মর্যাদা স্থির হয় এক সামরিক একনায়কত্বের কালে; নেপলিয়নি বিধি, তার ভাগ্যকে এক শতাব্দীর জন্যে বিধিবদ্ধ ক'রে, তার মুক্তিকে বিপুলভাবে শ্লথ ক'রে দেয়। সব সামরিক ব্যক্তির মতো নেপলিয়ন নারীর মধ্যে দেখতে পছন্দ করতো একটি মা; কিন্তু একটি বুর্জোয়া বিপ্লবের উত্তরাধিকারীরূপে সে এমন লোক ছিলো না যে বিপর্যস্ত করবে সমাজের সংস্থিতি, এবং মাকে দেবে স্ত্রীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব। সে পিতৃত্ব খোঁজা নিষিদ্ধ করে; অবিবাহিত মা ও অবৈধ সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেয় কঠোর শর্ত। তবে বিবাহিত নারী নিজে কোনো মর্যাদা পায় নি মা হিশেবে; সামন্ততান্ত্রিক অসঙ্গতিকে দেয়া হয় স্থায়িত্ব। বালিকা ও স্ত্রীকে বঞ্চিত করা হয় নাগরিক অধিকার থেকে, যার ফলে তার পক্ষে সম্ভব হয় না আইনব্যবসা ও অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করা। তবে কুমারী নারী, চির-আইবুড়ো, ভোগ করতো সমস্ত নাগরিক অধিকার, কিন্তু বিয়েতে বজায় থাকতো সে-পুরোনো পরনির্ভরতা। স্ত্রী বাধ্য থাকতো স্বামীর *অনুগত* থাকতে; ব্যভিচারের অপরাধে স্বামী তাকে একলা ঘরে বন্দী ক'রে রাখতে পারতো এবং বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো; যদি ব্যভিচারের কাজের সময় স্বামী ধরতে পারতো স্ত্রীকে, খুন করতো স্ত্রীকে, আইনের চোখে সে ক্ষমার্হ হতো; আর স্বামী যদি বাড়িতে নিয়ে আসতো রক্ষিতা, তাহলে তার হতো সামান্য দণ্ড; এবং এ-ঘটনার জন্যেই শুধু স্ত্রী স্বামীর কাছে থেকে পেতে পারতো বিবাহবিচ্ছেদ। স্ত্রীর দেহ ও সম্পদ ছিলো কঠোর বৈবাহিক নিয়ন্ত্রণের অধীন।

উনিশ শতকে আইনশাস্ত্র চাপিয়ে দেয় ওই বিধির কঠোর প্রয়োগ। ১৮২৬-এ লুপ্ত হয় বিবাহবিচ্ছেদ, এবং ১৮৮৪-র আগে আর পুনপ্রবর্তিত হয় নি; তখনও এটা ছিলো কঠিন। ঘোষণা করা হয় যে নারী তৈরি হয়েছে পরিবারের জন্যে, রাজনীতির জন্যে নয়; গৃহস্থালির জন্যে, সামাজিক কাজের জন্যে নয়। অগাস্ত কোঁৎ ঘোষণা করেন বিশেষভাবে মানবপ্রজাতিতে, শারীরিক ও নৈতিকভাবে, নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে মৌল পার্থক্য, যা তাদের ক'রে তুলেছে গভীরভাবে ভিন্ন। নারীত্ব ছিলো এক ধরনের 'প্রলম্বিত শৈশব', যা তাকে পৃথক ক'রে তুলেছে 'জাতির আদর্শরূপ থেকে' এবং তার মনকে করেছে দুর্বল। তিনি গৃহের বাইরে নারীর শ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। নৈতিকতা ও প্রেমে নারীকে মনে করা যেতে পারে শ্রেষ্ঠতর; কিন্তু পুরুষ করতো কাজ, যখন নারী আর্থিক বা রাজনীতিক অধিকারহীন হয়ে থাকতো বাড়িতে।

বালজাক আরো নৈরাশ্যজনক ভাষায় প্রকাশ করেছেন একই বিশ্বাস। *ফিজিয়লজি দি মারিয়াজ*-এ তিনি লিখেছেন : 'পুরুষের হৃদয়কে স্পন্দিত করাই নারীর নিয়তি ও একমাত্র গৌরব... সে এক অস্থাবর সম্পত্তি এবং ঠিকভাবে বললে সে পুরুষের পাশে

এক গৌণ জিনিশ।' এখানে তিনি আঠারো শতকের অনুমোদন ও এ-সময়ের ভীতিকর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে কথা বলছেন নারীবিরোধী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির পক্ষে। বালজাক দেখিয়েছেন প্রেমহীন বুর্জোয়া বিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এগোয় ব্যভিচারের দিকে, এবং তিনি স্বামীদের পরামর্শ দিয়েছেন শক্তহাতে বল্গা ধ'রে রাখতে, স্ত্রীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি না দিতে, তাদের যতোখানি সম্ভব অসুন্দর রাখতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি নারীদের রান্নাঘরে ও বাড়িতে বন্দী ক'রে রেখে, তাদের আচরণের ওপর সতর্ক চোখ রেখে, তাদের পুরোপুরি নির্ভরশীল ক'রে রেখে মেনে চলেছে এ-কর্মসূচি। ক্ষতিপূরণ হিশেবে তাদের দেয়া হতো সম্মান এবং তাদের সঙ্গে করা হতো চরম ভদ্র ব্যবহার। 'বিবাহিতা নারী এক দাসী, যাকে বসিয়ে রাখতে হবে সিংহাসনে,' বলেছেন বালজাক। অধিকাংশ বুর্জোয়া নারী গ্রহণ করেছিলো এ-কারুকার্যমণ্ডিত বন্দীত্ব; আর অল্পসংখ্যক যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের কথা শোনা হয় নি। বার্নার্ড শ বলেছেন মানুষকে শেকলমুক্ত করার থেকে শৃঙ্খলিত করা সহজ, যদি শেকল হয় লাভজনক। মধ্যবিত্ত নারী আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিলো তার শেকল, কেননা সে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিলো তার শ্রেণীর সুযোগসুবিধা। পুরুষের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিজের জীবিকার জন্যে কাজ করতে হতো তাকে; সে শ্রমজীবী নারীর সাথে কোনো সংহতি বোধ করে নি, এবং তার বিশ্বাস ছিলো বুর্জোয়া নারীর মুক্তির অর্থ হচ্ছে তার শ্রেণীর বিনাশ।

তবে ইতিহাসের অগ্রগতি এসব একগুঁয়ে প্রতিরোধে থেমে থাকে নি; যন্ত্রের আগমন ধ্বংস করে ভূসম্পত্তিশালীদের এবং নারীদের সাথে শ্রমজীবীদের মুক্তিকেও ত্বরান্বিত করে। সব ধরনের সমাজতন্ত্র, পরিবার থেকে নারীদের জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে, প্রশস্ত করে নারীর মুক্তি। প্লাতো স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ধরনের সংঘব্যবস্থার এবং তাদের দিতে চেয়েছিলেন এমন স্বায়ত্তশাসন, যা উপভোগ করতো স্পার্টার নারীরা। সাঁৎ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ও কাবের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সাথে জন্ম নেয় 'মুক্তনারী'র ইউটোপিয়া; বিলুপ্ত করা হয় শ্রমিক ও নারীর দাসত্ব, কেননা নারীরাও পুরুষের মতো মানুষ। দুর্ভাগ্যক্রমে এ-যৌক্তিক ভাবনা সাঁৎ-সিমোঁবাদী ধারায় প্রাধান্য লাভ করে নি। ফুরিয়ে, উদাহরণস্বরূপ, গোলমাল পাকিয়ে তোলেন নারীমুক্তি ও মাংসের পুনর্বাসনের মধ্যে, তিনি দাবি করেন যে প্রতিটি মানুষকে সাড়া দিতে হবে তার কামনার ডাকে এবং বিয়ের স্থান নেবে প্রেম; তিনি নারীকে মানুষ হিশেবে গণ্য না ক'রে দেখেছেন শুধু তার কামমূলক ভূমিকা। কাবে নারীপুরুষের সম্পূর্ণ সাম্যের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু তিনি নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধা দেন। অন্যরা নারীমুক্তি না চেয়ে দাবি করেন নারীদের সুশিক্ষা। নারী যে এক পুনর্জীবনদাত্রী শক্তি, এ-ধারণা টিকে ছিলো উনিশ শতক ভ'রে এবং আবার দেখা দেয় ভিক্তর উগোতে। নারীপক্ষীয়দের অযোগ্যতার ফলে নারীর আন্দোলন হারিয়ে ফেলে তার সুনাম। বিভিন্ন সংঘ, সাময়িকী, প্রতিনিধিদল, 'ব্লুমারবাদ'-এর মতো আন্দোলনগুলো– সবই হয়ে ওঠে হাস্যাস্পদ। তখনকার সবচেয়ে মেধাবী নারী মাদাম দ্য স্তেল ও জর্জ সাঁ নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই ক'রে দূরে থাকেন এসব আন্দোলন থেকে। তবে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন সাধারণভাবে ছিলো নারীবাদের পক্ষে, কেননা এটা চেয়েছিলো সাম্যের মধ্যে সুবিচার। প্রধোঁ ছিলো এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। সে

নারীদের নিকৃষ্টতা দেখাতে চেয়ে ভঙ্গ করে নারীবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রি, সতীনারীকে ঠেলে দেয় গৃহে, ও পুরুষনির্ভরতায়। সে বেছে নিতে বলে 'গৃহিণীকে অথবা বেশ্যা'কে। তবে সব নারীবিরোধীর মতোই পুরুষের দাসী ও দর্পণ 'প্রকৃত নারী'র প্রতি সে নিবেদন করে অতি আকুল প্রার্থনাগীতি। তবে এ-গভীর ভক্তি সত্ত্বেও সে ব্যর্থ হয় নিজের স্ত্রীকে সুখী করতে : মাদাম প্রধোঁর পত্রাবলি এক দীর্ঘ বিলাপ।

এসব তাত্ত্বিক বিতর্ক ঘটনাক্রমের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে নি : এগুলো বরং যা ঘটছিলো, এগুলো ছিলো তার দ্বিধাগ্রস্ত প্রতিফলন। নারীরা পুনরুদ্ধার করে এমন এক আর্থিক গুরুত্ব, যা তারা হারিয়ে ফেলেছিলো প্রাগৈতিহাস কাল থেকে, কেননা তারা মুক্তি পায় চুলো থেকে এবং কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পায় একটি নতুন ভূমিকা। যন্ত্রই সম্ভব ক'রে তোলে এ-অভ্যুত্থানকে, কেননা অনেকাংশেই লোপ পায় নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের শারীরিক বলের পার্থক্য। কলকারখানার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে দরকার পড়ে অনেক বড়ো শ্রমশক্তি, যা শুধু পুরুষের পক্ষে যোগানো সম্ভব হয় নি, তাই দরকার হয়ে পড়ে নারীদের সহযোগিতা। এটাই ছিলো উনিশ শতকের মহাবিপ্লব, যা রূপান্তরিত ক'রে দেয় নারীদের ভাগ্য, এবং তাদের জন্যে সূচনা করে এক নতুন যুগের। মার্ক্স ও এঙ্গেলস পরিমাপ করেন এর সম্পূর্ণ বিস্তারটি, এবং তাঁরা সর্বহারার মুক্তির মধ্যে দেখতে পান নারীর মুক্তি। আসলে, 'নারী ও শ্রমিকদের এখানেই মিল : তারা উভয়ই নির্যাতিত,' বলেছেন বেবেল। এবং প্রাযুক্তিক বিবর্তনের ফলে তাদের শ্রম যে-গুরুত্ব পাবে, তাতে উভয়েই নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে একই সাথে। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে নারীর ভাগ্য শক্তভাবে বাঁধা ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির সাথে; একটি বিপর্যয় মাতৃধারার স্থানে বসিয়েছিলো পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এবং নারীকে বেঁধে ফেলেছিলো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তির দাসত্বে। তবে শিল্পবিপ্লব ছিলো ওই অধিকারহানির বিপরীতরূপমূর্তি এবং যা নিয়ে যায় নারীমুক্তির দিকে।

উনিশ শতকের শুরুতে নারীদের লজ্জাকরভাবে শোষণ করা হয়েছে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায়। ঘরে নারীশ্রমকে ইংরেজেরা বলতো 'ঘর্মায়ণ পদ্ধতি'; নিরন্তর শ্রম সত্ত্বেও নারীশ্রমিকেরা তাদের অভাব মেটানোর মতো আয় করতে পারতো না। জুলে সিমোঁ তাঁর *ল'ইউভরিয়েতে* এবং এমনকি রক্ষণশীল লিরোয়-বয়লো ১৮৭৩-এ প্রকাশিত তাঁর *ল্য ত্রাভেল দে ফেমে ও ১৯*-এ, নিন্দা করেছেন এ-হীন পীড়নের; পরেরজন বলেছেন যে ফ্রান্সের দু-লক্ষেরও বেশি নারীশ্রমিক দিনে পঞ্চাশ সাঁতিমের থেকেও কম আয় করে। মালিকেরা অনেক সময় পুরুষদের থেকে বেশি পছন্দ করতো নারীদের। 'তারা কম মজুরিতে বেশি কাজ করে।' এ-নিরাশাজনক সূত্র আলোকিত ক'রে তোলে নারীশ্রমের নাটকটিকে। কেননা শ্রমের মধ্য দিয়েই মানুষ হিশেবে নারী জয় করেছে তার মর্যাদা; তবে এটা ছিলো একটা অতি কষ্টার্জিত ও প্রলম্বিত বিজয়।

সুতো কাটা ও কাপড় বোনার কাজ করতে হতো শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। ব্লঁকু লিখেছেন, 'লায়নে ফিতার কারখানায় নারীদের কাজ করতে হয় অনেকটা দোয়ালে ঝুলে থেকে, যখন তারা উভয় পা ও হাত দিয়ে কাজ করে।' ১৮৩১-এ রেশম শ্রমিকেরা গ্রীষ্মকালে কাজ করতো ভোর তিনটে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, শীতকালে কাজ করতো ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত, দৈনিক সতেরো ঘণ্টা; 'এমন

কারখানায় যা অধিকাংশ সময়ই হতো অস্বাস্থ্যকর, যেখানে কখনো সূর্যালোক ঢুকতো না,' বলেছেন নর্বার ক্রুর্কি।

তাছাড়া, পুরুষ শ্রমিকের' বিশেষ সুবিধা আদায় ক'রে নিতো তরুণী শ্রমিক মেয়েদের ওপর। অনেক সময় নারীরা কারখানায় কাজের সাথে খামারের কাজও করতো। তারা শোষিত হতো পীড়াদায়কভাবে। *ডাস কাপিটাল*-এর এক টীকায় মার্ক্স বর্ণনা করেছেন এটা : 'উৎপাদনকারী, মিঃ ই., আমাকে জানিয়েছেন তিনি তাঁর তাঁতকলে শুধু নারীদেরই নিয়োগ করেন, তিনি অগ্রাধিকার দেন বিবাহিত নারীদের, আবার তাদের মধ্যে সে-নারীদের, বাড়িতে যাদের ভরণপোষণের জন্যে আছে পরিবার, কেননা তারা অবিবাহিতদের থেকে বেশি মনোযোগী আর বশমানা; এবং পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে তারা তাদের শক্তির শেষকণাটি ক্ষয় ক'রে কাজ করে।' জি দারভিল লিখেছেন : 'পোষাপ্রাণী বা ভারবাহী পশু : এই হচ্ছে আজকাল নারী। যখন সে কাজ করে না তখন তার প্রতিপালন করে পুরুষ, আর সে এখনও প্রতিপালিত হয় পুরুষ দিয়ে যখন সে কাজ করতে করতে মারা যাচ্ছে।' তাদের এ-অবস্থার আংশিক কারণ হচ্ছে নারীরা প্রথমে বুঝতে পারে নি কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় এবং নিজেদের সংগঠিত করতে হয় সংঘে।

১৮৮৯-৯৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে ফ্রান্সে নারীশ্রমিকেরা দৈনিক মজুরি হিশেবে পেতো পুরুষের মজুরির অর্ধেক। ১৯০৮-এর এক অনুসন্ধান অনুসারে ঘণ্টাপ্রতি শ্রমিকদের সর্বোচ্চ মজুরি বিশ সাঁতিমের বেশি হতো না এবং কখনো কখনো কমে দাঁড়াতো পাঁচ সাঁতিম; তাই এভাবে শোষিত কোনো নারীর পক্ষে ভিক্ষা করা বা কোনো রক্ষক ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। ১৯১৮তে আমেরিকায় একজন নারীশ্রমিক পেতো পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেক মজুরি। এ-সময়ে জর্মন কয়লাখনিতে একজন নারীশ্রমিক সমপরিমাণ কয়লা খোঁড়ার জন্যে মজুরি পেতো একজন পুরুষ শ্রমিকের থেকে শতকরা পঁচিশ ভাগ কম। ১৯১১ থেকে ১৯৪৩-এর মধ্যে ফ্রান্সে নারীশ্রমিকদের মজুরি পুরুষ শ্রমিকদের থেকে অনেক বেশি দ্রুত বাড়ানো হয়, তারপরও তাদের মজুরি থাকে অনেক কম।

কম মজুরি নিতো ব'লে নারীশ্রমিকদের পছন্দ করতো নিয়োগদাতারা, আর এটাই জাগাতো পুরুষ শ্রমিকদের বিরোধিতা। বেবেল ও এঙ্গেলস যেমন দাবি করেছেন তেমন কোনো অব্যবহিত সংহতি ছিলো না সর্বহারার স্বার্থের সাথে নারীর স্বার্থের। একই সমস্যা দেখা দেয় যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। শোষণকারীরা সাধারণত অস্ত্র হিশেবে তাদের নিজেদের শ্রেণীরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে সমাজের সবচেয়ে শোষিত সংখ্যালঘুদের; তাই তাদের শ্রেণীর কাছে প্রথমে সংখ্যালঘুদের মনে হয় শত্রু; কালো ও শাদাদের স্বার্থ, নারীশ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিকদের স্বার্থ, পরস্পরের বিরোধী না হয়ে যে লাভ করতে পারে সংহতি, এর জন্যে দরকার পরিস্থিতিকে অনেক বেশি গভীরভাবে অনুধাবন করা। এটা সহজবোধ্য যে পুরুষ শ্রমিকেরা প্রথমে এই হ্রাস-মূল্যে ছাড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে দেখেছিলো এক প্রচণ্ড বিপদ, তাই তারা দেখিয়েছিলো এর বিরুদ্ধে শত্রুতা। শুধু যখন নারীরা শ্রমিক সংগঠনে সুসংহত হয়েছে, তখনই শুধু তারা রক্ষা করতে পেরেছে নিজেদের স্বার্থ এবং সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে

বিপজ্জনক হওয়া থেকে বিরত করতে পেরেছে নিজেদের।

নারীর এক মৌলিক সমস্যা হচ্ছে প্রজননগত ভূমিকার সাথে তার উৎপাদনশীল শ্রমের সামঞ্জস্যবিধান। ইতিহাসের সূচনা থেকে যে-মৌল সত্য গৃহকর্মে নিযুক্ত ক'রে শেষ ক'রে দিয়েছে নারীকে এবং তাকে বাধা দিয়েছে বিশ্বকে বদলে দেয়ার কাজে অংশ নিতে, সেটা হচ্ছে প্রজননগত ভূমিকার কাছে তার দাসত্ব। স্ত্রীপশুদের আছে একটা জৈবিক ও ঋতুগত স্পন্দ, যা তাদের রক্ষা করে শক্তি ক্ষয় থেকে; কিন্তু নারী, বয়ঃসন্ধি থেকে ঋতুবিরতি পর্যন্ত, কতোবার গর্ভবতী হবে তার কোনো সীমা ঠিক ক'রে দেয় নি প্রকৃতি। কোনো কোনো সভ্যতা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে, এবং কথিত আছে যে কিছু ভারতি গোত্রে রীতি আছে দুটি প্রসবের মধ্যে অন্তত দু-বছরের জন্যে নারীদের বিশ্রাম দেয়ার; তবে সাধারণভাবে বহু শতাব্দী ধ'রে নারীর উর্বরতা থেকেছে অনিয়ন্ত্রিত। প্রাচীন কাল থেকেই অস্তিত্ব আছে জন্মনিরোধকের, যা সাধারণত গ্রহণ করে নারীরা : বিষোপচার, ভেষজ নিবেশ্য, যোনিপটি; তবে ওগুলো থেকে গেছে বেশ্যা ও চিকিৎসকদের গুপ্তকথা। সম্ভবত এসব গুপ্তকথা অবক্ষয়ের কালের রোমের নারীদের জানা ছিলো, যাদের বন্ধ্যাত্ব ছিলো ব্যঙ্গলেখকদের আক্রমণের লক্ষ্য। তবে মধ্যযুগের ইউরোপে অজানা ছিলো জন্মনিরোধক; আঠারো শতক পর্যন্ত ওগুলোর একটি টুকরোও পাওয়া যায় নি। ওই সময়ে নারীর জন্যে জীবন ছিলো অব্যাহত গর্ভের পর গর্ভ; এমনকি সহজ সতীত্বের নারীরাও তাদের অবাধ প্রেমের মূল্য শোধ করতো ঘনঘন গর্ভধারণ ক'রে।

কোনো কোনো পর্বে মানুষ জনসংখ্যা কমানোর তীব্র প্রয়োজন বোধ করেছে; তবে একই সময়ে রাষ্ট্র ভয় পেয়েছে দুর্বল হয়ে যাওয়ার। সংকট ও দুর্যোগের সময় হয়তো জন্মহার কমিয়েছে দেরিতে বিয়ের মাধ্যমে, তবে সাধারণ নিয়ম থেকেছে অল্প বয়সে বিয়ে করা এবং নারীর পক্ষে যতো বেশি সন্তান উৎপাদন সম্ভব ততো সন্তান উৎপাদন; শিশুমৃত্যুই শুধু হ্রাস করতো জীবিত সন্তানের সংখ্যা। সতেরো শতকেই আবে দ্য পির প্রতিবাদ করেছিলেন নারীদের 'প্রেমে পেটফোলা রোগ'-এ দণ্ডিত করার বিরুদ্ধে; এবং মাদাম দ্য সেভিঁএ তাঁর কন্যাকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঘনঘন গর্ভবতী না হওয়ার। তবে আঠারো শতকে ফ্রান্সে বিকশিত হয় মালথাসীয়বাদ। প্রথমে উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলো, তারপর সাধারণ জনগণ পিতামাতার অবস্থানুসারে সন্তানের সংখ্যা কমানোকে যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে করে, এবং শুরু হয় জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া। প্রথমে *বহিরপাত* রীতি ছড়িয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, তারপর গ্রামবাসী ও শ্রমিকদের মধ্যে। ফ্রান্সে নিষিদ্ধ ছিলো জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক প্রচারণা ও যোনিপটি ও এ-ধরনের অন্যান্য জিনিশ বিক্রি; তবে বেশ ব্যাপকভাবেই চলতো 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'।

গর্ভপাত কোথাও আইনে সরকারিভাবে অনুমোদিত ছিলো না। রোমান আইন ভ্রূণজীবনের জন্যে কোনো বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নি; এ-আইন *প্রসব্যকে* মায়ের শরীরের অংশ ব'লেই গণ্য করতো, মানুষ হিশেবে নয়। অবক্ষয়ের কালে গর্ভপাত এক স্বাভাবিক প্রচল হয়ে উঠেছিলো। যদি স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গর্ভপাত ঘটাতো স্ত্রী, সে স্ত্রীকে শাস্তি দিতো, তবে ওটা তার অবাধ্যতার অপরাধের জন্যে। সমগ্র প্রাচ্যদেশীয় ও গ্রেকো-রোমান সভ্যতায় গর্ভপাত অনুমোদিত ছিলো।

খ্রিস্টধর্ম ভ্রূণকে একটি আত্মা দিয়ে নৈতিক বিপ্লব ঘটায়; এর পর থেকে গর্ভপাত হয়ে ওঠে ভ্রূণের বিরুদ্ধে অপরাধ। সেইন্ট অগাস্টিনের মতে, 'যে-নারী তার পক্ষে যতোগুলো সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব ততোগুলো সন্তান জন্ম দেয় না, সে ততোগুলো হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অপরাধী, ঠিক তেমনই অপরাধী সে-নারী, যে গর্ভধারণের পর আহত করে নিজেকে।' যাজকীয় আইন বিকশিত হয় ধীরেধীরে, তারা অন্তহীন আলোচনা করে এ-প্রশ্ন নিয়ে যে আসলে ঠিক কখন আত্মা প্রবেশ করে ভ্রূণের দেহে। সেইন্ট টমাস ও অন্যরা ঠিক করেন পুরুষের বেলা আত্মা ঢোকে চল্লিশ দিনের দিন আর মেয়ের বেলা ঢোকে আশি দিনের দিন। মধ্যযুগে গর্ভপাতের জন্যে নানা মাত্রার অপরাধ নির্দিষ্ট হয় গর্ভপাতের সময় ও কারণ অনুসারে : 'যে-গরিব নারী প্রতিপালন করতে পারবে না ব'লে শিশু ধ্বংস করে এবং যার লাম্পট্যের অপরাধ লুকোনো ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, তাদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে,' প্রায়শ্চিত্ত পুস্তক বলেছে একথা। উনিশ শতকে গর্ভপাত হত্যাকাণ্ড এ-ধারণা লোপ পায়; একে গণ্য করা হয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লে। ক্যাথলিক গির্জা তার কঠোরতা হ্রাস করে নি; ১৯১৭তে গির্জা গর্ভপাতে জড়িত সবাইকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করার বিধান দেয়। পোপ এই সম্প্রতিও ঘোষণা করেছেন যে মায়ের জীবন ও শিশুর জীবনের মধ্যে উৎসর্গ করতে হবে আগেরটিকে : অবশ্য মায়ের যেহেতু অপ্সুদীক্ষা হয়েছে, সে স্বর্গে প্রবেশাধিকার পেতে পারে– কিন্তু মজার কথা যে নরক কখনো এসব হিশেব করে না– আর ভ্রূণ অনন্তকাল কাটাতে থাকবে লিম্বোতে। গর্ভপাত সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছিলো শুধু অল্পকালের জন্যে : জর্মনিতে নাটশিবাদের আগে, এবং ১৯৩৬-এর আগে রাশিয়ায়। কিন্তু ধর্ম ও আইন সত্ত্বেও সব দেশেই এটা অধিকার ক'রে আছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

নারীর অবস্থার বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে হবে দুটি কারণের একযোগে কাজ হিশেবে : উৎপাদনশীল শ্রমে অংশগ্রহণ ও প্রজননের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ। এঙ্গেলস যেমন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, রূপান্তরিত ক'রে দিতে হবে নারীর সামাজিক ও রাজনীতিক মর্যাদা। নারীবাদী আন্দোলন, ফ্রান্সে যার রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন কঁদরসে, ইংল্যান্ডে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ তাঁর *ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্‌ অফ ওম্যান*-এ, এবং উনিশ শতকের শুরুতে যা আবার শুরু করেছিলেন সাঁৎ-সিমোঁবাদীরা, তা কোনো সুস্পষ্ট ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়, কেননা তার অভাব ছিলো বাস্তব ভিত্তির। কিন্তু এখন, যখন নারীরা স্থান নিয়েছে কলকারখানায় এবং বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, তখন তাদের দাবি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তির মাধ্যমেই নারী শক্তভাবে বাঁধা ছিলো স্বামীর সঙ্গে; বিষয়সম্পত্তি অতীতের ব্যাপার হয়ে ওঠায় স্বামী-স্ত্রী শুধুই স্থাপিত হয় পাশাপাশি; এমনকি সন্তানেরাও তাদের ততোটা শক্তভাবে বেঁধে রাখতে পারে না যেমন বেঁধে রাখতো সম্পত্তির স্বার্থ। এভাবে ব্যক্তি মুক্তি পায় দল থেকে।

এ-প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় আমেরিকায়, যেখানে জয়ী হয়েছে আধুনিক পুঁজিবাদ : বিবাহবিচ্ছেদ বাড়তে থাকে এবং স্বামীস্ত্রীরা সাময়িক সহচরের বেশি কিছু থাকে না। ফ্রান্সে এ-বিবর্তন শ্লথগতিতে ঘটতে বাধ্য হয়, কেননা এখানে পল্লীর

জনগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং নেপলিয়নি বিধি বিবাহিত নারীকে রেখেছে অন্যের কর্তৃত্বে। ১৮৮৪তে পুনপ্রবর্তিত হয় বিবাহবিচ্ছেদ; স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারতো যদি স্বামী ব্যভিচার করতো। তবে দণ্ডশাস্ত্রে রক্ষিত হয় লিঙ্গভিন্নতা : ব্যভিচার ছিলো আইনত অপরাধ, যদি করে স্ত্রী। ১৯০৭-এ দেয়া হয় ন্যাসরক্ষকের কিছুটা ক্ষমতা, যা পুরোপুরি দেয়া হয় ১৯১৭তে। ১৯১২তে অনুমোদিত হয় স্বাভাবিক পিতৃত্ব নির্ণয়ের অধিকার। ১৯৩৮ ও ১৯৪২-এ সংশোধিত হয় বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা : আনুগত্যের কর্তব্য বাতিল করা হয়, যদিও পিতাই থাকে পরিবারের প্রধান। সে-ই ঠিক করে বাসস্থান, যদি যথেষ্ট কারণ থাকে তাহলে স্ত্রী তার পছন্দের বিরোধিতা করতে পারে। তার আইনগত ক্ষমতা বাড়ানো হয়; কিন্তু এ-গোলমেলে বিবৃতিতে : 'বিবাহিত স্ত্রীর সমস্ত আইনগত ক্ষমতা রয়েছে। শুধু বিয়ের চুক্তি ও আইনানুসারেই এসব ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব', এ-ধারার শেষাংশ প্রথমাংশের বিরোধী। স্বামীস্ত্রীর সাম্য তখনও অর্জিত হয় নি।

বলতে পারি ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিক অধিকার সহজে অর্জিত হয় নি। ১৮৬৭ অব্দে জন স্টুয়ার্ট মিল ইংরেজি সংসদে নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে প্রথম বক্তৃতা করেন, এটাই নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে প্রথম সরকারিভাবে প্রদত্ত বক্তৃতা। তাঁর লেখায় তিনি পরিবারে ও সমাজে নারীপুরুষের সাম্যের জন্যে প্রবলভাবে দাবি জানান। 'আমি নিশ্চিত যে-সামাজিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা এক লিঙ্গকে অধীন করে আরেক লিঙ্গের, সেটা সহজাতভাবেই খারাপ এবং সেটা মানুষের প্রগতির বিরুদ্ধে একটা বড়ো বাধা; আমি নিশ্চিত যে ওগুলো স্থান ছেড়ে দেবে বিশুদ্ধ সাম্যের জন্যে।' তাঁর অনুসরণে মিসেস ফসেটের নেতৃত্বে ইংরেজ নারীরা নিজেদের রাজনীতিকভাবে সংগঠিত করে; ফরাশি নারীরা জড়ো হয় মারিয়া দারাইসেঁর পেছনে, যিনি ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১-এর মধ্যে একরাশ সম্মেলনে আলোচনা করেন নারীর অবস্থা। লিয়োঁ রিশিয়ে, যিনি ছিলেন নারীবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, ১৮৬৯-এ প্রকাশ করেন 'নারীর অধিকার', এবং ১৮৭৮-এ এ-সম্পর্কে আয়োজন করেন আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের। তখনও নারীদের ভোটাধিকারের প্রশ্নটি তোলা হয় নি, নারীরা নাগরিক অধিকার দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নিজেদের। তিরিশ বছর ধ'রে ফ্রান্সে ও ইংল্যান্ডে এ-আন্দোলন থেকেছে খুবই ভীরু। স্থাপিত হয়েছে অসংখ্য সংঘ, কিন্তু অর্জন হয়েছে সামান্যই, কেননা লিঙ্গ হিশেবে নারীদের ছিলো সংহতির অভাব।

ভোটাধিকার পেতে ফরাশি নারীদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৪৫ পর্যন্ত।

নিউজিল্যান্ড নারীদের পূর্ণ অধিকার দেয় ১৮৯৩-এ; অস্ট্রেলিয়া ১৯০৮-এ। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ভোটাধিকার লাভ ছিলো খুবই কঠিন। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ড নারীদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিলো গৃহের ভেতরে; জেন অস্টিন লেখার জন্যে গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে; বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন নারীরা 'এক উপপ্রজাতি, যাদের কাজ হচ্ছে প্রসব করা'। সেখানে ১৯০৩ পর্যন্ত নারীবাদ ছিলো ভীরু, যখন প্যাংখার্স্ট পরিবার লন্ডনে স্থাপন করে নারীদের সামাজিক ও রাজনীতিক সংঘ, এবং নারীবাদী আন্দোলন ধরে এক অনন্য ও উগ্র রূপ। ইতিহাসে এই প্রথম নারীদের দেখা যায় নারী হিশেবে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে। ১৯১২তে গৃহীত হয় আরো হিংস্র কৌশল

: তারা বাড়িতে আগুন লাগায়, চিত্রকলা নষ্ট করে, পায়ে পিষে লণ্ডভণ্ড করে ফুলের কেয়ারি, পুলিশের দিকে পাথর ছোঁড়ে, বারবার প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে অ্যাসকুইথ ও স্যার অ্যাডওয়ার্ড গ্রেকে ঘিরে ফেলে, জনসভার বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটায়। মাঝখানে ঘটে মহাযুদ্ধ। ১৯১৮ অব্দে ইংরেজ নারীরা পায় নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকার, এবং ১৯২৮-এ অনিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকার। তাদের সাফল্য অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিলো যুদ্ধের সময় দায়িত্ব পালনের ফলে।

শুরু থেকেই আমেরিকার নারীরা অনেক বেশি মুক্ত ছিলো ইউরোপীয় বোনদের থেকে। উনিশ শতকের শুরুতে পুরুষদের সঙ্গে নারীদের করতে হয়েছিলো নতুন দেশে বসতি স্থাপনের কঠোর কাজ; পুরুষের পাশে থেকে তারা লড়াই করেছে; পুরুষের থেকে সংখ্যায় তারা ছিলো অনেক কম, এবং এটা তাদের খুব মূল্যবান ক'রে তুলেছিলো। তবে ক্রমশ তাদের অবস্থা হয়ে ওঠে তাদের পুরোনো বিশ্বের নারীদের মতোই; তাদের খুব ভক্তি করা হতো এবং তারা পরিবারে ছিলো কর্তৃত্বশীল, তবে সামাজিক কর্তৃত্ব পুরোপুরিই ছিলো পুরুষের হাতে। ১৮৩০-এর দিকে কিছু নারী রাজনীতিক অধিকার দাবি করতে থাকে; এবং তারা প্রচারাভিযান চালাতে থাকে নিগ্রোদের পক্ষে। কুয়েকারনেত্রী লুক্রেশিয়া মোট স্থাপন করেন আমেরিকান নারীমুক্তি সংঘ, এবং ১৮৪০-এর এক সম্মেলনে ঘোষণা করেন কুয়েকার-অনুপ্রাণিত এক ইশতেহার, যা ঠিক ক'রে দেয় আমেরিকার সব নারীমুক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। 'পুরুষ ও নারীকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, স্রষ্টা তাদের ভূষিত করেছে কতিপয় হস্তান্তরঅযোগ্য অধিকারে.. সরকার স্থাপিত হয়েছে শুধু এসব অধিকার রক্ষা করার জন্যে... পুরুষ বিবাহিত নারীকে এক নাগরিক শবে পরিণত করেছে... সে জোর ক'রে নিজে অধিকার করেছে ছিনিয়ে তার সমস্ত অধিকার, দাবি করেছে যে নারীর জন্যে এক পৃথক এলাকা বরাদ্দ করা তার অধিকার।' তিন বছর পরে হ্যারিয়েট বিশার স্টো লেখেন *আংকেল টমস্ কেবিন*, যা নিগ্রোদের পক্ষে গ'ড়ে তোলে জনমত। এমার্সন ও লিংকন নারীমুক্তি আন্দোলন সমর্থন করেন। গৃহযুদ্ধের পর নারীবাদীরা নিষ্ফলভাবে দাবি করেন যে-সংশোধনী নিগ্রোদের ভোটাধিকার দিয়েছে সেটা যেনো নারীদেরও ভোটাধিকার দেয়; দ্ব্যর্থকতার সুযোগ নিয়ে সুজ্যান বি অ্যান্থনি ও তাঁর চোদ্দোজন সঙ্গী রস্টারে ভোট দেন; তাঁকে একশো ডলার দণ্ডিত করা হয়। ১৮৬৯-এ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নারী ভোটাধিকারের জন্যে জাতীয় সংঘ; এবং একই বছরে ওইমিংগে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। ১৮৯৩-এ ভোটাধিকার দেয়া হয় কোলোরাডোতে, তারপর ১৮৯৬-এ আইডাহো ও ইউটাতে।

তারপর অগ্রগতি ঘটে খুব ধীরে; তবে আর্থিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ইউরোপের নারীদের থেকে অনেক বেশি সাফল্য লাভ করে। ১৯২০-এ নারীর ভোটাধিকার দেশের আইনে পরিণত হয়।

লাতিন দেশগুলো, প্রাচ্যদেশগুলোর মতো, আইন দিয়ে যতোটা অধীনে রাখে নারীদের তারচেয়ে বেশি রাখে প্রথার কঠোরতা দিয়ে। ইতালিতে ফ্যাশিবাদ যথারীতি বাধা দিয়েছে নারীবাদের অগ্রগতিতে। গির্জার সাথে মৈত্রি চেয়ে, পরিবারকে যেমন ছিলো তেমন রেখে, নারীদাসত্বের ধারা বজায় রেখে ফ্যাশিবাদী ইতালি নারীকে বন্দী

করে দ্বিগুণ দাসত্বে : শাসক কর্তৃপক্ষের কাছে এবং তার স্বামীর কাছে। জর্মনিতে ঘটনাক্রম ছিলো খুবই ভিন্ন। হিপেল নামক এক ছাত্র ১৭৯০-এ জোরে ছুঁড়ে দিয়েছিলো প্রথম নারীবাদী ইশতেহার, এবং উনিশ শতকের শুরুতে বিকশিত হ'তে থাকে এক ধরনের ভাবালুতাপূর্ণ নারীবাদ, যা স্বভাবে ছিলো জর্জ সাঁর নারীবাদের সগোত্র। ১৮৪৮-এ প্রথম জর্মন নারীবাদী নারী লুইজা ওটো জাতীয়বাদের চরিত্র সংস্কারে নারীর অংশগ্রহণের অধিকার দাবি করেন এবং ১৮৬৫তে স্থাপন করেন নারীসংঘ। জর্মন সমাজতন্ত্রবাদীরা অনুকূলে ছিলো নারীবাদের, এবং ১৮৯২-এ দলের নেতাদের মধ্যে ছিলেন ক্লারা জেটকিন। নারীরা ১৯১৪তে যুদ্ধে অংশ নেয়; এবং জর্মনির পরাজয়ের পর নারীরা পায় ভোটাধিকার এবং সক্রিয় হয় রাজনীতিতে। রোজা লুক্সেমবার্গ স্পার্টাকাস সংঘে লড়াই করেন এবং আততায়িত হন ১৯১৯-এ। অধিকাংশ জর্মন নারী সমর্থন করে শৃঙ্খলার দলকে; অনেকে রাইসস্টাগেও আসন গ্রহণ করেন। এ-মুক্তনারীদের ওপর হিটলার নতুনভাবে চাপিয়ে দেয় নেপলিয়নি আদর্শ : *কাইস, কির্স, কিন্টার*– রান্নাঘর, গির্জা, শিশু। এবং সে ঘোষণা করে যে 'নারীর উপস্থিতি রাইসস্টাগকে অপমানিত করবে'। নাৎসিবাদ ছিলো ক্যাথলিক-বিরোধী ও বুর্জোয়াবিরোধী, তাই এটা মাতৃত্বকে দেয় এক সুবিধাপ্রাপ্ত স্থান, অবিবাহিত মাদের ও অবৈধ সন্তানদের বিশেষ নিরাপত্তা দিয়ে এটা নারীকে বিয়ের বন্ধন থেকে অনেকটা বের ক'রে আনে। স্পার্টায় যেমন, এখানে নারী কোনো বিশেষ পুরুষের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নির্ভরশীল ছিলো রাষ্ট্রের ওপর; এটা তাকে পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যবিত্ত নারীর থেকে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছিলো।

সোভিয়েত রাশিয়ায় নারীবাদী আন্দোলন লাভ করেছে ব্যাপকতম অগ্রগতি। উনিশ শতকের শেষভাগে এটা দেখা দেয় শিক্ষার্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, এমনকি তখনই তারা জড়িত ছিলো হিংস্র ও বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের সাথে। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় অনেক কাজে নারীরা দখল করে পুরুষের স্থান এবং সাম্যের জন্যে সংঘবদ্ধ দাবি জানায়। ১৯০৫-এর পর তারা অংশ নেয় রাজনীতিক ধর্মঘটে, সৃষ্টি করে অবরোধ; এবং বিপ্লবের কিছু দিন আগে ১৯১৭তে তারা পিটার্সবার্গে প্রদর্শন করে এক গণবিক্ষোভ, দাবি করে রুটি, শান্তি, ও তাদের পুরুষদের প্রত্যাবর্তন। অক্টোবর অভ্যুত্থানে এবং পরে, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, তারা পালন করে এক বড়ো ভূমিকা। মার্ক্সীয় ধারার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে লেনিন শ্রমিকের মুক্তির সাথে যুক্ত করেন নারীর মুক্তিকে; তিনি তাদের দেন রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সাম্য।

নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন সম্প্রতি এক বৈঠকে সব দেশে দু-লিঙ্গের সাম্যকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়েছে, এবং এটি এ-আইনি ধারাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে গ্রহণ করেছে কয়েকটি প্রস্তাব। তাই মনে হ'তে পারে যে খেলায় জিৎ হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ আরো গভীর গভীরতরভাবে নারীদের অঙ্গীভূত করবে আমাদের একদা পুংলৈঙ্গিক সমাজে।

এ-ইতিহাসের দিকে সাধারণভাবে তাকালে আমরা দেখতে পাই এর থেকে বেরিয়ে আসছে কয়েকটি সিদ্ধান্ত। সবার আগে আছে এটি : নারীর সম্পূর্ণ ইতিহাস পুরুষের তৈরি। ঠিক যেমন আমেরিকায় কোনো নিগ্রো সমস্যা নেই, বরং আছে এক

শাদা সমস্যা; ঠিক যেমন 'ইহুদিবিদ্বেষ ইহুদির সমস্যা নয়; এটা আমাদের সমস্যা'; ঠিক তেমনি নারী সমস্যা সব সময়ই ছিলো একটি পুরুষের সমস্যা। আমরা দেখেছি শুরু থেকেই কেনো পুরুষের শারীরিক শক্তির সাথে ছিলো নৈতিক শক্তি; তারা সৃষ্টি করেছে মূল্যবোধ, লোকাচার, ধর্ম; ওই সাম্রাজ্য নিয়ে নারী কখনো পুরুষের সাথে বিবাদ করে নি। কয়েকজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি– সাফো, ক্রিস্তিন দ্য পিসাঁ, মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট্‌, অলিঁপ দ্য গজে– তাঁদের নিয়তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এবং কখনো কখনো গণবিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে; তবে রোমান মাতৃরা সফল হয় নি ওপ্পিয়ান আইনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে, অ্যাংলো-স্যাক্সন ভোটাধিকার দাবিকারীরাও চাপ দিয়ে সফল হয় নি, যতোদিন না পুরুষকে বাধ্য করা হয়েছে নতি স্বীকারে। পুরুষ সব সময়ই নিজ হাতে ধ'রে রেখেছে নারীর ভাগ্য; এবং এটা কী হওয়া উচিত তা ঠিক করেছে পুরুষ, তবে তা নারীর স্বার্থে করে নি, করেছে নিজেদের পরিকল্পনা, ভীতি, ও প্রয়োজন অনুসারে। যখন তারা দেবী মহামাতাকে ভক্তি করেছে, তারা তা করেছে প্রকৃতিকে ভয় করেছে ব'লে; যখন ব্রোঞ্জের হাতিয়ার আবিষ্কারের ফলে তারা দৃপ্তভাবে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ায়, তারা প্রতিষ্ঠা করে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা; তারপর পরিবার ও রাষ্ট্রের বিরোধ স্থির ক'রে দেয় নারীর মর্যাদা; খ্রিস্টানের ঈশ্বর, বিশ্ব, ও নিজ দেহের প্রতি তার মনোভাব প্রতিফলিত হয় নারীর পরিস্থিতিতে, যা সে নির্ধারিত করে নারীর জন্যে; মধ্যযুগে যাকে বলা হতো 'নারী নিয়ে ঝগড়া', সেটা ছিলো যাজকশ্রেণী ও সাধারণ পুরুষের মধ্যে বিবাহ ও কৌমার্য নিয়ে ঝগড়া : সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা অনুসারে যে-সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা বিবাহিত নারীর জন্যে নিয়োগ করে অভিভাবক, এবং আজ পুরুষের অর্জিত প্রযুক্তিগত বিবর্তন মুক্ত করেছে নারীকে। পুরুষের নীতিবোধের রূপান্তরের ফলেই জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবারের আকার কমানো সম্ভব হয়েছে, এবং নারী আংশিক মুক্ত হয়েছে মাতৃত্বের দাসত্ব থেকে। নারীবাদ কখনোই কোনো স্বায়ত্তশাসিত আন্দোলন ছিলো না : অংশত এটা ছিলো রাজনীতিবিদদের হাতের এক হাতিয়ার, অংশত ছিলো একটি অন্তপ্রপঞ্চ, যা প্রতিফলিত করে গভীর সামাজিক নাটককে। নারী কখনো কোনো পৃথক জাত সৃষ্টি করে নি, সত্য কথা বলতে কী লিঙ্গ অনুসারে তারা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের কথাও ভাবে নি। অধিকাংশ নারী কোনো কর্মোদ্যোগ গ্রহণের বদলে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের; আরা যাঁরা এটা বদলে দিতে চেয়েছেন, তাঁরা নিজেদের বিশেষ অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে বন্দী থেকে একে জয়ী করতে চান নি, বরং এর থেকে ওপরে উঠতে চেয়েছেন। যখন তাঁরা বিশ্বের কর্মকাণ্ডে ঢুকেছেন, তাঁরা তা করেছেন পুরুষের সাথে খাপ খাইয়ে, পুরুষের প্রেক্ষাপটে।

যে-শ্রেণীগুলোর মধ্যে নারী কিছুটা আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং অংশ নিয়েছে উৎপাদনে, সেগুলো ছিলো শোষিত শ্রেণী, এবং নারীশ্রমিক বেশি দাসত্বে বন্দী হয়েছিলো পুরুষ শ্রমিকদের থেকে। শাসক শ্রেণীগুলোর মধ্যে নারী ছিলো পরগাছা এবং এজন্যে অধীনে ছিলো পুরুষের বিধিবিধানের। উভয় ক্ষেত্রেই নারীর পক্ষে কোনো কর্মোদ্যোগ গ্রহণ ছিলো বাস্তবিকভাবে অসম্ভব। আইন আর লোকাচার অনেক সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না, এবং এ-দুয়ের মধ্যে এমনভাবে স্থাপিত হতো ভারসাম্য

যে নারী কখনোই বস্তুগতভাবে মুক্ত থাকতো না। প্রাচীন রোমান প্রজাতন্ত্রে আর্থিক অবস্থা মাতৃদের দিয়েছিলো বস্তুগত ক্ষমতা, কিন্তু তাদের কোনো আইনগত স্বাধীনতা ছিলো না। কৃষিসভ্যতায় ও নিম্ন ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেও নারীর অবস্থা ছিলো অনেক সময় একই রকম : গৃহিণী, গৃহের দাসী, কিন্তু সামাজিকভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক। বিপরীতভাবে, সামাজিক বিপর্যয়ের পর্বগুলোতে নারী পেয়েছে মুক্তি, কিন্তু পুরুষের অনুগত দাসী না হওয়ায় সে হারিয়েছে তার ফিফ; সে পেয়েছে শুধু এক নেতিবাচক স্বাধীনতা, যা প্রকাশ পেয়েছে স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষতিকর আমোদপ্রমোদে। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে সমাজে বিবাহিত নারীর একটি স্থান ছিলো, কিন্তু তার কোনো অধিকার ছিলো না; কিন্তু অবিবাহিত নারীর, সতী হোক বা বেশ্যা হোক, ছিলো পুরুষের মতো সব আইনগত অধিকার, তবে এ-শতাব্দী পর্যন্ত তারা ছিলো সামাজিক জীবন থেকে বর্জিত।

আইনগত অধিকার ও সামাজিক প্রথার এ-বিরোধ থেকে, আরো অনেক কিছুর সাথে, দেখা দিয়েছে এ-অসঙ্গতিটি : অবাধ যৌনপ্রেম আইনে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ব্যভিচার অপরাধ; কিন্তু যে-তরুণী 'ভুল পথ'-এ গেছে, তাকে অনেক সময়ই নিন্দিত করা হয়, কিন্তু স্ত্রীর অসদাচরণকে দেয়া হয় প্রশ্রয়; এবং এজন্যে সতেরো শতক থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত অনেক তরুণী বিয়ে করেছে শুধু অবাধে প্রেমিক নেয়ার জন্যে। যে-সব নারী পুরুষের সমতুল্য সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁরা উন্নীত হয়েছেন সব ধরনের লৈঙ্গিক বৈষম্যের উর্ধ্বে অবস্থিত সামাজিক সংস্থাগুলোর শক্তি দিয়ে। রাণী ইসাবেলা, রাণী এলিজাবেথ, মহান ক্যাথেরিন পুরুষও ছিলেন না নারীও ছিলেন না– তাঁরা ছিলেন সার্বভৌম শাসক। ধর্মও ঘটায় একই ধরনের রূপান্তর : সিয়েনার ক্যাথেরিন, সেইন্ট তেরেসা তাঁদের শারীরবৃত্তিক বিবেচনা পেরিয়ে ছিলেন সন্ত আত্মা।

বোঝা যায় অন্য নারীরা যে বিশ্বে গভীর ছাপ ফেলতে পারে না, তার কারণ তারা তাদের পরিস্থিতির সাথে শক্তভাবে বাঁধা। তারা নঞর্থক ও পরোক্ষভাবে ছাড়া কোনো কিছুতেই হাত দিতে পারে না। জুডিথ, শার্লট কর্দি, ফেরা জাসুলিস ছিলেন আততায়ী; *ফ্রঁদোস*রা ছিলেন ষড়যন্ত্রকারী; বিপ্লবের সময়, কমিউনের কালে নারীরা পুরুষের সাথে লড়াই করেছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অধিকারহীন, ক্ষমতাহীন মুক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যানে ও বিপ্লবে অংশ নিতে দেয়া হয়েছে নারীদের, কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে সদর্থক গঠনমূলক কাজে; বেশি হ'লে পরোক্ষ পথে তারা পুরুষের কাজে অংশ নিয়ে সফল হ'তে পেরেছে। আস্পাসিয়া, মাদাম দ্য মঁতেনোঁ, রাজকন্যা দেস উরর্সি ছিলেন উপদেষ্টা, যাঁদের কথা গুরুত্বের সাথে শোনা হতো– তবে যদি এমন কেউ থাকতো, যে তাঁদের কথা শুনতে চাইতো। নারীরা যুদ্ধ বাঁধানোর উশকানি দিতে পেরেছে, যুদ্ধের কৌশল প্রস্তাব করতে পারে নি; তারা তখনই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে রাজনীতি যখন রাজনীতি নেমে গেছে যড়যন্ত্রের স্তরে; বিশ্বের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কখনোই নারীর হাতে আসে নি; তারা কৌশল বা অর্থব্যবস্থার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি, তারা রাষ্ট্র ভাঙে নি গড়ে নি, তারা নতুন বিশ্ব আবিষ্কার করে নি। তাদের মধ্য দিয়ে ঘটেছে কিছু ঘটনার সূত্রপাত, তবে তাতে নারীরা ছিলো অজুহাত, সংঘটক নয়। লুক্রেতিয়ার আত্মহত্যার ছিলো শুধু প্রতীকী মূল্য। শহিদত্ব খোলা শোষিতের জন্যে;

খ্রিস্টানদের পীড়নের কালে, সামাজিক বা জাতীয় পরাজয়ের প্রভাতে, নারীরা সাক্ষ্য দেয়ার এ-কাজটি করেছে; কিন্তু কখনোই কোনো শহিদ বিশ্বের মুখমণ্ডল বদলে দেয় নি। এমনকি নারী যখন কিছু শুরু করেছে এবং প্রদর্শন করেছে বিক্ষোভ, এসব কার্যক্রম তখনই গুরুত্ব লাভ করেছে যখন কোনো পুরুষের সিদ্ধান্ত তা সম্প্রসারিত করেছে। হ্যারিয়েট বিশার স্টোকে ঘিরে সমবেত নারীরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেছে তীব্র জনমত; তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধের সত্যিকার কারণগুলো ভাবালুতাধর্মী ছিলো না। ১৯১৭ অব্দের ৮ মার্চের 'নারীদিবস' হয়তো রুশবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে– তবে ওটা ছিলো একটি সংকেত মাত্র।

অধিকাংশ নারী বীরাঙ্গনারাই অস্বাভাবিক : সাহসিকারা ও আদিতমারা যতোটা উল্লেখযোগ্য তাদের কাজের গুরুত্বের জন্যে, তার চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তাদের নিয়তির অনন্যতার জন্যে। তাই আমরা যদি জোয়ান অফ আর্ক, মাদাম রোলাঁ, ফ্লোরা ত্রিস্তানকে তুলনা করি রিশলো, দাঁতোঁ, লেনিনের সাথে, দেখতে পাই যে তাঁদের মহত্ত্ব প্রধানত আত্মগত : তাঁরা ঐতিহাসিক সংঘটক নন, তারা দৃষ্টান্তমূলক মানবমূর্তি। মহাপুরুষ উঠে আসেন জনগণ থেকে এবং পরিস্থিতি তাঁকে চালিয়ে নেয় সামনের দিকে; নারী জনমগুলি থাকে ইতিহাসের প্রান্তদেশে এবং পরিস্থিতি প্রতিটি নারীর জন্যে প্রতিবন্ধক, স্প্রিংবোর্ড নয়। বিশ্বের মুখমণ্ডল বদলানোর জন্যে প্রথম দরকার সেখানে দৃঢ়ভাবে নোঙর পাতা; কিন্তু যে-নারীদের শেকড় সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, তারা সমাজের অধীনস্থ; কোনো ঐশী শক্তি দিয়ে কর্মে প্রবর্তিত না হ'লে– সেখানেই তাঁরা নিজেদের দেখাতে পেরেছেন পুরুষের সমান ব'লে– উচ্চাভিলাষী নারী ও বীরাঙ্গনা হয়ে ওঠে অদ্ভুত দানব। যখন থেকে নারীরা পৃথিবীতে স্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি রোজা লুক্সেমবার্গ, মাদাম কুরির মতো নারীর আবির্ভাব। তাঁরা দীপ্তভাবে দেখিয়েছেন যে নারীর নিকৃষ্টতা নারীকে ঐতিহাসিকভাবে তুচ্ছ ক'রে তোলে নি; বরং তাদের ঐতিহাসিক তুচ্ছতাই তাদের করেছে নিকৃষ্ট।

এ-সত্যটি উজ্জ্বলভাবে স্পষ্ট সে-এলাকায়, যেখানে নারী সবচেয়ে সফল হয়েছে নিজেদের দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করতে– অর্থাৎ, সংস্কৃতির এলাকায়। তাদের ভাগ্য গভীরভাবে জড়িয়ে আছে সাহিত্য ও শিল্পকলার ভাগ্যের সাথে; প্রাচীন জর্মনদের মধ্যে দৈবজ্ঞা ও যাজিকার ভূমিকা ছিলো একান্তভাবে নারীর যোগ্য কাজ। ইতালীয় রেনেসাঁসের কালে বিকশিত হয়েছিলো যে-প্রণয়মূলক অতীন্দ্রিয়তাবাদ, মানবতাবাদী ঔৎসুক্য, সৌন্দর্যস্পৃহা, সতেরো শতকের পরিমার্জিতি, আঠারো শতকের প্রগতিশীল আদর্শবাদ – সবগুলোই বিভিন্ন রূপে নারীত্বকে করেছে পরমায়িত। এভাবে নারী হয়ে ওঠে কবিতার ধ্রুবতারা, শিল্পকলার বিষয়বস্তু; অবসর তাকে সুযোগ দেয় চেতনার আনন্দের কাছে আত্মোৎসর্গ করতে; লেখকের প্রেরণা, সমালোচক, ও পাঠকগোষ্ঠি, সে হয়ে ওঠে তাঁর প্রতিপক্ষ; নারীই মাঝেমাঝে সংবেদনশীলতার কোনো একটি রীতিকে প্রধান ক'রে তোলে, তৈরি করে এমন নীতি, যা তৃপ্ত করে পুরুষচিত্তকে, এবং এভাবে সে হস্তক্ষেপ করে নিজের নিয়তির ওপর– নারীর শিক্ষা ছিলো বৃহদংশে নারীর এক বিজয়। তবে বুদ্ধিজীবী নারীদের যৌথ ভূমিকা যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক-না-কেনো, তাদের ব্যক্তিগত অবদান সাধারণভাবে হয়েছে কম মূল্যবান। যে কিছু সৃষ্টি করতে

চায় নতুনভাবে, তার জন্যে বিশ্বের প্রান্তদেশে বাস করাটা অনুকূল অবস্থান নয় : এখানে আবার, বিদ্যমান অবস্থা থেকে উঠে আসার জন্যে, প্রথম দরকার অবস্থার মাঝে গভীরভাবে মূল প্রোথিত করা। যাদের সম্মিলিতভাবে রাখা হয়েছে নিকৃষ্ট পরিস্থিতিতে সে-মানব গোষ্ঠির মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন প্রায় অসম্ভব। মারি বাশকির্তসেভ জানতে চেয়েছিলেন, 'একজন কোথায় যেতে পারে, স্কার্ট প'রে?' স্তেঁদাল বলেছিলেন : 'সব প্রতিভা, যাঁরা জন্মেছেন *নারী* হয়ে, নষ্ট হয়েছেন জনগণের কল্যাণে।' সত্য বলতে কী, কেউ প্রতিভা হয়ে জন্মায় না : প্রতিভা হয়ে *ওঠে*; আজ পর্যন্ত নারীর পরিস্থিতি এই হয়ে ওঠাকে ক'রে রেখেছে বাস্তবিকভাবে অসম্ভব।

নারীর ইতিহাস থেকে নারীমুক্তিবিরোধীরা বের করেন করেন দুটি পরস্পরবিরোধী যুক্তি : (১) নারী কখনো মহৎ কিছু সৃষ্টি করে নি; এবং (২) নারীর পরিস্থিতি মহৎ নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশে কখনো বাধা দেয় নি। এ-মন্তব্য দুটিতে রয়েছে প্রতারণা; সুবিধাপ্রাপ্ত গুটিকয়েকের সাফল্য সম্মিলিত মানের নিম্নায়নের সাথে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে না বা তাকে অব্যাহতি দেয় না; এবং এ-সাফল্য যে এতো দুর্লভ ও সীমাবদ্ধ, তা-ই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে পরিস্থিতি ছিলো তাদের প্রতিকূলে। ক্রিস্তিন দ্য পিসাঁ, পোলিঁ দ্য লা বার, কঁদরসে, জন স্টুয়ার্ট মিল, এবং স্তেঁদাল যেমন মনে করেছেন, নারী সুযোগ পায় নি কোনো এলাকায়ই। এ-কারণেই আজকাল অসংখ্য নারী দাবি করে নতুন মর্যাদা; এবারও তারা দাবি করে না যে তাদের গৌরব দিতে হবে নারীত্বের জন্যে : তারা চায় তাদের মধ্যে, যেমন সমগ্র মানবমণ্ডলিতে, সীমাবদ্ধতার ওপর আধিপত্য করবে সীমাতিক্রমণতা; তারা চায় অবশেষে তাদের দিতে হবে বিমূর্ত অধিকার ও বাস্তব সম্ভবপরতা, যা একযোগে না মিললে মুক্তি হয়ে ওঠে একটা পরিহাস।

এ-বাসনা পূর্ণ হওয়ার পথে। কিন্তু যে-সময়ে আছি আমরা, সেটা এক ক্রান্তিকাল; এ-বিশ্ব, যা সব সময়ই ছিলো পুরুষের অধিকারে, আজো আছে তাদেরই অধিকারে; আজো টিকে আছে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্থা ও মূল্যবোধগুলোর বড়ো অংশ। সবখানে নারীকে সবগুলো বিমূর্ত অধিকার সম্পূর্ণরূপে দেয়া হয় নি : সুইজারল্যান্ডে এখনো তারা ভোট দিতে পারে না; ফ্রান্সে ১৯৪২-এর আইন আজো শীর্ণরূপে রক্ষা করে স্বামীর সুযোগসুবিধা। বিমূর্ত অধিকার, আমি একটু আগেই বলেছি, কখনোই নারীকে পৃথিবীর ওপর নিশ্চিত অধিকার দিতে সমর্থ হয় নি : আজো দু-লিঙ্গের মধ্যে সত্যিকার সাম্য বিরাজ করে না।

প্রথমত, বিয়ের বোঝার ভার পুরুষের থেকে নারীর ওপর অনেক বেশি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে স্বীকৃত বা গুপ্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে মাতৃত্বের কাছে দাসত্ব কমেছে; তবে এটা সর্বত্র ছড়ায় নি। গর্ভপাত যেহেতু সরকারিভাবে নিষিদ্ধ, তাই অনেক নারী তত্ত্বাবধানহীন গর্ভপাত ক'রে নেয় স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বা বিধ্বস্ত হয় অসংখ্য গর্ভধারণে। গৃহকর্মের মতো সন্তান লালনপালনের কাজও প্রায় সবটাই করে নারী। বিশেষ ক'রে ফ্রান্সে নারীমুক্তিবিরোধী ঐতিহ্য আজো এতো নাছোড়বান্দা যে পুরুষেরা আজো মনে করে নারীর কাজে সাহায্য ক'রে তারা নিজেদের নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। এর ফল হচ্ছে পারিবারিক জীবনের সাথে কর্মজীবনের সামঞ্জস্য স্থাপন পুরুষের থেকে নারীর পক্ষে

অনেক কঠিন। সমাজ যখন দাবি করে এ-প্রয়াস, তখন নারীর জীবন হয়ে ওঠে তার স্বামীর জীবনের থেকে অনেক কষ্টকর।

যে-সত্য নারীর বাস্তবিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা হচ্ছে অস্পষ্ট রূপরেখা নিয়ে দেখা দিচ্ছে যে-নতুন সভ্যতা, তার ভেতরে একগুঁয়েভাবে অতিশয় পুরোনো ঐতিহ্যের টিকে থাকা। এটাই সে-জিনিশ, যাকে ভুল বোঝে চটজলদি দর্শকেরা, যারা মনে করে নারীকে এখন দেয়া হচ্ছে যে-সব সম্ভাবনা, নারী তার উপযুক্ত নয়, অথবা আবার তারা, যারা এসব সম্ভাবনার মধ্যে দেখতে পায় শুধু ভয়ঙ্কর প্রলোভন। সত্য হচ্ছে নারীর পরিস্থিতি হয়ে পড়েছে ভারসাম্যহীন, এবং এ-কারণে তার সাথে খাপ খাওয়ানো নারীর পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা নারীর জন্যে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি কলকারখানা, কর্মস্থল, অনুষদ, কিন্তু আমরা আজো বিশ্বাস ক'রে চলছি যে বিয়েই নারীর জন্যে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা। যেমন আদিম সভ্যতাগুলোতে, আনন্দে নারী যে-সব কাজ করে, সে-কাজগুলোর জন্যে কমবেশি প্রত্যক্ষভাবে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার তার আছে। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া, অন্তত রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ অনুসারে, সবখানেই আধুনিক নারীকে অনুমতি দেয়া হয় তার দেহকে শোষণের পুঁজি হিশেবে গণ্য করতে। বেশ্যাবৃত্তি সহ্য করা হয়, বীরপুঙ্গবতাকে উৎসাহিত করা হয়। এবং বিবাহিত নারীকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এটা দেখতে যে স্বামী তার ভরণপোষণ করছে কি না; এর সাথে তাকে দেয়া হয়েছে অবিবাহিত নারীর থেকে বেশি সামাজিক মর্যাদা। লোকাচার অবিবাহিত পুরুষকে কামচরিতার্থ করতে যতোটা সম্মতি দেয় তার সামান্যও দেয় না অবিবাহিত নারীকে; বিশেষভাবে তার জন্যে মাতৃত্ব বাস্তবিকভাবে নিষিদ্ধ, অবিবাহিত মাতা থাকে এক কেলেঙ্কারির বস্তুরূপে। কীভাবে সিন্ডেরেলার কিংবদন্তি হারাবে তার সব বৈধতা? আজো সব কিছুই তরুণীকে কঠিন ও অনিশ্চিত বিজয়ের চেষ্টার থেকে উৎসাহিত করে কোনো সুদর্শন রাজকুমারের কাছে থেকে সৌভাগ্য ও সুখ লাভ করতে। বিশেষ ক'রে সে আশা করতে পারে ওই রাজকুমারের বদৌলতে সে উন্নতি লাভ করবে নিজের বর্ণের থেকে উচ্চবর্ণে, সারাজীবনের শ্রম দিয়েও সে কিনতে পারবে না যে-অলৌকিক ব্যাপারকে। তবে এ-আশা এক চরম অশুভ, কেননা এটা খণ্ডিত করে তার শক্তি ও তার স্বার্থকে, এ-বিভাজনই সম্ভবত নারীর প্রধানতম প্রতিবন্ধকতা। পিতামাতারা আজো কন্যাদের তাদের বিকাশের জন্যে বড়ো না ক'রে বড়ো করে বিয়ের জন্যে; তারা এর মাঝে এতো বেশি সুবিধা দেখতে পায় যে তারা নিজেরাই এটা চাইতে থাকে; এর ফল হচ্ছে তারা সাধারণত হয় কম প্রশিক্ষিত, ভাইদের থেকে তাদের ভিত্তি হয় কম দৃঢ়, তারা তাদের পেশায় মন দেয় অনেক কম। এভাবে তারা নিজেদের নষ্ট করে, থেকে যায় নিম্ন স্তরে, হয় নিকৃষ্ট; এবং গ'ড়ে ওঠে দুষ্টচক্র : পেশাগত নিকৃষ্টতা তাদের ভেতরে বাড়িয়ে তোলে একটি স্বামী লাভের আকাঙ্খা।

প্রতিটি সুবিধারই খারাপ দিক হিশেবে সব সময় থাকে কিছু ভার; তবে ভারটা যদি হয় খুবই বেশি, তখন ওই সুবিধাটিকে আর দাসত্বশৃঙ্খলের থেকে অন্য কিছু মনে হয় না। অধিকাংশ শ্রমিকের জন্যে আজ শ্রম হচ্ছে একঘেয়ে ধন্যবাদহীন ক্লান্তিকর খাটুনি, আর নারীর বেলা সুনির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা, তার আচরণের স্বাধীনতা, বা

আর্থিক মুক্তি লাভের মধ্যে দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ ঘটে না; তাই অনেক নারী শ্রমিক ও কর্মচারীর পক্ষে কর্মের অধিকারকে মনে হ'তে পারে বাধ্যবাধকতা, যা থেকে বিয়ে তাদের পরিত্রাণ করবে। এ-কারণে যে নারী সচেতন হয়ে উঠেছে নিজের সম্পর্কে এবং যেহেতু সে একটি চাকুরি নিয়ে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে বিয়ে থেকে, তাই সে আর ভীরুতার সাথে গার্হস্থ্য অধীনতা মেনে নেয় না। সে যা আশা করে, তা হচ্ছে পারিবারিক জীবন ও চাকুরির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে তাকে নিঃশেষকর, কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে না। তার পরও, যতো দিন থাকবে সুবিধার প্রলোভন– আর্থনীতিক অসাম্য, যা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করে এবং এ-সুবিধাপ্রাপ্ত কোনো একটি পুরুষের কাছে নারীর নিজেকে বিক্রি করার স্বীকৃত অধিকার– স্বাধীনতার পথ বেছে নেয়ার জন্যে পুরুষের থেকে নারীর দরকার হয় অনেক বেশি নৈতিক উদ্যোগ। এটা যথেষ্টরূপে অনুধাবন করা হয় নি যে প্রলোভনও প্রতিবন্ধকতা, এবং অতিশয় ভয়ঙ্করগুলোর একটি। এখানে আছে একটা ধোঁকাবাজি, কেননা প্রকৃতপক্ষে বিয়ের লটারিতে হাজার হাজারের মধ্যে বিজয়ী হবে একজন। আধুনিক কাল নারীদের আমন্ত্রণ জানায়, এমনকি বাধ্য করে কাজ করতে; কিন্তু এটি তাদের চোখের সামনে মেলে রাখে আলস্য ও প্রমোদের স্বর্গের ঝিলিক : যারা বাঁধা থাকে মাটির সাথে, তাদের থেকে এটা জয়ীদের উন্নীত করে অনেক উর্ধ্বে।

আর্থিক জীবন, তাদের সামাজিক উপযোগিতা, বিয়ের মর্যাদা প্রভৃতিতে পুরুষ অধিকার ক'রে আছে যে-সুবিধাজনক স্থান, তাতে নারীরা উৎসাহ বোধ করে পুরুষদের খুশি করতে। নারীরা এখনো, অধিক অংশে, আছে অধীন অবস্থায়। তাই নারী নিজেকে দেখে না এবং তার পছন্দগুলোও করে না তার প্রকৃত স্বভাব অনুসারে, বরং করে যেভাবে পুরুষ তাকে সংজ্ঞায়িত করে। তাই আমরা প্রথম নারীকে বর্ণনা করবো পুরুষ নারীকে স্বপ্নে যেমন দেখতে চেয়েছে, কেননা তার বাস্তব পরিস্থিতির একটি আবশ্যক কারণ হচ্ছে পুরুষের-চোখে-তাকে-কেমন-দেখায়।

ভাগ ৩

কিংবদন্তি

পরিচ্ছেদ ১

স্বপ্ন, ভয়, প্রতিমা

ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে পুরুষেরা সব সময় নিজেদের হাতে ধ'রে রেখেছে সব বস্তুগত ক্ষমতা; পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদিকাল থেকে তারা নারীকে পরনির্ভর অবস্থায় রাখাকেই মনে করেছে সবচেয়ে ভালো; তাদের আইনগত বিধিবিধান তৈরি হয়েছে নারীর বিরুদ্ধে: এবং এভাবে তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অপররূপে। এ-ব্যবস্থা হয়েছে পুরুষের আর্থিক স্বার্থের উপযোগী; এবং এটা খাপ খেয়েছে তাদের অস্তিত্বস্বরূপতাত্ত্বিক ও নৈতিক আত্মাভিমানের সাথেও। একবার কর্তা যখন নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন অপর, যে কর্তাকে সীমাবদ্ধ ও অস্বীকার করতে চায়, সেও কর্তার কাছে হয়ে ওঠে আবশ্যক : সে আত্মসিদ্ধি লাভ করে সে-সত্যের মাধ্যমে যে যা নয়, যা তার থেকে ভিন্ন কিছু। এজন্যেই পুরুষের জীবন কখনো প্রাচুর্য ও প্রশান্তি নয়; তা অভাব ও সক্রিয়তা, তা সংগ্রাম। নিজের সামনে, পুরুষ মুখোমুখি হয় প্রকৃতির; তার কিছু ক্ষমতা আছে প্রকৃতির ওপর, সে চায় নিজের বাসনা অনুসারে প্রকৃতিকে রূপ দিতে। তবে প্রকৃতি তার অভাব পূরণ করতে পারে না। হয়তো প্রকৃতি দেখা দেয় এক বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক বিরোধিতারূপে, সে একটি বাধা এবং থেকে যায় আগন্তুকরূপে; বা সে অক্রিয়ভাবে পুরুষের ইচ্ছের কাছে ধরা দেয় এবং সম্মত হয় সামঞ্জস্য লাভ করতে, তাই পুরুষ তাকে শুধু গ্রাস ক'রে– অর্থাৎ, তাকে ধ্বংস ক'রে– অধিকার করে। উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষ থেকে যায় নিঃসঙ্গ; সে নিঃসঙ্গ যখন সে ছোঁয় একটি পাথর, নিঃসঙ্গ যখন সে খায় একটি ফল। অপর-এর উপস্থিতি ঘটতেই পারে না যদি না অপর উপস্থিত থাকে তার ভেতরে এবং তার জন্যে : তাই বলা যায় সত্যিকার বিকল্পতা– অপরত্ব– হচ্ছে আমার চেতনার থেকে পৃথক এক চেতনা এবং আমার চেতনার সাথে বস্তুত অভিন্ন এক চেতনা।

প্রত্যেক স্বতন্ত্র সচেতন সত্তা চায় একমাত্র নিজেকে সার্বভৌম কর্তা হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। প্রত্যেকেই নিজেকে চরিতার্থ করতে চায় অন্যকে দাসে পরিণত ক'রে। তবে দাস যদিও কাজ করে এবং ভয় পায়, তবু সে একরকমে নিজেকে বোধ করে প্রয়োজনীয়; এবং এক দ্বান্দ্বিক বিপ্রতীপ রীতিতে প্রভুই নিজেকে বোধ করে

অপ্রয়োজনীয়। পুরুষ নির্জনতার মধ্যে নিজেকে চরিতার্থ করতে পারে না, তাই পুরুষ তার সহচরদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে থাকে নিরন্তর বিপদের মধ্যে : তার জীবন এক কঠিন সাহসী উদ্যোগ, যাতে সাফল্য কখনোই নিশ্চিত নয়।

অন্যান্য পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিটি পুরুষকে ছিন্ন ক'রে আনে তার সীমাবদ্ধতা থেকে এবং তাকে সমর্থ করে তার সত্তার সত্যতাকে পূর্ণ ক'রে তুলতে, সীমাতিক্রমণতার মধ্য দিয়ে, কোনো লক্ষ্যের দিকে যাত্রার মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে। তবে এ-স্বাধীনতা আমার নিজের নয়, আমার স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েও এটি তার বিরোধিতা করে : হতভাগ্য মানব চৈতন্যের ট্র্যাজেডি এখানেই; প্রতিটি সচেতন সত্তা শুধু একলা নিজেকে সার্বভৌম কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করার অভিকাঙ্ক্ষী। অপরকে দাসে পরিণত ক'রে প্রত্যেকে পরিপূর্ণ করতে চায় নিজেকে। কিন্তু দাস, যদিও সে কাজ করে ও ভয় পায়, কোনো-কোনো রকমে নিজেকে বোধ করে অপরিহার্যরূপে; এবং একটা দ্বান্দ্বিক বিপর্যাসের ফলে প্রভুকেই মনে হয় অপ্রয়োজনীয় ব'লে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি খোলাখুলিভাবে অপরকে স্বীকার ক'রে নেয়, যদি প্রত্যেকে যুগপৎ নিজেকে ও অপরকে পারস্পরিক রীতিতে গণ্য করে কর্ম ও কর্তারূপে, তাহলে এ-বিরোধ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সুতরাং নির্জনতার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ করতে অসমর্থ হয়ে পুরুষ তার সহচরদের সাথে সম্পর্কের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিপদগ্রস্ত : তার জীবন এক দুঃসাধ্য কর্মোদ্যোগ, যাতে সাফল্যলাভ কখনোই নিশ্চিত নয়।

তবে সে বাধাবিপত্তি পছন্দ করে না; সে ভয় করে বিপদকে। পরস্পরবিরোধী রীতিতে সে অভিকাঙ্ক্ষী হয় জীবন ও বিশ্রাম, অস্তিত্ব ও নিতান্ত জীবনধারণ উভয়েরই; সে ভালোভাবেই জানে যে 'অস্থিরতার ঝঞ্ঝাট' হচ্ছে বিকাশের দাম, জানে যে অভীষ্ট বস্তু থেকে দূরত্ব হচ্ছে তার নিজের কাছে নৈকট্যের মূল্য; তবে সে স্বপ্ন দেখে উদ্বেগের মধ্যে শান্তির এবং এক অনচ্ছ পরিপূর্ণতার, যা ভূষিত থাকবে চৈতন্যে। এ-স্বপ্নের সম্যক প্রতিমূর্তি নারী; সে প্রকৃতির সাথে আকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগের মাধ্যম, পুরুষের কাছে অপরিচিত, এবং সহচর সত্তা, যে অত্যন্ত অভিন্ন। প্রকৃতির বিরূপ নৈঃশব্দ দিয়েও সে পুরুষের বিরোধিতা করে না, আবার পারস্পরিক সম্পর্কের কঠোর আবশ্যকতা দিয়েও বিরোধিতা করে না; এক অনন্য বিশেষাধিকারের মাধ্যমে সে এক চৈতন্যসম্পন্ন সত্তা এবং তবুও মনে হয় যেনো তাকে শারীরিকভাবে অধিকার করা সম্ভব।

আমরা দেখেছি যে প্রথম দিকে ছিলো না মুক্ত নারীরা, পুরুষেরা যাদের পরিণত করেছিলো দাসীতে, এমনকি লিঙ্গভিত্তিক কোনো জাতও ছিলো না। নারীকে শুধু দাসী হিশেবে গণ্য করা ভুল; এটা ঠিক যে দাসদের মধ্যে অনেকে ছিলো নারী, কিন্তু সব সময়ই ছিলো মুক্ত নারী– অর্থাৎ ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন নারী। তারা মেনে নিয়েছিলো পুরুষের সার্বভৌমত্ব এবং পুরুষ এমন কোনো বিদ্রোহের হুমকি বোধ করে নি, যা তাকে কর্মে পরিণত করতে পারতো। এভাবে নারীকে মনে হয় সে-অপ্রয়োজনীয়, পারস্পরিকতা ছাড়া যে আবার অপরিহার্য হয়ে ধ্রুব অপর হ'তে চায় না। এ-বিশ্বাস পুরুষের কাছে প্রিয়, এবং প্রতিটি সৃষ্টিপুরাণ এটা প্রকাশ করেছে, তার মধ্যে আছে জেনেসিস, যাকে খ্রিস্টধর্মের মধ্য দিয়ে জীবন্ত ক'রে রাখা হয়েছে

পাশ্চাত্য সভ্যতায়। হাওয়াকে পুরুষের সাথে একই সময়ে নির্মাণ করা হয় নি; তাকে কোনো ভিন্ন পদার্থেও তৈরি করা হয় নি, আদমকে যে-মাটিতে তৈরি করা হয়েছিলো তাতেও তৈরি করা হয় নি তাকে : তাকে নেয়া হয়েছিলো প্রথম পুরুষের পার্শ্বাঙ্গ থেকে। তার জন্মও স্বাধীন ছিলো না; বিধাতা তাকে তারই জন্যে স্বতস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি করে নি এবং প্রতিদানরূপে সরাসরি তার উপাসনা লাভের জন্যেও সৃষ্টি করে নি। সে তার নিয়তি নির্ধারণ করেছিলো পুরুষের জন্যে; আদমকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত করার জন্যে সে হাওয়াকে দান করেছিলো আদমকে, তার সহচরের মধ্যেই ছিলো তার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য; হাওয়া ছিলো অপ্রয়োজনীয়দের বিন্যাসের মধ্যে আদমের পরিপূরক। তাই সে দেখা দেয় সুবিধাপ্রাপ্ত শিকারের বেশে। সে ছিলো চেতনার স্তরে উন্নীত প্রকৃতি; সে সচেতন সত্তা ছিলো, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবেই ছিলো অনুগত। এবং এখানেই রয়েছে সে-বিস্ময়কর আশাটি, পুরুষ যা পোষণ করেছে নারীর মধ্যে : সে সত্তা হিশেবে নিজেকে চরিতার্থ করতে চায় অন্য একটি সত্তাকে দৈহিকভাবে দখল ক'রে, এবং একই সময়ে একটি মুক্ত মানুষের বাধ্যতার মাধ্যমে সে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে চায় তার স্বাধীনতাবোধ। কোনো পুরুষই কখনো নারী হ'তে সম্মত হবে না, তবে প্রতিটি পুরুষই চায় নারী থাকুক। 'নারী সৃষ্টির জন্যে বিধাতাকে ধন্যবাদ।' 'প্রকৃতি শুভ, কেননা সে পুরুষকে দিয়েছে নারী।' এসব উক্তির মধ্যে পুরুষ পুনরায় স্থূল উগ্রতার সাথে জ্ঞাপন করে যে এ-বিশ্বে তার উপস্থিতি এক অবধারিত ঘটনা ও অধিকার, নারীরটা এক দুর্ঘটনা মাত্র– তবে খুবই সুখকর দুর্ঘটনা। অপররূপে দেখা দিয়ে একই সময়ে নারী দেখা দেয় সত্তার এক প্রাচুর্যরূপে, যা বিপরীত সে-অস্তিত্বের, যার শূন্যতা পুরুষ বোধ করে নিজের মধ্যে; কর্তার চোখে কর্মরূপে গণ্য হয়ে ওই অপর গণ্য হয় *আঁ সুওঅ* রূপে; সুতরাং একটি সত্তারূপে। পুরুষ যে-অভাব বহন করে তার অন্তরে, তা সদর্থকরূপে প্রতিমূর্তিত হয় নারীতে, এবং তার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে পুরুষ আশা করে আত্মসিদ্ধি অর্জনের।

তবে নারী পুরুষের কাছে শুধু অপর-এর প্রতিমূর্তি উপস্থাপন করে নি, এবং ইতিহাসের যাত্রাপথ ভ'রে সে সমান গুরুত্ব ধারণ করে নি। অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন সে গ্রস্ত হয়েছে অন্যান্য প্রতিমা দিয়ে। যখন নগর বা রাষ্ট্র গিলে খায় নাগরিকদের, তখন পুরুষের পক্ষে ব্যক্তিগত নিয়তি নিয়ে বিভোর থাকা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের কাছে উৎসর্গিত হয়ে স্পার্টার নারীদের অবস্থা ছিলো গ্রিসের অন্যান্য নারীদের ওপরে। তবে এটা সত্য যে নারী কোনো পুরুষসুলভ স্বপ্নের ফলে রূপান্তরিত হয় নি। নেতাতন্ত্র, তা সে নেপলিয়ন, মুসোলিনি, বা হিটলারই হোক, বর্জন করে অন্য সব তন্ত্র। সামরিক স্বৈরতন্ত্রে, একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, নারী আর সুবিধাপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না। এটা বোঝা যায় যে নারীকে দেবীত্বে উন্নীত করা হয় এমন ধনী দেশে, যেখানে নাগরিকেরা জীবনের অর্থ সম্পর্কে বিশেষ নিশ্চিত নয় : যেমন হয় আমেরিকায়। অন্য দিকে, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শগুলো, যা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে সব মানুষের সাম্য, সেগুলো এখন ও ভবিষ্যতে কোনো মানবশ্রেণীকে বস্তু বা দেবতা ব'লে গণ্য করতে অস্বীকার করে : মার্ক্সের ঘোষিত খাঁটি গণতান্ত্রিক সমাজে অপর-এর কোনো স্থান নেই। ফরাসি বেশ্যাদের কাছে লেখা জর্মন সৈন্যদের চিঠি আমি দেখেছি, যাতে,

নাটশিবাদ সত্ত্বেও, স্থূলভাবে জ্ঞাপন করা হয়েছে কুমারীর শুদ্ধতার অন্তর্নিহিত ঐতিহ্য। ফ্রান্সে আরাগঁ, আর ইতালিতে ভিত্তোরিনির মতো সাম্যবাদী লেখকেরা নিজেদের লেখায় নারীদের স্থান দিয়েছেন প্রথম সারিতে, তারা রক্ষিতা বা মাতা যা-ই হোক। হয়তো কোনোদিন নির্বাপিত হবে নারী-কিংবদন্তি, যতো বেশি নারীরা নিজেদের দাবি করবে মানুষ হিশেবে। তবে আজো তা আছে প্রতিটি মানুষের মনে।

প্রতিটি কিংবদন্তি ইঙ্গিত করে একটি কর্তার প্রতি, যে তার আশা ও ভয়গুলোকে বিস্তীর্ণ ক'রে দেয় এক সীমাতিক্রমণতার আকাশের দিকে। নারীরা নিজেদের কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করে না এবং সেজন্যে তারা এমন কোনো পুরুষপুরাণ সৃষ্টি করে নি, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের পরিকল্পনা; তাদের নিজেদের কোনো ধর্ম বা কবিতা নেই : তারা আজো পুরুষের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে স্বপ্ন দেখে। পুরুষের তৈরি দেবতারাই তাদের দেবতা, যাদের তারা পুজো করে। পুরুষেরা নিজেদের পরমে উন্নীত করার জন্যে সৃষ্টি করেছে বীরপ্রতিমা : হারকিউলিস, প্রোমিথিউস, পার্সিফাল; এ-বীরদের নিয়তিতে নারীরা পালন করেছে শুধুই গৌণ ভূমিকা। সন্দেহ নেই যে আছে নারীর সাথে সম্পর্কে জড়িত পুরুষের নানা প্রথাগত প্রতিমা : পিতা, প্রলুব্ধকারী,স্বামী, ঈর্ষাকাতর প্রেমিক, সুবোধ পুত্র, নষ্ট পুত্র; তবে এদের সবাইকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পুরুষেরা, এবং এগুলোর নেই পুরাণের মহিমা, এগুলো শস্তা গতানুগতিকের বেশি কিছু নয়। আর সেখানে নারীকে একান্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় পুরুষের সাথে তার সম্পর্ক অনুসারে। পুরুষ ও নারী– এ-ধারণা দুটির অপ্রতিসাম্যকে প্রকাশ করা হয়েছে কামপুরাণগুলোর একপাক্ষিক গঠনের মধ্য দিয়ে। আমরা অনেক সময় নারী বোঝানোর জন্যে বলি 'লিঙ্গ'; নারী হচ্ছে মাংস, মাংসের সুখ ও বিপদ। নারীর জন্যে পুরুষও যে লিঙ্গ ও মাংস, তা কখনো ঘোষিত হয় নি, কেননা ঘোষণা করার কেউ নেই। বিশ্বের উপস্থাপন, বিশ্বের মতোই, পুরুষেরই কাজ; তারা একে বর্ণনা করে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে, যাকে তারা গুলিয়ে ফেলে ধ্রুবসত্যের সাথে।

কোনো একটি পুরাণ বর্ণনা করা সব সময়ই কঠিন; একে ধরা বা বেষ্টন করা যায় না; এটি কোনো স্থির রূপে উপস্থিত না হয়ে মানুষের চেতনায় ঘুরে ফিরে হানা দেয়। পুরাণ এতো বিচিত্র, এতো পরস্পরবিরোধী যে প্রথমে উপলব্ধি করা যায় না এর ঐক্য : ডেলাইলা ও জুডিথ, আস্পাসিয়া ও লুক্রেতিয়া, প্যান্ডোরা ও অ্যাথেনা– নারী একই সময়ে হাওয়া ও কুমারী মেরি। সে প্রতিমা, ভৃত্য, জীবনের উৎস, অন্ধকারের শক্তি; সে সত্যের আদি নৈঃশব্দ্য, সে ছল, গুজব, ও মিথ্যাচার; সে শুশ্রূষাকর উপস্থিতি ও মায়াবিনী; সে পুরুষের শিকার, তার পতন, সে সব কিছু পুরুষ যা নয় এবং পুরুষ যা কামনা করে, সে পুরুষের নেতি এবং তার লক্ষ্য ও সত্যতাপ্রতিপাদন।

'নারী হওয়া,' *স্টেজেজ অন দি রোড অফ লাইফ*-এ বলেছেন কিয়ের্কেগার্ড, 'এমন অদ্ভুত, এতো গোলমেলে, এতো জটিল যে কোনো বিধেয় একে প্রকাশ করার কাছাকাছিও আসে না এবং প্রয়োগ করতে হয় যে-বহুসংখ্যক বিধেয়, সেগুলো এতো পরস্পরবিরোধী যে শুধু নারীর পক্ষেই সেগুলো সহ্য করা সম্ভব।' নারীর নিজেকে নিজের কাছে যেমন মনে হয়, এটা তেমন সদর্থকভাবে গণ্য করা থেকে বেরিয়ে আসে নি, এসেছে নঞর্থকভাবে, তবে একথা সত্য যে নারীকে সব সময় সংজ্ঞায়িত করা হয়

অপররূপে। আগেই বলেছি অপর হচ্ছে অশুভ; তবে তা শুভর জন্যে আবশ্যক হয়ে হয়ে ওঠে শুভ। নারী কোনো স্থির ধারণা রূপায়িত করে না, এখানেই রয়েছে তার কারণটি; তার মাধ্যমে নিরন্তর যাতায়াত চলে আশা থেকে নিরাশায়, ঘৃণা থেকে প্রেমে, শুভ থেকে অশুভে, অশুভ থেকে শুভে। যে-বৈশিষ্ট্যেই নারীকে বিবেচনা করি না কেনো, পরস্পরবিপরীত এ-মূল্যই প্রথম ঘা দেয় আমাদের মনে।

পুরুষ নারীর মধ্যে অপরকে খোঁজে প্রকৃতিরূপে এবং তার সহচর সত্তারূপে। তবে আমরা জানি পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি জাগিয়ে তোলে কোন পরস্পরবিপরীত মূল্যসম্পন্ন অনুভূতিরাশি। পুরুষ নারীকে শোষণ করে, নারী পুরুষকে চুরমার করে, পুরুষ নারী থেকে জন্ম নেয় এবং নারীর মধ্যে মৃত্যুবরণ করে; নারী তার সত্তার উৎস এবং সে-এলাকা, যা সে নিজের ইচ্ছের অধীন করে; প্রকৃতি হচ্ছে অমার্জিত বস্তুর মিশ্রণ, যাতে বন্দী হয়ে আছে আত্মা, আর নারী হচ্ছে পরম বাস্তবতা; নারী আকস্মিকতা ও ভাব, সসীম ও সম্পূর্ণ; সে আত্মার বিপরীত, এবং আত্মা নিজে। এখন মিত্র, পরক্ষণেই শত্রু, সে প্রতিভাত হয় সে-অন্ধকার বিশৃঙ্খলারূপে যেখান থেকে জীবন উৎসারিত হয়, প্রতিভাত হয় এ-জীবনরূপে, এবং ওই সুদূররূপে, যার দিকে ঝুঁকে আছে জীবন। জননী, স্ত্রী, ও ভাবরূপে নারী প্রকাশ করে প্রকৃতির সার; এ-রূপগুলো কখনো মিলেমিশে যায় এবং কখনো সংঘর্ষে আসে, এবং এদের প্রত্যেকে ধারণ করে দ্বৈত মুখাবয়ব।

পুরুষের শেকড় প্রকৃতির ভেতর গভীরভাবে ছড়ানো; তার জনন ঘটেছে পশু ও উদ্ভিদের মতো; সে ভালোভাবেই জানে সে ততোদিনই অস্তিত্বশীল, যতোদিন সে বেঁচে আছে। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার আগমনের পর থেকে তার চোখে জীবন গ্রহণ করেছে দুটি বৈশিষ্ট্য : জীবন হচ্ছে চেতনা, ইচ্ছা, সীমাতিক্রমণতা, এটি চৈতন্য; এবং জীবন হচ্ছে বস্তু, অক্রিয়তা, সীমাবদ্ধতা, এটি মাংস। এস্কিলুস, আরিস্ততল, হিপোক্রেতিস ঘোষণা করেছিলেন অলিম্পাসে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি পুরুষ-নীতিই সত্যিকারভাবে সৃষ্টিশীল : এর থেকে এসেছে গঠন, সংখ্যা, গতি; দিমিতারের প্রযত্নে শস্য জন্মে ও সংখ্যায় বাড়ে, কিন্তু শস্যের উদ্ভব ও সত্যিকার অস্তিত্বের মূলে আছে জিউস; নারীর উর্বরতাকে গণ্য করা হয় শুধু এক অক্রিয় গুণ হিশেবে। নারী হচ্ছে মাটি, আর পুরুষ বীজ; নারী জল এবং পুরুষ অগ্নি। সৃষ্টিকে অনেক সময় কল্পনা করা হয়েছে অগ্নি ও জলের বিবাহরূপে; উষ্ণতা ও আর্দ্রতা জন্ম দেয় জীবন্ত বস্তুদের; সূর্য হচ্ছে সমুদ্রের স্বামী; সূর্য, অগ্নি হচ্ছে পুরুষ দেবতা; এবং সমুদ্র মাতৃপ্রতীকগুলোর মধ্যে প্রায়-সর্বজনীন প্রতীকগুলোর একটি। জল অক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে জ্বলন্ত বিকিরণের উর্বরায়ণ ক্রিয়া। একইভাবে তৃণভূমির মাটি চাষীর শ্রমে বিচূর্ণ হয়ে তার হলরেখায় অক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে বীজ। তবে এটা পালন করে এক দরকারি ভূমিকা : এটা বাঁচিয়ে রাখে জীবন্ত জীবাণুটিকে, একে রক্ষা করে এবং এর বিকাশের জন্যে সরবরাহ করে বস্তু। এবং এ-কারণেই মহামাতার সিংহাসনচ্যুতির পরও পুরুষ পুজো ক'রে এসেছে উর্বরতার দেবীর; পুরুষ তার শস্য, পশুপাল, ও তার সমস্ত সমৃদ্ধির জন্যে ঋণী সিবিলের কাছে। এমনকি সে তার জীবনের জন্যেও ঋণী তার কাছে। সে অগ্নির যতোটা স্তব করে, জলের স্তবও তারচেয়ে কম করে না। 'সমস্ত প্রশংসা

সমুদ্রের! সমস্ত প্রশংসা পবিত্র অগ্নিতে পরিবৃত তার তরঙ্গরাশির! সমস্ত প্রশংসা তরঙ্গরাশির! সমস্ত প্রশংসা অগ্নির! সমস্ত প্রশংসা এ-অদ্ভুত অভিযাত্রার,' *ফাউস্ট*-এর দ্বিতীয় ভাগে এভাবে চিৎকার করেছেন গ্যেটে। পুরুষ পুজো করে মাটির : যেমন ব্লেক মাটিকে বলেছেন 'মাতৃকা কর্দম'। ভারতবর্ষের এক ধর্মপ্রবর্তক তাঁর ভক্তদের মাটিতে কোদাল না চালানোর উপদেশ দিয়েছেন, কেননা 'চাষ করতে গিয়ে আমাদের সকলের জননীকে বিক্ষত করা বা কাটা বা ছিন্ন করা পাপ... আমি কি একটা ছোরা ঢুকিয়ে দেবো আমার জননীর বুকে?... আমি কি তাঁর মাংস টুকরো টুকরো ক'রে ঢুকবো তাঁর অস্থিতে?... আমার কী সাহস যে আমি কাটবো আমার মাতার কেশ?' মধ্যভারতে 'মাতা বসুমতীর বুক লাঙল দিয়ে ছিন্নভিন্ন করাকে' পাপ ব'লে গণ্য করেন বৈদ্য। উল্টোভাবে, ইদিপাস সম্পর্কে এস্কিলুস বলেছেন সে 'বীজ বপন করেছিলো সেই পবিত্র হলরেখায়, যেখানে সে গঠিত হয়েছিলো'। সফোক্লিজ বলেছেন 'পৈতৃক হলরেখা'র কথা এবং 'সেই কৃষক, দূরের জমির যে প্রভু, যেখানে সে যায় মাত্র একবার, বীজ বপনের সময়', তার কথা। একটি মিশরি গানে দয়িতা ঘোষণা করে : 'আমিই মৃত্তিকা!' ইসলামি ধর্মীয় রচনায় নারীকে বলা হয় 'জমি... দ্রাক্ষাক্ষেত্র'। আসিসির সেইন্ট ফ্রান্সিস একটি স্তোত্রে বলেছেন তার কথা, যে 'আমাদের ভগিনী, মাটি, আমাদের জননী, লালন করছে আমাদের, ফলাচ্ছে সব ধরনের ফল, ফোটাচ্ছে নানান রঙের ফুল ও জন্মাচ্ছে ঘাস'। মিশেলে, আকুইয়ে কর্দমস্নানের পর, বিস্ময়ে ব'লে উঠেছিলেন : 'সকলের প্রিয় জননী! আমরা এক। তোমার থেকে এসেছিলাম আমি, তোমার কাছে আমি ফিরে আসছি!...' এবং এমনই ঘটে সে-সব পর্বে, যখন দেখা দেয় প্রাণবাদী রোম্যান্টিসিজম, যার কাম্য আত্মার ওপর জীবনের জয়; তখন ভূমির, নারীর ঐন্দ্রজালিক ঊর্বরতাকে বেশি বিস্ময়কর মনে হয় পুরুষের আবিষ্কৃত কৌশলগুলোর থেকে : তখন পুরুষ মাতৃছায়ায় নিজেকে নতুনভাবে হারিয়ে ফেলার স্বপ্ন দেখে, যাতে সেখানে আবার সে পেতে পারে তার সত্তার সত্যিকার উৎস। মা হচ্ছে মহাবিশ্বের অতলে লুপ্ত সে-শেকড়, যে টানতে পারে এর রস; সে হচ্ছে সেই ফোয়ারা যেখান থেকে ঝরে জীবন্ত জল, সেই জল যা পুষ্টিকর দুগ্ধও, এক উষ্ণ ঝরনাধারা, সঞ্জীবনী গুণাবলিতে সমৃদ্ধ মৃত্তিকা ও জলে তৈরি কর্দম।

তবে অধিকাংশ সময় পুরুষ লিপ্ত থাকে তার দৈহিক অবস্থার বিরুদ্ধে দ্রোহে; সে নিজেকে দেখে এক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা হিশেবে : তার অভিশাপ হচ্ছে এক দীপ্ত ও সুশৃঙ্খল স্বর্গ থেকে তার পতন ঘটেছে মাতৃগর্ভের বিশৃঙ্খল আঁধারে। এই অগ্নি, এই শুদ্ধ ও সক্রিয় নিঃসারণ, যার মধ্যে পুরুষ নিজেকে দেখতে পছন্দ করে, নারীর দ্বারা তা বন্দী হয়ে আছে মৃত্তিকার কর্দমে। বিশুদ্ধ ভাবের মতো, এক-এর মতো, সর্বস্বের মতো, ধ্রুব আত্মার মতো অবধারিত হওয়ার কথা ছিলো তার; এবং সে দেখতে পায় সে বন্দী হয়ে আছে সীমিত ক্ষমতার একটি দেহের ভেতরে, এমন স্থানে ও কালে যা সে কখনো বেছে নেয় নি, যেখানে সে অনাহূত, অপ্রয়োজনীয়, দুর্বহ, উদ্ভট। তার পরিত্যক্তির মধ্যে, তার অপ্রতিপাদ্য অনাবশ্যকতার মধ্যে তাকেই ভোগ করা হয় সমগ্র শরীরের অনিশ্চয়তা। নারীও তাকে দণ্ডিত করে মৃত্যুতে। এই কম্পমান জেলি যা বিকশিত হয় জরায়ুতে (জরায়ু, সমাধির মতো সংগোপন ও রুদ্ধ) অতি স্পষ্টভাবে

তার স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলে পূতিমাংসের কোমল গাঢ় তরলতা, কিন্তু ঘৃণায় তার থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাওয়া যাবে না। যেখানেই জীবন প্রস্তুত হ'তে থাকে– বীজায়ন, গাঁজন– সেখানেই এটা জাগিয়ে তোলে ঘৃণাবোধ, কেননা ধ্বংসের ভেতর দিয়েই তৈরি হয় এটি; পিচ্ছিল ভ্রূণ শুরু করে সে-চক্র, যা সম্পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যুর পচনের ভেতর দিয়ে। যেহেতু সে অনাবশ্যকতা ও মৃত্যুতে বিভীষিকা বোধ করে, তাই পুরুষ জন্মলাভের মধ্যেও বোধ করে বিভীষিকা; সে সানন্দে অস্বীকার করতে চায় তার পাশবিক বন্ধনরাশি; তার মৃত্যুর ভেতর দিয়ে ঘাতক প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে।

আদিম জনগণের মধ্যে শিশুর জন্মকে ঘিরে থাকে চরম কঠোর ট্যাবু; বিশেষ ক'রে গর্ভফুলটি পোড়াতে হয় যত্নের সাথে বা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় সমুদ্রে, কেননা যার হাতেই এটা পড়বে নবজাতকের ভাগ্য থাকবে তারই হাতে। সে-ঝিল্লিময় বস্তুরাশি, যার সাহায্যে বেড়ে ওঠে ভ্রূণটি, তাই হচ্ছে এর পরনির্ভরশীলতার চিহ্ন; যখন এটি ধ্বংস করা হয়, তখন ব্যক্তিটি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনতে সমর্থ হয় জীবন্ত ম্যাগমা থেকে এবং হয়ে ওঠে স্বায়ত্তশাসিত সত্তা। জন্মের অশুচিতা চাপিয়ে দেয়া হয় মায়ের ওপর। লেভিটিকাস ও সমস্ত প্রাচীন বিধি শুচিতার সমস্ত কৃত্য চাপিয়ে দেয় তার ওপর, যে জন্ম দিয়েছে; এবং অনেক পল্লী অঞ্চলে গির্জানুষ্ঠানে (শিশুজন্মের পর আশীর্বাদ) এখনো চলছে এ-প্রথা। আমরা জানি যে গর্ভিণীর পেট দেখে স্বতস্ফূর্তভাবে বিব্রত বোধ করে শিশুরা, বালিকারা, ও পুরুষেরা, যা অধিকাংশ সময় প্রকাশ পায় কৌতুকের হাসিতে। সমাজ এর প্রতি যতোই ভক্তি দেখাক না কেনো গর্ভধারণের ব্যাপারটি আজো জাগিয়ে তোলে স্বতস্ফূর্ত ঘেন্নার বোধ। আর ছোটো বালক যদিও শৈশবে ইন্দ্রিয়সুখে জড়িত থাকে মায়ের মাংসের সাথে, কিন্তু যখন সে বড়ো হয়, সামাজিকীকরণ হয় তার, এবং বোধ করে অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য, তখন ওই একই মাংস সন্ত্রস্ত করে তাকে; সে এটা অস্বীকার করে এবং মায়ের মধ্যে সে দেখে শুধু এক নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে। সে যে মাকে শুদ্ধ ও সতী ব'লে বিশ্বাস করার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকে, তা যতোটা যৌন ঈর্ষার কারণে তার চেয়ে অনেক বেশি এ-কারণে যে সে মাকে একটি শরীর হিশেবে দেখতে রাজি নয়। যৌবনে সদ্য পা দেয়া কিশোর বিব্রত বোধ করে, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে যদি সঙ্গীদের সাথে থাকার সময় সে হঠাৎ মুখোমুখি হয় মায়ের, বোনদের, বা কোনো আত্মীয়ার : এর কারণ তাদের উপস্থিতি তাকে মনে করিয়ে দেয় সে-সীমাবদ্ধতার কথা, যার থেকে সে পালিয়ে যেতে চায়, এটা মেলে ধরে সে–শেকড়, যার থেকে সে ছিন্ন করতে চায় নিজেকে। মায়ের চুম্বনে আদরে বালকের বিরক্তিরও একই তাৎপর্য; সে অস্বীকার করে পরিবার, মা, মায়ের বুক। তার ভালো লাগতো পৃথিবীতে হঠাৎ বিকশিত হ'তে পারলে, অ্যাথেনার মতো– পরিপূর্ণগঠিত, সশস্ত্র, অপরাজেয়। মায়ের পেটে বিকশিত হওয়া ও তারপর শিশুরূপে জন্ম নেয়া হচ্ছে সে-অভিশাপ, যা ঝুলে আছে তার নিয়তির ওপর, সে-অশুচিতা, যা দূষিত করে তার সত্তাকে। এবং এটা তার মৃত্যুরও ঘোষণা। বীজায়ন তন্ত্রের সাথে সব সময়ই জড়িত হয়ে আছে মৃতের তন্ত্র। মাতা বসুমতী গ্রাস করে তার সন্তানদের অস্থিপুঞ্জ। যারা বয়ন করে মানবজাতির নিয়তি– পারকেয়ে, মোইরাই– তারা নারী; আবার তারাই ছিঁড়ে ফেলে সুতো। অধিকাংশ জনপ্রিয় উপস্থাপনে মৃত্যু এক নারী,

এবং মৃতের জন্যে বিলাপ নারীর কাজ, কেননা মৃত্যু তাদেরই কর্ম।

তাই নারী-মাতার মুখমণ্ডল ছায়াচ্ছন্ন : সে হচ্ছে সে-বিশৃঙ্খলা, যেখান থেকে সবাই এসেছে এবং একদিন যেখানে সবাইকে ফিরতে হবে; সে হচ্ছে শূন্যতা। রাত্রিতে বিশ্বের বহু রকমের বৈশিষ্ট্য বিভ্রান্তিজাগানো অবস্থায় থাকে, যা উদ্ভাসিত হয় দিনের আলোতে। সমুদ্রের গভীর তলদেশে আছে রাত্রি : নারী *মারে তেনেব্রারুম*, অন্ধকার সাগর, যাকে ভয় করেছে পুরোনো দিনের নাবিকেরা; পৃথিবীর অন্ত্রে আছে রাত্রি। পুরুষ এ-রাত্রি, যা উর্বরতার বিপরীত, যা তাকে গিলে খেতে চায়, তার ভয়ে ভীত। তার অভিকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আকাশ, আলোক, রৌদ্রদীপ্ত শিখর, নীলাকাশের বিশুদ্ধ ও স্ফটিক কামশীতলতা; এবং তার পায়ের নিচে আছে এক আর্দ্র, উষ্ণ, ও আঁধারাচ্ছন্ন উপসাগর, যা প্রস্তুত হয়ে আছে তাকে তলদেশে টানার জন্যে; অজস্র উপকথায় আমরা দেখতে পাই নায়ক লুপ্ত হয়ে গেছে মাতৃধর্মী ছায়ায়– গুহায়, রসাতলে, নরকে।

আবার এখানে সে-পরস্পরবিপরীত মূল্যের খেলা : যদি বীজায়ন সব সময় জড়িত মৃত্যুর সাথে, তাহলে মৃত্যুও জড়িত উর্বরতার সাথে। ঘৃণ্য মৃত্যু দেখা দেয় নবজন্ম রূপে, এবং হয়ে ওঠে আশীর্বাদপ্রাপ্ত। মৃত নায়ক, ওসিরিসের মতো, পুনর্জীবিত হয় প্রত্যেক বসন্তে, এবং তাকে পুনর্সৃষ্টি করা হয় একটি নবজন্মের মাধ্যমে। মানুষের উচ্চতম স্বপ্ন, *মেটামোরফোসেস অফ দি লিবিডোতে* ইয়ুং বলেছেন, 'হচ্ছে মৃত্যুর অন্ধকার জলরাশি হয়ে উঠুক জীবনের জলরাশি, মৃত্যু ও তার শীতল আলিঙ্গন হোক মায়ের বক্ষ, যা সমুদ্রের মতো সূর্যকে গ্রাস ক'রেও আবার তাকে জন্ম দেয় নিজের গভীরে'। অসংখ্য পুরাণে পাওয়া যায় একটি সাধারণ বিষয়, সেটি হচ্ছে সমুদ্রের বুকে সূর্যদেবতার সমাহিতি এবং তার প্রোজ্জ্বল পুনরাবির্ভাব। এবং পুরুষ একই সঙ্গে বেঁচে থাকতে চায়, তবে কামনা করে বিশ্রাম ও নিদ্রা ও শূন্যতা। সে অমর হবে এটা সে চায় না, এবং তাই সে মৃত্যুকে ভালোবাসতে শেখে।

সব সভ্যতায় এবং আজো আমাদের কালে পুরুষের বুকে নারী জাগিয়ে তোলে বিভীষিকা; এটা হচ্ছে তার নিজের দৈহিক অনিশ্চিত সম্ভাবনার বিভীষিকা, যা সে প্রক্ষেপ করে নারীর ওপর। ছোটো বালিকা, যে এখনো বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে নি, কোনো ভীতি প্রদর্শন করে না, তার ওপর কোনো ট্যাবু নেই এবং তার কোনো পবিত্র বৈশিষ্ট্য নেই। অনেক আদিম সমাজে তার লিঙ্গকে মনে করা হয় নিষ্পাপ : শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের অনুমতি দেয়া হয় কামক্রীড়ার। কিন্তু যেদিন নারী ঋতুমতী হয়, সে হয়ে ওঠে অশুচি; এবং ঋতুমতী নারীকে ঘিরে থাকে কঠোর সব ট্যাবু। লেভিটিকাস দিয়েছে এর বিস্তৃত বিধিবিধান, এবং অনেক আদিম সমাজে বিচ্ছিন্নতা ও শুচিতা বিষয়ে আছে একই রকম বিধিবিধান। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ঋতুস্রাবের সঙ্গে জড়িত শক্তিগুলোতে বিদ্যমান ছিলো পরস্পরবিপরীত মূল্য : ঋতুস্রাব বিপর্যস্ত করতে পারতো সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং নষ্ট করতো শস্য; তবে এটা প্রণয়োপচার ও ঔষধ তৈরিতেও ব্যবহৃত হতো। এমনকি আজো কোনো কোনো ভারতি গোষ্ঠিতে নদীর দানবদের সাথে সংগ্রামের জন্যে নৌকোর সম্মুখ গলুইয়ে রাখা হয় ঋতুস্রাবে ভেজানো একদলা তন্তু। তবে পিতৃতান্ত্রিক কাল থেকে নারীর ঋতুস্রাবকে জড়ানো হয়েছে শুধু অশুভ শক্তির সাথে। প্লাইনি লিখেছেন যে ঋতুমতী নারী ফসল নষ্ট করে, বাগান ধ্বংস করে,

মৌমাছি মেরে ফেলে ইত্যাদি; এবং সে যদি মদ স্পর্শ করে, সেটা ভিনেগারে পরিণত হয়; দুধ প'চে যায় ইত্যাদি। এক প্রাচীন ইংরেজ কবি এ-ধারণাকেই ছন্দে বেঁধেছিলেন :

> হায়! ঋতুমতী নারী, এক শয়তান তুমি
> যার থেকে আড়ালে রাখতে হবে সমগ্র প্রকৃতিভূমি!

এসব বিশ্বাস আজো টিকে আছে বেশ শক্তিশালীরূপেই। ১৮৭৮-এ *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জর্নাল*-এ ঘোষণা করা হয়েছিলো 'এটা নিঃসন্দেহ যে ঋতুমতী নারীর ছোঁয়ায় মাংস পচে', এবং নানা ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিলো ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে। এ-শতকের শুরুতে একটি বিধানে উত্তর ফ্রান্সের শোধনাগারগুলোতে 'অভিশাপ'গ্রস্ত নারীদের ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো, কেননা তাতে চিনি কালো হয়ে যায়। এসব ধারণা আজো গ্রামাঞ্চলে টিকে আছে, যেখানে প্রতিটি পাচক জানে যদি ধারে-কাছে কোনো ঋতুমতী নারী থাকে, তাহলে মেইয়ানেইজ ঠিক হবে না; অনেক গ্রাম্যলোক মনে করে সাইডার গাজিয়ে উঠবে না, অনেকে মনে করে শুয়োরমাংস নোনা করা যাবে না এবং এমন পরিস্থিতিতে তা নষ্ট হয়ে যাবে। হয়তো কিছু অস্পষ্ট বিবরণ আছে এসব বিশ্বাসের পেছনে; তবে এগুলোর গুরুত্ব ও সর্বজনীনতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এগুলো উদ্ভূত হয়েছে কোনো কুসংস্কার বা অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস থেকে। রক্ত পবিত্র, তাই এখানে সাধারণভাবে রক্তের প্রতি প্রতিক্রিয়ার থেকে বেশি কিছু আছে। তবে ঋতুস্রাব বিশেষ অদ্ভুত জিনিশ, এটা নির্দেশ করে নারীর সারসত্তা। তাই এটা ক্ষতি করতে পারে নারীরই যদি অন্য কেউ এর অপব্যবহার করে। সি লেভি-স্ট্রাউসের মতে শাগোদের মধ্যে মেয়েদের সাবধান ক'রে দেয়া হয় যাতে কেউ ঋতুস্রাবের কোনো চিহ্নও দেখতে না পায়; বিপদ এড়ানোর জন্যে পোশাক ইত্যাদি অবশ্যই মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। লেভিটিকাস ঋতুস্রাবকে অভিন্ন ক'রে দেখেছে গনোরিয়ার সাথে, এবং ভিগনি এ-অসুস্থতার সাথে জড়িত দেখেছেন অশুচিতা, যখন তিনি লিখেছেন : 'নারী, অসুস্থ শিশু এবং বারো গুণ অশুচি।'

নারীর রক্তক্ষরণের চক্রটি সময়ের দিক দিয়ে বিস্ময়করভাবে সঙ্গতিপূর্ণ চাঁদের চক্রের সাথে; এবং এও মনে করা হয় যে চাঁদেরও আছে ভয়ঙ্কর সব চপলতা। নারী সে-ভীতিপ্রদ কৌশলের অংশ, যা গ্রহগুলোকে ও সূর্যকে চালায় তাদের পরিক্রমার পথে, নারী শিকার সে-মহাজাগতিক শক্তিরাশির, যা নিয়ন্ত্রণ করে নক্ষত্ররাশির নিয়তি ও জোয়ারভাটা, এবং পুরুষ ভোগে যার পীড়াদায়ক বিকিরণে। তবে মনে করা হয় যে ঋতুস্রাব বিশেষভাবে ক্রিয়া করে সে-জৈব বস্তুদের ওপর, যা আছে পদার্থ ও জীবনের মাঝামাঝি পথে : মাখন টকায়, মাংস নষ্ট করে, গাজায়, পচায়; এবং এটা রক্ত ব'লে নয়, বরং এজন্যে যে এটা উৎসারিত হয় যৌনপ্রত্যঙ্গ থেকে। এর যথাযথ কাজ বুঝতে না পেরেও মানুষ বুঝেছে এটা জড়িত জীবন সৃষ্টির সাথে : ডিম্বাশয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো প্রাচীন মানুষ, তারা ঋতুস্রাবে এমনকি দেখতে পেয়েছে শুক্রাণুর পরিপূরক। তবে এ-রক্ত নারীকে অশুচি করে না; এটা নারীর অশুচিতার চিহ্ন। এটা জড়িত প্রজননের সাথে, যেখানে ভ্রূণ বিকশিত হয়, সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এ-রক্ত। নারীর উর্বরতা বহু পুরুষের মনে জাগায় যে-ভয়, তা প্রকাশ পায় ঋতুস্রাবের মাধ্যমে।

অতিশয় কঠোর ট্যাবুগুলোর একটি নিষিদ্ধ করে ঋতুমতী অশুচি নারীর সাথে সব ধরনের যৌনসম্পর্ক। অনেক সমাজে এ-নিষেধভঙ্গকারীদেরই বিশেষ সময়ের জন্যে গণ্য করা হয়েছে অশুচি ব'লে, বা তাদের বাধ্য করা হয়েছে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে; মনে করা হতো যে পুরুষের শক্তি ও প্রাণবন্ততা ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা এ-সময়ে নারী-নীতি থাকে তার চূড়ান্ত ক্ষমতায়। আরো অস্পষ্টভাবে, তার অধিকারে যে-নারী তার মধ্যে মায়ের ভীতিকর সারসত্তার মুখোমুখি হ'তে ঘেন্না বোধ করে পুরুষ; সে নারীত্বের এ-দু-বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লিষ্ট করার জন্যে বদ্ধপরিকর। তাই অজাচার নিষিদ্ধ ক'রে বিধিবদ্ধ হয়েছে সর্বজনীন আইন, যার প্রকাশ ঘটেছে গোত্রের বহির্ভূত বিয়ের বিধানে বা আরো আধুনিক নানা রূপে; এজন্যেই পুরুষ নারীর থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায় যখন নারী বিশেষভাবে থাকে তার প্রজননগত ভূমিকায় : তার ঋতুস্রাবের সময়, তার গর্ভের সময়, তার স্তন্যদানের সময়। ইদিপাস গূঢ়৻ষা, যাকে নতুনভাবে বর্ণনা করা দরকার, এ-প্রবণতাকে অস্বীকার করে না, বরং এটাই জ্ঞাপন করে। নারী যতোখানি প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্বের অস্পষ্ট উৎসের ও অবোধ্য জৈববিকাশের, পুরুষ নারীর বিরুদ্ধে ততোখানি থাকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে।

মহাবিশ্ব ও দেবতাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও আজো নারী এ-বেশেই তার গোষ্ঠিকে সামর্থ্য দেয় তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার। নারী আজো বেদুইন ও ইরোকুইদের মধ্যে নিশ্চয়তা দেয় জমির উর্বরতার; প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে নারী শুনতে পেতো পাতালের স্বর; সে বুঝতে পারতো বায়ু ও বৃক্ষের ভাষা; সে ছিলো পাইথিয়া, সিবিলে, দৈবজ্ঞা; মৃতরা ও দেবতারা কথা বলতো তার মুখ দিয়ে। সে আজো ধারণ করে ভবিষ্যৎবক্তার ক্ষমতা : সে মাধ্যম, হস্তরেখা ও তাস পাঠক, অলোকদ্রষ্টা, অনুপ্রাণিত; সে স্বর শুনতে পায়, দেখতে পায় প্রেতচ্ছায়া। যখন পুরুষ আবার দরকার বোধ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের ভেতরে মগ্ন হওয়ার– যেমন অ্যান্টিউস তার শক্তি নবায়নের জন্যে স্পর্শ করেছিলো মাটি– তারা আবেদন জানায় নারীর কাছে। গ্রিস ও রোমের যুক্তিপরায়ণ সমগ্র সভ্যতা ভ'রে অস্তিত্বশীল ছিলো গূহ্যধর্ম তন্ত্রগুলো। ওগুলো ছিলো সরকারিভাবে স্বীকৃত ধর্মগুলোর থেকে প্রান্তিক অবস্থানে; ওগুলো অবশেষে, যেমন এলুসিসে, রূপ নেয় রহস্যের। পুরুষদের দ্বারা পুনরায় বিজিত এক বিশ্বে দেখা দেয় এক পুরুষ দেবতা, দিউনিসুস, যে দখল ক'রে নেয় ইশতারের, আস্তারতের বন্য ও ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা; তবু তার মূর্তি ঘিরে উন্মত্ত আনন্দোৎসবে যারা মেতে উঠতো, তারা ছিলো নারী : মিনাদ, থাইয়াদ, বাক্কুসানুসারীরা মানুষদের আমন্ত্রণ জানাতো পবিত্র পানোন্মত্ততায়, পবিত্র উন্মত্ততায়। ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তি পালন করতো একই ভূমিকা : এটা ছিলো উর্বরতার শক্তিগুলোকে একযোগে বন্ধনমুক্ত ও প্রবাহিত ক'রে দেয়া। লৌকিক উৎসবগুলোতে আজো দেখা যায় কামের তীব্র বহিঃপ্রকাশ; এতে নারী শুধু প্রমোদের বস্তু হিশেবে উপস্থিত থাকে না, বরং থাকে *হাইব্রিস*, বন্যতার অবস্থা অর্জনের উপায়রূপে, যাতে ব্যক্তি অতিক্রম ক'রে যায় তার নিজের সীমা। 'সেই লুপ্ত, বিয়োগান্তক, "অন্ধকারী বিস্ময়"-এর কী ধারণ করে একটি মানুষ তার গভীর ভেতরে, তা শয্যা ছাড়া আবার কোথাও পাওয়া যাবে না,' লিখেছেন জি বাতাইল।

কামে পুরুষ আলিঙ্গন করে প্রিয়াকে এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় মাংসের

অপার রহস্যে। তবে আমরা দেখেছি যে, উল্টোভাবে, তার স্বাভাবিক কাম মাতাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় স্ত্রী থেকে। সে জীবনের রহস্যময় রসায়নের প্রতি বোধ করে ঘৃণা, যদিও তার নিজের জীবনই লালিত ও প্রফুল্ল হয় মৃত্তিকার সুস্বাদু ফলে; সে এগুলো অধিকার ক'রে নিতে চায় নিজের জন্যে; সে প্রবলভাবে কামনা করে সদ্য ঢেউ থেকে উঠে আসা ভেনাসকে। নারীকে স্ত্রী হিশেবে প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিলো পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, যেহেতু পরম সৃষ্টিকর্তাই পুরুষ। মানবজাতির মাতা হওয়ার আগে হাওয়া ছিলো আদমের সঙ্গিনী; তাকে দান করা হয়েছিলো পুরুষের কাছে, যাতে পুরুষ তাকে অধিকার ও উর্বর করতে পারে, যেমন সে অধিকার ও উর্বর করে ভূমি; এবং তার মাধ্যমে পুরুষ সমগ্র প্রকৃতিকে ক'রে তোলে নিজের রাজ্য। পুরুষ যৌন ক্রিয়ায় শুধু ব্যক্তিগত ও ক্ষিপ্র আনন্দ খোঁজে না। সে চায় জয় করতে, দখল করতে, অধিকার করতে; একটি নারী পাওয়া হচ্ছে তাকে জয় করা; লাঙলের ফাল যেমন বিদ্ধ করে হলরেখাকে তেমনি সে বিদ্ধ করে নারীকে; নারীকে সে নিজের ক'রে নেয় যেমন সে নিজের ক'রে নেয় নিজের কর্ষিত জমি; সে চাষ করে, রোপণ করে, বপন করে : এসব চিত্রকল্প সাহিত্যের মতোই প্রাচীন; প্রাচীন কাল থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত উদ্ধৃত করা যায় সহস্র উদাহরণ : 'নারী ক্ষেত্রের মতো, এবং পুরুষ বীজের মতো,' বলেছে মনুর বিধান। আঁদ্রে মাসোঁর একটি রেখাচিত্রে আছে কোদাল হাতে একটি পুরুষ, সে কোদাল দিয়ে কোপাচ্ছে একটি নারীর যোনিদ্বারের উদ্যান। নারী তার স্বামীর শিকার, তার বিষয়সম্পত্তি।

ভয় ও কামনার মাঝে, নিয়ন্ত্রণঅসম্ভব শক্তিরাশিকে অধিকারে রাখার ভয় ও সেগুলোকে জয় করার বাসনার মধ্যে, পুরুষের দ্বিধা চমকপ্রদভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কুমারীপুরাণে। পুরুষ একে এই ভয় পাচ্ছে, আবার এই কামনা করছে বা এমনকি দাবি করছে, কুমারী তাই নারীরহস্যের নিখুঁততম পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রতীক; তাই সে এর সবচেয়ে পীড়াদায়ক এবং একই সময়ে সবচেয়ে সুখদ রূপ। তাকে ঘিরে ফেলেছে যে-শক্তিরাশি, পুরুষ সেগুলো দিয়ে অভিভূত হচ্ছে ব'লে বোধ করছে, না কি সে সগর্বে বিশ্বাস করছে সে এসব নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ, সে-অনুসারে সে তার স্ত্রীকে কুমারী রূপে পেতে অস্বীকার করে অথবা দাবি করে। আদিমতম সমাজে, যেখানে নারীর শক্তি অত্যন্ত বেশি, সেখানে ভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষকে; তাই বিয়ের রাতের আগেই নারীটির কুমারীত্বমোচন করাই সঙ্গত। মার্কো পোলো তিব্বতিদের সম্বন্ধে বলেছেন 'তাদের কেউই কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে রাজি নয়'। এ-অস্বীকৃতিকে অনেক সময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যুক্তিসঙ্গত রীতিতে : কোনো পুরুষ এমন স্ত্রী চায় না যে এরই মাঝে পুরুষের কামনা জাগায় নি। আরব ভূগোলবিদ আল বাকরি স্লাভদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন 'যদি কোনো পুরুষ বিয়ের পর দেখতে পায় তার স্ত্রী কুমারী, তাহলে সে স্ত্রীকে বলে : ''যদি তোমার কোনো রূপ থাকতো, তাহলে পুরুষেরা তোমার সাথে শৃঙ্গার করতো এবং কোনো একজন হরণ করতো তোমার কুমারীত্ব।'' তারপর সে স্ত্রীকে বের ক'রে দেয় ঘর থেকে এবং তাকে ত্যাগ করে।' এও দাবি করা হয়েছে যে কিছু আদিম জাতির পুরুষ শুধু সে-নারীকেই বিয়ে করতে চায় যে ইতিমধ্যেই মা হয়েছে, এভাবেই সে প্রমাণ দেয় নিজের উর্বরতার।

কিন্তু সতীত্বমোচনের পেছনের ব্যাপকভাবে প্রচলিত এসব প্রথার সত্যিকার প্রেষণাগুলো অতীন্দ্রিয়। কিছু জনগোষ্ঠি কল্পনা করে যে যোনির ভেতরে আছে সাপ, যেটি সতীচ্ছদ ছিন্ন করার সাথে সাথে দংশন করবে স্বামীকে; অনেক জাতি মনে করে কুমারীর রক্তে আছে ভীতিকর শক্তি, যা ঋতুস্রাবের সাথে সম্পর্কিত, তাই একইভাবে তা বিনাশ ঘটাতে পারে পুরুষের বলের। এসব চিত্রকল্পে প্রকাশিত হয় এ-ধারণাটি যে নারী-নীতি তখনই বেশি বলশালী, বেশি হুমকিদায়ক, যখন সেটি থাকে অক্ষত।

অনেক ক্ষেত্রে কুমারীত্বমোচনের প্রশ্নই ওঠে না; উদাহরণস্বরূপ, ম্যালিনোস্কির বর্ণিত ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপবাসীদের মধ্যে, মেয়েরা কখনোই কুমারী নয়, কেননা শৈশব থেকেই সেখানে কামক্রীড়া অনুমোদিত। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে মা, বড়ো বোন, বা কোনো মাতৃকা যথারীতি মোচন করে বালিকার সতীত্ব এবং তার শৈশব ভ'রে প্রসারিত ক'রে চলে যোনিমুখ। আবার, বয়ঃসন্ধিকালে ছিন্ন করা যেতে পারে সতীচ্ছদ, সেখানে নারীটি ব্যবহার করতে পারে কাঠি, হাড়, বা পাথর, এবং একে মনে করতে পারে শল্যচিকিৎসা। অন্য কিছু গোত্রে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েকে বাধ্য করা হয় এক বর্বর দীক্ষায় : পুরুষেরা তাকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যায় গ্রামের বাইরে এবং ধর্ষণ ক'রে বা কোনো বস্তু দিয়ে তার চ্ছদ ছিন্ন করে। একটি সাধারণ প্রথা হচ্ছে অচেনা পথিকদের কাছে কুমারী দান– হয়তো তারা মনে করে যে ওই অচেনা পথিকেরা মানার বিরূপতার বাইরে, ওই মানা প্রযোজ্য শুধু তাদের গোত্রের পুরুষদের ক্ষেত্রে, বা হয়তো অচেনা পথিকদের বিপদের প্রতি তারা উদাসীন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোহিত, বা কবিরাজ, বা কাশিক, বা গোত্রপতি সাধারণত বিয়ের আগের রাতে মোচন করে বধুর সতীত্ব। মালাবার উপকূলে এ-দায়িত্ব পালন করে ব্রাহ্মণেরা, যা তারা কোনো সুখভোগ ছাড়াই সম্পন্ন করে এবং এর জন্যে বেশ ভালো দক্ষিণা দাবি করে। এটা সুবিদিত যে সমস্ত পবিত্র বস্তুই সাধারণের জন্যে ভয়ঙ্কর, তবে পূতপবিত্র ব্যক্তিরা ঝুঁকি ছাড়াই এসব করতে পারে; তাই বোঝা যায় পুরোহিতেরা আর গোত্রপতিরা জয় করতে পারে সে-অমঙ্গলজনক শক্তিগুলো, যাদের ক্ষোভ থেকে রক্ষা করতে হবে স্বামীকে। রোমে এমন প্রথার লেশ হিশেবে টিকে ছিলো শুধু একটি প্রতীকী অনুষ্ঠান : একটি পাথুরে প্রিয়াপাসের লিঙ্গের ওপর বসানো হতো বধুকে, যেটি পূরণ করতো দুটি উদ্দেশ্য যে এটা বাড়াবে তার উর্বরতা এবং শোষণ ক'রে নেবে তার ভেতরের অতি শক্তিশালী– এবং এ-কারণে অশুভ– তরল পদার্থ। স্বামী নিজেকে আরেক উপায়ে রক্ষা করতে পারে : সে নিজে সতীত্বমোচন করতে পারে কুমারীটির, তবে এটা ঘটতে হবে উৎসবের মধ্যে, যা সংকটের মুহূর্তে তাকে ক'রে তোলে অবেধ্য; উদাহরণস্বরূপ, সমগ্র পল্লীবাসীর উপস্থিতিতে সে এ-কাজটি করতে পারে কোনো কাঠি বা হাড় দিয়ে। সামোয়ায় সে ব্যবহার করে শাদা কাপড়ে মুড়ে তার আঙুল, যে-কাপড় ছিন্নভিন্ন ক'রে বিতরণ করা হয় উপস্থিতদের মধ্যে। বা স্বামীকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে স্বাভাবিক রীতিতে স্ত্রীর সতীত্বমোচনের, তবে যাতে প্রজননশীল জীবাণু সতীচ্ছদের রক্তে দূষিত না হয়, তাই সে তিন দিন স্ত্রীর ভেতরে বীর্যপাত করতে পারবে না।

এক ধরনের মূল্যবদলের ফলে কম আদিম সমাজে কুমারীর রক্ত হয়ে ওঠে শুভ

প্রতীক। ফ্রান্সে এখনো আছে অনেক গ্রাম, যেখানে বিয়ের পর দিন ভোরে, আত্মীয়-স্বজনদের সামনে প্রদর্শন করা হয় রক্তরঞ্জিত বিছানার চাদর। যা ঘটেছে, তা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ হয়ে উঠেছে তার নারীর প্রভু; এবং যে-শক্তিরাশি বন্যপশুতে বা অবিজিত বস্তুতে থাকলে হয়ে ওঠে ভীতিকর, সে-একই শক্তিরাশি সেই মালিকের কাছে হয়ে ওঠে মূল্যবান গুণাবলি, যে তাদের পোষ মানাতে পারে। বন্য ঘোড়ার অগ্নি থেকে, বজ্রপাত ও জলপ্রপাতের হিংস্রতা থেকে পুরুষ বের করেছে সম্পদশালী হওয়ার উপায়। এবং তাই সে নারীকে তার সমস্ত সম্পদসহ অক্ষতরূপে আনতে চায় নিজের মালিকানায়। সন্দেহ নেই মেয়েটির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে-সতীত্ব, সেটা দাবি করতে বেশ ভূমিকা পালন করে যুক্তিপরায়ণ প্রেষণা : স্ত্রীর সতীত্বের মতোই বাগদত্তার নিষ্পাপতা প্রয়োজনীয়, যাতে পিতা পরে এমন ঝুঁকিতে না পড়ে যে তার সম্পত্তি দিয়ে যেতে হয় অন্য কারো সন্তানকে। তবে যখন পুরুষ নিজের স্ত্রীকে গণ্য করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে, তখন কুমারীত্ব দাবি করা হয় আরো জরুরি কারণে। প্রথমে, মালিকানার ধারণাটিকে সব সময়ই সদর্থকরূপে বোধ করা অসম্ভব; সত্য হচ্ছে, কখনোই কারো থাকে না কোনো জিনিশ বা ব্যক্তি; মানুষ মালিকানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে নঞর্থকভাবে। কোনো কিছু আমার, এটা সবচেয়ে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাপন করার উপায় হচ্ছে অন্যদের সেটি ব্যবহার করতে না দেয়া। এবং যা কখনোই অন্য পুরুষের অধিকারে ছিলো না, তার থেকে বেশি কাম্য বস্তু পুরুষের কাছে আর কিছু হ'তে পারে না : তখন ওই বিজয়কে মনে হয় এক অনন্য ও ধ্রুব ঘটনা। অনাবাদী জমি সব সময়ই মুগ্ধ করেছে অভিযাত্রীদের; প্রত্যেক বছরই নিহত হয় পর্বতারোহীরা, কেননা তারা চায় অস্পৃষ্ট কোনো শিখরের হানি ঘটাতে বা এ-কারণে যে তারা চায় এক পাশে একটি নতুন পথ তৈরি করতে; এবং উৎসুক মানুষেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নামার চেষ্টা করে মাটির তলদেশের অজানা গুহায়। মানুষেরা যে-বস্তু এরই মাঝে ব্যবহার করেছে, সেটি হয়ে উঠেছে একটি হাতিয়ার; প্রাকৃতিক বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে সেটি হারিয়ে ফেলে তার গভীরতম গুণাবলি : গণফোয়ারার জলের থেকে প্রবল জলধারার অদম্য প্রবাহের মধ্যে আছে অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি।

কুমারীর শরীরে আছে গোপন ঝরনাধারার সজীবতা, না-ফোটা ফুলের প্রভাতি আভা, মুক্তোর প্রাচ্য দ্যুতি, যার ওপর কখনো সূর্যের রশ্মি পড়ে নি। কৃত্রিম গুহা, মন্দির, পুণ্যস্থান, গোপন উদ্যান– শিশুর মতো পুরুষও মুগ্ধ হয় বেড়া দেয়া ও ছায়াচ্ছন্ন স্থান দিয়ে, যা কোনো চেতনার দ্বারা সজীব হয়ে ওঠে নি, যা অপেক্ষায় আছে যে তাকে দেয়া হবে একটি আত্মা : পুরুষ যা একা গ্রহণ এবং বিদ্ধ করবে, সত্যিকারভাবে মনে হয় তা যেনো সে নিজেই সৃষ্টি করেছে। সব কামনার একটি লক্ষ্য হচ্ছে কাম্যবস্তুকে ব্যবহার ক'রে নিঃশেষ ক'রে ফেলা, যা বোঝায় তার ধ্বংস। যে-বিদ্ধকরণের পর সতীচ্ছদ অক্ষত থাকে, তার থেকে সতীচ্ছদ ছিন্ন ক'রে পুরুষ নারীদেহ অধিকার করে অনেক বেশি অন্তরঙ্গভাবে; সতীচ্ছদ ছিন্নকরণের উল্টোনোঅসম্ভব কাজটি সম্পন্ন ক'রে পুরুষ দেহটিকে সুস্পষ্টভাবে পরিণত করে একটি অক্রিয় বস্তুতে, সে এটিকে করায়ত্ত করার ব্যাপারটিকে করে প্রতিষ্ঠিত। এ-ভাবনাটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে-নাইটের উপকথায়, যে বহু বাধা পেরিয়ে

এগিয়েছে কাঁটাভরা ঝোপের ভেতর দিয়ে এমন একটি গোলাপ তোলার জন্যে, যার সুগন্ধ আজো অনঘ্রাত; সে শুধু সেটি পায়ই নি, সে ডাঁটা ভেঙেছে, এবং এভাবেই সে সেটিকে করেছে নিজের। চিত্রকল্পটি এতো স্পষ্ট যে সাধারণ ভাষায় কোনো নারীর কাছে থেকে 'তার ফুল ছিঁড়ে নেয়া' বোঝায় তার কুমারীত্ব নষ্ট করা; এবং এ-প্রকাশরীতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে 'ডিফ্লোরেশন' (সতীত্বমোচন) শব্দটি।

তবে সাথে যৌবন থাকলেই শুধু থাকে কুমারীত্বের যৌনাবেদন; নইলে তার রহস্য আবার হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক। আজকের অনেক পুরুষ অতিশয় প্রলম্বিত কুমারীত্বের উপস্থিতিতে বোধ করে যৌন ঘৃণা; এবং শুধু মনস্তাত্ত্বিক কারণেই 'আইবুড়ো'রা সংকীর্ণমনা ও তিক্ত নারীতে পরিণত হয় না। অভিশাপটি আছে তাদের মাংসের ভেতরেই, যে-মাংস কোনো কর্তার কর্ম নয়, যা কোনো পুরুষের কামনার কাছে হয়ে ওঠে নি কাম্য, পুরুষের পৃথিবীতে একটুকু জায়গা না পেয়ে যা ফুটে ঝ'রে গেছে; তার ঠিক গন্তব্য থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যা হয়ে উঠেছে এক অদ্ভুতত্ব, হয়ে উঠেছে উন্মাদের প্রকাশঅসম্ভব চিন্তার মতো পীড়াদায়ক। চল্লিশ বছর বয়স্ক এক নারী, যে তখনো রূপসী, কিন্তু সম্ভবত কুমারী, তার সম্পর্কে আমি একটি পুরুষকে স্থূলভাবে বলতে শুনেছি : 'এটার ভেতরটা নিশ্চয়ই মাকড়সার জালে ভরা।' এটা সত্য, যে-সব ভূগর্ভস্থ ঘর ও চিলেকোঠায় কেউ ঢোকে না, যেগুলোর ব্যবহার নেই, সেগুলো ভ'রে ওঠে অশোভন রহস্যে; সেগুলোতে হয়তো প্রেতেরা ঘুরে বেড়ায়; ছাড়াবাড়ি হয়ে ওঠে ভুতপ্রেতের আবাসস্থল। যদি নারীর কুমারীত্ব কোনো দেবতার কাছে উৎসর্গিত না হয়, তাহলে লোকেরা সহজেই বিশ্বাস করে যে তার এক রকম বিয়ে হয়েছে শয়তানের সাথে। পুরুষের দ্বারা পরাভূত হয় নি যে-নারী, বৃদ্ধা নারীরা যারা মুক্ত থেকেছে পুরুষের অধীনতা থেকে, তাঁদের অতি সহজেই মনে করা হয় যাদুকরিণী; কারণ নারীর ভাগ্যই হচ্ছে সে কারো দাসত্বে থাকবে, যদি সে পুরুষের জোয়াল থেকে মুক্তি পায়, তাহলে তাকে প্রস্তুত থাকতে হয় শয়তানের জোয়াল মেনে নিতে।

সতীত্বমোচন ব্রতের মধ্য দিয়ে অশুভ প্রেতের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বা তার কুমারীত্বের মধ্য দিয়ে শুদ্ধিলাভ ক'রে, ঘটনা যাই হোক, নববধুকে মনে হয় এক অতিশয় কাম্য শিকার। তাকে আলিঙ্গন ক'রে প্রেমিক লাভ করে জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য। সে পৃথিবীর সব প্রাণী, পৃথিবীর সব উদ্ভিদ; হরিণ ও হরিণী, পদ্ম ও গোলাপ, কোমল জাম, সুগন্ধি বেরি, সে মূল্যবান রত্ন, শুক্তিপুট, গন্ধর্বমণি, মুক্তো, রেশম, আকাশের নীল, ঝরনার সুস্নিগ্ধ জল, বায়ু, অগ্নিশিখা, ভূখণ্ড ও সমুদ্র। পুব ও পশ্চিমের কবিরা নারীর দেহকে রূপান্তরিত করেছেন পুষ্পে, ফলে, পাখিতে। এখানে আবার, প্রাচীন, মধ্য, এবং আধুনিক যুগের লেখা থেকে এতো উদ্ধৃতি দেয়া যায় যে তাতে একটি বিশাল সংকলন তৈরি হয়ে যাবে। কে না জানে পরমগীতের কথা? প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলছে :

> কপোতের চোখের মতো তোমার চোখ...
> তোমার কেশপাশ ছাগপালের মতো...
> তোমার দন্তরাজি মেষপালের মতো ছাঁটা হয়েছে যাদের পশম...
> তোমার গাল ডালিমের মতো...

তোমার স্তনযুগল দুটি হরিণশাবকের মতো...
তোমার জিভের নিচে আছে মধু ও দুধ...

*রহস্যময় ১৭*তে আঁদ্রে ব্রেতোঁ আবার শুরু করেছেন শাশ্বত স্তুতিগীতি : 'মেলুসিন দ্বিতীয় চিৎকারের সময় : সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে তার তন্বী নিতম্ব থেকে, তার পেট আগস্টের সমস্ত গম, বাঁকানো কোমর থেকে আতশবাজির মতো জ্ব'লে ওঠে তার কবন্ধ, চাতকের দুটি ডানার মতো ছাঁচে ঢালা হয়েছে যাদের; তার স্তনযুগল আরমিনের মতো...'

পুরুষ নারীর মধ্যে আবার দেখতে পায় উজ্জ্বল নক্ষত্র ও স্বপ্নাতুর চাঁদ, সূর্যের আলো, কৃত্রিম গুহার ছায়ানিবিড়তা; এবং, বিপরীতভাবে, ঝোপঝাড়ের বন্যফুল, উদ্যানের গর্বিত গোলাপ হচ্ছে নারী। বনদেবীরা, বনপরীরা, সাইরেনরা, পরীরা বিচরণ করে মাঠে ও বনভূমিতে, হ্রদে, সাগরে, পতিত জমিতে। পুরুষের মনের গভীর তলে এ-সর্বপ্রাণবাদ ছাড়া আর কিছু নেই। নাবিকের কাছে সমুদ্র নারী, বিপজ্জনক, বিশ্বাসঘাতক, জয় করা কঠিন, কিন্তু তাকে পরাভূত করার বাসনা পুরুষের প্রবল। যে-পর্বতারোহী জীবন বিপন্ন ক'রে জয় করতে চায় গর্বিত, দ্রোহী, কুমারী ও খল পর্বত, তার কাছে পর্বত হচ্ছে নারী। অনেক সময় বলা হয় এসব তুলনা প্রকাশ করে কামের উদ্গাতিপ্রাপ্তি; তবে এগুলো প্রকাশ করে নারী ও মৌল উপাদানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যা কামের মতোই মৌলিক। নারী হচ্ছে সেই সুবিধাপ্রাপ্ত বস্তু, যার মাধ্যমে পুরুষ পরাভূত করে প্রকৃতিকে। তবে অন্যান্য বস্তুও এ-ভূমিকা পালন করতে পারে। কখনো কখনো পুরুষ বালকের দেহে আবার খুঁজে পেতে চায় বালুকাময় উপকূল, মখমল রাত্রি, মধুমতির সুগন্ধ। তবে যৌন বিদ্ধকরণ পৃথিবীকে দৈহিকভাবে অধিকার করার একমাত্র রীতি নয়। স্টেইনবেক তার *টু এ গড আননৌন* উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন এক পুরুষকে, যে একটি শ্যাওলাধরা পাথরকে বেছে নিয়েছে তার ও প্রকৃতির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিশেবে; কলেৎ *শাৎ*-এ বর্ণনা করেছেন এক তরুণ স্বামীকে, যার প্রেমের কেন্দ্র তার প্রিয় বেড়ালটি, কেননা এ-বন্য ও নিরীহ পশুটির মধ্য দিয়ে সে ধরতে পারে ইন্দ্রিয়কাতর বিশ্বকে, যা তার স্ত্রীর একান্ত মানবিক দেহ তাকে দিতে পারে না। অপর নারীর মতোই চমৎকারভাবে রূপ লাভ করতে পারে সমুদ্ররূপে, পর্বতরূপে। সমুদ্র ও পর্বত যদি হয় নারী, তাহলে নারীও তার প্রেমিকের কাছে সমুদ্র ও পর্বত।

তবে পুরুষ ও বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিশেবে এভাবে কাজ করার জন্যে এটা আকস্মিকভাবে দেয়া হয় নি যে-কোনো নারীকে; পুরুষ শুধু তার সঙ্গিনীর মাঝে তার পরিপূরক যৌনপ্রত্যঙ্গগুলো দেখে সন্তুষ্টি লাভ করে না, নারীকে অবশ্যই হ'তে হবে জীবনের বিস্ময়কর প্রস্ফুটনের প্রতিমূর্তি এবং একই সময়ে তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে জীবনের অবোধ্য রহস্যগুলো। সব কিছুর আগে, তাই, তার থাকতে হবে যৌবন ও স্বাস্থ্য, কেননা পুরুষ যখন একটি জীবন্ত প্রাণীকে আলিঙ্গনে বাঁধে, সে শুধু তখনই তার মধ্যে পেতে পারে মোহিনীশক্তি যদি সে ভুলে যেতে পারে মৃত্যু বাসা বেঁধে আছে জীবনের মাঝে। এবং সে চায় আরো বেশি কিছু : চায় তার প্রেমিকা হবে সুন্দর। নারীসৌন্দর্যের আদর্শ রূপ পরিবর্তনশীল, তবে কিছু দাবি থাকে অপরিবর্তিত;

নারীর নিয়তিই যেহেতু কারো মালিকানায় থাকা, তাই তার দেহের থাকতে হয় বস্তুর জড় ও অক্রিয় গুণ। কর্মের জন্যে শারীরিক যোগ্যতার মধ্যে থাকে পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্য, থাকে শক্তিতে, ক্ষিপ্রতায়, নমনীয়তায়; এটা হচ্ছে সে-সীমাতিক্রমণতার প্রকাশ, যা সপ্রাণ ক'রে তোলে শরীরকে। নারীর আদর্শ রূপ প্রতিসম শুধু স্পার্টা, ফ্যাশিবাদী ইতালি, ও নাটশি জর্মনির মতো সমাজে, যেগুলো নারীকে তৈরি করে রাষ্ট্রের জন্যে, ব্যক্তির জন্যে নয়, তাকে একান্তভাবে গণ্য করে মাতারূপে এবং তাতে কামের কোনো স্থান নেই।

তবে নারীকে যখন সম্পত্তি হিশেবে দান করা হয় পুরুষের কাছে, তখন পুরুষ দাবি করে নারী হবে মাংসের জন্যে মাংসের প্রতীক। তার শরীরকে উপলব্ধি করা হয় না কোনো কর্তৃ-ব্যক্তিত্বের বিকিরণ হিশেবে, বরং গণ্য করা হয় আপন সীমাবদ্ধতায় গভীরভাবে বিলুপ্ত এক বস্তু হিশেবে; এমন শরীরের বিশ্বের সাথে কোনো অভিসম্বন্ধ থাকতে পারে না, এটা শুধু নিজের ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিশ্রুতি হ'তে পারে না : তাকে তৃপ্ত করতে হয় তার জাগানো কামনা। এ-প্রয়োজনীয়তার সবচেয়ে স্থূল রূপ হচ্ছে হটেনটটদের নিতম্বিনী ভেনাসের আদর্শ, কেননা শরীরের মধ্যে নিতম্বেই থাকে সবচেয়ে কম স্নায়ু, যেখানে মাংসকে মনে হয় উদ্দেশ্যহীন। প্রাচ্যদেশীয়দের স্থূলাঙ্গী নারী পছন্দ করাও একই প্রকৃতির; তারা ভালোবাসে মেদের এ-নিরর্থক প্রবৃদ্ধি, যার কোনো পরিকল্পনা নেই, শুধু সেখানে থাকা ছাড়া যার আর কোনো অর্থ নেই। এমনকি সে-সব সভ্যতায় যেখানে কামবোধ অধিকতর সূক্ষ্ম, যেখানে পোষণ করা হয় গঠন ও সুষমা সম্পর্কে বিশেষ ধারণা, সেখানেও স্তন ও নিতম্ব থাকে পছন্দের বস্তুরূপে, তাদের অপ্রয়োজনীয়, বিনামূল্যে পাওয়া বিকাশের জন্যে।

পোশাকপরিচ্ছদ ও চালচলনকে অনেক সময় এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়, যাতে নারীদেহ বিচ্ছিন্ন হয় সক্রিয়তা থেকে : পা বাঁধা চিনদেশের নারীরা হাঁটতেই পারতো না, হলিউডের তারকার মাজাঘষা নখ তাকে বঞ্চিত করে তার হাত থেকেই; উঁচু খুড়, কর্সেট, প্যানিয়ার, ফার্দিংগেল, ক্রিনোলিনের যতোটা কাজ ছিলো নারীশরীরের বাঁকগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তার চেয়ে বেশি ছিলো দেহকে সামর্থ্যহীন ক'রে তোলা। নারীদেহ যখন মেদভারে নুজ হয়, বা এতো কৃশ হয় যে কাজের কোনো শক্তি থাকে না, অসহায় হয়ে ওঠে অসুবিধাজনক পরিচ্ছদ বা শোভনতা-শালীনতা দিয়ে—তখন নারীদেহকে পুরুষের মনে হয় নিজের সম্পত্তি, তার মাল। প্রসাধন ও অলঙ্কার আরো বাড়িয়ে তোলে মুখমণ্ডল ও শরীরের শিলীভবন। কারুকার্যখচিত বস্ত্রের ভূমিকা খুবই জটিল; কিছু আদিম সমাজে এর রয়েছে ধর্মীয় তাৎপর্য; তবে অধিকাংশ সময় এর লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে কোনো মূর্তিতে রূপান্তরিত করা। দ্ব্যর্থবোধক মূর্তি! পুরুষ চায় যে নারী হবে শারীরিক, তার সৌন্দর্য হবে ফল ও ফুলের মতো; তবে সে তাকে আবার চায় নুড়ির মতো মসৃণ, শক্ত ও পরিবর্তনহীন।

নারী তার শরীর দিয়ে হয়ে ওঠে উদ্ভিদ, চিতাবাঘ, মাণিক্য, শুক্তি, আন্দোলিত পুষ্প, পশম, রত্ন, ঝিনুক, পালক; সে নিজেকে সুরভিত করে পদ্ম ও গোলাপের সুগন্ধ ছড়ানোর জন্যে। তবে পালক, রেশম, মুক্তো, ও সুগন্ধি অবশ্য তার মাংসের, গন্ধের পাশব স্থূলতাকে লুকিয়ে রাখার কাজ করে। সে তার মুখ ও চিবুক রঞ্জিত করে

সেগুলোকে মুখোশের কঠিন স্থিরতা দেয়ার জন্যে; সে সুরমা ও মাসকারায় গভীরভাবে বন্দী করে তার দৃষ্টিকে, এটা তার চোখের বর্ণাঢ্য অলঙ্কারের থেকে বেশি কিছু নয়; বিনুনিত, কুঞ্চিত, বিন্যস্ত তার কেশপাশ হারিয়ে ফেলে উদ্বেগজাগানো উদ্ভিদ-ধর্মী রহস্য।

বস্ত্রপরিহিত ও অলঙ্কৃত নারীর মধ্যে প্রকৃতি উপস্থিত থাকে, তবে নিয়ন্ত্রিতভাবে, মানুষের ইচ্ছে দিয়ে তাকে ঢালাই করা হয় পুরুষের কামনা অনুসারে। কোনো নারীর মধ্যে প্রকৃতি যতোবেশি বিকশিত ও বন্দী হয়, সে ততোবেশি হয়ে ওঠে কামনার বস্তু : 'পরিশীলিত' নারীই সব সময় থেকেছে আদর্শ কামসামগ্রি। একটু বেশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পছন্দ করা অধিকাংশ সময়ই হচ্ছে পরিশীলনের এক আপাতসত্য রূপ। রেমি দ্য গরমোঁ চেয়েছিলেন নারীদের চুল থাকবে এলানো, থাকবে স্রোতস্বিনীর ও প্রেইরির ঘাসের মতো ঢেউখেলানো। নারী যতো তরুণী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং তার নতুন ও দীপ্ত তনু যতোবেশি চিরস্থায়ী সজীবতায় ভূষিত ব'লে মনে হয়, ছলাকলার প্রয়োজন হয় তার ততো কম। পুরুষ যেহেতু ভয় পায় নারীর অনিশ্চিত নিয়তিকে, যেহেতু পুরুষ নারীকে দেখতে পছন্দ করে পরিবর্তনহীন, প্রয়োজনীয়রূপে, তাই পুরুষ নারীর মুখে, নারীর শরীরে, নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেখতে চায় এক আদর্শ রূপের যথাযথ প্রকাশ। আদিম জনগোষ্ঠির মধ্যে এ-আদর্শ হচ্ছে জনপ্রিয় প্রতিরূপের উৎকৃষ্ট রূপ : যে-জাতির ঠোঁট মোটা ও নাক বোঁচা তার ভেনাসও হয় মোটা ঠোঁটের ও বোঁচা নাকের; পরে আরো জটিল নান্দনিক বিধি প্রয়োগ করা হয়েছে নারীর ক্ষেত্রে। তারপর আমরা এসে পৌঁছি এক বিসঙ্গতিতে : পুরুষ নারীর মধ্যে প্রকৃতিকে লাভ করতে গিয়ে তাকে বাধ্য করে ছলাকলাপূর্ণ হয়ে উঠতে। সে শুধু *ফিসিস* নয়, বরং সমপরিমাণে প্রতি-*ফিসিস*; এটা শুধু বৈদ্যুতিক 'পার্ম'-এর, মোম দিয়ে অতিরিক্ত চুল তোলার, ল্যাটেক্স কোমরবন্ধের সভ্যতায়ই ঘটে না, ঘটে ওষ্ঠ-চাকতির নিগ্রোদের দেশে, চিনে এবং সারা পৃথিবীতে।

সুইফ্‌ট্ তাঁর বিখ্যাত *ওড টু সেলিয়ায়* নিন্দা করেছিলেন এ-রহস্যীকরণের; ঘেন্নার সাথে তিনি বর্ণনা করেছেন ছেনালের টুকিটাকি জিনিশপত্র এবং ঘেন্নার সাথে স্মরণ করেছেন তার দেহের পাশবিক প্রয়োজনগুলো। ক্রোধে তিনি দু-বার ভুল করেছেন; কেননা পুরুষ চায় নারী একই সাথে হবে পশু ও উদ্ভিদ এবং সে ঢাকা থাকবে এক কৃত্রিম সম্মুখভাগের আড়ালে; পুরুষ দেখতে ভালোবাসে যে নারী উঠে আসছে সমুদ্র থেকে এবং বেরিয়ে আসছে ফ্যাশনসম্মত বস্ত্রনির্মাতার প্রতিষ্ঠান থেকে, নগ্ন ও বস্ত্রপরিহিত, তার বস্ত্রের নিচে নগ্ন– এভাবেই পুরুষ নারীকে পায় মানবমণ্ডলির বিশ্বে। নগরের পুরুষেরা নারীর ভেতরে খোঁজে পাশবিকতা; তবে সামরিক কাজে নিয়োজিত তরুণ চাষীর কাছে বেশ্যালয়ই হচ্ছে নগরের সমস্ত ইন্দ্রজালের প্রতিমূর্তি। নারী ক্ষেত্র ও চারণভূমি, তবে সে ব্যাবিলনও।

তবে এটাই নারীর প্রথম মিথ্যাচার, তার প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা : এটা জীবনেরই মিথ্যাচার– জীবন যদিও প্রকাশ করে অতিশয় আকর্ষণীয় গঠন, তবু জীবন সব সময়ই উপদ্রুত থাকে বয়স ও মৃত্যুর উত্তেজনা দিয়ে। পুরুষ যেভাবে ব্যবহার করে নারীকে, তাতেই নষ্ট হয় নারীর সবচেয়ে মূল্যবান শক্তিগুলো : গর্ভধারণে ভারাক্রান্ত হয়ে সে

হারিয়ে ফেলে তার কামের আবেদন; এমনকি নারী বন্ধ্যা হ'লেও শুধু কালপ্রবাহই নষ্ট ক'রে দেয় তার মনোহারিত্ব। ক্ষীণবল, সাদামাটা, বৃদ্ধ অবস্থায় নারী আকর্ষণহীন। গাছ সম্পর্কে যেমন বলা হয় তেমনি বলা যেতে পারে সে হয়ে গেছে বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ। এটা ঠিক যে পুরুষের জরাগ্রস্ততাও ভীতিকর; তবে পুরুষ সাধারণত বৃদ্ধ পুরুষদের মাংসরূপে দেখে না। নারীর শরীরেই– যে-শরীর সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষেরই জন্যে– শুধু পুরুষ মুখোমুখি হয় মাংসের অবনতির। বৃদ্ধা নারী, সাদামাটা নারী আকর্ষণহীন বস্তুই শুধু নয়, তারা জাগায় ভয়মিশ্রিত ঘৃণা। যখন নিঃশেষিত হয়ে যায় স্ত্রীর মনোহারিত্ব, তখন তাদের মধ্যে আবার দেখা দেয় মাতার উদ্বিগ্নকর মূর্তি।

তবুও স্ত্রী এক ভয়ঙ্কর শিকার। সমুদ্রের ঢেউ থেকে উঠে আসে ভেনাসের মধ্যে– সজীব ফেনা, উজ্জ্বল ফসল তোলা– বেঁচে থাকে দিমিতার; পুরুষ যখন নারীর কাছে থেকে পাওয়া বিনোদের মধ্য দিয়ে অধিকার করে নারীকে, তখন পুরুষ নারীর ভেতরে জাগিয়ে তোলে উর্বরতার সন্দেহজনক শক্তিকেও : যে-প্রত্যঙ্গটিকে সে বিদ্ধ করে, সেটি দিয়েই নারী জন্ম দেয় সন্তান। এ-কারণেই সব সমাজেই নানা ট্যাবু দিয়ে পুরুষকে রক্ষা করা হয় স্ত্রীলিঙ্গের বিপদ থেকে। এর বিপরীতটি সত্য নয়, পুরুষের কাছে নারীর ভয় পাওয়ার কিছু নেই; পুরুষের লিঙ্গকে গণ্য করা হয় ইহজাগতিক, লৌকিক ব'লে। শিশ্নকে উন্নীত করা যেতে পারে দেবতার পর্যায়ে; কিন্তু তার পুজোর মধ্যে নেই ভয়ের কোনো উপাদান, এবং প্রাত্যহিক জীবনে নারীকে পুরুষের থেকে অতীন্দ্রিয়ভাবে রক্ষা করার দরকার পড়ে না; পুরুষ সব সময়ই শুভ। উল্লেখযোগ্য যে বহু মাতৃধারার সমাজে বিরাজ করে খুবই অবাধ যৌনতা; তবে এটা সত্য শুধু নারীর বাল্যকালে, তার কৈশোরে, যখন সঙ্গম প্রজননের ধারণার সাথে জড়িত থাকে না। ম্যালিনোস্কি কিছুটা বিস্ময়ের সাথেই বর্ণনা করেছেন যে তরুণতরুণী যারা অবাধে ঘুমোয় 'অবিবাহিতদের গৃহ'-এ, তারা তাদের প্রেমলীলার কথা খোলাখুলি প্রকাশ ক'রে দেয়; ঘটনা হচ্ছে অল্প [illegible] করে অবিবাহিত মেয়ের গর্ভ হয় না, এবং তাই সঙ্গমকে মনে করা হয় নিতান্তই এক অনুত্তেজিত ঐহিক প্রমোদ ব'লে। কিন্তু যেই বিয়ে হয় নারীর, স্বামী প্রকাশ্যে স্ত্রীর প্রতি কোনো অনুরাগও প্রকাশ করতে পারে না, স্ত্রীকে তার ছোঁয়া নিষেধ; এবং নিজেদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রতি কোনো ইঙ্গিত হচ্ছে অধর্মাচরণ : নারী অংশীদার হয়ে উঠেছে মাতার ভীতিকর সারসত্তার, এবং সঙ্গম হয়ে উঠেছে এক পবিত্র কর্ম। তারপর থেকে এটা পরিবৃত থাকে নিষেধ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দিয়ে। ভূমি চাষের, বীজ বোনার, চারা লাগানোর সময় সঙ্গম নিষিদ্ধ।

পুরুষের মধ্যে নারী যে-ভয় জাগায়, তা কি সাধারণভাবে কাম থেকে উদ্ভূত, না কি ভয় থেকে জাগে কাম, সেটা এক প্রশ্ন। উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ ক'রে লেভিটিকাসে, স্বপ্নদোষকে গণ্য করা হয় দূষণ ব'লে, যদিও এর সাথে নারীর সম্পর্ক নেই। এবং আমাদের আধুনিক সমাজে হস্তমৈথুনকে সাধারণত মনে করা হয় বিপজ্জনক ও পাপ : অনেক কিশোর ও তরুণ, যারা এর প্রতি আসক্ত, তারা এ-কাজটি করে ভয়াবহ আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্যে। সমাজের এবং বিশেষ ক'রে পিতামাতার হস্তক্ষেপে একটি একান্ত সুখ হয়ে ওঠে পাপ; তবে একাধিক ছেলে স্বতস্ফূর্তভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে তাদের বীর্যপাতে : রক্ত বা বীর্য, তার নিজের

যে-কোনো পদার্থের নিঃসরণ তার কাছে মনে হয় উদ্বিগ্নকর। যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা হচ্ছে তার জীবন, তার মানা। তবে পুরুষ কোনো নারীর উপস্থিতি ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে যৌনাভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেলেও তার কামের মধ্যে বস্তুগতভাবে জ্ঞাপন করা হয় নারীকে : প্লাতো যেমন উভলিঙ্গদের উপকথায় বলেছেন, পুরুষের সংগঠন ইঙ্গিত করে নারীর সংগঠনের প্রতি। পুরুষ নিজের লিঙ্গ আবিষ্কার করতে গিয়ে আবিষ্কার করে নারী, এমনকি নারী রক্তমাংসে এবং চিত্রে উপস্থিত না থাকলেও।

নারীর প্রতি পুরুষের অনুভূতির পরস্পরবিপরীত মূল্য আবার জেগে ওঠে নিজের কামপ্রত্যঙ্গের প্রতি তার মনোভাবে : সে এর জন্যে গর্বিত, সে এটিকে উপহাস করে, এটির জন্যে লজ্জা পায়। ছোটো ছেলে তার শিশ্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে বন্ধুদের সাথে নামে প্রতিযোগিতায় : তার শিশ্নের প্রথম উত্থান তাকে একই সাথে ভ'রে দেয় গর্বে ও ভীতিতে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তার শিশ্নকে গণ্য করে সীমাতিক্রমণতা ও শক্তির প্রতীকরূপে; এটা এক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত পেশিরূপে এবং একই সময়ে একটি ঐন্দ্রজালিক উপহাররূপে তৃপ্ত করে তার অহমিকাকে : সে এটি দিয়ে মুগ্ধ থাকে, তবে তার মনে সন্দেহ জেগে থাকে যে সে প্রতারিত হ'তে পারে। যে-প্রত্যঙ্গটি দিয়ে সে নিজেকে দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করতে চায়, সেটি তার অনুগত নয়; অতৃপ্ত কামনায় ভারি হয়ে, আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে, কখনো ঘুমের মধ্যে নিজেকে ভারমুক্ত ক'রে, এটা প্রকাশ করে এক সন্দেহজনক ও খামখেয়ালভরা প্রাণশক্তি। পুরুষ চৈতন্যকে জয়ী করতে চায় জীবনের ওপর, সক্রিয়তাকে অক্রিয়তার ওপর; তার চেতনা প্রকৃতিকে রাখে দূরে, তার ইচ্ছে তাকে রূপ দান করে, কিন্তু তার কামপ্রত্যঙ্গে সে নিজেকে আবার অবরুদ্ধ দেখতে পায় জীবন, প্রকৃতি, ও অক্রিয়তা দিয়ে।

'কামপ্রত্যঙ্গগুলো,' লিখেছেন শপেনহায়ার, 'ইচ্ছেশক্তির প্রকৃত পীঠস্থান, যার বিপরীত মেরু হচ্ছে মস্তিষ্ক।' তিনি যাকে 'ইচ্ছেশক্তি' বলেছেন, তা হচ্ছে জীবনলগ্নতা, যা হচ্ছে দুঃখভোগ ও মৃত্যু, আর সেখানে 'মস্তিষ্ক' হচ্ছে চিন্তা, যা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে যৌন লজ্জা হচ্ছে সে-লজ্জা, যা আমরা বোধ করি শরীরের প্রতি আমাদের নির্বোধ মোহের ফলে। তাঁর তত্ত্বগুলোর হতাশাবাদকে আমরা আপত্তিকর মনে করলেও, যে-বৈপরীত্য তিনি দেখেছেন, তা ঠিক : কাম বনাম মস্তিষ্ক, মানুষের দ্বৈততার প্রকাশ। কর্তা হিশেবে পুরুষ মুখোমুখি হয় বিশ্বের, এবং এ-বিশ্বের বাইরে অবস্থান ক'রে সে নিজেকে ক'রে তোলে এর শাসক; যদি সে নিজেকে দেখে মাংস হিশেবে, কাম হিশেবে, সে আর থাকে না স্বাধীন চেতনা, স্পষ্ট, স্বাধীন সত্তা : সে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় বিশ্বের সাথে, হয়ে ওঠে এক সীমাবদ্ধ ও বিনাশী বস্তু। সন্দেহ নেই যে প্রজননের কর্ম অতিক্রম ক'রে যায় দেহের সীমা, তবে সে-মুহূর্তেই এটা প্রতিষ্ঠিত করে সীমা। শিশ্ন, প্রজন্মদের পিতা, সঙ্গতিপূর্ণ মায়ের জরায়ুর সাথে; পুরুষ উদ্ভূত হয় একটি জীবাণু থেকে, যে-জীবাণু বাড়ে নারীর দেহের ভেতরে, পুরুষ নিজেই আবার জীবাণুর বহনকারী, এবং যা দান করে জীবন, তা বপন ক'রে পুরুষকে পরিত্যাগ করতে হয় তার নিজের জীবনকেই। 'সন্তানদের জন্ম হচ্ছে,' হেগেল বলেছেন, 'পিতামাতার মৃত্যু।' বীর্যপাত হচ্ছে মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি, এটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রজাতির দৃঢ় ঘোষণা; কামপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব ও তার কর্মকাণ্ড অস্বীকার করে কর্তার

গর্বিত বিশিষ্টতা। আত্মার বিরুদ্ধে জীবনের এ-প্রতিদ্বন্দ্বিতাই পুরুষাঙ্গটিকে লজ্জাজনক ক'রে তোলে। পুরুষ যৌনাঙ্গ নিয়ে তখনই গৌরব বোধ করে যখন সে এটিকে মনে করে সীমাতিক্রমণ ও সক্রিয়তা, অপরকে অধিকার করার একটি হাতিয়ার; কিন্তু সে একে নিয়ে লজ্জা বোধ করে যখন সে এটিকে দেখে নিতান্ত অক্রিয় মাংসরূপে, যার মাধমে সে হয়ে ওঠে জীবনের অন্ধকার শক্তিরাশির খেলার সামগ্রি।

কিন্তু এখানেই সে বুঝতে পারে– শ্রেষ্ঠ প্রমাণের সাথে– তার দৈহিক পরিস্থিতির দ্ব্যর্থবোধকতা। সে তার কামে ততোটাই গর্ব বোধ করে, এটা যতোখানি পরিমাণে অপরকে আত্মসাতের এক রকম উপায়– এবং মালিকানা লাভের এ-স্বপ্ন শেষ হয় শুধু হতাশায়। যথার্থ মালিকানায় অপর বিলুপ্ত হয়ে যায়, একে নিঃশেষ ও ধ্বংস কর়া হয় : যখন ভোর এসে হাজির হয় তার শয্যা থেকে রক্ষিতাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, তখন শুধু *আরব্যরজনীর* সুলতানেরই আছে তার প্রত্যেক রক্ষিতার মাথা কাটার ক্ষমতা। নারী বেঁচে থাকে পুরুষের আলিঙ্গনের পরেও, এবং এ-ঘটনা দিয়েই সে মুক্তি পায় পুরুষের থেকে; যখনই পুরুষ শিথিল করে বাহু, তার শিকার আবার তার কাছে হয়ে ওঠে অচেনা; সেখানে সে প'ড়ে থাকে, নতুন, অক্ষত, একই স্বল্পস্থায়ী রীতিতে প্রস্তুত অন্য কোনো প্রেমিকের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার জন্যে। পুরুষের এক স্বপ্ন হচ্ছে নারীটিকে এমনভাবে 'ছাপ মেরে দেয়া', যাতে নারীটি চিরকাল তার হয়ে থাকে; তবে সবচেয়ে উদ্ধত পুরুষটিও ভালোভাবেই জানে সে নারীটির কাছে স্মৃতি ছাড়া আর কিছু রেখে যাবে না আর অতিশয় ব্যাকুল স্মৃতিচারণও সত্যিকারের, বর্তমান অনুভূতির তুলনায় ঠাণ্ডা। বিপুল পরিমাণ সাহিত্যে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে এ-হতাশা। এটা নারীকে করেছে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু, এবং তাকে বলা হয়েছে অস্থিরমতী এবং বিশ্বাসঘাতিনী, কেননা তার শরীরটি এমন যে তা বিশেষ কোনো পুরুষের কাছে নয়, সাধারণভাবে সব পুরুষের কাছেই উৎসর্গিত হ'তে পারে।

তবে তার দ্রোহিতা আরো বেশি বিশ্বাসঘাতক : সত্য বলতে কী নারী তার প্রেমিককে পরিণত করে নিজের শিকারে। শুধু একটি দেহই স্পর্শ করতে পারে অন্য একটি দেহকে; পুরুষ তার কাম্য মাংসের প্রভু হয়ে ওঠে শুধু নিজে মাংসে পরিণত হয়ে; হাওয়াকে দেয়া হয়েছিলো আদমের কাছে, যাতে হাওয়ার মাধ্যমে আদম অর্জন করতে পারে তার সীমাতিক্রমণতা, এবং হাওয়া আদমকে টেনে নেয় সীমাবদ্ধতার রাত্রির ভেতরে। তার রক্ষিতা, প্রমোদের মাথাঘোরানোর মধ্যে, তাকে আবার বন্দী করে সে-অন্ধকার গর্ভের অনচ্ছ কাদামাটিতে, যা মা তৈরি করেছে তার পুত্রের জন্যে এবং যেখান থেকে সে চায় মুক্তি পেতে। পুরুষ চায় নারীকে অধিকার করতে : সে নিজেই হয় অধিকৃত! গন্ধ, আর্দ্রতা, ক্লান্তি, নির্বেদ– এক গ্রন্থাগারভর্তি বইয়ে বর্ণনা করা হয়েছে মাংসে পরিণত হওয়া চেতনার এ-বিষাদাচ্ছন্ন সংরাগ।

ধারাবাহিক উপন্যাসের অতিব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার নারীকে বর্ণনা করেছে অভিচারিণী, সম্মোহনকারিণী রূপে, যারা পুরুষকে মুগ্ধ ক'রে তার ওপর ছড়িয়ে দেয় সম্মোহন, এ-বর্ণনায় প্রতিফলিত হয় সবচেয়ে পুরোনো ও সর্বজনীন কিংবদন্তিগুলো। নারী উৎসর্গিত যাদুর কাছে। আলাইন বলেছেন যে যাদু হচ্ছে বস্তুর মাঝে বেঁকে ভেঙে পড়া প্রেত; কোনো কাজ তখনই ঐন্দ্রজালিক, যখন তা কোনো সংঘটক দ্বারা উৎপন্ন না হয়ে বয়ে

আসে অক্রিয় কিছু থেকে। পুরোহিত ও যাদুকরের মধ্যে পার্থক্য সুবিদিত : প্রথমজন দেবতাদের ও বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে শক্তিরাশিকে, সকলের কল্যাণের জন্যে, দলের সব সদস্যের নামে; যাদুকর কাজ করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দেবতাদের ও বিধানের বিরুদ্ধে, তার নিজের গভীর আগ্রহ অনুসারে। এখন, পুরুষের বিশ্বে নারী সম্পূর্ণরূপে সংহতি লাভ করে নি; অপররূপে, সে তাদের বিরোধী পক্ষ। এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক যে তার শক্তিগুলো সে প্রয়োগ করবে, সে বিস্তৃত হবে না পুরুষের সমাজে এবং ভবিষ্যৎ সীমাতিক্রমণতার শীতল উদ্যোগের মধ্যে, কিন্তু, যেহেতু সে বিচ্ছিন্ন, বিরোধী, সে পুরুষদের টেনে নেবে বিচ্ছিন্নতার নিঃসঙ্গতায়, সীমাবদ্ধতার তমসায়। নারী হচ্ছে সাইরেন, যার গানে প্রলুব্ধ নাবিকেরা আছড়ে পড়ে শিলার ওপর; সে সির্সে, যে তার প্রেমিকদের রূপান্তরিত করে পশুতে, সে আনডাইন, যে জেলেদের টেনে নেয় খাড়ির গভীরে। নারীর রূপে মুগ্ধ হওয়ার পর পুরুষের আর থাকে না ইচ্ছেশক্তি, কর্মোদ্যোগ, ভবিষ্যৎ; সে আর নাগরিক থাকে না, হয়ে ওঠে মাংসের কামনার কাছে দাসত্বে বন্দী মাংস, গোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন, মুহূর্তের কাছে বন্দী, পীড়ন ও প্রমোদের মধ্যে অক্রিয়ভাবে আন্দোলিত।

এ-মাংসের নাটকের কোন দিকের ওপর পুরুষ গুরুত্ব দিচ্ছে, সে-অনুসারে পুরুষের থাকতে পারে বহু মনোভাব। যদি কোনো পুরুষ জীবনকে অনন্য মনে না করে, যদি সে তার বিশেষ নিয়তি নিয়ে উদ্বিগ্ন না থাকে, যদি সে মৃত্যুকে ভয় না পায়, তাহলে সে আনন্দের সাথে মেনে নেয় তার পাশবিকতা। সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যে মুসলমানদের মধ্যে নারীকে ধ্বংস করা হয় অতি শোচনীয় অবস্থায়; ওই সমাজ পরিবারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কাছে আবেদনের অনুমতি দেয় না, এবং ধর্মের কারণে, যে-ধর্ম প্রকাশ করে সভ্যতার যুদ্ধপরায়ণ ভাবাদর্শ, পুরুষকে সরাসরি উৎসর্গ করা হয়েছে মৃত্যুর কাছে এবং নারীকে বঞ্চিত করেছে তার যাদু থেকে। কীসের সে ভয় করবে পৃথিবীতে, যে তৈরি হয়ে আছে যে-কোনো মুহূর্তে মুহম্মদীয় স্বর্গের ইন্দ্রিয়পরায়ণ প্রমোদে লিপ্ত হওয়ার জন্যে? এমন ক্ষেত্রে পুরুষ নিজের বা নারীর থেকে আত্মরক্ষার কোনো দরকার ছাড়াই শান্তভাবে উপভোগ করতে পারে নারী। *আরব্য-রজনীর* গল্পগুলো নারীকে উপস্থাপিত করে সুখকর প্রমোদের উৎসরূপে, যেমন উৎস ফল, মোরব্বা, সুস্বাদু পিঠা, ও সুগন্ধি তেল। আজকাল আমরা ওই ইন্দ্রিয়ভারাতুরতা দেখতে পাই ভূমধ্যসাগরীয় জনগণের মধ্যে। *ইন সিসিলিতে* ভিত্তোরিনি বলেছেন সাত বছর বয়সে প্রশান্ত বিস্ময়ে তিনি দেখেছিলেন এক নারীর নগ্ন দেহ। গ্রিস ও রোমের যুক্তিশীল চিন্তাধারা সমর্থন করে এ-সহজিয়া মনোভাব। তবে যুক্তিশীলতা কখনোই সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ করে নি এবং এসব সভ্যতায় কামের অভিজ্ঞতাগুলো রক্ষা করেছে তাদের পরস্পরবিপরীত মূল্যসম্পন্ন চরিত্র : আচারানুষ্ঠান, পুরাণ, সাহিত্য এসবের প্রমাণ। তবে নারীর প্রতি আকর্ষণ ও বিপদ প্রকাশ পেয়েছে দুর্বলতর রূপে।

খ্রিস্টধর্ম আবার নারীকে ভ'রে তোলে ভীতিকর মর্যাদায় : পুরুষের অস্বস্তিপূর্ণ বিবেকের তীব্র যন্ত্রণা রূপ নেয় অন্য লিঙ্গের প্রতি ভীতি রূপে। একজন খ্রিস্টান নিজের ভেতরে দ্বিধাবিভক্ত; দেহ ও আত্মার, জীবন ও চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য এখানে সম্পূর্ণ; আদিপাপ দেহকে করেছে আত্মার শত্রু; মাংসের সমস্ত বন্ধনকে মনে হয়

অশুভ। শুধু খ্রিস্টের দ্বারা ত্রাণ লাভ ক'রে এবং স্বর্গরাজ্যের দিকে চালিত হয়েই রক্ষা পেতে পারে মানুষ; তবে মূলত মানুষ হচ্ছে দূষণ; তার জন্য তাকে শুধু মৃত্যুদণ্ডিত করে না, নরকদণ্ডিতও করে; শুধু স্বর্গীয় করুণায়ই তার সামনে উন্মুক্ত হ'তে পারে স্বর্গ, তবে তার পার্থিব অস্তিত্বের সব রূপের ওপরই রয়েছে একটা অভিশাপ। অশুভ হচ্ছে এক ধ্রুব বাস্তবতা; আর দেহ হচ্ছে পাপ। নারী যেহেতু সব সময়ই অপর, তাই এটা বিশ্বাস করা হয় না যে পুরুষ ও নারী উভয়ই পরস্পরের কাছে দেহ : খ্রিস্টানের কাছে দেহ হচ্ছে সেই বৈরী *অপর*, যা সব সময়ই নারী। খ্রিস্টানের কাছে নারীর মধ্যে রূপ ধারণ করেছে বিশ্বের, মাংসের, ও শয়তানের প্রলোভন। গির্জার সব পিতাই এ-ধারণার ওপর জোর দেন যে নারীই আদমকে প্রলুব্ধ করেছে পাপে। আমাদের আবার উদ্ধৃত করতে হবে তারতুলিয়ানকে : 'নারী! তুমি শয়তানের প্রবেশদ্বার। তাঁকে তুমি প্ররোচিত করেছিলে, যাঁকে শয়তানও সরাসরি আক্রমণের সাহস করে নি। তোমার জন্যেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে ঈশ্বরের পুত্রকে। তুমি সব সময়ই থাকবে শোকে ও ছিন্নবস্ত্রে।' সমগ্র খ্রিস্টান সাহিত্যের প্রয়াস হচ্ছে নারীর প্রতি পুরুষের ঘৃণা বাড়ানো। তারতুলিয়ান নারীর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'পয়ঃপ্রণালির ওপর নির্মিত মন্দির'রূপে। সেইন্ট অগাস্টিন বিভীষিকার সাথে কামের ও মলমূত্র ত্যাগের প্রত্যঙ্গগুলোর মেশামেশির দিকে আকর্ষণ করেছেন দৃষ্টি : 'আমরা জন্ম নিই মল ও মূত্রের মধ্যে।' নারীশরীরের প্রতি খ্রিস্টধর্মের বিরূপতা এতো যে যখন এটি তার ঈশ্বরকে ধ্বংস করতে চায় এক কলঙ্কজনক মৃত্যুতে, তখন এটি তাঁকে অব্যাহতি দেয় জন্ম নেয়ার কালিমা থেকে : প্রাচ্য গির্জার এফিসুসের পরিষদ এবং পাশ্চাত্য গির্জার ল্যাটেরান পরিষদ ঘোষণা করেছে যে খ্রিস্টের জন্ম হয়েছে কুমারী মায়ের গর্ভে। গির্জার আদিপিতারা– অরিগেন, তারতুলিয়ান, ও জেরোমে– মনে করেছিলেন অন্যান্য নারীর মতো মেরিও প্রসব করেছিলো রক্ত ও ময়লার মধ্যেই; কিন্তু সেইন্ট অ্যামব্রোজ ও সেইন্ট অগাস্টিনের মতামতই জয়লাভ করে। কুমারীর দেহ থেকেছিলো রুদ্ধ। মধ্যযুগ থেকেই শরীর থাকা, নারীর বেলা, গণ্য হয়ে এসেছে কলঙ্ক ব'লে। এমনকি বিজ্ঞানও দীর্ঘকাল বিহ্বল ছিলো এ-ঘৃণায়। লিনাউস তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক সন্দর্ভে 'ঘৃণ্য' ব'লে নারীর যৌনপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা এড়িয়ে যান। ফরাশি চিকিৎসক দ্য লরেঁ নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এ-মর্মপীড়াদায়ক প্রশ্নটি : 'এ-স্বর্গীয় প্রাণীটি, যে পরিপূর্ণ যুক্তিশীলতা ও বিচারবুদ্ধিতে, যাকে আমরা বলি পুরুষ, সে কী ক'রে আকৃষ্ট হয় নারীর ওইসব অশ্লীল প্রত্যঙ্গের প্রতি, যা নোংরা হয়ে থাকে তরল পদার্থে এবং লজ্জাকরভাবে অবস্থিত ধড়ের নিম্নতম অংশে?'

আজকাল খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় আরো নানা প্রভাব; এবং এর রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য। তবে, পিউরিটান জগতে, শরীরের প্রতি ঘৃণা সমানভাবে বিরাজ করছে; এর প্রকাশ ঘটেছে, উদাহরণস্বরূপ, ফকনারের *লাইট ইন আগস্ট*-এ; নায়কের প্রথম দিকের যৌন অভিজ্ঞতাগুলো ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্কজনক। সাহিত্য ভ'রেই এটা দেখানো খুবই সাধারণ ঘটনা যে এক তরুণ প্রথম সঙ্গমের পর এতোই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে তার বিবমিষা জাগে; এবং বাস্তবে যদিও এমন প্রতিক্রিয়া খুবই দুর্লভ, তবু এটা যে এতো ঘনঘন বর্ণনা করা হয়, তা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। বিশেষ

ক'রে অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলোতে, যেগুলো পিউরিটানবাদে বিশেষভাবে সিক্ত, অধিকাংশ তরুণ ও বহু পুরুষের মধ্যে নারী জাগিয়ে তোলে ভয়, যা কমবেশি খোলাখুলি স্বীকার করা হয়। এ-অনুভূতিটা বেশ তীব্রভাবে বিরাজ করে ফ্রান্সে। মিশেল লিরি *আজ দ'অম*-এ লিখেছেন : 'আজকাল আমি নারীর প্রত্যঙ্গটিকে মনে করি একটি ঘিনঘিনে জিনিশ বা একটা ঘা, কিন্তু এর জন্যে এটা কম আকর্ষণীয় নয়, তবে অন্য সব রক্তাক্ত, শ্লেষ্মল, রোগাক্রান্ত বস্তুর মতোই এটা ভয়ঙ্কর।' একটি সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে সঙ্গমের ফলে পুরুষ হারিয়ে ফেলে তার পেশিশক্তি ও চিন্তাশক্তি, তার ফসফরাস নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং নির্জীব হয়ে পড়ে তার অনুভূতি। এটা সত্য যে হস্তমৈথুনও নির্দেশ করে এসব বিপদ, এবং নৈতিক কারণে সমাজ একে স্বাভাবিক যৌনকর্মের থেকে আরো বেশি ক্ষতিকর মনে করে। কামের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে বৈধ বিবাহ ও সন্তানকামনা। নারী হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার, সে পুরুষ খায় ও পান করে; তার যৌনাঙ্গ বেঁচে থাকে পুরুষের যৌনাঙ্গ খেয়ে খেয়ে। কিছু মনোবিশ্লেষক চেষ্টা করেছেন এসব অলীক কল্পনার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যোগানোর, তাঁরা প্রস্তাব করেছেন সঙ্গমে নারী যে-সুখ পায়, তা হয়তো আসে এ-ব্যাপার থেকে যে নারী পুরুষটিকে প্রতীকীরূপে খোজা করে এবং অধিকার ক'রে নেয় শিশ্নটি। তবে মনে হয় মনোবিশ্লেষণ করা দরকার এসব তত্ত্বেরই, এবং এটা সম্ভবপর এসব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন যে-সব চিকিৎসক, তাঁরা হয়তো লিপ্ত তাঁদের পূর্বপুরুষের ভীতি প্রক্ষেপণে।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে গভীরভাবে পোষ মানানো হয়েছিলো নারীর যাদুকে। তার ভেতরে আছে যে-মহাজাগতিক শক্তিগুলো, নারী সেগুলোকে অঙ্গীভূত করার সুযোগ দেয় সমাজকে। দুমিজেল তাঁর *মিত্র-বরুণ* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যেমন রোমে তেমনি ভারতে পৌরুষ দেখানোর দুটি রীতি রয়েছে : প্রথমত, বরুণ ও রোমুলুসে, গন্ধর্বদের ও লুপারর্কির মধ্যে, এ-শক্তি হচ্ছে আক্রমণ, ধর্ষণ, বিশৃঙ্খলা, কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংস্রতা; এতে নারী দেখা দেয় এমন সত্তারূপে, যাকে করতে হবে ধর্ষণ, বলাৎকার; ধর্ষিতা সেবিন নারীদের, যারা স্পষ্টত ছিলো বন্ধ্যা, মারা হয়েছিলো বৃষের চামড়ায় তৈরি চাবুক; এটা করা হয়েছিলো অধিকতর হিংস্রতা দিয়ে অতিশয় হিংস্রতার ক্ষতিপূরণের জন্যে। তবে, দ্বিতীয়ত এবং এর বিপরীতে, মিত্র, নুমা, ব্রাহ্মণরা, ও পুরোহিতেরা ছিলো নগরের আইনশৃঙ্খলার পক্ষে : এক্ষেত্রে নারীকে বিয়ের বিস্তৃত আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করা হয় স্বামীর সাথে, এবং তার সাথে কাজ করতে গিয়ে নারী তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় প্রকৃতির সব নারীশক্তিকে অধীনস্থ করার; রোমে স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে জুপিটারের পুরোহিত ত্যাগ করতো নিজের পদ। একইভাবে মিশরে আইসিস দেবী মহামাতার পরম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পরও থাকে মহানুভব, সুস্মিত, দয়াবতী, ও শুভ, ওসিরিসের জাঁকজমকপূর্ণ স্ত্রী। কিন্তু নারী যখন পুরুষের সঙ্গী, পরিপূরক, তার 'অর্ধাঙ্গিনী', তখন দরকারবশতই নারীর থাকে এক সচেতন অহং, একটি আত্মা। পুরুষ এতো অন্তরঙ্গভাবে এমন কোনো প্রাণীর ওপর নির্ভর করতে পারে না, যে তার সাথে মানুষের সারসত্তার অংশী নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে মনুর বিধান বৈধ স্ত্রীকে দিয়েছে স্বামীর সাথে একই স্বর্গের প্রতিশ্রুতি।

খ্রিস্টধর্ম, স্ববিরোধীরূপে, বিশেষ এক স্তরে ঘোষণা করেছে পুরুষ ও নারীর সাম্য।

নারীর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম ঘৃণা করে দেহ; নারী যদি দেহ অস্বীকার করে, তাহলে সে ঈশ্বরের জীব, ত্রাতা যাকে পাপমুক্ত করেছে, তখন সে পুরুষের থেকে কম নয় : নারী তখন আসন পায় পুরুষের পাশে, স্বর্গের সুখের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে যারা, সে-সব পুণ্যাত্মার মধ্যে। পুরুষ ও নারী উভয়ই বিধাতার দাস, অনেকটা দেবদূতদের মতো অলৈঙ্গিক, এবং একত্রে তারা বিধাতার করুণায় মুক্ত থাকে পার্থিব প্রলোভন থেকে। নারী যদি সম্মত হয় তার পাশবিকতাকে অস্বীকার করতে, তাহলে নারী, যে পাপের প্রতিমূর্তি, সেও তখন হয়ে ওঠে যারা পাপকে জয় করেছে, সেই মনোনীতদের বিজয়ের উজ্জ্বলতম প্রতিমূর্তি। অবশ্য সে-স্বর্গীয় ত্রাতা, যে পাপমুক্ত করে মানুষকে, সে পুরুষ। খ্রিস্ট বিধাতা; কিন্তু মানবমণ্ডলির ওপর রাজত্ব করে এক নারী, কুমারী মেরি। তবে কিছু প্রান্তিক ধর্মগোত্রই নারীর মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে মহাদেবীর প্রাচীন সুযোগসুবিধা ও ক্ষমতা– গির্জা ধারণ ও সেবা করে এক পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার, যাতে পুরুষের উপাঙ্গ হিশেবে থাকাই নারীর জন্যে মানানসই ও বিধেয়। পুরুষের বাধ্য দাসীরূপেই সে হ'তে পারে আশীর্বাদপ্রাপ্ত সেইন্ট। এভাবে মধ্যযুগের অন্তরে জেগে ওঠে পুরুষের জন্যে শুভ নারীর এক অতিশয় সংস্কৃত ভাবমূর্তি : গৌরবে মণ্ডিত হয় খ্রিস্টের মাতার সুপ্রসন্ন মুখভাব। সে হচ্ছে পাপীয়সী হাওয়ার বিপরীত দিক; সে পায়ের নিচে পিষ্ট করে সাপটিকে; সে পাপমুক্তির মধ্যস্থতাকারিণী, যেমন হাওয়া ছিলো নরকদণ্ডের।

মাতারূপেই ভীতিকর ছিলো নারী; তাই মাতার মধ্যেই তাকে মহিমান্বিত করতে হবে ও পরিণত করতে হবে দাসীতে। সবার ওপরে মেরির কুমারীত্বের আছে এক নঞর্থক মূল্য : এটা যে যেটির মাধ্যমে মাংসকে পাপমুক্তি দেয়া হয়েছে, সেটি দৈহিক নয়; এটিকে স্পর্শ বা অধিকার করা হয় নি। একইভাবে এশীয় মহামাতারও কোনো স্বামী ছিলো না : সে সৃষ্টি করেছিলো বিশ্ব এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাজত্ব করেছিলো এর ওপর; সে তার চপলতায় উচ্ছৃঙ্খল হ'তে পারে, কিন্তু মহামাতারূপে কোনো স্ত্রীধর্মী আনুগত্য দিয়ে তার মহিমার লাঘব ঘটে নি। একইভাবে মেরির গায়েও লাগে নি কামের দাগ। রণলিপ্সু মিনার্ভার মতো সে একটি গজদন্ত মিনার, নগরদুর্গ, অজেয় প্রধান দুর্গমিনার। প্রাচীন কালের যাজিকারাও, অধিকাংশ খ্রিস্টীয় সেইন্টের মতো, ছিলো কুমারী : শুভর কাছে উৎসর্গিত নারী উৎসর্গিত হ'তে হবে তার অক্ষত শক্তির মহিমার মধ্যে; তাকে সংরক্ষিত রাখতে হবে তার নারীত্বের সারসত্তা, তার অপরাজিত সংহতির মধ্যে। স্ত্রী হিশেবে মেরির মর্যাদা যদি অস্বীকার করা হয়, সেটা করা হয়েছে এ-লক্ষ্যে যে তার মধ্যে বিশুদ্ধতররূপে উন্নীত করতে হবে নারী মাতাকে। কিন্তু সে গৌরব পাবে তার জন্যে নির্ধারিত অধস্তন ভূমিকা গ্রহণ ক'রে। 'আমি প্রভুর দাসী।' মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম মাতা নতজানু হয় তার পুত্রের কাছে; সে তার নিকৃষ্টতা মেনে নেয় সহজে। পুরুষের এটা চরম বিজয়, যা চরিতার্থ হয়েছে কুমারীতন্ত্রে– এটা নারীর পরাজয় সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নারীর পুনর্বাসন। ইশতার, আস্তারতে, সিবিলে ছিলো নিষ্ঠুর, খামখেয়ালপূর্ণ, কামনাপরায়ণ; তারা ছিলো ক্ষমতাশালী। তারা যেমন ছিলো মৃত্যুর তেমনি জীবনের উৎস, পুরুষ জন্ম দিয়ে তারা পুরুষকে করেছিলো নিজেদের দাস। খ্রিস্টধর্মে জীবন ও মৃত্যু শুধু ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল, এবং পুরুষ

একবার মায়ের দেহ থেকে বেরিয়ে চিরকালের জন্যে মুক্তি পেয়ে গেছে দেহ থেকে; মা এখন অপেক্ষায় আছে শুধু তার অস্থিমালার। প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ হিশেবে মাতৃত্ব আর নারীকে কোনো ক্ষমতা দান করে না। তাই নারী যদি তার আদিদোষ থেকে উদ্ধার চায়, তাহলে তার জন্যে আছে শুধু বিধাতার ইচ্ছের কাছে মাথা নত করা, যা তাকে অধীনস্থ করে পুরুষের। এবং এ-বশ্যতাস্বীকারের মধ্য দিয়েই সে পুরুষের পুরাণে পেতে পারে একটি নতুন ভূমিকা। যখন সে আধিপত্য করতে চেয়েছে, তখন তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে দেয়া হয়েছে বিশেষ আকার, করা হয়েছে পদদলিত এবং যতোদিন সে সুস্পষ্টভাবে অধিকার ত্যাগ না করবে, ততোদিন তাকে দেয়া যেতে পারে শুধু অনুগত দাসীর মর্যাদা। সে তার আদিম গুণগুলোর কোনোটিই হারাচ্ছে না, শুধু এগুলো সংকেত হিশেবে উল্টে যাচ্ছে; সেগুলো অশুভ সংকেত থেকে হয়ে ওঠে শুভ সংকেত; কৃষ্ণ যাদু রূপান্তরিত হয় শ্বেততে। দাসী হিশেবে নারীকে দেয়া হয়েছে অতিশয় জমকালো দেবীত্বলাভের অধিকার।

এবং নারীকে যেহেতু বশ মানানো হয়েছে মাতারূপে, তাই সর্বপ্রথম তাকে লালন ও সম্মান করা হয় মাতারূপে। পরিবারে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, বিধিবিধান ও প্রথার সাথে খাপ খাইয়ে, মাতা হয়ে উঠেছে শুভর অমনা প্রতিমূর্তি : যে-প্রকৃতির সে আংশিক অংশীদার, সে-প্রকৃতি হয়ে উঠেছে শুভ, তা আর চেতনার শত্রু নয়; আর যদি সে রহস্যময়ও থাকে, তবে তার রহস্যটা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ম্যাডোনাদের মতো সুস্মিত রহস্য। পুরুষ নারী হ'তে চায় না, কিন্তু সে স্বপ্ন দেখে অস্তিত্বশীল সব কিছু– এই নারীসহ, সে যা নয়– নিজের মধ্যে জড়িয়ে ধরার; মাতৃপুজোর মধ্য দিয়ে পুরুষ অধিকার করতে চায় তার অদ্ভুত সম্পদরাশি।

পার্কের প্রাচীন পুরাণের মতো মাতা জড়িয়ে থাকে মৃত্যুর সাথে; মৃতকে সৎকারের জন্যে প্রস্তুত করার কাজটি করতে হয় তাকেই, মৃতের জন্যে শোকপালনও করতে হয় তাকেই। তবে তার কাজ হচ্ছে জীবনের, সমাজের, সকলের মঙ্গলের সাথে মৃত্যুর সামঞ্জস্য বিধান। এবং তাই সুশৃঙ্খলভাবে উৎসাহিত করা হয় 'বীরমাতা'তন্ত্র : সমাজ যদি মাতাদের সম্মত করাতে পারে তাদের পুত্রদের মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করতে, তাহলে সমাজ বোধ করে যে তাদের হত্যা করার অধিকার তার আছে। মাতার যেহেতু প্রভাব আছে তার পুত্রদের ওপর, তাই মাতাকে হাতে রাখা সমাজের জন্যে বিশেষ সুবিধাজনক : এ-কারণেই মাতাকে ঘিরে দেয়া হয় শ্রদ্ধার অজস্র নিদর্শনে, তাকে ভূষিত করা হয় সমস্ত গুণাবলিতে, তাকে নিয়ে গ'ড়ে ওঠে একটা ধর্ম। তাকে করা হয় নৈতিকতার অভিভাবক; সে পুরুষের দাসী, যারা ক্ষমতাশালী হবে তাদের সে দাসী, সে তার সন্তানদের সুকোমলভাবে পরিচালিত করে বিধিবদ্ধ পথে। যে-সমাজ যতোবেশি দৃঢ় আশাবাদী, সেটি ততো বশমানাভাবে অনুগত হয় এ-অমায়িক কর্তৃত্বের কাছে, আর মাতা ততোবেশি লাভ করে আদর্শায়িত রূপ। মাতাকে গৌরবান্বিত করা হচ্ছে জন্ম, জীবন, ও মৃত্যুকে একই সময়ে তাদের পাশবিক ও সামাজিক রূপে গ্রহণ করা, এর কাজ প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গতি ঘোষণা। এ-সংশ্লেষণের স্বপ্ন দেখেছিলেন ব'লে অগাস্ত কোঁৎ নারীকে করেছিলেন ভবিষ্যৎ মানবজাতির দেবী। কিন্তু একই বিবেচনা সব বিপ্লবীকেই উদ্বুদ্ধ করে মাতৃমূর্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে; তাকে অবজ্ঞা ক'রে

তারা প্রত্যাখ্যান করে *স্টেটাস কৌ*, বিধিবিধান ও প্রথার অভিভাবকরূপে মাতার মাধ্যমে সমাজ যা চাপিয়ে দিতে চায় তাদের ওপর।

যে-ভক্তিশ্রদ্ধা জ্যোতিশ্চক্রের মতো ঘিরে থাকে মাতাকে, তাকে ঘিরে থাকে যে-নিষেধাবলি, সেগুলো চাপা দিয়ে রাখে সে-শত্রুতাপূর্ণ ঘৃণা, যা স্বতস্ফূর্তভাবে মিশ্রিত থাকে তার জাগানো দৈহিক কোমলতার সাথে। তবে এক ধরনের মাতৃভীতি টিকেই আছে। এটা উল্লেখ করা কৌতূহলজনক হবে যে মধ্যযুগ থেকেই আছে একটি গৌণ কিংবদন্তি, যাতে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পায় এ-ঘৃণা : সেটি হচ্ছে শাশুড়ীর কিংবদন্তি। উপকথা থেকে ভোদভিল পর্যন্ত স্ত্রীর মাতার মধ্য দিয়ে পুরুষ অবজ্ঞা করে মাতৃত্বকে, এবং স্ত্রীর মাতাকে রক্ষা করার জন্যে কোনো ট্যাবু নেই। যে-নারীকে সে ভালোবাসে, তাকে জন্ম লাভ করতে হয়েছে, এটা ভাবতেই অপছন্দ করে পুরুষ : তার শাশুড়ী হচ্ছে সে-জরাগ্রস্ততার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ, কন্যাকে জন্ম দিয়ে যা সে নির্ধারিত ক'রে রেখেছে নিজের কন্যার জন্যে। তার মেদ ও চামড়ার ভাঁজ জানিয়ে দেয় যে তরুণী নববধুর জন্যেও অপেক্ষা ক'রে আছে এ-মেদ ও ভাঁজ, তার ভবিষ্যৎ লাভ ক'রে আছে এমন শোকাবহ রূপ।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে তার ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বামীর অধীন হয়ে 'সতী স্ত্রী' হয়ে ওঠে পুরুষের অতিশয় মূল্যবান সম্পদ। সে এতো গভীরভাবে স্বামীর অধিকারে থাকে যে সে অংশী হয়ে ওঠে স্বামীর একই সারসত্তার; সে পায় স্বামীর নাম, স্বামীর দেবতা, এবং স্বামী নেয় তার দায়দায়িত্ব। স্বামী তাকে বলে তার 'অর্ধাঙ্গিনী'। স্বামী যেমন তার গৃহ, জমিজমা, পশুপাল, ধনসম্পদ নিয়ে গর্ব বোধ করে, তেমনি সে গর্ব বোধ করে স্ত্রী নিয়েও, এবং কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি; তার মাধ্যেমে স্বামী বিশ্বের কাছে দেখায় নিজের ক্ষমতা : সে হচ্ছে স্বামীর আদর্শ পরিমাপ এবং পার্থিব অংশ। প্রাচ্যদেশীয় দৃষ্টিতে নারীকে হ'তে হয় স্থূলকায় : লোকেরা দেখতে পায় যে সে বেশ পরিপুষ্ট এবং তার প্রভু ও মালিককে সে ভক্তি করে। কোনো মুসলমানের যেতো বেশি স্ত্রী থাকে এবং তারা যতোবেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়, তার সম্বন্ধে পোষণ করা হয় ততো ভালো ধারণা। বুর্জোয়া সমাজে নারীকে দেয়া হয় একটি ভূমিকা যে তাকে *খাসা দেখাতে* হবে : তার রূপ, মনোহারিত্ব, বুদ্ধি, মার্জিতভাব হচ্ছে তার স্বামীর ধনসম্পদের বাহ্যিক ও দর্শনীয় চিহ্ন, যেমন চিহ্ন তার গাড়ির ক্রেতা-নির্দেশিত গঠন। যদি স্বামী ধনী হয়, তাহলে সে স্ত্রীকে ঢেকে দেয় পশমে ও রত্নে; যদি ততো ধনী না হয়, তাহলে সে গর্ব করে স্ত্রীর নৈতিকতা ও গৃহিণীপনার। অতিশয় নিঃস্বও যদি তাকে সেবা করার জন্যে পেয়ে থাকে কোনো নারী, তাহলে সেও বিশ্বাস করে যে জগতে সেও কিছুর মালিক : *দি টেমিং অফ দি শ্রু* নায়ক সব পাড়াপ্রতিবেশীকে ডেকে আনে সে কতোটা প্রভুত্বের সাথে পরাভূত করতে পারে তার স্ত্রীকে, তা দেখানোর জন্যে। সব পুরুষই স্মরণ করিয়ে দেয় রাজা কাঁদুলেকে : সে তার স্ত্রীকে প্রদর্শন করে, কেননা সে বিশ্বাস করে যে এভাবেই সে প্রচার করছে তার নিজের গুণাবলি।

কিন্তু নারী শুধু পুরুষের সামাজিক শ্লাঘাকে ফুলিয়ে তোলে না; সে পুরুষের আরো আন্তর শ্লাঘার উৎস। নারীর ওপর আধিপত্যে সে আনন্দ পায়; লাঙলের ফাল খুঁড়ছে

হলরেখা এ-বাস্তবসম্মত প্রতীকের ওপর– যখন নারী একজন ব্যক্তি– চাপিয়ে দেয় আরো আধ্যাত্মিক প্রতীক : স্বামী তার স্ত্রীকে শুধু কামগতভাবে 'গঠন' করে না, করে নৈতিক ও মননগতভাবেও; স্বামী তাকে শিক্ষা দেয়, তার মূল্যায়ন করে, তার ওপর মারে নিজের ছাপ। যে-সমস্ত স্বপ্নে পুরুষ আনন্দ পায়, তার একটি হচ্ছে তার ইচ্ছেয় জিনিশপত্র রঞ্জিত করা– তাদের গঠনকে বিশেষ রূপ দিতে, তাদের উপাদানকে বিদ্ধ করতে। নারী হচ্ছে *সর্বোচ্চ মাত্রায়* 'তার হাতের কর্দম', যার ওপর অক্রিয়ভাবে ক্রিয়া করা যায় এবং যাকে আকৃতি দেয়া যায়; আত্মসমর্পণ করতে করতে নারী বাধা দিতে থাকে, তার ফলে পুরুষের কাজ চলতে থাকে অনির্দিষ্ট কাল ধ'রে।

খ্রিস্টধর্মের জন্ম থেকে নারীর দেহকে কীভাবে আধ্যাত্মিক ক'রে তোলা হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে। পুরুষ নারীর মাধ্যমে উপভোগ করতে চায় যে-সৌন্দর্য, উষ্ণতা, অন্তরঙ্গতা, সেগুলো আর শরীরী গুণাবলি নয়; বস্তুর অব্যবহিত ও উপভোগ্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করার বদলে নারী হয়ে ওঠে তাদের আত্মা; শরীরী রহস্যের থেকে গভীর, তার হৃদয়ে এক গোপন ও বিশুদ্ধ উপস্থিতি প্রতিফলিত করে বিশ্বের সত্য। সে গৃহের, পরিবারের, বাড়ির আত্মা। এবং সে নগর, রাষ্ট্র, জাতির মতো বৃহত্তর সংঘগুলোর আত্মা। ইয়ুং বলেছেন নগরকে সব সময়ই সম্পর্কিত করা হয়েছে মায়ের সাথে, কেননা তারা বক্ষে ধারণ করে নগরবাসীদের : তাই সিবিলেকে রূপায়িত করা হয় সৌধের মুকুটপরা মূর্তিতে। এবং এভাবে বলা হয় 'মাতৃভূমি'; তবে জীবন লালনকারী মাটিরই শুধু নয়, নারী প্রতীক আরো সূক্ষ্ম বাস্তবতার। পুরোনো বাইবেল ও আপকালিপসে জেরুজালেম ও ব্যাবিলন শুধু মা নয় : তারা স্ত্রীও। আছে অনেক কুমারী নগর, এবং বাবেল ও ট্রয়ের মতো বেশ্যাস্বভাবা নগর। এজন্যে ফ্রান্সকে বলা হয়েছে 'গির্জার জ্যেষ্ঠা কন্যা'; ফ্রান্স ও ইতালি হচ্ছে লাতিন বোন। পুরুষেরা যে বিভিন্ন স্থানকে নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত করে, তা বিশুদ্ধভাবে প্রতীকধর্মী নয় : অনেক পুরুষ আবেগগতভাবেই এটা অনুভব করে। অধিকাংশ সময়ই ভ্রমণকারী তার ভ্রমণের দেশের চাবি খোঁজে নারীর মধ্যে : সে যখন কোনো ইতালীয় বা স্পেনীয় নারীকে আলিঙ্গনে বাঁধে, তার মনে হয় সে অধিকার করেছে ইতালি বা স্পেনের সুগন্ধি সারসত্তা। 'যখন আমি কোনো নতুন নগরে যাই, সব সময়ই আমি শুরু করি কোনো বেশ্যালয়ে গিয়ে,' মন্তব্য করেছেন এক সাংবাদিক। যদি একটি দারুচিনি চকোলেট জিদের কাছে মেলে ধরতে পারে সমগ্র স্পেনকে, তাহলে অদ্ভুত মদির ওষ্ঠের চুম্বন প্রেমিককে দেয় তার সমস্ত পশুপাখিউদ্ভিদ, তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ একটি সম্পূর্ণ দেশ। নারী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বা আর্থনীতিক সম্পদগুলোর সারাংশ ধারণ করে না; কিন্তু সে যুগপৎ প্রতিমূর্তি তাদের সম্পদের মর্মবস্তু ও অতীন্দ্রিয় মানার। খ্রিস্টান বিশ্ব বনদেবী ও পরীর স্থানে বসিয়েছে অনেক কম শরীরী উপস্থিতিকে; তবে গৃহ, ভূখণ্ড, নগর, এবং ব্যক্তিদের ভেতরে এখনো আনাগোনা করে স্পর্শাতীত নারীত্ব।

এ-সত্য, বস্তুর রাত্রিতে ঢাকা, আকাশেও জ্বলে দীপ্তভাবে; বিশুদ্ধভাবে সীমাবদ্ধ, তবে আত্মা আবার একই সময়ে সীমাতিক্রমণতা, ভাববস্তু। শুধু নগর ও জাতিই নয়, প্রতিষ্ঠানের মতো বিমূর্ত ব্যাপারগুলোও নারীত্বের গুণাবলিতে ভূষিত : গির্জা, সিনেগগ, প্রজাতন্ত্র, মানবজাতি নারী; শান্তি, যুদ্ধ, স্বাধীনতা, বিপ্লব, বিজয়ও তাই। নারী হচ্ছে

আত্মা ও ভাব, তবে সে এদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারিণীও : সে হচ্ছে স্বর্গীয় করুণা, খ্রিস্টধর্মীকে যে পথ দেখিয়ে নেয় ঈশ্বরের দিকে, সে বিয়াত্রিসে, যে দান্তেকে পথ দেখিয়ে নেয় দূরান্তরে, সে লরা, যে পেত্রার্ককে ডাকে কবিতার উচ্চতম শিখরের দিকে। যে-সব মতবাদ সমন্বিত করে প্রকৃতি ও চেতনাকে, সেগুলোতে সে দেখা দেয় সঙ্গতি, যুক্তিশীলতা, সত্য রূপে। নস্টিক ধর্মগোত্রগুলো প্রজ্ঞাকে দিয়েছিলো নারীরূপ, সোফিয়া, যার কাজ বিশ্বকে এবং এমনকি তার সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করা। এখানে নারীকে আমরা আর মাংসরূপে দেখতে পাই না, দেখি মহিমান্বিত বস্তুরূপে; সে আর অধিকৃত হওয়ার নয়, বরং ভক্তি করতে হবে তাকে তার অক্ষুণ্ন গৌরবে; পোর মলিন মৃতরা জল, বায়ু, স্মৃতির মতো তরল; শিভলরীয় প্রেমে, *লে প্রেসিওতে*, এবং রোমান্সের সমগ্র ধারা ভ'রে, নারী আর কোনো পাশব জীব নয়, বরং সে এক বায়বীয় সত্তা, প্রশ্বাস, শিখাহীন দীপ্তি। এভাবেই নারী নিশীথের অনচ্ছতা রূপান্তরিত হয় স্বচ্ছতায়, এবং খলতা রূপান্তরিত হয় শুদ্ধতায়।

নারীর নিম্নমুখি প্রভাব যায় পাল্টে; সে আর পুরুষকে পৃথিবীর দিকে ডাকে না, ডাকে আকাশের দিকে। *ফাউস্ট*-এর শেষভাগে এটা ঘোষণা করেন গ্যেটে :

> শাশ্বতী নারী
> ইশারা করে আমাদের উর্ধ্ব অভিমুখে।

কুমারী মেরি যেহেতু সবচেয়ে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত ও সাধারণভাবে পূজিত নারী ভাবমূর্তি, যে উৎসর্গিত শুভর কাছে, তাই সে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সাহিত্য ও চিত্রকলায়, সেটা দেখা হবে বেশ আকর্ষণীয়। নিচে উদ্ধৃত হলো মেরির উদ্দেশে নিবেদিত মধ্যযুগের এক ঐকান্তিক খ্রিস্টধর্মীর প্রার্থনাগীত :

> ... অতিশয় মহৎ কুমারী, তুমি উর্বর শিশির, আনন্দের ফোয়ারা, করুণার প্রণালি, প্রাণময় জলের কূপ যা শীতল করে আমাদের অনুভূতির উত্তাপ।
> তুমি সেই স্তন যা ঈশ্বর পান করতে দিয়েছে অনাথদের...
> তুমি সেই মজ্জা, ক্ষুদ্র কণা, সমস্ত ভালো জিনিশের শাঁস,
> তুমি সেই প্রতারণাহীন নারী যার প্রেম কখনো বদলায় না...
> তুমি সেই সূক্ষ্ম চিকিৎসক যার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না সালেরনো বা মঁতপেলিয়েরে...
> তুমি নিরাময় হাতের নারী... তুমি হাঁটাও পক্ষাঘাতগ্রস্তদের, তুমি সংশোধন করো হীনকে, তুমি বাঁচিয়ে তোলো মৃতকে।

এসব আবাহনে আমরা আবার দেখতে পাই আমাদের আলোচিত নারীর অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য। কুমারী মেরি হচ্ছে উর্বরতা, শিশির, জীবনের নির্ঝর; বহু ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তিতে তাকে দেখা যায় কুয়ো, নির্ঝর, ফোয়ারার পাশে; একটি বহুলব্যবহৃত পদ হচ্ছে 'জীবনের ফোয়ারা'; সে সৃষ্টিশীল নয়, তবে সে ফলবতী করে, যা মাটির নিচে গুপ্ত ছিলো, সেগুলোকে সে বিকশিত করে দিনের আলোতে। সে হচ্ছে বস্তুর প্রতিভাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীর বাস্তবতা : শাঁস, মজ্জা। তার মাধ্যমে বাসনা প্রশমিত হয় : সে তাই, যা পুরুষের পরিতৃপ্তির জন্যে দেয়া হয়েছে পুরুষকে। সে নিরাময় করে ও বলশালী করে; সে মানুষ ও জীবনের সঞ্চারিকা; জীবন আসে ঈশ্বরের কাছে থেকে, সুতরাং সে মানবজাতি ও ঈশ্বরের সঞ্চারিকা। তারতুলিয়ান তাকে বলেছিলেন

'শয়তানের প্রবেশদ্বার'; কিন্তু, মহিমান্বিত রূপ লাভ ক'রে, সে হয়ে উঠেছে স্বর্গের প্রবেশদ্বার। চিত্রকলায় আমরা তাকে দেখতে পাই যে সে খুলছে স্বর্গের দিকের কোনো দরোজা বা জানালা, বা মই স্থাপন করছে পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের মাঝখানে। তাকে আরো সরাসরি দেখানো হয় প্রবক্তারূপে, যে মানুষের জন্যে ওকালতি করছে তার পুত্রের কাছে, এবং শেষবিচারের দিনে, বক্ষ নগ্ন ক'রে, দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তার গৌরবান্বিত মাতৃত্বের নামে প্রার্থনা করছে খ্রিস্টের কাছে। সে রক্ষা করে শিশুদের, এবং তার করুণাময় প্রেম সব বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে মানুষকে অনুসরণ করে সমুদ্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে। সে স্বর্গীয় ন্যায়বিচারকে দুলিয়ে সুস্মিত হাসিতে ভারি ক'রে তোলে দাঁড়িপাল্লার দয়ার দিক।

এ-করুণা ও কোমলতার ভূমিকা নারীকে দেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলোর একটি। যখন নারী পরিপূর্ণরূপে সংহত হয়ে যায় সমাজের সাথে তখনও সে সূক্ষ্মভাবে প্রসারিত করে তার সীমা, কেননা তার আছে জীবনের বিশ্বাসঘাতক মহানুভবতা। পুরুষ দেবতারা নির্দেশ করে নিয়তি; দেবীদের মধ্যে দেখা যায় স্বেচ্ছাচারী হিতাকাঙ্ক্ষা, লীলাময় অনুগ্রহ। খ্রিস্টীয় বিধাতা সুবিচারের কঠোরতায় পরিপূর্ণ, কুমারী পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্যের বদান্যতায়। পৃথিবীতে পুরুষেরা রক্ষাকারী আইন, যুক্তিশীলতা, প্রয়োজনের। নারী নিরাময় করে পুরুষের ক্ষত, সে লালনপালন করে নবজাত শিশু, এবং সৎকারের জন্যে প্রস্তুত করে মৃতকে। কবিতার কাজ হচ্ছে যা আছে প্রতিদিনের গদ্য পেরিয়ে, তাকে ধরা; এবং নারী হচ্ছে বিশেষভাবে এক কাব্যিক বাস্তবতা, কেননা পুরুষ তার ওপর প্রক্ষেপ করে সে-সব, যা সে হ'তে চায় না। নারী প্রতিমূর্তিত করে স্বপ্নকে, পুরুষের কাছে যা সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও সবচেয়ে অদ্ভুত।

নারী যেহেতু পুরুষের কাব্যকর্মের একান্ত বিষয়, তাই বোঝা যায় যে নারী দেখা দেবে পুরুষের প্রেরণারূপে : কাব্যদেবীরা নারী। কাব্যদেবী মধ্যস্থতা করে স্রষ্টা ও তার প্রাকৃতিক নির্ঝরগুলোর মধ্যে, যা থেকে আহরণ করতে হয় তাকে। নারীর চেতনা গভীরভাবে প্রকৃতির ভেতরে মগ্ন, এবং তার মাধ্যমেই পুরুষ জানার চেষ্টা করে নৈঃশব্দ্যের গভীরতার ও রাত্রির উর্বরতার অভিপ্রায়। কাব্যদেবী নিজে কিছুই সৃষ্টি করে না; সে এক শান্ত, বিজ্ঞ সিবিলে, যে বশ মেনে নিজেকে সমর্পণ করেছে এক প্রভুর সেবায়। মূর্ত ও বাস্তবিক এলাকায় তার উপদেশ হবে অসার। পুরুষ চায় নারীর 'বোধি' যেমন সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে তারামণ্ডলকে। এ-ধরনের 'বোধি'কে সঞ্চারিত করা হয় এমনকি ব্যবসা ও রাজনীতিতে : আস্পাসিয়া ও মাদাম দ্য মঁতেনোঁ আজো সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের পেশা।

পুরুষ অন্য যে-একটি এলাকায় দায়িত্ব দেয় নারীকে, সেটি মূল্যায়নের এলাকা; নারী এক বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত বিচারক। পুরুষ অপর-এর স্বপ্ন দেখে শুধু তাকে অধিকার করার জন্যে নয়, তার দ্বারা অনুসমর্থিত হওয়ার জন্যেও; অন্য পুরুষদের দ্বারা, তার সমকক্ষদের দ্বারা অনুসমর্থিত হওয়ার জন্যে পুরুষকে থাকতে হয় স্থায়ী মানসিক চাপের মধ্যে; তাই সে চায় বাইরে থেকে বিবেচনা ক'রে কেউ তার জীবনকে, তার কর্মোদ্যোগকে, এবং তাকে ভূষিত করুক ধ্রুব মূল্যে। বিধাতার বিবেচনা গুপ্ত, বৈরি, দুশ্চিন্তাজনক; এমনকি খুব কম সংখ্যক অতীন্দ্রিয় সাধকই এটা

কামনা করেছেন। এ-ঐশ্বরিক ভূমিকা অধিকাংশ সময়ই হস্তান্তরিত হয়ে এসে পড়েছে নারীর ওপর। যেহেতু সে অপর, সে থাকে পুরুষের জগতের বাইরে এবং এটি সে দেখতে পায় বস্তুগতভাবে; এবং পুরুষের কাছে থেকে ও তার অধীনস্থ হয়ে সে পুরুষের বিরোধী কোনো মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করে না। নারী পুরুষের বিগড়ে যাওয়া জগতের বাইরের; তার সমস্ত পরিস্থিতি তার জন্যে নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দর্শকের ভূমিকা। নাইট তার নারীর জন্যে নামে অস্ত্রপ্রতিযোগিতায়; কবি চায় নারীর অনুমোদন। প্যারিস জয়ের অভিযাত্রায় বেরোনোর আগে রাস্তিগনাগ প্রথমে চায় নারী, তবে সে তাদের শারীরিকভাবে অধিকার করতে বিশেষ চায় নি, সে চেয়েছিলো সেই খ্যাতি, যা শুধু নারীরা দিতে পারে পুরুষকে। বালজাক তাঁর নিজের যৌবনের কাহিনী প্রক্ষিপ্ত করেছেন তাঁর তরুণ নায়কদের মধ্যে : সে নিজেকে শিক্ষিত ও রূপায়িত করতে শুরু করে তার থেকে জ্যেষ্ঠ উপপত্নীদের সংস্পর্শে। নারীকে শিক্ষাদাত্রীর ভূমিকা দেয়া হয়েছে ফ্লবেরের *এদিকাসিয়োঁ সাঁতিমাঁতাল*-এ, স্তঁদালের উপন্যাসে, এবং শিক্ষানবিশির আরো অনেক গল্পে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে নারী হচ্ছে *ফিসিস* ও *অ্যান্টি-ফিসিস* : অর্থাৎ সে সমাজের যতোটা প্রতিমূর্তি, প্রকৃতিরও ততোটাই; তার মধ্যেই সাররূপ লাভ করে বিশেষ পর্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যেমন আমরা দেখতে পাই শিভলরির কবিতায়, *দেকামেরন*-এ, *আস্ত্রিতে*। সে সূচনা করে নতুন ফ্যাশনের, নেত্রীত্ব করে সাঁলতে, প্রভাবিত ও প্রতিফলিত করে মতামত। খ্যাতি ও গৌরব হচ্ছে নারী; এবং মালার্মে বলেছেন : 'জনতা হচ্ছে নারী।' তরুণেরা নারীর সাহচর্যের মধ্যে দীক্ষিত হয় 'সমাজ'-এ এবং 'জীবন' নামক জটিল বাস্তবতায়। নারী হচ্ছে সেই বিশেষ পুরস্কার, যা অবধারিতভাবে জয় করে নায়কেরা, অভিযাত্রীরা, এবং কর্কশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা। প্রাচীন কালে আমরা দেখতে পাই পার্সিউস মুক্ত করছে অ্যান্ড্রোমিডাকে, পাতাললোকে অর্ফিউস খুঁজছে ইউরিদিসকে, এবং সুন্দরী হেলেনকে রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছে ট্রয়। শিভলরির উপন্যাসের প্রধান বিষয়ই হচ্ছে বন্দিনী রাজকুমারীদের মুক্ত করার শৌর্যবীর্য। সুন্দর রাজকুমারের কী হতো কাজ যদি সে ঘুম না ভাঙাতো নিদ্রিতা রূপসীর? রাজা বিয়ে করছে রাখালকন্যাকে, এ-উপকথা পুরুষকে যতোটা তৃপ্ত করে, ততোটাই করে নারীদের। ধনী পুরুষ দরকার বোধ করে দান করার, নইলে তার নিরর্থক ধন থেকে যায় এক নিষ্কর্ষ : তার কাছাকাছি কারো থাকা দরকার, যাকে সে দিতে পারে। সিন্ডেরেলা উপকথা বিকাশ লাভ করে বিশেষ ক'রে আমেরিকার মতো ধনী দেশে। সেখানে পুরুষেরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ নারীর পেছনে ব্যয় না ক'রে কী করবে?

এটা স্পষ্ট যে পুরুষ নিজেকে দাতা, মুক্তিদাতা, ত্রাতা, পাপমোচনকারীরূপে স্বপ্ন দেখে কামনা করে তার কাছে নারীর অধীনতা; কেননা নিদ্রিতা রূপসীকে জাগানোর জন্যে তাকে আগে ঘুম পাড়ানো দরকার : বন্দিনী রাজকুমারী থাকতে হ'লে সেখানে থাকতে হবে রাক্ষসখোক্কস। পুরুষ যতোই কঠিন কর্মোদ্যোগের রুচি অর্জন করে, সে ততোই সুখ বোধ করে নারীকে স্বাধীনতা দিতে। তবে উপহার বা মুক্তি দানের থেকে জয় করা অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর।

তাই গড়পড়তা পশ্চিমি পুরুষের কাছে সে-ই হচ্ছে আদর্শ নারী, যে সানন্দে মেনে

নেয় পুরুষের আধিপত্য, যে আলোচনা না ক'রে পুরুষের চিন্তাভাবনা মেনে নেয় না, তবে সে নতি স্বীকার করে পুরুষের যুক্তির কাছে, সে বুদ্ধির সাথে পুরুষকে প্রতিরোধ করে এবং শেষ করে পুরুষের মতে বিশ্বাসী হয়ে। পুরুষের দুঃসাহসিক কাজ যতো বেশি বিপদসঙ্কুল, তার গর্ব ততো বেশি : একটি বশমানা সিন্ডেরেলাকে বিয়ে করার থেকে পেন্থেসিলিয়াকে জয় করা অনেক বেশি তৃপ্তিকর। 'যোদ্ধা ভালোবাসে বিপদ ও আমোদ,' বলেছেন নিটশে; 'তাই সে ভালোবাসে নারী, সব আমোদের মধ্যে যে সবচেয়ে বিপজ্জনক।' যে-পুরুষ বিপদ ও আমোদ পছন্দ করে, সে নারীকে আমাজনে রূপান্তরিত হ'তে দেখে অসন্তুষ্ট হয় না, যদি তার ভেতরে আশা জেগে থাকে যে সে পরাভূত করতে পারবে নারীটিকে। তার অন্তরের অন্তস্তলে সে যা পোষণ করে, তা হচ্ছে এ-যুদ্ধ তার জন্যে হবে এক খেলা, আর নারীর জন্যে হবে একান্ত নিয়তি। সে ত্রাতা বা বিজয়ী যাই হোক, পুরুষের প্রকৃত বিজয় হচ্ছে : নারী তাকে সানন্দে স্বীকার ক'রে নেবে নিজের নিয়তি ব'লে।

নারীকে মাঝেমাঝেই তুলনা করা হয়েছে জলের সাথে; সে হচ্ছে আয়না, যাতে পুরুষ, নার্সিসাসধর্মী, নিবিষ্টভাবে দেখে নিজেকে : সরল বিশ্বাসে বা প্রতারণার জন্যে সে হেলে পড়ে নারীর দিকে। নারী হচ্ছে তার জন্যে পরম ক্ষতিপূরণ, কেননা তার কাছে অচেনা এক আকৃতিতে, যা সে অধিকার করতে পারে নারীর মাংসে, নারী হচ্ছে তার নিজের দেবত্ব-অর্জন। সে আলিঙ্গন করে এ- অতুলনীয় দানবী'টিকে, যখন সে নিজের বাহুতে বাঁধে সে-সত্তাটিকে, যে তার কাছে বিশ্বের সারসংক্ষেপ এবং যার ওপর সে চাপিয়ে দিয়েছে তার মূল্যবোধ ও বিধিবিধান। তারপর, সে নিজের ক'রে নিয়েছে যে-অপরকে, তার সাথে মিলিত হ'তে গিয়ে সে আশা পোষণ করে নিজের মধ্যে পৌছোতে। সম্পদ, শিকার, আমোদ ও বিপদ, সেবিকা, পথপ্রদর্শক, বিচারক, মধ্যস্থতাকারিণী, আয়না, নারী হচ্ছে সেই অপর, যার মধ্যে কর্তা সীমাবদ্ধ না থেকে করে নিজের সীমাতিক্রমণ, যে তার বিরোধিতা করে তাকে অস্বীকার না ক'রে; তাই পুরুষের সুখ ও বিজয়ের জন্যে নারী এতো প্রয়োজনীয় যে বলা যেতে পারে যদি নারী না থাকতো, তাহলে পুরুষ তাকে আবিষ্কার করতো।

তারা তাকে আবিষ্কার করেছে। 'পুরুষ সৃষ্টি করেছে নারী, এবং কী দিয়ে? তার দেবতার পাঁজরের, তার আদর্শের একটি অস্থি দিয়ে,' *দি টুইলাইট অফ দি গড্স্*-এ বলেছেন নিটশে। কিন্তু নারী আছে তাদের আবিষ্কারশক্তি থেকে দূরেও। এবং তাই সে শুধু পুরুষের স্বপ্নের প্রতিমূর্তিই নয়, তার হতাশাও। এমন কোনো অলঙ্কৃত ভাবমূর্তি নেই নারীর, যা সাথে সাথে তার বিপরীত রূপকে স্মরণ করিয়ে দেয় না : সে জীবন ও মৃত্যু, প্রকৃতি ও ছল, দিবালোক ও রাত্রি। যে-বৈশিষ্ট্যেই আমরা তাকে বিবেচনা করি না কেনো, আমরা দেখতে পাই একই এগোনো ও পিছোনো, কেননা পরিহার্য দরকারবশতই ফিরে আসে অপরিহার্যের কাছে। কুমারী মেরি ও বিয়াত্রিসের আদর্শরূপের মধ্যে আজো বেঁচে আছে হাওয়া ও সির্সি।

যেহেতু নারী এক মিথ্যে অসীমতা, সত্যতাহীন এক আদর্শ, তাই সে দেখা দেয় সসীমতা ও মাঝারিত্ব রূপে, এবং একই কারণে, মিথ্যাচারিতারূপে। লাফর্গে সে দেখা দেয় এভাবেই। ওফেলিয়া, সালোমে আসলে নিতান্তই *খর্ব নারী*। নারী স্বপ্ন দেখায়

পুরুষকে; তবু নারী আরামের কথা ভাবে, রাতের খাবারের জন্যে ভাবে স্টিউর কথা; পুরুষ তার কাছে যখন তার আত্মার কথা বলে, তখন সে নিতান্তই এক শরীর।

পুরুষ সফল হয়েছে নারীকে দাসী বানাতে; তবে একই মাত্রায় পুরুষ তাকে বঞ্চিত করেছে সে-জিনিশ থেকে, যার জন্যে তাকে অধিকারে আনা মনে হয়েছে কাম্য। পরিবারে ও সমাজে সংহত হয়ে নারীর যাদু রূপান্তরিত না হয়ে অপচয়িত হয়ে গেছে; যে ছিলো প্রকৃতির সমস্ত সম্পদের প্রতিমূর্তি, দাসীর পর্যায়ে নেমে গিয়ে সে আর আগের সেই অজেয় শিকার থাকে নি। শিভলরীয় প্রেমের উদ্ভব থেকে একটি গতানুগতিক কথা হচ্ছে যে বিয়ে হত্যা করে প্রেম। নিদারুণ অবজ্ঞার পাত্র হয়ে, অতিশয় ভক্তি পেয়ে, অতিশয় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে, স্ত্রী হারিয়ে ফেলেছে তার কামের আবেদন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মূল লক্ষ্য ছিলো নারীর কবল থেকে পুরুষকে রক্ষা করা; নারী হয়ে ওঠে পুরুষের সম্পত্তি। কিন্তু আমরা যে-সবের মালিক সে-সবও হয়ে ওঠে আমাদের মালিক, এবং বিয়ে পুরুষের জন্যেও এক ধরনের দাসত্ব। সে ধরা পড়ে প্রকৃতির পাতা ফাঁদে : যেহেতু সে চেয়েছে একটি টাটকা তরুণী, তাই তাকে জীবনভর ভরণপোষণ করতে হয় একটি ভারি মেয়েলোককে বা একটি শুঁটকি বুড়ীকে। তার অস্তিত্বকে অলঙ্কৃত করার সুকুমার রত্নটি হয়ে ওঠে এক ঘৃণ্য বোঝা : জানতিপ্পি ধরনের নারী চিরকালই পুরুষের কাছে ভীতিকর; প্রাচীন গ্রিসে ও মধ্যযুগে সে হয়ে উঠেছিলো বহু বিলাপের বিষয়বস্তু। কিন্তু নারী যখন তরুণী, তখনও বিয়েতে থাকে এক ধোঁকাবাজি, কেননা কামের সামাজিকীকরণ করতে গিয়ে এটি সফল হয় শুধু কামকে হত্যা করতে।

ঘটনা হচ্ছে যে কাম জানায় সময়ের বিরুদ্ধে মুহূর্তের, দলের বিরুদ্ধে ব্যক্তির দাবি; এটা যোগাযোগের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করে বিচ্ছিন্নতা; এটা সব বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এর মধ্যে আছে সমাজের বিরোধী নীতি। প্রথা কখনোই পুরোপুরি নত হয় নি সংস্থা ও বিধিবিধানের কাছে; প্রেম সব সময়ই দেখিয়েছে অবাধ্যতা। গ্রিসে ও রোমে ইন্দ্রিয়াতুর রূপে প্রেম চালিত হয়েছিলো তরুণ ও পতিতাদের দিকে; শিভলরীয় প্রেম, যা ছিলো যুগপৎ শারীরিক ও প্লাতোয়ী, সব সময়ই তার লক্ষ্য ছিলো পরকীয়া। *ত্রিস্তান* হচ্ছে ব্যভিচারের মহাকাব্য। যে-পর্বে, ১৯০০র দিকে, সৃষ্টি হয় নারীর নতুন কিংবদন্তি, তখন ব্যভিচার বিষয় হয়ে ওঠে সমস্ত সাহিত্যের। ব্যভিচার লোপ পেতে পারে শুধু বিয়ের সাথে। যেহেতু বিয়ের একটি লক্ষ্য হচ্ছে *তার নিজের* স্ত্রীর থেকে পুরুষকে অনাক্রম্য করা : কিন্তু অন্য নারীরা– স্বামীর জন্যে– ছড়িয়ে রাখে তাদের উচ্চণ্ড আবেদন; এবং তাদের দিকেই সে এগোয়। নারীরা এতে সহযোগী ক'রে তোলে নিজেদের। এর কারণ বস্তুর এমন বিন্যাসের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে, যা তাদের বঞ্চিত করতে চায় তাদের অস্ত্র থেকে। নারীকে দেয়া হয়েছে শুধু বন্দিনী হওয়ার স্বাধীনতা; সে শুধুই প্রাকৃতিক বস্তু হিশেবে নিজের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রত্যাখ্যান করে এ-মানবিক সুবিধা। দিনভর দুরাচারিণীরূপে সে পালন করে তার বশমানা দাসীর ভূমিকা, কিন্তু রাতে সে রূপান্তরিত হয় বেড়ালীতে, বা হরিণীতে; সে আবার ঢুকে পড়ে তার সাইরেনের চামড়ার ভেতরে, বা কোনো ঝাঁড়ুতে চ'ড়ে যাত্রা করে শয়তানের নৃত্যোৎসবের দিকে। কখনো কখনো সে তার নিজের স্বামীর ওপরই

প্রয়োগ করে তার নৈশ ইন্দ্রজাল; তবে তার প্রভুর কাছে থেকে তার রূপান্তররাশি লুকিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ; তাই তার নিয়তিই হচ্ছে অসতীত্ব : এটাই তার মুক্তির একান্ত মূর্তরূপ। এমনকি তার কামনা, চিন্তা, সচেতনা পেরিয়ে সে অবিশ্বাসিনী; যেহেতু তাকে গণ্য করা হয় বস্তু হিশেবে, তাই সে নিবেদিত হ'তে পারে যে তাকে অধিকার করতে সম্মত, এমন যে-কোনো কর্তার কাছে। হারেমে বন্দী থেকে, অবগুণ্ঠনের আড়ালে গুপ্ত থেকেও নিশ্চিত নয় যে সে কারো ভেতরে কামনা জাগিয়ে তুলবে না; এবং কোনো অপরিচিতের মনে কামনা জাগানো হচ্ছে স্বামী ও সমাজকে প্রত্যাখ্যান করা। অধিকাংশ সময়ই সে এ-দুষ্কর্মের আগ্রহী সহযোগী; শুধু প্রতারণা ও ব্যভিচারের মধ্য দিয়েই সে প্রমাণ করতে পারে যে সে কারো অস্থাবর সম্পত্তি নয়। স্বামীর ঈর্ষা কেনো এতো দ্রুত জেগে ওঠে তার কারণ এ-ই; উপকথায় দেখতে পাই অকারণেই সন্দেহ করা হয় নারীদের, তুচ্ছতম সন্দেহে, ব্রাবাঁতের জেনেভিয়েভ ও দেসদিমোনার মতো, দণ্ডিত করা হয় তাদের। এমনকি যখন কোনো সন্দেহ দেখা দেয় নি, তখনও গ্রিসেলদাকে যেতে হয়েছে কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে; এ-কাহিনী হতো উদ্ভট যদি নারীদের আগে থেকেই সন্দেহ করা না হতো; তার অপরাধ প্রমাণের কোনো কথাই ওঠে না : তার সতীত্ব প্রমাণের দায়িত্ব তারই।

ঈর্ষা কেনো চির-অতৃপ্ত, তার কারণ এ-ই। আমরা দেখেছি যে অধিকার কখনোই সদর্থকভাবে বাস্তবায়িত হ'তে পারে না; যদি আর সকলকেও সেখানে ডুব দিতে নিষিদ্ধ করা হয়, তবু যে-ঝরনাধারায় তার তৃষ্ণা মেটে সে তার মালিক হয় না : যে ঈর্ষাকাতর, সে এটা জানে ভালোভাবে। সারসত্তায় নারী হচ্ছে অস্থির, জল যেমন তরল; এবং কোনো মানবিক শক্তিই প্রাকৃতিক সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। সাহিত্য ভ'রেই, যেমন *আরব্যরজনী*তে তেমনি *দেকামেরন*-এ, আমরা দেখতে পাই নারীর ধূর্ততা জয়ী হচ্ছে পুরুষের সাবধানতার ওপর। অধিকন্তু, শুধু একলা নিজের ইচ্ছেয়ই পুরুষ কারারক্ষক হয়ে ওঠে নি : সমাজই তাকে– পিতা, ভ্রাতা, স্বামী রূপে– দায়ী করে তার নারীর আচরণের জন্যে। নারীর ওপর সতীত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় আর্থনীতিক ও ধর্মীয় কারণে, কেননা প্রতিটি নাগরিককে সপ্রমাণিত হ'তে হয় তার আসল পিতার পুত্ররূপে।

তবে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সমাজ তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে যে-ভূমিকা, তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য করতে হবে নারীকে। পুরুষের রয়েছে এক দ্বিগুণ দাবি, যা নারীকে কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে : পুরুষ চায় নারী হবে তার এবং থাকবে তার সাথে অসম্পর্কিত; পুরুষ স্বপ্ন দেখে তাকে যুগপৎ দাসী ও মোহিনীরূপে পাওয়ার। কিন্তু প্রকাশ্যে সে স্বীকার করে শুধু প্রথমটি; অপরটি এমন প্রতারণাপূর্ণ বাসনা যে সে তা লুকিয়ে রাখে তার হৃদয় ও মাংসের সংগোপনীয়তার ভেতরে। এটা নৈতিকতা ও সমাজ বিরোধী; এটা অপর-এর মতো, বিদ্রোহপরায়ণ প্রকৃতির মতো, 'নষ্ট মেয়েলোক'-এর মতো খল। পুরুষ যে-শুভকে প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রয়োগ করেছে ব'লে দাবি করে, তার কাছে পুরুষ নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে না; সে খারাপের সাথে রক্ষা করে লজ্জাজনক সম্পর্ক। কিন্তু যখনই ওই খারাপ অসতর্ক সাহসে খুলে দেখায় তার মুখ, পুরুষ তার বিরুদ্ধে লিপ্ত হয় যুদ্ধে। রাত্রির ছায়ার তলে পুরুষ

নারীকে আমন্ত্রণ জানায় পাপে। কিন্তু পূর্ণ দিবালোকে সে অস্বীকার করে পাপ ও নির্দোষ পাপীকে। এবং নারীরা, শয্যার গোপনীয়তার ভেতরে যারা পাপী, প্রকাশ্যে আরো বেশি সংরক্ত হয়ে ওঠে সতীত্বের পুজোয়।

অন্য দিকে নারী যদি কৌশলে এড়িয়ে যায় সমাজের নিয়ম, তখন সে ফিরে যায় প্রকৃতির কাছে ও শয়তানের কাছে, সে সমষ্টির মধ্যে মুক্ত ক'রে দেয় অদম্য ও অশুভ শক্তিরাশি। নারীর কামুক আচরণের নিন্দার সাথে সব সময়ই জড়িয়ে থাকে ভয়। স্বামী তার স্ত্রীকে সৎপথে রাখতে সফল না হ'লে সে ভাগী হয় স্ত্রীর দোষের; সমাজের চোখে তার দুর্ভাগ্য হয়ে ওঠে তার মানসম্মানের ওপর একটি কলঙ্ক; অনেক কঠোর সভ্যতা আছে, যেগুলো স্ত্রীর অপরাধ থেকে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করার জন্যে স্বামীকে বাধ্য করে দোষীকে হত্যা করতে। অনেকগুলোতে অপরের সন্তোষ বিধানে আগ্রহী স্বামীকে শাস্তি দেয়া হয় ব্যঙ্গতামাসার মধ্যে, তাকে ন্যাংটো ক'রে দু-পা দু-দিকে ঝুলিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে ঘোরানো হয়। এবং সারা সমাজ কঠোর শাস্তি দেয় অপরাধীকে : স্ত্রী শুধু একলা স্বামীর বিরুদ্ধে অপরাধ করে নি, করেছে সম্পূর্ণ সমাজের বিরুদ্ধে। এসব প্রথা অতিশয় কঠোরভাবে প্রচলিত ছিলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতীন্দ্রিয়বাদী স্পেনে, মাংস দিয়ে সন্ত্রস্ত এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেশে। কালদেরন, লর্কা, ভালে ইনক্লান বহু নাটকে ব্যবহার করেছেন এ-বিষয়। লর্কার *হাউজ অফ বার্নাদায়* গ্রাম্য পরচর্চাকারীরা ধর্ষিত মেয়েটিকে শাস্তি দেয় 'যে-স্থানে সে পাপ করেছে' সেখানে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো পুড়িয়ে। ভালে ইনক্লানের *ডিভাইন ওয়ার্ডস*-এ ব্যভিচারিণী নারীটি দেখা দেয় শয়তানের সাথে নৃত্যরত অভিচারিণীরূপে: তার অপরাধ একবার ধরা পড়ার সাথে সাথে সারা গ্রাম জড়ো হয়ে ছিঁড়েফেড়ে ফেলে তার কাপড়চোপড়, তারপর তাকে জলে ডুবিয়ে মারে। বহু প্রথানুসারে, পাপী নারীকে এভাবে ন্যাংটো করা হতো; তার দিকে ছোঁড়া হতো পাথর, যেমন জানানো হয়েছে বাইবেলে, বা তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, চুবিয়ে মারা হতো, বা পুড়িয়ে মারা হতো। এসব পীড়নের অর্থ হচ্ছে সামাজিক মর্যাদা বঞ্চিত ক'রে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রকৃতির কাছে; তার পাপ দিয়ে সে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলো অশুভর প্রাকৃতিক প্রবাহ।

কুসংস্কার কমতে থাকার সাথে সাথে কমে এ-প্রচণ্ড বর্বরতা এবং দূর হয় ভয়। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে আজো নাস্তিক জিপ্সিদের গৃহহীন ভবঘুরে হিশেবে দেখা হয় সন্দেহের চোখে। যে-নারী যথেচ্ছ ব্যবহার করে তার আকর্ষণকে– সাহসিকা, ছলনাময়ী, *করালী রূপসী*– আজো হয়ে আছে উদ্বেগজাগানো নারী। হলিউডের ছায়াছবির নষ্ট নারীর মধ্যে আজো বেঁচে আছে সির্সির ভাবমূর্তি। নারীদের ডাইনিরূপে পুড়িয়ে মারা হয়েছে শুধু এ-কারণে যে তারা ছিলো রূপসী। অনৈতিক জীবনযাপনকারী নারীদের সামনে মফস্বলীয় সতীত্বের বিনয়াভিমানপূর্ণ অসন্তুষ্টির মধ্যে আজো বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে প্রাচীন এক ভীতি।

প্রকৃতপক্ষে এসব বিপদই দুঃসাহসিক পুরুষের কাছে নারীকে ক'রে তোলে এক প্রলোভনজাগানো শিকার। বৈবাহিক অধিকারকে অবজ্ঞা ক'রে এবং সমাজের বিধানের সমর্থন প্রত্যাখ্যান ক'রে, পুরুষ দ্বৈরথে তাকে জয় করার চেষ্টা করে। নারীটি প্রতিরোধ করলেও পুরুষ তাকে অধিকার করতে চায়; পুরুষ নারীটির পেছনে ধাওয়া করে সেই

স্বাধীনতার সাথে, যার মাধ্যমে নারীটি এড়িয়ে যায় তাকে। নিষ্ফলভাবে। কেউ যখন স্বাধীন থাকে, তখন সে কোনো ভূমিকায় অভিনয় করে না : স্বাধীন নারী মাঝেমাঝেই *পুরুষের বিরুদ্ধে করে এমন অভিনয়। এমনকি নিদ্রিতা রূপসীও ঘুম ভেঙে জেগে* উঠতে পারে অসন্তোষের মধ্যে, যে তাকে জাগিয়েছে তাকে সে সুদর্শন রাজকুমার ব'লে মনে নাও করতে পারে, সে মধুরভাবে হাসতে নাও পারে। বীরের স্ত্রী নিস্পৃহভাবে শোনে তার দুঃসাহসিক কর্মগুলোর উপাখ্যান; কবি স্বপ্ন দেখে যে-কাব্যদেবীর, সে হয়তো তার স্তবকরাশি শুনতে শুনতে হাই তোলে। আমাজন অবসাদবশত যুদ্ধে নামতে নাও পারে; এবং সে বিজয়ীও হ'তে পারে। অবক্ষয়ের যুগের রোমের নারীরা, আজকের বহু নারী, পুরুষের ওপর চাপিয়ে দেয় তাদের লীলাচাপল্য বা তাদের নিয়ম। কোথায় সিন্ডেরেলা?

পুরুষ দিতে চায়, এবং এখন এমন নারী আছে, যে নিজের জন্যে নেয়। এটা হয়ে উঠছে আত্মরক্ষার বিষয়, এটা আর খেলা নয়। নারী যখন স্বাধীন সে-মুহূর্ত থেকে সে স্বাধীনভাবে যা সৃষ্টি করে নিজের জন্যে, তা ছাড়া তার আর কোনো নিয়তি নেই। তারপর থেকে দুটি লিঙ্গের সম্পর্ক হচ্ছে সংগ্রামের সম্পর্ক। এক সহচর ব্যক্তি হয়ে নারী এখন হয়ে উঠেছে ততোটা ভীতিকর, যতোটা ছিলো যখন সে পুরুষের মুখোমুখি দাঁড়াতো বৈরী প্রকৃতির অংশ হয়ে। পরিশ্রমী মৌমাছি বা মা মুরগির কিংবদন্তির বদলে দেখা দিয়েছে এখন গোগ্রাসে গেলা স্ত্রী পতঙ্গের কিংবদন্তি : আরাধনাকারী ম্যান্টিস, মাকড়সা। সে আর সে-নারী নেই, যে লালন করতো নবজাত শিশু, বরং সে এমন নারী, যে পুরুষ খায়; ডিম্ব আর প্রাচুর্যের গোলাঘর নয়, বরং এটা এক জড় বস্তুর ফাঁদ, যার ভেতরে শুক্রাণুকে খোজা ও মগ্ন করা হয়। জরায়ু, সেই উষ্ণ, শান্তিময়, ও নিরাপদ নির্জন আশ্রয়, হয়ে উঠেছে রসের মণ্ড, এক মাংসাশী উদ্ভিদ, এক অন্ধকার, সংকোচনসক্ষম উপসাগর, যেখানে বাস করে একটি সাপ, যে অশেষ ক্ষুধায় গেলে পুরুষের শক্তি। একই দ্বান্দ্বিকতা আশ্লেষের বস্তুকে ক'রে তোলে কৃষ্ণ যাদুর অধিকারী, দাসীকে করে বিশ্বাসঘাতকিনী, সিন্ডেরেলাকে রাক্ষসী, এবং সব নারীকে রূপান্তরিত করে শত্রুতে : পুরুষ যে প্রতারণা ক'রে নিজেকে একমাত্র অপরিহার্য ব'লে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, এটা হচ্ছে তার মূল্য পরিশোধ।

তবে এ-বৈরী মুখমণ্ডলই অন্যগুলোর থেকে নারীর অধিকতর চূড়ান্ত মুখাবয়ব নয়। বরং নারীর অন্তরে প্রবর্তিত হয়েছে এক ম্যানিকীয়বাদ। পিথাগোরাস শুভ নীতিগুলোকে সম্পর্কিত করেছিলেন পুরুষের সাথে এবং অশুভগুলোকে নারীর সাথে। পুরুষেরা নারীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে জয় করতে চেয়েছিলো অশুভকে; তারা আংশিক সফল হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম যেমন মুক্তি ও পাপমোচনের ধারণা এনে *নরকদণ্ড* শব্দটিকে দিয়েছে তার পূর্ণ অর্থ, ঠিক সেভাবেই পবিত্রীকৃত নারীর সাথে তীব্র বৈপরীত্যেই নষ্ট নারী উদ্ভাসিত হয় বিশিষ্ট হয়ে। মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত চ'লে এসেছে যে 'নারী নিয়ে ঝগড়া', তাতে কিছু পুরুষ স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে শুধু তাদের স্বপ্নের আশীর্বাদপ্রাপ্ত নারীকে, অন্যরা শুধু অভিশপ্ত নারীকে, যে ভ্রান্ত ব'লে প্রতীয়মান করে তাদের স্বপ্নকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষ যদি *সব কিছু* পেতে পারে নারীর মধ্যে, তার কারণ হচ্ছে এ-উভয় মুখই আছে তার। জীবন্ত, দৈহিক ধরনে সে ধারণ করে সব

মূল্যবোধ ও প্রতি-মূল্যবোধ, যা অর্থপূর্ণ করে জীবনকে। এখানে, বেশ স্পষ্টভাবে, অনুরক্ত মাতা ও বিশ্বাসঘাতকিনী রক্ষিতারূপে পরস্পরের বিপরীতে রয়েছে শুভ ও অশুভ; প্রাচীন ইংরেজি গীতিকা *লর্ড র‍্যান্ডাল, মাই সান*-এ এক তরুণ নাইট, রক্ষিতা যাকে বিষ খাইয়েছে, বাড়ি ফিরে আসে মায়ের কোলে মৃত্যুবরণের জন্যে। মাতা, বিশ্বস্ত দয়িতা, ধৈর্যশীলা স্ত্রী– সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকে 'ছলনাময়ীরা' ও ডাইনিরা পুরুষের হৃদয়ে যে-ক্ষত সৃষ্টি করে, তা পেঁচিয়ে বাঁধার জন্যে। এ-দুই স্পষ্ট স্থির মেরুর মাঝখানে দেখা যায় অসংখ্য দ্ব্যর্থবোধক মূর্তি, শোচনীয়, ঘৃণ্য, পাপিষ্ঠ, উপদ্রুত, ছেনালিপূর্ণ, দুর্বল, দেবদূতপ্রতিম, শয়তানপ্রতিম। নারী এভাবে পুরুষের জীবনকে উদ্দীপ্ত ও সমৃদ্ধ করার জন্যে যোগায় বিচিত্র আচরণ ও ভাবাবেগ।

পুরুষ মুগ্ধ হয় নারীর জটিলতা দিয়েই : এক অপূর্ব দাসী, যে ধাঁধিয়ে দিতে পারে তার চোখ– এবং খুব বেশি ব্যয়বহুলও নয়। সে কি দেবী না দানবী? এ-অনিশ্চয়তা তাকে পরিণত করে এক স্ফিংক্সে। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে প্যারিসের প্রসিদ্ধতম বেশ্যালয়গুলোর একটি ব্যবসা চালাতো তার পৃষ্ঠপোষকতায়, স্ফিংক্সের উল্কি ধারণ ক'রে। নারীত্বের মহাপর্বে, কর্সেটের কালে, পল বর্জে, অঁরি বাতাইল ও ফরাশি ক্যান-ক্যানের কালে, নাটক, কবিতা, গানে প্রবলভাবে চলেছিলো স্ফিংক্সের বিষয়বস্তু : 'কে তুমি, কোথা থেকে আসো তুমি, অদ্ভুত স্ফিংক্স?' এবং আজো নারীর রহস্য সম্পর্কে স্বপ্নের ও বিতর্কের কোনো শেষ নেই। বস্তুত এ-রহস্য রক্ষা করার জন্যেই পুরুষ বহু কাল ধ'রে নারীর কাছে আবেদন জানিয়েছে দীর্ঘ স্কার্ট, পেটিকোট, অবগুণ্ঠন, লম্বা গ্লোভ, উঁচু খুড়ের জুতো না ছাড়ার জন্যে : যা কিছু অপরের পার্থক্যকে ক'রে তোলে দৃষ্টিনন্দন, তাই তাকে ক'রে আরো কাম্য, কেননা পুরুষ এভাবেই অধিকার করতে চায় অপরকে। আমরা দেখতে পাই যে পুরুষের মতো করমর্দন করে ব'লে ইংরেজ নারীদের বরফের আলাঁ-ফরনিয়ে : তাকে উত্তেজিত করে ফরাশি নারীদের বিনয়ী সংযমশীলতা। সুদূরতমা রাজকুমারীর মতো গভীর ভালোবাসা পেতে হ'লে নারীকে থাকতে হবে গোপন, অজ্ঞাত। ফরনিয়ে তার জীবনে নারীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা মনে করার কোনো কারণ নেই; তিনি বাল্যকালের, যৌবনের সমস্ত বিস্ময়, হারানো স্বর্গের জন্যে সমস্ত কাতরতা ভ'রে দিয়েছিলেন তার নিজের সৃষ্টিকরা এক নারীর মধ্যে, যার প্রথম গুণই ছিলো যে সে অপ্রাপণীয়। তাঁর ইভঁন দ্য গালাইয়ের ছবিটি শাদায় ও সোনায় আঁকা।

তবে পুরুষেরা নারীর ত্রুটিগুলোও মনে সযত্নে লালন করে, যদি সেগুলো রহস্য সৃষ্টি করে। 'নারীর লীলাচপলতা থাকা দরকার,' এক পুরুষ কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে বলেছিলো এক বুদ্ধিমান নারীকে। চপলতা সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়, এটা নারীকে দেয় জলের ওপর ঢেউয়ের শোভা; মিথ্যাচার তাকে সাজায় মনোমুগ্ধকর প্রতিবিম্বে; ছেনালিপনা, এমনকি বিকৃতি, তাকে দেয় উন্মাদক সুগন্ধ। ছলনাময়, পলায়নপর, দুর্বোধ্য, প্রতারণাপূর্ণ– এভাবেই শ্রেষ্ঠরূপে সে ধরা দেয় পুরুষের স্ববিরোধী বাসনার কাছে; অজস্র ছদ্মবেশের আড়ালে সে মায়া। স্ফিংক্সকে তরুণীরূপে রূপায়িত করা এক গতানুগতিক ব্যাপার : কুমারীত্ব হচ্ছে এক গূঢ়রহস্য, যা সাড়া জাগায় পুরুষের মনে– সেটা হয় ততো বেশি নারী হয় যতো বেশি অসচ্চরিত্র ;

বালিকার সতীত্ব জাগিয়ে তোলে সব ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার প্রত্যাশা; এবং কেউ জানে না তার নিষ্পাপতার ভেতরে লুকিয়ে আছে কী সব বিকার। এখনো পশু ও উদ্ভিদের সন্নিকট, ইতিমধ্যেই সামাজিক নিয়মের অনুগত, সে শিশুও নয় প্রাপ্তবয়স্কও নয়; তার ভীরু নারীত্ব কোনো ভয় জাগায় না, শুধু জাগায় মৃদু উদ্বেগ। আমরা বোধ করি যে সে হচ্ছে নারীরহস্যের অন্যতম বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত উদাহরণ। 'খাঁটি বালিকা' যেহেতু লোপ পেয়ে গেছে, তাই তার তন্ত্রও সেকেলে হয়ে পড়েছে। অন্য দিকে, বেশ্যার প্রতিমা, যাকে *মায়ায়* বিজয়দৃপ্তভাবে ফরাশি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন গঁতিলঁ, আজো রক্ষা করেছে তার বহু মর্যাদা। ভীরু পিউরিটানের কাছে বেশ্যা হচ্ছে পাপ, লজ্জা, রোগ, নরকদণ্ডের প্রতিমূর্তি; সে জাগিয়ে তোলে ভয় ও ঘৃণা; সে কোনো পুরুষের অধিকারে নয়, কিন্তু নিজেকে সে দান করে সকলের কাছে এবং জীবিকা নির্বাহ করে এ-ব্যবসা দিয়ে। সে এভাবে পুনরুদ্ধার করে প্রাচীন কালের বিলাসিনী দেবী মহামাতার ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা, এবং সে ধারণ করে নারীত্বের এমন মূর্তি, যা পুরুষের সমাজ পবিত্রিত করে নি এবং সে ভরা থাকে ক্ষতিকর শক্তিতে। যৌনক্রিয়ায় পুরুষ সম্ভবত ভাবতেও পারে না যে সে বেশ্যাটির মালিক; সে নিতান্তই নিজেকে সমর্পণ করেছে মাংসের এ-দানবীর কাছে। এটা এমন এক অবমাননা, এমন এক দূষণ, যাতে বিশেষভাবেই তিক্ততা বোধ করে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা, যারা দেহকে কমবেশি ঘৃণ্য ব'লেই মনে করে। অন্য দিকে, যে-পুরুষ দেহকে ভয় পায় না সে উপভোগ করে বেশ্যাকর্তৃক দেহের মহানুভব ও সৎ ঘোষণাকে; সে তার মধ্যে অনুভব করে নারীত্বের এমন এক উন্নয়ন, কোনো নৈতিকতাই যাকে নিষ্প্রাণ করতে পারে নি। সে আবার তার দেহে ফিরে পায় সে-ঐন্দ্রজালিক গুণাবলি, যা অতীতে নারীকে করেছিলো নক্ষত্র ও সমুদ্রের বোন; একজন হেনরি মিলার বেশ্যার সাথে শুয়ে অনুভব করে সে মাপছে জীবন, মৃত্যু, ও মহাজগতের গভীরতা; আগুগ্রাহী যোনির গভীর, আর্দ্র ছায়াতলে সে দেখা পায় বিধাতার। বেশ্যা যেহেতু এক ধরনের অস্পৃশ্যজন, যে বাস করে এক সকপট নৈতিক জগতের প্রান্তে, তাই আমরা *নষ্ট কন্যাকে* গণ্য করতে পারি গৃহীত সতীত্বের এক অকার্যকরকারী হিশেবে; তার দীন অবস্থা তাকে সম্পর্কিত করে খাঁটি সন্তের সাথে; কেননা যাকে পদদলিত করা হয়েছে, সে পাবে উচ্চস্থান। মেরি ম্যাগডালিন ছিলো খ্রিস্টের এক প্রিয়পাত্রী; সকপট সতীত্বের থেকে পাপ স্বর্গের দরোজা খোলে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি। সব নারীর মধ্যে বেশ্যারাই পুরুষের বেশি অনুগত, তবু তারাই বেশি সমর্থ পুরুষের থেকে মুক্তি পেতে; এজন্যেই তারা ধারণ করে বিচিত্র অর্থ। তবে এমন কোনো নারী-ধরন নেই– কুমারী, মাতা, স্ত্রী, বোন, দাসী, প্রেমিকা, প্রচণ্ড সতী, সুস্মিত অডালিস্ক– যে পুরুষের ছন্নছাড়া ব্যাকুল কামনাকে এভাবে সংক্ষেপিত করতে সমর্থ নয়।

নারীর কেনো রয়েছে এক দ্বৈত ও প্রতারক মুখাবয়ব, তার কারণ এ-ই : পুরুষ যা কিছু কামনা করে, সে তা এবং পুরুষ যা কিছু অর্জন করতে পারে না, সে তা। সুপ্রসন্ন প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সে এক ভালো মধ্যস্থতাকারিণী; এবং সে হচ্ছে অজিত প্রকৃতির প্রলোভন, যা সব শুভর বিরোধী। সে সব নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিমূর্তি, শুভ থেকে অশুভর, এবং তাদের বিপরীতের; সে কর্মের এবং যা কিছু তার প্রতিবন্ধক,

তার বিষয়, সে পৃথিবীতে পুরুষের আয়ত্তি ও তার হতাশা : সে পুরুষের নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সব চিন্তাভাবনার এবং পুরুষ তা যেভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ, তার সমস্ত কিছুর উৎস ও উদ্ভব; এবং এ-সত্ত্বেও সে কাজ করে পুরুষকে নিজের থেকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে, তাকে নিস্তব্ধতায় ও মৃত্যুতে ডুবে যেতে। সে দাসী ও সঙ্গিনী, কিন্তু পুরুষ আরো প্রত্যাশা করে যে সে হবে পুরুষের শ্রোতা ও সমালোচক এবং তাকে সমর্থন ও অনুমোদন করবে তার সত্তাবোধে; কিন্তু তার নিস্পৃহতা এবং এমনকি তার পরিহাস ও অট্টহাস্য দিয়ে সে বিরোধিতা করে পুরুষের। পুরুষ যা কামনা করে ও যা ভয় করে, পুরুষ যা ভালোবাসে ও যা ঘৃণা করে, সে-সব পুরুষ প্রক্ষেপ করে নারীর ওপর। এবং নারীর সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা যদি এতোই কঠিন হয়, তার কারণ হচ্ছে পুরুষ নারীর মধ্যে খোঁজে নিজের পুরোটা এবং এ-কারণে যে নারী হচ্ছে সব। নারী হচ্ছে সব, অর্থাৎ, অপ্রয়োজনীয়র তলে; সে সর্বাঙ্গীন অপর। সব হয়ে, সে কখনো তা নয়, যা তার হওয়া উচিত; সে চিরস্থায়ী ছলনা, সেই অস্তিত্বের একান্ত ছলনা, যা কখনোই সফলভাবে অর্জিত হয় নি, আবার পুরোপুরি সামঞ্জস্যও লাভ করে নি অস্তিমানের সমগ্রতার সাথে।

পরিচ্ছেদ ২

পাঁচজন লেখকে নারীকিংবদন্তি

সাধারণ দৃষ্টিতে নারীকিংবদন্তি যে-রূপ নিয়েছে, তার এ-বিশ্লেষণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করার জন্যে আমরা এখন বিচার করবো কয়েকজন লেখকের লেখায় এটা যে-বিশেষ ও বিচিত্রভাবে সম্মিলিত রূপ নিয়েছে, সে-রূপগুলো। নারীর প্রতি মঁতেরলঁ, ডি এইচ লরেন্স, ক্লদেল, ব্রেতোঁ, এবং স্তেঁদালের মনোভাবকে আমার কাছে মনে হয়েছে বৈশিষ্ট্যসূচক।

এক

মঁতেরলঁ বা ঘৃণার রুটি

মঁতেরলঁ অন্তর্ভুক্ত পুরুষের সে-দীর্ঘ ধারার, যাঁরা আপন ব'লে গ্রহণ করেছেন পিথাগোরাসের গর্বিত ম্যানিকীয়বাদ। নিটশের অনুসরণে তিনি মনে করেন যে শুধু দুর্বলতায় বিশিষ্ট পর্বগুলোই উচ্চপ্রশংসা করেছে শাশ্বতী নারীর এবং তাই নায়ককে বিদ্রোহ করতে হবে মহামাতার বিরুদ্ধে। বীরত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি, দায়িত্ব নিয়েছেন নারীকে সিংহাসনচ্যুত করার। নারী– সে হচ্ছে রাত্রি, বিশৃঙ্খলা, সীমাবদ্ধতা। তাঁর মতে আজকের পুরুষের নির্বুদ্ধিতা ও হীনতার জন্যেই নারীর উনতাগুলোকে দেয়া হচ্ছে সদর্থক মূল্য : আমরা শুনতে পাই নারীর সহজাত প্রবৃত্তি, তাদের বোধি, তাদের ভবিষ্যৎকথনের কথা, যখন নিন্দা করা উচিত তাদের যুক্তিশীলতার অভাবের, একগুঁয়ে মূর্খতার, তাদের বাস্তবতাবোধের অক্ষমতার। আসলে তারা পর্যবেক্ষকও নয় মনোবিজ্ঞানীও নয়; তারা বস্তুরাশিকে দেখতেও পায় না, জীবন্ত বস্তুদের বুঝতেও পারে না; তাদের রহস্য এক ফাঁদ এবং এক প্রতারণা, তাদের অতল সম্পদের আছে শূন্যতার গভীরতা; পুরুষকে তাদের দেয়ার কিছুই নেই এবং তারা শুধু ক্ষতি করতে পারে পুরুষের। মঁতেরলঁর কাছে সবার আগে মা-ই হচ্ছে মহাশত্রু; তারুণ্যপূর্ণ একটি প্রকাশনায়,'*ল'একজিল*-এ, তিনি আমাদের এমন এক মাকে দেখান, যে তার পুত্রকে বিয়ের চুক্তি করতে বাধা দেয়; *লে অলেঁপিক*-এ এক কিশোর, যে খেলায় নিজেকে নিয়োগ করতে চায়, সে 'নিষিদ্ধ' হয় মায়ের ভীরু আত্মপ্রচারের ফলে; *লে সেলিবাতেরে*-এ যেমন তেমনি *লে জোনে ফিইতে*ও তেমনি মাকে দেয়া হয় ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য। তার অপরাধ সে চিরকাল তার পুত্রকে নিজের দেহের অন্ধকারে রুদ্ধ ক'রে

রাখতে চায়; সে পুত্রকে বিকলাঙ্গ ক'রে দেয়, যাতে সে পুত্রকে শুধু একা তারই কাছে রাখতে পারে এবং ভ'রে তুলতে পারে তার সত্তার বন্ধ্যা শূন্যতাকে; সে হচ্ছে সবচেয়ে শোচনীয় শিক্ষক; সে শিশুর ডানা কেটে দেয়, পুত্র যে-উচ্চ শিখরে উঠতে চায়, তার থেকে অনেক পেছনে সে টেনে রাখে পুত্রকে; সে পুত্রকে ক'রে তোলে নির্বোধ এবং অধঃপাতিত।

এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। তবে যে-তীব্র ভর্ৎসনা চাপিয়ে দেন তিনি নারী মার ওপর, তাতে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় তিনি মার মধ্যে যা ঘেন্না করেন, তা হচ্ছে তার নিজের জন্মের ঘটনা। তিনি বিশ্বাস করেন তিনিই বিধাতা, তিনি বিধাতা হ'তে চান; কেননা তিনি পুরুষ, কেননা তিনি একজন 'উৎকৃষ্টতর মানুষ', কেননা তিনি মঁতেরলঁ। দেবতা কোনো জননিত সত্তা নয়; তাঁর যদি দেহ থাকে, তাহলে তাঁর দেহ হচ্ছে দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল পেশির ছাঁচে ঢালাই করা এক ইচ্ছে, সেটা স্থূলভাবে জীবন ও মৃত্যুর অধীন কোনো মাংসপিণ্ড নয়; তিনি মাকে দায়ী করেন এ-বিনাশী মাংসের জন্যে, যা অনিশ্চিত, অরক্ষিত, এবং তাঁর নিজের দ্বারা ত্যাজ্য। 'তার শরীরের শুধু সে-স্থানেই ভেদ্য ছিলো একিলিস, যেখানে তাকে ধ'রে রেখেছিলো তার মা,' *সির লে ফেম*-এ বলেন মঁতেরলঁ। মানুষ হওয়ার মধ্যে নির্দেশিত হয়ে আছে যে-অবস্থা, তা তিনি মেনে নিতে কখনোই ইচ্ছুক ছিলেন না। নিজের উদ্ভবের উর্ধ্বে না উঠে তিনি একে অস্বীকার করেন প্রবলভাবে।

মঁতেরলঁর কাছে রক্ষিতাও মায়ের মতোই অশুভ সংকেতবহ; সে বাধা দেয় পুরুষকে তার ভেতরের দেবতাকে পুনর্জীবিত করতে। তিনি ঘোষণা করেন যে নারীর নিয়তি হচ্ছে সদ্যস্কতার জীবন; সে বেঁচে থাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর, তার আছে বাঁচার দুর্বার ক্রোধ– এবং পুরুষকে সে আবদ্ধ করতে চায় এ-হীনবস্থায়। নারী পুরুষের সীমাতিক্রমণতার উদ্যম অনুভব করে না, তার নেই কোনো মহিমাবোধ; সে তার প্রেমিককে ভালোবাসে তার দুর্বলতার মধ্যে, তার শক্তির মধ্যে নয়, তার দুর্দশার মধ্যে এবং তার আনন্দের মধ্যে নয়; সে তাকে চায় নিরস্ত্র। প্রেমিক তাকে অতিক্রম ক'রে যায় এবং মুক্তি পায় তার থেকে; কিন্তু সে জানে কীভাবে প্রেমিককে ক্ষীণ ক'রে তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে হয়। কেননা প্রেমিককে তার দরকার, সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সে একটা পরগাছা। *ল্য সঁজ*-এ দমিনিকের চোখ দিয়ে মঁতেরলঁ দেখান যে রেনেলার পদচারণারত নারীরা 'তাদের প্রেমিকদের বাহু থেকে ঝুলে আছে ছদ্মবেশী বিশাল শামুকসদৃশ অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতো'। তাঁর মতে শুধু নারী ক্রীড়াবিদেরা ছাড়া নারীরা অসম্পূর্ণ জীব, যারা নির্ধারিত দাসীত্বের জন্যে; কোমল এবং পেশিহীন হওয়ার জন্যে বিশ্বের ওপর তাদের কোনো আয়ত্তি নেই; তাই তারা কঠোর পরিশ্রম করে একটা প্রেমিক, বা আরো ভালো হয় একটি স্বামী, সংযোজনের জন্যে। মঁতেরলঁ আরাধনারত ম্যান্টিসের উপকথা ব্যবহার না করতে পারেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন এর বিষয় : প্রেম হচ্ছে, নারীর কাছে, গিলে খাওয়া; দেয়ার ভান ক'রে সে নেয়। তিনি তুলে ধরেন মাদমোয়াজেল তলস্তয়ের চিৎকার : 'আমি তার মধ্যে বাঁচি, তার জন্যে বাঁচি; আমি চাই আমার জন্যে সে তা-ই করুক', এবং তিনি চিত্রিত করেন এমন প্রেমোত্তেজনার বিপদ; এবং এক্লিজিয়াস্টেস্-এর বচনে পান এক ভয়ঙ্কর সত্য : 'যে-

পুরুষ তোমার অশুভ কামনা করে সেও ভালো সে-নারীর থেকে, যে তোমার শুভ কামনা করে।'

মঁতেরলঁ যদি সত্যিই শাশ্বতী নারীর কিংবদন্তি চূর্ণ ক'রে থাকেন, তাহলে এ-সাফল্যের জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হবে : শাশ্বতী নারীকে অস্বীকার ক'রেই শুধু মানুষের মর্যাদা লাভে আমরা সাহায্য করতে পারি নারীকে। কিন্তু তিনি মূর্তিটি চুরমার করেন না, তিনি একে ক'রে তোলেন এক দানবী। তিনিও বিশ্বাস করেন সে-অস্পষ্ট ও মৌল সারবস্তুতে, নারীত্বে; আরিস্ততল ও সেইন্ট টমাসের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন নারীকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে নঞর্থকভাবে; নারী পৌরুষের অভাবেই নারী; এটা সংশোধন করতে সমর্থ না হয়ে এর কাছে আত্মসমর্পণ করাই প্রতিটি নারীর নিয়তি। যে-কেউ এর থেকে মুক্তির কথা ভাবে, সে-ই নিজেকে পতিত করে মানুষের মানদণ্ডের তলদেশে : সে পুরুষ হ'তে ব্যর্থ হয়, সে নারী হওয়াকে পরিত্যাগ করে; সে হয়ে ওঠে এক হাস্যকর প্রাণী, একটা ভান।

মঁতেরলঁ প্রাচ্য মনোভাব অনুমোদন করেন : সম্ভোগের বস্তু হিশেবে দুর্বল লিঙ্গটির একটা জায়গা আছে জগতে, সন্দেহ নেই জায়গাটা খুবই হীন, তবে বেশ; পুরুষ এর থেকে যে-প্রমোদ আহরণ করে, তার জন্যেই সে থাকতে পারে এবং থাকতে পারে শুধু প্রমোদের জন্যেই। আদর্শ নারী নিখুঁতভাবে নির্বোধ ও নিখুঁতভাবে অনুগত; সে সব সময়ই পুরুষকে গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত এবং পুরুষের কাছে সে কিছু দাবি করে না। এমন একজন হচ্ছে রিদিদিয়া, ছোট্ট আরব প্রেমের শান্তশিষ্ট পশু, বশমানারূপে যে গ্রহণ করে কাম ও অর্থ।

তবুও কোনোক্রমেই মঁতেরলঁ কোনো প্রাচ্য সুলতান নন; প্রথমত, তাঁর রয়েছে কামবোধের অভাব। 'নারী পশুদের' মধ্যে কিছু আপত্তি ছাড়া তিনি কখনোই সুখ পান না : তারা অসুস্থ, অস্বাস্থ্যকর, কখনো পরিচ্ছন্ন নয়। কোস্তাল গোপনে আমাদের বলে যে বালকের চুলের গন্ধ নারীর চুলের থেকে অনেক বেশি সুগন্ধি ও তীব্র; অনেক সময় সে বিরক্তি বোধ করে সলঁজের, 'সেই মিঠে, প্রায় অসুস্থকর গন্ধ ও সেই পেশিহীন, শাদা স্লাগের মতো স্নায়ুহীন দেহ'-এর উপস্থিতিতে। প্রাচ্যদেশীয়রা নারীতে পায় প্রবল ইন্দ্রিয়সুখাবহ আনন্দ এবং এভাবে প্রেমিকপ্রেমিকার মধ্যে স্থাপন করে এক দৈহিক পারস্পরিকতা : এটা প্রকাশ পেয়েছে পরমগীতের আকুল আবাহনে, *আরব্যরজনী*র কাহিনীগুলোতে, এবং দয়িতার স্তবমুখর অসংখ্য আরব কবিতায়। সেখানে মঁতেরলঁর নায়ক সব সময়ই থাকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে : 'পরাভূত না হয়ে পরাজিত করা, শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারীর মধ্যে এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য সূত্র।'

অক্স ফঁতেনে দি দেজির-এ মঁতেরলঁ ঘোষণা করেন, 'কামনার থেকে ঘৃণা মহত্তর'; এবং *ল্য মেতর দ্য সান্তিয়াগো*তে আলভারো চিৎকার ক'রে ওঠে : 'ঘৃণা আমার কাছে রুটি।' তিনি গরিব মেয়েদের টাকা অথবা রত্ন দিয়ে প্রলুব্ধ করতে মজা পান : তারা তার অমঙ্গলকামী উপহার গ্রহণ করলে তিনি উল্লাস বোধ করেন। মজা করার জন্যে তিনি আঁদ্রির সাথে খেলেন এক ধর্ষকামী খেলা, তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে নয়, বরং সে নিজেকে কীভাবে হীন ক'রে তুলছে, তা দেখার জন্যে।

নারীর প্রতি মঁতেরলঁর মনোভাবের বৈধতা বিচার করার জন্যে ভালোভাবে পরীক্ষা

ক'রে দেখা তাঁর নীতিবোধ। তাঁর মনোভাবের নেই কোনো সদর্থক প্রতি-রূপ, যা একে ব্যাখ্যার কাজ করতে পারতো; এটা প্রকাশ করে শুধু তার অস্তিত্বগত পছন্দ। প্রকৃতপক্ষে, এ-নায়ক বেছে নিয়েছে ভয়। তাঁর নায়ক সব সময় একলা মুখোমুখি দাঁড়ায় পশুদের, শিশুদের, নারীদের, ভূদৃশ্যের; সে শিকার তার নিজের কামনার।

দুই

ডি এইচ লরেন্স বা শিশ্নের গর্ব

লরেন্স ও একজন মঁতেরলঁ দু-মেরুর মতো সুদূর। পুরুষের ও নারীর বিশেষ সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করা তাঁর কাজ নয়, বরং তাদের উভয়কে জীবনের সত্যের কাছে ফিরিয়ে আনা তাঁর কাজ। এ-সত্য প্রদর্শনের মধ্যেও নেই, ইচ্ছের মধ্যেও নেই : এটা জড়িত পাশবিকতায়, যার ভেতরে ছড়ানো মানুষের শেকড়। লরেন্স সংরক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেন লিঙ্গ–মস্তিষ্কের বৈপরীত্য; তাঁর আছে এক মহাজাগতিক আশাবাদ, যা আমূলভাবে বিপরীত শপেনহায়ারের হতাশাবাদের; শিশ্নের মধ্যে প্রকাশিত বেঁচে-থাকার-ইচ্ছে হচ্ছে আনন্দ।

লেডি চ্যাটার্লি ও মেলর্স উন্নীত হয়েছে একই মহাজাগতিক আনন্দে : একে অন্যের সাথে মিশে গিয়ে, তার মিশে গেছে গাছপালা, আলো, বৃষ্টির সাথে। লরেন্স এ-মতবাদটি সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন *দি ডিফেন্স অফ লেডি চ্যাটার্লিতে* : 'বিয়ে এক প্রতিভাস যদি তা স্থায়ীভাবে ও আমূলভাবে শৈশ্নিক না হয়, যদি তা জড়িত না থাকে সূর্য ও পৃথিবীর সাথে, চাঁদের, গ্রহনক্ষত্রের সাথে, ঋতুর, বর্ষের, লাস্ট্রার, শতাব্দীর ছন্দস্পন্দনের সাথে। বিয়ে কিছুই নয় যদি না তা স্থাপিত হয় রক্তের প্রতিসাম্যের ভিত্তির ওপর। কেননা রক্ত হচ্ছে আত্মার সারবস্তু।' 'পুরুষের রক্ত আর নারীর রক্ত হচ্ছে দুটি অনন্তকালীন পৃথক স্রোতধারা, যা মিশ্রিত হ'তে পারে না।' এ-কারণেই এ-স্রোতধারা দুটি তাদের সর্পিল পথেই আলিঙ্গন করে জীবনের সমগ্রতাকে। 'শিশ্ন হচ্ছে কিছু পরিমাণ রক্ত, যা পরিপূর্ণ করে নারীর ভেতরের রক্তের উপত্যকাকে। পুরুষের রক্তের তীব্র ধারা চরম গভীরতম তলে নিমজ্জিত করে নারীর রক্তের মহাধারাকে... তবে কোনোটিই বাঁধ ভেঙে ছোটে না। এটা হচ্ছে মিলনের বিশুদ্ধতম রূপ... এবং এটা মহারহস্যগুলোর অন্যতম।' জীবনের এক অলৌকিক সমৃদ্ধিসাধন এ-মিলন; তবে এটা চায় লোপ করতে হবে 'ব্যক্তিত্ব'-এর দাবি। যখন বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের অস্বীকার না ক'রে পৌছোতে চায় পরস্পরের ভেতরে, যা সব সময়ই ঘটে আধুনিক সভ্যতায়, তখন তাদের উদ্যোগ পরিণত হয় হতাশায়। এমন ক্ষেত্রে থাকে এক কাম, যা 'ব্যক্তিগত, শূন্য, শীতল, বিচলিত, কাব্যিক', তা বিধ্বস্ত করতে চায় প্রত্যেকের প্রাণস্রোত। তখন প্রেমিকপ্রেমিকারা পরস্পরকে ব্যবহার করে উপকরণের মতো, যা জাগায় ঘৃণা : এটা ঘটে লেডি চ্যাটার্লি ও মাইকেলিসের ক্ষেত্রে; তারা রুদ্ধ থাকে নিজেদের ব্যক্তিতার মধ্যে; তারা ভোগ করতে পারে এমন জ্বর, যা দেয়

অ্যালকোহল বা আফিম : তারা প্রত্যেকে ব্যর্থ হয় বাস্তবতা আবিষ্কারে; তারা কোথাও প্রবেশাধিকার পায় না।

লরেন্স সংরক্তভাবেই বিশ্বাস করেন পুরুষের আধিপত্যে। 'শৈশ্নিক বিয়ে' পদটিতে, তিনি 'কামগত' ও 'শৈশ্নিক'-এর মধ্যে স্থাপন করেন যে-প্রতিসাম্য, তাতেই এটা প্রমাণ হয়। যে-দুটি রক্তধারা রহস্যময়ভাবে বিবাহিত হয়, তাদের মধ্যে শৈশ্নিক ধারাটিই লাভ করে আনুকূল্য। 'শিশ্ন কাজ করে দুটি নদীর মিলনের উপায়রূপে; এটা একই স্রোতে সংযুক্ত করে দুটি ভিন্ন ছন্দকে।' তাই পুরুষটি শুধু যুগলের মধ্যে একটি উপাদানই নয়, বরং তাদের সংযোগের কারণ; সে যোগায় তাদের সীমাতিক্রমণতা : 'ভবিষ্যতের সাথে সেতু হচ্ছে শিশ্ন।' মাতা মহাদেবীর তন্ত্রের বিকল্পে লরেন্স প্রতিষ্ঠা করতে চান শিশ্নতন্ত্র; তিনি যখন মহাজগতের কামধর্মীতাকে উদ্ভাসিত করতে চান, তখন তিনি নারীর উদরের বদলে মনে পড়িয়ে দেন পৌরুষকে। তিনি কখনোই দেখান না যে নারী আলোড়িত করছে পুরুষকে; কিন্তু বারবার দেখান যে গোপনে নারী উত্তেজিত হচ্ছে পুরুষের তীব্র, সূক্ষ্ম, ও ধীরে-কৌশলে-প্রবেশকামী আবেদনে। তাঁর নায়িকারা রূপসী ও স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু হঠকারী নয়; আর সেখানে তার নায়কেরা উদ্বিগ্নকর ফন। পুরুষ প্রাণীরাই ধারণ করে জীবনের আলোড়ন ও শক্তিশালী রহস্য; নারী বোধ করে শুধু সম্মোহন : এটি অভিভূত হয় একটা শেয়াল দিয়ে, ওটি অনুরক্ত হয়ে ওঠে একটি অশ্বের, গাড্রুন অতি উত্তেজিত হয়ে রুখে দাঁড়ায় একপাল তরুণ ষাঁড়ের সামনে; সে অভিভূত হয় একটি খরগোশের বিদ্রোহী বলিষ্ঠতায়।

পুরুষের একটি সামাজিক সুবিধাকে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয় এসব মহাজাগতিক সুবিধার সাথে। সন্দেহ নেই এ-শৈশ্নিক ধারা যেহেতু মহাবেগশালী, আক্রমণাত্মক, যেহেতু ছড়িয়ে পড়ে ভবিষ্যতের ভেতরে– লরেন্স নিজেকে ব্যাখ্যা করেন, তবে অশুদ্ধভাবে– পুরুষকেই 'সামনের দিকে বইতে হয় জীবনের ধ্বজা'; পুরুষ উদ্দেশ্য ও পরিণতির প্রতি একাগ্রচিত্ত, পুরুষ ধারণ করে সীমাতিক্রমণতা; নারী জড়িত থাকে তার ভাবাবেগের মধ্যে, সে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখিতা; সে উৎসর্গিত সীমাবদ্ধতার কাছে। পুরুষ শুধু যৌনজীবনে সক্রিয় ভূমিকাই পালন করে না, সে একে অতিক্রম করার ব্যাপারেও সক্রিয়; তার মূল রয়েছে কামের বিশ্বে, কিন্তু সে এর থেকে মুক্তি অর্জন করে; নারী বন্দী হয়ে থাকে এর ভেতরেই। চিন্তা ও কর্মের মূল রয়েছে শিশ্নে; শিশ্নের অভাবে এটিতেও নারীর অধিকার নেই ওটিতেও নেই : সে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, এবং চমৎকারভাবেই পারতে পারে, কিন্তু এটা খেলা মাত্র, এতে নেই গভীর সত্যতা। নারীর 'গভীরতম চেতনা আছে পাছায় ও পেটে'। যদি একে বিকৃত করা হয় এবং তার শক্তিপ্রবাহ ধাবিত করা হয় উর্ধ্বমুখে, বক্ষে ও মাথায়, নারী হয়তো পুরুষের বিশ্বে বুদ্ধিমান, মহৎ, দক্ষ, মেধাবী, যোগ্য হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু, লরেন্সের মতে, তখন সব কিছু ধ'সে পড়ে, এবং সে ফিরে যায় কামের কাছে, 'বর্তমান মুহূর্তে যা তার করণীয়'। কর্মের এলাকায় পুরুষকেই হ'তে হবে প্রবর্তক, সদর্থক; নারী সদর্থক শুধু আবেগের স্তরে।

এভাবে লরেন্স আবার আবিষ্কার করেন বোনাল্দ্, অগাস্ত কোঁৎ, ক্লেমেঁ ভতেলের প্রথাগত বুর্জোয়া ধারণা। নারীকে তার অস্তিত্বকে করতে হবে পুরুষের অধীন।

'নারীকে বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে এবং তুমি বোঝাও যে-গভীর লক্ষ্য, তাকে।' তাহলে পুরুষ তাকে দেবে অনন্ত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা। 'আহা, কী চমৎকার বাড়িতে তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসা, যখন সে বিশ্বাস করে তোমাকে এবং অনুগত হয় তোমার লক্ষ্যের, যা তার ধরাছোঁয়ার বাইরে... যে-নারী তোমাকে ভালোবাসে, তার প্রতি তুমি অনুভব করো অতল কৃতজ্ঞতা।'

লরেন্স যার উচ্চপ্রশংসা করেন– প্রধোঁ ও রুশোর ধরনে– তা হচ্ছে একপতিপত্নীক বিয়ে, যাতে স্বামীর কাছে থেকে স্ত্রী আহরণ করে তার অস্তিত্বের যথার্থতা। মঁতেরলঁর মতোই তীব্র ঘৃণার সাথে লরেন্স সে-স্ত্রীর বিরুদ্ধে লেখেন, যে পাল্টে দিতে চায় ভূমিকা। লরেন্স মাতৃত্বকে আদৌ ঘৃণা করেন না : বরং এর উল্টো। মাংস হ'তে পেরে তিনি খুশি, তিনি স্বেচ্ছায় মেনে নেন তার জন্মকে, তিনি তাঁর মাকে ভালোবাসেন; তাঁর লেখায় মা দেখা দেয় খাঁটি নারীত্বের জমকালো উদাহরণরূপে; তারা বিশুদ্ধ আত্ম-অস্বীকৃতি, পরম মহত্ত্ব, তাদের সমস্ত জীবন্ত উত্তাপ সন্তানের সেবায় নিয়োজিত : তাদের পুত্ররা পুরুষ হয়ে উঠছে এটা তারা সানন্দে মেনে নেয়, তারা এতে গর্বিত। কিন্তু ভয় পেতে হবে অহমিকাপরায়ণ *অমঁৎ*কে, যে পুরুষকে ফিরিয়ে নেয় তার বাল্যকালে; সে ব্যাহত করে *এলঁ*, পুরুষের উড়াল। 'চাঁদ, নারীদের গ্রহ, আমাদের দুলিয়ে দেয় পেছনের দিকে।' নারী অনিঃশেষ কথা বলে প্রেম সম্বন্ধে; কিন্তু তার কাছে প্রেম হচ্ছে নেয়া, তার ভেতরে সে যে-শূন্যতা বোধ করে, এটা তা ভরিয়ে তোলার জন্যে; এমন প্রেম ঘৃণার মতোই।

তিন

ক্লদেল এবং প্রভুর দাসী

ক্লদেলের ক্যাথলিকবাদের মৌলিকত্ব এমন এক অনমনীয় আশাবাদের মধ্যে যে এতে অশুভকে পরিণত করা হয় শুভতে।

> অশুভ নিজেই
> জড়ানো তার শুভে যা আমরা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না।

ক্লদেল সৃষ্টির সব কিছুকেই অনুমোদন করেন, তিনি গ্রহণ করেন এমন দৃষ্টিভঙ্গি, যা স্রষ্টার ছাড়া আর কারো নয়– কেননা পরেরজনকে মনে করা হয় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং দয়ালু। নরক ও পাপ ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছেও থাকতো না পাপমুক্তিও থাকতো না; তিনি যখন শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেন এ-জগত, তখন আগে থেকেই তিনি দেখতে পান পতন ও পরিত্রাণ। ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মী উভয়েরই চোখে হাওয়ার অবাধ্যতা তার কন্যাদের ফেলে দেয় মহাঅসুবিধায়; সবাই জানে গির্জার পিতারা কী প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করেছেন নারীদের। কিন্তু উল্টোভাবে আমরা দেখতে পাবো যে সে ঠিক কাজই করেছে, যদি আমরা স্বীকার করি যে সে কাজ করেছে স্বর্গীয় লক্ষ্যকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে। 'নারী! সে-উপকার একদা স্বর্গোদ্যানে, যা সে করেছে বিধাতাকে তার অবাধ্যতা দিয়ে; সে-গভীর সমমর্মিতা তার ও তাঁর মাঝে; সে-মাংস, যা সে পতনের

মধ্য দিয়ে দান করেছে পরিত্রাণের কাছে!' এবং নিশ্চিতভাবেই সে পাপের উৎস, এবং তার কারণেই পুরুষ হারিয়েছে স্বর্গ। তবে ক্ষমা করা হয়েছে মানুষের পাপ, এবং এ-বিশ্ব নতুনভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত : 'বিধাতা আদিতে আমাদের যেখানে স্থান দিয়েছিলেন আমরা কোনোক্রমেই ছেড়ে আসি নি সে-সুখকর স্বর্গলোক!' 'সমগ্র পৃথিবীই প্রতিশ্রুত দেশ।'

যা কিছু বিধাতার হাত থেকে এসেছে, যা কিছু তিনি দিয়েছেন, তা নিজে খারাপ হ'তে পারে না : 'যা কিছু তিনি তৈরি করেছেন, তার কিছুই নিষ্ফল নয়।' মহাজগতের সঙ্গতির মধ্যে তাই আছে নারীর স্থান।

অতি নিশ্চিতভাবেই নারী হয়ে উঠতে পারে ধ্বংসকারী : ক্লদেল লিসির মধ্যে মূর্তি দিয়েছেন খারাপ নারীকে, যে পুরুষকে নিয়ে যায় সমূহ সর্বনাশের দিকে; *পার্তাজ দ্য মিদিতে* ওয়াইসি সর্বনাশ করে সে-পুরুষদের জীবন, যারা তার ফাঁদে পড়ে। কিন্তু যদি না থাকতো এ-সর্বনাশের বিপদ, তাহলে আর পাপমোচনও থাকতো না। নারী হচ্ছে 'বিপদের সে-উপাদান, যা তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিশাল নির্মাণে'। মাংসের প্রলোভন জানা পুরুষের জন্যে শুভ। 'এটি আমাদের ভেতরের সে-শত্রু, যে আমাদের জীবনকে দেয় তার নাটকীয় উপাদান, এ-মর্মভেদী লবণ। আত্মা এভাবে যদি নৃশংসভাবে আক্রান্ত না হতো, তাহলে তা ঘুমিয়ে থাকতো, এবং দ্যাখো, তা লাফিয়ে উঠছে... জয়ের পথ যুদ্ধের ভেতর দিয়েই'। 'এবং নারী ছাড়া পুরুষের সাথে কথা বলায় কোন মাংস বেশি শক্তিশালী?' তবে অধিকাংশ সময়ই নারী হচ্ছে প্রতিভাসের এক প্রতারক বহনকারী : 'আমি সে-প্রতিশ্রুতি, যা রক্ষা করা যাবে না এবং তার মধ্যেই আছে আমার আবেদন। যা নেই, তার জন্যে অনুতাপের সাথে, যা আছে, আমি তার মধুরতা।' তবে প্রতিভাসেরও আছে উপকারিতা; অভিভাবক দেবদূত এটাই বলে দোনা প্রোহেৎকে :

এমনকি পাপ! পাপও করে উপকার!
তাই ভালো ছিলো এ যে সে ভালোবাসতো আমাকে?
এ ছিলো ভালো যে তুমি কামনা শিখিয়েছিলে তাকে।
প্রতিভাসের জন্যে কামনা? এক ছায়ার জন্যে যে সব সময় পালায় তার থেকে?
যা আছে তার জন্যে কামনা, যা নেই তার প্রতিভাস। প্রতিভাসের
ভেতর দিয়ে কামনা
যা আছে তার জন্যে, যা নেই তার ভেতর দিয়ে।

বিধাতার ইচ্ছেয় রদরিগের কাছে প্রোহেৎ হচ্ছে : 'তার হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে একটি তরবারি।'

তবে বিধাতার হাতে নারী শুধু এ-ক্ষুরই নয়; এ-বিশ্বের ভালো জিনিশগুলোকেও সব সময় অস্বীকার করা ঠিক নয় : তারাও পুষ্টি; পুরুষকে নিতে হবে তাদেরও এবং ক'রে নিতে হবে নিজের।

নারী প্রকৃতির সর্বস্ব : গোলাপ ও পদ্ম, নক্ষত্র, ফল, কুঁড়ি, বায়ু, চাঁদ, সূর্য, ফোয়ারা, 'দুপুরের সূর্যের নিচে এক মহা সমুদ্রবন্দরের শান্ত উত্তেজনা'।

তবে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা পুরাপুরি সমরূপ নয়। সামাজিক স্তরে পুরুষের

প্রাধান্য সুস্পষ্ট। ক্লদেল স্তরক্রমে বিশ্বাস করেন, অন্য সবখানের মতো পরিবারেও : স্বামীই প্রধান। শুধু পুরুষ হওয়ার মধ্যেই পাওয়া যায় একটি সুবিধা। সিনে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কে, এক অভাগা মেয়ে, যে নিজেকে তুলনা করবো আমার জাতির পুরুষের সাথে?' পুরুষই জমি চাষ করে, ক্যাথিড্রাল তৈরি করে, তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে, বিশ্ব উদ্ঘাটন করে, দেশ জয় করে– যারা কাজ করে, উদ্যোগ নেয়। পৃথিবীতে পুরুষের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয় বিধাতার পরিকল্পনা। নারী এক সহায়ক বস্তু মাত্র। সে থাকে বিশেষ স্থানে, অপেক্ষা করে, এবং সে গুছিয়ে রাখে জিনিশপত্র : 'আমি সে, যে প'ড়ে থাকে, এবং সর্বদা সেখানে,' বলে সিনে।

চার

ব্রেতোঁ বা কবিতা

ক্লদেলের ধর্মীয় জগতের সাথে ব্রেতোঁর কাব্যিক বিশ্বের যেরকম ব্যবধান থাকলেও তাঁরা নারীকে যে-ভূমিকা দেন, তার মধ্যে রয়েছে সাদৃশ্য : নারী এক বিঘ্নকর জিনিশ; সে পুরুষকে ছিন্ন ক'রে নেয় সীমাবদ্ধতার নিদ্রা থেকে, মুখগহ্বর, চাবি, দরোজা, সেতু, দান্তেকে সে পথনির্দেশ ক'রে নিয়ে যায় দূরান্তরে। কিন্তু ব্রেতোঁর কাছে ওই দূরান্তর সুদূর স্বর্গ নয় : এটা আসলে এখানে, এটা সরিয়ে দিতে পারে দৈনন্দিনতার মামুলিত্ব; কাম দূর করতে পারে মিথ্যা জ্ঞানের সম্মোহন। নারী এক হেঁয়ালি এবং সে জ্ঞাপন করে হেঁয়ালি; তার বহু বৈশিষ্ট্য একত্রে তৈরি করে 'সে-অনন্য সত্তা, অনুগ্রহ ক'রে যার মধ্যে আমাদের দেখতে দেয়া হয়েছে স্ফিংক্সের শেষ প্রতিমূর্তি'; এবং এ-কারণেই সে হচ্ছে প্রত্যাদেশ। এক নারী, যাকে তিনি ভালোবাসেন, তাকে ব্রেতোঁ বলেন, 'তুমি হচ্ছো গূঢ়র একান্ত প্রতিরূপ'।

এটা বলার অর্থ নারী হচ্ছে কবিতা। এবং জেরার দ্য নের্ভালেও সে একই ভূমিকা পালন করে; কিন্তু তাঁর *সিলভি* ও *অরেলি*তে নারীর আছে স্মৃতি বা প্রেতচ্ছায়ার গুণ, কেননা স্বপ্ন, সত্যিকারটির থেকে অনেক সত্য, এর সাথে ঠিকমতো খাপ খায় না। ব্রেতোঁর কাছে মিল হচ্ছে উৎকৃষ্ট : বিশ্ব আছে মাত্র একটি; কবিতা জিনিশের মাঝে উপস্থিত বস্তুগতভাবে, আর নারী হচ্ছে অদ্ব্যর্থভাবে এক মাংস ও রক্তের সত্তা। একজন কেউ তার মুখোমুখি হয়, অর্ধ-স্বপ্নে নয়, পুরো জাগ্রত অবস্থায়, যে-কোনো একটা সাদামাটা দিনে, দিনপঞ্জিতে অন্যান্য দিনের মতো তার তারিখ আছে– ১২ এপ্রিল, ৪ অক্টোবর, বা যা-ই হোক– একটা সাদামাটা পরিবেশে : একটা কাফেতে, কোনো রাস্তার প্রান্তে। তবে সব সময়ই সে কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। নাদিয়া 'হেঁটে গেলো তার মাথা উঁচু ক'রে, অন্য পথচারীদের থেকে একেবারে ভিন্ন... অদ্ভুত প্রসাধনে... এমন চোখ আমি কখনো দেখি নি'।

নারী প্রেমে লাভ করে পরিপূর্ণতা এবং প্রকৃত সিদ্ধি; বিশেষ, একটি বিশেষ নিয়তি মেনে নিয়ে– এবং মহাজগত ভ'রে শেকড়হীন ভেসে বেড়িয়ে নয়– সে ধারণ করে সব কিছু। যে-মুহূর্তে তার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় শ্রেষ্ঠরূপে, সেটা রাত্রির সে-সময়ে যখন

'সে হচ্ছে বিশুদ্ধ দর্পণ, যাতে আছে যা কিছু ছিলো, যা কিছুকে হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, *এবার* যা হ'তে যাচ্ছে, তার ভেতরে মনোমোহনরূপে স্নাত হয়ে'।

অবিনাশী প্রেম অনন্য না হয়ে পারে না। ব্রেতোঁর মনোভাবের এটাই অসঙ্গতি যে তাঁর বইগুলোতে, *ভাজে কমিনিকাঁৎ থেকে আরকান ১৭* পর্যন্ত, তিনি দুর্দমনীয়ভাবে অঙ্গীকার করেছেন বিভিন্ন নারীর জন্যে এক অনন্য ও শাশ্বত প্রেম। কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এমন সামাজিক অবস্থা আছে, যা পুরুষকে স্বাধীনভাবে পছন্দ করতে দেয় না, তাই পুরুষকে ভুলভাবে পছন্দ করতে হয়; এছাড়াও, এসব ভুলের ভেতর দিয়ে আসলে সে খোঁজে *একটি* নারীকেই। এবং তিনি যদি সে-প্রিয়াদের মুখ স্মরণ করেন, তাহলে তিনি 'সব নারীর মুখের মধ্যে উপলব্ধি করবেন একটি মুখ : *শেষ* যে-মুখটি তিনি ভালোবেসেছেন'।

পাঁচ

স্তঁদাল বা বাস্তবের রোম্যান্টিক

বর্তমান কাল ছেড়ে যদি আমি ফিরে যাই স্তঁদালের কাছে, তা এজন্যে যে কার্নিভালের এ-জলবায়ুতে, যেখানে নারী আছে প্রতিশোধের দেবী, বনদেবী, শুকতারা, সাইরেন প্রভৃতির ছদ্মবেশে, সেখান থেকে বেরিয়ে এমন একজন পুরুষের কাছে যেতে আমি স্বস্তি বোধ করি, যিনি বাস করেন রক্তমাংসের নারীদের মধ্যে।

স্তঁদাল বাল্যকাল থেকেই কামনাতুরভাবেই ভালোবাসতেন নারীদের; তিনি তাদের ওপর প্রক্ষেপ করেছিলেন তাঁর কৈশোরিক অভিলাষগুলো : কল্পনা করতে তিনি ভালোবাসতেন যে তিনি উদ্ধার করছেন কোনো অচেনা রূপসীকে এবং পাচ্ছেন তার প্রেম। প্যারিসে এসে তিনি যা অতিশয় ব্যাকুলভাবে চান, তা হচ্ছে 'এক রূপসী নারী; আমরা পরস্পরকে ভালোবাসবো গভীরভাবে, সে জানবে আমার আত্মাকে'। বৃদ্ধকালে, তিনি ধুলোয় নাম লেখেন সে-নারীদের, যাদের তিনি ভালোবেসেছিলেন সবেচেয়ে বেশি। নারীরা অনুপ্রাণিত করেছিলো তাঁর বইগুলো, ওগুলো ভ'রে আছে নারীমূর্তিতে; এবং সত্য হচ্ছে বেশির ভাগ তিনি লিখেছেন তাদেরই জন্যে।

নারীর সকাতর এ-বন্ধু নারীরহস্যে বিশ্বাস করেন না, এ-কারণে যে তারা প্রকৃতই যেমন সে-রূপেই তিনি ভালোবাসেন তাদের; কোনো সারসত্তা চিরকালের জন্যে সংজ্ঞায়িত করে না নারীকে; 'চিরন্তনী নারী'র ধারণাটি তাঁর কাছে মনে হয় পণ্ডিতসুলভ ও হাস্যকর। 'দু-হাজার বছর ধ'রে পণ্ডিতেরা এ-ধারণা বারবার ব্যক্ত ক'রে এসেছেন যে নারীদের আছে এক অধিকতর প্রাণবন্ত আত্মা, পুরুষের আছে অধিকতর কাঠিন্য; নারীদের আছে ভাবনার কমনীয়তা পুরুষদের আছে মনোযোগ আকর্ষণের অধিকতর শক্তি। প্যারিসের এক কুঁড়ে যে একবার ভার্সাইয়ের উদ্যানে বেড়াতে গিয়েছিলো, সব কিছু দেখে সে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলো গাছপালা পরিপাটি ছাঁটাকাটারূপেই জন্মে।' পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-পার্থক্যগুলো দেখা যায়, সেগুলো প্রতিফলিত করে তাদের পরিস্থিতির পার্থক্য। কেনো নারীরা, উদাহরণস্বরূপ, হবে না তাদের প্রেমিকদের থেকে

বেশি রোম্যান্টিক? 'সূচিকর্মরত নারী, যে রত এক নীরস কাজে, যাতে ব্যবহৃত হয় শুধু তার হাত, সে স্বপ্ন দেখে তার প্রেমিকের; যখন প্রেমিক, তার স্কোয়াড্রনের সাথে অশ্বারোহণে চলে মুক্ত প্রান্তরে, ভুল পথে এগোলেই যার বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা।' একইরূপে নারীদের বিচারবুদ্ধির অভাব আছে ব'লে অভিযুক্ত করা হয়। 'নারী যুক্তির থেকে আবেগ বেশি পছন্দ করে, এবং এটা খুবই সহজ সরল ব্যাপার : আমাদের নির্বোধ প্রথানুসারে তারা যেহেতু কোনো পারিবারিক দায়িত্ব পায় না, *তাই যুক্তি তাদের কাছে কখনোই উপকারী নয়*... আপনার স্ত্রীকে চাষীদের সাথে আপনার দু-খণ্ড জমি দেখাশোনা করতে দিন, এবং আমি বাজি ধরতে পারি যে হিশেবনিকেশ আপনি রাখলে যা হতো রাখা হবে তার থেকে অনেক ভালোভাবে।' ইতিহাসে যদি পাওয়া যায় খুবই কম নারীপ্রতিভা, তার কারণ হচ্ছে সমাজ তাদের আত্মপ্রকাশের সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। 'সব প্রতিভা যাঁরা জন্ম নিয়েছেন নারীরূপে, তাঁরা হারিয়ে গেছেন জনকল্যাণে; ভাগ্য যদি একবার সুযোগ দেয় তাদের নিজেদের জ্ঞাত করাতে, তাহলে দেখতে পাবেন তারা অর্জন করেছে দুরূহতম সাফল্য।'

তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতবুদ্ধিকর শিক্ষা; উৎপীড়নকারী সব সময়ই উৎপীড়িতকে পরিণত করতে চায় বামনে; পুরুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নারীদের বঞ্চিত করতে চায় সুযোগসুবিধা থেকে। 'আমরা নারীদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় ক'রে রাখি অসাধারণ মেধাপূর্ণ গুণরাশি, যা তাদের ও আমাদের জন্যে হ'তে পারতো অসামান্য উপকারী।' দশ বছর বয়সে বালিকা তার ভাইয়ের থেকে দ্রুতগামী ও অনেক বেশি চালাক; বিশ বছর বয়সের তরুণ এক বুদ্ধিমান পুরুষ আর তরুণীটি 'একটি আস্ত বোকা, লাজুক এবং ভয় পায় মাকড়সাকে'; দোষ দিতে হবে তার শিক্ষাকে। নারীদের শিক্ষা দিতে হবে পুরুষদের সমান। নারীবিরোধীরা অভিযোগ তোলে যে সুসংস্কৃত ও বুদ্ধিমান নারীরা দানবী; কিন্তু গোলমালটি এখানে যে তারা আজো ভিন্ন; যদি তারা সবাই পুরুষের মতোই পেতো সংস্কৃতি, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই এ দিয়ে উপকৃত হতো। তাদের এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার পর, তাদের করা হয়েছে অস্বাভাবিক বিধানের অধীন : তাদের অনুভূতির বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে তাদের কাছে আশা করা হয় যে তারা হবে বিশ্বস্ত, এবং যদি বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তাহলে সেটাকে গণ্য করা হয় অসদাচরণের মতো একটা ভর্ৎসনার ব্যাপার ব'লে। কাজ ছাড়া তাদের জীবনে আর কোনো সুখ নেই ব'লে অসংখ্য নারী নষ্ট হয় আলস্যে। এসব ব্যাপার স্তেঁদালকে ক্রুদ্ধ করেছে, এবং তিনি এর মাঝেই দেখেছেন সমস্ত দোষ, যার জন্যে তিরস্কার করা হয় নারীদের। তারা দেবদূতী নয়, দানবী নয়, স্ফিংক্সও নয়; তারা নিতান্তই মানুষ, সমাজের জড়বুদ্ধি রীতিনীতি যাদের নামিয়ে দিয়েছে আধা-দাসীত্বের স্তরে।

তারা উৎপীড়িত হয় ব'লেই তাদের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে থাকে না সে-সব দোষ, যা বিকৃত করে তাদের উৎপীড়নকারীদের; তারা নিজেরা পুরুষের থেকে নিকৃষ্টও নয় উৎকৃষ্টও নয়; কিন্তু এক দুর্বোধ্য বিপর্যাসের ফলে তাদের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা তাদের অনুগ্রহই করে। একাগ্রমনস্কতাকে কতোটা ঘেন্না করতেন স্তেঁদাল, তা সুবিদিত : অর্থ, গৌরব, পদমর্যাদা, ক্ষমতা তাঁর কাছে মনে হতো সবচেয়ে করুণ ব্যাপার ব'লে;

অধিকাংশ পুরুষই লাভের কাছে বিক্রি ক'রে দেয় নিজেদের; পণ্ডিত, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বুর্জোয়া, স্বামী– সবাই তাদের ভেতরের জীবন ও সত্যের প্রতিটি স্ফুলিঙ্গকে নিভিয়ে ফেলে ছাই চাপা দিয়ে; গতানুগতিক চিন্তাভাবনা ও হাতের কাছে পাওয়া আবেগ দিয়ে এবং সামাজিক বিধিবিধানের সাথে খাপ খাইয়ে, তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না; এসব আত্মাবর্জিত প্রাণীদের আবাস যে-বিশ্ব, তা এক নির্বেদের মরুভূমি। দুর্ভাগ্যবশত আছে বহু নারী, যারা গড়ায় একই ধরনের দুঃখদায়ক নর্দমায়; এগুলো হচ্ছে 'সংকীর্ণ ও প্যারিসি ভাবভাবনার' পুতুল, বা ভণ্ড ভক্ত। স্তঁদাল আমরণ ঘৃণা বোধ করেন 'সম্ভ্রান্ত নারীদের ও তাদের অপরিহার্য ভণ্ডামোর' প্রতি; তারা তাদের তুচ্ছ কাজকে করে তোলে একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ, যা তাদের স্বামীদের করে কৃত্রিমতায় অনমনীয়; কুশিক্ষার ফলে নির্বোধ, ঈর্ষাকাতর, শূন্যগর্ভ, পরচর্চাকারী, আলস্যে অপদার্থ, শীতল, শুষ্ক, ভানপূর্ণ, বিদ্বেষপরায়ণ, তারা ভ'রে রেখেছে প্যারিস ও মফস্বলগুলো; আমরা তাদের দেখতে পাই একজন মাদাম দ্য রিনাল, একজন মাদাম দ্য শস্তেলেকে ঘিরে। স্তঁদাল চরম অমঙ্গলকামী যত্নের সাথে যে-একজনকে চিত্রিত করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে মাদাম গ্রঁদে, যার মাঝে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মাদাম রোলাঁ, মেতিল্‌দের সম্পূর্ণ বিপরীতকে।

ছয়

সারসংক্ষেপ

এসব উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে প্রত্যেক লেখক প্রতিফলিত করেন যৌথ মহাকিংবদন্তি : আমরা নারীকে দেখেছি *মাংস* হিশেবে; পুরুষের দেহ উৎপাদিত হয় মায়ের দেহের ভেতরে এবং পুনরায় সৃষ্ট হয় প্রেমিকা নারীর আলিঙ্গনে। তাই নারী *প্রকৃতি*র সাথে সম্পর্কিত, সে একে করে প্রতিমূর্তিত : রক্তের উপত্যকা, প্রস্ফুটিত গোলাপ, সাইরেন, পাহাড়ের বক্রতা, সে পুরুষের কাছে উর্বর মাটি, রস, বস্তুর সৌন্দর্য এবং বিশ্বের আত্মা। *কবিতা*র চাবি সে ধ'রে রাখতে পারে তার হাতে; সে হ'তে পারে তার এ-বিশ্ব ও বাইরের মধ্যে *মধ্যস্থতাকারিণী* : সে সৌন্দর্যের দেবী বা দৈববাণীর যাজিকা, নক্ষত্র বা অভিচারিণী, সে দরোজা খোলে অতিপ্রাকৃতের, পরাবাস্তবের। সে সীমাবদ্ধতায় নষ্ট হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট; এবং তার অক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সে বিতরণ করে শান্তি ও সঙ্গতি– কিন্তু যদি সে প্রত্যাখ্যান করে এ-ভূমিকা, তাকে দেখা হয় আরাধনাকারী ম্যান্টিসরূপে, রাক্ষসীরূপে। যা-ই ঘটুক, সে দেখা দেয় *বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অপর*রূপে, যার মাধ্যমে কর্তা লাভ করে চরিতার্থতা : পুরুষের এক মানদণ্ড, তার ভারসাম্য রক্ষাকারী, তার পরিত্রাণ, তার অভিযাত্রা, তার সুখ।

কিন্তু এসব কিংবদন্তি বিভিন্নরূপে বিন্যস্ত হয়েছে আমাদের লেখকদের হাতে। মঁতেরলঁর কাছে সীমাতিক্রমণতা হচ্ছে পরিস্থিতি : তিনি সীমাতিক্রমণকারী, তিনি ওড়েন বীরদের গগনে; নারীরা তার পায়ের নিচে গুটিসুটি মেরে হাঁটে মাটির ওপর; তাঁর ও নারীর মাঝে যে-দূরত্ব, সেটা মেপে তিনি মজা পান; কখনো কখনো তিনি

নারীকে নিজের কাছে তুলে নেন, তাকে গ্রহণ করেন, তারপর তাকে ছুঁড়ে ফেলেন; কখনোই তিনি নিজেকে নামান না নারীর কর্দমাক্ত ছায়ার জগতের কাছে। লরেন্স সীমাতিক্রমণতা স্থাপন করেন শিশ্নে; শুধু নারীর দয়ায়ই শিশ্ন হচ্ছে জীবন ও শক্তি; সীমাবদ্ধতা তাই শুভ ও প্রয়োজনীয়; যে-মিথ্যা নায়ক ভান করে যে তার পা মাটিতে পাড়া দেয়ার জন্যে নয়, নরদেবতা হওয়া দূরে থাক সে পুরুষের অবস্থাও অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ক্লদেল দাবি করেন একই গভীর অনুরক্তি : তাঁর কাছে নারীর কাজ হচ্ছে জীবন লালন, যখন পুরুষ কর্মের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যায় এর সীমা; তবে ক্যাথলিকের কাছে সমস্ত পার্থিব কর্মকাণ্ড নিমজ্জিত অসার সীমাবদ্ধতায়: একমাত্র সীমাতিক্রমণকারী হচ্ছেন বিধাতা; বিধাতার চোখে কর্মী পুরুষ এবং যে-নারী সেবা করে সে-পুরুষের, তারা পুরোপুরি সমান; প্রত্যেকের কাজ হচ্ছে তার পার্থিব অবস্থাকে পেরিয়ে যাওয়া : সব ক্ষেত্রেই পাপপরিত্রাণ এক স্বায়ত্তশাসিত কর্মোদ্যোগ। ব্রেতোঁ নারীকে ভক্তি করেন, কেননা সে শান্তি আনয়ন করে।

তাঁদের প্রত্যেকের কাছে সে-ই আদর্শ নারী, যে সবচেয়ে যথাযথভাবে মূর্ত করে *অপরকে*, যে প্রকাশ করতে সমর্থ পুরুষের নিজের কাছে নিজেকে। মঁতেরলঁ, সৌর চৈতন্য, নারীর ভেতরে খোঁজেন বিশুদ্ধ পশুত্ব; লরেন্স, শিশ্নবাদী, নারীকে অনুরোধ করেন সাধারণ নারী-লিঙ্গকে সংক্ষিপ্তরূপে ধারণ করতে; ক্লদেল নারীকে সংজ্ঞায়িত করেন আত্মার বোনরূপে; ব্রেতোঁ হৃদয়ে লালন করেন মেলুজিনেকে, যার শেকড় ছড়ানো প্রকৃতির ভেতরে, তিনি গভীর আস্থা পোষণ করেন নারী-শিশুর সহায়তার ওপর; স্তেঁদাল চান তাঁর দয়িতা হবে বুদ্ধিমান, সুসংস্কৃত, চেতনা ও আচরণে স্বাধীন : সমান একজন। কিন্তু সমান একজনের, নারী-শিশুর, আত্মার বোনের, নারী-লিঙ্গের, নারী-পশুর জন্যে যে-একমাত্র পার্থিব নিয়তিটি নির্ধারিত হয়ে আছে, তা সব সময়ই হচ্ছে পুরুষ। যে-কোনো অহংই নারীর ভেতরে নিজেকে খুঁজুক না কেনো, সে নিজেকে পেতে পারে শুধু তখনই, যদি নারী রাজি হয় তার মহাপরীক্ষারূপে কাজ করতে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজেকে ভুলে যেতে হবে নারীকে এবং ভালোবাসতে হবে। মঁতেরলঁ সে-নারীকে করুণা করতে রাজি, যে তাকে পরিমাপ করতে দেয় তার পৌরুষ; লরেন্স সে-নারীর উদ্দেশে নিবেদন করেন জ্বলন্ত স্তোত্র, যে লরেন্সের জন্যে বিসর্জন দেয় নিজের সত্তা; ক্লদেল উন্নীত করেন সে-দাসীকে, নারী-ভৃত্যকে, ভক্তকে, যে পুরুষের অনুগত হয়ে অনুগত হয় বিধাতার; ব্রেতোঁ নারীর থেকে আশা করেন মানুষের পাপমোচন, কেননা নারী তার সন্তান ও তার প্রেমিককে সামগ্রিকভাবে ভালোবাসতে সমর্থ; এবং এমনকি স্তেঁদালেও নায়িকারা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী তাঁর পৌরুষসম্পন্ন নায়কদের থেকে, কেননা নারীরা তাদের সংরাগের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে অধিকতর বিহ্বল প্রচণ্ডতার সাথে; তারা পুরুষকে তার নিয়তি চরিতার্থ করতে সাহায্য করে, যেমন প্রোহেৎ সহায়তা করে রদরিগের পাপমোচনে; স্তেঁদালের উপন্যাসে প্রায়ই ঘটে যে নারীরা তাদের প্রেমিকদের রক্ষা করে ধ্বংস, কারাগার, বা মৃত্যু থেকে। মঁতেরলঁ ও লরেন্স নারীর ভক্তিকে তার দায়িত্ব হিশেবে দাবি করেন। ক্লদেল, ব্রেতোঁ, ও স্তেঁদাল একে একটা স্বাধীন পছন্দের কাজ হিশেবে দেখেন মুগ্ধচোখে; এটা তাঁরা প্রাপ্য ব'লে দাবি করেন না, তবে কামনা করেন।

পরিচ্ছেদ ৩

কিংবদন্তি ও বাস্তবতা

নারীর কিংবদন্তি সাহিত্যে বড়ো ভূমিকা পালন করে; কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে কী এর গুরুত্ব? প্রথা ও ব্যক্তির আচরণকে এটা কতোটা প্রভাবিত করে? এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে বর্ণনা করা দরকার বাস্তবের সাথে এ-কিংবদন্তির সম্পর্ক কেমন।

কিংবদন্তি আছে নানা ধরনের। মানুষের অবস্থার এক অপরিবর্তনীয় দিককে পরিশোধিত ক'রে– যেমন, মানবজাতিকে 'ভাগ' করা হয় দু-শ্রেণীর মানুষে– এটি, নারীর কিংবদন্তিটি, এক অনড় কিংবদন্তি। প্লাতোয়ী ভাবের জগতে এটা প্রক্ষেপ করে এমন এক বাস্তবতা, যার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে বা ধারণাবদ্ধ করা হয়েছে অভিজ্ঞতা ভিত্তি ক'রে; ঘটনা, মূল্য, তাৎপর্য, জ্ঞান, পর্যবেক্ষণলব্ধ সূত্রের বদলে এটা গ্রহণ করে এক লোকোত্তর ভাব, যা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, প্রয়োজনীয়। এ-ভাব বিতর্কের উর্ধ্বে, কেননা এটা বিদ্যমানের বাইরের : এটা ভূষিত ধ্রুব সত্যে। তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, ঘটনাচক্রজাত, নানা ধরনের জীবন যাপনকারী বাস্তব নারীদের বিপক্ষে এ-কিংবদন্তিমূলক চিন্তা উপস্থাপন করে চিরন্তনী নারী, যা অনন্য ও অপরিবর্তনীয়। যখন রক্তমাংসের নারীদের আচরণ বিরুদ্ধে যায় নারীধারণার এ-সংজ্ঞার, তখন বাস্তব নারীদেরই নির্দেশ করা হয় ভুল ব'লে : বলা হয় না যে নারীত্ব একটা ভুল ধারণা, বরং বলা হয় সংশ্লিষ্ট নারীরাই নারীধর্মী নয়। কিংবদন্তির বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতার সত্যগুলো অচল। তবে, একভাবে, এর উৎস আছে অভিজ্ঞতার মধ্যেই। এটা খুবই সত্য যে নারী পুরুষ থেকে ভিন্ন, এবং এ-ভিন্নতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় বাসনায়, আলিঙ্গনে, প্রেমে; কিন্তু প্রকৃত সম্পর্কটি হচ্ছে এক পারস্পরিকতার সম্পর্ক; এভাবে এটা সৃষ্টি করে খাঁটি নাটক। কাম, প্রেম, বন্ধুত্ব, এবং এগুলোর বিপরীতগুলো, যেমন, প্রতারণা, ঘৃণা, প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে সম্পর্কটি হচ্ছে দুটি সচেতন সত্তার মধ্যে যুদ্ধ, যাদের প্রত্যেকেই হ'তে চায় অপরিহার্য, এটা হচ্ছে স্বাধীন সত্তাদের পারস্পরিক স্বীকৃতি, যারা প্রতিপন্ন করে পরস্পরের স্বাধীনতা, এটা হচ্ছে বিরূপতা থেকে অংশগ্রহণের দিকে অস্বচ্ছ উত্তরণ। নারীর অবস্থান নেয়া হচ্ছে ধ্রুব অপর-এর অবস্থান নেয়া, যাতে কোনো পারস্পরিকতা নেই, সে যে একজন কর্তা, একজন সহচর মানুষ, সমস্ত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে তা অস্বীকার করা।

বাস্তবে, অবশ্য, নারী দেখা দেয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে; কিন্তু নারী বিষয়টি ঘিরে গ'ড়ে ওঠা প্রতিটি কিংবদন্তির লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে সংক্ষেপিত রূপে *হুবহু* ধারণ; প্রতিটিই হ'তে চায় অনন্য। পরিণামে, দেখা দেয় একরাশ পরস্পরবিরুদ্ধ কিংবদন্তি, এবং নারীত্বের ধারণা প্রকাশ করে যে-সব অদ্ভুত অসঙ্গতি, সেগুলোর কথা ভেবে

বিবর্ণ হয়ে ওঠে পুরুষেরা। যেহেতু এসব আদিরূপের অধিকাংশের সাথে কিছুটা মিল আছে প্রত্যেক নারীরই– যেগুলোর প্রত্যেকটি দাবি করে যে সেটিই ধারণ করে নারী সম্পর্কে একমাত্র সত্য– তাই আজকালকার পুরুষেরাও এমন বিস্ময়ে বিচলিত হয় তাদের সঙ্গী নারীদের রূপে, যেমন প্রাচীন সোফিস্টরা বিস্মিত হতো একথা ভেবে যে মানুষ কী ক'রে একই সময়ে হয় গৌর ও কৃষ্ণ! সে-পুরুষেরা, যারা ভাগ্যান্বেষী, জোচ্চোর, ফটকাবাজ, তারা সাধারণত ত্যাজ্য হয় তাদের গোত্রের দ্বারা; কিন্তু নারীরা আইনের মধ্যে থেকেও কামকলা প্রয়োগ ক'রে পটাতে পারে তরুণদের, এমনকি পরিবারের কর্তাদের, ফলে নাশ হ'তে পারে তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সম্পত্তি। এমন কিছু নারী আত্মসাৎ করে তাদের শিকারদের ধনসম্পত্তি বা অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে পায় উত্তরাধিকার; এ-কাজকে যেহেতু খারাপ মনে করা হয়, তাই যারা এটা করে, তাদের বলা হয় 'নষ্টনারী'। কিন্তু সত্য হচ্ছে এর বিপরীতে তারা অভিভাবক দেবদূতীরূপে উপস্থিত হ'তে পারে অন্য কোনো পরিবেশে– বাড়িতে তাদের পিতা, ভাই, স্বামী, বা প্রেমিকদের সঙ্গে; যে-বিলাসিনী নারী 'লোম তোলে' ধনী পুঁজিপতির, সে হয়তো চিত্রকর ও লেখকদের কাছে দয়াবতী পৃষ্ঠপোষিকা। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আস্পাসিয়া বা মাদাম দ্য পঁপাদোরের ব্যক্তিত্বের দ্ব্যর্থতা বোঝা সহজ। নারীদের যদি চিত্রিত করা হয় আরাধনাকারী ম্যান্টিস, ম্যানড্রেক, দানবীরূপে, তাহলে তাদের মধ্যে কাব্যদেবী, দেবী মহামাতা, বিয়াত্রিসেকেও পাওয়া খুবই গোলমেলে ব্যাপার।

দলগত প্রতীক ও সামাজিক শ্রেণীরূপগুলোকে যেহেতু সাধারণত সংজ্ঞায়িত করা হয় বিপরীতার্থক শব্দযুগলের সাহায্যে, তাই পরস্পরবিপরীত মূল্যধারণকে মনে হবে চিরন্তনী নারীর এক সহজাত বৈশিষ্ট্য ব'লে। দেবীর মতো মায়ের সাথে সম্পর্কিত ধারণা হচ্ছে নিষ্ঠুর সৎ মা, লক্ষ্মীর মতো তরুণীর সাথে সম্পর্কিত বিকারগ্রস্ত কুমারী : তাই কখনো কখনো বলা হয় যে মা মৃত্যুর সমান, প্রত্যেক কুমারীই হচ্ছে বিশুদ্ধ আত্মা বা শয়তানের কাছে উৎসর্গিত দেহ।

কিংবদন্তিকে তাৎপর্য শনাক্তির সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়; তাৎপর্য সীমায়িত থাকে বস্তুর মধ্যে; এটা মনের কাছে ধরা দেয় যাপিত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে; আর সেখানে কিংবদন্তি হচ্ছে এক সীমাতিক্রমী ধারণা, যা মানসিক উপলব্ধিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যায়। মিশেল লিরিস *ল'আজ দ'অম*-এ যখন নারীর যৌনাঙ্গ সম্পর্কে তাঁর স্বপ্নবিভাব বর্ণনা করেন, তখন তিনি বলেন তাৎপর্যপূর্ণ জিনিশের কথা, তিনি কোনো কিংবদন্তি বর্ণনা করেন না। নারীর শরীর দেখে বিস্ময় জাগে, ঋতুস্রাবে ঘেন্না লাগে মূর্ত বাস্তব উপলব্ধি থেকে। যে-অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে নারীশরীরের ইন্দ্রিয়সুখাবহ গুণ, তাতে কিংবদন্তির কিছু নেই, এবং এগুলো যদি কেউ ফুল বা উপলের সাথে তুলনা ক'রে বর্ণনা করেন, তাতে তিনি কিংবদন্তির জগতে যান না। কিন্তু নারী হচ্ছে দেহ, দেহ হচ্ছে রাত্রি ও মৃত্যু, বা দেহ হচ্ছে মহাজগতের মহিমা, এসব বলা হচ্ছে পার্থিব সত্য ছেড়ে শূন্য আকাশে উড়াল দেয়া। কেননা পুরুষও নারীর কাছে দেহ; এবং নারী নিতান্ত এক দৈহিক বস্তু নয়; এবং দেহ প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় প্রকাশ করে বিশেষ তাৎপর্য। এটা খুবই সত্য যে নারী– পুরুষের মতোই– প্রকৃতির ভেতরে

শেকড়ছড়ানো এক মানুষ; পুরুষের থেকে সে অধিকতর দাসত্বে বন্দী তার প্রজাতির কাছে, তার পশুত্ব অনেক বেশি স্পষ্ট; কিন্তু যেমন পুরুষের ভেতরে তেমনি নারীর ভেতরেও বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হয় অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, সেও মানুষের জগতের অন্তর্ভুক্ত। তাকে প্রকৃতির সাথে সমীভূত করা নিতান্তই পূর্বসংস্কারজাত কাজ।

শাসক জাতের কাছে কম কিংবদন্তিই বেশি সুবিধাজনক হয়েছে নারীকিংবদন্তির থেকে : এটা প্রতিপাদন করে সমস্ত বিশেষাধিকারের যাথার্থ্য, এমনকি অনুমোদন করে সেগুলোর অপব্যবহার। শারীরবৃত্তিক যে-সব দুঃখকষ্ট ও ভার নারীর নিয়তি, সেগুলো দূর করা নিয়ে পুরুষের মাথাব্যথা নেই, কেননা সেগুলো 'প্রকৃতির ঈপ্সিত' : সেগুলোর অজুহাতে পুরুষ বরং বাড়িয়ে চলে নারীর দুঃখকষ্ট, যেমন, কামসুখ লাভের কোনো অধিকার দেয়া হয় না নারীকে, তাকে খাটতে বাধ্য করা হয় ভারবাহী পশুর মতো।

এসব কিংবদন্তির মধ্যে নারীর 'রহস্য'-এর কিংবদন্তিটি পুরুষের মনে যতোটা দৃঢ়ভাবে নোঙর ফেলে আছে, ততোটা আর কোনো কিংবদন্তি নয়। এর আছে অজস্র সুবিধা। প্রথমত, যা কিছু অব্যাখ্যেয় মনে হয়, এটা দিয়ে সে-সব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়; যে-পুরুষ নারীকে 'বোঝে না', সে সুখ পায় মনের একটা মন্ময় উনতাকে বস্তুগত প্রতিরোধ দিয়ে বদল ক'রে; নিজের অজ্ঞতা স্বীকারের বদলে সে নিজের বাইরে বোধ করে এক 'রহস্য'-এর উপস্থিতি : এটা এমন এক অজুহাত, যা একসঙ্গে তুষ্ট করে আলস্য ও অহমিকাকে। প্রেমাহত হৃদয় এভাবে এড়িয়ে যায় বহু নিরাশা : প্রেমিকার আচরণ যদি হয় খামখেয়ালপূর্ণ, কথাবার্তা হয় মূঢ়, তাহলে এসব কিছুকে অব্যাহতি দেয়ার কাজ করে এ-রহস্য। এবং পরিশেষে, আবার রহস্যের কল্যাণে, স্থায়ী করা হয় সে-নঞর্থক সম্পর্ক, কিয়েৰ্কেগার্দের কাছে যা অশেষভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিলো সদর্থক অধিকারের থেকে।

নারী, এক অর্থে, নিশ্চয়ই রহস্যময়, মেটারলিংকের ভাষায় 'যেমন সমগ্র বিশ্বই রহস্যময়'। পুরুষ নারীর কামসুখের রীতি, ঋতুস্রাবের ঝামেলা, এবং সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা সম্পর্কে অজ্ঞ। সত্যি হচ্ছে দু-পক্ষেই আছে রহস্য : পুংলিঙ্গসম্পন্ন *অপররূপে*, প্রত্যেক পুরুষেরও আছে আন্তর একটি রূপ, একটি অন্তর্গত সত্তা, যা নারীর পক্ষে অভেদ্য; অন্যদিকে নারীও অজ্ঞ পুরুষের কামসুখ সম্পর্কে। কিন্তু যে-বিশ্বজনীন সূত্র আমি বর্ণনা করেছি, সে-অনুসারে পুরুষ যে-সমস্ত ধারণা দিয়ে বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তা করে সেগুলো *তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, ধ্রুবরূপে* প্রতিষ্ঠিত : এখানে, যেমন সবখানে, তারা পারস্পরিকতাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। পুরুষের কাছে এক রহস্য, তাই নারীকে বিবেচনা করা হয় সারসত্তায় রহস্যময়।

তার পরিস্থিতি খুবই দায়ী নারী সম্পর্কে এ-ধারণার জন্যে। তার শারীরবৃত্তিক প্রকৃতি খুবই জটিল : সে নিজে এর এমন অধীন যেনো সে অনুবর্তী বাইরের কোনো নিরর্থক কাহিনীর; তার দেহকে নিজের সুস্পষ্ট প্রকাশ ব'লে মনে হয় না তার কাছে; এর ভেতরে তার নিজেকেই নিজের অচেনা মনে হয়।

তবে সাধারণভাবে যাকে নির্দেশ করা হয় রহস্য ব'লে, তা সচেতন সত্তার কোনো মন্ময় একাকীত্বও নয়, গোপন জৈবিক জীবনও নয়। শুধু যোগাযোগের স্তরেই শব্দটি প্রকাশ করে তার প্রকৃত অর্থ : এটা কোনো শুদ্ধ নিঃশব্দতায়, অন্ধকারে, অনুপস্থিতিতে

পরিণত করা নয়, এটা জ্ঞাপন করে এক বিভ্রান্তিকর রূপ, যা নিজেকে প্রকাশ করতে ও স্পষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। নারী এক রহস্য, একথা বলার অর্থ এ নয় যে সে নীরব, বরং এর অর্থ হচ্ছে তার ভাষা দুর্বোধ্য; সে আছে, কিন্তু অবগুণ্ঠনের আড়ালে ঢাকা; এসব অনিশ্চিত রূপ পেরিয়ে সে আছে। সে কী? দেবদূতী, দানবী, অনুপ্রাণিত, অভিনেত্রী? মনে করা যেতে পারে যে এসব প্রশ্নের উত্তর আছে, কিন্তু সেগুলো আবিষ্কার করা অসম্ভব, অথবা এও মনে করা যেতে পারে কোনো উত্তরই যথার্থ নয়, কেননা এক মৌল দ্ব্যর্থবোধকতা নারীসত্তার বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ : হয়তো নিজের অন্তরে সে নিজের কাছেও অনিরূপণীয় : একটি স্ফিংক্স্।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে *সে কী* তা স্থির করতে গিয়ে সে-ই বিব্রত বোধ করবে; তবে এটা এজন্যে নয় যে গূঢ় সত্যটি এতোই অস্বচ্ছ যে শনাক্ত করা যায় না : এটা এজন্যে যে এ-এলাকায় কোনো সত্য নেই। একজন অস্তিত্বশীল যা করে, সে তা ছাড়া আর কিছুই নয়; সম্ভবপর বাস্তবকে পেরিয়ে ছড়িয়ে থাকে না, সারসত্তা অস্তিত্বের পূর্ববর্তী নয় : বিশুদ্ধ মন্ময়তায়, মানুষ *কিছু নয়*। তাকে পরিমাপ করতে হবে তার কাজ দিয়ে। কোনো কৃষাণী সম্পর্কে কেউ বলতে পারে যে সে একটি ভালো বা খারাপ শ্রমিক, কোনো অভিনেত্রী সম্পর্কে বলা যায় যে তার প্রতিভা আছে বা নেই; কিন্তু কেউ যদি কোনো নারীকে বিবেচনা করে তার সীমাবদ্ধ রূপে, তার আন্তর সত্তায়, তাহলে আসলে তার সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব নয়, তখন তার কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকে না। তার কাম বা দাম্পত্য সম্পর্কে, সমস্ত সম্পর্কে, নারী যেখানে একটি অনুগত দাসী, অপর, তাকে সেখানে দেখা হয় তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে। লক্ষণীয় যে নারী সহকর্মীদের, সহচরদের কোনো রহস্য নেই; অন্য দিকে, যদি অনুগত দাসটি হয় পুরুষ, যদি একজন প্রবীণ বা ধনী নারী বা পুরুষের কাছে তরুণটি, উদাহরণস্বরূপ, পালন করে পরিহার্য বস্তুর ভূমিকা, তখন সেও হয়ে ওঠে রহস্যাবৃত। এটা আমাদের কাছে উন্মোচন করে নারীর রহস্যের তলদেশের এক ভিত্তিমূল, যা প্রকৃতিতে আর্থনীতিক।

কোনো ভাবাবেগকে কোনো বস্তু ব'লে মনে করা যায় না। জিদ লিখেছেন, 'ভাবাবেগের ক্ষেত্রে বাস্তবিককে কাল্পনিকের থেকে পৃথক করা হয় না।' কাল্পনিক ও বাস্তবিকের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব শুধু আচরণ দিয়ে। পুরুষ যেহেতু পৃথিবীতে আছে এক সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানে, সে সক্রিয়ভাবে দেখাতে পারে তার প্রেম; অনেক সময় সে ভরণপোষণ করে নারীটির, বা কমপক্ষে আর্থিকভাবে সাহায্য করে; নারীটিকে বিয়ে ক'রে তাকে দেয় সামাজিক মর্যাদা; সে তাকে উপহার দেয়; তার আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা তাকে উদ্যোগ নিতে সাহায্য করে। অধিকাংশ সময়ই পুরুষটি থাকে ব্যস্ত, নারীটি কর্মহীন : পুরুষটি যতোক্ষণ নারীটির সাথে থাকে ততোক্ষণ সে নারীটিকে সময় *দেয়*; নারীটি নেয় : তা কি সুখের সাথে, সংরাগের সাথে, না কি শুধু প্রমোদের জন্যে? নারীটি কি এসব গ্রহণ করে প্রেমে, না কি নিজের স্বার্থে? সে কি তার স্বামীকে বা তার বিয়েকে ভালোবাসে? এমনকি পুরুষটির প্রমাণও দ্ব্যর্থতাবোধক : এটা-সেটা উপহার কি ভালোবেসে দেয়া হয়েছে, না কি করুণা ক'রে? কিন্তু কোনো নারী যখন কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্কবশত পায় অজস্র সুবিধা, তখন কোনো নারীর সঙ্গে

কোনো পুরুষের সম্পর্ক পুরুষটির জন্যে ততোটা মাত্র লাভজনক যতোটা সে ভালোবাসে নারীটিকে। তাই তার মনোভাবের সম্পূর্ণ চিত্র থেকে তার প্রীতির মাত্রা অনেকটাই নির্ণয় করা যায়।

অধিকাংশ নারীর জন্যেই সীমাতিক্রমণের পথ রুদ্ধ : কেননা তারা কিছুই করে না, তাই তারা *নিজেদের কিছু ক'রে তুলতে* ব্যর্থ হয়। তারা নিরন্তর ভাবে তারা *কী হ'তে পারতো*, এবং এটা তাদের মনে প্রশ্ন জাগায় তারা *কী?* এটা এক নিষ্ফল প্রশ্ন। পুরুষ যে ব্যর্থ হয় নারীত্বের গূঢ় সারসত্তা আবিষ্কারে, তা শুধু এজন্যে যে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। বিশ্বের প্রান্তিক অবস্থানে রেখে এ-বিশ্ব দিয়ে নারীকে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে না; তার রহস্য শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই লুকিয়ে রাখে না।

এছাড়াও, সব উৎপীড়িতের মতোই, নারী ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন ক'রে রাখে তার বস্তুগত সত্য; দাস, ভৃত্য, দরিদ্র, যারা নির্ভরশীল কোনো প্রভুর খেয়ালখুশির ওপর, তারা সবাই তার দিকে মেলে রাখতে শেখে একটি পরিবর্তনহীন হাসি বা একটা বিভ্রান্তিকর নির্বিকারত্ব; আসল ভাবাবেগ, বাস্তবিক আচরণ তারা সযত্নে গোপন ক'রে রাখে। অধিকন্তু কিশোরী বয়স থেকে নারীকে শেখানো হয় পুরুষের কাছে মিথ্যে কথা বলতে, ফন্দি আঁটতে, ধূর্ত হ'তে। পুরুষের সাথে কথা বলার সময় সে মুখের ওপর প'রে থাকে একটা কৃত্রিম ভাব; সে সতর্ক, কপটতাপূর্ণ, সে করে অভিনয়।

কিন্তু কিংবদন্তিমূলক চিন্তাধারায় শনাক্ত করা হয়েছে যে-নারীত্বের রহস্য, তা এক গভীরতর ব্যাপার। আসলে, এটা অবিলম্বে স্থাপন করা হয় ধ্রুব অপর-এর পুরাণে। বিশুদ্ধ সীমাবদ্ধ রূপে এটা স্পষ্টতই হবে এক রহস্য। এটা নিজেই হবে এক রহস্য এ-ঘটনা থেকে যে এটা নিজের কাছেই রহস্য; এটা হবে ধ্রুব রহস্য।

একইভাবে এটা সত্য যে তাদের আসল মনোভাব গোপন ক'রে রাখার ফলে সৃষ্টি হয় যে-গোপনীয়তা, তার বাইরে ততোখানি রহস্যই থাকে কৃষ্ণকায়ে, পীতকায়ে, যতোখানি ধ্রুবভাবে তাদের মনে করা হয় পরিহার্য অপর। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে আমেরিকার নাগরিকেরা গভীরভাবে হতবুদ্ধি করে গড়পড়তা ইউরোপীয়দের, কিন্তু কেউ তাদের কখনো 'রহস্যময়' মনে করে না : নম্রভাবে তারা বলে যে আমেরিকার নাগরিকদের তারা বুঝতে পারে না। এবং একইভাবে নারীও সব সময় পুরুষকে 'বোঝে' না; তাই ব'লে পুরুষের রহস্য ব'লে কোনো জিনিশ নেই। ব্যাপার হচ্ছে ধনী আমেরিকা, এবং পুরুষ, আছে প্রভুর ধারে, আর দাসদেরই আছে রহস্য।

একথা সত্য, রহস্যের সদর্থক বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা ধ্যান করতে পারি শুধু প্রতারণা করার উদ্দেশ্যের প্রদোষকালীন পার্শ্বপথে; কিন্তু কোনো কোনো গৌণ দৃষ্টিভ্রমের মতোই তার দিকে একদৃষ্টে তাকালে, তা অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়। 'রহস্যময়ী' নারীদের চিত্রিত করতে গিয়ে সাহিত্য সব সময়ই ব্যর্থ হয়; শুধু উপন্যাসের শুরুতেই তারা দেখা দেয় অদ্ভুত, বিভ্রান্তিকর চরিত্ররূপে; কিন্তু গল্পটি যদি অসমাপ্ত থেকে না যায়, তবে শেষে তারা ত্যাগ করে তাদের রহস্য এবং তারপর হয়ে ওঠে নিতান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্বচ্ছ মানুষ। উদাহরণস্বরূপ, পিটার শিনির বইগুলোর নায়কেরা সব সময়ই বিস্মিত হয় নারীদের অভাবিত চপলতায় : তারা কখন কী করবে সে-সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণাই করা যায় না, তারা সব হিশেবনিকেশকে বিপর্যস্ত ক'রে

দেয়। ঘটনা হচ্ছে একবার যখন পাঠকদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় তাদের কার্যকলাপের কারণ, তখন দেখা যায় যে ওগুলো কাজ সাধনের খুবই সরল পদ্ধতি : এ-নারীটি ছিলো একটি গুপ্তচর, ওইটি ছিলো চোর; প্লট যতোই চাতুর্যপূর্ণই হোক-না-কেনো, রহস্যের জট খোলার একটি চাবি থাকে সব সময়ই; লেখকের যদি থাকতো বিশ্বের সমস্ত প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি, তাহলে এটা অন্য রকম হ'তে পারতো না। রহস্য কখনোই মরীচিকার থেকে বেশি কিছু নয়, দেখার জন্যে আমরা যখন কাছাকাছি আসি, তখন তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমরা দেখতে পাই যে পুরুষের কাছে তার উপকারিতা দিয়েই অনেকাংশে ব্যাখ্যা করা যায় কিংবদন্তি। নারীর কিংবদন্তি একটা বিলাস। এটা দেখা দিতে পারে তখন, পুরুষ যখন মুক্তি পায় তার জীবনযাপনের জরুরি চাহিদাগুলো থেকে; সম্পর্কগুলো যতো বাস্তবিকভাবে যাপিত হয়, ততোই কম আদর্শায়িত হয়। প্রাচীন মিশরের ফেলা, বেদুইন চাষী, মধ্যযুগের কারিগর, আজকের শ্রমিক তার বিশেষ নারীটির সাথে সম্পর্কে থাকে তার কাজ ও দারিদ্র্যের মধ্যে, তা এতো সুনির্দিষ্ট যে তাকে কোনো শুভ বা অশুভ অলৌকিক আভা দিয়ে অলঙ্কৃত করা যায় না। যে-সব পর্ব ও সামাজিক শ্রেণী স্বপ্ন দেখার মতো অবকাশ পেয়েছিলো, সেগুলোই সৃষ্টি করেছে নারীত্বের, শাদা বা কালো, ভাবমূর্তি। তবে বিলাসের সাথে ছিলো উপযোগিতাও; এসব স্বপ্ন অপ্রতিরোধ্যভাবে চালিত হয়েছিলো স্বার্থ দিয়ে। এসব কিংবদন্তির মাধ্যমে কার্যকর রীতিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজগুলো ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো তাদের বিধিবিধান ও প্রথা; কিংবদন্তিরূপেই গোত্রীয় অবশ্যকর্তব্যগুলো প্রত্যেকের চেতনায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো বিশ্বাসরূপে। ধর্ম, প্রথা, ভাষা, কাহিনী, গান, চলচ্চিত্র প্রভৃতি যোগাযোগ-মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এসব কিংবদন্তি ঢোকে এমন সব মানুষের মধ্যেও, যারা খুবই কঠোরভাবে আবদ্ধ বাস্তব অবস্থার দাসত্বে। এতে প্রত্যেকে দেখতে পায় তার নীরস অভিজ্ঞতাগুলোর শোধিত রূপ : যে-নারীকে সে ভালোবাসে, তার দ্বারা প্রতারিত হয়ে সে ঘোষণা করে যে নারী এক বাতিকগ্রস্ত জরায়ু; অন্য কেউ তার নপুংসকতা দিয়ে আবিষ্ট হয়ে নারীকে বলে আরাধনাকারী ম্যান্টিস; আবার একজন উপভোগ করে তার স্ত্রীর সঙ্গ : দ্যাখো, নারী হচ্ছে সঙ্গতি, বিশ্রাম, সুপ্রসন্ন মৃত্তিকা। পকেট-মাপের একটি ধ্রুবর বিনিময়ে, যা থাকে অধিকাংশ পুরুষেরই, চিরন্তনের জন্যে অভিরুচি পরিতৃপ্ত হয় কিংবদন্তিতে। ক্ষুদ্রতম আবেগ, তুচ্ছ বিরক্তি হয়ে ওঠে এক শাশ্বত ধারণার প্রতিফলন – এমন এক প্রতিভাস, যাতে অহমিকা বোধ করে প্রীতিকর শ্লাঘা।

কিংবদন্তি হচ্ছে মিথ্যে বস্তুনিষ্ঠতার এক ফাঁদ, যার দিকে হঠকারীর মতো ছুটে যায় সে-পুরুষ, যে নির্ভর করে আগে-থেকে-প্রস্তুত মূল্যায়নে। এখানে আমরা আবার জড়িয়ে পড়ি বাস্তবিক অভিজ্ঞতার স্থানে বসানো একগুচ্ছ মূর্তি এবং এর জন্যে দরকার যে-মুক্তমনের বিচার, তার সাথে। একজন স্বায়ত্তশাসিত অস্তিত্বের সঙ্গে খাঁটি সম্পর্কের স্থানে নারীর কিংবদন্তি স্থাপন করে মরীচিকার এক অপরিবর্তনীয় ধারণা। 'মরীচিকা! মরীচিকা!' চিৎকার ক'রে ওঠেন লাফর্গ। 'আমাদের উচিত তাদের খুন করা, কেননা তাদের আমরা বুঝতে পারি না; তার চেয়ে ভালো তাদের অষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া, শিক্ষা দেয়া, এমন করা যাতে তারা ছেড়ে দেয় তাদের রত্নের জন্যে রুচি,

তাদের ক'রে তুলতে হবে আমাদের সত্যিকারের সমান সঙ্গী, আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাদের ভিন্নভাবে পোশাক পরাতে হবে, তাদের চুল ছোটো ক'রে ছাঁটাতে হবে, যা-কিছু এবং সব কিছু বলতে হবে তাদের সাথে।' পুরুষ যদি নারীকে প্রতীকের ছদ্মবেশ পরানো ছেড়ে দেয়, তাহলে পুরুষের কোনো ক্ষতি নেই। লাক্লস, স্তঁদাল, হেমিংওয়ের নায়িকাদের কোনো রহস্য নেই, সেজন্যে তারা কম আকর্ষণীয় নয়। নারীর মধ্যে একজন মানুষকে স্বীকার করলে পুরুষের অভিজ্ঞতা দরিদ্র হয়ে ওঠে না : এতে এর বৈচিত্র্য, এর ঐশ্বর্য, বা এর তীব্রতা এতোটুকুও কমে না, যদি তা ঘটে দুটি মানুষের মধ্যে। সমস্ত কিংবদন্তি বর্জন করা হ'লে ধ্বংস করা হয় না দুটি লিঙ্গের সব নাটকীয় সম্পর্ক, পুরুষের কাছে নারীর বাস্তবতা দিয়ে খাঁটিরূপে প্রকাশিত তাৎপর্য এতে অস্বীকার করা হয় না; এতে বাতিল হয় না কবিতা, প্রেম, অভিযাত্রা, সুখ, স্বপ্নদেখা। যা চাই, তা হচ্ছে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে আচরণ, ভাবাবেগ, সংরাগ।

'হারিয়ে গেছে নারী। নারীরা কোথায়? আজকালকার নারীরা নারীই নয়!' আমরা দেখেছি এসব রহস্যময় পদ কী অর্থ বোঝায়। পুরুষদের চোখে– এবং সে-নারীবাহিনী, যারা দেখে পুরুষদের চোখ দিয়ে, তাদের কাছে– নারীর শরীর থাকা বা স্ত্রী অথবা মা হিশেবে নারীর কাজগুলো করাই 'খাঁটি নারী' হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। কামে ও মাতৃত্বে কর্তা হিশেবে নারী স্বায়ত্তশাসন দাবি করতে পারে; তবে 'খাঁটি নারী' হওয়ার জন্যে নিজেকে তার স্বীকার ক'রে নিতে হবে অপর-রূপে। আজকালকার পুরুষেরা দেখিয়ে থাকে মনোভাবের এক ধরনের কপটতা, যা নারীর মনে সৃষ্টি করে বেদনাদায়ক ক্ষত : সব মিলিয়ে তারা নারীকে একজন সহচর মানুষ, একজন সমান মানুষ হিশেবে মেনে নিতে চায়; কিন্তু তবু চায় যে নারী থাকবে অপ্রয়োজনীয়। নারীর কাছে এ-দুটি নিয়তি অসঙ্গতিপূর্ণ; একটির সাথেও ঠিকমতো মেলাতে না পেরে সে দুলতে থাকে একটি থেকে আরেকটিতে, এবং এ থেকে জন্মে তার ভারসাম্যের অভাব। পুরুষের কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে কোনো ছেদ নেই : কাজকর্মে ও বিশ্বে পুরুষ যতো বেশি প্রতিষ্ঠা করে তার অধিকার, তাকে দেখায় ততো বেশি পৌরুষসম্পন্ন; তার মধ্যে মিলিত হয় মানবিক ও প্রাণশক্তিগত গুণগুলো। আর সেখানে নারীর স্বাধীন সাফল্যগুলো তার নারীত্বের বিরোধী; কেননা 'খাঁটি নারী'র কাছে চাওয়া হয় যে নিজেকে সে ক'রে তুলবে বস্তু, ক'রে তুলবে অপর।

এটা খুবই সম্ভব যে সংশোধিত হ'তে চলছে পুরুষের সংবেদনশীলতা ও যৌনতা। ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছে এক নতুন সৌন্দর্যতত্ত্ব। সমতল বুক ও সংকীর্ণ নিতম্বের ফ্যাশন– ছেলেদের মতো অবয়ব– যদিও টিকেছে স্বল্প সময় ধ'রে, তবু অতীত শতাব্দীগুলোর অতি-অতি-বৃদ্ধিশীল আদর্শ আর ফিরে আসে নি। চাওয়া হয় যে নারীর দেহ হবে মাংস, তবে সতর্কভাবে; এটাকে হ'তে হবে তন্বী এবং মেদে বোঝাই হ'তে পারবে না; হ'তে হবে পেশল, কোমল, সবল, এটাকে জ্ঞাপন করতে হবে সীমাতিক্রমণতার ব্যঞ্জনা; অতিশয় ছায়াবৃত উষ্ণগৃহের উদ্ভিদের মতো বিবর্ণ হবে না এটা, তবে ভালো হয় যদি হয় রোদে-খোলা-থেকে কর্মজীবী পুরুষের কবন্ধের মতো রোদ-পোড়া তামাটে। নারীর পোশাক ব্যবহারিক হয়ে উঠছে ব'লে তাকে কামহীন দেখালে চলবে না : বরং ঘটেছে উল্টোটা, খাটো স্কার্ট পা ও উরুকে ক'রে তুলেছে

এতো আকর্ষণীয় যে তা আগে কখনো ঘটে নি। কাজ যে কেড়ে নেবে নারীর যৌনাবেদন তার কোনো কারণ নেই। নারীকে একই সঙ্গে একজন সামাজিক ব্যক্তি ও কামের শিকার ব'লে ভাবা বেশ পীড়াদায়ক।

যা নিশ্চিত তা হচ্ছে আজ নারীদের পক্ষে একই সাথে স্বায়ত্তশাসিত মানুষ হিশেবে তাদের মর্যাদা ও তাদের নারীসুলভ নিয়তি মেনে নেয়া খুবই কঠিন; এটা সে-নির্বোধ ভুল ও অস্থিরতার উৎস, যার জন্যে তাদের কখনো কখনো মনে করা হয় 'বিলুপ্ত লিঙ্গ'। সন্দেহ নেই যে মুক্তির জন্যে কাজের থেকে অন্ধ দাসত্বের কাছে আত্মসমর্পণ অনেক বেশি আরামপ্রদ : মৃতরা জীবিতদের থেকে অনেক ভালোভাবে খাপ খায় মাটির সাথে। সব দিক দেয়ই অতীতে ফেরা যতোটা কাম্য, তার থেকে বেশি অসম্ভব। যা অবশ্যই আশা করতে হবে, তা হচ্ছে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে যাচ্ছে, পুরুষদের তা অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে হবে; শুধু তখনই নারী সে-পরিস্থিতিতে বাস করতে পারবে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া। তখনই পাওয়া যাবে লাফর্গের প্রার্থনার উত্তর : 'আহ্, তরুণীরা, কখন তোমরা হবে আমাদের ভাই, অন্তরঙ্গভাবে আমাদের ভাই পরিশেষে শোষিত হওয়ার ভয় ছাড়া? কখন আমরা সত্যিকারভাবে ধরবো হাত শক্ত ক'রে?' তখন ব্রেতোঁর 'মেলুসিন, আর থাকবে না পুরুষ কর্তৃক তার ওপর চাপিয়ে দেয়া দুর্যোগের ভারের নিচে। মুক্ত মেলুসিন...' ফিরে পাবে 'মানুষের মাঝে তার স্থান।' তখন সে হবে একজন সম্পূর্ণ মানুষ, 'যখন', র‍্যাঁবোর চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি, 'নারীর অসীম দাসত্ব ধ্বংস হবে, যখন সে নিজের মধ্যে ও নিজের জন্যে বাঁচবে, পুরুষ– এ-পর্যন্ত ঘৃণার্হ– তাকে হ'তে দেবে স্বাধীন'।

দ্বিতীয় খণ্ড

আজ নারীর জীবন

ভাগ ৪

গঠনের বছরগুলো

পরিচ্ছেদ ১

শৈশব

কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং নারী হয়ে ওঠে। সমাজে যেভাবে দেখা দেয় স্ত্রীলিঙ্গ মানুষ কোনো জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, বা আর্থনীতিক নিয়তি তার রূপ নির্ধারণ করে না; সার্বিকভাবে সভ্যতাই উৎপাদন করে পুরুষ ও খোজার মাঝামাঝি এ-প্রাণীটি, যাকে বলা হয় নারী। শুধু অন্য কারো হস্তক্ষেপই একটি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে *অপর*-রূপে। যখন সে অস্তিত্বশীল নিজের মধ্যে ও নিজের জন্যে, তখন কোনো শিশুর পক্ষে নিজেকে লৈঙ্গিকঅর্থে পৃথক ভাবাই কঠিন। যেমন ছেলেদের বেলা, তেমনি মেয়েদের বেলাও সবার আগে দেহ হচ্ছে এক ব্যক্তিতার বিকিরণ, এটা এমন এক হাতিয়ার, যা সম্ভব করে তোলে বিশ্বকে বোঝা : হাত দিয়ে, চোখ দিয়ে শিশুরা বোঝে বিশ্বকে, যৌনাঙ্গ দিয়ে নয়। জন্মলাভের ও দুধ ছাড়ানোর নাটক একইভাবে উন্মোচিত হয় উভয় লিঙ্গের শিশুর কাছেই; এগুলোর আকর্ষণ ও আনন্দ একই; স্তন্যপান প্রথমে তাদের সবচেয়ে সুখকর ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলোর উৎস; তারপর তারা যায় এক পায়ুপর্বের ভেতর দিয়ে, যখন মলমূত্র ত্যাগে তারা পায় তাদের চরম সুখ, যা দুজনে একই রকম। তাদের যৌনাঙ্গের বিকাশও একই রকম; তারা একই আগ্রহে ও একই নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে লাভ করে নিজেদের শরীর সম্বন্ধে জ্ঞান; ভগাঙ্কুর ও শিশ্ন থেকে তারা পায় একই রকম অস্পষ্ট সুখ। তাদের সংবেদনশীলতার যেহেতু দরকার হয় একটা বস্তু, তাই সেটি হয় মায়ের অভিমুখি : কোমল, মসৃণ, স্থিতিস্থাপক নারীশরীর জাগায় যৌনকামনা, এবং এ-কামনাগুলো পরিগ্রাহী; ছেলের মতোই আক্রমণাত্মকভাবে মেয়ে চুমো খায় তার মাকে, তাকে নাড়াচাড়া করে, আদর করে; আরেকটি নতুন শিশু জন্ম নিলে তারা বোধ করে একই রকম ঈর্ষা। বারো বছর বয়স পর্যন্ত বালিকা থাকে তার ভাইদের মতোই সবল, এবং তার থাকে একই মনোবল; কোনো ক্ষেত্রেই সে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকে না। বয়ঃসন্ধির বেশ আগে এবং কখনো কখনো শৈশবের শুরু থেকেই, মেয়েকে যদি আগে থেকেই লৈঙ্গিকভাবে নির্ধারিত মনে হয় আমাদের, সেটা এজন্যে নয় যে রহস্যময় প্রবৃত্তি তাকে সরাসরি দণ্ডিত করেছে অক্রিয়তা, ছেনালিপনা, মাতৃত্বের জন্যে; বরং এজন্যে যে প্রায়

শুরু থেকেই শিশুর ওপর অন্যদের প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং এভাবে শৈশব থেকেই তাকে দীক্ষিত করা হয় তার বৃত্তিতে।

নবজাতক শিশুর কাছে বিশ্ব প্রথম ধরা পড়ে শুধু তার সহজাত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে; সে তখনও মগ্ন থাকে সমগ্রের বুকে যেমন ছিলো যখন সে ছিলো অন্ধকার জরায়ুর ভেতরে; যখন তার মুখে দেয়া হয় স্তন বা দুধের বোতল তখনও সে পরিবৃত থাকে মায়ের মাংসের উষ্ণতা দিয়ে। একটু একটু ক'রে সে নিজের থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ব'লে বুঝতে শেখে বস্তুদের, এবং নিজেকে তাদের থেকে পৃথক করতে পারে। এর মাঝে কম বা বেশি নৃশংসভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় পুষ্টিকর শরীরটি থেকে। অনেক সময় শিশু প্রচণ্ড সংকট দিয়ে এ-বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানায়, তা যা-ই হোক, যখন এ-বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণতা লাভ করে, হয়তো ছ-মাস বয়সে, তখন শিশু নানা রকম অনুকৃতির মাধ্যমে দেখাতে থাকে অন্যদের আকৃষ্ট করার বাসনা, যা পরে হয়ে ওঠে আসলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা। নিশ্চিতভাবেই এ-মনোভাব একটা সুবিবেচিত পছন্দের মাধ্যমে ঘটে না। দুধের শিশু প্রত্যক্ষভাবে যাপন করে প্রতিটি অস্তিত্বশীলের মৌল নাটক : অপর-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের নাটক। মানসিক যন্ত্রণার সাথে পুরুষ বোধ করে তার বাঁধনমুক্তি, তার অসহায়ত্ব। তার স্বাধীনতা, তার মন্ময়তা থেকে পলায়নের সময় সে নিজেকে সানন্দে হারাতে চায় সমগ্রের বুকে। এখানেই, আসলে, আছে তার বিস্মৃতির জন্যে আকুলতার জন্যে, নিদ্রার জন্যে, পরমোল্লাসের জন্যে, মৃত্যুর জন্যে মহাজাগতিক ও সর্বেশ্বরবাদী স্বপ্নের উৎস।

এ-পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করতে হবে শিশুর আচরণ : দৈহিক রূপে এক অদ্ভুত বিশ্বে সে আবিষ্কার করে সসীমতা, একাকীত্ব, অসহায় পরিত্যাগ। সে তার অস্তিত্বকে একটি মূর্তিতে প্রক্ষেপ ক'রে প্রয়াস চালায় এ-বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণের, অন্যরা প্রতিষ্ঠিত করবে যার বাস্তবতা ও মূল্য। এমন মনে হয় যে সে-সময় সে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে শুরু করে তার স্বরূপ যখন সে আয়নায় চিনতে পারে তার প্রতিফলন– এ-সময়টা মিলে যায় দুধ ছাড়ার সময়ের সাথে : তার অহং এতোটা পরিপূর্ণভাবে অভিন্ন হয়ে হয়ে ওঠে এ-প্রতিফলিত ছবির সাথে যে প্রক্ষিপ্ত হয়েই শুধু এটি গঠিত হয়। আয়না প্রকৃতপক্ষে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করুক বা না করুক, এটা নিশ্চিত যে শিশু ছ-মাস বয়সের দিকে তার বাবা-মাকে অনুকরণ করতে, এবং তাদের স্থিরদৃষ্টির তলে সে নিজেকে একটি বস্তু হিশেবে গণ্য করতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই সে হয়ে উঠেছে এক স্বায়ত্তশাসিত কর্তা, যে সীমাতিক্রমণ করতে শুরু করেছে বাইরের বিশ্বের দিকে; কিন্তু সে নিজের মুখোমুখি হয় শুধু এক প্রক্ষিপ্ত রূপে।

যখন শিশু আরো বেড়ে ওঠে, আদি পরিত্যাগের বিরুদ্ধে সে লড়াই করে দু-রকমে। সে উদ্যোগ নেয় বিচ্ছিন্নতাকে অস্বীকার করার : মায়ের বাহুতে গিয়ে প'ড়ে সে খোঁজে তার সজীব উষ্ণতা এবং দাবি করে তার আদর। এবং সে নিজের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে চায় অন্যদের অনুমোদনের মাধ্যমে। তার কাছে প্রাপ্তবয়স্কদের মনে হয় দেবতা, কেননা তাদের আছে তাকে অস্তিত্বে ভূষিত করার ক্ষমতা। সে অনুভব করে এ-বোধের যাদু, যা তাকে একবার পরিণত করে আনন্দদায়ক ছোট্ট দেবতায়, আবার পরিণত করে দানবে। প্রথম তিন-চার বছর ছেলে ও মেয়ের মনোভাবের মধ্যে

কোনো পার্থক্য থাকে না; উভয়েই চায় দুধ ছাড়ার আগে তারা যে-সুখের মধ্যে ছিলো, সে-অবস্থাটিকে স্থায়ী ক'রে রাখতে; উভয় লিঙ্গেই দেখা দেয় অন্যদের মনে প্রলোভন জাগানোর ও নিজের গরিমা প্রদর্শনের স্বভাব : তাদের বোনদের মতোই ছেলেরাও চায় বড়োদের খুশি করতে, তাদের হাসাতে, তাদের প্রশংসা পেতে।

প্রাপ্তবয়স্কদের স্থিরদৃষ্টির যাদু চপল। শিশু ভান করে যেনো সে অদৃশ্য হয়ে গেছে; এ-খেলায় প্রবেশ করে তার মা-বাবা, অন্ধের মতো তাকে খোঁজার চেষ্টা করে এবং হাসতে থাকে; তবে অবিলম্বে তারা বলে : 'তুমি ক্লান্তিকর হয়ে উঠছো, তুমি একেবারেই অদৃশ্য নও।' শিশুটি তাদের একটি চমৎকার কথা ব'লে মজা দিয়েছে; সে এটা আবার বলে, এবং এবার তারা তাদের কাঁধ ঝাঁকায়। এ-বিশ্বে, যা কাফকার মহাবিশ্বের মতো অনিশ্চিত ও ভবিষ্যদ্বাণী-অসম্ভব, পদে পদে মানুষ হোঁচট খায়। এজন্যেই অনেক শিশু বেড়ে উঠতে ভয় পায়; তারা হতাশ হয় যখন তাদের পিতামাতা আর তাদের হাঁটুর ওপরে তোলে না বা উঠতে দেয় না বড়োদের বিছানায়। দৈহিক হতাশার মধ্য দিয়ে তারা অধিকতর নিষ্ঠুরভাবে অনুভব করতে থাকে অসহায়ত্ব, পরিত্যাগ, যন্ত্রণাবোধ ছাড়া যা কোনো মানুষ বুঝতে পারে না।

ঠিক এখানেই ছোটো মেয়েদের প্রথম মনে হয় বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ব'লে। একটি দ্বিতীয় বারের জন্যে দুধ ছাড়া, যেটি প্রথমটির থেকে কম নিষ্ঠুর ও অনেক বেশি ধীর, মায়ের দেহকে দূরে সরিয়ে নেয় শিশুর আলিঙ্গন থেকে; তবে একটু একটু ক'রে ছেলেদেরই অস্বীকার করা হয় আর চুমো খেতে বা আদর করতে, যাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। ছোটো মেয়ের বেলা, তাকে ভুলিয়ে রাখা হয় মিষ্টি মিষ্টি কথায়, তাকে লেগে থাকতে দেয়া হয় তার মায়ের স্কার্টের সাথে, তার বাবা তাকে পায়ের ওপর তুলে দোলায়, তার চুলে হাত বুলোয়। সে পরে ছোটো ছোটো মিষ্টি পোশাক, লাই দেয়া হয় তার চোখের জল ও খেয়ালখুশিকে, সুন্দরভাবে তার চুল বেঁধে দেয়া হয়, বড়োরা মজা পায় তার ভাবভঙ্গি ও ছেনালিপনায়– শারীরিক সংস্পর্শ ও আদরভরা চাহনি তাকে রক্ষা করে নিঃসঙ্গতার উদ্বেগ থেকে। এর বিপরীতে ছেনালিপনা করতে দেয়া হয় না ছোটো ছেলেকে; তার অন্যদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা, তার ছলছলনা বিরক্তিকর। তাকে বলা হয় 'পুরুষ চুমো চায় না... পুরুষ আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে না... পুরুষ কাঁদে না'। তাকে বলা হয় 'একটি ছোট্ট পুরুষ' হ'তে; বড়োদের থেকে স্বাধীন হয়ে সে পায় বড়োদের সম্মতি। তারা খুশি হয় যদি সে তাদের খুশি করার চেষ্টা না করে।

বহু ছেলে, তাদের যে-কঠোর স্বাধীনতায় দণ্ডিত করা হয়েছে, তাতে ভয় পেয়ে মনে করে যে মেয়ে হ'লেই ভালো ছিলো; আগের দিনে ছোটো বয়সে যখন ছেলেদের পরানো হতো মেয়েদের মতো পোশাক, তারা কাঁদাকাটি করতো যখন তাদের মেয়ের পোশাক ছেড়ে পরানো হতো ট্রাউজার, কেটে ফেলা হতো তাদের ঝুঁটি। তাদের কেউ কেউ একগুঁয়েভাবে চাইতো নারী থাকতেই– এটা সমকামিতার সাথে পরিচিত হওয়ার একটা ধরন। মরিস সাক (*ল্য সাবাতে*) বলেন : 'আমি সংরক্তভাবে চেয়েছিলাম মেয়ে হ'তে এবং পুরুষ হওয়ার মহিমা সম্পর্কে অসচেতনতাকে আমি এতো দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম যে আমি ভান করতাম ব'সে প্রস্রাব করার।'

যদি প্রথম প্রথম মনেও হয় যে ছেলেকে তার বোনদের থেকে দেখানো হচ্ছে কম অনুগ্রহ, তা এ-কারণে যে তার জন্যে অপেক্ষায় আছে বড়ো বড়ো ব্যাপার। তার কাছে যা দাবি করা হয়, তা নির্দেশ করে উচ্চ মূল্যায়ন। মাওরা তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন যে তিনি ঈর্ষা বোধ করেছিলেন তাঁর এক কনিষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি, যাকে তাঁর মা ও দাদী স্তোকবাক্যে ভুলোনোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁর বাবা হাত ধ'রে তাঁকে ঘর থেকে নিয়ে যান, বলেন : 'আমরা পুরুষ, চলো আমরা এসব নারীদের ছেড়ে কোথাও যাই।' শিশুকে বোঝানো হয় যে ছেলেদের কাছে বেশি দাবি করা হয়, কেননা তারা শ্রেষ্ঠতর; যে-কঠিন পথে তাকে চলতে হবে, তাতে চলার সাহস দেয়ার জন্যে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় পুরুষত্বের গর্ব; এ- বিমূর্ত ধারণাটি তার মধ্যে রূপায়িত হয় একটি মূর্ত বস্তুতে : এটা মূর্ত হয় তার শিশ্নে। স্বতস্ফূর্তভাবে সে তার লিঙ্গে কোনো গর্ব বোধ করতে পারে না, বোধ করে তার চারপাশের লোকজনের মনোভাবের মধ্য দিয়ে। মায়েরা ও ধাত্রীরা বাঁচিয়ে রাখে সে-প্রথাটি, যা শিশ্ন ও পুরুষত্বের ধারণাকে ক'রে তোলে অভিন্ন; তারা শিশুর শিশ্নকে দেখে অসামান্য আত্মপ্রসাদের সাথে। একটু বেশি বিনয়ী নারীরা আজো বালকের লিঙ্গকে ডাকে ডাকনামে, তার সাথে এটার সম্পর্কে এমনভাবে তারা কথা বলে যেনো এটা একটি ছোটো মানুষ, যেনো এটা সে নিজে এবং তার থেকে ভিন্ন কেউ : তারা একে ক'রে তোলে একটা '*বিকল্প সত্তা*, যে শিশুটির থেকে সাধারণত একটু বেশি রঙিলা, বেশি বুদ্ধিমান, এবং বেশি চতুর'।

শারীরসংস্থানগতভাবে শিশ্ন এ-ভূমিকার জন্যে খুবই উপযুক্ত; দেহ থেকে বেরিয়ে থাকে ব'লে এটাকে মনে হয় একটা প্রাকৃতিক খেলনা, এক রকম পুতুল। বয়স্করা শিশ্নটিকে তার ডবলে পরিণত ক'রে মূল্য দেয় শিশুকে। এক বাবা আমাকে বলেছিলেন তার এক ছেলে তিন বছর বয়সেও ব'সে প্রস্রাব করতো; বোনদের ও চাচাতো বোনদের দ্বারা পরিবৃত থেকে সে হয়ে উঠেছিলো এক ভীতু ও বিষণ্ন শিশু। একদিন তার বাবা তাকে পায়খানায় নিয়ে বলে, 'তোমাকে দেখাচ্ছি পুরুষেরা এটা কীভাবে করে।' তারপর থেকে সে গর্ববোধ করতে থাকে সে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ব'লে, এবং তিরস্কার করতে থাকে মেয়েদের 'যারা একটা ছিদ্র দিয়ে প্রস্রাব করে'; মূলত মেয়েদের শিশ্ন নেই ব'লে তার ঘেন্না জাগে নি, বরং জাগে এ-কারণে যে মেয়েদের কেনো আগে খুঁজে বের করা হয় নি, এবং বাবা কেনো তার মতো ক'রে তাদের এতে দীক্ষিত করে নি। এভাবে, শিশ্ন এমন কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধা নির্দেশ করে না যার থেকে বালক আহরণ করতে পারে শ্রেষ্ঠত্বের বোধ, এর উচ্চ মূল্যকে বরং মনে হয় দ্বিতীয়বার দুধ ছাড়ার দুর্ভোগের ক্ষতিপূরণ ব'লে– বয়স্করা যা আবিষ্কার করেছে ও অতি আকুলতার সাথে শিশু যা গ্রহণ করেছে। এভাবে তাকে রক্ষা করা হয় দুগ্ধপোষ্য শিশু হিশেবে তার মর্যাদা হারানোর এবং মেয়ে না হওয়ার দুঃখ থেকে। পরে সে তার সীমাতিক্রমণতা ও গর্বিত সার্বভৌমত্বকে মূর্ত করবে তার লিঙ্গে।

ছোটো বালিকার ভাগ্য এর থেকে অনেক ভিন্ন। মায়েরা ও ধাত্রীরা তার যৌনাঙ্গের প্রতি কোনো ভক্তি বা স্নেহ দেখায় না; তারা তার ওই গোপন প্রত্যঙ্গটি, ঢাকনাটি ছাড়া যেটি অদৃশ্য, এবং যেটিকে হাত দিয়ে ধরা যায় না, সেটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; এক অর্থে তার কোনো যৌনাঙ্গই নেই। এটির এ-অনুপস্থিতি তার

কাছে কোনো অভাব ব'লে মনে হয় না; তার কাছে স্পষ্টতই তার দেহ সুসম্পূর্ণ; কিন্তু সে দেখতে পায় বিশ্বে সে আছে ছেলের থেকে ভিন্ন অবস্থানে; একরাশ ব্যাপার এ-পার্থক্যকে, তার চোখে, রূপান্তরিত করতে পারে নিকৃষ্টতায়।

নারীদের প্রসিদ্ধ 'খোজা গূঢ়ৈষা'র থেকে কম প্রশ্নই অধিক ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন মনোবিশ্লেষকেরা। আজকাল অধিকাংশই স্বীকার করবেন যে শিশ্নাসূয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় বিচিত্ররূপে। শুরুর পর্যায়ে, বহু ছোটো মেয়েই কিছু বছর অজ্ঞ থাকে পুরুষের দেহসংস্থান সম্পর্কে। আছে পুরুষ ও নারী, এটা স্বাভাবিক ব'লে মনে হয় এমন মেয়ের কাছে, যেমন সূর্য ও চাঁদ থাকা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় : সে বিশ্বাস করে শব্দের নিহিত সারার্থে এবং প্রথমে তার ঔৎসুক্য বিশ্লেষণধর্মী নয়। অন্য অনেক মেয়ের কাছে ছেলেদের দু-পায়ের মাঝখানে ঝুলন্ত এ-ছোটো মাংসখণ্ডটিকে গুরুত্বহীন বা এমনকি হাস্যকর মনে হয়; এটা এমন এক বিশেষত্ব, যা মিলেমিশে যায় পোশাক বা চুলের ছাঁটের সাথে। প্রায়ই এটা চোখে পড়ে নবজাতক ছোট্ট ভাইয়ের দেহে এবং, যেমন বলেন হেলেন ডয়েট্‌শ্‌, 'ছোটো বালিকা যখন খুবই ছোটো থাকে, তখন ছোটো ভাইয়ের শিশ্ন তার মনে দাগ কাটে না'। এমনও ঘটতে পারে যে শিশ্নটি গণ্য হ'তে পারে একটা অস্বাভাবিক বস্তু ব'লে : একটা উপবৃদ্ধি, একটা অস্পষ্ট জিনিশ, যা ঝুলে থাকে ব্যাধিত মাংসপিণ্ড, স্তন, বা আঁচিলের মতো; এটা জাগিয়ে তুলতে পারে বিরক্তি। পরিশেষে, বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যাতে ছোটো মেয়ে আগ্রহ বোধ করে ভাইয়ের বা খেলার সাথীর শিশ্নের প্রতি; তবে তা বোঝায় না যে সে বাস্তবিকভাবে যৌন ধরনে এটির প্রতি ঈর্ষা বোধ করে, এবং এ-প্রত্যঙ্গটির অনুপস্থিতি দিয়ে সে আক্রান্ত হয় আরো অনেক কম; সে যেমন প্রতিটি ও সব জিনিশই চায়, তেমনি এটাও চাইতে পারে, তবে এ-বাসনা খুবই অগভীর।

সন্দেহ নেই যে নিঃসরণের কাজগুলো, বিশেষভাবে প্রস্রাবের কাজটি, শিশুদের কাছে সংরক্ত আগ্রহের ব্যাপার; বিছানায় প্রস্রাব করা, আসলে, অনেক সময়ই অন্য সন্তানের প্রতি পিতামাতার সুস্পষ্ট পছন্দের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। অনেক দেশে পুরুষেরা ব'সে প্রস্রাব করে, এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীরা প্রস্রাব করে দাঁড়িয়ে, যেমন প্রচলিত অনেক কৃষকদের মধ্যে; তবে সমকালীন পাশ্চাত্য সমাজে চাওয়া হয় যে নারীরা ব'সে বা নত হয়ে পেশাব করবে, আর দাঁড়ানো অবস্থাটি নির্ধারিত পুরুষদের জন্যে। ছোটো মেয়ের কাছে এ-পার্থক্যকে মনে হয় অত্যন্ত লক্ষণীয় লৈঙ্গিক পার্থক্য ব'লে। পেশাব করার জন্যে তাকে নত হ'তে হয়, নিজেকে ন্যাংটো করতে হয়, তাই লুকোতে হয় নিজেকে : এটা এক লজ্জাজনক ও অসুবিধাজনক পদ্ধতি। এ-লজ্জা প্রায়ই বৃদ্ধি পায়, যখন মেয়েটির ভেতর থেকে তার অনিচ্ছায় বেরিয়ে আসে প্রস্রাব, উদাহরণস্বরূপ যখন সে প্রচণ্ডভাবে হাসে; সাধারণভাবে তার নিয়ন্ত্রণ ছেলেদের মতো ততোটা ভালো নয়।

ছেলেদের কাছে প্রস্রাবের কাজটিকে মনে হয় খেলা, সব খেলার আনন্দের মতোই এটি তাদের দেয় কর্মসাধনের স্বাধীনতা; শিশ্নকে নিপুণভাবে ব্যবহার করা যায়, এটা সুযোগ দেয় নানা ক্রিয়াকর্মের, যা শিশুর কাছে গভীরভাবে আকর্ষণীয়। একটি ছোটো মেয়ে একটি ছেলেকে প্রস্রাব করতে দেখে বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠেছিলো : 'কী

সুবিধা!' প্রস্রাবের ধারাটি যে-দিকে ইচ্ছে সে-দিকে তাক করা যায় এবং বেশ দূরে ফেলা যায়, যা ছেলেকে দেয় সীমাহীন শক্তির বোধ। ফ্রয়েড বলেছেন 'যথাসময়ের আগে মূত্রবর্ধকতত্ত্বের তীব্র আকাঙ্খা'র কথা; স্টেকেল এ-সূত্রটি আলোচনা করেছেন কাণ্ডজ্ঞানের সাথে, তবে এটা সত্য, যেমন বলেছেন কারেন হোরনি, যে 'সীমাহীন শক্তিবোধের উদ্ভট কল্পনা, যেগুলো বিশেষভাবে ধর্ষকামী ধরনের, প্রায়ই জড়িত থাকে পুরুষের মূত্রস্রাবের সাথে'; এ-উদ্ভট কল্পনাগুলো, যা দীর্ঘস্থায়ী কিছু পুরুষের মধ্যে, শিশুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। 'নমনীয় নলের সাহায্যে বাগানে জল সিঞ্চন ক'রে নারীরা যে অসামান্য আনন্দ পায়', তার কথা বলেছেন আব্রাহাম; সার্ত্র ও বাখেলারের তত্ত্বের সাথে একমত হয়ে আমি বিশ্বাস করি যে নলটিকে শিশ্নের সাথে অভিন্ন ব'লে বোধ করা আবশ্যিকভাবে এ-সুখের উৎস নয়– যদিও অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে তা-ই। বাতাসের মধ্যে প্রতিটি জলস্রোতকেই অলৌকিক ব্যাপার ব'লে, অভিকর্ষকে অস্বীকার করা ব'লে মনে হয় : একে পরিচালিত করা, শাসন করা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মের ওপর একটি ছোটো বিজয়; এবং তা যাই হোক ছোটো ছেলে এর মাঝে পায় একটি প্রাত্যহিক মজা, যা তার বোনেরা পায় না। এটা প্রস্রাবের ধারার মাধমে বহু কিছু, যেমন জল, মাটি, শ্যাওলা, তুষার প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয়। অনেক ছোটো মেয়ে আছে, যারা এ-অভিজ্ঞতার অংশী হওয়ার জন্যে চিৎ হয়ে শোয় এবং চেষ্টা করে ওপরের দিকে মুততে বা দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুশীলন করে। কারেন হোরনির মতে, ছেলেদের আছে প্রদর্শন করার সম্ভাবনা, তারা তাকেও ঈর্ষা করে। কারেন হোরনি জানিয়েছেন যে 'একজন রোগী রাস্তায় একটি লোককে প্রস্রাব করতে দেখে হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠেছিলো : "বিধাতার কাছে আমি যদি একটি বর চাইতে পারতাম, তাহলে চাইতাম যেনো জীবনে অন্তত একবার আমি পুরুষের মতো প্রস্রাব করতে পারি।"' বহু ছোটো মেয়ে মনে করে ছেলেরা যেহেতু তাদের শিশ্ন ছুঁতে পারে, তাই তাকে তারা খেলনা হিশেবেও ব্যবহার করতে পারে, আর সেখানে তাদের যৌনাঙ্গগুলো ট্যাবু।

বহু কারণে একটি পুরুষাঙ্গের অধিকারী হওয়া যে বহু মেয়ের কাছে কাম্য ব'লে মনে হয়, এটা এমন এক সত্য যা প্রমাণিত হয়েছে অসংখ্য অনুসন্ধানে এবং মনোবিজ্ঞানীদের কাছে ব্যক্ত গোপন কথায়। হ্যাভলক এলিস উদ্ধৃত করেছেন ডঃ এস ই জেলিফের কাছে জিনিয়া নামে তাঁর এক রোগিণীর উক্তি : 'ফোয়ারা বা ছিটোনোর মতো জলের তীব্র উদ্গীরণ, বিশেষ ক'রে বাগানের দীর্ঘ নমনীয় নল থেকে, সব সময়ই আমার কাছে মনে হয়েছে ইঙ্গিতপূর্ণ, যা আমার মনে জাগিয়ে তোলে বাল্যকালে দেখা আমার ভাইদের, এমনকি অন্য ছেলেদের প্রস্রাব করার দৃশ্যের স্মৃতি।' এক পত্রলেখিকা, মিসেস আর এস, এলিসকে জানিয়েছে যে শৈশবে সে খুবই চাইতো ছেলেদের শিশ্ন নাড়তে এবং কল্পনা করতো প্রস্রাবের সময় এমন আচরণ; একদিন তাকে বাগানের নল ধরতে দেয় হয়। 'একে একটি শিশ্ন ধরার মতো আনন্দদায়ক ব'লে মনে হয়।' সে জোর দিয়ে বলেছে যে তার কাছে শিশ্নের কোনো যৌন তাৎপর্য ছিলো না; সে জানতো শুধু প্রস্রাবের কাজের কথা।

যে-মনোবিশ্লেষকেরা, ফ্রয়েডের অনুসরণে, মনে করেন যে শুধু শিশ্ন আবিষ্কারই

ছোটো মেয়ের স্নায়ুরোগ সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট, তাঁরা সুগভীরভাবে ভুল বোঝেন শিশুর মানসিকতাকে; তাঁরা যতোটা মনে করেন ব'লে মনে হয়, তার থেকে অনেক কম যুক্তিধর্মী এ-মানসিকতা। ছোটো মেয়ে যখন শিশ্ন দেখতে পায় এবং ঘোষণা করে : 'আমারও একটি ছিলো,' বা 'আমিও একটি নেবো,' অথবা এমনকি 'আমারও একটি আছে,' তখন এটা এক আন্তরিকতাহীন আত্ম-যাথার্থ্যপ্রতিপাদন নয়; উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি পারস্পরিকভাবে একচেটে নয়। সোস্যুর চার বছরের একটি মেয়ের কথা বলেছেন, যে ছেলেদের মতো দরোজার শিকের ফাঁক দিয়ে প্রস্রাব করতে গিয়ে বলে, যদি তার থাকতো 'একটা লম্বা ছোটো জিনিশ, যার ভেতর থেকে ধারা বেরোয়'। সে তখন জ্ঞাপন করছিলো যে তার একটি শিশ্ন ছিলো এবং একটি শিশ্ন ছিলো না, যা পিয়াজের বর্ণিত শিশুদের 'অংশগ্রহণ'-এর মাধ্যমে চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ছোটো মেয়ে অবলীলায় বিশ্বাস করে যে সব শিশুই একটি শিশ্ন নিয়ে জন্মে, পরে মা-বাবারা মেয়ে বানানোর জন্যে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটির শিশ্ন কেটে ফেলে; এ-ভাবনা পরিতৃপ্ত করে শিশুর সে-কৃত্রিমতাবাদ, যে-শিশু, পিতামাতাকে অমান্য ক'রে, 'ওগুলোকে মনে করে তার সমস্ত কিছুর উৎস', যেমন বলেছেন পিয়াজে; শিশু প্রথমে খোজা করাকে একটা শাস্তি হিশেবে দেখে না।

তার অবস্থার একটি হতাশাগ্রস্ত রূপ নেয়ার জন্যে বালিকার, কোনো-না-কোনো কারণে, ইতিমধ্যেই হতাশা বোধ করা দরকার হয় তার অবস্থান সম্পর্কে; যেমন হেলেন ডয়েট্শ্ ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে শিশ্নের মতো একটা বাহ্যিক ঘটনার পক্ষে একটা আভ্যন্তর পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হতো না : 'পুরুষাঙ্গ দেখার ঘটনা ফেলতে পারে অবিস্মরণীয় দুঃখজনক প্রভাব,' তিনি বলেন, 'তবে এ-শর্তে যে এর আগে থাকতে হবে এমন অভিজ্ঞতার দীর্ঘপরম্পরা, যা ফেলতে পারে এমন প্রভাব।' যদি ছোটো বালিকা হস্তমৈথুন বা নিজেকে প্রদর্শন ক'রে তার কামনা মেটাতে না পারে, যদি তার মা-বাবা বাধা দেয় তার আত্মমেহনে, যদি তার মনে হয় তাকে সবাই কম ভালোবাসে, কম আদর করে তার ভাইদের থেকে, তবে তার হতাশাবোধ সে প্রক্ষিপ্ত করে পুরুষাঙ্গের ওপর। 'ছোটো মেয়ে যখন আবিষ্কার করে ছেলের থেকে তার শারীরসংস্থানগত ভিন্নতা, তখন এটা প্রতিষ্ঠিত করে আগে থেকেই অনুভূত তার একটি অভাবকে; বলা যায় এ দিয়েই সে প্রতিষ্ঠা করে তার অভাবের যৌক্তিকতা।' অ্যাডলার এ-ঘটনার ওপর বিশেষ জোর দেন যে তার পিতামাতা ও তাদের বন্ধুদের মূল্যায়নই বালককে দেয় বিশেষ মর্যাদা, ছোটো বালিকার চোখে শিশ্নটি হয়ে ওঠে যার ব্যাখ্যা ও প্রতীক। লোকজন তার ভাইকে মনে করে শ্রেষ্ঠ; সে নিজে স্ফীত থাকে তার পুরুষত্বের গর্বে; তাই মেয়েটি তাকে ঈর্ষা করে এবং বোধ করে হতাশা। অনেক সময় এর জন্যে সে দায়ী করে তার মাকে, খুব কম সময়ই তার বাবাকে; বা অঙ্গচ্ছেদের জন্যে সে দোষ দিতে পারে নিজেকে, বা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে একথা ভেবে যে শিশ্নটি দেহের ভেতরে লুকিয়ে আছে এবং কোনো একদিন বেরিয়ে আসবে।

তরুণীর যদি তীব্র শিশ্নস্পৃহা নাও থাকে, তবু প্রত্যঙ্গটির অভাব তার নিয়তিতে পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার যেহেতু আছে এমন একটি প্রত্যঙ্গ, যেটি দেখা যায় এবং ধরা যায়, তাই বালক এটির থেকে যে-প্রধান উপকার পায়, তা হচ্ছে

অন্তত আংশিকভাবে হ'লেও সে নিজেকে এটির সাথে অভিন্ন ব'লে ভাবতে পারে। সে তার শরীরের রহস্যকে, এর হুমকিগুলোকে, প্রক্ষেপ করে নিজের বাইরে, যা তাকে সমর্থ করে নিজের থেকে ওগুলোকে দূরে রাখতে। এটা সত্য যে শিশ্নের ব্যাপারে সে ভয়ের আভাস পায়, সে ভয় পায় যে এটাকে কেটে নেয়া হ'তে পারে; কিন্তু ছোটো বালিকা তার 'অভ্যন্তর' সম্পর্কে বোধ করে যে-বিকীর্ণ আশঙ্কা, যা প্রায়ই থেকে যায় জীবনভর, তার তুলনায় বালকের ভীতি কাটানো সহজতর। তার অভ্যন্তরে যা-কিছু ঘটে, সে-সম্পর্কে বালিকা থাকে অতিশয় উদ্বিগ্ন, পুরুষের থেকে শুরু থেকেই সে নিজের চোখেই অনেক বেশি অনচ্ছ, জীবনের অবোধ্য রহস্যে সে অনেক বেশি গভীরভাবে নিমজ্জিত। বালকের যেহেতু আছে একটি *বিকল্প সত্তা*, যার মাঝে সে দেখে নিজেকে, তাই সে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে মন্ময়তার মনোভঙ্গি; যে-বস্তুটিতে সে প্রক্ষেপ করে নিজেকে, সেটি হয়ে ওঠে স্বায়ত্তশাসনের, সীমাতিক্রমণতার, ক্ষমতার প্রতীক; সে পরিমাপ করে শিশ্নের দৈর্ঘ্য; সে সঙ্গীদের সাথে তুলনা করে তার প্রস্রাবধারার; পরে, দাঁড়ানো ও বীর্যপাত হয়ে উঠবে পরিতৃপ্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তি। কিন্তু ছোটো বালিকা তার নিজের কোনো অঙ্গে নিজেকে মূর্ত করতে পারে না। এর ক্ষতিপূরণের এবং তার *বিকল্প সত্তারূ*পে কাজ করার জন্যে, তাকে দেয়া হয় একটা বাইরের জিনিশ : পুতুল। লক্ষণীয় যে ফরাশি ভাষায় *পুপে* (পুতুল) শব্দটি ক্ষতার্ত আঙুলে জড়ানো পটি বোঝানোর জন্যেও ব্যবহৃত হয়; একটি পটি-বাঁধা আঙুল, যেটি ভিন্ন অন্যগুলোর থেকে, সেটিকে দেখা হয় কৌতুকের চোখে এবং এক ধরনের গর্বরূপে, শিশু এর সাথে কথা ব'লে এর সাথে অভিন্ন বোধের লক্ষণ দেখাতে থাকে। কিন্তু এটি মানুষের মুখাবয়বসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্রমূর্তি– অথবা, তার অভাবে, একটা একটা শস্যের শিষ, বা এক টুকরো কাঠ– যা বালিকার কাছে সন্তোষজনকভাবেই কাজ করে সে-ডবলের, সে-স্বাভাবিক খেলনার : শিশ্নের।

প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, একদিকে, পুতুল বোঝায় পুরো শরীর, আবার, অন্য দিকে, এটি এক অক্রিয় বস্তু। এজন্যে বালিকা তার সমগ্র শরীরকে এর সাথে অভিন্ন ব'লে মনে করতে থাকে এবং দেহকে মনে করতে থাকে এক অক্রিয় জড় বস্তু ব'লে। বালক যখন তার শিশ্নে নিজেকে খোঁজে এক স্বায়ত্তশাসিত কর্তা হিশেবে, তখন বালিকা তার পুতুলকে বুকের কাছে কোলে নিয়ে আদর করে এবং জামাকাপড় পরায়, যেমন সে স্বপ্ন দেখে কেউ তাকে বুকের কাছে কোলে নিয়ে আদর করছে এবং জামাকাপড় পরিয়ে দিচ্ছে; উল্টোভাবে, সে নিজেকে মনে করে এক বিস্ময়কর পুতুল। প্রশংসা ও তিরস্কারের সাহায্যে, ছবি ও কথার ভেতর দিয়ে, সে শেখে *সুন্দর* ও *সাদাসিধে* শব্দ দুটির অর্থ; অবিলম্বে সে শিখে ফেলে যে মনোহর হওয়ার জন্যে তাকে হ'তে হবে 'ছবির মতো সুন্দর'; সে চেষ্টা করতে থাকে যাতে তাকে ছবির মতো দেখায়, পরতে থাকে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, নিজেকে দেখতে থাকে আয়নায়, নিজেকে তুলনা করতে থাকে রাজকুমারী ও পরীদের সাথে। মারি বাশকির্তসেভ এ-শিশুসুলভ ছেনালিপনার এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের। এটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে বেশ দেরি ক'রে দুধ ছেড়ে– সাড়ে তিন বছর বয়সে– চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে তিনি তীব্রভাবে বোধ করেন যে নিজেকে আকর্ষণীয় করতে হবে যাতে মুগ্ধ হয়

অন্যরা, অন্যদের সুখী ক'রে বাঁচতে হবে। এতোটা বয়স্ক শিশুর কাছে দুধ ছাড়ার আঘাতটি নিশ্চয়ই ছিলো প্রচণ্ড, এবং তিনি নিশ্চয়ই সংরক্তভাবে ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছেন তার ওপর চাপানো বিচ্ছিন্নতার; তাঁর জর্নালে তিনি লিখেছেন : 'পাঁচ বছর বয়সে আমি সেজেছি আমার মায়ের কারুকার্যময় ফিতেয়, চুলে পরেছি ফুল, এবং ড্রয়িংরুমে নাচতে গেছি। আমি ছিলাম মহানর্তকী পেতিপা, এবং *আমাকে দেখার জন্যে* ছিলো সারা পরিবার।'

বালিকার মধ্যে এ-আত্মরতি দেখা দেয় এতো অকালে, নারী হিশেবে এটা তার জীবনে পালন করবে এতো মৌল ভূমিকা যে এটা উদ্ভূত হয় এক রহস্যময় নারীপ্রকৃতি থেকে, এমন মনে করা সহজ। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে প্রকৃতপক্ষে শারীরসংস্থানগত নিয়তি তার মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে না। যে-পার্থক্য ছেলেদের স্বতন্ত্র ক'রে তোলে, তাকে একটি মেয়ে নানাভাবে গ্রহণ করতে পারে। শিশ্ন থাকা যে একটি বিশেষ সুবিধা, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মূল্য স্বাভাবিকভাবেই ক'মে যায় শিশুর কাছে, যখন সে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে মলমূত্রত্যাগের কর্মগুলোর প্রতি। যদি আট বা ন-বছর বয়সের পরেও শিশুর মনে টিকে থাকে এর মূল্য, তার কারণ শিশ্নটি হয়ে উঠেছে পুরুষত্বের প্রতীক, যাকে সামাজিকভাবে মূল্যবান মনে করা হয়। সত্য হচ্ছে এ-ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রতিবেশের প্রভাব অসীম। দুধ ছাড়ার ভেতর দিয়ে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে-বিচ্ছিন্নতা, সব শিশুই তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে অন্যদের প্ররোচিত ক'রে ও নিজেকে জাহির করার আচরণের মাধ্যমে; বালক বাধ্য হয় এ-অবস্থা পেরিয়ে যেতে; নিজের শিশ্নের প্রতি মনোনিবেশের মাধ্যমে সে মুক্তি পায় আত্মরতি থেকে; আর তখন ছোটো মেয়ে নিবদ্ধ হয়ে থাকে নিজের প্রতি অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণের প্রবণতার মধ্যে, যা সব ছোটো শিশুর মধ্যে দেখা যায়। পুতুল একটি সহায়ক, কিন্তু এর নেই আর কোনো নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা; ছেলেও লালন করতে পারে একটা খেলনা ভালুক, বা পুতুল, যাতে সে প্রক্ষেপ করে নিজেকে; তাদের জীবনের সমগ্রতার মধ্যেই প্রতিটি ব্যাপার– শিশ্ন অথবা পুতুল– অর্জন করে তার গুরুত্ব।

তাই 'নারীধর্মী' নারীর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যে-অক্রিয়তা, তা এমন এক চারিত্রিক গুণ, যা তার ভেতরে দেখা দেয় তার জীবনের আদিকাল থেকেই। তবে এর মূলে আছে এক জৈবিক তথ্য, এমন দাবি করা ভুল; প্রকৃতপক্ষে এটা এমন এক নিয়তি, যা তার ওপর চাপিয়ে দেয় তার শিক্ষকেরা ও সমাজ। ছেলে যে-বিশাল সুবিধা উপভোগ করে, তা হচ্ছে এই যে অন্যদের সাথে সম্পর্কে তার অস্তিত্বের ধরন তাকে তার কর্তৃমূলক স্বাধীনতা জ্ঞাপনের দিকে নিয়ে যায়। জীবনের জন্যে তার শিক্ষানবিশির মূল উপাদান হচ্ছে বাইরের বিশ্বের দিকে স্বাধীন অগ্রগতি; অন্য ছেলেদের সাথে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাহসিকতা ও স্বাধীনতার মধ্যে, সে তাচ্ছিল্য করে মেয়েদের। গাছে চ'ড়ে, তার সঙ্গীদের সাথে মারামারি ক'রে, কষ্টকর খেলাধুলোয় তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিজের দেহকে বোধ করে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করার একটি উপায় হিশেবে এবং লড়াই করার একটা অস্ত্র ব'লে; সে তার পেশি নিয়ে গর্ব করে যেমন গর্ব করে তার যৌনাঙ্গ নিয়ে; খেলাধুলোয়, ক্রীড়ায়, মারামারিতে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের

প্রতিযোগিতায়, শক্তির পরীক্ষায় সে দেখতে পায় তার ক্ষমতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগ; একই সময়ে সে আত্মীভূত করে হিংস্রতার কঠোর পাঠ; অল্প বয়স থেকেই সে শেখে ঘুসি সহ্য করতে, যন্ত্রণা তাচ্ছিল্য করতে, অশ্রু ধ'রে রাখতে। সে দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে আবিষ্কার করে, সে স্পর্ধা দেখায়। নিশ্চয়ই সে নিজেকেও পরখ করে এমনভাবে যেনো সে অন্য কেউ; সে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাকে নিজের পৌরুষকে, এবং বয়স্কদের ও অন্য শিশুদের সাথে সম্পর্কে দেখা দেয় বহু সমস্যা। কিন্তু যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে সে যে-বস্তুগত মানবমূর্তি, তার জন্যে তার যে-আগ্রহ, ও বস্তুগত লক্ষ্যের মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির ইচ্ছার মধ্যে কোনো মৌল বৈপরীত্য নেই। *করার* মাধ্যমেই সে সৃষ্টি করে নিজের অস্তিত্ব, এক ও অভিন্ন কর্মের মধ্যে।

শুরু থেকেই, এর বিপরীতে, নারীর মধ্যে থাকে তার স্বায়ত্তশাসিত অস্তিত্ব ও তার বস্তুগত সত্তার, তার 'অপর-হওয়ার', মধ্যে বিরোধ; তাকে শেখানো হয় অন্যদের খুশি করার জন্যে তাকে চেষ্টা করতে হবে খুশি করার, নিজেকে ক'রে তুলতে হবে বস্তু; তাই তাকে অস্বীকার করতে হবে তার স্বায়ত্তশাসন। তাকে দেখা হয় একটি জীবন্ত পুতুলরূপে এবং অস্বীকার করা হয় তার স্বাধীনতা। এভাবে গ'ড়ে ওঠে এক দুষ্টচক্র; কেননা তার চারপাশের বিশ্বকে বোঝার, তাকে আয়ত্ত ও আবিষ্কার করার জন্যে সে যতোই কম প্রয়োগ করতে থাকে তার স্বাধীনতা, সে নিজের ভেতরে পেতে থাকে ততোই কম শক্তি, আর সে ততোই কম পেতে থাকে নিজেকে কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করার সাহস। যদি তাকে এতে উৎসাহিত করা হতো, তাহলে সে ছেলের মতো দেখাতে পারতো একই প্রাণপ্রাচুর্য, একই ঔৎসুক্য, একই উদ্যোগ, একই সাহসিকতা। এটা মাঝেমাঝে ঘটে, যখন মেয়েকে লালনপালন করা হয় ছেলের মতো; এ-ক্ষেত্রে সে বেঁচে যায় নানা সমস্যা থেকে। লক্ষণীয় যে বাবারা তাদের কন্যাদের এ-ধরনের শিক্ষা দিতেই পছন্দ করে; পুরুষের অভিভাবকত্বে বেড়ে ওঠে যে-নারীরা, তারা মুক্ত থাকে নারীর দোষত্রুটিগুলো থেকে। কিন্তু প্রথা মেয়েদের ছেলেদের মতো লালনপালন করার বিরোধী। তিন বা চার বছর বয়সের কয়েকটি গ্রামের মেয়ের কথা আমি জানি, যাদের বাবারা তাদের বাধ্য করে ট্রাউজার পরতে। অন্য সব মেয়ে তাদের উপহাস করতো : 'এরা কি মেয়ে না ছেলে?'– এবং তারা পরখ ক'রে ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হ'তে চাইতো। আক্রান্তরা আবেদন জানাতো ড্রেস পরার। যদি কোনো ছোটো মেয়ে অস্বাভাবিক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন না করে, তাহলে তার পিতামাতার সম্মতি সত্ত্বেও ছেলের মতো জীবন যাপন আহত করবে তার সহচরদের, তার বন্ধুদের, তার শিক্ষকদের। বাবার প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্যে চারপাশে সব সময়ই থাকবে খালারা, পিতামহীরা, চাচাতো-খালাতো ভাইবোনেরা। সাধারণত কন্যার শিক্ষার বেলায় পিতাকে দেয়া হয় একটা গৌণ ভূমিকা। একটা বিঘ্ন, যা নারীদের ওপর প্রচণ্ড ভার হিশেবে চেপে থাকে– মিশেলে যা যথার্থভাবে নির্দেশ করেছেন– তা হচ্ছে শৈশবে লালনপালনের ভার নারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া। ছেলেও প্রথমে লালিত হয় মায়ের দ্বারাই, কিন্তু সে পুত্রের পুরুষত্বকে ভক্তি করে এবং ছেলে সত্বর মুক্তি পেয়ে যায়; সেখানে মা চায় তার মেয়েকে নারীর জগতের সাথে

সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে দিতে।

পরে আমরা দেখতে পাবো কন্যার সাথে মায়ের সম্পর্ক কতো জটিল : মায়ের কাছে তার কন্যা একই সময়ে তার ডবল এবং এক ভিন্ন মানুষ, মা একই সময়ে তার কন্যার প্রতি অতিশয় স্নেহপরায়ণ এবং শত্রুতাপ্রবণ; মা তার শিশুর ওপর চাপিয়ে দিতে চায় তার নিজের নিয়তির বোঝা : এটা হচ্ছে সগর্বে একে নিজের নারীত্ব ব'লে দাবি করার একটি উপায় এবং এর জন্যে নিজের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করারও একটি উপায়। একই প্রক্রিয়া দেখা যাবে বালকমেহনকারী, জুয়োরি, মাদকাসক্তদের মধ্যে, তাদের সকলের মধ্যে যারা একই সঙ্গে গর্ববোধ করে বিশেষ একটি ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এবং লজ্জিত বোধ করে এ-সংঘের জন্যে : ধর্মান্তরিতকরণের ব্যগ্রতার সাথে তারা প্রয়াস চালায় নতুন অনুগামী লাভের। সুতরাং যখন কোনো শিশুকে লালনপালনের ভার পড়ে নারীদের ওপর, তখন তারা সর্বাত্মকভাবে নিজেদের নিয়োগ করে শিশুটিকে নিজেদের মতো নারীতে পরিণত করার কাজে, দেখায় এমন উদ্দীপনা যাতে মিশ্রিত থাকে উগ্রতা ও ক্ষোভ; এমনকি মহানুভব মা, আন্তরিকভাবেই যে কল্যাণ চায় তার কন্যার, স্বাভাবিকভাবে সেও মনে করে মেয়েকে 'খাঁটি নারী' ক'রে তোলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ, কেননা এটা করা হ'লেই সমাজ মেয়েটিকে সানন্দে গ্রহণ করবে। তাই তাকে খেলা করতে দেয়া হয় ছোটো মেয়েদের সাথে, তাকে দেয়া হয় মহিলা শিক্ষকদের কাছে, গ্রিসের গাইনিকিউমের মতো সে থাকে বৃদ্ধা নারীদের সাথে, তার জন্যে বাছাই করা হয় এমন সব বই আর খেলাধুলো, যা তাকে দীক্ষিত করে তার নির্ধারিত এলাকায়, জ্ঞানবৃদ্ধিরাশি ঢেলে দেয়া হয় তার কানে, তার কাছে চাওয়া হয় নারীর গুণাবলি, তাকে সেখানো হয় রান্নাবান্না, সূচিকর্ম, ঘরকন্না, শেখানো হয় শরীর ও রূপের যত্ন নিতে, বিনয়ী হ'তে; তাকে পরতে হয় অসুবিধাজনক ও ঝালরঅলা পোশাক, যার জন্যে তাকে সব সময় সাবধানে থাকতে হয়, তার চুল বাঁধা হয় নয়নাভিরাম ভঙ্গিতে, তাকে শেখানো হয় চালচলনের নিয়মকানুন : 'সোজা দাঁড়াও, পাতিহাঁসের মতো হেঁটো না'; সৌষ্ঠব বাড়ানোর জন্যে তাকে দমন করতে হয় তার স্বতস্ফূর্ত চলাফেরা; তাকে বলা হয় ছেলে হয়ে ওঠার মতো ক্রিয়াকলাপ না করতে, তাকে নিষেধ করা হয় কঠোর ব্যায়াম করতে, তাকে মারামারি করতে দেয়া হয় না। সংক্ষেপে, তাকে চাপ দেয়া হয় তার প্রবীণাদের মতো দাসী ও মূর্তি হওয়ার জন্যে। আজকাল, নারীদের জয়ের কল্যাণে, ক্রমিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে শিক্ষা নেয়ার জন্যে ছোটো মেয়েকে উৎসাহিত করা, খেলাধুলোর প্রতি তাকে আগ্রহী ক'রে তোলা; তবে এসব ক্ষেত্রে তার অসাফল্যকে ছেলেদের থেকে অনেক বেশি নির্দ্বিধায় ক্ষমা করা হয়; তার কাছে আরেক রকম অর্জন দাবি ক'রে সাফল্যকে কঠিন ক'রে তোলা হয় : যাই হোক তাকে একটি নারীও হ'তে হবে, সে তার নারীত্ব *হারাতে* পারবে না।

যখন মেয়ে খুবই ছোটো থাকে তখন সে হেলাফেলায় বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি না ক'রে মেনে নেয় এসব। শিশুটি চলতে থাকে খেলা ও স্বপ্নের স্তরে, অভিনয় করতে থাকে সত্তার, অভিনয় করতে থাকে কর্মের; যখন কেউ শুধু কাল্পনিক অর্জন নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, তখন করা ও হওয়ার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করা হয় না। ছোটো মেয়ে

ছেলেদের বর্তমান শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষতিপূরণ করতে পারে তার নারীসুলভ নিয়তির মধ্যে নিহিত যে-সব প্রতিশ্রুতি এবং অভিনয়ের মাধ্যমে সে যেগুলো চরিতার্থ করে, সেগুলোর সাহায্যে। যেহেতু এ-পর্যন্ত সে জানে শুধু তার শৈশবের মহাবিশ্বকে, তাই প্রথমে মাকে তার মনে হয় পিতার থেকে অধিক কর্তৃত্বে ভূষিত ব'লে; সে বিশ্বকে এক ধরনের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব'লে কল্পনা করে; সে তার মাকে অনুকরণ করে এবং তার সাথে নিজেকে অভিন্ন ক'রে তোলে; প্রায়ই সে বদলে দেয় নিজেদের ভূমিকা : 'যখন আমি বড়ো হবো, আর তুমি ছোটো...' সে ভালোবাসে তার মাকে বলতে। পুতুলটি শুধুই তার ডবল নয়; এটি তার সন্তানও। এ-ভূমিকা দুটি পরস্পরকে বাদ দেয় না, যেহেতু মায়ের কাছে আসল শিশুটিও একটি *বিকল্প সত্তা*। যখন সে তার পুতুলকে বকে, শাস্তি দেয়, এবং তারপর সেটিকে সান্ত্বনা দেয়, তখন সে একই সঙ্গে মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে এবং নিজে ধারণ করে মায়ের মর্যাদা : সে নিজের মধ্যে সম্মিলিত করে মাতা-কন্যা যুগলের দুটি উপাদান। সে নিজের গোপন কথা বলে পুতুলকে, সে এটিকে লালন করে, এর ওপর প্রয়োগ করে তার সার্বভৌম কর্তৃত্ব, এমনকি অনেক সময় খসিয়ে ফেলে তার হাত, তাকে মারে, পীড়ন করে তাকে। এর অর্থ হচ্ছে পুতুলের মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতা লাভ করে কর্তৃত্বপরায়ণ আত্মঘোষণার ও স্বরূপনির্ণয়ের। প্রায়ই মাকে জড়ানো হয় এ-কাল্পনিক জীবনে : শিশুটি তার মায়ের কাছে অভিনয় করে যেনো সে পুতুলটির পিতা ও মাতা, তৈরি করে এমন একটি দম্পতি, যাতে বাদ দেয়া হয় পুরুষটিকে। ছোটো মেয়ে স্থির করে যে শিশুদের যত্ন নেয়ার ভার পড়ে মায়ের ওপর, তাকে তা-ই শেখানে হয়; যতো গল্প সে শুনেছে, পড়েছে যতো বই, তার ছোট্ট অভিজ্ঞতা সপ্রমাণ করে এ-ধারণাকেই। তাকে উৎসাহিত করা হয় ভবিষ্যতের এসব সম্পদের যাদু অনুভব করতে, তাকে পুতুল দেয়া হয় যাতে এর পর এসব মূল্যবোধ লাভ করে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। তার 'বৃত্তি' সজোরে ছেপে দেয়া হয় তার ওপর।

ছোটো মেয়ে যেহেতু অনুভব করে শিশু জন্ম দেয়া হবে তার নিয়তি, এবং যেহেতু সে ছেলের থেকে তার 'অভ্যন্তর' সম্পর্কে বেশি আগ্রহী, সে বিশেষভাবেই উৎসুক হয় সন্তান উৎপাদনের রহস্য সম্পর্কে। সে আর বিশ্বাস করে না যে শিশুরা জন্ম নেয় বাঁধাকপির ভেতরে, বা শিশুদের নিয়ে আসা হয় ডাক্তারের থলেতে ক'রে, বা নিয়ে আসে সারসেরা; সে শিগগির জানতে পারে, বিশেষ ক'রে যদি এর মধ্যে জন্ম নেয় ভাইবোন, যে বাচ্চারা জন্ম নেয় মায়ের দেহের ভেতরে। তাছাড়া, আধুনিক মা-বাবারা ব্যাপারটিকে আর আগের দিনের মতো রহস্যে পরিণত করে না। ছোটো বালিকা ভয় পাওয়ার বদলে সাধারণত অভিভূত হয় বিস্ময়ে, কারণ প্রপঞ্চটিকে ঐন্দ্রজালিক ব'লে মনে হয় তার কাছে; সে তখনও সমস্ত শারীরবৃত্তিক নিহিতার্থ বুঝে উঠতে পারে না। প্রথমে সে অজ্ঞ থাকে বাবার ভূমিকা সম্পর্কে এবং ধারণা করে যে নারীরা বিশেষ কোনো খাবার খেয়ে গর্ভবতী হয়। এটা এক কিংবদন্তিমূলক বিষয় (রূপকথায় রাণীরা বিশেষ কোনো ফল, বা বিশেষ ধরনের মাছ খেয়ে জন্ম দেয় ছোট্ট মেয়ে বা সুন্দর ছেলে), এবং এটা অনেক নারীর মনে গর্ভধারণের ব্যাপারটিকে সম্পর্কিত করে পরিপাকতন্ত্রের সাথে। এসব সমস্যা ও আবিষ্কার বালিকার মনে জাগায় ঔৎসুক্য এবং

লালন করে তার কল্পনা।

এ-ইতিহাস বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যদিও ছোটো মেয়ে প্রায়ই বাবার ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো প্রশ্ন করে না, বা মা-বাবারা এড়িয়ে যায় এ-ব্যাপারটি। অনেক ছোটো মেয়ে তার জামার নিচে বালিশ নিয়ে গর্ভবতী হওয়ার খেলা খেলে, বা জামার ভাঁজের টোপরে একটি পুতুল নিয়ে হাঁটে এবং সেটিকে ফেলে দোলনায়; সে এটিকে স্তন্যদান করতে পারে। ছেলেরা, মেয়েদের মতোই, বিস্ময় বোধ করে মাতৃত্বের রহস্যে; সব শিশুই 'গভীরতা সম্পর্কে' কল্পনা করে, যা তাদের দেয় জিনিশপত্রের অভ্যন্তরে গুপ্তধনের ধারণা বোধ করতে; তারা সবাই চারদিক ঘিরে ফেলার, পুতুলের ভেতরে পুতলের, বাক্সের ভেতরে বাক্সের, ছবির ভেতরে ক্রমিকভাবে ছোটো আকারের ছবির অলৌকিত্ব অনুভব করে; সবাই উল্লাস বোধ করে কুঁড়ি ছিঁড়েফেড়ে, ডিমের খোলসের ভেতরে ছানা দেখে, জলের গামলায় ভাসানো 'জাপানি ফুল'-এর প্রস্ফুটিত হওয়া দেখে। ছোটো ছোটো চিনির ডিমে বোঝাই একটা ইস্টারের ডিম খুলে একটি ছোটো ছেলে আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠেছিলো : 'আহ্, এটা একটা মা!' কারো দেহের ভেতর থেকে একটি শিশুকে বের করা : তা ভোজবাজির কৃতিত্বপূর্ণ কাজের মতোই চমৎকার। মাকে মনে হয় বিস্ময়কর পরীর ক্ষমতায় ভূষিত। অনেক ছেলে দুঃখ পায় তাদের এমন বিশেষাধিকার নেই ব'লে; পরে যখন তারা পাখির ডিম চুরি করে ও মাড়িয়ে যায় ছোটো ছোটো চারাগাছ, যখন তারা এক ধরনের প্রবল ক্ষিপ্ততায় ধ্বংস করে জীবন, তারা তা করে তাদের যে জীবন আনয়নের সামর্থ্য নেই, তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে; আর তখন ছোটো মেয়ে একথা ভেবে সুখ পায় যে একদিন সে জীবন সৃষ্টি করবে।

পুতুল নিয়ে খেলা যে-আশাকে মূর্ত ক'রে তোলে, তার সাথে পারিবারিক জীবন যোগ করে ছোটো মেয়ের আত্মপ্রকাশের আরো নানা সুযোগ। গৃহস্থালির বেশ কিছু কাজ ছোটো মেয়ের সামর্থ্যের মধ্যে; বালককে সাধারণত রেহাই দেয়া হয়, কিন্তু তার বোনকে অনুমতি দেয়া হয়, এমনকি আদেশ দেয়া হয় ঝাঁট দিতে, ধুলো ঝাড়তে, আলুর খোসা ছুলতে, শিশুকে স্নান করাতে, রান্নার দিকে চোখ রাখতে। বিশেষ ক'রে বড়ো বোনটিকে সাধারণত জড়িয়ে ফেলা হয় মাতৃসুলভ কাজে; হয়তো নিজের সুবিধার জন্যে বা হয়তো শত্রুতা ও ধর্ষকামিতাবশত মা নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয় নিজের অনেক দায়িত্ব থেকে; এভাবে মেয়েটিকে অকালেই খাপ খেতে বাধ্য করা হয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জগতের সাথে; নিজের গুরুত্ববোধ তাকে সাহায্য করে নারীত্ব অর্জনে। কিন্তু সে বঞ্চিত হয় আনন্দময় স্বাধীনতা থেকে, শৈশবের ভাবনাহীনতা থেকে; অকালেই একটি নারী হয়ে উঠে সে জেনে ফেলে এ-অবস্থা একটি মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় কেমন অসামর্থ্য; সে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরূপে পৌঁছে বয়ঃসন্ধিকালে, যা তার ইতিহাসকে দেয় এক বিশেষ চরিত্র। মাত্রাতিরিক্ত কাজের ভার বয়ে একটি শিশু অকালেই পরিণত হ'তে পারে একটি ক্রীতদাসে, যার জন্যে নির্ধারিত এক নিরানন্দ জীবন। মায়ের কাজগুলো মেয়ের পক্ষে করা বেশ সম্ভব; 'সে এর মাঝেই হয়ে উঠেছে এক ছোটো নারী,' তার মা-বাবারা ব'লে থাকে এমন কথা; এবং কখনোবা মনে করা হয় যে সে ছেলের থেকে বেশি মূল্যবান। প্রকৃতপক্ষে, যদি সে

প্রাপ্তবয়স্ক স্তরে পৌঁছেই থাকে, তাহলে তা এ-কারণে যে অধিকাংশ নারীতেই এ-স্তরটি প্রধাগতভাবে থাকে কম-বেশি শিশুধর্মী। ঘটনা হচ্ছে যে বালিকা সচেতন তার অকালপক্বতা সম্বন্ধে, তাই সে ছোটো শিশুদের সামনে ছোটো মায়ের অভিনয় ক'রে গর্ব বোধ করে; গুরুত্বপূর্ণ হয়ে সে আনন্দ পায়, সে যথোচিতভাবে কথা বলে, সে আদেশ দেয়, সে তার ছোটো ভাইদের কাছে গুরুজন হওয়ার ভাব করে, সে তার মায়ের সমান অবস্থান থেকে বলে কথাবার্তা।

এসব ক্ষতিপূরণ সত্ত্বেও তার জন্যে নির্ধারিত ভাগ্যকে সে খেদহীনভাবে মেনে নেয় না; যতোই সে বড়ো হ'তে থাকে, ততোই ছেলেদের সে ঈর্ষা করতে থাকে তাদের বলিষ্ঠতার জন্যে। পিতামাতা ও পিতামহ-মহীরা একথা গোপন ক'রে রাখে না যে সে মেয়ে না হয়ে ছেলে হ'লেই তারা বেশি পছন্দ করতো; বা তারা বোনটির থেকে ভাইটির প্রতি দেখায় বেশি স্নেহ। অনুসন্ধানে সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে মেয়ে হওয়ার থেকে ছেলে হওয়াই পছন্দ করতো অধিকাংশ পিতামাতা। ছেলেদের সাথে কথাবার্তা বলা হয় অনেক বেশি গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সাথে, তাদের দেয়া হয় অনেক বেশি অধিকার; তারা নিজেরা মেয়েদের তাচ্ছিল্য করে; তারা নিজেরা খেলা করে, মেয়েদের তাদের দলে যোগ দিতে না দিয়ে তারা মেয়েদের অপমান করে : একদিকে, মেয়েদের 'প্রিসি' বা ও-রকম কিছু বলা এবং এভাবে ছোটো মেয়ের মনে তার গোপন অবমাননা জাগিয়ে তোলা। ফ্রান্সে, মিশ্র বিদ্যালয়গুলোতে, ছেলেদের জাত ইচ্ছাকৃতভাবে পীড়ন ও অত্যাচার করে মেয়েদের জাতকে।

যদি মেয়েরা লড়াই করতে চায় ছেলেদের সাথে এবং লড়াই করে তাদের অধিকারের জন্যে, তাহলে তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়। তারা দ্বিগুণ ঈর্ষা বোধ করে একান্তভাবে ছেলেদের কাজকর্মের প্রতি : প্রথমত, বিশ্বের ওপর তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্যে তাদের স্বতস্ফূর্ত বাসনা আছে ব'লে, এবং, দ্বিতীয়ত, তাদের যে-নিকৃষ্ট অবস্থানে দণ্ডিত করা হয়েছে, তারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ব'লে। একদিকে, গাছে ওঠা এবং মই বাওয়া বা ছাদে ওঠা যে তাদের জন্যে নিষিদ্ধ, এতে তারা কষ্ট পায়। অ্যাডলার মন্তব্য করেছেন যে উচ্চ ও নিম্ন ধারণার আছে মহাগুরুত্ব, স্থানিকভাবে উচ্চতা জ্ঞাপন করে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব, যেমন দেখা যায় বিচিত্র ধরণের বীরত্বব্যঞ্জক কিংবদন্তিতে; কোনো শিখরে, কোনো চূড়োয় আরোহণ হচ্ছে সার্বভৌম কর্তা (অহং) হিশেবে ঘটনার সাধারণ বিশ্ব পেরিয়ে ওপরে ওঠা; ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই আরোহণ করা হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তি। ছোটো মেয়ে, যার জন্যে এসব কাজ নিষিদ্ধ এবং কোনো গাছ বা সমুদ্রতীরের উঁচু খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে ব'সে যে তার থেকে অনেক ওপরে দেখে বিজয়দৃপ্ত ছেলেটিকে, সে অবশ্যই অনুভব করে যে সে, দেহে ও আত্মায়, তাদের থেকে নিকৃষ্ট। একই রকম ঘটে যদি সে দৌড় বা লাফ দেয়ার প্রতিযোগিতায় *পিছিয়ে* পড়ে, যদি হাতাহাতির সময় তাকে ফেলে দেয়া হয় বা তাকে রাখা হয় শুধু দর্শক হিশেবে।

সে যখন আরো বড়ো হয়, তার বিশ্ব সম্প্রসারিত হয়, এবং তখন সে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে। মায়ের সাথে অভিন্নতাবোধ করা প্রায়ই আর সন্তোষজনক সমাধান ব'লে মনে হয় না; যদি ছোটো মেয়ে প্রথমে মেনেও নেয় তার

নারীসুলভ বৃত্তি, এটা এ-কারণে নয় যে সে দাবি ত্যাগ করতে চায়; এটা বরং শাসন করার জন্যে; সে মাতৃকা হ'তে চায়, কেননা মাতৃকাদের বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত মনে হয়; কিন্তু যখন তার সঙ্গীরা, তার পড়াশুনো, তার খেলাধুলো, তার পাঠ, তাকে বের ক'রে নেয় মাতাদের বৃত্ত থেকে, তখন সে দেখতে পায় নারীরা নয়, পুরুষেরাই নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ব। এ-উপলব্ধিই– শিশ্ন আবিষ্কারের থেকে অনেক বেশি– অপ্রতিরোধ্যভাবে বদলে দেয় তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা।

লিঙ্গ দুটির আপেক্ষিক মর্যাদা, স্তরক্রম, প্রথমে তার চোখে পড়ে পারিবারিক জীবনে; একটু একটু ক'রে সে বুঝতে পারে যে যদিও পিতার কর্তৃত্ব প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সব সময় অনুভব করা যায় না, তবে বাস্তবিকভাবে তার কর্তৃত্বই চূড়ান্ত। এটুকু বোঝার বুদ্ধি তার থাকে যে বাবার ইচ্ছেই সবার আগে; গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে মা বাবারই নামে, তারই কর্তৃত্বের মাধ্যমে, দাবি করে, পুরস্কার দেয়, শাস্তি দেয়। বাবার জীবনের আছে এক রহস্যময় মর্যাদা : যে-সময়টুকু সে বাড়িতে থাকে, যে-ঘরে সে কাজ করে, তার চারপাশে থাকে যে-সব জিনিশপত্র, তার কর্মগুলো, তার শখগুলোর আছে পবিত্র চরিত্র। সে ভরণপোষণ করে পরিবারের এবং সে পরিবারের দায়িত্বশীল কর্তা। সাধারণত তার কাজের জন্যে তাকে বাইরে যেতে হয়, এবং তাই তার মাধ্যমেই পরিবারটি যোগাযোগ করে বাইরের জগতের সাথে : সে হচ্ছে বিশাল, দুরূহ, ও বিস্ময়কর দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের জগতের প্রতিমূর্তি; সে সীমাতিক্রমণতার মনুষ্যমূর্তি, সে বিধাতা; মেয়ে এটাই শারীরিকভাবে অনুভব করে যখন ওই শক্তিশালী বাহু তাকে তুলে ধরে ওপরের দিকে, সে দোলে যে-শক্তির কাঠামোর আশ্রয়ে। একদা যেমন আইসিসকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলো রা, পৃথিবীকে সূর্য, তেমনি তার মাধ্যমে সিংহাসনচ্যুত হয় মা।

কিন্তু এখানে গভীরভাবে বদলে যায় শিশুর পরিস্থিতি : তার একদিন হওয়ার কথা ছিলো তার সর্ব-শক্তিমান মায়ের মতো এক নারী– সে কখনো সার্বভৌম পিতা হবে না; যে-বন্ধন তাকে জড়িয়ে রেখেছিলো তার মায়ের সাথে, সেটা ছিলো একটা সক্রিয় সমকক্ষ হওয়ার সাধনা– অক্রিয়ভাবে সে শুধু প্রতীক্ষা করতে পারে পিতার সম্মতির একটা লক্ষণ। ছেলে তার পিতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভাবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুভূতি নিয়ে; কিন্তু মেয়েকে এটা মেনে নিতে হয় নির্বীর্য প্রশস্তিবোধের সাথে। আমি ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে ফ্রয়েড যাকে ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা বলেন, সেটা, তিনি যেমন মনে করেন, তেমন কোনো যৌন কামনা নয়; এটা হচ্ছে কর্তার পুরোপুরি দাবি ত্যাগ ক'রে আনুগত্য ও ভক্তির মধ্যে কর্ম হওয়ার সম্মতি। যদি তার পিতা কন্যার প্রতি স্নেহ দেখায়, তাহলে সে বোধ করে যে মহিমান্বিতরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে তার অস্তিত্বের সত্যতা; সে ভূষিত সে-সমস্ত গুণে যা অন্যদের অর্জন করতে হয় অনেক কষ্টে; সে লাভ করেছে পরিপূর্ণতা ও সে অধিষ্ঠিত হয়েছে দেবীত্বে। সারাজীবন আকাঙ্ক্ষাভরে সে খুঁজতে পারে প্রাচুর্য ও শান্তির সেই হারানো অবস্থা।

সব কিছুই কাজ করে ছোটো বালিকার দৃষ্টিতে এ-স্তরক্রম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। যে-ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সংস্কৃতির সে অন্তর্ভুক্ত, তার যে-সব গান ও রূপকথা দিয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো হয়, তার সবই পুরুষের এক সুদীর্ঘ স্তবগান। পুরুষেরা গ'ড়ে

তুলেছিলো গ্রিস, রোমান সাম্রাজ্য, ফ্রান্স ও অন্য সব দেশ, তারা আবিষ্কার করেছে সারা পৃথিবী এবং এর সম্পদ কাজে লাগানোর জন্যে উদ্ভাবন করেছে হাতিয়ার, তারা একে শাসন করেছে, তারা একে ভ'রে তুলেছে ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্যসৃষ্টিতে। শিশুদের বইপত্র, পুরাণ, রূপকথা, উপকথা সব কিছুতেই প্রতিফলিত হয় পুরুষের গর্ব ও কামনা থেকে জন্ম নেয়া কিংবদন্তি; তাই পুরুষের চোখ দিয়েই ছোটো বালিকা আবিষ্কার করে বিশ্ব এবং তাতে পাঠ করে তার নিয়তি

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, বাস্তবিকই, অভিভূতকর : পার্সিউস, হারকিউলিস, ডেভিড, একিলিস, লাঁসলো, প্রাচীন ফরাশি যোদ্ধা দ্য গয়েসলি ও বায়ার্দ, নেপোলিয়ন– একজন জোয়ান অফ আর্কের স্থানে এতো পুরুষ; এবং মেয়ে তার পেছনে দেখতে পায় মহাদেবদূত মাইকেলের মহান পুরুষমূর্তি! বিখ্যাত নারীদের জীবনীগুলোর থেকে কিছুই আর বেশি ক্লান্তিকর নয় : মহাপুরুষদের তুলনায় তারা নিতান্তই ফ্যাকাশে মূর্তি; এবং তাদের অধিকাংশই পোহায় কোনো বীরপুরুষের গৌরবের রোদ। হাওয়াকে তার নিজের জন্যে সৃষ্টি করা হয় নি, করা হয়েছিলো আদমের সঙ্গিনীরূপে, এবং তাকে তৈরি করা হয়েছিলো আদমের পাঁজরের হাড় থেকে। বাইবেলে প্রকৃত খ্যাতিসম্পন্ন নারী কমই আছে : রুথ নিজের জন্যে একটি স্বামী যোগাড়ের বেশি কিছু করে নি। এসথার ইহুদিদের জন্যে অনুগ্রহ লাভ করেছে আহাসুয়েরাসের কাছে নতজানু হয়ে, তবে সে ছিলো মোরডেকাইর হাতে একটি সহজে-বশ-মানা হাতিয়ার মাত্র; জুডিথ ছিলো অনেক বেশি দুঃসাহসী, তবে সে ছিলো পুরোহিতদের কাছে দাসভাবাপন্ন, এবং তার দুঃসাহসিক কাজগুলোকে, যেগুলো সন্দেহজনক ধরনের, কিছুতেই তুলনা করা যায় না তরুণ ডেভিডের পরিচ্ছন্ন, অত্যুজ্জ্বল বিজয়ের সাথে। পৌত্তলিক পুরাণের দেবীরা লঘুচপল বা অস্থিরমতি, এবং তার সবাই কেঁপে ওঠে জুপিটারের সামনে। প্রোমিথিউস যখন সূর্য থেকে মহিমান্বিতভাবে চুরি ক'রে আনে আগুন, প্যান্ডোরা তখন জগতের সামনে খোলে তার অশুভের বাক্স।

একথা সত্য যে রূপকথা ও উপকথায় আছে ডাইনিরা ও কুৎসিত বুড়ীরা, যাদের আছে ভীতিকর ক্ষমতা। অ্যান্ডারসনের *গার্ডেন অফ প্যারাডাইস*-এর বায়ুদের মায়ের চরিত্রটি স্মরণ করিয়ে দেয় আদিম মহাদেবীকে; তার চারটি দানবাকার পুত্র ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মান্য করে তাকে, দুষ্টুমি করলে সে তাদের পিটিয়ে ভ'রে রাখে ছালার ভেতরে। তবে এগুলো আকর্ষণীয় চরিত্র নয়। এর থেকে অনেক বেশি সুখকর পরী, সাইরেন, ও আনডাইনরা, এরা পুরুষের আধিপত্যের বাইরে; তবে এদের অস্তিত্ব সন্দেহজনক, এদের নেই স্বাতন্ত্র্য; এরা হস্তক্ষেপ করে মানুষের কর্মকাণ্ডে, কিন্তু এদের নিজেদের কোনো নিয়তি নেই : অ্যান্ডারসনের ছোটো সাইরেন যেদিন নারী হয়ে ওঠে, সেদিন বুঝতে পারে প্রেমের জোয়াল কাকে বলে, এবং দুঃখভোগ হয়ে ওঠে তার নিয়তি।

যেমন প্রাচীন কিংবদন্তিতে তেমনি আধুনিক কাহিনীতে পুরুষ হচ্ছে সুবিধাপ্রাপ্ত বীর। রোমাঞ্চ উপন্যাসে ছেলেই বেরোয় পৃথিবী পর্যটনে, যে ভ্রমণ করে জাহাজের নাবিক হয়ে, যে জঙ্গলে রুটিফল খেয়ে বেঁচে থাকে। পুরুষের সক্রিয়তায়ই ঘটে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এসব উপন্যাস ও উপকথা যা বলে, বাস্তবতা তা সপ্রমাণিত করে। ছোটো মেয়ে যদি পত্রিকা পড়ে, যদি সে শোনে বড়োদের কথাবার্তা, সে বুঝতে পারে

যেমন আজকাল তেমনি চিরকাল পুরুষেরাই চালিয়েছে বিশ্ব। যে-সব রাজনীতিক নেতা, সেনাপতি, অভিযাত্রী, সঙ্গীতস্রষ্টা, ও চিত্রকরের সে অনুরাগী, তারা সবাই পুরুষ; এটা নিশ্চিত যে পুরুষেরাই তার মনে জাগায় প্রবল উৎসাহ।

এ-মর্যাদা প্রতিফলিত হয় অতিপ্রাকৃত জগতে। সাধারণত, নারীর জীবনে ধর্মের বৃহৎ ভূমিকার পরিণতিরূপে, বালিকা তার ভাইয়ের থেকে মাকে দিয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয় ব'লে, তার ওপর ধর্মের প্রভাব পড়ে অনেক বেশি। পশ্চিমের ধর্মগুলোতে বিধাতা একজন পুরুষ, পুরুষের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক : তিনি শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত। খ্রিস্টধর্মীদের কাছে খ্রিস্ট আরো স্পষ্টভাবে রক্তমাংসের পুরুষ, যাঁর আছে উজ্জ্বল শ্মশ্রু। ধর্মতাত্ত্বিকদের মতে দেবদূতদের কোনো লিঙ্গ নেই; কিন্তু তাঁদের নামগুলো পুরুষের এবং তাঁদের সুদর্শন তরুণদের মতো দেখায়। পৃথিবীতে বিধাতার প্রতিনিধিরা : পোপ, বিশপ (যাঁর আংটিতে চুমো খেতে হয়), পুরোহিত, যিনি খ্রিস্টের নৈশভোজের পর্বে মন্ত্রপাঠ করেন, যিনি ধর্মোপদেশ দেন, যাঁর সামনে লোকজন নতজানু হয় স্বীকারোক্তির গোপনীয়তার সময়– তাঁরা সবাই পুরুষ। ক্যাথলিক ধর্ম ছোটো মেয়ের ওপর ফেলে এক অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর প্রভাব। কুমারী নতজানু হয়ে শোনে দেবদূতের বাণী এবং উত্তর দেয় : 'দ্যাখো বিধাতার দাসীকে।' মেরি ম্যাগডালিন পড়ে খ্রিস্টের পদতলে, পদতলি ধুয়ে দেয় নিজের অশ্রুতে এবং শুকিয়ে দেয় নিজের মাথার কেশে, তার নারীর দীর্ঘ চুলে। সন্তরা নতজানু হয়ে দীপ্ত খ্রিস্টের প্রতি ঘোষণা করেন তাঁদের প্রেম। ধূপের গন্ধ নিশ্বাসে নিয়ে নতজানু বালিকা আত্মবিসর্জন করে বিধাতা ও দেবদূতদের স্থিরদৃষ্টির সামনে : পুরুষের স্থিরদৃষ্টির সামনে। আশ্লেষের ভাষা ও নারীদের বলা অতীন্দ্রিয় ভাষার সাদৃশ্যের ওপর প্রায়ই জোর দেয়া হয় : উদাহরণস্বরূপ, সেইন্ট তেরেসা জেসাস সম্পর্কে লিখেছেন : ' হে আমার প্রিয়তম, তোমার প্রেমের মাধ্যমে, এইখানে নিম্নে, আমি তোমার মুখের অনির্বচনীয় চুম্বন অনুভব করতে চাই না... তবে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার প্রেমে আমাকে প্রজ্জ্বলিত করো... আহ, আমার দাউদাউ উন্মত্ততায় আমাকে তোমার হৃদয়ে লুকোতো দাও... আমি তোমার প্রেমের শিকার হবো...' ইত্যাদি।

তবে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো ঠিক হবে না এসব অপ্রতিরোধ্য ভাবোচ্ছ্বাস সব সময়ই যৌন; বরং সত্য হচ্ছে যখন বিকশিত হয় নারীর কাম, তাতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে ধর্মানুভূতি যা নারী সাধারণত আবাল্য চালিত করে পুরুষের দিকে। একথা সত্য যে ছোটো মেয়ে তার স্বীকারোক্তিগ্রহণকারীর মুখোমুখি, এবং একলা বেদিমূলে, বোধ করে একটা চাঞ্চল্য, যা সে পরে অনুভব করবে তার প্রেমিকের আলিঙ্গনে : এটা বোঝায় যে নারীর প্রেম হচ্ছে অভিজ্ঞতার এমন এক রূপ যাতে এক সচেতন অহং সে-সত্তার জন্যে নিজেকে পরিণত বস্তুতে করে, যে এর সীমাতিক্রমণ করেছে; এসব অক্রিয় সুখানুভবও ছায়াচ্ছন্ন গির্জায় বিলম্বকারী তরুণী ভক্তের আনন্দ।

অবনত মস্তকে, আপন হাতে মুখ ঢেকে, সে বোঝে আত্ম-অস্বীকৃতির অলৌকিকত্ব : জানুতে ভর দিয়ে সে ওঠে স্বর্গের দিকে; মেঘ ও দেবদূতদের উর্ণাজালের মধ্যে বিধাতার বাহুতে তার আত্মসমর্পণ তাকে দেয় স্বর্গে প্রবেশের নিশ্চয়তা। এ-চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা থেকেই সে নকল করে তার পার্থিব ভবিষ্যৎ। শিশু এটা পেতে পারে আরো

নানা পথেও : এক গৌরবের স্বর্গে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্যে সব কিছুই দিবাস্বপ্নে তাকে আমন্ত্রণ জানায় পুরুষের বাহুতে নিজেকে সমর্পণ করতে। সে শেখে যে সুখী হওয়ার জন্যে তাকে প্রেম পেতে হবে; প্রেম পাওয়ার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে প্রেমিকের আগমনের জন্যে। নারী হচ্ছে নিদ্রিতা রূপসী, সিন্ডেরেলা, তুষারশুভ্রা, যে গ্রহণ করে এবং বশ্যতা স্বীকার করে। গানে ও গল্পে দেখা যায় যুবক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে নারীর খোঁজে; সে হত্যা করে ড্রাগন, সে যুদ্ধ করে দানবদের সাথে; নারী বন্দী থাকে কোনো মিনারে, প্রাসাদে, উদ্যানে, গুহায়, সে শৃঙ্খলিত থাকে পাথরের সাথে, সে বন্দিনী, গভীর নিদ্রামগ্ন : সে অপেক্ষা করে।

একদিন আসবে আমার রাজকুমার... একদিন আসবে সেই পুরুষ, যাকে আমি ভালোবাসি– জনপ্রিয় গানের ভাষা তাকে ভ'রে দেয় ধৈর্য ও আশার স্বপ্নে।

তাই নারীর কাছে চরম প্রয়োজনের ব্যাপার হচ্ছে কোনো পুরুষের হৃদয়কে মুগ্ধ করা; তারা হ'তে পারে অকুতোভয় ও রোমাঞ্চাভিলাষী, সব নায়িকারই অভিকাঙ্ক্ষী হয় পুরস্কারপ্রাপ্তির; এবং অধিকাংশ সময়ই রূপ ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো গুণই চাওয়া হয় না। তাই বোঝা যায় যে তার শারীরিক সৌন্দর্যের যত্ন নেয়াই হয়ে ওঠে বালিকার প্রকৃত আবিষ্টতা; তারা রাজকন্যাই হোক আর রাখালীই হোক, ভালোবাসা ও সুখ পাওয়ার জন্যে সব সময় রূপসী হ'তেই হবে তাদের; সাদাসিধে ভাবের সাথে নির্মমভাবে জড়ানো হয় খলস্বভাবকে, আর কুৎসিত মেয়ের ওপর যখন নেমে আসে দুর্ভাগ্য, বোঝা যায় না তারা শাস্তি পাচ্ছে তাদের অপরাধের জন্যে, না তাদের অসুন্দর চেহারার জন্যে। মাঝেমাঝেই রূপসী তরুণী জীবদের, যাদের জন্যে রক্ষিত আছে এক উপভোগ্য ভবিষ্যৎ, তাদের প্রথম দেখা যায় শিকাররূপে; ব্রাবঁরের জেনেভিয়েভের, গ্রিসেলদার কাহিনী যতোটা সরল মনে হয় আসলে ততোটা সরল নয়; তাদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে প্রেম ও দুঃখভোগ; নারী প্রথমে শোচনীয় দুর্দশার গভীরে পতিত হয়েই নিশ্চিত করে তার চরম স্বাদু বিজয়গুলো; বিধাতা বা পুরুষ যে-ই জড়িত থাক-না-কেনো ছোটো বালিকা জানে সে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে গভীরতম দাবিত্যাগের মাধ্যমে : সে আনন্দ পায় এমন এক মর্ষকামিতায়, যা তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় পরম বিজয়লাভের। সেইন্ট ব্লাঁদিন, সিংহের থাবায় গাঁথা তার রক্তের ডোরাকাটা দেহ, মৃতের মতো কাঁচের কফিনে শায়িত তুষারশুভ্রা, নিদ্রিতা রূপসী, মূর্ছিতা আতালা, একপাল ভঙ্গুর নায়িকা ক্ষতবিক্ষত, অক্রিয়, আহত, নতজানু, অবমানিত, তাদের বালিকা বোনের কাছে প্রদর্শন করে শহিদ হওয়ার, পরিত্যক্ত হওয়ার, দাবিত্যাগী সৌন্দর্যের মোহনীয় মর্যাদা। আমরা বিস্মিত হই না যখন তার ভাই পালন করে বীরের ভূমিকা, তখন বালিকা স্বেচ্ছায় পালন করে শহিদের ভূমিকা : পৌত্তলিকেরা তাকে ছুঁড়ে দেয় সিংহের মুখে, নীলশ্মশ্রু তাকে চুল ধ'রে টেনে হিঁচড়ে নেয়, তার স্বামী, মহারাজ, তাকে নির্বাসিত করে অরণ্যের গভীরে; সে বশ্যতা স্বীকার করে, দুঃখভোগ করে, মৃত্যুবরণ করে, এবং তার মাথা পরে গৌরবের জ্যোতিশ্চক্র।

ছলচাতুরি ও দিবাস্বপ্ন ছোটো মেয়েকে পরিচিত করিয়ে দিতে থাকে অক্রিয়তার সাথে; তবে নারী হওয়ার আগে সে একটি মানুষ, এবং সে ইতিমধ্যেই জানে যে নিজেকে নারী হিশেবে মেনে নেয়া হচ্ছে দাবি ত্যাগ করা এবং নিজের অঙ্গহানি করা;

দাবি ত্যাগের ব্যাপারটি প্রলোভনজাগানো হ'লেও অঙ্গহানিত্ব জাগায় ঘৃণা। ভবিষ্যতের কুয়াশার মধ্যে পুরুষ, প্রেম এখনো সুদূর; বর্তমান মুহূর্তে ছোটো মেয়ে, তার ভাইদের মতোই, চায় সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা। শিশুদের ওপর স্বাধীনতা গুরুভার নয়, কেননা এর সাথে দায়িত্ব জড়িত নয়; তারা জানে প্রাপ্তবয়স্কদের তত্ত্বাবধানের মধ্যে তারা নিরাপদ : তারা পালিয়ে যাওয়ার প্ররোচনা বোধ করে না। জীবনের দিকে তার স্বতস্ফূর্ত উদ্বেলন, খেলাধুলোয় তার আনন্দ, হাসাহাসি, রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ড ছোটো মেয়েকে দেখিয়ে দেয় যে মায়ের এলাকাটি সংকীর্ণ ও শ্বাসরুদ্ধকর। তার ইচ্ছে হয় মায়ের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে, এ-কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয় এমন ঘনিষ্ঠ ও প্রাত্যহিক রীতিতে যার মতো কিছু ছেলেদের ওপর প্রয়োগ করা হয় না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সুখ পায়, যখন তারা তার সাথে এমনভাবে আচরণ করে যেনো সে আছে তাদের সমান অবস্থানে, এবং সে চেষ্টা করে তাদের অনুমোদন পাওয়ার। সুবিধাপ্রাপ্ত জাতের অন্তর্ভুক্ত হ'লে তার ভালো লাগতো। মার্জিত আচরণের বিধিবিধান দ্বারা, নিজের পোশাকের ঝামেলা দিয়ে, গৃহস্থালির কাজকর্মের কাছে বন্দী হয়ে নিজের সব উড়ালকে প্রতিহত করতে সে পছন্দ করে না। অসংখ্য অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এ-ব্যাপারে, প্রায় অধিকাংশ থেকেই পাওয়া গেছে একই ফলাফল : বাস্তবিকভাবে সব ছেলেই– প্লাতোর কালের প্রাতোর মতোই– ঘোষণা করেছে যে মেয়ে হ'তে তারা ভয় পায়; আর প্রায় সব মেয়েই দুঃখ পায় যে তারা ছেলে হয় নি। হ্যাভলক এলিসের পরিসংখ্যান অনুসারে, একশোর মধ্যে একটি ছেলে পছন্দ করে মেয়ে হ'তে; আর শতকরা পঁচাত্তরজনেরও বেশি মেয়ে পছন্দ করে তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে। অধিকাংশ মেয়েই অভিযোগ করে যে তাদের পোশাক বিরক্তিকর, তাতে চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে না, তাদের সাবধান থাকতে হয় যাতে তাদের হালকা রঙের স্কার্ট ও ফ্রকে দাগ না লাগে।

দশ বা বারো বছর বয়সে অধিকাংশ ছোটো মেয়েই খাঁটি *গারসঁ মাঁক*– অর্থাৎ, এমন শিশু, যারা কোনো একটি অভাবের ফলে ছেলে হ'তে পারে নি। একে তারা শুধু একটা বঞ্চনা ও অবিচার ব'লেই মনে করে না, তারা দেখতে পায় তারা দণ্ডিত হয়েছে যে-অবস্থায় থাকার জন্যে, সেটি অশুভ। দমিত হয় মেয়েদের প্রাণোচ্ছলতা, তাদের নিষ্ক্রিয় শক্তি রূপান্তরিত হয় স্নায়বিক দৌর্বল্যে; তাদের অতিশান্ত কাজগুলো নিঃশেষ করতে পারে না তাদের শক্তির প্রাচুর্য; তারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে, এবং অবসাদের মধ্য দিয়ে ও তাদের হীন অবস্থানের ক্ষতিপূরণের জন্যে নিজেদের তারা সমর্পণ করে বিষাদগ্রস্ত ও রোম্যান্টিক দিবাস্বপ্নের কাছে; তারা সুখ পায় এসব সহজমুক্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং হারিয়ে ফেলে তাদের বাস্তবতাবোধ; তাদের আবেগের কাছে তারা ধরা দেয় অদম্য উত্তেজনায়; কাজ করার বদলে তারা কথা বলে, অধিকাংশ সময় খিচুড়ির ধরনে মিলিয়েমিশিয়ে দেয় গুরুত্বপূর্ণ কথার সাথে নিরর্থক কথা। অবহেলিত, 'ভুলভাবে বোঝা', তারা সান্ত্বনা খোঁজে আত্মরতিক কল্পনায় : নিজের প্রতি অনুরাগ ও করুণার সাথে নিজেদের তারা কল্পনা করতে থাকে উপন্যাসের রোম্যান্টিক নায়িকারূপে। খুবই স্বাভাবিকভাবে তারা হয়ে ওঠে ছেনাল ও নাটুকে, এ-ক্রটিগুলো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে বয়ঃসন্ধিকালে। তাদের অসুস্থতা ধরা পড়ে ধৈর্যহীনতায়,

বদমেজাজের ঘোরে, অশ্রুপাতে; তারা কান্না উপভোগ করে– অনেক নারী এ-অভ্যাস টিকিয়ে রাখে বুড়ো বয়স পর্যন্ত– অনেকটা এজন্যে যে তারা দণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করতে পছন্দ করে : এটা যুগপৎ তাদের নির্মম ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিজেদের আকর্ষণীয় ক'রে তোলার উপায়। ছোটো বালিকারা প্রায়ই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে দেখে নিজেদের, তাদের সুখ দ্বিগুণ করার জন্যে।

তবে এভাবে তার অক্রিয় ভূমিকা মেনে নিয়ে, প্রতিবাদ না ক'রে বালিকা রাজি হয় এমন এক নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে, যা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হ'তে যাচ্ছে তার ওপর, এবং এ-দুর্যোগ তাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে। কোনো ছেলে, সে উচ্চাভিলাষী, বা চিন্তাভাবনাশূন্য, বা ভীতু, যাই হোক, সে চোখ রাখে এক মুক্ত ভবিষ্যতের দিকে; সে নাবিক হবে বা হবে প্রকৌশলী, সে খামারে কাজ করবে বা শহরে চ'লে যাবে, সে বিশ্বটাকে দেখবে, সে ধনী হবে; সে স্বাধীনভাবে দাঁড়াবে সে-ভবিষ্যতের মুখোমুখি, যার ভেতরে তার জন্যে অপেক্ষায় আছে অভাবিত। বালিকা হবে স্ত্রী, মা, মাতামহী; সে ঘরবাড়ি গুছিয়ে রাখবে যেমন রাখতো তার মা, ছোটো বয়সে সে যেমন সেবাযত্ন পেয়েছে, তাই সে দেবে তার সন্তানদের– তার বয়স বারো, কিন্তু এর মাঝেই তার উপাখ্যান লেখা হয়ে গেছে স্বর্গে। সে একে তৈরি না ক'রে একে আবিষ্কার করবে দিনের পর দিন; সে ঔৎসুক্য বোধ করে, তবে ভয় পায় যখন গভীরভাবে চিন্তা করে এ-জীবনের কথা, যার প্রতিটি স্তরই আগাম জানা হয়ে গেছে এবং যার দিকে অপ্রতিরোধভাবে সে এগিয়ে চলছে প্রতিদিন।

এটাই ব্যাখ্যা করে কেনো ছেলের চেয়ে বালিকা তার ভাইদের থেকে বেশি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কামের রহস্যের ভাবনা দিয়ে। ছেলেরাও এসব ব্যাপারের প্রতি বোধ করে সংরক্ত আকর্ষণ; কিন্তু ভবিষ্যতে স্বামী ও পিতা হিশেবে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে তারা ভাবেই না। সেখানে বিয়ে ও মাতৃত্ব হয়ে ওঠে বালিকার সমগ্র নিয়তি; এবং যখন থেকে সে ওগুলোর গুপ্তকথা সামান্যও বোঝে, তার মনে হয় যেনো কদর্যভাবে আক্রান্ত হ'তে যাচ্ছে তার দেহ। মাতৃত্বের ইন্দ্রজাল দূরীভূত হয়ে গেছে : মোটামুটি ঠিকভাবেই এখন এটা জেনে গেছে বালিকা, এবং আগে হোক বা পরে হোক সে জেনেছে যে শিশু দৈবক্রমে এসে উপস্থিত হয় না মায়ের দেহের ভেতরে এবং এটা একটা যাদুকাঠি নাড়ানোর ফলে দেহ থেকে বেরিয়ে আসে না; সে নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকে উদ্বেগের সাথে। এটা আর বিস্ময়কর মনে হয় না তার কাছে, বরং তার দেহের ভেতরে বিস্তার লাভ করবে একটা পরজীবী দেহ, এটা তার কাছে বীভৎস মনে হয়; এবং এ-দানবিক ফুলে ওঠার সামান্য ভাবনাই তাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে।

এবং শিশুটি বেরোবে কীভাবে? এমনকি যদি কেউ তাকে সন্তানপ্রসবের আর্তনাদ ও যন্ত্রণার কথা নাও ব'লে থাকে, সে হয়তো হঠাৎ শুনে ফেলেছে এ-সম্পর্কে কথা বা পড়েছে বাইবেলের কথাগুলো : 'কষ্টের ভেতর দিয়ে তুমি সন্তান জন্ম দেবে'; একটি পূর্ববোধ আছে তার ওই পীড়ন সম্পর্কে, যা সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কল্পনাও করতে পারে না; সে অদ্ভুত সব ক্রিয়া উদ্ভাবন করে নাড়ির এলাকায়। যদি সে অনুমান করে ভ্রূণটি বেরোবে পায়ুদ্বার দিয়ে, তাহলেও ওই ভাবনা তাকে আশ্বস্ত করে না : জানা গেছে যে ছোটো মেয়েরা মানসিক চাপজনিত কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে যখন তারা মনে করে যে

তারা প্রসবের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে। যথাযথ ব্যাখ্যাও বিশেষ কাজে আসে না : তার ভেতর আনাগোনা করতে থাকে ফোলার, ছেঁড়ার, রক্তক্ষরণের ছবি।

গর্ভধারণ ও প্রসবের শারীরিক প্রকৃতি অবিলম্বে নির্দেশ করে যে 'শারীরিক কিছু একটা' ঘটে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। 'একই রক্তের সন্তান', 'বিশুদ্ধ রক্ত', 'মিশ্র রক্ত' প্রভৃতি কথায় 'রক্ত' শব্দটি প্রায়ই উপস্থিত থেকে অনেক সময় পরিচালিত করে শিশুসুলভ কল্পনাকে; উদাহরণস্বরূপ, এমন মনে হ'তে পারে যে বিয়ে হচ্ছে একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে রক্তসঞ্চালনের এক ধরনের ধর্মীয় ব্রতানুষ্ঠান। তবে 'শারীরিক কিছু একটা' অধিকাংশ সময়ই সম্পর্কিত থাকে মূত্র ও বিষ্ঠাঘটিত প্রত্যঙ্গের সাথে; শিশুরা বিশেষ ক'রে বিশ্বাস করতে চায় যে পুরুষটি প্রস্রাব করে নারীটির ভেতরে। যৌনক্রিয়াকে মনে করা হয় *নোংরা*। এটা অত্যন্ত বিপর্যস্তকর শিশুর কাছে, যার জন্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 'নোংরা' জিনিশ : তাহলে বড়োরা কীভাবে এমন জিনিশ মেনে নিতে পারে জীবনের অচ্ছেদ্য অংশরূপে?

শিশুদের যখন সাবধান করা হয় অচেনাদের সম্পর্কে বা কোনো যৌন ব্যাপার ব্যাখ্যা করা হয় তাদের কাছে, এটা সম্ভব যে তখন নির্দেশ করা হয় রোগগ্রস্তদের প্রতি, প্রচণ্ড উন্মাদদের প্রতি, বিকৃতমস্তিষ্কদের প্রতি; এটা এক সুবিধাজনক ব্যাখ্যা। যে-শিশু সিনেমায় ছোঁয়া বোধ করে পাশের লোকটির, বা যে রাস্তায় কাউকে ন্যাংটো হ'তে দেখেছে, সে বিশ্বাস করে তারা পাগল। একথা সত্য যে উন্মত্তের মুখোমুখি হওয়া অপ্রীতিকর : মৃগীরোগীর আক্রমণ, স্নায়ুবিকারগ্রস্তের ক্রোধের বিস্ফোরণ, বা প্রচণ্ড কলহ বিপর্যস্ত করে বয়স্কদের জগত, যে-শিশু এটা দেখে সে বিপন্ন বোধ করে; তবে সুদৃশ্যভাবে সজ্জিত সমাজে যেমন আছে কিছু সংখ্যক ভিখিরি, খোঁড়া, ও জঘন্য ঘায়েভরা জরাগ্রস্ত, সমাজের ভিত্তি বিচলিত না ক'রে তাই সেখানে পাওয়া যেতে পারে কিছু অস্বাভাবিকও। কিন্তু যখন সন্দেহ করা হয় যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষকেরা গোপনে উদযাপন করে কৃষ্ণ ম্যাস, তখন শিশু সত্যিসত্যিই ভয় পায়।

বস্ত্রপরিহিত ও সম্মানিত ভদ্রলোকগণ, যাঁরা নির্দেশ করেন শোভনতা, সংযম, যুক্তির জীবন, এ-ভাবনা থেকে কী ক'রে যাওয়া যায় পরস্পর ধস্তাধস্তিরত দুটি পশুর ভাবনায়? এখানেই আছে বয়স্কদের আত্ম-মানহানি, যা কাঁপিয়ে তোলে তাদের স্তম্ভভিত্তি, যা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে আকাশ। শিশু প্রায়ই ফাঁস-হয়ে-যাওয়া এ-গুপ্ততথ্য মেনে নিতে একগুঁয়েভাবে অস্বীকার করে : 'আমার মা-বাবা ওটা করে না,' বালিকা জোরের সাথে বলে। বা সে নিজে গঠন করার চেষ্টা করে সঙ্গমের একটা শোভন চিত্র : যেমন একটি ছোটো মেয়ে বলেছে, 'যখন শিশুর দরকার হয়, তখন পিতামাতা যায় চিকিৎসকের রোগী দেখার ঘরে; তারা নগ্ন হয়, তারা নিজেদের চোখ বেঁধে নেয় কেননা তাদের কিছু দেখা নিষেধ; তারপর চিকিৎসক তাদের একত্র করে এবং দেখে যাতে সব কিছু ঠিকঠাক মতো হয়'; সে প্রণয়কর্মটিকে একটি শল্যচিকিৎসায় রূপান্তরিত করেছে, যা নিঃসন্দেহে অপ্রীতিকর, তবে দন্ত্যচিকিৎসকের সাথে একটা বৈঠকের মতো নির্ভুল। তবু অস্বীকার ও বাস্তব থেকে পলায়ন সত্ত্বেও, শিশুর মনে চুপিসারে ঢোকে অস্বস্তি ও সন্দেহ এবং সৃষ্টি হয় দুধ ছাড়ার মতো বেদনাদায়ক একটা প্রভাব।

এবং যা বাড়িয়ে তোলে ছোটো মেয়ের বিপন্নতা, তা হচ্ছে তার ওপর চেপে আছে দ্ব্যর্থবোধক যে-অভিশাপ, তার রূপ সে স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারে না। তার তথ্য বিশৃঙ্খল, বইগুলো পরস্পরবিরোধী; এমনকি কৌশলসংক্রান্ত ব্যাখ্যাও গাঢ় অন্ধকার দূর করতে পারে না; শত শত প্রশ্ন দেখা দেয় : সঙ্গমের কাজটি কি যন্ত্রণাদায়ক? না কি আনন্দদায়ক? এটা কতোক্ষণ চলে– পাঁচ মিনিট না কি সারারাত? সে এখানে পড়ে যে একবার আলিঙ্গনেই এক মহিলা মা হয়েছে, আবার অন্য জায়গায় পড়ে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যৌন সুখের পরেও নারী বন্ধ্যা থাকে। লোকজন কি প্রতিদিনই 'এটা করে'? না কি মাঝেমাঝে? শিশু বাইবেল প'ড়ে, অভিধান ঘেঁটে, তার বন্ধুদের কাছে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞেস ক'রে নিজেকে অবহিত করতে চায়, সুতরাং সে অস্পষ্টতা ও ঘৃণার মধ্যে অন্ধের মতো হাতড়ে ফেরে।

বলা দরকার যে এমনকি সুস্পষ্টভাবে শিক্ষাদানও এ-সমস্যা সমাধান করবে না; পিতামাতা ও শিক্ষকেরা যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শুভকামনা নিয়েও কাজ করেন, তবুও শব্দ ও ধারণার মধ্য দিয়ে যৌন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা অসম্ভব, এটা বোঝা সম্ভব শুধু যাপন ক'রে; যে-কোনো বিশ্লেষণেরই, তা যতোই গভীর হোক-না-কেনো, থাকে একটা কৌতুককর দিক এবং সেটা সত্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়।

সংরাগহীন শিশুর কাছে কী ক'রে ব্যাখ্যা করা যায় চুম্বনের বা আদরের সুখ? পারিবারিক চুম্বন দেয়া ও নেয়া হয় অনেক সময় এমনকি ওষ্ঠেই; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ওই সংস্পর্শের, অনেক ক্ষেত্রে, কেনো থাকে মাথা ঝিম-ধরানোর প্রভাব? এটা অন্ধের কাছে রঙের বর্ণনা দেয়ার মতো। যে-পর্যন্ত থাকে না সে-উত্তেজনা ও কামনার বোধি, যা যৌনক্রিয়াকে দেয় তার অর্থ ও তার ঐক্য, সে-পর্যন্ত তার বিচিত্র উপাদানকে মনে হয় অতি জঘন্য ও পৈশাচিক। বিশেষত, ছোটো মেয়ে যখন বুঝতে পারে সে কুমারী ও রুদ্ধ, এবং তাকে একটি নারীতে পরিণত করার জন্যে দরকার পড়বে পুরুষের একটি যৌনাঙ্গের, যেটি বিদ্ধ করবে তাকে, তখন তার মনে জেগে ওঠে ঘৃণা ও ভীতির শিহরণ। যৌনাঙ্গপ্রদর্শন যেহেতু একটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যৌনবিকৃতি, অনেক তরুণী মেয়েই দেখেছে দাঁড়ানো শিশ্ন; তা যা-ই হোক, তারা দেখেছে পুরুষ পশুর যৌনাঙ্গ, এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঘোড়ার যৌনাঙ্গ প্রায়ই আকর্ষণ করেছে তাদের স্থিরদৃষ্টি; এটা হ'তে পারে খুবই ভীতিকর। সন্তানপ্রসবের ভয়, পুরুষের যৌনাঙ্গের ভয়, বিবাহিতদের আক্রান্ত করে যে-সব 'সংকট', সেগুলোর ভয়, অশোভন আচরণের প্রতি ঘৃণা– এসব মিলেমিশে প্রায়ই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে ছোটো মেয়ে ঘোষণা করে : 'আমি কখনো বিয়ে করবো না।' যন্ত্রণা, বোকামি, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এটাই হবে নিশ্চিত প্রতিরোধ।

তবুও রূপান্তর ঘটতে থাকে। ছোটো মেয়ে এর অর্থ বুঝতে পারে না, কিন্তু সে লক্ষ্য করে যে বিশ্বের সাথে ও তার নিজের শরীরের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে ঘটছে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন : সে সচেতন হয়ে উঠছে সে-সব স্পর্শ, স্বাদ, রঙের প্রতি, যেগুলো আগে ছিলো তার প্রতি উদাসীন; অদ্ভুত সব ছবি ঝিলিক দিতে থাকে তার মনে; আয়নায় সে নিজেকে প্রায় চিনতেই পারে না; তার নিজেকে 'অদ্ভুত' লাগতে থাকে, সব কিছু তার 'অদ্ভুত' লাগে।

এ-অস্থিরতার সময়ে যা ঘটতে থাকে, তা হচ্ছে বালিকার দেহ পরিণত হ'তে থাকে নারীর দেহে এবং হয়ে উঠতে থাকে মাংস। লালাগ্রন্থিক ন্যূনতার বেলা ছাড়া, যেখানে বিষয়ী আবদ্ধ হয়ে থাকে বালসুলভ পর্বে, বয়ঃসন্ধির সংকট হঠাৎ এসে হাজির হয় বারো-তেরো বছর বয়সে। ছেলের থেকে মেয়ের মধ্যে এ-সংকট দেখা দেয় অনেক আগে, এবং এটা ঘটিয়ে থাকে অনেক বেশি গুরুত্বপর্ণ বদল। কিশোরী মেয়ে এর সাক্ষাৎ লাভ করে অস্বস্তির সাথে, বিরক্তির সাথে। যখন দেখা দিতে থাকে স্তন ও শরীরের লোম, তখন জন্ম নেয় এমন একটা বোধ, যা অনেক সময় দেখা দেয় গর্বরূপে, তবে সেটা মূলত লজ্জা; হঠাৎ বালিকা হয়ে ওঠে বিনয়ী, সে উলঙ্গ হ'তে চায় না এমনকি তার মা ও বোনদের সামনে, সে নিজেকে দেখতে থাকে মিলেমিশে যাওয়া বিস্ময় ও বিভীষিকার মধ্যে, এবং নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে সে দেখতে থাকে প্রতিটি বৃন্তের নিচে বেড়ে উঠছে এ-টানটান ও কিঞ্চিৎ বেদনাদায়ক শাঁসটি, যা এ-পর্যন্ত ছিলো নাভির মতোই নিরীহ। একথা অনুভব ক'রে সে বিচলিত বোধ করে যে তার আছে একটা অরক্ষিত স্থান; এ-স্পর্শকাতর ও যন্ত্রণাপূর্ণ স্থানটি অবশ্যই পোড়ার বা দাঁতের ব্যথার তুলনায় তুচ্ছ ব্যাপার; তবে আঘাতের ফলেই হোক বা অসুখের ফলেই হোক, সব ধরনের ব্যথাই অস্বাভাবিক জিনিশ। কিছু একটা ঘটছে– যা অসুখ নয়– যার ইঙ্গিত রয়েছে অস্তিত্বের নিয়মের মধ্যেই; তবে তার প্রকৃতি অনেকটা সংগ্রামের, একটা ক্ষতের। শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত মেয়েটি অবশ্যই বড়ো হয়েছে, তবে সে কখনো তার বৃদ্ধি টের পায় নি : দিনের পর দিন তার শরীর ছিলো এক বর্তমান ঘটনা, নির্দিষ্ট, সম্পূর্ণ; কিন্তু এখন সে 'বাড়ছে'। এ-শব্দটিই বিভীষিকাজাগানো; স্তনের বিকাশের মধ্যে বালিকা বোধ করে *বাঁচা* শব্দটির দ্ব্যর্থতা। সে সোনাও নয় হীরেও নয়, সে এক অদ্ভুত পদার্থ, সব সময়ই পরিবর্তনশীল, অনির্দিষ্ট, যার গভীরতলে বিশদভাবে ঘটছে অপরিচ্ছন্ন রসায়ন। সে অভ্যস্ত মাথাভরা চুলে, যা রেশমি ফিতের মতো নীরবে ঢেউ খেলে; কিন্তু তার বগলে ও মধ্যভাগে এই নতুন উদ্গম তাকে রূপান্তরিত করে এক ধরনের জন্তু বা শৈবালে। তাকে আগে থেকে সতর্ক ক'রে দেয়া হোক বা না হোক, এসব বদলের মধ্যে সে অনুভব করে এক চূড়ান্ত অবস্থার পূর্ববোধ, যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে : সে দেখতে পায় তাকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে এক জীবনচক্রে, যা প্লাবিত করছে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের গতিপথকে, সে জানতে পারে ভবিষ্যতের পরনির্ভরতাকে, যা তাকে দণ্ডিত করে পুরুষের কাছে, সন্তানের কাছে, এবং মৃত্যুর কাছে। শুধু স্তন হিশেবে তার স্তন দুটিকে মনে হবে এক অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিতভাবে চাপিয়ে দেয়া বিস্তার ব'লে। বাহু, পা, ত্বক, পেশি, এমনকি বর্তুল পাছা, যার ওপর সে বসে– এ-পর্যন্ত এগুলোর ছিলো সুস্পষ্ট উপযোগিতা; শুধু তার লিঙ্গটিকে, সুস্পষ্টভাবেই যেটি প্রস্রাব করার প্রত্যঙ্গ, মনে হতো কিছুটা সন্দেহজনক, তবে সেটি ছিলো গোপন ও অন্যদের কাছে অদৃশ্য। তার সুয়েটার বা ব্লাউজের নিচে থেকেও তার স্তন দুটি প্রদর্শন করে নিজেদের, এবং যে-দেহটির সাথে ছোটো মেয়ে নিজেকে অভিন্ন বোধ করেছে, সেটিকে সে এখন বোধ করে মাংসরূপে। এটি হয়ে ওঠে একটি বস্তু, যা দেখতে পায় অন্যরা এবং যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অন্যরা। 'দু-বছর ধ'রে,' এক মহিলা আমাকে

বলেছেন, 'আমার বুক লুকিয়ে রাখার জন্যে আমি ঢিলে জামা পরেছি, আমি এতো লজ্জায় ছিলাম এ নিয়ে।' এবং আরেকজন : 'আমার আজো মনে পড়ে আমি কেমন অদ্ভুত বিভ্রান্তি বোধ করেছিলাম যখন আমার বয়সেরই এক বান্ধবী, তবে যে আমার থেকে অনেক বেশি বাড়ন্ত ছিলো, সে যখন উপুড় হয়ে একটি বল তুলছিলো আর আমি তার অন্তর্বাসের ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম তার পূর্ণবিকশিত স্তন দুটি। আমার নিজের বয়সের কাছাকাছি একটি দেহ, যার আদলে গ'ড়ে উঠবে আমার দেহটি, সেটি দেখে নিজের কথা ভেবে আমার গাল লাল হয়ে উঠেছিলো।' কিশোরী মেয়ে বোধ করে তার শরীর যেনো তার কাছে থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে, এটা আর ব্যক্তিতার সরাসরি প্রকাশ নয়; এটা অচেনা হয়ে ওঠে তার কাছে; এবং একই সময়ে অন্যদের কাছে সে হয়ে ওঠে একটি জিনিশ : পথে চোখে চোখে তাকে অনুসরণ করে পুরুষেরা এবং তার দেহসংস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করে। তার ইচ্ছে হয় অদৃশ্য হয়ে যেতে; মাংস হয়ে উঠতে ও তার মাংস প্রদর্শন করতে তার ভয় লাগে।

অনেক সময়, যাকে বলা যেতে পারে প্রাক-বয়ঃসন্ধিপর্ব, অর্থাৎ ঋতুস্রাব দেখা দেয়ার আগে, মেয়ে তার দেহ নিয়ে লজ্জা পায় না; নারী হয়ে উঠতে সে গর্ব বোধ করে এবং সন্তোষের সাথে দেখে তার স্তনের বেড়ে ওঠা, রুমাল দিয়ে সে তার ড্রেসে প্যাড লাগায় এবং বয়স্কদের সামনে এটি নিয়ে গর্ব বোধ করে; সে তখনও তার ভেতরে কী ঘটছে, তার তাৎপর্য বুঝে ওঠে না। তার প্রথম ঋতুস্রাব প্রকাশ করে এই অর্থ, এবং দেখা দেয় তার লজ্জাবোধ। তার যদি আগে থেকেই থাকে লজ্জাবোধ, তাহলে এ-সময় থেকে তা প্রবলতর ও অতিশায়িত হ'তে থাকে। সব সাক্ষ্যপ্রমাণ একযোগে দেখায় যে মেয়েটিকে আগে থেকে সতর্ক করা হয়ে থাক বা না থাক, এ-ঘটনাটি সব সময়ই তার কাছে মনে হয় অপছন্দনীয় ও অবমাননাকর। প্রায়ই মা তাকে এটা অবহিত করতে ব্যর্থ হয়; দেখা গেছে যে ঋতুস্রাবের ঘটনার থেকে সানন্দে মায়েরা তাদের মেয়েদের কাছে ব্যাখ্যা করে গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব, এবং এমনকি যৌনসম্পর্কের রহস্য। মনে হয় নারীদের এ-বোঝাটিকে তারা নিজেরাই এমন এক বিভীষিকার সাথে ঘৃণা করে যে তাতে প্রতিফলিত হয় পুরুষদের প্রাচীন অতীন্দ্রিয় ভীতি এবং মায়েরা যা সঞ্চারিত ক'রে যায় তাদের সন্তানদের মধ্যে। যখন মেয়ে তার কাপড়ে দেখতে পায় সন্দেহজনক দাগগুলো, সে বিশ্বাস করে সে আক্রান্ত হয়েছে উদরাময়ে, বা মারাত্মক কোনো রক্তক্ষরণে বা কোনো লজ্জাজনক রোগে। আত্মহত্যার উদ্যোগ নেয়ার ঘটনাও অজানা নয়, এবং সত্যিই কিশোরী মেয়ের পক্ষে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা মনে হয় যেনো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তার জীবনশোণিত, হয়তো আভ্যন্তর অঙ্গে কোনো ক্ষতের ফলে। এমনকি সুবিবেচিত শিক্ষাদানের ফলে যদি তার তীব্র উদ্বেগ কেটেও যায়, তবু মেয়ে লজ্জা বোধ করে, মনে করে সে ময়লা হয়ে গেছে; এবং সে দৌড়ে যায় স্নানঘরে, সে চেষ্টা করে তার নোংরা জামাকাপড় পরিষ্কার করতে বা লুকিয়ে ফেলতে।

ডঃ ডব্লিউ লিপমান তরুণতরুণীদের যৌনতাসম্পর্কে গবেষণা করার সময় এ-বিষয়ে, *জোনেস এ সেক্সিয়ালিতেতে*, আরো বহু কিছুর সাথে সংগ্রহ করেছেন নিচের মন্তব্যগুলো :

ষোলো বছর বয়সে, যখন আমি প্রথমবারের মতো অসুস্থ হই, আমি খুব ভয় পাই যখন ভোরবেলা আমি এটা আবিষ্কার করি। সত্যি বলতে কী, আমি জানতাম এটা ঘটবে; তবে আমি এতো লজ্জাবোধ করি যে সারাটা সকাল বিছানায় প'ড়ে থাকি এবং সব প্রশ্নের উত্তরে বলতে থাকে যে আমি উঠতে পারছি না।

আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম যখন বারো বছর বয়সে প্রথম আমার ঋতুস্রাব দেখা দেয়। আমি সন্ত্রস্ত বোধ করি, এবং আমার মা যখন শুধু বলে যে এটা প্রতিমাসেই দেখা দেবে, আমি একে গণ্য করি একটা বড়ো অশ্লীলতা ব'লে এবং পুরুষদেরও এটা হয় না, তা মেনে নিতে অস্বীকার করি।

আমার মা আমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে আগেই বলেছিলো, এবং আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম যখন, অসুস্থ হয়ে, আনন্দে ছুটে গিয়ে মাকে জাগিয়ে বলি : 'মা, আমার এটা হয়েছে!' আর সে শুধু বলে : 'এবং এর জন্যে তুমি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছো!' এসত্ত্বেও এ-ঘটনাকে আমি আমার জীবনের একটি প্রকৃত বিপ্লব ব'লে গণ্য করেছি।

আমার মা আমাকে সতর্ক করে নি। তার বেলা এটা শুরু হয়েছিলো উনিশ বছর বয়সে, এবং তার নিচের অন্তর্বাস নোংরা করার জন্যে গালি খাওয়ার ভয়ে সে বাইরে গিয়ে একটি ক্ষেতের মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলো তার জামাকাপড়।

এ-সংকট দেখা দেয় অল্প বয়সে; বালক বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে পনেরো-ষোলোতে; বালিকা নারীতে পরিবর্তিত হয় তেরো-চোদ্দোতে। তবে তাদের বয়সের পার্থক্য থেকে তাদের অভিজ্ঞতার মৌলিক পার্থক্য জন্মে না; এটা উপস্থিত থাকে না শারীরবৃত্তিক প্রপঞ্চেও, যা বালিকার অভিজ্ঞতার ওপর প্রয়োগ করে তার মর্মঘাতী বল : বয়ঃসন্ধি দু-লিঙ্গে পরিগ্রহ করে আমূলভাবে ভিন্ন তাৎপর্য, কেননা তা উভয়ের জন্যে একই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে না।

ছোটো মেয়েকে, এর বিপরীতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্যে বন্দী হয়ে থাকতে হয় তার ওপর তার নারীত্বের চাপিয়ে দেয় সীমার ভেতরে। বালক তার দেহে গজিয়ে ওঠা প্রশান্ত বিস্ময়ের সাথে দেখতে পায় যা ঘটতে যাচ্ছে যা ঘটবে; যে-'নৃশংস ও নির্ধারিত নাটক' স্থির করে বালিকার নিয়তি, তার মুখোমুখি বালিকা দাঁড়ায় বিব্রতভাবে। শিশ্নটি যেমন তার বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত মূল্যায়ন লাভ করে সামাজিক পরিস্থিতি থেকে, ঠিক তেমনি সামাজিক পরিস্থিতিই ঋতুস্রাবকে পরিণত করে একটি অভিশাপে। একজন প্রতীক হয়ে ওঠে পৌরুষের, আরেকজন নারীত্বের; আর নারীত্ব যেহেতু জ্ঞাপন করে বিকল্পতা ও নিকৃষ্টতা, তাই এর প্রকাশ হয়ে ওঠে লজ্জাজনক। বালিকার কাছে সব সময়ই তার জীবনকে মনে হয়েছে সে-অস্পষ্ট সারসত্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, একটি সদর্থক রূপ দেয়ার জন্যে একটি শিশ্নের অভাবকে যার কাছে যথেষ্ট ব'লে মনে হয় নি : কিন্তু সে তার দু-উরুর মাঝে দিয়ে প্রবাহিত ধারায় সচেতন হয়ে ওঠে নিজের সম্পর্কে। যদি সে ইতিমধ্যেই মেনে নিয়ে থাকে তার অবস্থাকে, তাহলে সে সানন্দে ঘটনাটিকে স্বাগত জানায়– 'এখন তুমি একজন নারী।' যদি সে সব সময়ই নিজের অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার ক'রে থাকে, তাহলে রক্তাক্ত রায় তাকে বিমূঢ় করে; প্রায়ই সে হোঁচট খায় : মাসিক অশুচিতা তার মনে জাগায় ঘৃণা ও ভয়। 'সুতরাং এই হচ্ছে "নারী হওয়া" শব্দগুলোর অর্থ!' নির্ধারিত যে-ভাগ্য অস্পষ্ট ও অবর্তমানভাবে এ-পর্যন্ত তার ওপর চেপে ছিলো, তা এখন গুটিসুটি মারছে তার পেটে; কোনো নিস্তার নেই; সে বোধ করে যে সে ধরা প'ড়ে গেছে।

এবং তার ঋতুস্রাব দেখা দেয়াই একলা বালিকার কাছে তার নারীসুলভ নিয়তি ঘোষণা করে না। তার মধ্যে দেখা দিতে থাকে আরো নানা সন্দেহজনক প্রপঞ্চ। এ-পর্যন্ত তার কামানুভূতি ছিলো ভগাঙ্কুরীয়। মেয়েদের মধ্যে হস্তমৈথুন ছেলেদের থেকে কম কি না তা বের করা কঠিন; বালিকা তার প্রথম দু-বছর ধ'রে এর চর্চা ক'রে থাকে, এমনকি এটা সে শুরু করে সম্ভবত তার জীবনের প্রথম মাসগুলোতেই; মনে হয় দু-বছর বয়সের দিকে সে এটা ছেড়ে দেয়, পরে আবার শুরু করার জন্যে। একটা গুপ্ত শ্লেষ্মল এলাকা ছোঁয়ার থেকে পুরুষের দেহে স্থাপিত ওই বৃন্তটির দেহসংস্থানগত অবয়ব অনেক বেশি প্ররোচিত করে ওটিকে ছোঁয়ার জন্যে; তবে হঠাৎ সংস্পর্শ– মেয়েটি দড়ি বা গাছ বেয়ে উঠছে, বা সাইকেল চালাচ্ছে– জামাকাপড়ের ঘষা, খেলার সময় ছোঁয়াছুঁয়ি, বা এমনকি খেলার সাথীদের, বয়স্কতর শিশুদের, বা প্রাপ্তবয়স্কদের দীক্ষাদান বালিকাকে প্রায়ই সচেতন ক'রে তুলতে পারে সে-অনুভূতি সম্পর্কে, যা সে আবার জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে হাতের সাহায্যে।

তা যা-ই হোক, যখন পাওয়া যায় এ-সুখ, তখন তা থাকে একটি স্বাধীন অনুভূতিরূপে : সব শিশুসুলভ চিত্তবিনোদনের মতোই এর থাকে লঘু ও নিষ্পাপ চরিত্র। বালিকা কখনো তার এসব গোপন উপভোগকে তার নারীসুলভ নিয়তির সাথে সম্পর্কিত করে না; ছেলেদের সাথে যদি তার যৌনসম্পর্ক ঘ'টে থাকে, তাহলে তা ঘটেছে মূলত ঔৎসুক্যবশত। আর সে এখন নিজেকে ধাবিত দেখে এমন এলোমেলো আবেগের মধ্যে, যার মধ্যে সে নিজেকে চিনতে পারে না। বাড়ছে কামানুভূতিপরায়ণ অঞ্চলগুলোর স্পর্শকাতরতা, এবং নারীতে এগুলো এতো অসংখ্য যে তার সম্পূর্ণ শরীরটিকেই গণ্য করা যেতে পারে কামানুভূতিপরায়ণ ব'লে। এ-সত্যটি তার কাছে প্রকাশ পায় পারিবারিক আদরের মধ্য দিয়ে, নিরীহ চুম্বনে, দর্জির, ডাক্তারের, বা নরসুন্দরের উদাসীন স্পর্শে, তার চুলের ওপর বা গ্রীবার পেছনে বন্ধুসুলভ হাতের ছোঁয়ায়; সে অনুভব করে, এবং অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে চায়, খেলার সম্পর্কের মধ্যে একটা গভীরতর শিহরণ, ছেলে বা মেয়েদের সাথে কুস্তি ক'রে।

তরুণী মেয়ের উদ্বেগ প্রকাশ পায় নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নে ও প্রেতের মতো আনাগোনা করা অলীক মূর্তিতে : যে-মুহূর্তে সে তার নিজের ভেতরে একটা ছলনাপর স্বেচ্ছাপ্রণোদনা বোধ করে, ঠিক তখনই অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষিত হওয়ার ভাবনা তার সমস্ত মনকে আবিষ্ট ক'রে রাখে। এ-ভাবনাটি কম-বেশি নির্দিষ্ট অজস্র প্রতীকের মধ্য দিয়ে দেখা দিতে থাকে স্বপ্নে ও আচরণে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে মেয়ে তার খাটের নিচে ভালোভাবে চায়, তার মনে হয় সন্দেহজনক অভিসন্ধি নিয়ে সেখানে লুকিয়ে আছে কোনো ডাকাত; তার মনে হয় বাড়িতে সে চোরের শব্দ পাচ্ছে; জানালা দিয়ে, ছোরা হাতে, তাকে ছোরা মারার জন্যে ঢুকছে আক্রমণকারী। পুরুষ তাকে কম-বেশি ভীত করে। বাবার প্রতি সে বোধ করে এক রকম বিরক্তি; তার তামাকের গন্ধ অসহ্য লাগে, তার পর স্নানাগারে যেতে তার ঘেন্না লাগে; এমনকি সে যদিও এখনো প্রীতিপূর্ণ, এ-শারীরিক অপছন্দের ভাব সে প্রায়ই বোধ করে। মনোচিকিৎসকেরা বলেন যে তাদের তরুণী রোগীরা প্রায়ই দেখে বিশেষ একটি স্বপ্ন : তারা কল্পনা করে তারা ধর্ষিত হয়েছে এক বয়স্ক মহিলার সামনে, যে কাজটিকে অনুমতি দিয়েছে। এটা

স্পষ্ট যে তাদের কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে তারা প্রতীকী রীতিতে অনুমতি চাচ্ছে তাদের মায়ের কাছে।

একটা চাপ, যা তাদের ওপর অতিশয় কদর্য প্রভাব ফেলে, তা হচ্ছে কপটতা। তরুণী মেয়ে নিবেদিত 'শুদ্ধতা' ও 'নিষ্পাপতা'র কাছে, আর ঠিক তখনি সে তার নিজের ভেতরে ও চারপাশে আবিষ্কার করতে থাকে জীবন ও কামের রহস্যপূর্ণ উত্তেজনা। মনে করা হয় সে হবে তুষারের মতো শুভ্র, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, তাকে পরানো হয় অত্যন্ত মিহি মসলিন-বস্ত্র, তার কক্ষটি মুড়ে দেয়া হয় সুরুচিসম্পন্ন রঙের কাগজে, তাকে আসতে দেখলে কথা বলা হয় নিচুস্বরে, তার জন্যে নিষিদ্ধ করা হয় অশ্লীল বই। এখন, এমন কোনো 'ভালো ছোট্ট মেয়ে' নেই, যে সাধ মেটায় না 'জঘন্য' ভাবনায় ও কামনায়। সে এগুলো লুকোতে চেষ্টা করে তার অন্তরঙ্গতম বন্ধুর কাছেও, এমনকি নিজের কাছেও; সে নিয়ম মেনেই বাঁচতে ও চিন্তা করতে চায়; নিজের প্রতি তার অবিশ্বাস তাকে দেয় একটা প্রতারণাপূর্ণ, অসুখী, অসুস্থ ভাবভঙ্গি; এবং পরে এসব প্রবৃত্তির প্রতি সংকোচ কাটানোর থেকে তার জন্যে অন্য কিছুই বেশি কঠিন হয় না। এবং তার সমস্ত অবদমন সত্ত্বেও, সে বোধ করে সে বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অকথ্য এক সীমালঙ্ঘনের ভারের নিচে। তার নারীত্বে রূপান্তরণ ঘটে শুধু লজ্জার মধ্যে নয়, বরং গভীর অনুশোচনার মধ্যে।

আমরা এখন পরিচিত সে-নাটকীয় সংঘাতের সাথে, যা বয়ঃসন্ধিকালে বিদীর্ণ করে কিশোরী মেয়ের মর্ম : তার নারীত্বকে মেনে না নিয়ে সে 'প্রাপ্তবয়স্ক' হ'তে পারে না; এবং সে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে তার লিঙ্গ তাকে দণ্ডিত করেছে একটি বিকলাঙ্গ ও নিশ্চল অস্তিত্বে, এ-সময়ে যা তার সামনে দেখা দেয় একটা অশুচি অসুস্থতা ও অস্পষ্ট অপরাধবোধরূপে। তার নিকৃষ্টতা প্রথমে মনে হয়েছিলো নিতান্তই একটি বঞ্চনা; কিন্তু একটা শিশ্নের অভাব এখন হয়ে উঠেছে একটা কলুষ ও সীমালঙ্ঘন। এভাবেই ক্ষতবিক্ষত, লজ্জিত, শাস্তিযোগ্য সে এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে।

পরিচ্ছেদ ২

তরুণী

সারা শৈশব ভ'রে বালিকা ভোগ করেছে শাসানো এবং সক্রিয়তা খর্বকরণ; তবুও সে নিজেকে মনে করেছে একটি স্বায়ত্তশাসিত মানুষ। পরিবারের ও বন্ধুদের সাথে তার সম্পর্কে, তার বিদ্যালয়ের পাঠে ও খেলাধুলোয়, তাকে মনে হয়েছে এক সীমাতিক্রমী সত্তা : তার ভবিষ্যৎ অক্রিয়তা ছিলো একটি স্বপ্নমাত্র। বয়ঃসন্ধির সাথে ভবিষ্যৎ শুধু এগিয়েই আসে না : এটা তার দেহে বাসা বাঁধে; এটা ধারণ করে চরম মূর্ত বাস্তবতা। এটা বজায় রাখে তার সব সময়ের ভয়াবহ বৈশিষ্ট্য। কিশোর যখন সক্রিয়ভাবে এগোয় প্রাপ্তবয়স্কতার দিকে, তখন কিশোরী প্রতীক্ষা করে এ নতুন, অপূর্বপরিজ্ঞেয় পর্বের সূচনার জন্যে, যার গল্পের ছক বোনা হবে এখন থেকে এবং সময় তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে-দিকে। সে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছে তার শৈশবের অতীত জীবন থেকে, এবং বর্তমানকে মনে হয় এক ক্রান্তিকাল; এর কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য নেই, আছে শুধু অবসরকালীন কাজকর্ম। তার যৌবন নিঃশেষ হয় প্রতীক্ষায়, যা একটু কম বা বেশি ছদ্মবেশধারী। সে থাকে পুরুষের প্রতীক্ষায়।

কিশোরও নিঃসন্দেহে নারীর স্বপ্ন দেখে : সে নারী কামনা করে; কিন্তু নারী তার জীবনে একটা উপাদানের বেশি কিছু নয় : নারী তার নিয়তির সারসংক্ষেপ ধারণ করে না। কিন্তু বালিকা, সে নারীত্বের সীমার মধ্যেই থাকতে চাক বা সীমা পেরিয়েই যেতে চাক, শৈশব থেকেই পূর্ণতা ও মুক্তির জন্যে সে তাকিয়ে থাকে পুরুষের দিকেই; পুরুষ ধারণ করে পার্সিউস বা সেইন্ট জর্জের দীপ্ত মুখমণ্ডল; পুরুষ ত্রাতা; সে ধনী ও ক্ষমতাশালী, তার হাতে আছে সুখের চাবি, সে সুদর্শন রাজকুমার। বালিকা মনে করে ওই রাজকুমারের আদরে তার মনে হবে যেনো সে ভেসে যাচ্ছে জীবনের বিশাল স্রোতে : আলিঙ্গন ও দৃষ্টিপাতের যাদু আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে এক মূর্তিরূপে। সব সময়ই সে দৃঢ় বিশ্বাস করেছে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বে; পুরুষের মর্যাদা কোনো শিশুসুলভ মরীচিকা নয়; এর আছে আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি; পুরুষেরা অবশ্যই বিশ্বের প্রভু। সব কিছুই তরুণীকে বলে তার নিজের স্বার্থেই তার শ্রেষ্ঠ কাজটি হচ্ছে পুরুষের দাসী হওয়া : তার পিতামাতা তাকে তাড়া দেয় ওদিকে যেতে; তার পিতা গর্ব বোধ করে কন্যার সাফল্যে, তার মা এতে দেখতে পায় এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ; বন্ধুরা তাকে ঈর্ষা ও প্রশংসা করে যে বেশি পায় পুরুষের মনোযোগ; আমেরিকার মহাবিদ্যালয়গুলোতে কোনো সহপাঠিনীর সামাজিক মর্যাদা পরিমাপ করা হয় তার 'অভিসারী'র সংখ্যা দিয়ে।

বিয়ে শুধু একটি সম্মানজনক পেশাই নয় এবং অন্যগুলো থেকে শুধু কম ক্লান্তিকরই নয় : এটাই শুধু নারীকে অক্ষত রাখতে দেয় তার সামাজিক মর্যাদা এবং

প্রিয়া ও মা হিশেবে একই সাথে চরিতার্থ করতে দেয় কাম। এরূপেই তার সহচররা দেখতে পায় তার ভবিষ্যৎ, যেমন সে নিজে দেখে। এ-ব্যাপারে সর্বসম্মত মতৈক্য হচ্ছে একটি স্বামী পাওয়া– এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি 'রক্ষক' পাওয়া– তার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবে পিতৃগৃহ থেকে, মায়ের কর্তৃত্ব থেকে, সে খুলবে তার ভবিষ্যৎ, কোনো সক্রিয় বিজয়ের মাধ্যমে নয়, বরং অক্রিয় ও বশীভূতরূপে একটি নতুন প্রভুর হাতে নিজেকে অর্পণ ক'রে।

মাঝেমাঝেই দাবি করা হয় যে যদি সে এভাবে হালছাড়া ভাবে মেনে নেয় বশ্যতা, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সে ছেলেদের থেকে বস্তুগত ও নৈতিকভাবে নিকৃষ্ট এবং তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য : একটা আশাহীন প্রতিযোগিতা ছেড়ে দিয়ে উচ্চবর্ণের এক সদস্যের ওপর সে দেয় তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভার। কিন্তু সত্য হচ্ছে তার হালছাড়া ভাবের উৎপত্তি কোনো পূর্বনির্ধারিত নিকৃষ্টতা থেকে ঘটে নি : সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, এটাই জন্ম দেয় তার সমস্ত ন্যূনতার; এ-হালছাড়া ভাবের উৎস রয়েছে কিশোরী মেয়ের অতীত জীবনে, তার চারপাশের সমাজে, এবং বিশেষ ক'রে, তার জন্যে ধার্য ভবিষ্যতের মধ্যে।

খুবই সত্য যে বয়ঃসন্ধি রূপান্তরিত ক'রে দেয় বালিকার দেহ। এটা এ-সময় আগের থেকেও ভঙ্গুর; নারীপ্রত্যঙ্গগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ, এবং কাজকর্মে সুকুমার; তার অদ্ভুত ও বিরক্তিকর স্তন দুটি একটা বোঝা, তীব্র ব্যায়ামের সময় বেদনাদায়কভাবে আন্দোলিত হয়ে ওগুলো মনে করিয়ে দেয় ওগুলোর উপস্থিতি। ভবিষ্যতে তার পেশিশক্তি, সহিষ্ণুতা, ও ক্ষিপ্রতা হবে পুরুষের ওই গুণগুলোর থেকে নিকৃষ্ট। তার হরমোনগুলোর ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে স্নায়বিক ও বেসো-নিয়ামক অস্থিতি। ঋতুস্রাব যন্ত্রণাকর : মাথাধরা, অতি-অবসাদ, তলপেটের ব্যথা স্বাভাবিক কাজকর্মকে ক'রে তোলে পীড়াদায়ক বা অসম্ভব; মাঝেমাঝেই দেখা দেয় মানসিক যন্ত্রণা; স্নায়ুদৌর্বল্য ও বিরক্তিতে নারী অস্থায়ীভাবে হয়ে উঠতে পারে আধ-পাগল। এসব অসুবিধা ও অক্রিয় দেহের মাধ্যমে বুঝতে গিয়ে সারা বিশ্বকে তার মনে হয় এক দুর্বহ ভার। অতিভারাক্রান্ত, নিমজ্জিত, সে নিজের কাছে নিজে হয়ে ওঠে অচেনা, কেননা সে অচেনা বাকি বিশ্বের কাছে। সংশ্লেষণ ভেঙে পড়ে, সময়ের মুহূর্তগুলো আর সম্পর্কিত থাকে না, অন্য মানুষজনকে অন্যমনস্কভাবে চেনা চেনা লাগে; আর যুক্তিশীলতা অটুট থাকলেও, যেমন থাকে বিষাদচিন্তাগ্রস্ত উন্মাদরোগে, তবু ওগুলো বাড়িয়ে তোলে জৈবিক বৈকল্য থেকে উদ্ভূত আবেগগুলোকে।

তেরো বছর বয়সের দিকেই বালকেরা শিক্ষা নেয় হিংস্রতার, তখন বিকাশ ঘটে তাদের আক্রমণাত্মকতার, দেখা দেয় ক্ষমতালাভের ইচ্ছে, প্রতিযোগিতাপ্রীতি; আর এ-সময় বালিকা ছেড়ে দেয় রূঢ় খেলাধুলোগুলো। তার জন্যে নিষিদ্ধ করা হয় ঘুরে দেখা, উদ্যোগ নেয়া, সম্ভবপরতার সীমা বাড়ানো। বিশেষভাবে, *প্রতিযোগিতামূলক* মনোভাব, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তরুণদের কাছে, তা মেয়েদের কাছে প্রায়-অজানা। এটা ঠিক, নারীরা তুলনা করে নিজেদের মধ্যে, তবে প্রতিযোগিতা, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারেই ভিন্ন জিনিশ এসব অক্রিয় তুলনা থেকে : দুটি স্বাধীন সত্তা পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিশ্বের ওপর তাদের যে-অধিকার আছে, তা

বাড়ানোর জন্যে; খেলার সাথীর থেকে বেশি ওপরে আরোহণ করা, একটা হাতকে জোরে চাপ দিয়ে বাঁকা করা, হচ্ছে সাধারণভাবে বিশ্বের ওপর তার সার্বভৌমত্ব দাবি করা। এমন কর্তৃত্বব্যঞ্জক আচরণ মেয়েদের জন্যে নয়, বিশেষ ক'রে যখন তার সাথে জড়িত থাকে হিংস্রতা।

একইভাবে, যে-কিশোরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে তার অস্তিত্বকে কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে জ্ঞাপন করতে এবং যে-কিশোরীর আবেগানুভূতির কোনো অব্যবহিত কার্যকারিতা নেই, বিশ্ব তাদের কাছে একই রকমে দেখা দেয় না। একজন নিরন্তর প্রশ্ন করে বিশ্বকে; সে যে-কোনো মুহূর্তে রুখে দাঁড়াতে পারে; তাই সে অনুভব করে সে যখন কিছু মেনে নিচ্ছে তখন সক্রিয়ভাবে সেটিকে সংশোধন করছে। অন্যজন করে বশ্যতাস্বীকার; বিশ্ব সংজ্ঞায়িত হয় তার প্রতি নির্দেশ না ক'রেই, এবং বিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলো ততোখানি অপরিবর্তনীয়, যতোখানি সে জড়িত বিশ্বের সাথে। শারীরিক শক্তির এ-অভাব তাকে ঠেলে দেয় আরো বেশি সার্বিক ভীরুতার দিকে : তার বিশ্বাস নেই সে-শক্তির ওপর, যা সে নিজের দেহে বোধ করে নি; সে সাহস করে না উদ্যোগী হ'তে, বিদ্রোহ করতে, আবিষ্কার করতে; বশ মানতে, হালছাড়া ভাব পোষণ করার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে সে সমাজে নিতে পারে সে-স্থান, যা ইতিমধ্যেই তার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। সে বর্তমান অবস্থাকে চিরস্থায়ী ব'লে মনে করে।

যুবকের কামপ্রবর্তনা শরীর নিয়ে তার গর্বকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে : এতে সে দেখতে পায় তার সীমাতিক্রমণতা ও ক্ষমতার লক্ষণ। যুবতী তার কামনা মেনে নিতে পারে, তবে তাতে লেগে থাকে লজ্জাবোধ। তার সারা দেহই অস্বস্তির এক উৎস। ছোটো শিশুরূপে তার 'অভ্যন্তরভাগ' বিষয়ে সে বোধ করেছে যে-আস্থাহীনতা, তা-ই ঋতুস্রাবের সংকটকে দেয় সন্দেহজনক চরিত্র, যা একে ঘৃণ্য ক'রে তোলে তার কাছে। নারীর শরীর– বিশেষ ক'রে যুবতীর শরীর– এক 'স্নায়ুবিকারগ্রস্ত' শরীর, এ-অর্থে যে বলা যায় এতে মনোজীবন ও তার শারীর বাস্তবায়নের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই। যেহেতু তার দেহকে তার কাছে মনে হয় সন্দেহজনক, এবং যেহেতু সে একে দেখে আতঙ্কের সাথে, একে তার মনে হয় অসুস্থ : এটা অসুস্থ। আমরা দেখেছি যে আসলে এ-শরীরটি কমনীয়, এবং এতে ঘটে প্রকৃত দৈহিক ব্যাধি; তবে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞরা একমত যে তাঁদের রোগীদের দশজনের মধ্যে ন-জনই কল্পিত রোগী; অর্থাৎ, হয়তো তাদের অসুস্থতার আদৌ কোনো শারীরবৃত্তিক সত্যতা নেই বা একটা মানসিক অবস্থার ফলেই ঘটে এ-দৈহিক বিশৃঙ্খলা : এটা মনোদৈহিক। নারী হওয়ার মধ্যে আছে যে-উদ্বেগ, তা-ই অনেকাংশে ধ্বংস করে নারীর শরীর।

এটা স্পষ্ট যে যদি জৈবিক অবস্থা নারীর জন্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে থাকেই, তবে তা ঘটে তার সার্বিক পরিস্থিতির জন্যেই। স্নায়বীয় ও রক্তবাহনিয়ামক স্থিতিহীনতা যদি বিকারধর্মী না হয়, তবে তা তাকে কোনো পেশার অযোগ্য ক'রে তোলে না : পুরুষের মধ্যেও আছে বিচিত্র ধরনের ধাত। মাসে এক বা দু-দিনের অসুস্থতা যন্ত্রণাদায়ক হ'লেও সেটা কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়; বহু নারীই এর সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়, এবং বিশেষ ক'রে তারা, যাদের কাছে এ-মাসিক 'অভিশাপ'টিকে মনে হ'তে পারে অতিশয় বিব্রতকর : খেলোয়াড়, ভ্রমণকারী, নর্তকী,

যে-নারীরা গুরুভার কাজ করে। অধিকাংশ পেশার জন্যেই এতো বেশি শক্তি লাগে না যা নারীর নেই। এটা ঠিক যে নারীর শারীরিক দুর্বলতার ফলে নারী হিংস্রতার পাঠ নেয় না; কিন্তু সে যদি নিজের শরীর দিয়ে দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করতে পারতো নিজেকে এবং বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতো অন্য কোনো ধরনে, তাহলে সহজেই এ-অভাবের ক্ষতিপূরণ ঘটতো। তাকে দেয়া হোক সাঁতার কাটতে, পর্বতের চুড়োয় উঠতে, বিমান চালাতে, প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, ঝুঁকি নিতে, রোমাঞ্চের জন্যে বাইরে যেতে, তাহলে সে ভীরুতা বোধ করবে না বিশ্বের মুখোমুখি। একটি সার্বিক অবস্থা, যা নারীকে বিশেষ কোনো বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দেয় না, তার ভেতরেই নারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো লাভ করে গুরুত্ব– সরাসরি নয়, বরং শৈশবে গ'ড়ে ওঠা হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষাকে প্রমাণ ক'রে।

অধিকন্তু, এ-গূঢ়ৈষা ভারি হয়ে চেপে থাকবে তার মননবৃত্তিক সিদ্ধির ওপর। প্রায়ই বলা হয় যে বয়ঃসন্ধির পর বালিকা মননগত ও শৈল্পিক এলাকায় অধিকার হারিয়ে ফেলে। এর আছে অনেক কারণ। একটা অতিসাধারণ কারণ হচ্ছে কিশোরীকে তার ভাইদের মতো উৎসাহ দেয়া হয় না– বরং ঘটে তার উল্টোটা। তার কাছে চাওয়া হয় সে *নারীও* হবে, এবং তার পেশাগত পাঠের দায়িত্ব যুক্ত করতে হবে তার নারীত্বের দায়িত্বের সাথে।

গৃহস্থালির দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজগুলো ও নীরস একঘেয়ে প্রাত্যহিক খাটুনি, মায়েরা যা বিদ্যালয়ের ছাত্রী বা শিক্ষানবিশ কন্যার ওপর চাপিয়ে দ্বিধা করে না, সেগুলো তাদের খাটিয়ে খাটিয়ে নিঃশেষ ক'রে ফেলে। যুদ্ধের সময় সেভরেতে আমার ক্লাশে আমি ছাত্রীদের দেখেছি, বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে যাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো গার্হস্থ্য কাজের অতিরিক্ত ভার : একজন হঠাৎ প'ড়ে যায় পটের রোগে, আরেকজন মেনিনজাইটিসে। মা, যেমন আমরা দেখতে পাবো, গোপনে গোপনে তার মেয়ের মুক্তির বিরোধী, এবং সে তার কন্যাকে কম-বেশি স্বেচ্ছাকৃতভাবে পীড়ন করে: কিন্তু পুরুষ হওয়ার জন্যে পুত্রের চেষ্টাকে শ্রদ্ধা করা হয়, এবং তাকে দেয়া হয় প্রচুর স্বাধীনতা। কন্যাকে ঘরে থাকতে বাধ্য করা হয়, চোখ রাখা হয় তার আসা-যাওয়ার ওপর : তার নিজের হাস্যকৌতুক ও আনন্দোপভোগের অধিকার তাকে দেয়া হয় না। এটা দেখতে পাওয়া খুবই অস্বাভাবিক যে নারীরা নিজেরা আয়োজন করেছে দীর্ঘ পথযাত্রার বা পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে প্রমোদভ্রমণের, বা তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছে বিলিয়ার্ডজ বা বাউলিংয়ের মতো খেলায়।

নারীর শিক্ষার জন্যে যতোখানি উদ্যোগ নেয়া দরকার, তা তো নেয়াই হয় না, এ-ছাড়াও প্রথা স্বাধীনতাকে তাদের জন্যে কঠিন ক'রে তোলে। যদি তারা পথে ঘোরাঘুরি করে, তাদের দিকে সবাই তাকায় এবং লোকজন এগিয়ে আসে তাদের সাথে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে। কিছু তরুণীকে আমি চিনি, যারা একেবারেই ভীতু নয়, তবুও তারা প্যারিসের পথে একলা হেঁটে কোনো আনন্দ পায় না, কেননা নিরন্তর তারা ডাক পায় দেহদানের জন্যে, এজন্যে তাদের সব সময় থাকতে হয় সতর্ক, এতে নষ্ট হয় তাদের সুখ। বিদ্যালয়ের মেয়েরা যদি দলবেঁধে রাস্তায় দৌড়োদৌড়ি করে, যেমন ছেলেরা করে, তাহলে তারা অবতারণা করে একটি প্রদর্শনীর; দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটা,

গান গাওয়া, কথা বলা, বা উচ্চস্বরে হাসা, বা একটা আপেল খাওয়া হচ্ছে প্ররোচনা দেয়া; যারা এটা করে তাদের অপমান করা হয় বা তাদের পিছে লাগা হয় বা তাদের সাথে কথা বলার জন্যে এগিয়ে আসে লোকজন। চপল আমোদপ্রমোদ এমনিতেই খারাপ আচরণ; যে-আত্মসংযম চাপিয়ে দেয়া হয় নারীদের ওপর এবং যা দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে ওঠে 'সুশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণী'র মধ্যে, তা নষ্ট করে স্বতস্ফূর্ততা; চূর্ণ করা হয় তার প্রাণোচ্ছলতা। এর ফল হচ্ছে উত্তেজনা ও অবসাদ।

এ-অবসাদ সংক্রামক : তরুণীরা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে ওঠে পরস্পরকে দিয়ে; তারা নিজেদের কারাগারে পরস্পরের উপকারের জন্যে দলবদ্ধ হয় না; এবং ছেলেদের সঙ্গ তাদের কেনো দরকার হয়, এটাই তার একটি কারণ। স্বাবলম্বী হওয়ার অযোগ্যতা জন্ম দেয় এমন এক ভীরুতা, যা ছড়িয়ে পড়ে তাদের সমগ্র জীবনে এবং তা ধরা পড়ে তাদের কাজেও। তারা বিশ্বাস করে অসামান্য সাফল্য শুধু পুরুষদের জন্যেই; তারা উচ্চাভিলাষ পোষণ করতে ভয় পায়। আমরা দেখেছি চোদ্দো বছরের বালিকারা ছেলেদের সাথে নিজেদের তুলনা ক'রে ঘোষণা করেছে 'ছেলেরাই উৎকৃষ্ট'। এটা এক দুর্বলকারী বিশ্বাস। এটা ঠেলে দেয় আলস্য ও মাঝারিত্বের দিকে। এক তরুণী, যার কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই অধিকতর শক্তিমান লিঙ্গের প্রতি, সে একটি পুরুষকে বকাবকি করছিলো তার ভীরুতার জন্যে; তখন তাকে বলা হয় সে নিজেই তো ভীরু। সে আত্মতুষ্টির সাথে ঘোষণা করে, 'ওহ্, নারী, তা তো ভিন্ন!'

এমন পরাজয়বাদী মনোভাবের মৌল কারণ হচ্ছে কিশোরী তার ভবিষ্যতের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে না; সে নিজের কাছে বেশি চাওয়ার মধ্যে কোনো লাভ দেখতে পায় না, কেননা পরিশেষে তার ভাগ্য তার কাজের ওপর নির্ভর করবে না। সে নিজের নিকৃষ্টতা বুঝতে পারে ব'লে পুরুষের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করে না, বরং তাকে যে ন্যস্ত করা হয় পুরুষের কাছে, সেজন্যেই সে মেনে নেয় তার নিকৃষ্টতার ধারণা, এবং প্রমাণ করে এর সত্যতা।

এবং, আসলেই, নিজের যোগ্যতা বাড়িয়ে সে মানুষ হিশেবে পুরুষের কাছে মূল্য পাবে না, বরং মূল্য পাবে নিজেকে তাদের স্বপ্নের আদলে তৈরি ক'রে। যখন তার অভিজ্ঞতা কম, তখন সে এ-ব্যাপারটি সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকে না। সে হ'তে পারে ছেলেদের মতোই আক্রমণাত্মক; কিন্তু এ-মনোভাব তাকে নিষ্ফল ক'রে তোলে। অতিশয় দাসীস্বভাবসম্পন্ন মেয়ে থেকে সবচেয়ে উদ্ধত মেয়েটি পর্যন্ত সব মেয়েই এক সময় বুঝতে পারে যে অন্যদের খুশি করার জন্যে তাদের অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে অধিকার। তাদের মায়েরা তাদের আদেশ দেয় যেনো তারা আর ছেলেদের সঙ্গী মনে না করে, যেনো নিজেরা উদ্যোগ না নেয়, যেনো তারা অক্রিয় ভূমিকা নেয়। বন্ধুত্ব বা ফষ্টিনষ্টি শুরু করতে চাইলেও তাদের যত্নশীল হ'তে হবে, যাতে এমন মনে না হয় যে তারাই উদ্যোগ নিচ্ছে; পুরুষেরা *গারসঁ মাঁক*, বা নীলমুজো বা মেধাবী নারী পছন্দ করে না; অতি বেশি সাহস, সংস্কৃতি, বা বুদ্ধি, অতি বেশি চরিত্র, তাদের ভীত করবে। অধিকাংশ উপন্যাসে, যেমন জর্জ এলিয়ট মন্তব্য করেছেন, স্বর্ণকেশী ও বোকাটে নায়িকারাই শেষে জয়ী হয় পুরুষস্বভাবের শ্যামাঙ্গীদের ওপর; এবং *দি মিল অন দি ফ্লস*-এ ম্যাগি নিষ্ফলভাবে চেষ্টা করে ভূমিকা দুটি পাল্টে দিতে; কিন্তু শেষে সে মারা

যায় এবং স্বর্ণকেশী লুসির বিয়ে হয় স্টিফেনের সাথে। *দি লাস্ট অফ দি মোহিকান্স*-এ সাহসী ক্ল্যারা নয়, নায়কের হৃদয় জয় করে নিষ্প্রাণ এলিস; *লিটল উইমেন*-এ মনোরম জো লরির বাল্যকালের খেলার সাথী মাত্র : জোর প্রেম রক্ষিত থাকে নিষ্প্রাণ অ্যামি ও তার কোঁকড়ানো কেশরাজির জন্যে।

নারী হ'তে হ'লে হ'তে হবে দুর্বল, অপদার্থ, বশমানা। তরুণীকে শুধু সুসজ্জিত থাকলেই চলবে না, শুধু চটপটে হ'লেই হবে না, তাকে দমন করতে হবে তার স্বতস্ফূর্ততা এবং তার বদলে তার থাকতে হবে তার গুরুজনদের শেখানো শোভা ও সৌন্দর্য। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যে-কোনো উদ্যোগই কমাবে তার নারীত্ব ও আবেদন। নিজের অস্তিত্বের ভেতরে ভ্রমণ যুবকের পক্ষে আপেক্ষিকভাবে সহজ, কেননা মানুষ হিশেবে তার বৃত্তি ও তার পুরুষ হওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; আর এ-সুবিধাটি সূচিত হয় শৈশবেই। স্বাধীনতা ও মুক্তির মধ্যে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সে একই সময়ে অর্জন করে তার সামাজিক মূল্য এবং পুরুষ হিশেবে তার মর্যাদা : উচ্চাভিলাষী পুরুষেরা, বালজাকের রাস্তিনাকের মতো, একই কাজের মধ্য দিয়ে চায় অর্থ, খ্যাতি, ও নারী; একটি ছক, যা তরুণকে কাজে উদ্দীপ্ত করে, তা হচ্ছে ক্ষমতাশালী ও বিখ্যাত পুরুষের ছক, নারীরা যার অনুরাগিণী।

কিন্তু, উল্টোভাবে, তরুণীর জন্যে একজন প্রকৃত মানুষ হিশেবে মর্যাদা লাভ ও নারী হিশেবে তার বৃত্তির মধ্যে আছে বিরোধ, এবং এখানেই মিলবে সে-কারণটি কেনো বয়ঃসন্ধি নারীর জন্যে খুবই কঠিন ও নিষ্পত্তিকারক মুহূর্ত। এ-সময় পর্যন্ত সে থেকেছে এক স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তি : এখন তাকে অস্বীকার করতে হবে সার্বভৌমত্ব। তার ভাইদের মতোই, তবে অনেক বেশি বেদনাদায়কভাবে, তাকে শুধু ছিন্ন করা হয় না অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে, কিন্তু এর সাথে দেখা দেয় একটা বিরোধ, সেটি হচ্ছে তার কর্তা হওয়া, সক্রিয়, স্বাধীন হওয়ার মূল দাবি এবং তার কাম প্রবর্তনা ও নিজেকে একটি অক্রিয় বস্তুরূপে মেনে নেয়ার জন্যে সামাজিক চাপের মধ্যে বিরোধ। তার স্বতস্ফূর্ত প্রবণতা হচ্ছে নিজেকে অপরিহার্যরূপে গণ্য করা : কী ক'রে সে মনস্থির করবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার জন্যে? অভিলাষ ও ঘৃণা, আশা ও ভয়ের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে সন্দেহের সাথে সে বিলম্ব করতে থাকে শৈশবের স্বাধীনতার কাল ও নারীসুলভ বশ্যতাস্বীকারের মধ্যে।

তার আগের প্রবণতা অনুসারে এ-পরিস্থিতিতে নানা প্রতিক্রিয়া ঘটে তরুণীর মধ্যে। 'ছোটো মাতা', ভবিষ্যৎ-মাতৃ, সহজেই আত্মসমর্পণ করতে পারে তার রূপান্তরের কাছে; তবে 'ছোটো মাতা' হিশেবে হয়তো সে পেয়েছে কিছুটা কর্তৃত্বের স্বাদ, এটা তাকে পুরুষের অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ক'রে তুলতে পারে : সে একটা মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত, কামসামগ্রী ও দাসী হওয়ার জন্যে নয়। বড়ো বোনেরা, যারা ছোটোবেলায়ই বহন করে অতিরিক্ত দায়িত্বভার, তাদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে মাঝেমাঝেই। *গারসঁ মাঁক* যখন আবিষ্কার করে সে নারী, তখন কখনো কখনো সে বোধ করে প্রবঞ্চিত হওয়ার প্রচণ্ড জ্বালা, যা তাকে নিয়ে যেতে পারে সমকামিতার দিকে; তবে স্বাধীনতা ও হিংস্রতার মধ্যে সে যা চেয়েছে, তা হচ্ছে বিশ্বকে অধিকার করা : সাধারণত সে চাইতে পারে না তার নারীত্বের, মাতৃত্বলাভের

অভিজ্ঞতার, তার নিয়তির এক সার্বিক এলাকার, ক্ষমতা ছেড়ে দিতে। সাধারণত, কিছুটা প্রতিরোধের সাথে হ'লেও, তরুণী মেনে নেয় তার নারীত্ব; তার পিতার সাথে, তার শৈশবের ছেনালিপনার সময়, তার যৌন স্বপ্নপ্রয়াণে, সে এর মাঝেই জানতে পেরেছে অক্রিয়তার মোহনীয়তা; সে দেখতে পায় এর ক্ষমতা; তার দেহের জাগানো লজ্জার সাথে মিলেমিশে যায় গর্ববোধ। সেই হাত, সেই দৃষ্টি, যা আলোড়িত করেছে তার অনুভূতি, সেটা ছিলো এক আবেদন, এক প্রার্থনা; তার দেহকে মনে হয় ঐন্দ্রজালিক গুণসমৃদ্ধ; এটি একটি সম্পদ, একটি অস্ত্র; সে এর জন্যে গর্বিত। তার যে-ছেনালিপনা হারিয়ে গিয়েছিলো শৈশবের স্বাধীন বছরগুলোতে, তা আবার দেখা দেয়। সে নেয় নতুন প্রসাধন, চুল বাঁধার নতুন ঢঙ; স্তন লুকিয়ে রাখার বদলে সে ওগুলো বাড়ানোর জন্যে মর্দন করে, সে আয়নায় দেখে তার নিজের হাসি।

তরুণীর জন্যে যৌন সীমাতিক্রমণতার মধ্যে থাকে একটি জিনিশ, তার নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিজেকে তার হয়ে উঠতে হয় শিকার। সে হয়ে ওঠে একটি বস্তু, এবং নিজেকে সে দেখে বস্তুরূপে; সে বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করে তার সত্তার এ-নতুন দিকটি : তার মনে হয় সে দ্বিগুণ হয়ে গেছে: নিজের সাথে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়ানোর বদলে সে এখন শুরু করে *বাইরে* অস্তিত্বশীল থাকার। আমরা রোজামঁদ লেহ্‌মানের *ইনভিটেশন টু দি য়োল্‌স্*-এ দেখি অলিভিয়া আয়নায় আবিষ্কার করে একটি নতুন শরীর : বস্তু-রূপে-সে হঠাৎ মুখোমুখি হয় নিজের। এটা জন্ম দেয় এক অস্থায়ী, তবে বিহ্বলকর আবেগ।

কিছু মেয়ে পরস্পরকে দেখায় তাদের নগ্ন দেহ, তারা তুলনা করে তাদের স্তনের : আমাদের মনে পড়ে *ম্যাটশন ইন ইউনিফর্ম*-এর সে-দৃশ্যটি, যাতে আঁকা হয়েছে আবাসিক বিদ্যালয়ের বালিকাদের এসব দুঃসাহসিক আমোদপ্রমোদ; তারা সাধারণ বা বিশেষ ধরনের শৃঙ্গার পর্যন্ত ক'রে থাকে। অধিকাংশ তরুণীর মধ্যেই রয়েছে সমকামী প্রবণতা, যাকে আত্মরতিমূলক সুখানুভূতিবোধ থেকে পৃথক করা যায় না : প্রত্যেকেই অন্যের মধ্যে কামনা করে তার নিজের ত্বকের কোমলতা, তার নিজের দেহের বাঁকগুলো। পুরুষ, কামগতভাবে, *কর্তা*, এবং তাই পুরুষেরা সাধারণত পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এমন কামনায়, যা তাদের চালিত করে তাদের থেকে ভিন্ন এক বস্তুর দিকে। কিন্তু নারী হচ্ছে কামনার ধ্রুব *কর্ম*, এবং এজন্যেই বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, স্টুডিওতে গ'ড়ে ওঠে এতো 'বিশেষ বন্ধুত্ব'; ওগুলোর কিছু বিশুদ্ধভাবে প্লাতোয়ী এবং অন্যগুলো স্থূলভাবেই দৈহিক।

তাকে যেহেতু পুরুষের ভূমিকা নিতে হবে, তাই প্রিয়া অবিবাহিতা হ'লেই ভালো হয়: বিয়ে সব সময় তরুণী অনুরাগিণীকে হতোদ্যম করে না, তবে এটা তাকে বিরক্ত করে; সে পছন্দ করে না যে তার অনুরাগের বস্তুটি থাকবে কোনো স্বামী বা প্রেমিকের অধীনে। অধিকাংশ সময়ই এ-সংরাগগুলো দেখা দেয় গোপনে, বা কমপক্ষে এক প্লাতোয়ী স্তরে। *ম্যাটশন ইন ইউনিফর্ম*-এ যখন ডরোথি ভিয়েক চুমো খায় হের্টা থিলের ঠোঁটে, তখন চুমোটি একই সাথে মাতৃধর্মী ও কামময়। নারীদের মধ্যে রয়েছে এমন দুষ্কর্মের সহযোগিতা, যা নষ্ট করে শালীনতাবোধ; তারা একজন আরেকজনের মধ্যে জাগায় যে-উত্তেজনা, তা সাধারণত হিংস্রতাহীন; সমকামী শৃঙ্গারে থাকে না

সতীচ্ছদছিন্নকরণ বা বিদ্ধকরণ : নতুন ও উদ্বেগজাগানো পরিবর্তন না চেয়ে তারা তৃপ্ত করে শৈশবের ভগাঙ্কুরীয় কাম। তরুণী নিজেকে গভীরভাবে বিচ্ছিন্ন বোধ না ক'রে অক্রিয় বস্তুরূপে বাস্তবায়িত করতে পারে তার বৃত্তি। রেনি ভিভিয়েঁ এটাই প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো কবিতায়, যাতে তিনি গেয়েছেন তাদের লঘু স্পর্শ ও কমনীয় চুম্বনের গান, যারা একই সাথে প্রেমিকা ও বোন, যাদের শৃঙ্গার ঠোঁটে বা স্তনে কোনো ছাপ ফেলে না।

ওষ্ঠ ও *স্তন* শব্দের কাব্যিক অনৌচিত্যের মধ্যে সে তার বান্ধবীকে যে-প্রতিশ্রুতি দেয়, স্পষ্টভাবে তা হচ্ছে যে সে বান্ধবীকে বলাৎকার করবে না। এবং আংশিকভাবে হিংস্রতার, বলাৎকারের ভয়েই কিশোরী মেয়ে অনেক সময় তার প্রথম প্রেম দান করে কোনো পুরুষের বদলে কোনো বয়স্ক নারীকে। বালিকার চোখে ওই পুরুষধর্মী নারীটি হয়ে ওঠে তার বাবা ও মা উভয়ের প্রতিমূর্তি : তার আছে বাবার কর্তৃত্ব ও সীমাতিক্রমণতা, সে হচ্ছে মূল্যবোধের উৎস ও মানদণ্ড, সে অতিক্রম ক'রে যায় বিদ্যমান বিশ্বকে, সে অপার্থিব; তবে সে এক নারীও। শিশু অবস্থায় মেয়েটি মায়ের স্পর্শাদর কমই পেয়ে থাক, বা এর বিপরীতে, তার মা তাকে দীর্ঘ কাল ধ'রে লাই-ই দিক, ভাইদের মতোই সে স্বপ্ন দেখে উষ্ণ বুকের; তার সাথে ঘনিষ্ঠ এ-মাংসে এখন সে আবার ফিরে পায় জীবনের সাথে সেই ভাবনাহীন, সরাসরি একীভবন, যা সে একদা হারিয়ে ফেলেছিলো দুধ ছাড়ার সময়; এবং যে-বিচ্ছিন্নতা তাকে ক'রে তুলেছিলো একটি একাকী ব্যক্তিসত্তা, তা পরাভূত হয় আরেকজনের এই পূর্ণতর স্থিরদৃষ্টিতে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মানবিক সম্পর্ক জ্ঞাপন করে বিরোধ, সব প্রেমই জন্ম দেয় ঈর্ষা। তবে কুমারী মেয়ে ও তার প্রথম পুরুষ প্রেমিকের মধ্যে দেখা দেয় যে-সব বাধা, সেগুলো এখানে মুক্ত হয়। সমকামী অভিজ্ঞতা নিতে পারে একটি প্রকৃত প্রেমের রূপ; এটা তরুণী মেয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এমন এক সময়োপযোগী ভারসাম্য যে সে চাইবে একে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে বা পুনরাবৃত্তি করতে, সে বইবে এর আবেগভারাতুর স্মৃতি; সত্যিই, এটা প্রকাশ করতে বা জন্ম দিতে পারে একটি নারীসমকামী প্রবণতা।

পুরুষ তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তবু পুরুষ তাকে ভীত করে। পুরুষের প্রতি সে পোষণ করে যে-বিরোধী অনুভূতি, তাদের খাপ খাওয়ানোর জন্যে সে পৃথক ক'রে নেয় তার ভেতরের সে-পুরুষকে, যে তাকে ভীত করে এবং সে-উজ্জ্বল স্বর্গীয় দেবতাকে, যাকে সে ধার্মিকের মতো পুজো করে। তার পুরুষ সঙ্গীদের কাছে সে রূঢ় ও লাজুক হ'লেও সে আরাধনা করে কোনো সুদূর সুদর্শন রাজকুমারের : কোনো চিত্রতারকার, যার ছবি সে লাগিয়ে রাখে তার খাটে, কোনো বীরের, মৃত বা এখনো জীবিত, কিন্তু সব সময়ই অগম্য, এমন এক অপরিচিতের, যাকে সে হঠাৎ দেখেছে এবং জানে তাকে সে আর কখনো দেখতে পাবে না। কিছু প্রেম সমস্যা সৃষ্টি করে না। অধিকাংশ সময়ই সে হয় সামাজিক বা মননগত মর্যাদার কোনো পুরুষ, কোনো দৈহিক কামনা ছাড়াই তরুণী আকৃষ্ট হয় তার প্রতি : মনে করা যাক কোনো বুড়ো ও হাস্যকর অধ্যাপকের প্রতি। এসব বুড়ো পুরুষ আছে কিশোরীর জগতের বাইরে, এবং সে সংগোপনে তাদের অনুরাগী হ'তে পারে, যেমন কেউ নিজেকে সমর্পণ করে

বিধাতার কাছে; এটা অবমাননাকর নয়, কেননা এতে নেই কোনো দৈহিক কামনা। এমনকি মনোনীত ব্যক্তিটি হ'তে পারে নগণ্য বা মামুলি, কেননা এ-ক্ষেত্রে সে আরো নিরাপদ বোধ করে। যাকে পাওয়া যাবে না, এমন কাউকে বাছাই ক'রে সে প্রেমকে ক'রে তুলতে পারে একটি বিমূর্ত মন্ময় অভিজ্ঞতা, যা তার সততার প্রতি হুমকি নয়; সে বোধ করে আকুলতা, আশা, তিক্ততা, কিন্তু বাস্তবিকভাবে সে জড়িয়ে পড়ে না। বেশ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আরাধ্য দেবতাটি থাকে যতো দূরে, সে হয় ততো দীপ্ত; প্রতিদিনের পিয়ানো শিক্ষককে আবর্ষণহীন হ'লেও চলে, কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরের নায়ককে হ'তে হবে সুদর্শন ও পৌরুষসম্পন্ন। গুরুত্বপূর্ণ জিনিশটি হচ্ছে যে কামের উপাদানটিকে একভাবে বা অন্যভাবে রাখা হয় এর বাইরে, এভাবে দীর্ঘায়িত করা হয় অন্তর্নিহিত কামের আত্মরতিমূলক প্রবণতা।

এভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা এড়িয়ে কিশোরী প্রায়ই গ'ড়ে তোলে এক তীব্র কাল্পনিক জীবন, কখনো কখনো অবশ্য সে তার স্বপ্নের ছায়ামূর্তিগুলোকে গুলিয়ে ফেলে বাস্তবের সাথে। হেলেন ডয়েট্শ্ বর্ণনা করেছেন এক তরুণীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে তার থেকে বড়ো এক বালকের সাথে কল্পনা করেছে তার নিবিড় সম্পর্ক, যার সাথে সে কখনো কথাই বলে নি। সে ডায়েরি লিখেছে কাল্পনিক ঘটনাগুলোর, অশ্রুপাত ও আলিঙ্গনের, বিদায় নেয়ার ও ভুল বোঝাবুঝি অবসানের, এবং তাকে চিঠি লিখেছে, যা কখনো পাঠানো হয় নি, কিন্তু সেগুলোর উত্তর সে নিজেই লিখেছে। এগুলো স্পষ্টতই সে-বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, যেগুলোকে সে ভয় পেতো।

এটা এক চূড়ান্ত বিকার, তবে প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক। নারী হওয়ার জন্যে যে-সব পরিস্থিতি তাঁকে ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জনে বাধা দিতো, সে-সব পরিস্থিতিতে নিজের অহমিকা উন্নত রাখার বাসনায় মারি বাশকির্তসেভ এক কাল্পনিক ভাবাবেগপূর্ণ সম্পর্ক লালন করতেন এক অগম্য সামন্তপুরুষের সাথে। তিনি হ'তে চেয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ কেউ, কিন্তু স্কার্ট প'রে তা কী ক'রে হওয়া যায়? তাঁর দরকার পড়ে একটি পুরুষের, তবে পুরুষটিকে হ'তে হবে শ্রেষ্ঠতম। 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নিজেকে নত করা হচ্ছে উৎকৃষ্টতর নারীদের শ্রেষ্ঠতম গর্ব,' লিখেছেন তিনি। তাই আত্মরতি নিয়ে যায় মর্ষকামের দিকে। অন্যদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ লীন করা হচ্ছে অন্যদেরকে নিজের মধ্যে ও নিজের জন্যে বাস্তবায়িত করা। নিরোর প্রেম পেয়ে মারি বাশকির্তসেভ *হয়ে উঠবেন* নিরো। বস্তুত, শূন্যতার এ-স্বপ্ন হচ্ছে হয়ে ওঠার এক গর্বিত ইচ্ছে; সত্য হচ্ছে তিনি কখনো এমন কোনো অসাধারণ পুরুষের দেখা পান নি যে তার মধ্যে হারিয়ে ফেলবেন নিজেকে। নিজের তৈরি দেবতা, যে সব সময় সুদূরে থাকে, তার সামনে নতজানু হওয়া এক কথা, আর কোনো রক্তমাংসের পুরুষের কাছে নত হওয়া অন্য কথা। অনেক তরুণী বাস্তবতার জগতেও টিকিয়ে রাখে এ-স্বপ্ন; তারা খোঁজে এমন একজন পুরুষ, যে সব কিছুতে সকলের থেকে উৎকৃষ্ট, যার আছে ধন ও খ্যাতি, সে এক পরম কর্তা, যে তার প্রেমে তাদের ভূষিত করবে তার মহিমা ও অপরিহার্যতায়। এ-স্বপ্ন তাদের প্রেমকে আদর্শায়িত করে সে পুরুষ ব'লে নয়, বরং সে *সেই* মহিমান্বিত সত্তা ব'লে। 'আমি চাই দানব, কিন্তু শুধু পুরুষ দেখতে পাই,' এক বান্ধবী বলেছিলো আমাকে।

এ-আত্মরতিমূলক আত্মসমর্পণের বাইরে কিছু তরুণী বাস্তবসম্মতভাবেই বোধ করে যে তাদের একজন পথপ্রদর্শক, একজন শিক্ষক দরকার। পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে এ-অনভ্যস্ত স্বাধীনতাকে তাদের মনে হয় অস্বস্তিকর; তারা লঘুচপলতা ও অসংযমে পতিত হয়ে এর নেতিবাচক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু ক'রে উঠতে পারে না; তারা ছেড়ে দিতে চায় তাদের মুক্তি। জনপ্রিয় উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের একটি মান ছক হচ্ছে অস্থিরমতি, রাগী, বিদ্রোহী, ও দুঃসহ তরুণীর গল্প, যে প্রেমের মাধ্যমে বশ মানে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনো পুরুষের কাছে : এটা এমন এক শস্তা জিনিশ, যা একই সাথে শ্লাঘা জাগায় পুরুষ ও নারীর। মার্কিন নারীদের জেদি গর্ববোধ সত্ত্বেও হলিউডের চলচ্চিত্র বারবার দেখিয়েছে স্বামী বা প্রেমিকদের শুভ নিষ্ঠুরতা কীভাবে বশ মানায় বেপরোয়া তরুণীদের : একটি বা দুটো চড়, তার চেয়ে ভালো পাছায় বেশ কয়েকটা ঘা, এটাই তাদের সঙ্গমে সম্মত করার সুনিশ্চিত পদ্ধতি।

কিন্তু আদর্শায়িত প্রেম থেকে যৌন প্রেমে উত্তরণ বাস্তবে এতো সহজ নয়। অনেক নারী সযত্নে এড়িয়ে যায় তাদের প্রিয় জিনিশের কাছাকাছি আসা। তারা ভয় পায় যে তারা প্রতারিত হ'তে পারে। যদি বীরটি, দানবটি, নরদেবতাটি সাড়া দেয় তার জাগানো প্রেমের ডাকে এবং একে রূপান্তরিত করে কোনো সত্যিকার অভিজ্ঞতায়, তাতে ভয় পায় তরুণী; তার দেবতা হয়ে ওঠে একটি পুরুষ, যার থেকে সে ঘেন্নায় স'রে আসে। অনেক ছেনাল মেয়ে আছে, যারা তাদের কাছে যে-পুরুষকে 'আকর্ষণীয়' বা 'মনোহর' মনে হয়, তাদের আকৃষ্ট করতে গিয়ে তারা কিছুতেই থামে না, কিন্তু তারা অসঙ্গতভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যখন সে-পুরুষ তাদের প্রতি প্রাণবন্তভাবে মনোযোগ দেয়; সে অগম্য ব'লেই পুরুষটি তাদের মনে আবেদন জাগায় : প্রেমিক হিশেবে তাকে মনে হয় খুবই সাদামাটা– 'অন্যদের মতোই সে একটি পুরুষমাত্র'। মেয়েটি তার মর্যাদাহানির জন্যে দোষ দেয় পুরুষটিকে, একে সে অজুহাতরূপে ব্যবহার ক'রে এড়িয়ে যায় দৈহিক সম্পর্ক, যা ভীত করে তার কুমারী সংবেদনশীলতাকে। যখন সে ধরা দেয় তার 'আদর্শ'-এর কাছে, তার বাহুবন্ধনে সে থাকে শীতল, এবং স্টেকেল যেমন বলেছেন, 'কখনো কখনো এমন ঘটনার পর অহঙ্কারী মেয়ে আত্মহত্যা করে, বা ধ'সে পড়ে তার প্রণয়াকুল কল্পনার সমগ্র সৌধ, কেননা সে-আদর্শটির প্রকাশ ঘটে একটি "বর্বর জন্তু"রূপে'।

অসম্ভবের জন্যে এ-বাসনা প্রায়ই তরুণীকে ঠেলে দেয় সে-পুরুষের প্রেমে পড়ার দিকে, যে আগ্রহী তার কোনো বান্ধবীর প্রতি, এবং প্রায়ই সে হয় বিবাহিত পুরুষ। ডন জোয়ানকে দিয়ে সে নির্দ্বিধায় মুগ্ধ হয়; সে পরাভূত ও অধীন করতে চায় এ-রমণীবল্লভকে, যাকে কোনো নারীই দীর্ঘ সময় ধ'রে রাখতে পারে নি; সে লালন করতে থাকে তাকে সংশোধনের বাসনা, যদিও জানে সে ব্যর্থ হবে, এবং তার পছন্দের এটাই একটি কারণ। কিছু মেয়ে চিরকালের জন্যে অসমর্থ হয়ে ওঠে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ প্রেমের। জীবনভর তারা চায় এক আদর্শ অসম্ভবকে বাস্তবায়িত করতে।

মেয়ের আত্মরতি এবং তার কাম দিয়ে যে-অভিজ্ঞতার জন্যে সে নির্ধারিত, তার মধ্যে রয়েছে স্পষ্টত বিরোধ। নারী শুধু তখনই নিজেকে মেনে নেবে অপ্রয়োজনীয় ব'লে যদি সে নিজেকে আবিষ্কার করে দাবিত্যাগের কর্মে। নিজেকে একটি বস্তু হ'তে

দিয়ে সে রূপান্তরিত হয় একটি প্রতিমায় এবং সগর্বে নিজেকে দেখে এ-রূপে; তবে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এ-নিষ্করুণ যুক্তি, যা তাকে আরো অপ্রয়োজনীয় ক'রে তোলে। একটি বস্তু মনে করা নয়, তার ভালো লাগতো একটা মুগ্ধকর আকর্ষণীয় সম্পদ হ'তে পারলে। সে ভালোবাসে ঐন্দ্রজালিক প্রবাহসম্পন্ন এক বিস্ময়কর প্রেতাশ্রিত-বস্তুরূপে প্রতিভাত হ'তে, সে নিজেকে দেখতে চায় না মাংসরূপে, যা দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ক্ষতার্ত করা যায় : পুরুষ এভাবেই শিকার হিশেবে পছন্দ করে নারীকে, তবে পালিয়ে যায় মানুষখেকো রাক্ষসী দিমিতার।

সে গর্ব বোধ করে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে, পুরুষের অনুরাগ জাগিয়ে, কিন্তু যা তাকে ক্ষুব্ধ করে, তা হচ্ছে ধরা প'ড়ে যাওয়া। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছে লজ্জাবোধের সাথে; এবং এটা চলতে থাকে তার ছেনালিপনা ও অহমিকার সাথে মিলেমিশে। পুরুষের দৃষ্টি তাকে একই সঙ্গে খুশি ও আহত করে; সে চায় সে যেটুকু দেখাতে চায় সেটুকুই দেখতে পাক : চোখ সব সময়ই অতি অন্তর্ভেদী। তাই দেখা দেয় অসামঞ্জস্য, যা পুরুষের কাছে বিব্রতকর : তরুণী প্রদর্শন করে তার *দেকলতে*, তার পা, এবং যখন সেগুলোর দিকে কেউ তাকায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, সে বিব্রত বোধ করে। সে পুরুষকে প্রজ্জ্বলিত ক'রে সুখ পায়, কিন্তু সে যদি দেখে যে সে জাগিয়েছে পুরুষের কামনা, সে ঘেন্নায় নিজেকে গুটিয়ে নেয়। পুরুষের কামনা যতোখানি প্রশংসাসূচক ঠিক ততোখানিই মনোকষ্টদায়ক; সে নিজের মোহনীয়তার জন্যে নিজেকে যতোটা দায়ী মনে করে, বা মনে করে সে এটা প্রদর্শন করছে নিজের ইচ্ছেয়, সে ততোখানি সুখ পায় নিজের বিজয়ে, কিন্তু তার মুখ, তার দেহগঠন, তার মাংস এতে যতোটা ভূমিকা পালন করে সে ততোখানি এদের লুকোতে চায় এ-স্বাধীন অপরিচিতের কাছে থেকে, যে এগুলোকে ভোগের কামনা বোধ করে।

এখানেই আছে এ-প্রাথমিক বিনয়ের গভীরতর অর্থ, যা বিব্রতকরভাবে ব্যাহত করে সাহসীতম ছেনালিপনাগুলোকে। একটা ছোটো মেয়ে বিস্ময়করভাবে দুঃসাহসী হ'তে পারে, কেননা সে বোঝে না যে উদ্যোগ গ্রহণ ক'রে সে প্রকাশ করছে তার অক্রিয়তা : যখনই সে এটা দেখতে পায়, সে ভীত ও বিরক্ত বোধ করে। কিছুই তাকানোর থেকে বেশি দ্ব্যর্থবোধক নয়; এটা থাকে দূরে, দূরে থাকা অবস্থায় একে মনে হয় সশ্রদ্ধ, কিন্তু এটা অচেতনভাবেই দখল ক'রে নেয় দেখা মূর্তিকে। অপরিণত নারী লড়াই করে এ-প্রলোভনের মধ্যে। সে শুরু করে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে টানটান ক'রে তোলে এবং দমন করে তার জেগে ওঠা কামনা। তার এখনো-অস্থির দেহে আদরকে একবার মনে হয় একটা কোমল চাপ ব'লে, তারপরই মনে হয় একটা অস্বস্তিকর কাতুকুতু ব'লে; একটি চুমো প্রথমে তাকে আলোড়িত ক'রে তোলে, তারপরই তাতে সে হেসে ওঠে; প্রতিটি সমর্পণের পরই দেখা দেয় বিদ্রোহ; সে পুরুষকে চুমো খেতে দেয়, কিন্তু সে তার ঠোঁট মোছার অভিনয় করে; সে সুস্মিত হাসে ও প্রীতিময় থাকে, কিন্তু তারপরই হয়ে ওঠে শ্লেষপূর্ণ ও শত্রুতামূলক; সে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেগুলো ভুলে যায়।

এভাবেই একটি শিশুসুলভ ও যুক্তির বিপরীতধর্মী চরিত্র প্রদর্শন ক'রে 'অপক্ব ফল'টি নিজেকে রক্ষা করে পুরুষের থেকে। তরুণী মেয়েকে প্রায়ই বর্ণনা করা হয়

এমন অর্ধ-বন্য অর্ধ-পোষমানা প্রাণীরূপে। কলেৎ, উদাহরণস্বরূপ, একে চিত্রিত করেছেন তাঁর *ক্লদিন অ লেকল্*-এ এবং *ব্লে এঁ এর্ব্*-এও সম্মোহিনী ভিঁকারূপে। সে তার বিশ্বের প্রতি বোধ করে একটা তীব্র আগ্রহ এবং সার্বভৌম রীতিতে শাসন করে তাকে; তবে ঔৎসুক্য বোধ করে পুরুষের প্রতিও এবং তার জন্যে বোধ করে ইন্দ্রিয়াতুর ও রোম্যান্টিক কামনা। কাঁটাগাছের ঝোপে ছিঁড়েফেড়ে যায় ভিঁকা, সে বাগদাচিংড়ি ধরে, গাছে চড়ে, তবুও শিউরে ওঠে যখন তার খেলার সাথী ফিল তার হাত ছোঁয়; সে অনুভব করে সে-উত্তেজনা, যাতে দেহ পরিণত হয় মাংসে এবং নারী প্রথম প্রকাশ পায় নারীরূপে। কামনা জাগার পর, সে চায় রূপসী হ'তে : কখনো কখনো সে তার কেশবিন্যাস করে, প্রসাধন করে, পরে মিহিমসৃণ অর্গান্ডি, সে নিজে নিজে মজা পায় ছেনাল ও মনোমোহিনী হয়ে উঠে; তবে সে যেনো চায় *অন্যদের জন্যে* নয়, *নিজের জন্যে* বাঁচতে, তাই কখনো কখনো পরে অমার্জিত পোশাক বা অশোভন ট্রাউজার্স; তার একটা বড়ো অংশ মেনে নেয় না ছেনালিপনা এবং একে মনে করে নীতিবিসর্জন। তাই সে ইচ্ছাকৃতভাবে নখে কালি মাখে, চুল আঁচড়ায় না এবং থাকে নোংরা ও অসংবৃত। এ-বিদ্রোহী আচরণ তাকে ক'রে তোলে এমন বেঢপ, যাতে তার বিরক্তি লাগে; এতে সে রুষ্ট হয়, লজ্জা লাগে, আবার দ্বিগুণ ক'রে তোলে তার অমার্জিততা, এবং মনোমোহিনী হওয়ার জন্যে তার ব্যর্থ প্রয়াসের কথা ভেবে ঘৃণায় কেঁপে ওঠে। এ-পর্যায়ে তরুণী মেয়ে আর শিশু হ'তে চায় না, তবে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াকেও মেনে নেয় না, এবং নিজেকে ফিরে ফিরে তিরস্কার করে তার বালসুলভতা ও তার নারীসুলভ দাবিত্যাগের জন্যে; সে আছে এক অবিরাম প্রত্যাখ্যানের অবস্থায়।

এটা সে-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা বিশিষ্টতা দেয় তরুণীকে এবং আমাদের দেয় তার অধিকাংশ আচরণের জট খোলার চাবি; তার জন্যে প্রকৃতির ও সমাজের নির্ধারিত নিয়তি সে মেনে নেয় না, তবে সে তা পুরোপুরি অস্বীকারও করে না; সে নিজের বিরুদ্ধে এতো বিভক্ত যে বিশ্বের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে পারে না; সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে বাস্তবতা থেকে পলায়নের বা তার বিরুদ্ধে একটা প্রতীকী যুদ্ধের মধ্যে। তার প্রতিটি বাসনার আছে সেটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উদ্বেগ : সে ব্যগ্র তার ভবিষ্যৎকে অধিকার করতে, কিন্তু সে ভয় পায় অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে; সে একটি পুরুষ 'অধিকার' করতে চায়, তবে সে চায় না যে পুরুষটি তাকে অধিকার করুক তার শিকাররূপে। এবং প্রতিটি ভয়ের পেছনে ওত পেতে থাকে একটি ক'রে বাসনা : বলাৎকার তাকে আতঙ্কিত করে, তবে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে অক্রিয়শীলতার জন্যে। এভাবে সে দণ্ডিত হয় আন্তরিকতাহীনতায় ও তার সমস্ত ছলচাতুরিতে; সে উন্মুখ থাকে সব রকম নেতিবাচক আবিষ্টতার প্রতি, যা প্রকাশ করে উদ্বেগ ও বাসনার পরস্পরবিপরীত মূল্যের বিদ্যমানতা।

তরুণী যদি নিজেকে এলোমেলো অশোভনভাবে ছুঁতে বা চুমো খেতে দেয়, তাহলে সে এর প্রতিশোধ নেয় তার নাচের সঙ্গীটির মুখের ওপর বা তার সঙ্গীদের সাথে উচ্চহাস্যে ফেটে প'ড়ে। দুটি তরুণীর কথা আমার মনে পড়ছে, রেলগাড়ির কামরায় একরাতে, যাদের একজনের পর আরেকজনকে 'আদর' ক'রে চলছিলো এক ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী, যে স্পষ্টভাবেই উপভোগ করছিলো তার সৌভাগ্য; মেয়ে দুটি

থেকে থেকে উন্মত্ত উচ্চহাস্য ক'রে উঠছিলো, কাঁচা বয়সের বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণ অনুসারে তারা আবর্তিত হচ্ছিলো কাম ও লজ্জার মিশ্রণের মধ্যে।

এ-তরুণ বয়সে মেয়েরা যেমন ব্যবহার করে রূঢ় ভাষা তেমনি হাসে উন্মত্ত হাসি : তাদের কারো কারো আছে এমন শব্দভাণ্ডার, যা তাদের ভাইদের গাল রাঙিয়ে দিতে পারে; সন্দেহ নেই এ-ভাষা তাদের কাছে অনেক কম জঘন্য মনে হয়, কেননা, আধা-অজ্ঞতার মধ্যে তারা যে-সব প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করে, সেগুলো তাদের মনে কোনো যথাযথ ছবি জাগায় না; তাছাড়া এসব ছবি জাগিয়ে তোলা নয়, বরং তাদের অভিপ্রায় এগুলো রোধ করা, কমপক্ষে এগুলো ম্লান করা। বিদ্যালয়ের মেয়েরা একে-অন্যকে বলে যে-সব নোংরা গল্প, সেগুলোর উদ্দেশ্য তাদের যৌনকামনা পরিতৃপ্ত করা নয়, বরং কাম অস্বীকার করা : তারা দেখতে চায় যান্ত্রিক বা দৃশ্যত-শল্যকর্মরূপে এর কৌতুককর দিকটা। তবে উচ্চহাস্যের মতো, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার নিতান্তই একটি যুদ্ধের কৌশল নয় : এটা এক রকমের বয়স্কদের বিরুদ্ধাচরণ, এক ধরনের পবিত্রবস্তুকে অসম্মানকরণ, একটা স্বেচ্ছাকৃত ভ্রষ্ট আচরণ। প্রকৃতি ও সমাজকে অবজ্ঞা ক'রে তরুণী মেয়ে নানা অদ্ভুত উপায়ে তাদের যুদ্ধে আহ্বান করে ও নির্ভীকভাবে তাদের সম্মুখীন হয়। প্রায়ই দেখা যায় খেয়ালি খাদ্যাভ্যাস : সে খায় পেন্সিলের সীসা, গালার চাকতি, কাঠের টুকরো, জ্যান্ত চিংড়ি; সে গেলে ডজন ডজন অ্যাসপিরিন টেবলেট; সে এমনকি খায় মাছি আর মাকড়সা। যা 'ঘেন্না জাগায়', তা প্রায়ই তাকে আকৃষ্ট করে।

এ-মনোভাব আরো স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নিজের অঙ্গ নিজে ছেদনে, যা এ-বয়সে বেশ দেখা যায়। তরুণী মেয়ে ক্ষুর দিয়ে গভীর ক'রে কাটতে পারে তার উরু, নিজের গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁক দিতে পারে, নিজের চামড়া ছুলে ফেলতে পারে; একটা ক্লান্তিকর উদ্যান-পার্টি এড়ানোর জন্যে আমার তরুণ বয়সের এক বান্ধবী একটি ছোটো কুড়াল দিয়ে মারাত্মকভাবে কেটে ফেলেছিলো তার পা, যার জন্যে তাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিলো ছ-সপ্তাহ। এ-ধর্ষ-মর্ষকামী কাজগুলো একই সঙ্গে যৌন অভিজ্ঞতার পূর্বাভাস এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে নিজেকে কঠিন ক'রে তোলে সম্ভাব্য সব অগ্নিপরীক্ষার জন্যে এবং হ্রাস করে সেগুলোর কঠোরতা, এমনকি বিয়ের রাতের অগ্নিপরীক্ষার কঠোরতাও। যখন সে তার স্তনের ওপর রাখে একটা শামুক, গিলে ফেলে এক কৌটো অ্যাসপিরিন টেবলেট, নিজেকে আহত করে, তখন তরুণী অবজ্ঞা ছুঁড়ে দেয় তার ভবিষ্যৎ প্রেমিকের প্রতি– 'আমি নিজের ওপর যা করি তুমি তার থেকে বেশি ঘৃণ্য কিছু করতে পারবে না'। এগুলো হচ্ছে কামদীক্ষার প্রতি গর্বিত ও চাপা ক্রোধযুক্ত ইশারা।

পুরুষের অক্রিয় শিকার হওয়ার জন্যে নির্ধারিত হয়ে এমনকি যন্ত্রণা ও ঘৃণার মধ্যেও মেয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে তার স্বাধীনতার অধিকার। যখন সে নিজেকে কাটে বা ছ্যাঁক দেয়, সে প্রতিবাদ জানায় তার যোনিচ্ছদছিন্নকরণরূপ শূলবিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে : রদ করার মাধ্যমে সে জানায় প্রতিবাদ। সে মর্ষকামী, এতে যে তার আচরণ তাকে যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু সর্বোপরি সে ধর্ষকামী : একটি স্বাধীন কর্তারূপে সে চাবুক মারে, অবজ্ঞা করে, পীড়ন করে এ-পরনির্ভর মাংসকে, এ-মাংস, যা দণ্ডিত হয়েছে

আনুগত্যে, যা সে ঘৃণা করে– তবে নিজেকে সে এর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে না। কেননা সব কিছু সত্ত্বেও, সত্যিকারভাবে সে তার নিয়তি বর্জন করাকে বেছে নেয় না। তার ধর্ষ-মর্ষকামী বিকৃতির আছে একটা প্রাথমিক আন্তরিকতাহীনতা : মেয়েটি যদি নিজেকে তা চর্চা করতে দেয়, তাহলে বোঝায় যে রদ করার মাধ্যমে সে মেনে নিচ্ছে সেই নারীসুলভ ভবিষ্যৎ, যা রক্ষিত তার জন্যে; সে তার মাংসকে ঘৃণাভরে বিকৃত করতো না যদি না সে প্রথমে নিজেকে মাংস হিশেবে স্বীকার ক'রে নিতো।

যে-মিথ্যাচারে দণ্ডিত তরুণী, তা হচ্ছে তাকে ভান করতে হবে যে সে একটি বস্তু, এবং একটি আকর্ষণীয় বস্তু; নিজের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সচেতন থেকেই সে নিজেকে বোধ করতে থাকে একটি অনিশ্চিত, বিচ্ছিন্নকৃত সত্তারূপে। প্রসাধন, নকল চুল, কোমরবন্ধ, এবং 'দৃঢ়ীভূত' বক্ষবন্ধনি সবই মিথ্যাচার। তার মুখটিই হয়ে ওঠে মুখোশ : স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তিগুলোকে চতুরতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ভান করা হয় কৌতূহলজাগানো অক্রিয়তার; হঠাৎ কোনো তরুণীর মুখাবয়ব আবিষ্কারের থেকে কিছুই বেশি বিস্ময়কর নয়, যখন এটি নারীসুলভ ভূমিকাগুলো পালন করে তখন এটি সুপরিচিত; সীমাতিক্রমণতাকে বর্জন ক'রে এটি অনুকরণ করে সীমাবদ্ধতার; চোখ আর অন্তর্ভেদ করে না, প্রতিফলিত করে; দেহটি আর জীবন্ত নয়, এটা প্রতীক্ষা করে; প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ও হাসি হয়ে ওঠে আবেদন। নিরক্ত, বর্জনীয়, তরুণী এখন একটি নিবেদিত ফুল মাত্র, এমন একটি ফল, যাকে ছিঁড়ে নিতে হবে।

অধিকাংশ বয়স্ক মেয়ে, তা তারা কঠোর পরিশ্রমই করুক বা যাপন করুক চপল জীবন, তারা বাড়িতে বদ্ধই থাকুক বা উপভোগ করুক কিছুটা স্বাধীনতা, তাদের জন্যে একটি স্বামী পাওয়া– বা, কমপক্ষে একটি স্থির প্রেমিক পাওয়া– ক্রমশ হয়ে ওঠে খুবই জরুরি ব্যাপার। এটা প্রায়ই নষ্ট করে বান্ধবীদের সাথে সম্পর্ক। 'শ্রেষ্ঠ বান্ধবী' হারিয়ে ফেলে তার সম্মানজনক স্থান। তরুণী তার সঙ্গিনীদের মধ্যে মিত্রের বদলে দেখতে পায় প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি এমন একজনকে চিনতাম, যে ছিলো বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান, সে কবিতা ও সাহিত্যিক প্রবন্ধে নিজের বর্ণনা দিতো 'সুদূরের রাজকুমারী' রূপে; আন্তরিকভাবেই সে ঘোষণা করেছিলো যে শৈশবসাথীদের জন্যে তার মনে কোনো ভালোবাসা নেই : তারা সাদামাটা ও নির্বোধ হ'লে তাদের তার মনে হতো বিরক্তিকর; আর সুন্দর হ'লে সে ভয় পেতো তাদের। একটি পুরুষের জন্যে অধীর ব্যগ্রতা, যাতে প্রায়ই থাকে কৌশলী পরিচালনা, ঠকানোর কৌশল, ও অবমাননা, তা সংকীর্ণ করে তরুণীর দিগন্ত : সে হয়ে ওঠে অহমিকাপরায়ণ ও বিচেতন। আর যদি সুদর্শন রাজকুমার দেখা দিতে দেরি করে, তাহলে মনে জমে ক্লান্তি ও তিক্ততা।

তরুণীর চরিত্র ও আচরণ তার পরিস্থিতিরই ফল : এটা বদলালে তরুণী মেয়েও ধরবে আরেক রূপ। আজকাল তার পক্ষে নিজের ভাগ্যের ভার কোনো পুরুষের হাতে দেয়ার বদলে নিজের হাতে নেয়া সম্ভব হয়ে উঠছে। যদি সে নিয়োজিত থাকে পড়াশুনোয়, খেলাধুলোয়, পেশাগত প্রশিক্ষণে, বা কোনো সামাজিক বা রাজনীতিক ক্রিয়াকর্মে, সে মুক্তি পায় পুরুষভাবনার আবিষ্টতা থেকে, তার ভাবাবেগ ও কামের বিরোধ নিয়ে সে অনেক কম ব্যস্ত থাকে। তবুও, একজন স্বাধীন মানুষ হিশেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে যুবকের থেকে তার অসুবিধা অনেক বেশি। আমি দেখিয়েছি যে

তার পরিবার বা লোকাচার এদিকে তার উদ্যোগের অনুকূল নয়।

অধিকন্তু, যখন সে স্বাধীনতাও বেছে নেয় নিজের জন্যে তখনও তার জীবনে একটি স্থান থাকে পুরুষের জন্যে, প্রেমের জন্যে। সে ভয় পেতে পারে যে যদি সে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করে কোনো কাজে, তাহলে সে হয়তো হারিয়ে ফেলবে তার নারীসুলভ নিয়তি। প্রায়ই এ-বোধটা প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয় না, কিন্তু এটা আছে; এটা দুর্বল ক'রে তোলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে, এটা বেঁধে দেয় সীমানা। যাই হোক, যে-নারী কোনো কাজ করে সে তার পেশাগত সাফল্যকে খাপ খাওয়াতে চায় তার একান্ত নারীসুলভ সিদ্ধির সাথে; এটা শুধু বোঝায় না যে বেশ খানিকটা সময় তাকে দিতে হবে তার রূপের জন্যে, যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে তার প্রাণশক্তিগত আগ্রহগুলো ভেঙে পড়ে নানা ভাগে। তাকে ভাবতে হয় তার দৈহিক রূপ সম্বন্ধে, পুরুষ সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে; সে ততোটুকুই মনোযোগ দেয় পড়াশুনোয়, পেশায় যতোটা না দিলেই চলে না। এটা মানসিক দুর্বলতার, বা মনোযোগের অসামর্থ্যের ব্যাপার নয়, বরং এটা আগ্রহগুলোর মধ্যে এমনভাবে খণ্ডখণ্ড হয়ে যাওয়ার ব্যাপার, যেগুলোর মধ্যে সঙ্গতিবিধান খুবই কঠিন। গ'ড়ে ওঠে একটি দুষ্টচক্র এবং প্রায়ই এটা দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয় যে যখন নারী একটি স্বামী পায় তখন কতো তাড়াতাড়ি সে ছেড়ে দিতে পারে সঙ্গীতচর্চা, পড়াশুনো, পেশা। সব কিছু দল বাঁধে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে, এবং বিয়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্যে তার ওপর এখনো পড়ে বিপুল সামাজিক চাপ। এটাই স্বাভাবিক ব'লে মনে করা হয় যে সে বিশ্বে নিজের জন্যে স্থান সৃষ্টির জন্যে নিজের চেষ্টায় কিছু করবে না বা করবে ভীরুভাবে। যতোদিন না সমাজে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে আর্থিক সাম্য আর যতোদিন লোকাচার স্ত্রী বা রক্ষিতা হিশেবে পুরুষের কাছে থেকে সুযোগসুবিধা নেয়াকেই অনুমোদন করবে নারীর জন্যে, ততোদিন টিকে থাকবে তার অনর্জিত স্বপ্ন এবং ব্যাহত হবে তার নিজের সিদ্ধি।

পরিচ্ছেদ ৩

কামদীক্ষা

এক অর্থে, নারীর কামদীক্ষা, পুরুষের মতোই, শুরু হয় তার আদি শৈশবে। মৌখিক, পায়ুগত, ও কামপ্রত্যঙ্গগত পর্ব থেকে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত একটা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকে। তবে তরুণীর কামের অভিজ্ঞতাগুলো শুধুই তার আগের যৌন কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ নয়; প্রায়ই সেগুলো অপ্রত্যাশিত ও বিসদৃশ; এবং সেগুলোর সব সময়ই থাকে নতুন ঘটনার প্রকৃতি, যা অতীতের সাথে ঘটায় বিচ্ছিন্নতা। যখন সে বাস্তবিকভাবে যেতে থাকে এসব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, তখন তরুণীর সমস্ত সমস্যা লাভ করে তীক্ষ্ণ ও জরুরি প্রতীকরূপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহজেই কেটে যায় এ-সংকট, কিন্তু আছে নানা বিয়োগান্তক উদাহরণ যেগুলোতে পরিস্থিতির সমাধান ঘটে শুধু মৃত্যুতে বা উন্মত্ততায়। সব ক্ষেত্রেই এ-সময়ে তার মধ্যে জাগে যে-প্রতিক্রিয়া, তা দিয়ে তীব্রভাবে প্রভাবিত হয় নারীর ভবিষ্যৎ। নারীর প্রথম কামাভিজ্ঞতার চরম গুরুত্ব সম্পর্কে সব মনোচিকিৎসকই একমত : সেগুলোর প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় নারীর বাকি জীবন ভ'রে।

বিবেচ্য পরিস্থিতিটি– জৈবিক, সামাজিক, ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে– গভীরভাবে ভিন্ন পুরুষ ও নারীর বেলা। পুরুষের জন্যে শৈশব কাম থেকে প্রাপ্তবয়স্কতায় উত্তরণ আপেক্ষিকভাবে সহজ : এতে কামসুখ হয় বস্তু-আশ্রিত, কেননা কামনা নিজের সীমার মধ্যে বাস্তবায়িত না ক'রে চালনা করা হয় আরেকটি ব্যক্তির দিকে। লিঙ্গের দাঁড়ানো হচ্ছে এ-প্রয়োজনের অভিব্যক্তি; শিশ্ন নিয়ে, হাত, মুখ, তার সারা শরীর নিয়ে পুরুষ এগোয় তার সঙ্গিনীর দিকে, তবে সে নিজে থাকে এ-কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে, সব কিছু মিলিয়ে সে থাকে *কর্তা,* এর বিপরীতে থাকে *কর্মগুলো,* যেগুলোকে সে উপলব্ধি করে এবং যে-*করণগুলোকে* সে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে; সে নিজের স্বাধীনতা না হারিয়ে নিজেকে প্রক্ষেপ করে অপরের দিকে; তার কাছে নারীর দেহ একটি শিকার, এবং এটির মাধ্যমে সে প্রবেশাধিকার পায় তার কাম্য গুণাবলিতে, যেমন পায় প্রতিটি বস্তুতে। একথা সত্য যে সে নিজের জন্যে বাস্তবিকভাবে সফল হয় না ওগুলো অধিকার করতে, তবে অন্তত সে ওগুলোকে আলিঙ্গন করে। প্রণয়স্পর্শ, চুমো বোঝায় একটা আংশিক পরীক্ষা; তবে এ-পরীক্ষা নিজেই এক ধরনের উদ্দীপক ও আনন্দ। সঙ্গমের কাজটি সম্পূর্ণতা লাভ করে কামপুলকে, যা সঙ্গমের স্বাভাবিক পরিণতি। সঙ্গমের আছে এক নির্দিষ্ট জৈবিক পরিণতি ও লক্ষ্য; বীর্যপাতের ফলে পুরুষ মুক্তি পায় কিছু অস্বস্তিকর নিঃসরণ থেকে; কামোত্তেজনার পর সে লাভ করে সম্পূর্ণ উপশম, যাতে সব সময়ই থাকে চরম সুখ। একথা সত্য যে এ-সুখই একমাত্র

লক্ষ্যবস্তু নয়; প্রায়ই এর পর থাকে হতাশা : প্রয়োজনটা মিটে গেছে, যদিও পুরুষটি সব দিকে তৃপ্তি পায় নি। যা-ই ঘটুক না কেনো, একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং পুরুষটির দেহ টিকিয়ে রেখেছে তার সংহতি : প্রজাতির প্রতি তার দায়িত্ব পালনের সাথে মিলেছে তার ব্যক্তিগত সুখ।

নারীর কাম আরো অনেক বেশি জটিল, এবং এটা প্রতিফলিত করে নারীর পরিস্থিতির জটিলতা। আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে প্রজাতির শক্তিশালী প্রবর্তনাগুলো সুসমঞ্জস করার বদলে নারী হচ্ছে তার প্রজাতির শিকার, এবং প্রজাতির স্বার্থগুলোকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়া হয়েছে ব্যক্তি হিশেবে নারীর স্বার্থগুলো থেকে। এ-বিপরীতার্থকতা চূড়ান্তে পৌঁছে মনুষ্য নারীর মধ্যে; এর অভিব্যক্তি ঘটে, একদিকে, দুটি প্রত্যঙ্গের : ভগাঙ্কুর ও যোনির বৈপরীত্যের মধ্যে। শৈশবে আগেরটি হচ্ছে নারীর কামানুভূতির কেন্দ্র। যদিও কিছু মনোচিকিৎসক মনে করেন যে কিছু কিছু ছোটো মেয়েও যোনীয় স্পর্শকাতরতা অনুভব করে, তবে এটা বিতর্কের বিষয়, তা যা-ই হোক, এর গুরুত্ব নিতান্তই গৌণ। ভগাঙ্কুরীয় সংশ্রয় অপরিবর্তিত থাকে প্রাপ্তবয়স্ক নারীতে, এবং নারী সারাজীবন রক্ষা করে তার এ-কামস্বাধীনতা; ভগাঙ্কুরীয় পুলক, পুরুষের পুলকের মতোই, এক ধরনের স্ফীতিহ্রাসকরণ, যা অর্জিত হয় কিছুটা যান্ত্রিকভাবে; তবে এটা স্বাভাবিক সঙ্গমের সাথে নিতান্তই পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত, এবং সন্তান জন্মদানে এর কোনো ভূমিকা নেই।

নারীকে বিদ্ধ ও উর্বর করা হয় যোনি দিয়ে, আর পুরুষের মধ্যবর্তিতায়ই যোনি হয়ে ওঠে একটি কামকেন্দ্র, এবং এটা সব সময়ই এক ধরনের বলাৎকার। আগের দিনে একটা বাস্তবিক বা ছদ্মধর্ষণের মাধ্যমে শিশুকে ছিনিয়ে নেয়া হতো তার শৈশবের জগত থেকে এবং ছুঁড়ে দেয়া হতো স্ত্রীর জীবনে; একটা হিংস্র কাজের মধ্য দিয়েই বালিকাকে পরিণত করা হয় নারীতে : আমরা আজো বলি বালিকার কুমারীত্ব নেয়ার কথা, তার ফুল 'ছিঁড়ে নেয়া'র কথা, বা তার কুমারীত্ব 'ভাঙা'র কথা। এ-সতীত্বমোচন কোনো ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলে ধীরেধীরে অর্জিত পরিণতি নয়, এটা হচ্ছে অতীতের সাথে হঠাৎ সম্পর্কচ্ছেদন, একটি নতুন চক্রের সূচনা। এরপর থেকে কামসুখ লাভ ঘটে যোনির দেয়ালের সংকোচনের ফলে; এ-সংকোচন কি কোনো যথাযথ ও নির্দিষ্ট কামপুলক ঘটায়? এটা এখনো বিতর্কিত বিষয়। শরীরসংস্থানগত উপাত্তগুলো অস্পষ্ট। কিন্সে রিপোর্টে ব্যাপারটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

> বিপুল পরিমাণে শরীরসংস্থানগত ও নিদানিক প্রমাণ রয়েছে যে যোনির অভ্যন্তর ভাগের বেশি অংশই স্নায়ুহীন। যোনির অভ্যন্তর ভাগে বেশ পরিমাণে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব অনুভূতিনাশক ছাড়াই। যোনির ভেতরে শুধু অগ্রদেয়ালের এক এলাকায়, ভগাঙ্কুরের মূলের সন্নিকটস্থলে স্নায়ু দেখা যায়।

তবে, ওই স্নায়ুরহিত অঞ্চলে উদ্দীপনার অতিরিক্ত,

> নারী যোনিতে কোনো বস্তুর প্রবেশ টের পেতে পারে, বিশেষ ক'রে যদি যোনির পেশিগুলো কষানো হয়; তবে এতে যে-তৃপ্তি পাওয়া যায়, তা সম্ভবত যতোখানি যৌনস্নায়ুর উদ্দীপনার সঙ্গে জড়িত তার থেকে বেশি সম্পর্কিত পেশির আততির সঙ্গে

তবু কোনো সন্দেহ নেই যে যোনীয় সুখের অস্তিত্ব আছে; এবং যোনীয় হস্তমৈথুন, সেদিক থেকে দেখতে গেলে– প্রাপ্তবয়স্ক নারীতে– কিন্সে যা নির্দেশ করেছেন, তার

থেকে অনেক বেশি ঘটে। তবে যা নিশ্চিত, তা হচ্ছে যোনীয় প্রতিক্রিয়া খুবই জটিল জিনিশ, যাকে বলা যেতে পারে মনোশারীরতাত্ত্বিক, কেননা এতে শুধু সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রই জড়িয়ে পড়ে না, এটা নির্ভর করে ব্যক্তিটির সমগ্র অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির ওপরও : এটা নারীর কাছে দাবি করে তার সর্বস্ব।

প্রথম সঙ্গমের ফলে সূচিত হয় যে-নতুন কামচক্র, সেটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে দরকার পড়ে স্নায়ুতন্ত্রে এক ধরনের মন্তাজ বা পুনর্বিন্যাস, এমন একটি বিন্যাস যার রূপরেখা আগে বিশদ করা হয় নি, যার ভেতরে ভগাঙ্কুরীয় দেহতন্ত্রও অন্তর্ভুক্ত; এটা ঘটতে কিছুটা সময় নেয়, এবং কিছু ক্ষেত্রে এটা কখনোই সফলভাবে সাধিত হয় না। এটা চমকপ্রদ যে নারীর ভেতরে আছে দুটি সংশ্রয়, এগুলোর একটি স্থায়িত্ব দেয় কৈশোরিক স্বাধীনতাকে, আরেকটি নারীকে অর্পণ করে পুরুষ ও সন্তানধারণের কাছে। স্বাভাবিক যৌনকর্ম তাই নারীকে ক'রে তোলে পুরুষ ও তার প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল। পুরুষই– যেমন ঘটে অধিকাংশ প্রাণীতে– নেয় আক্রমণাত্মক ভূমিকা, নারী ধরা দেয় তার আলিঙ্গনে। সাধারণত, নারীকে যে-কোনো সময়ই পুরুষ সঙ্গমের জন্যে ব্যবহার করতে পারে, সেখানে পুরুষ নারীর সাথে শুধু তখনই সঙ্গম করতে পারে যখন তার লিঙ্গ থাকে দাঁড়ানো অবস্থায়। শুধু যোনিসংকোচনের বেলা ছাড়া, যখন নারী সতীচ্ছদের দ্বারা রুদ্ধ থাকার থেকেও দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ থাকে, নারীর অনিচ্ছাকে পরাভূত করা যায়; এবং এমনকি যোনিসংকোচনের সময়ও এমন কিছু উপায় আছে, যা দিয়ে পুরুষ নিজের পেশিশক্তির বলে নারীর শরীরের ওপর নিজের কামের উপশম ঘটাতে পারে। যেহেতু সে বস্তু, তাই তার দিক থেকে কোনো জাড্য তার স্বাভাবিক ভূমিকাকে বিশেষ প্রভাবিত করে না : বহু পুরুষ ভাবেই না যে তারা যে-নারীদের সাথে শোয় তারা সঙ্গম করতে চায়, না কি নিতান্তই নিজেদের সঙ্গমে সমর্পণ করে। এমনকি শবের সাথেও সঙ্গম সম্ভব। পুরুষের সম্মতি ছাড়া সঙ্গম হ'তে পারে না, এবং পুরুষের পরিতৃপ্তিই এর স্বাভাবিক সমাপ্তি। নারী কোনো সুখ না পেয়েও গর্ভবতী হ'তে পারে। তবু তার পক্ষে গর্ভবতী হওয়া নির্দেশ করে কামপ্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি; এর বিপরীতে, প্রজাতির প্রতি তার দায়িত্ব পালন শুরু হয় এখানেই : এটা ধীরেধীরে ও যন্ত্রণাকরভাবে পূর্ণতা লাভ করে গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব, ও স্তন্যদানের মধ্যে।

পুরুষ ও নারীতে 'দেহসংস্থানগত নিয়তি' তাই সুগভীরভাবে ভিন্ন, এবং তাদের নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতেও কম ভিন্ন নয়। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা নারীকে উৎসর্গ করেছে সতীত্বের কাছে; এবং কম-বেশি প্রকাশ্যেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে পুরুষের কামস্বাধীনতা, আর নারীকে আবদ্ধ করা হয়েছে বিবাহে। যৌনকর্মকে যদিও বিধানের দ্বারা পবিত্র ব'লে পৃথক ক'রে রাখা হয় নি, তবু একটি সংস্কার বলে এটা নারীর জন্যে একটি দোষ, একটি পতন, একটি পরাজয়, একটি দুর্বলতা; নারীকে রক্ষা করতে হয় তার সতীত্ব, তার সম্মান; যদি সে 'আত্মসমর্পণ করে', যদি সে 'পতিত হয়', তাহলে তাকে তিরষ্কার করা হয়; তার সম্ভোগকারীকে কিছুটা দোষী করা হ'লেও তাতে মিশে থাকে প্রশস্তিবোধ। আদিম কাল থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত সব সময়ই সঙ্গমকে গণ্য করা হয়েছে একটি 'সেবাদান' ব'লে, যার জন্যে উপহার দিয়ে বা তার ভরণপোষণের অঙ্গীকার ক'রে পুরুষ ধন্যবাদ জানায় নারীকে; কিন্তু সেবাদান হচ্ছে নিজেকে একটি

প্রভুর কাছে দান করা; এ-সম্পর্কের মধ্যে কোনো পারস্পরিকতা নেই। বিয়ের প্রকৃতি, এবং তার সাথে বেশ্যাদের অস্তিত্ব থাকা, এর প্রমাণ : নারী *নিজেকে দান* করে, পুরুষ তাকে টাকা দেয় এবং তাকে ভোগ করে। কিছুই পুরুষকে প্রভুর ভূমিকা নিতে, নিকৃষ্ট প্রাণীদের ভোগ করতে নিষেধ করে না। দাসীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক মেনে নেয়া হয়েছে সব সময়ই, আর সেখানে যদি কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী দেহ দান করে গাড়ির চালককে বা বাগানের মালিকে, তাহলে সে হয় শ্রেণীচ্যুত। লোকাচার সব সময়ই বর্বরভাবে জাতিবিদ্বেষী আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের পুরুষদের অনুমতি দিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গিনীদের সাথে শুতে, গৃহযুদ্ধের আগে যেমন তেমনি আজো, এবং তারা প্রভুসুলভ স্পর্ধার সাথে এ-অধিকারটি ভোগ করে; কিন্তু দাসপ্রথার কালে যদি কোনো শ্বেতাঙ্গিনী দেহসম্পর্ক করতো কোনো কৃষ্ণকায় পুরুষের সাথে, তাহলে তাকে দেয়া হতো মৃত্যুদণ্ড, এবং আজ সম্ভবত তাকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলোনো হবে।

একটি নারীর সাথে সে সঙ্গম করেছে, একথা বলার জন্যে পুরুষ বলে যে সে নারীটিকে 'দখল' করেছে, বা সে তাকে 'পেয়েছে'; যে-নারী কোনো পুরুষকে জানে নি গ্রিকরা তাকে বলতো অপরাভূতা কুমারী; রোমানরা মেসালিনাকে বলতো 'অপরাজিতা' কেননা তার কোনো প্রেমিকই তাকে পুরো সুখ দেয় নি। তাই প্রেমিকের কাছে প্রণয়কর্ম হচ্ছে জয়, বিজয়। পুরুষদের কামবিষয়ক শব্দসম্ভার নেয়া হয়েছে সামরিক পরিভাষা থেকে : প্রেমিকের আছে সৈনিকের তেজ, তার লিঙ্গ ধনুকের মতো টানটান, বীর্যপাত হচ্ছে 'গুলি ছোঁড়া'; সে বলে আক্রমণ, হামলা, বিজয়ের কথা। তার যৌন উত্তেজনায় আছে বীরত্বের কিছুটা স্বাদগন্ধ। 'প্রজননকর্মে,' *ল্য রাপর দুরিএ*-তে বেন্দা লিখেছেন :

> একজন মানুষ অধিকার করে আরেকজন মানুষকে, এটা একদিকে আরোপ করে একজন বিজয়ীর ধারণা, অন্যদিকে কোনো কিছু জয় করার ধারণা। বস্তুত, তাদের প্রেমের সম্পর্কের কথা বলার সময় চরম সভ্যরা বলে জয়, আক্রমণ, হামলা, অবরোধ, এবং প্রতিরোধ, পরাজয়, আত্মসমর্পণের কথা, তারা স্পষ্টভাবেই প্রেমের ধারণাটিকে রূপায়িত করে যুদ্ধের ধারণার আদলে। এ-কর্মটিতে একজন দূষিত করে আরেকজনকে, এবং এতে দূষণকারীকে ভূষিত করা হয় কিছুটা গৌরবে, এবং দূষিতকে কিছুটা অবমাননায়, এমনকি যখন সে সম্মতি দেয়।

এ-ভাষাশৈলি সূচনা করে একটি নতুন কিংবদন্তির : যথা, পুরুষটি নারীটির ওপর চাপিয়ে দেয় একটা কলুষ। বাস্তবিকপক্ষে, বীর্য বিষ্ঠাপ্রকৃতির নয়; 'স্বপ্নদোষ'-এর কথা বলা হয়, কেননা এতে স্বাভাবিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; কিন্তু কফি যদিও দাগ ফেলে হাল্কা-রঙের পোশাকে, তবু একে কেউ ময়লা বলে না, বলে না যে পাকস্থলিকে এটা ময়লা করবে। বরং, উল্টোভাবে, মনে করা হয় যে নারীই অশুচি, কেননা তার থেকে বেরোয় 'নোংরা স্রাব' এবং সে দূষিত করে পুরুষকে। যে কলুষিত করে, এমন একজন হওয়া একটা অত্যন্ত সন্দেহজনক শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ তার বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত অবস্থান লাভ করে তার জৈবিকভাবে আক্রমণাত্মক ভূমিকার সঙ্গে নেতা বা প্রভু হিশেবে তার সামাজিক কর্মকাণ্ডকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার মধ্য দিয়ে; তার এ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্যেই শারীরবৃত্তিক পার্থক্যগুলো লাভ করে সব তাৎপর্য। বিশ্বে পুরুষ যেহেতু শাসনকর্তা, সে মনে করে যে তার কামনাগুলোর হিংস্রতা হচ্ছে

তার সার্বভৌমত্বের একটি লক্ষণ; অতিশয় কামশক্তিসম্পন্ন পুরুষকে মনে করা হয় শক্তিশালী, বীর্যবান– এ-অভিধাগুলো নির্দেশ করে সক্রিয়তা ও সীমাতিক্রমণতা। অন্য দিকে, নারী যেহেতু একটি বস্তু, তাই তাকে বর্ণনা করা হয় *উষ্ণ* বা *শীতল* ব'লে, এর অর্থ হচ্ছে সে কখনো অক্রিয় গুণাবলি ছাড়া আর কোনো গুণ প্রকাশ করবে না।

যে-পরিবেশে, যে-আবহাওয়ায় জেগে ওঠে নারীর কাম, তা তাই বেশ ভিন্ন তার থেকে, যাতে পরিবৃত থাকে বয়ঃসন্ধির পুরুষ। তাছাড়া, নারী যখন প্রথমবার মুখোমুখি হয় পুরুষের, তখন নারীর কামের মনোভাব থাকে খুবই জটিল। অনেক সময় যে মনে করা হয় কুমারী মেয়ে কামবাসনার সাথে অপরিচিত এবং তাই পুরুষকে জাগাতে হবে তার কামাবেগ, তা ঠিক নয়। এ-কিংবদন্তিটি আবার প্রকাশ ক'রে ফেলে পুরুষের আধিপত্য করার নৈপুণ্যের সত্য, যার মধ্যে পুরুষ প্রকাশ করে যে নারী কোনো উপায়েই, এমনকি তার জন্যে আকুলতার মধ্যেও, স্বাধীন হবে না। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে বিপরীত লিঙ্গের সাথে সংস্পর্শই জাগায় প্রথম কামনা, এবং উল্টোভাবে কোনো কামনাপরায়ণ হাতের ছোঁয়া পাওয়ার অনেক আগে থেকেই অধিকাংশ তরুণী স্পর্শাদরের জন্যে বোধ করে উত্তেজিতভাবে আকুলতা।

সত্য হচ্ছে কুমারীর কামনা কোনো যথাযথ প্রয়োজন হিশেবে প্রকাশিত হয় না : কুমারী ঠিকমতো জানে না সে কী চায়। শৈশবের আক্রমণাত্মক কাম আজো টিকে আছে তার মধ্যে, তার প্রথম প্রণোদনাগুলো ছিলো পরিগ্রাহী, এবং সে এখনো চায় জড়িয়ে ধরতে, অধিকার করতে। কাম যেহেতু কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়, এর ভেতরে চলতে থাকে প্রথম বয়সের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বপ্ন ও আনন্দগুলো; উভয় লিঙ্গের শিশুকিশোররাই পছন্দ করে মসৃণ, মাখনের মতো, সাটিনের মতো, রসালো, নমনীয় স্থিতিস্থাপক জিনিশ : ভেঙে না প'ড়ে বা বদলে না গিয়ে চাপে যা নমিত হয়, চোখের সামনে বা আঙুলে ফাঁক দিয়ে যা গ'লে পড়ে। পুরুষের মতো নারীও সুখ পায় বালিয়াড়ির কোমল উষ্ণতায়, যা কখনো কখনো দেখায় স্তনের মতো, সুখ পায় রেশমের কোমল স্পর্শে, তুলতুলে পালকভরা লেপের কমনীয়তায়, ফুল বা ফলের ওপরের শ্বেতচূর্ণে; তরুণী সাধারণত ভালোবাসে অনুজ্জ্বল প্যাস্টল রঙ, টুল ও মসলিনের অস্বচ্ছতা। সে পছন্দ করে না কর্কশ বস্ত্র, কাঁকর, শিলাকর্ম, তিক্ত স্বাদ, এসিডের গন্ধ; তার ভাইয়ের মতোই যা সে প্রথম আদর করেছে, তা হচ্ছে তার মায়ের শরীর। তার আত্মরতির মধ্যে, তার সমকামী অভিজ্ঞতার ভেতরে, স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক, সে কাজ করে কর্তারূপে এবং অধিকার করতে চায় কোনো নারীর দেহ। সে যখন মুখোমুখি হয় পুরুষের, তার হাতে ও তার ঠোঁটে সে কামনা বোধ করে একটি শিকারকে সক্রিয়ভাবে স্পর্শ করার। কিন্তু স্থূল পুরুষ, যার পেশি শক্ত, যার ত্বক প্রায়ই কর্কশ ও লোমশ, যার গন্ধ কটু, যার গঠন মোটা, তার কাছে কাম্য মনে হয় না, তার মনে আবেদন জাগায় না; তাকে এমনকি ঘৃণ্য মনে হয়।

যদি পরিগ্রাহী, অধিকারপ্রবণ, প্রবণতা বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে টিকে থাকে নারীর মধ্যে, তাহলে রেনি ভিভিয়েঁর মতো সে এগোবে সমকামের দিকে। বা সে শুধু সে-পুরুষদেরই বেছে নেবে, যাদের সে নারীদের মতো ব্যবহার করতে পারে : এটাই ঘটে রাশিলদের *মশিয় ভিনাস*-এর নায়িকার ক্ষেত্রে, যে নিজের জন্যে কেনে এক

যুবককে; সে সংরক্তভাবে আদর করে যুবকটিকে, কিন্তু তার সতীত্বমোচন করতে দেয় না যুবকটিকে। অনেক নারী আছে, যারা তেরো-চোদ্দো বছরের বালকদের, এমনকি শিশুদের, গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে পছন্দ করে, এবং এড়িয়ে চলে বয়স্ক পুরুষদের। তবে আমরা দেখেছি যে অধিকাংশ নারীর মধ্যেই শৈশব থেকেই বিকশিত হয় অক্রিয় কাম : নারী পছন্দ করে আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'তে, স্পর্শাদর পেতে, এবং বিশেষ ক'রে বয়ঃসন্ধির পর সে মাংস হ'তে চায় পুরুষের বাহুবন্ধনে; কর্তার ভূমিকা সাধারণত দেয়া হয় পুরুষকে; নারী তা জানে; তাকে বারবার বলা হয়েছে 'পুরুষের সুদর্শন হওয়ার কোনো দরকার নেই'; পুরুষের মধ্যে বস্তুর জড় গুণাবলি খুঁজতে হবে না, খুঁজতে হবে শক্তি ও পৌরুষ।

এভাবে নারী বিভক্ত হয়ে পড়ে নিজের বিরুদ্ধে; সে কামনা করে দৃঢ় আলিঙ্গন, যা তাকে পরিণত করবে শিউরে-ওঠা বস্তুতে, তবে পরুষতা ও বল এমন অসহ্য নিরোধক, যা ক্ষুণ্ন করে নারীকে। তার ত্বক ও তার হাত উভয় স্থানেই থাকে তার অনুভূতি, এবং এক এলাকার চাহিদা আংশিকভাবে অন্যটির চাহিদার বিরোধী। যতোটা সম্ভব সে আপোষ করে; সে একটি পৌরুষসম্পন্ন পুরুষের কাছে নিজেকে দান করে, তবে কাম্য বস্তু হওয়ার জন্যে পুরুষটিকে হ'তে হয় তরুণ ও আকর্ষণীয়; একটি সুদর্শন যুবকের মধ্যে সে পেতে পারে তার কাম্য সব আবেদন। পরমগীতে স্ত্রী ও স্বামীর আনন্দভোগের মধ্যে একটা প্রতিসাম্য আছে : নারীটি পুরুষটির মধ্যে তাই পায় পুরুষটি যা খোঁজে নারীটির মধ্যে : পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল, মূল্যবান রত্নরাজি, স্রোতস্বিনীগুলো, নক্ষত্ররাজি। কিন্তু নারীটির এসব সম্পদ অধিকারের উপায় নেই; তার দেহসংস্থান তাকে বাধ্য করে খোজার মতো এলোমেলো ও নপুংসক থাকতে : একটি প্রত্যঙ্গ, যাতে মূর্ত হয়ে ওঠে অধিকারের ইচ্ছে, সেটির অভাবে নিষ্ফল হয়ে ওঠে অধিকারের ইচ্ছে। যাই হোক না কেনো, পুরুষ অক্রিয় ভূমিকা নিতে অস্বীকার করে। প্রায়ই পরিস্থিতি এমন হয় যে তরুণী ধরা দেয় এমন কোনো পুরুষের কাছে, যার আদর তাকে আলোড়িত করে, যদিও সে পুরুষটির দিকে তাকিয়ে বা তাকে স্পর্শাদর ক'রে কোনো সুখ পায় না। নারীকে কামসুখ পেতে হয় তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বতস্ফূর্ত উদ্বেলনের বিপক্ষে, আর সেখানে ছোঁয়া আর দেখার আনন্দের মধ্যেই পুরুষ পায় কামসুখ।

তবে এমনকি অক্রিয় কামের উপাদানগুলোও দ্ব্যর্থবোধক। *স্পর্শের* থেকে কিছুই বেশি দ্ব্যর্থবোধক নয়। বহু পুরুষ, যারা ঘৃণা না ক'রেই নাড়াচাড়া করে সব ধরনের জিনিশ, তারাও উদ্ভিদ ও পশুর সংস্পর্শে আসতে ঘৃণা করে। নারীর শরীর রেশম বা মখমলের ছোঁয়ায় সুখে কেঁপে উঠতে পারে বা পারে ঘেন্নায় থরথর ক'রে উঠতে : মনে পড়ছে আমার তরুণ বয়সের এক বান্ধবীর কথা, শুধু একটা পিচ দেখেই যার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। তার বিসঙ্গত পরিস্থিতির জন্যে এ-দ্ব্যর্থবোধ টিকে থাকে কুমারীর ভেতরে : যে-প্রত্যঙ্গে তার রূপান্তর ঘটবে, সেটি রুদ্ধ। যেখানে সঙ্গম ঘটবে, শুধু সেখানটিতে ছাড়া তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তার মাংসের অস্পষ্ট ও উত্তপ্ত ডাক। কুমারীর সক্রিয় কামপরিতৃপ্তির জন্যে কোনো প্রত্যঙ্গ নেই; এবং তার কোনো বাস্তবিক অভিজ্ঞতা নেই সেটির সাথে, যেটি তাকে ক'রে তোলে অক্রিয়।

তবু, এ-অক্রিয়তা শুধু জাড্য নয়। নারীকে কামোত্তেজিত হওয়ার জন্যে কিছু সদর্থক প্রপঞ্চ উপস্থিত থাকা দরকার : উত্তেজিত হ'তে হবে তার কিছু কামস্পর্শাতুর এলাকা, স্ফীত হয়ে পারে খাড়া হ'তে পারে এমন কিছু তন্তুকে উত্তেজিত হ'তে হবে, ঘটতে হবে নিঃসরণ, বাড়তে হবে দেহতাপ, এবং দ্রুততর হ'তে হবে নাড়ির স্পন্দন ও নিশ্বাস। কামনা ও কামসুখ পুরুষের মতোই নারীর মধ্যেও চায় যে এতে ব্যয় হবে কিছুটা জীবনশক্তি; যদিও স্বভাবে গ্রহণধর্মী, তবু নারীর কামক্ষুধা এক অর্থে সক্রিয়, এটা প্রকাশ পায় স্নায়ুতন্ত্রের ও পেশির উত্তেজনায়। উদাসীন ও হতোদ্যম নারীরা সব সময়ই শীতল।

যদি জীবনশক্তি ব্যয় হয়ে যায় খেলাধুলোর মতো স্বেচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ডে, তাহলে তা কামের দিকে চালিত হয় না : স্ক্যান্ডিনেভীয় নারীরা স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী, এবং শীতল। তারাই অতিশয় ব্যগ্র নারী, যারা অবসন্নতাকে মিশ্রিত করে *অগ্নির* সাথে, ইতালি ও স্পেনের নারীদের মতো– অর্থাৎ, যাদের ব্যগ্র জীবনশক্তি মুক্তিলাভ করে শুধু দৈহিকভাবে। নিজেকে বস্তু *ক'রে তোলা*, নিজেকে *অক্রিয় ক'রে তোলা* খুবই ভিন্ন জিনিশ অক্রিয় বস্তু *হওয়ার* থেকে : প্রেমে পড়া নারী নিদ্রিতও নয় মৃতও নয়; তার ভেতরে ধেয়ে চলে এমন তরঙ্গ, যার ঘটতে থাকে নিরন্তর ভাটা ও জোয়ার : ভাটা তৈরি করে এমন যাদুমন্ত্র, যা সজীব রাখে কামনাকে। তবে উৎসাহ এবং প্রবৃত্তির কাছে সমর্পিত বেপরোয়া স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করা সহজ। পুরুষের কামনা হচ্ছে উত্তেজনা; এটা ছড়িয়ে পড়তে পারে সারা শরীর জুড়ে, যার স্নায়ু ও পেশিগুলো উত্তেজিত : যে-সব আসন ও অঙ্গসঞ্চালন তার দেহটিকে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উদ্যোগী ক'রে তোলে, সেগুলো এর বিপক্ষে চলে না, বরং প্রায়ই বাড়িয়ে চলে এগুলো। এর বিপরীতে, সমস্ত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত উদ্যোগ নারীর দেহকে বাধা দেয় 'অধিগত হওয়া' থেকে; এজন্যেই নারী স্বতস্ফূর্তভাবে বাধা দেয় সে-ধরনের সঙ্গমে, যেগুলোতে তাকে নিতে হয় উদ্যোগ, হ'তে হয় উত্তেজিত; আসনের আকস্মিক এবং খুব বেশি বদল, সচেতনভাবে কিছু করার জন্যে কোনো আহ্বান – ভাষায়ই হোক বা আচরণেই হোক– নষ্ট ক'রে দেয় যাদুমন্ত্র। বেপরোয়া আকুলতার চাপে সৃষ্টি হ'তে পারে দাহ, সংকোচন, কাঠিন্য : কিছু নারী খামচায় বা কামড়ায়, তাদের দেহ হয়ে ওঠে শক্ত এবং ভ'রে ওঠে অনাভ্যাসিক শক্তিতে; তবে এ-প্রপঞ্চ শুধু তখনই দেখা দেয় যখন পৌঁছোনো হয় কোনো আকস্মিক বিস্ফোরণের অবস্থায়, এবং এতে তখনই পৌঁছোনো হয় যখন– যেমন শারীরিক তেমনি নৈতিক– কোনো সংকোচের অনুপস্থিতির ফলে জীবনের সমস্ত শক্তি জড়ো হয় যৌনকর্মে। এটা বোঝায় যে তরুণীর জন্যে শুধু *নিজেকে দান করাই* যথেষ্ট নয়; বশীভূত, নিস্তেজ, অন্য কোথাও প'ড়ে আছে তার মন, এমন অবস্থায় সে নিজেকেও তৃপ্ত করে না সঙ্গীটিকেও করে না। একটি রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের জন্যে তার দরকার সক্রিয় অংশগ্রহণ, কিন্তু সেটা সদর্থকভাবে তার কুমারীশরীরও চায় না তার মনও চায় না, কেননা এটি পরিবৃত হয়ে আছে ট্যাবু, নিষেধ, সংস্কার, ও অতিরিক্ত দাবি দ্বারা।

দেহসংস্থানগতভাবে ও প্রথাগতভাবে দীক্ষাদাতার ভূমিকা নেয়া যুবকের কাজ। একথা সত্য যে কুমার যুবকের প্রথম দয়িতাও তাকে দেয় দীক্ষা; তা সত্ত্বেও তার

আছে কামগত স্বাধীনতা, যা স্পষ্টভাবে দেখা দেয় তার লিঙ্গের দাঁড়ানোতে; তার দয়িতা বাস্তবে শুধু যোগায় তার কাম্য বস্তুটি : একটি নারীদেহ। তরুণীর দরকার হয় একটি পুরুষ, যে তার দেহ প্রকাশ করবে তার কাছে : তরুণী এর থেকেও অনেক গভীরভাবে নির্ভরশীল। তার আদি অভিজ্ঞতাগুলো থেকেই পুরুষ সাধারণত সক্রিয়, নিষ্পত্তিকারক। প্রেমিক বা স্বামী যে-ই হোক, সে-ই নারীকে নিয়ে যায় বিছানায়, যেখানে নারীর কাজ শুধু নিজেকে দান করা এবং পুরুষের কথামতো কাজ করা। যদিও সে মানসিকভাবে এ-আধিপত্য মেনে নেয়, তবু যখন বাস্তবিকভাবেই আসে আত্মসমর্পণের মুহূর্ত, তখন সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

প্রথমত, সে পরিহার করে সে-স্থিরদৃষ্টি, যা তাকে ঢেকে ফেলতে পারে। তার শালীনতাবোধ এক আংশিকভাবে অগভীর অর্জন, তবে এরও শেকড় গভীর। পুরুষ ও নারী সবাই তাদের মাংস নিয়ে লজ্জিত। অনেক পুরুষ আছে যারা বলে যে শিশ্নের দাঁড়ানো অবস্থায় ছাড়া তারা কোনো নারীর সামনে নগ্ন হওয়া সহ্য করতে পারে না; সত্যিই দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে এ-মাংস হয়ে ওঠে সক্রিয়তা, বীর্যশীলতা, যৌনাঙ্গটি আর জড় বস্তু থাকে না, বরং হাত বা মুখের মতো হয়ে ওঠে কর্তার এক কর্তৃত্বব্যঞ্জক প্রকাশ। শালীনতাবোধ কেনো নারীদের থেকে অনেক কম বিহ্বল করে যুবকদের, এটা তার অন্যতম কারণ; তাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকাটির জন্যে তাদের দিকে কেউ স্থিরদৃষ্টিতে থাকায় না; এবং তাকালেও, কেউ তাদের বিচার করছে এ-ভয় তাদের বিশেষ থাকে না, কেননা তাদের দয়িতারা তাদের কাছে জড় গুণ কামনা করে না : তাদের গূঢ়েষাগুলো বরং নির্ভর করে তাদের আশ্লেষের ক্ষমতা এবং তাদের প্রমোদ দেয়ার দক্ষতার ওপর; অন্তত তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে, সংঘর্ষে জয়লাভের চেষ্টা করতে পারে। নারী ইচ্ছে করলেই তার মাংসকে বদলাতে পারে না : যখন সে আর এটিকে গোপন করে না, তখন সে বিনা প্রতিরোধে এটি সমর্পণ করে; এমনকি সে যদি স্পর্শাদরের জন্যে ব্যাকুলতাও বোধ করে, তবুও কেউ তাকে দেখছে ও স্পর্শ করছে, এ-ভাবনা তার মনে জাগিয়ে তোলে ঘৃণাভীতির শিহরণ; বিশেষ ক'রে তার স্তনযুগল ও পাছা যেহেতু বিশেষভাবে মাংসল এলাকা; অনেক বয়স্ক নারী পোশাকপরা অবস্থায়ও তাদের কেউ পেছন থেকে দেখছে, এটা ঘৃণা করে; এবং এ থেকেই ধারণা করা সম্ভব প্রেমে নবদীক্ষিত কোনো তরুণীকে কতোটা বাধা পেরোতে হয় তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাতে দিতে। সন্দেহ নেই একজন ফ্রাইনের কোনো ভয় নেই পুরুষের স্থিরদৃষ্টির সামনে; সে নিজেকে নগ্ন করে উদ্ধত গর্বে– সে প'রে আছে তার সৌন্দর্য। সে ফ্রাইনের সমতুল্য হ'লেও তরুণী মেয়ে কখনো এ-সম্পর্কে নিশ্চয়তা বোধ করে না; সে তার দেহ নিয়ে উদ্ধত অহমিকা পোষণ করতে পারে না যদি না পুরুষের অনুমোদন দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে তার যৌবনের অহমিকাকে। এবং এটাই তাকে ভ'রে দেয় ভয়ে; তার প্রেমিক স্থিরদৃষ্টির থেকেও অনেক বেশি দুর্ধর্ষ : সে একজন বিচারক। তার প্রেমিক তার কাছে তাকে প্রকাশ করবে সত্যিকারভাবে; যদিও তারা সংরক্তভাবে মোহিত থাকে তাদের প্রতিফলন দিয়ে, তবু প্রতিটি মেয়ে নিজের সম্বন্ধে পুরুষের রায়ের ব্যাপারে থাকে অনিশ্চিত; তাই সে চায় আলো নেভে যাওয়া, লুকোতে চায় বিছানার চাদরের নিচে। যখন সে আয়নায় দেখে প্রশংসা করে নিজের, তখন সে

শুধু স্বপ্ন দেখছে নিজেকে, স্বপ্ন দেখছে তার নিজেকে কেমন দেখাবে পুরুষের চোখে; এখন এসে উপস্থিত হয়েছে সে-চোখ; প্রতারণা অসম্ভব, লড়াই অসম্ভব; সিদ্ধান্ত নেবে একটি রহস্যপূর্ণ স্বাধীন সত্তা– এবং কোনো পুনর্বিচার নেই। অনেক তরুণী অস্বস্তি বোধ করে তাদের বেশি মোটা গুল্ফ নিয়ে, খুব কৃশ বা খুব বেশি বড়ো আকারের স্তন নিয়ে, সরু উরু নিয়ে, জড়ুল নিয়ে; এবং প্রায়ই তারা ভয়ে থাকে কোনো গুপ্ত ত্রুটিপূর্ণ গঠন নিয়ে। স্টেকেলের মতে সব তরুণীই ভরাট থাকে হাস্যকর ভীতিতে, তারা মনে করে তারা হয়তো দৈহিকভাবে অস্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ, একজন মনে করতো নাভি হচ্ছে যৌনাঙ্গ এবং এটা বন্ধ ব'লে সে খুবই কষ্টে ছিলো। আরেকজন মনে করতো যে সে উভলিঙ্গ।

তাকে কেউ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে, এটা এক বিপদ, তাকে কেউ প্রহার করছে, সেটা আরেক বিপদ। সাধারণভাবে নারীরা হিংস্রতার সাথে অপরিচিত, তারা পুরুষদের মতো শৈশব বা যৌবনের ধস্তাধস্তির ভেতর দিয়ে যায় না, এবং এখন মেয়েটি বাহুতে আটকা প'ড়ে ভেসে গেছে এক শারীরিক লড়াইয়ে, যাতে পুরুষটি অধিকতর শক্তিশালী। তার এখন আর স্বপ্ন দেখার, দেরি করার, কৌশল গ্রহণ করার স্বাধীনতা নেই : তরুণী এখন পুরুষের দখলে, তার নিয়ন্ত্রণে। এসব আলিঙ্গন, যা অনেকটা হাতে-হাতে ধস্তাধস্তির মতো, তাকে সন্ত্রস্ত করে, কেননা সে কখনো ধস্তাধস্তি করে নি। এটা বিরল ঘটনা নয় যে তরুণীর প্রথম অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে একটা প্রকৃত ধর্ষণ এবং পুরুষটি কাজ করে কদর্য বর্বরের মতো; পল্লী অঞ্চলে এবং যেখানেই আচারব্যবহার রুক্ষ, সেখানেই প্রায়ই ঘটে যে– আধা-রাজি আধা-বিদ্রোহী– চাষীকন্যা তার কুমারীত্ব হারায় কোনো খন্দখন্দে, ভয়ে আর লজ্জায়। তা যা-ই হোক, সব সমাজে ও শ্রেণীতে যা প্রায়ই ঘটে, তা হচ্ছে কুমারী মেয়েটিকে হঠাৎ সম্ভোগ করে তার প্রেমিক, যে প্রধানত তার নিজের সুখের কথাই ভাবে, বা কোনো স্বামী, যে তার বৈবাহিক অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিত, যে তার স্ত্রীর প্রতিরোধে অপমান বোধ করে এবং সতীত্বমোচনের কাজটি কঠিন হ'লে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

অধিকন্তু, পুরুষটি যতোই শ্রদ্ধাশীল ও ভদ্র হোক না কেনো, প্রথম বিদ্ধকরণ সব সময়ই বলাৎকার। কারণ তরুণী চায় ঠোঁটে ও স্তনে স্পর্শাদর, বা কামনা করে তার জ্ঞাত বা কল্পিত কোনো বিশেষ কামসুখ, কিন্তু যা ঘটে, তা হচ্ছে পুরুষটির যৌনাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে তরুণীকে এবং অনুপ্রবেশ করে সে-অঞ্চলে, যেখানে সেটিকে কামনা করা হয় নি। বহু লেখক বর্ণনা করেছেন কুমারী মেয়ের বেদনার্ত বিস্ময়, প্রেমিক বা স্বামীর বাহুর মধ্যে মুগ্ধ হয়ে প'ড়ে থেকে যে বিশ্বাস করে অবশেষে সে পূরণ করছে তার ইন্দ্রিয়সুখাবহ স্বপ্ন এবং তার গোপন যৌনাঙ্গে বোধ করে অভাবিত যন্ত্রণা : তার স্বপ্ন অন্তর্হিত হয়, তার শিহরণ ধীরেধীরে বিলীন হয়ে যায়, এবং প্রেম রূপ নেয় এক ধরনের অস্ত্রোপচারের।

এ-ক্ষেত্রে ছদছিন্নকরণ ছিলো এক ধরনের ধর্ষণ। তবে স্বেচ্ছায় ঘটলেও এটা যন্ত্রণাদায়ক হ'তে পারে। আইসাডোরা ডাংকান *আমার জীবন*-এ বর্ণনা করেছেন তিনি কতোটা উত্তেজনাগ্রস্ত হয়েছিলেন। একটি সুদর্শন অভিনেতার সাথে তাঁর দেখা হয়, প্রথম দর্শনেই তিনি তার প্রেমে পড়েন এবং লাভ করেন আকুল প্রেমনিবেদন।

আমিও কামোত্তেজিত এবং বিহ্বল ছিলাম, যখন তাকে কাছে থেকে আরো কাছে চেপে ধরার অপ্রতিরোধ্য ব্যাকুলতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে আমার মধ্যে, তারপর একরাতে সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ও অসংযত আবেগে সে আমাকে সোফায় নিয়ে যায়। সন্ত্রস্ত তবে পরমানন্দিত এবং যন্ত্রণায় আর্তনাদের মধ্যে আমি দীক্ষিত হয়েছিলাম প্রেমের ক্রিয়ায়। স্বীকার করি যে আমার প্রথম অনুভূতি ছিলো ভয়াবহ বিভীষিকার ও অসহ্য ব্যথার, যেনো কেউ হঠাৎ তুলে নিয়েছে আমার কয়েকটি দাঁত; কিন্তু সে অত্যন্ত দরদ বোধ করছিলো দেখে আমি দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারি নি তা থেকে, যা প্রথমত ছিলো নিতান্তই অঙ্গচ্ছেদন ও পীড়ন... পরদিনও আমার শহিদ হওয়ার আর্তনাদ ও চোখের জলের মধ্যে তা চলতে থাকে, যা তখন আমার কাছে একটা যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। আমার মনে হয় যেনো আমাকে কেটে ছিঁড়ে ফেড়ে নষ্ট ক'রে ফেলা হচ্ছে।

অচিরেই তিনি উপভোগ করতে থাকেন, প্রথমে এ-প্রেমিকটির, পরে অন্যদের সাথে, সেই তূরীয় আনন্দ, যা তিনি গীতিময়ভাবে বর্ণনা করেছেন।

তবে আগে যেমন ছিলো কুমারীর স্বপ্নঘোরের মধ্যে, তেমনি বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় যন্ত্রণাটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নয় : বিদ্ধকরণের ঘটনাটি অনেক বেশি গুরুতর। সঙ্গমে পুরুষ ব্যবহার করে শুধু একটি বাহ্যিক প্রত্যঙ্গ, আর নারী তখন আক্রান্ত হয় তার গভীর মর্মমূলে। সন্দেহ নেই যে বহু যুবক নারীর গোপন আঁধারে উদ্বেগহীনভাবে প্রবেশ করতে পারে না, পুনরায় সে বোধ করে গুহা বা সমাধির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানোর বাল্যের ত্রাস, তার চোয়ালের, কাস্তে দিয়ে কাটার, ফাঁদের ভয় : তারা ভাবে স্ফীত শিশ্নটি আটকে যাবে শ্লেষ্মল খাপে। নারীর আর, একবার বিদ্ধ হওয়ার পর, এমন ভীতিবোধ থাকে না; তবে সে বোধ করে তার দেহে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে।

স্বত্বাধিকারী তার জমির ওপর মালিকানা জ্ঞাপন করে, গৃহস্থ জ্ঞাপন করে তার বসতবাড়ির ওপর– 'অনধিকার প্রবেশ নিষেধ!' তার সীমাতিক্রমণতার ব্যর্থতার হতাশা থেকে নারী বিশেষ ক'রে তার নিজের জিনিশপত্র রক্ষা করার ব্যাপারে হয় খুবই ঈর্ষাকাতর : তার ঘর, তার বস্ত্রের আলমারি, তার বাক্সপত্র পবিত্র। এক বৃদ্ধা বেশ্যা একদা কলেৎকে বলেছিলো : 'মাদাম, কোনো পুরুষ কখনো আমার ঘরে ঢোকে নি; পুরুষদের সাথে আমাকে যা করতে হয়, তার জন্যে প্যারিস বেশ বড়ো।' দেহটিকে না হ'লেও, সে একটি ছোটো জায়গা রেখেছে, যা অন্যদের জন্যে নিষিদ্ধ।

কিন্তু তরুণীর নিজের দেহটি ছাড়া নিজের বলতে আর কিছু নেই : এটা তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; যে-পুরুষ তার ভেতরে ঢোকে সে এটি *নিয়ে নেয়* তার কাছে থেকে; সাধারণ ভাষারীতিটির সত্যতা প্রতিপন্ন হয় বাস্তব অভিজ্ঞতাটিতে। যে-অবমাননা সে আশঙ্কা করেছিলো, তা ঘ'টে গেছে : তাকে পরাভূত করা হয়েছে, জোর ক'রে রাজি করানো হয়েছে, জয় করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রজাতির স্ত্রীলিঙ্গের মতোই, সঙ্গমের সময় নারী থাকে পুরুষটির *নিচে*। এর ফলে যে-হীনম্মন্যতাবোধ জন্মে, অ্যাডলার একে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব'লে গ্রহণ করেছেন। শৈশব থেকেই শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার ধারণাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ; গাছের অনেক ওপরে ওঠা কৃতিত্বের কাজ; স্বর্গ পৃথিবীর ওপরে, নরক নিচে; পড়া, পিছলে পড়া, হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া, এবং ওপরে ওঠা হচ্ছে সাফল্য; কুস্তিতে জেতার জন্যে প্রতিপক্ষের কাঁধ ভূমিতে চেপে ধ'রে রাখতে হয়। নারীটি প'ড়ে থাকে পরাজিতের ভঙ্গিতে; এর চেয়েও খারাপ হচ্ছে পুরুষটি এমনভাবে ওঠে নারীটির ওপরে যেভাবে সে লাগাম লাগিয়ে বলগা ধ'রে উঠতো কোনো পশুর ওপর। নারী সব

সময় বোধ করে অক্রিয়তা : তাকে আদর করা হয়, তাকে বিদ্ধ করা হয়; তাকে রমণ করা হয়, আর সেখানে পুরুষ নিজেকে জ্ঞাপন করে সক্রিয়ভাবে। এটা সত্য, পুরুষের প্রত্যঙ্গটি কোনো রেখাঙ্কিত, স্বেচ্ছাচালিত পেশি নয়; এটা লাঙ্গলের ফালও নয় তলোয়ারও নয়, এটা শুধুই মাংস; তবুও, পুরুষ এতে সঞ্চালিত করে এমন গতিশীলতা, যা স্বতপ্রবৃত্ত; এটা সামনের দিকে যায় পেছনের দিকে যায়, থামে, আবার হয়ে ওঠে গতিশীল, তখন নারী একে গ্রহণ করে অনুগতভাবে। পুরুষটিই ঠিক করে কামে নেয়া হবে কোন আসন– বিশেষ ক'রে নারীটি যদি এ-খেলায় নতুন হয়– এবং সে-ই ঠিক করে কাজটির সময়কাল এবং পৌনপুনিকতা। নারীটি বোধ করে যে সে একটি উপকরণ মাত্র; স্বাধীনতা পুরোপুরি অন্যজনের। একেই কাব্যিকভাবে বলা হয় নারী হচ্ছে বেহালা, আর পুরুষ হচ্ছে ছড়, যা স্পন্দিত করে নারীকে। 'শৃঙ্গারে,' বালজাক বলেছেন, 'আত্মার কথা ছেড়ে দিলে, নারী হচ্ছে বীণা, যে তার গুপ্তকথা জানায় শুধু তাকে, যে জানে এটি কীভাবে বাজাতে হয়।' পুরুষ নারীকে সম্ভোগ *করে;* পুরুষ নারীকে সুখ *দেয়;* এ-শব্দগুলোই বোঝায় পারস্পরিকতার অভাব।

নারী পুরোপুরি প্রতিবুদ্ধ সে-সব প্রচলিত ধারণায়, যা পুরুষের সংরাগকে ক'রে তোলে মহিমান্বিত এবং লজ্জাজনকভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে নারীর কামানুভূতির দাবি : নারীর অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে এ-অপ্রতিসমতার ঘটনাটি। ভুললে চলবে না যে কিশোর ও কিশোরী তাদের দেহ সম্পর্কে সচেতন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে : কিশোর তার কামনার মধ্যে একে গ্রহণ করে সহজে ও সগর্বে; কিশোরীর জন্যে, তার আত্মরতি সত্ত্বেও, এটা এক অদ্ভুত ও উদ্বেগজাগানো বোঝা। পুরুষের যৌনাঙ্গটি একটি আঙুলের মতো সরল ও পরিচ্ছন্ন; এটা স্পষ্ট দেখা যায় এবং প্রায়ই সগর্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটা প্রদর্শন করা হয় সঙ্গীদের কাছে; কিন্তু নারীর যোনিটি এমনকি নারীর কাছেও রহস্যময়, এটা লুকোনো, শ্লেষ্মল, ও আর্দ্র; প্রতিমাসে এটা থেকে রক্ত বেরোয়, এটা প্রায়ই গুমোট হয়ে থাকে দেহের তরল পদার্থে, এটির নিজেরই আছে একটা গোপন ও বিপজ্জনক জীবন। নারী এটির মধ্যে নিজেকে চিনতে পারে না, এবং এটাই অনেকাংশে ব্যাখ্যা করে কেনো নারী এটির কামনাকে নিজের কামনা ব'লে বুঝতে পারে না। এসব দেখা দেয় বিব্রতকরভাবে। পুরুষ 'শক্ত হয়', কিন্তু নারী 'ভিজে যায়'; এ-শব্দটিতেই ধরা আছে শৈশবের বিছানা ভেজানোর, প্রস্রাবের কাছে অপরাধ ও অনিচ্ছার মধ্যে ধরা দেয়ার স্মৃতি। পুরুষও একই রকম ঘেন্না বোধ করে স্বপ্নদোষের প্রতি; একটা তরল পদার্থ, প্রস্রাব হোক বা ধাতু হোক, নির্গত করা লজ্জাজনক নয় : এটা এক সক্রিয় কর্ম; কিন্তু তরল পদার্থটি যদি অক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসে, তখন তা লজ্জাজনক, কেননা শরীরটি তখন আর থাকে না মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রিত ও এক সচেতন কর্তার প্রকাশরূপ পেশি ও স্নায়ুসম্বলিত জীব, বরং সেটি হয়ে ওঠে জড়বস্তুতে গঠিত একটি পাত্র, একটি আধার, যা খামখেয়ালি যান্ত্রিক শক্তিরাশির ক্রীড়নক। যদি কোনো শরীরের ছিদ্র দিয়ে বেরোয় তরল পদার্থ– যেমন তরল পদার্থ বেরোতে পারে একটা প্রাচীন দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে বা মৃতদেহ থেকে– তখন মনে হয় যেনো এটি তরল পদার্থ নির্গত করছে না, বরং তরল হয়ে যাচ্ছে : এটা একটা বিকট পচন।

নারীর কামবাসনা হচ্ছে মলাস্কের কোমল ধপধপানো। পুরুষ যেখানে প্রবৃত্তিতাড়িত, নারী সেখানে অধৈর্য মাত্র; নারীর প্রত্যাশা অক্রিয় থেকেও হয়ে উঠতে পারে ব্যগ্র; পুরুষ ইগল ও বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর; নারী প্রতীক্ষায় প'ড়ে থাকে মাংসাশী উদ্ভিদের মতো, জলাভূমির মতো, যাতে গ্রস্ত হয় পতঙ্গ ও শিশুরা। নারী হচ্ছে শোষণ, চোষণ, উদ্ভিজ্জমৃত্তিকা, পিচ ও আঠা, এক অক্রিয় অন্তঃপ্রবাহ, ধীরেধীরে-সুকৌশলে-প্রবেশকারী ও চটচটে : অন্তত অস্পষ্টভাবে নারী নিজেকে অনুভব করে এভাবেই। তাই তার ভেতরে পুরুষের অধীনতাকরণের অভিপ্রায়কে প্রতিরোধ করার ইচ্ছেই শুধু নেই, বিরোধ আছে তার নিজের ভেতরেও। তার শিক্ষা ও সমাজ তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে-ট্যাবু ও সংবাধ, তার সাথে অতিরিক্ত যুক্ত হয় কামানুভূতির অভিজ্ঞতা থেকে আগত বিরক্তি ও অস্বীকৃতি : এ-প্রভাবগুলো পরস্পরকে এতো দূর বাড়িয়ে তোলে যে প্রথম সঙ্গমের পর প্রায়ই নারী তার কামনিয়তির বিরুদ্ধে অনেক বেশি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আগের থেকে।

পরিশেষে, আছে আরো একটি ব্যাপার, যা পুরুষকে দেয় একটি বৈরীবৈশিষ্ট্য এবং যৌনক্রিয়াকে ক'রে তোলে এক ভয়ঙ্কর বিপদ : এটা হচ্ছে গর্ভধারণের ঝুঁকি। অবিবাহিত নারীর জন্যে একটি অবৈধ সন্তান এমন এক সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রতিবন্ধকতা যে মেয়েরা যখন বুঝতে পারে তারা গর্ভবতী হয়ে পড়েছে, তখন তারা আত্মহত্যা করতে পারে, এবং কিছু তরুণী মা হত্যা করে তাদের নবজাতক শিশুদের। এমন বিশাল মাত্রার একটা বিপদ অনেক মেয়েকে বাধ্য করে লোকাচারের নির্দেশিত বিবাহপূর্ব সতীত্ব বজায় রাখার জন্যে কামকে নিয়ন্ত্রিত করতে। যখন এ-নিয়ন্ত্রণ অপ্রতুল হয়ে ওঠে, তখন তরুণী মেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সে-ভয়ে, যা ওত পেতে আছে তার প্রেমিকের শরীরে। স্টেকেল এমন সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে সচেতনভাবে বোধ করা হয়েছে এ-ত্রাস এবং প্রকাশ করা হয়েছে সঙ্গমের সময়েই এসব উক্তিতে : 'কিছু যেনো না ঘটে! এটা কি নিরাপদ!' এবং বিয়ের মধ্যেও শারীরিক ও আর্থিক কারণে একটি শিশু বাঞ্ছিত নাও হ'তে পারে।

নারীটি যদি তার সঙ্গীটির ওপর পূর্ণ আস্থা পোষণ না করে, সে প্রেমিকই হোক বা হোক স্বামী, তাহলে তার সতর্কতাবোধের জন্যে বিবশ হয় তার কামানুভূতি। সে হয়তো উদ্বেগের সাথে চোখ রাখবে পুরুষটির কর্মকাণ্ডের ওপর, বা সঙ্গমের পরপরই উঠে যাবে এবং রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা নেবে সে-জীবন্ত বীজাণু থেকে, তার সঙ্গীটি যা তার ভেতরে জমা করেছে। এ-স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রূঢ়ভাবে বিপরীত স্পর্শাদরের ইন্দ্রিয়াতুর যাদুর; যে-দেহ দুটি সম্প্রতি সংযুক্ত হয়েছিলো পারস্পরিক সুখের মধ্যে, এটা তাদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে। এ-সময়ে পুরুষটির শুক্রগুলোকে অশোভন বস্তুর মতোই ক্ষতিকর জীবাণু ব'লে মনে হয়; একটা নোংরা পাত্র ধোয়ার মতো সে নিজেকে পরিষ্কার করে, আর তখন চরম অখণ্ডতার মধ্যে বিশ্রাম করে পুরুষটি। এক তরুণী বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্ত নারী আমাকে বলেছিলেন তাঁর বিরক্তির কথা, বিয়ের রাতের দ্বিধাগ্রস্ত সুখের পর যখন তাঁকে যেতে হয়েছিলো স্নানাগারে, তখন তাঁর স্বামী নির্লিপ্তভাবে টানছিলো সিগারেট : তার মনে হয় যেনো ওই মুহূর্তেই নিশ্চিত হয়ে যায় তার বিয়ের বিপর্যয়। যান্ত্রিক জন্মনিরোধ প্রক্রিয়ার প্রতি প্রবল অনীহাও নিঃসন্দেহে

প্রায়সই হয়ে থাকে নারীর কামশীলতার কারণ।

জন্মনিরোধের অধিকতর নিশ্চিত ও কম অস্বস্তিকর পদ্ধতি নারীর যৌনমুক্তির দিকে একটি মহাপদক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে, যেখানে উন্নততর পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত, সেখানে বিয়ের সময় কুমারী মেয়ের সংখ্যা ফ্রান্সের থেকে কম। নিঃসন্দেহে এসব পদ্ধতি যৌনক্রিয়ার সময় মনকে ভাবনাহীন রাখে। তবে এখানেও আবার নিজের দেহটিকে একটি বস্তুরূপে ব্যবহারের আগে তরুণীকে জয় করতে হয় কিছু অনীহা : পুরুষ দিয়ে বিদ্ধ হওয়ার ভাবনাকে সে সানন্দে মেনে নেয় না, আর হাসিমুখে সে মেনে নেয় না পুরুষটির সুখের জন্যে 'ছিপিবদ্ধ' হওয়াকে। তার জরায়ু সে রুদ্ধই করুক বা ভেতরে একটা শুক্রনাশক ট্যাম্পন ঢুকুক, যে-নারী দেহ ও কামের অনিশ্চিত মূল্য সম্পর্কে সচেতন, সে অসুবিধায় পড়বে এরকম ঠাণ্ডা পূর্বপরিকল্পনায়– এবং বহু পুরুষও আছে, যারা এমন রক্ষাকবচ অপছন্দ করে। সম্পূর্ণ কামপরিস্থিতি যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে প্রতিটি ভিন্ন উপাদানের : এক বিশ্লেষণে যে-আচরণকে মনে হবে আপত্তিকর, তাকেই মনে হয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যখন লিপ্ত দেহ দুটি রূপান্তরিত হয় তাদের কামবৈশিষ্ট্য দিয়ে; তবে বিপরীতভাবে, যখন দেহ ও আচরণকে বিশ্লিষ্ট করা হয় পৃথক ও নিরর্থক উপাদানে, তখন এ-উপাদানগুলো হয়ে ওঠে অমার্জিত, অশ্লীল। যে-বিদ্ধকরণকে গণ্য করা হয় মিলন ব'লে, দয়িতের সাথে একীভবন ব'লে, যা প্রণয়িনী নারীকে সুখ দেয়, তা-ই আবার পরিগ্রহ করে তার অস্ত্রোপচারধর্মী, অমার্জিত বৈশিষ্ট্য, যদি তা ঘটে কামোত্তেজনা, বাসনা, ও সুখ ছাড়া, যেমন ঘটতে পারে নিরোধকের পরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে। তা যাই হোক, এ-নিরোধকগুলো সব নারীর কাছে সুলভ নয়; বহু তরুণীই গর্ভধারণের বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ, এবং তীব্র উদ্বেগের সাথে তারা মনে করে তাদের নিয়তি নির্ভরশীল ওই পুরুষটির সদিচ্ছার ওপর, যাকে তারা দান করেছে দেহ।

এটা মনে করা ঠিক হবে না যে অতিশয় আকুল ধরনের নারীদের ক্ষেত্রে হ্রাস পায় সব রকম বিপদের তীব্রতা। ঘটতে পারে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নারীর কামোত্তেজনা পৌঁছোতে পারে এতো তীব্রতায়, যা পুরুষের অজানা। পুরুষের কামোত্তেজনা তীক্ষ্ণ তবে বিশেষ স্থানে সীমিত, এবং– সম্ভবত শুধু পুলকলাভের মুহূর্তে ছাড়া– পুরুষ রক্ষা করে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ; নারী, এর বিপরীতে, প্রকৃতপক্ষেই হয়ে ওঠে আত্মহারা; অনেকের জন্যে এটি হচ্ছে দৈহিক প্রেমের সবচেয়ে নির্দিষ্ট ও ইন্দ্রিয়সুখাবহ মুহূর্ত, তবে এরও আছে একটি যাদুধর্মী ও ভীতিকর বৈশিষ্ট্য। পুরুষ কখনো কখনো ভয় পেতে পারে তার আলিঙ্গনাবদ্ধ নারীটিকে, তাকে মনে হ'তে পারে আপন বিকৃতির শিকার; পুরুষটির আক্রমণাত্মক ক্ষিপ্ততা পুরুষটিকে যতোটা রূপান্তরিত করে তার থেকে অনেক বেশি আমূলভাবে রূপান্তরিত হয় নারীটি তার বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতা দিয়ে। এ-জ্বর তাকে মুহূর্তের জন্যে রেহাই দেয় লজ্জা থেকে, কিন্তু পরে এর কথা ভাবতেও সে লজ্জা ও বিভীষিকা বোধ করে। এটা যদি সে সাদরে গ্রহণ করতে চায়– অথবা এমনকি সগর্বে– তাহলে সুখের উষ্ণতার মধ্যে তাকে থাকতে হয় আনন্দিত চিত্তে; সে তার কামনাবাসনাকে শুধু তখনি স্বীকার ক'রে নিতে পারে যদি তা পরিতৃপ্ত হয় উপভোগ্যভাবে : নইলে সে ওগুলোকে ক্রোধের সাথে অস্বীকার করে।

এখানেই আমরা আসি নারীর কামের সংকটপূর্ণ সমস্যায় : নারীর কামজীবনের সূচনায় তীক্ষ্ণ ও নিশ্চিত উপভোগের মধ্য দিয়ে তার আত্মসমর্পণের ক্ষতিপূরণ ঘটে না। সে সানন্দে তার সংযম ও তার অহমিকা বিসর্জন করবে, যদি এটা ক'রে সে খুলতে পারে তার স্বর্গের পথ। কিন্তু চ্ছদচ্ছিন্নকরণ, আমরা যেমন দেখেছি, তরুণী প্রেমিকার কাছে প্রীতিকর ব্যাপার নয়; প্রীতিকর হওয়াই বরং অত্যন্ত অস্বাভাবিক; যোনীয় সুখ অবিলম্বে পাওয়া যায় না। স্টেকেলের পরিসংখ্যান অনুসারে– অসংখ্য যৌনবিজ্ঞানী ও মনোবিশ্লেষক যা সমর্থন ও অনুমোদন করেছেন– খুব বেশি হ'লে চার শতাংশ নারী শুরু থেকেই পায় পুলকসুখ; পঞ্চাশ শতাংশ যোনীয় পুলক লাভ করে বহু সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছরের পর।

এতে মানসিক ব্যাপার পালন করে অপরিহার্য ভূমিকা। নারীদেহ বিশিষ্টরূপেই মনোদৈহিক : অর্থাৎ প্রায়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে মানসিকের সঙ্গে দৈহিকের। নারীর নৈতিক সংবাধ বাধা দেয় কামাবেগ জেগে উঠতে; সুখে সেগুলোর সমতাবিধান না ঘটলে সেগুলো চিরস্থায়ী হ'তে থাকে এবং সৃষ্টি করে ক্রমশক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা। বহু ক্ষেত্রে গ'ড়ে ওঠে একটা দুষ্টচক্র : প্রথম দিকে পুরুষটির কোনো বিশ্রী আচরণ, একটা কথা, একটা স্থূল ভঙ্গি, একটা শ্রেষ্ঠত্বের হাসির প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে মধুচন্দ্রিমা, এমনকি সারা বিবাহিত জীবন ভ'রে। অবিলম্বে সুখ না পেয়ে হতাশ হয়ে তরুণী বোধ করে চিরস্থায়ী বিরক্তি, যা পরে কোনো সুখকর সম্পর্কের প্রতিকূল হয়ে ওঠে।

স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির অভাবে, একথা সত্য, পুরুষটি সব সময়ই ভগাঙ্কুরটিকে উদ্দীপিত করার উদ্যোগ নিতে পারে, যা, নীতিবাদী মিথ্যে বিবরণ সত্ত্বেও, এমন সুখ যোগাতে পারে যাতে নারীটি লাভ করতে পারে কামপুলক ও শমন। তবে বহু নারী এটা প্রত্যাখ্যান করে, কেননা এটাকে তাদের কাছে যোনীয় সুখের মতো মনে না হয়ে মনে হয় *আরোপিত* ব'লে; তাই নারী যেমন কষ্ট পায় যখন পুরুষ ব্যগ্র থাকে শুধু তার নিজের স্বস্তিলাভের জন্যে, তেমনি তাকে সোজাসুজি সুখ দেয়ার চেষ্টাতেও সে কষ্ট পায়। 'অন্যকে সুখের অনুভূতি দেয়ার অর্থ হচ্ছে,' স্টেকেল বলেন, 'অন্যের ওপর আধিপত্য করা; নিজেকে অন্যের কাছে সমর্পণ করা হচ্ছে নিজের ঈপ্সার দাবি ত্যাগ করা।' নারী কামসুখকে তখনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে যখন তা স্বাভাবিকভাবে বয়ে হয়ে আসে পুরুষটির অনুভূত কামসুখ থেকে, যেমন ঘটে সফল স্বাভাবিক সঙ্গমে। স্টেকেল আবার যেমন বলেছেন : 'নারীরা তখনই সানন্দে নিজেদের সমর্পণ করে যখন তারা বোধ করে যে তাদের সঙ্গীরা তাদের পরাভূত করার *ইচ্ছে পোষণ করে* না'; অন্য দিকে, যখন তারা বোধ করে যে তারা ওই ওই ইচ্ছে পোষণ করছে, তখন বিদ্রোহ করে নারীরা। হাতের সাহায্যে উত্তেজিত হওয়াকে অনেকে অপছন্দ করে, কেননা হাত এমন একটি হাতিয়ার, সেটি যে-সুখ দেয় তাতে সেটি অংশ নেয় না, এটি মাংস নির্দেশ না ক'রে নির্দেশ করে কর্মপরায়ণতা। এমনকি পুরুষের যৌনাঙ্গটিকেও যদি এটি কামনাময় মাংস ব'লে মনে না হয়ে একটি দক্ষভাবে ব্যবহৃত হাতিয়ার ব'লে মনে হয়, তাহলেও নারী বোধ করবে একই বিকর্ষণ। বহু পর্যবেক্ষণের পর স্টেকেল সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে কামশীতল ব'লে কথিত নারীদের সমগ্র কামনার লক্ষ্য হচ্ছে স্বাভাবিকতা : 'তারা কামপুলক বোধ করতে চায় (যাকে তারা গণ্য করে) স্বাভাবিক

নারীর রীতিতে, অন্যান্য রীতি তাদের নৈতিক দাবিগুলো তৃপ্ত করে না।'

পুরুষটির মনোভাব তাই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষটির কামনা যদি হয় প্রচণ্ড ও নৃশংস, তাহলে তার সঙ্গিনীটির মনে হয় যে পুরুষটির আলিঙ্গনের মধ্যে সে হয়ে উঠছে নিতান্তই একটি বস্তু; তবে পুরুষটি যদি হয় অতিরিক্ত আত্মসংযমী, অতিরিক্ত নির্বিকার, তখন তাকে আর মাংস ব'লে মনে হয় না; সে চায় যে নারীটি নিজেকে ক'রে তুলবে একটি বস্তু, তবে এর বিনিময়ে তার ওপর নারীটির থাকবে না কোনো অধিকার। উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অহমিকা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; কেননা নিজেকে একটি রক্তমাংসের বস্তুতে রূপান্তরণ ও নিজের ব্যক্তিতার দাবির মধ্যে মিটমাট করার জন্যে তার দরকার পড়ে যে পুরুষটিকেও সে ক'রে তুলবে তার শিকার, যখন সে নিজে হয়ে উঠছে পুরুষটির শিকার। এ-কারণেই নারীরা এতো ঘন ঘন থাকে একগুঁয়েভাবে কামশীতল। যদি তার প্রেমিকটি মনোমোহনের শক্তিহীন হয়, যদি সে হয় নিরুত্তাপ, তাচ্ছিল্যপরায়ণ, অদক্ষ, তাহলে সে নারীটির কাম জাগাতে ব্যর্থ হয়, বা সে তাকে রাখে অতৃপ্ত; তবে যদি সে পৌরুষপূর্ণ এবং দক্ষও হয়, তাহলেও সে জাগাতে পারে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিক্রিয়া; নারীটি ভয় পায় তার আধিপত্যকে : অনেক নারী কামসুখ পায় শুধু সে-সব পুরুষের সাথে, যারা ভীরু, নির্গুণ, অথবা এমনকি আধা নপুংসক এবং যাদের থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এটা নিশ্চিত সত্য যে নারীর কামসুখ পুরুষের কামসুখের থেকে বেশ ভিন্ন। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে যোনীয় অনুভূতি কোনো নির্দিষ্ট কামপুলক জাগায় কি না, তা অনিশ্চিত : এ-ব্যাপারে নারীদের মত খুবই বিরল, এবং যখন যথাযথভাবে ব্যাপারটি বর্ণনার চেষ্টা করা হয়, তখনও তা থাকে খুবই অস্পষ্ট; দেখা যায় যে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে ভিন্ন। কিন্তু সন্দেহ নেই যে পুরুষের কাছে সঙ্গমের আছে এক সুনির্দিষ্ট জৈবিক উপসংহার : বীর্যপাত। এবং নিশ্চয়ই এ-লক্ষ্যের সাথে জড়িত থাকে আরো নানা জটিল অভিপ্রায়; কিন্তু একবার এটা ঘটলে একেই মনে হয় একটি নির্দিষ্ট ফলাফল ব'লে; এবং এতে যদি কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাও ঘটে, তবে কিছু সময়ের জন্যে কামনার সমাপ্তি ঘটে। নারীর মধ্যে, উল্টোভাবে, শুরু থেকেই লক্ষ্য অনিশ্চিত, এবং এটা যতোটা শারীরবৃত্তিক তার চেয়েও বেশি মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির; সাধারণভাবে নারী কামনা করে কামোত্তেজনা ও সুখ, কিন্তু তার দেহ এ-রমণের কোনো যথাযথ পরিসমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয় না; এবং এজন্যেই তার জন্যে সঙ্গম কখনোই সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয় না : এটা কোনো সমাপ্তি মানে না। পুরুষের কামানুভূতি তীরের মতো জেগে ওঠে, যখন এটা পৌঁছে বিশেষ উচ্চতায় বা সীমায়, এটা পূর্ণতা লাভ করে এবং কামপুলক লাভের মধ্যে হঠাৎ মারা যায়; তার রমণকর্মের ভঙ্গিটি সসীম ও ধারাবাহিকতাহীন। নারীর সুখ বিকিরিত হয় সারা শরীর জুড়ে; এটা সব সময় যৌনপ্রত্যঙ্গগুলোতে কেন্দ্রীভূত হয় না; এমনকি যখন হয়ও, যোনীয় সংকোচন একটি প্রকৃত কামপুলক সৃষ্টির বদলে তৈরি করে একটা তরঙ্গসংশ্রয়, যা জেগে ওঠে ছন্দস্পন্দনে, বিলীন হয় ও পুনর্গঠিত হয়, থেকে থেকে লাভ করে এক আকস্মিক বিস্ফোরণের অবস্থা, হয়ে ওঠে অস্পষ্ট, এবং কখনোই লুপ্ত না হয়ে স্তিমিত হয়। যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত নেই, নারীর কামানুভূতি সম্প্রসারিত হয়

অনন্তের দিকে; কোনো বিশেষ পরিতৃপ্তিবশত নয়, বরং প্রায়ই স্নায়ুতন্ত্রের বা হৃৎপিণ্ডের অবসাদের ফলে বা মানসিক পূর্ণপরিতৃপ্তির ফলেই সীমায়িত হয় নারীর কামের সম্ভাবনা; এমনকি সে যখন অভিভূত, অবসন্ন, তখনও সে কখনো পরিপূর্ণভাবে নিস্তার লাভ করে না : *লাসাতা ননদুম সাতিয়াতা*, যেমন বলেছেন জুভেনাল।

কোনো পুরুষ যখন সঙ্গিনীটির ওপর চাপিয়ে দেয় তার ছন্দোস্পন্দ বা সময়সীমা এবং তাকে একটা কামপুলক দেয়ার জন্যে প্রাণপণে খাটে, তখন সে অত্যন্ত ভুল করে : নারীটি নিজের যে-বিশেষ রীতিতে পুলকের যে-রূপের দিকে এগোচ্ছিলো, তখন সে সফল হয় শুধু তা চুরমার ক'রে দিতে। এটা এমন এক নমনীয় রূপ যে এর শর্তগুলো নির্ধারণ করা কঠিন : মংসপেশির কিছু খিঁচুনি যোনিতে সীমিত থেকে বা সমগ্রভাবে কামসংশ্রয়ের ভেতরে, বা সারা শরীরে জড়িত থেকে ঘটাতে পারে সমাপ্তি; কিছু নারীতে এগুলো খুবই তীব্র এবং নিয়মিতভাবে ঘটে যে এগুলোকে গণ্য করা যায় কামপুলক ব'লে; তবে প্রণয়িনী নারী তার পুরুষটির কামপুলকের মধ্যেও পৌঁছোতে পারে উপসংহারে, যা দেয় প্রশমন ও পরিতৃপ্তি। এবং এও সম্ভব যে কামের অবস্থাটি প্রশমিত হ'তে পারে ধীরশান্তভাবে, হঠাৎ রাগমোচন ছাড়াই। সাফল্যের জন্যে অনুভূতির গাণিতিক এককালবর্তীকরণ দরকার পড়ে না, যেমন আছে খুঁটিনাটির প্রতি অতিযত্নশীল বহু পুরুষের অতি-সরলীকৃত বিশ্বাসে, এর জন্যে দরকার একটা জটিল কামবিন্যাস প্রতিষ্ঠা। অনেকে মনে করে যে নারীদের কামসুখের অনুভূতি দেয়া একটা সময় ও কৌশলের ব্যাপার মাত্র, এটা এক হিংস্র কর্ম বটে; তারা বোঝে না নারীর কাম কতোটা মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হয় সমগ্র পরিস্থিতি দিয়ে।

নারীর কামসুখ, আমি আগেই বলেছি, এক ধরনের যাদুমন্ত্র; এটা চায় প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ; যদি কোনো কথা বা নড়াচড়া স্পর্শাদরের যাদুর বিপক্ষে যায়, তাহলে ভেঙে যায় মন্ত্রটি। এটাই অন্যতম কারণ কেনো নারী চোখ বোজে; শারীরবৃত্তিকভাবে এটা চোখের মণির প্রসারণের ক্ষতিপূরণ করার জন্যে একটি প্রতিবর্তী ক্রিয়া; কিন্তু এমনকি অন্ধকারেও নারীর চোখের পাতা নেমে আসে। সে লুপ্ত ক'রে দিতে চায় সমগ্র পরিপার্শ্ব, লুপ্ত ক'রে দিতে চায় ওই মুহূর্তের, তার নিজের, এবং তার প্রেমিকের এককত্ব, সে হারিয়ে যেতে চায় মাতৃগর্ভের মতো ছায়াচ্ছন্ন মাংসের রাত্রির ভেতরে। আরো বিশেষভাবে সে লোপ ক'রে দিতে চায় তার ও পুরুষটির মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্নতা; সে চায় পুরুষটির সাথে গ'লে এক হয়ে যেতে।

দুটি শরীরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তটি কেনো প্রায় সব সময়ই নারীর জন্যে বেদনাদায়ক, এটাই ব্যাখ্যা করে তার কারণ। প্রকৃতির ছল বা নারীর বিজয়ী পুরুষ সঙ্গমে সুখ পাক বা হতাশ হোক, সঙ্গমের পর সে সব সময়ই বর্জন করে দেহ; সে আবার হয়ে ওঠে একটি সৎ শরীর, সে ঘুমোতে চায়, স্নান করতে চায়, সিগারেট খেতে চায়, মুক্ত বায়ুর জন্যে বাইরে যেতে চায়। কিন্তু নারী বিলম্বিত করতে চায় মাংসের সংস্পর্শ যতোক্ষণ না পুরোপুরি কাটে সে-যাদুমন্ত্র, যা তাকে মাংসে পরিণত করেছিলো; বিচ্ছিন্ন হওয়া তার জন্যে নতুন ক'রে মায়ের দুধ ছাড়ার মতো এক বেদনাদায়ক মূলোৎপাটন; যে-প্রেমিক তাকে ছেড়ে হঠাৎ উঠে যায়, তার ওপর তার রাগ হয়। তবে সে আরো বেশি আহত বোধ করে সে-সব কথায়, যা বিপক্ষে যায়

তার সে-মিলনের, যাতে সে মুহূর্তের জন্যে হ'লেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে। 'ওটা যথেষ্ট হয়েছে? আরো লাগবে? ওটা ভালো লেগেছে?'– এ-ধরনের জিজ্ঞাসা জোর দেয় বিচ্ছিন্নতার ওপর, সঙ্গমের কাজটিকে রূপান্তরিত করে পুরুষের পরিচালিত একটি যান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে। নারীর অনেক বিপদ দূর হতো যদি পুরুষ তার চিন্তাধারায় না বইতো অজস্র গূঢ়ৈষা, যার ফলে সে সঙ্গমকে যুদ্ধ হিশেবে গণ্য করে; তাহলে নারীও শয্যাকে আর যুদ্ধক্ষেত্র ব'লে মনে করতো না।

তবু দেখা যায় আত্মরতি ও গর্ববোধের সাথে তরুণীর মধ্যে আছে শাসিত হওয়ার বাসনা। কিছু মনোবিশ্লেষকের মতে মর্ষকাম নারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এবং এটাই তাকে তার কামনিয়তির সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। তবে মর্ষকামের ধারণাটি অতি গোলমেলে, এবং ব্যাপারটি ভালোভাবে বিচার ক'রে দেখা দরকার।

ফ্রয়েডের অনুসরণে মনোবিশ্লেষকেরা তিন প্রকার মর্ষকাম নির্ণয় করেন : একটিতে আছে যন্ত্রণা ও কামসুখের সম্মিলন, আরেকটি হচ্ছে নারীর কামগত পরনির্ভরশীলতা মেনে নেয়া, আর তৃতীয়টি নির্ভরশীল আত্মপীড়নের এক কার্যসাধনপদ্ধতির ওপর। এ-দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী মর্ষকামী, কেননা তার মধ্যে সুখ ও বেদনা মিলিত হয় সতীত্বমোচন ও সন্তানপ্রসবে, এবং যেহেতু সে মেনে নেয় অক্রিয় ভূমিকা।

সর্বপ্রথম আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে বেদনার ওপর একটা কামগত মূল্য আরোপ আদৌ বোঝায় না যে আচরণটি অক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণমূলক। বেদনা প্রায়ই বাড়ায় পেশির সংকোচনপ্রসারণ, কামোত্তেজনা ও কামসুখের হিংস্রতার ফলে ভোঁতা হয়ে যাওয়া স্পর্শকাতরতাকে আবার জাগিয়ে তোলে; এটা মাংসের রাত্রির ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি; যাতে তাকে আবার নিক্ষেপ করা যায়, তাই এটা প্রেমিককে উঠিয়ে আনে সে-বিস্মৃত অবস্থা থেকে, যেখানে সে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে ছিলো। বেদনা সাধারণত কামোন্মত্ততার একটা অংশ। কামজ প্রেমে সব সময়ই থাকে নিজের থেকে ছিঁড়ে আনা, আবেগে আত্মহারা হওয়া, পরমানন্দ; বেদনাভোগ ভেঙেচুড়ে ফেলে অহংয়ের সীমানাও, এটা সীমাতিক্রমণতা, আবেগের আকস্মিক বিস্ফোরণ; বেদনা সব সময়ই বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বন্য-আনন্দোৎসবে, এবং এটা সুপরিজ্ঞাত যে তীব্র সুখ ও বেদনা খাপ খায় পরস্পরে সাথে : প্রণয়স্পর্শ হয়ে উঠতে পারে পীড়ন, যন্ত্রণা দিতে পারে সুখ। আলিঙ্গন সহজেই নিয়ে যায় দংশন, নখাঘাত, আঁচড় দেয়ার দিকে; এমন আচরণ সাধারণত ধর্ষকামী নয়; এটা মিলেমিশে যাওয়ার বাসনা, ধ্বংস করার নয়; এবং যে-ব্যক্তিটি এটা ভোগ করে সে প্রত্যাখ্যান ও অবমাননা খোঁজে না, খোঁজে মিলন; এছাড়া, এটা বিশেষভাবে পুরুষের আচরণ নয়– আদৌ তা নয়। প্রকৃতপক্ষে তখনই বেদনার থাকে মর্ষকামী তাৎপর্য, যখন একে গ্রহণ করা হয় ও চাওয়া হয় দাসত্বের প্রমাণ হিশেবে। সতীত্বমোচনের বেদনা সুখের সাথে পরস্পরসম্পর্কিত নয়; এবং সন্তানপ্রসবের বেদনাকে ভয় পায় সব নারীই এবং তারা আনন্দিত যে আধুনিক ধাত্রীবিদ্যার পদ্ধতি এটা দূর করছে। নারীর কামে বেদনার ভূমিকা পুরুষের থেকে বেশিও নয়, কমও নয়।

নারীর বাধ্যতা, অধিকন্তু, একটি খুবই দ্ব্যর্থক ধারণা। আমরা দেখেছি যে তরুণী সাধারণত *কল্পনায়* মেনে নেয় কোনো নরদেবতার, কোনো বীরের, কোনো পুরুষের

আধিপত্য; তবে এটা আত্মরতিমূলক খেলার থেকে বেশি কিছু নয়। বাস্তবে তরুণীকে এটা কোনোভাবেই এমন কোনো প্রভুর দৈহিক চর্চার কাছে সমর্পণ করে না। এর বিপরীতে, প্রায়ই সে প্রত্যাখ্যান করে সে-পুরুষটিকে, যাকে সে পছন্দ ও শ্রদ্ধা করে, এবং নিজেকে দান করে এমন কোনো পুরুষের কাছে, যার নেই কোনো বিশিষ্টতা। উদ্ভট কল্পনার মধ্যে বাস্তব আচরণের চাবি খোঁজা ভুল; কেননা উদ্ভট কল্পনাগুলো সৃষ্টি ও পোষণ করা হয় উদ্ভট কল্পনারূপেই। আমরা আবার উদ্ধৃত করতে পারি মারি বাশকির্তসেভকে : 'সারাজীবন আমি নিজেকে কোনো *প্রাতিভাসিক আধিপত্যের* কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছি, কিন্তু যে-সব পুরুষ নিয়ে আমি এ-চেষ্টা করেছি, তারা আমার তুলনায় এতো তুচ্ছ যে আমি শুধু ঘৃণা বোধ করেছি।'

তবু, ঠিক যে কামে নারীর ভূমিকা প্রধানত অক্রিয়; তবে পুরুষের স্বাভাবিক আক্রমণাত্মক আচরণ যতোটা ধর্ষকামী ওই অক্রিয়া ভূমিকার বাস্তবিক রূপায়ণ তার থেকে বেশি মর্ষকামী নয়; সুখ পাওয়ার জন্যে প্রণয়স্পর্শ, উত্তেজনা, ও বিদ্ধকরণকে অতিক্রম ক'রে গিয়ে নারী রক্ষা করতে পারে তার ব্যক্তিতা; নারী তার প্রেমিকের সাথে সম্মিলন চাইতেও পারে এবং নিজেকে দান ও করতে পারে তার কাছে, এটা বোঝায় অহংয়ের সীমাতিক্রমণতা, দাবি ছেড়ে দেয়া নয়। তখনই থাকে মর্ষকাম, যখন কেউ চায় যে অন্যদের সচেতন ইচ্ছেয় সে হয়ে উঠবে একটি যথার্থ বস্তু, যখন সে নিজেকে দেখতে চায় বস্তুরূপে, বস্তু হওয়ার ভান করে। 'মর্ষকাম আমার বস্তুতন্ত্রতা দিয়ে অন্যকে মুগ্ধ করার কোনো উদ্যোগ নয়, তবে এটা হচ্ছে অপরের দৃষ্টিতে নিজেকে নিজে হয়ে ওঠার উদ্যোগ, যা আমার বস্তুতন্ত্রতায় মুগ্ধ' (জে.-পি. সার্ত্, *ল'এতর এৎ ল্য নিআঁ*)।

এটা এক পুরোনো কুটভাষ যে পুরুষ বাস করে এক ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে, যেখানে আছে মধুরতা, প্রীতি, ভদ্রতা, এক নারীসুলভ জগতে, আর সেখানে নারী ঢোকে পুরুষের জগতে, যা কঠিন ও কর্কশ; নারীর হাত এখনো কামনা করে কোমল, মসৃণ মাংসের সংস্পর্শ : কিশোর, নারী, পুষ্প, পশম, শিশু; তার ভেতরের একটি সম্পূর্ণ এলাকা থেকে যায় অনধিষ্ঠিত এবং সে কামনা করে এমন সম্পদ অধিকার করতে, যা সে দেয় পুরুষকে। বহু নারীর মধ্যে যে বিদ্যমান থাকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট সমকামিতার প্রবণতা, এটা ব্যাখ্যা করে এ-ব্যাপারটি। এক ধরনের নারী আছে, বহু জটিল কারণে, যাদের মধ্যে এ-প্রবণতা প্রকাশ পায় অস্বভাবিক শক্তিতে। সব নারী তাদের যৌন সমস্যাগুলো মানবদ্ধ রীতিতে, সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র পদ্ধতিতে, সমাধান করতে সমর্থও নয় এবং ইচ্ছুকও নয়। আমরা এখন মনোযোগ দেবো তাদের দিকে, যারা বেছে নেয় নিষিদ্ধ পথ।

পরিচ্ছেদ ৪

নারীসমকামী

নারীসমকামীর কথা ভাবতে গিয়ে আমরা সাধারণত ভাবি এমন এক নারীর কথা, যে পরে একটা সাদাসিধে ফেল্ট হ্যাট, যার ছোটো চুল, ও পরে একটা নেকটাই; তার পুরুষধরনের আকৃতি যেনো নির্দেশ করে হরমোনের কোনো অস্বাভাবিকতা। বিপর্যস্তকে 'পুরুষালি' নারীর সঙ্গে এভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলার থেকে কিছুই আর বেশি ভ্রান্তিপূর্ণ হ'তে পারে না। হারেমের বাসিন্দা, বেশ্যা, স্বেচ্ছাকৃতভাবে 'নারীধর্মী' নারীদের মধ্যে আছে বহু সমকামী; এর বিপরীতে বিপুল সংখ্যক 'পুরুষালি' নারী বিষমকামী। যৌনবিজ্ঞানী ও মনোবিশ্লেষকেরা এ-সাধারণ পর্যবেক্ষণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে অধিকাংশ নারী 'হোমো'ই ধাতে অন্য নারীদের মতোই। তাদের কাম কিছুতেই কোনো দেহসংস্থানগত 'নিয়তি' দ্বারা নির্ধারিত নয়।

তবে সন্দেহ নেই যে শারীরবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। দুটি লিঙ্গের মধ্যে কোনো কঠোর জৈবিক স্বাতন্ত্র্য নেই : কিছু হরমোন ক্রিয়া করে একটি অভিন্ন দেহের ওপর, যার অভিমুখ– পুরুষত্ব বা নারীত্বের দিকে– নির্ধারিত হয় জিনসত্তা দিয়ে, তবে ভ্রূণের বিকাশের সময় এর গতিপথ কম-বেশি পাল্টে দেয়া সম্ভব, যার ফলে দেখা দেবে এমন ব্যক্তিরা, যারা কিছু কিছু ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর মাঝামাঝি। কিছু পুরুষের মধ্যে থাকে নারীর বৈশিষ্ট্য, কেননা তাদের পুরুষাঙ্গ বিকাশে বিলম্ব ঘটেছিলো : এজন্যেই আমরা মাঝেমাঝে দেখতে পাই মেয়ে ব'লে গণ্য কিছু মেয়ে– তাদের অনেকে বিশেষভাবে জড়িত থাকে খেলাধুলোয়– পরিবর্তিত হয়ে ছেলে হয়ে ওঠে। হেলেন ডয়েট্‌শ্ এক তরুণী মেয়ের রোগের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যে ব্যগ্রভাবে প্রেম নিবেদন করে এক বিবাহিত নারীর কাছে, হরণ ক'রে নিয়ে তার সাথে জীবন যাপন করতে চায়। পরে দেখা যায় সে আসলে ছিলো উভলিঙ্গ, এবং সে ওই নারীটিকে বিবাহবিচ্ছেদের পর বিয়ে করতে পেরেছিলো এবং অস্ত্রোপচারের পর তার অবস্থা স্বাভাবিক পুরুষের অবস্থা হয়ে উঠলে সে সন্তানও জন্ম দিতে পেরেছিলো। তবে কিছুতেই এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে প্রতিটি বিপর্যস্ত নারীই জৈবিকভাবে পুরুষ, যে উড়িয়ে চলছে প্রতারণামূলক পতাকা। উভলিঙ্গ, যার আছে উভয় লিঙ্গেরই কামপ্রত্যঙ্গ সংশ্রয়ের উপাদান, দেখাতে পারে নারীসুলভ কাম : আমি নিজেই চিনতাম এক নারীকে, নাটশিদের দ্বারা যে বহিষ্কৃত হয়েছিলো ভিয়েনা থেকে, তার দুঃখ ছিলো বিষমকামী পুরুষেরা বা সমকামীরা তার দিকে আকৃষ্ট হতো না, তবে সে নিজে আকর্ষণ বোধ করতো শুধু পুরুষদের প্রতি।

পুরুষ হরমোনের প্রভাবে 'পুরুষালি' ব'লে কথিত নারীদের মধ্যে দেখা দেয় পুরুষের অপ্রধান লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য, যেমন মুখে পশম গজায়; বালধর্মী নারীদের মধ্যে

উনতা থাকতে পারে স্ত্রী হরমোনের এবং তাই তাদের বিকাশ সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এসব বিশিষ্টতা কম-বেশি সরাসরিভাবে বিকাশ ঘটাতে পারে নারীসমকামী প্রবণতার। তেজস্বী, আক্রমণাত্মক, প্রাণোচ্ছল জীবনশক্তিসম্পন্ন নারী পছন্দ করে নিজেকে সক্রিয়ভাবে প্রদর্শন করতে এবং সাধারণত অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে অক্রিয়তা; অনুগ্রহবঞ্চিত, বিকলাঙ্গ কোনো নারী তার নিকৃষ্টতার ক্ষতিপূরণ করতে পারে পুরুষধর্মী বৈশিষ্ট্য ধারণ ক'রে; যদি তার কামানুভূতি অবিকশিত থাকে, তাহলে সে পুরুষের স্পর্শাদর কামনা করে না।

তবে দেহসংস্থান ও হরমোন শুধু প্রতিষ্ঠা করে একটি পরিস্থিতি এবং কোন দিকে পরিস্থিতিটির সীমাতিক্রমণ ঘটাতে হবে, তার লক্ষ্য নির্দেশ করে না। হেলেন ডয়েট্শ্ প্রথম মহাযুদ্ধের পোলীয় অনীকিনীর এক তরুণ সৈনিকের কথা উল্লেখ করেছেন, যে আহত হয়ে তাঁর কাছে আসে চিকিৎসার জন্যে এবং যে আসলে ছিলো সুস্পষ্টভাবে পুরুষের অপ্রধান লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক মেয়ে। সেবিকা হিসেবে সে যোগ দেয় সৈন্যবাহিনীতে, এবং তারপর সে সফল হয় তার লিঙ্গ গোপন ক'রে সৈনিক হ'তে। তবে সে প্রেমে পড়ে এক সঙ্গীর, এবং পরে সে সম্পন্ন করে এক অনুকূল উপযোজন। তার আচরণে তার সঙ্গীদের মনে হয় যে সে এক পুরুষ সমকামী, তবে বাস্তবিকভাবে তার পুরুষধর্মী জাঁক সত্ত্বেও তার নারীত্ব আবার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে নিজেকে। পুরুষ অবধারিতভাবে নারী কামনা করে না; পুরুষ সমকামীর যে থাকতে পারে একটি সুগঠিত পুরুষের দৈহিক গঠন, এটাই বোঝায় যে পুরুষধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো নারী সমকামিতার জন্যে অবধারিতভাবে দণ্ডিত নয়।

কখনো কখনো দাবি করা হয় যে বেশ স্বাভাবিক শারীরবৃত্তসম্পন্ন নারীদের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে 'ভগাঙ্কুরীয়' ও 'যোনীয়' ধরনের নারী, এদের প্রথমটির নিয়তি সমকামী প্রেম। তবে আমরা দেখেছি সমস্ত শৈশব কামই ভগাঙ্কুরীয়; এটা এ-স্তরেই স্থিত হয়ে থাকুক বা রূপান্তরিত হোক, তা অঙ্গসংস্থানের ব্যাপার নয়; প্রায়ই যা বলা হয়ে থাকে যে শৈশবের হস্তমৈথুনের ফলে পরে প্রধান হয়ে ওঠে ভগাঙ্কুর, তাও সত্য নয় : আজকাল যৌনবিজ্ঞান শিশুর হস্তমৈথুনকে বেশ স্বাভাবিক ও ব্যাপক প্রপঞ্চ ব'লেই গণ্য করে। নারীর কামের বিকাশ, আমরা দেখেছি, একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যা প্রভাবিত হয় শারীরবৃত্তিক ব্যাপার দিয়ে, তবে এটা নির্ভর করে অস্তিত্বের প্রতি ব্যক্তির মনোভাবের ওপর। মারানোঁ মনে করতেন যে কাম এক সম্মিলিত গুণ এবং পুরুষের মধ্যে এটা যেখানে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে, সেখানে নারীর মধ্যে এটা থাকে অর্ধবিকশিত স্তরে; শুধু একটি নারীসমকামীরই থাকতে পারে পুরুষের মতো সমৃদ্ধ একটি লিবিডো, এবং সুতরাং সে নির্দেশ করে এক 'শ্রেষ্ঠতর' নারী-ধরন। তবে সত্য হচ্ছে যে নারীর কামের আছে এক নিজস্ব সংগঠন, এবং তাই পুরুষের ও নারীর লিবিডো প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতার কথা বলা নিরর্থক; কামের সামগ্রিরূপে সে কী বেছে নেবে, তা কিছুতেই নারীটির কর্মশক্তির ওপর নির্ভর করে না

ফ্রয়েডের মতে, নারীর কামের পরিপক্বতার জন্যে ভগাঙ্কুরীয় স্তর থেকে যোনীয় স্তরে বদল দরকার, এ-পরিবর্তনটি শিশুর মায়ের প্রতি ভালোবাসা পিতার প্রতি ভালোবাসায় পরিবর্তিত করার সাথে প্রতিসম। নানা কারণে এ-বিকাশপ্রক্রিয়া ব্যাহত

হ'তে পারে; নারীটি তার 'খোজা' অবস্থা মেনে নাও নিতে পারে, তার শিশ্নের অভাব গোপন ক'রে রাখতে পারে নিজের কাছেও এবং স্থিত হয়ে থাকতে পারে মায়ের ওপর, যার বিকল্প সে নিরন্তর খুঁজে চলে।

অ্যাডলারের মতে, এ-বিকাশ স্থগিত হওয়া অক্রিয়ভাবে ভোগ-করা দুর্ঘটনা নয় : এটা কামনা করেছে ব্যক্তিটিই, ক্ষমতাপ্রয়োগের ইচ্ছের মাধমে যে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে তার অঙ্গহানি এবং পুরুষটির অধীনতা না মেনে অভিন্ন হয়ে উঠতে চায় তার সাথে। শিশুসুলভ সংবন্ধনের ব্যাপারই হোক বা হোক পুরুষালি প্রতিবাদের ব্যাপার, সমকামকে গণ্য করা হয় বিকাশরুদ্ধতার ব্যাপার ব'লে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমকামী নারী 'উৎকৃষ্টতর' নারীর থেকে অধিকতর 'অবিকশিত' নারী নয়। ব্যক্তির ইতিহাস কোনো নিয়তিনির্ধারিত অগ্রসরণ নয়। সমকামিতা নারীর কাছে হ'তে পারে তার পরিস্থিতি থেকে পলায়নের একটি রীতি বা একে স্বীকার ক'রে নেয়ার ধরন। প্রথাগত নৈতিকতা অনুসরণের ফলে মনোবিশ্লেষকদের মহাভুলটি হচ্ছে সমকামকে কখনোই একটি অস্বাভাবিক প্রবণতা ছাড়া অন্য কিছু ব'লে গণ্য না করা।

নারী এমন এক অস্তিত্বশীল সত্তা, যার প্রতি আহ্বান জানানো হয় নিজেকে একটি বস্তু ক'রে তোলার জন্যে; কর্তা হিশেবে তার কামে আছে আক্রমণাত্মক উপাদান, যা পুরুষের শরীর দিয়ে পরিতৃপ্ত হয় না : তাই দেখা দেয় বিরোধ, যা কোনো উপায়ে মিটমাট করতে হয় তার কামের। সে-রীতিটিকেই স্বাভাবিক বা 'প্রাকৃতিক' ব'লে গণ্য করা হয় যেটি, তাকে কোনো পুরুষের কাছে শিকার হিশেবে ছেড়ে দিয়ে, তার কোলে একটা শিশু তুলে দিয়ে পুনরুদ্ধার করে তার সার্বভৌমত্ব : তবে এ-কল্পিত 'স্বাভাবিকত্ব' তৈরি হয় কম-বেশি স্পষ্টভাবে উপলব্ধ সামাজিক স্বার্থে। এমনকি বিষম কামেও থাকে আরো নানা উপায়। নারীর সমকামিতা হচ্ছে তার মাংসের অক্রিয়তার সাথে তার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধের মীমাংসা করার অন্যতম উদ্যোগ। এবং যদি প্রকৃতিকেই আবাহন করা হয়, তাহলে বলা যায় যে সব নারীই প্রাকৃতিকভাবে সমকামী। নারীসমকামীকে, প্রকৃতপক্ষে, চিহ্নিত করা হয় সে পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে ব'লে এবং সে নারীদেহ পছন্দ করে ব'লে; তবে প্রতিটি তরুণী ভয় পায় বিদ্ধকরণ ও পুরুষাধিপত্য, এবং পুরুষের দেহের প্রতি বোধ করে এক রকম ঘৃণা; অন্যদিকে, নারীদেহ, তার কাছে, যেমন পুরুষের কাছে, এক কামনার বস্তু।

প্রায়ই চিহ্নিত করা হয় দু-ধরনের নারীসমকামী : 'পুরুষধর্মী', যারা 'পুরুষের অনুকরণ করতে চায়', ও 'নারীধর্মী', যারা 'পুরুষকে ভয় পায়'। এটা সত্য যে সার্বিকভাবে শনাক্ত করা যায় বিপর্যস্ততার দুটি প্রবণতা; কিছু নারী অক্রিয়তা মেনে নেয় না, আর অন্য কিছু নারী চায় নারীর বাহু, যার ভেতরে তারা নিজেদের সমর্পণ করতে পারে অক্রিয়ভাবে। অনেক কারণে আমার ওপরের শ্রেণীকরণকে নিতান্তই খামখেয়ালি ব্যাপার ব'লে মনে হয়।

'পুরুষধর্মী' নারীসমকামীকে তার 'পুরুষকে অনুকরণ করার' ইচ্ছের সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তাকে অস্বাভাবিক ব'লে নির্দেশ করা। ইতিমধ্যেই আমি দেখিয়েছি যে সমাজ এখন পুরুষধর্মী-নারীধর্মী ব'লে নির্দেশ ক'রে থাকে যে-সব শ্রেণী, সেগুলো মেনে নিয়ে মনোবিশ্লেষকেরা সৃষ্টি ক'রে থাকেন কতো অজস্র

দ্ব্যর্থকতা। সত্য হচ্ছে যে পুরুষ আজ বোঝায় ধনাত্মকতা ও নিরপেক্ষতা– অর্থাৎ পুরুষ ও মানুষ– আর সেখানে নারী শুধুই ঋণাত্মক, স্ত্রীলিঙ্গ। যখনই নারী মানুষের মতো আচরণ করে, তখনই ঘোষণা করা হয় যে সে পুরুষের সাথে নিজেকে অভিন্ন ক'রে তুলছে। খেলাধুলো, রাজনীতি, ও মননশীল ব্যাপারে তার কর্মকাণ্ড, অন্য নারীদের প্রতি তার যৌন কামনা, সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা হয় 'পুরুষধর্মী প্রতিবাদ' ব'লে।

এ-ধরনের ব্যাখ্যার পেছনের প্রধান বিভ্রান্তিটি হচ্ছে যে স্ত্রীলিঙ্গ মানুষের পক্ষে নিজেকে *নারীধর্মী* নারী ক'রে তোলাই *প্রাকৃতিক* : এ-আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে বিষমকামী হওয়া, এমনকি মা হওয়াও, যথেষ্ট নয় : 'খাঁটি নারী' সভ্যতার তৈরি এক কৃত্রিম বস্তু, যেমন আগের দিনে তৈরি করা হতো খোজা। ছেনালিপনা, বশমানার জন্যে তার 'প্রবৃত্তি'গুলো আসলে প্রতিবোধনের ফল, যেমন প্রতিবোধনের ফল পুরুষের শিশ্নগর্ব। পুরুষ, প্রকৃতপক্ষে, সব সময় তার পুরুষপ্রবৃত্তিকে মেনে নেয় না; এবং নারীর জন্যে যে-প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়, সেটিকে নারীর পক্ষে একটু কম বশ্যতার সাথে গ্রহণ করার বিশেষ কারণ রয়েছে। 'হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষা' ও 'পুরুষধর্মী গূঢ়ৈষা' ধারণা আমাকে মনে করিয়ে দেয় দেনিস দ্য রজর্স-এর *পার দি দ্যিব্‌ল্*-এর গল্প : এক মহিলা মনে করে পল্লীগ্রামে ঘোরাঘুরির সময় কিছু পাখি তাকে আক্রমণ করেছিলো; কয়েক মাস মানসিক চিকিৎসার পরও তার আবিষ্টতা কাটে না, ডাক্তার একদিন তাঁর রোগীকে নিয়ে ক্লিনিকের বাগানে যান এবং দেখতে পান যে পাখি সত্যিই তাকে আক্রমণ করেছিলো! নারী হীনতা বোধ করে, কেননা আসলে নারীত্বের চাহিদাগুলো তাকে হীন ক'রে তোলে। সে স্বতস্ফূর্তভাবে হয়ে উঠতে চায় একটি পরিপূর্ণ মানুষ, একজন কর্তা, একটি স্বাধীন সত্তা, যার সামনে খোলা আছে বিশ্ব ও ভবিষ্যৎ; এ-বাসনাকে যে পুরুষধর্মিতার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়, তার কারণ হচ্ছে আজ নারীত্ব বোঝায় অঙ্গহানি। চিকিৎসকদের কাছে বিপর্যস্তরা যে-সব বিবৃতি দিয়েছে, সেগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে তাদের যা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে, এমনকি শৈশবেও, তা হচ্ছে তাদের নারীধর্মী ব'লে গণ্য করা। তারা বালিকাসুলভ কাজ করতে অপমান বোধ করে, চায় ছেলেদের খেলা ও খেলার সামগ্রি; তারা করুণা করে নারীদের, তারা ভয় পায় রমণীয় হয়ে উঠতে, বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে তারা অস্বীকৃতি জানায়।

এ-বিদ্রোহ কিছুতেই কোনো পূর্বনির্ধারিত সমকামিতার দ্যোতনা করে না। কলেৎ অদ্রি বারো বছর বয়সে যখন আবিষ্কার করেন তিনি কখনো নাবিক হ'তে পারবেন না, তখন তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। তার লিঙ্গ তার ওপর যে-সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দেয়, তার জন্যে ভবিষ্যৎমুখি নারীর পক্ষে ক্রোধ বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। সে কেনো এসব প্রত্যাখ্যান করবে, সেটা আসল প্রশ্ন নয় : বরং সমস্যাটি হচ্ছে একথা বোঝা যে কেনো সে মেনে নেবে এসব। নারী বশ্যতা ও ভীরুতার মাধ্যমে খাপ খাওয়ায়; কিন্তু এ-মেনে নেয়া সহজেই রূপান্তরিত হয় বিদ্রোহে, যদি সমাজ এর জন্যে যে-ক্ষতিপূরণ দেয়, সেগুলো অপ্রতুল হয়। এটাই ঘটবে সে-সব ক্ষেত্রে যেখানে কিশোরী বোধ করে যে সে নারী হিশেবে হীনভাবে সজ্জিত; বিশেষ ক'রে এভাবেই দেহসংস্থানগত সম্পদগুলো হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ; যে-নারী মুখাবয়বে ও দেহকাঠামোয় কুৎসিত, বা

নিজেকে সে অমন মনে ক'রে, সে প্রত্যাখ্যান করে নারীধর্মী নিয়তি, ওই নিয়তির জন্যে নিজেকে তার মনে হয় অনুপযুক্ত। তবে একথা বলা ভুল হবে যে পুরুষধর্মী প্রবণতা আয়ত্ত করা হয় নারীধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলোর অভাবের ক্ষতিপূরণের জন্যে; বরং সত্য হচ্ছে পুরুষের সুবিধাগুলো বিসর্জনের বিনিময়ে কিশোরীকে যে-সব সুযোগসুবিধা দেয়া হয়, সেগুলো খুবই অকিঞ্চিৎকর।

এমনকি যদি তার একটি চমৎকার দেহ ও সুন্দর মুখও থাকে, তবুও যে-নারী মগ্ন নিজের উচ্চাভিলাষী কাজে বা যে-নারী নিতান্তই সাধারণভাবে মুক্তি পেতে চায়, আরেকটি মানুষের জন্যে নিজের কাজ ছেড়ে দিতে সে অস্বীকার করবে; সে নিজেকে উপলব্ধি করে নিজের কাজে, শুধু নিজের সীমাবদ্ধ দেহে নয় : পুরুষের যে-বাসনা তাকে ক্ষীণ ক'রে আনে তার দেহের সীমানার মধ্যে, তা তাকে ততোটাই আহত করে যতোটা আহত করে তরুণ ছেলেকে; সে বশীভূত নারীদের প্রতি ততোটা ঘেন্না বোধ করে একজন পৌরুষসম্পন্ন পুরুষ যতোটা ঘেন্না বোধ করে একটি অক্রিয় বালকসংসর্গকারীর প্রতি। এ-ধরনের নারীর সাথে দুষ্কর্মে তার সহযোগিতা আছে আংশিকভাবে এ-ধারণা অস্বীকার করার জন্যে সে নেয় পুরুষধর্মী মনোভাব; সে নেয় পুরুষের পোশাক, আচরণ, ভাষা; নারীধর্মী কোনো নারীসঙ্গীর সঙ্গে সে গ'ড়ে তোলে যুগল, যাতে সে নেয় পুরুষ মানুষের ভূমিকা : সত্যিই সে অভিনয় করে 'পুরুষধর্মী প্রতিবাদ'-এর। কিন্তু এটা এক গৌণ প্রপঞ্চ; যা মুখ্য তা হচ্ছে মাংসল শিকারে রূপান্তরিত হওয়ার কথা ভাবতেই বিজয়ী ও সার্বভৌম কর্তা বোধ করে এক লজ্জাপূর্ণ প্রবল অনীহা। বহু নারী ক্রীড়াবিদ সমকামী; শরীর জ্ঞাপন করে পেশি, সক্রিয়তা, সাড়াদানপ্রবণতা, প্রচণ্ড বেগে ধাবমান, তারা ওই শরীরকে অক্রিয় মাংস ব'লে গণ্য করে না; এটা ঐন্দ্রজালিকভাবে প্রণয়স্পর্শ জাগায় না, এটা বিশ্বের সাথে কাজের একটি উপায়, বিশ্বে এটি নিতান্তই একটি বস্তুধর্মী জিনিশ নয় : নিজের-জন্যে-দেহ ও অন্যদের-জন্যে-দেহের মাঝখানে আছে যে-বিরাট ব্যবধান, এক্ষেত্রে তা দুস্তর মনে হয়। সদৃশ প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া যাবে নির্বাহী ও মননশীল ধরনের নারীদের মধ্যে, যাদের পক্ষে সমর্পণ, এমনকি দেহও, অসম্ভব।

নারী চিত্রকর ও লেখকদের অনেকেই সমকামী। ব্যাপারটি এমন নয় যে তাদের যৌন-বিশিষ্টতা তাদের সৃষ্টিশীল শক্তির উৎস বা এ নয় যে এটা নির্দেশ করে শ্রেষ্ঠতর ধরনের শক্তি; বরং ব্যাপারটি হচ্ছে তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে মগ্ন ব'লে তারা একটা নারীধর্মী ভূমিকা পালন ক'রে বা পুরুষের সাথে লড়াই ক'রে সময় নষ্ট করতে চায় না। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না ক'রে তারা একে মেনে নেয়ার ভান করতে চায় না বা নিজেদের ক্লান্ত করতে চায় না প্রতিবাদ ক'রে। তারা কামসুখের মধ্যে চায় শমন, প্রশমিতকরণ, ও বিনোদন : তারা এড়িয়ে চলে এমন সাথী, যে দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে; এবং এভাবে তারা নিজেদের মুক্ত রাখে নারীত্বের মধ্যে দ্যোতিত বেড়ি থেকে।

তবে নারীটি যদি হয় আধিপত্যধর্মী ব্যক্তিত্বের, তাহলে তার কাছে সমকামিতাকে সব সময় পুরোপুরি সন্তোষজনক সমাধান ব'লে মনে হয় না। সে যেহেতু চায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা, তাই তার নারীধর্মী সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না করা তার কাছে অসন্তোষজনক মনে হয়; বিষমকামী সম্পর্ককে তার একই সঙ্গে মনে হয় হীনকর ও

সমৃদ্ধিকর; তার লিঙ্গের মধ্যে দ্যোতিত রয়েছে যে-সীমাবদ্ধতা, তা অস্বীকার ক'রে তার মনে হয় সে নিজেকে সীমিত করছে অন্যভাবে। ঠিক যেমন কামশীতল নারী চায় কামসুখ যখন সে তা প্রত্যাখ্যান করে, ঠিক তেমনি নারীসমকামীও চাইতে পারে স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণ নারী হ'তে, যদিও সে অমন না হওয়াই পছন্দ করে।

নারীসমকামী সানন্দে মেনে নিতে পারে তার নারীত্বের ক্ষতি, যদি এটা ক'রে সে লাভ করে এক সফল পুরুষত্ব; যদিও কৃত্রিম উপায়ে সে দয়িতার সতীত্বমোচন করতে পারে ও তাকে অধিকার করতে পারে, তবুও সে খোজা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং এ-বোধ থেকে সে পেতে পারে নিদারুণ কষ্ট। সে নারী হিশেবে অপরিপূর্ণ, পুরুষরূপে নপুংসক, এবং তার ব্যাধি পরিণত হ'তে পারে মনোবৈকল্যে। দালবিজকে এক রোগী বলেছিলো : 'যদি বিদ্ধকরণের জন্যে আমার একটা কিছু থাকতো, তাহলে অনেক ভালো হতো।' আরেকজন চেয়েছিলো তার স্তন শক্ত হোক। নারীসমকামী প্রায়ই তার পুরুষত্বের নিকৃষ্টতার ক্ষতিপূরণ করতে চায় ঔদ্ধত্য দিয়ে, দেহপ্রদর্শন ক'রে, যা দিয়ে সে অস্বীকার করে একটা আন্তর ভারসাম্যহীনতাকে।

এর ওপর জোর দেয়া অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যে নিজেকে বস্তুতে পরিণত করতে অস্বীকার সব সময় নারীকে সমকামিতার দিকে নিয়ে যায় না; উল্টোভাবে, অধিকাংশ নারীসমকামী চর্চা করতে চায় তাদের নারীত্বের সম্পদগুলোর। একটি অক্রিয় বস্তুতে পরিণত হ'তে ইচ্ছুক হওয়া ব্যক্তিতার সব দাবি অস্বীকার করা নয় : নিজেকে বস্তুর গুণবিশিষ্ট ক'রে এভাবে নারী পোষণ করে তার আত্মসিদ্ধির আশা; তবে তখন সে নিজেকে লাভ করতে চেষ্টা করবে নিজের অপরত্বের মধ্যে, তার বিকল্প সত্তার মধ্যে। যখন সে একলা, তখন সে সত্যিই তার ডবল সৃষ্টি করতে সফল হয় না; যদি সে মর্দন করে নিজের স্তন, তবুও সে জানে না একটা অচেনা হাতের কাছে তার স্তন কেমন লাগতো, এও জানে না একটি অচেনা হাতের ছোঁয়ায় কেমন লাগতো তার স্তনের; একটি পুরুষ তার কাছে *তার জন্যে* প্রকাশ করতে পারে তার মাংসের অস্তিত্ব–অর্থাৎ, সে নিজে তার দেহটিকে যেভাবে বোধ করে, সেভাবে, এটা *অন্যদের কাছে* যেমন, সেভাবে নয়। শুধু যখন তার আঙুল ধীরেধীরে চলে অন্য কোনো নারীর শরীরে এবং অন্য নারীর আঙুল ধীরেধীরে চলে তার শরীরে, তখনই সম্পন্ন হয় দর্পণের অলৌকিক কাণ্ড। পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রেম একটি কর্ম; এতে প্রত্যেকে অপর হয়ে ওঠে নিজের থেকে ছিন্ন হয়ে। নারীদের মধ্যে প্রেম ধ্যানমগ্নতা; এ-প্রণয়স্পর্শের লক্ষ্য অন্যকে অধিকার করা নয়, এর লক্ষ্য ধীরেধীরে অন্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে পুনর্সৃষ্টি করা; লুপ্ত হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতা, কোনো সংগ্রাম নেই, জয় নেই, পরাজয় নেই; যথাযথ পারস্পরিকতায় একই সময়ে প্রত্যেকেই কর্তা ও কর্ম, প্রভু ও দাস; দ্বৈততা হয়ে ওঠে পারস্পরিকতা।

এ-প্রতিবিম্বন নিতে পারে একটা মাতৃধর্মী ছাঁচ; মা নিজেকে দেখতে পায় ও প্রক্ষেপ করে মেয়ের মধ্যে, এবং প্রায়ই মেয়ের প্রতি থাকে তার একটা যৌন আকর্ষণ; নারীসমকামীর সাথে তার আছে একটি অভিন্ন কামনা যে একটি নরম মাংসের বস্তুকে সে নিজের বাহুতে রক্ষা করবে এবং দোলাবে। কলেৎ প্রকাশ করেন এ-সাদৃশ্যটি, যখন তিনি *ব্রিলে দ্য ল ভিন*-এ লেখেন : 'তুমি আনন্দ দেবে আমাকে, আমার ওপর

বেঁকে প'ড়ে, যখন, মায়ের উদ্বেগে দু-চোখ ভ'রে, তুমি তোমার প্রতি সংরক্তজনের মধ্যে খোঁজো সে-শিশুকে, যাকে তুমি জন্ম দাও নি'; এবং রেনি ভিভিয়েঁ তাঁর আরেকটি কবিতায় বিকাশ ঘটিয়েছেন একই ভাবাবেগের : '... তোমাকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে আমার বাহু দুটিকে করা হয়েছে উৎকৃষ্টতর... উষ্ণ দোলনার মতো যেখানে তুমি পাবে বিশ্রাম।'

সব প্রেমেই– তা কামধর্মীই হোক বা হোক মাতৃধর্মী– একই সঙ্গে আছে স্বার্থপরতা ও মহত্ত্ব, অপরকে অধিকার করার এবং অপরকে সব কিছু দেয়ার বাসনা; তবে মা ও নারীসমকামী একই রকম বিশেষ ক'রে যতোটা মাত্রায় তারা উভয়েই আত্মরতিপরায়ণ, যতোটা অনুরক্ত তারা যথাক্রমে মেয়ের প্রতি বা বান্ধবীর প্রতি, তাদের প্রত্যেকের কাছে মেয়ে বা বন্ধু হচ্ছে নিজের প্রক্ষেপণ বা প্রতিফলন।

তবে আত্মরতি– মায়ের প্রতি সংবন্ধনের মতোই– সব সময় সমকামিতার দিকে নিয়ে যায় না, উদাহরণস্বরূপ, এটা যেমন প্রমাণ হয়েছে মারি বাশকির্তসেভের বেলা, যাঁর লেখায় নারীর প্রতি প্রীতির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়কাতর ছিলেন না, ছিলেন বুদ্ধিপ্রধান, এবং ছিলেন চরম আত্মাভিমানী, বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে পুরুষেরা তাঁকে দেবে উচ্চমর্যাদা : তিনি শুধু তার প্রতিই আগ্রহী ছিলেন, যা বাড়াতে পারে তার গৌরব। যে-নারী দেবতারূপে পুজো করে শুধু নিজেকে এবং যার লক্ষ্য সাধারণভাবে সাফল্য, সে অন্য নারীর প্রতি উষ্ণ অনুরাগ পোষণ করতে ব্যর্থ হয়; সে তাদের মধ্যে দেখতে পায় শুধু শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী।

সত্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী হেতু কখনোই মাত্র একটি নয়; সব সময়ই এটা এক পছন্দের ব্যাপার, যাতে পৌঁছোনো হয় একটা জটিল সামগ্রিক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে, এবং একটা স্বাধীন সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি ক'রে; কোনো যৌন নিয়তি নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করে না : বরং তার কামের ধরন জীবন সম্পর্কে তার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।

তবে পছন্দের ওপর থাকে পারিবেশিক পরিস্থিতির বিশেষ প্রভাব। আজ দুটি লিঙ্গ সাধারণত যাপন করে বিচ্ছিন্ন জীবন : মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয়ে ও শিক্ষা-আশ্রমে দ্রুত ঘটে অন্তরঙ্গতা থেকে যৌনতা; যে-সব পরিবেশে ছেলেমেয়েদের সংসর্গের ফলে বিষমকামী অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশি, সেখানে নারীসমকামীর সংখ্যা অনেক কম। বহু নারী, যারা কারখানায় ও অফিসে নারীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কাজ করে, যারা পুরুষ দেখতে পায় খুবই কম, তারা কামনাপূর্ণ বন্ধুত্ব গ'ড়ে তোলে নারীদের সাথেই : তারা দেখতে পায় যে নিজেদের জীবন জড়িয়ে ফেলা তাদের জন্যে বস্তুগত ও নৈতিকভাবে সহজ। বিষমকামী সম্পর্কের অভাবে বা ওটা লাভ কঠিন হ'লে তারা বাধ্য হয় বিপর্যস্ত হ'তে। হাল-ছাড়া-ভাব ও অনুরাগের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন : পুরুষ তাকে নিরাশ করেছে ব'লে কোনো নারী অন্য নারীদের প্রতি অনুরক্ত হ'তে পারে, তবে অনেক সময়ই পুরুষ তাকে নিরাশ করেছে এজন্যে যে পুরুষের মধ্যে সে আসলে খুঁজেছিলো নারী।

এসব কারণে সমকামী ও বিষমকামী নারীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা ভুল। যখন একবার পার হয়ে যায় কৈশোরের অনিশ্চিত সময়, স্বাভাবিক পুরুষ নিজেকে আর

সমকামী প্রমোদ আহরণ করতে দেয় না, কিন্তু স্বাভাবিক নারী প্রায়ই ফিরে আসে সেই প্রেমে– প্লাতোয়ী বা অপ্লাতোয়ী– যা মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো তার যৌবনকে। পুরুষ তাকে হতাশ করেছে ব'লে নারীর মধ্যে সে খুঁজতে পারে এমন একটি প্রেমিককে, যে স্থান নেবে সে-পুরুষের, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সাথে। নারীর জীবনে নিষিদ্ধ সুখ প্রায়ই যে সান্ত্বনার কাজ করে, কলেৎ তা নির্দেশ করেছেন তাঁর *ভাগাবঁদ*-এ : কিছু নারী তাদের সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দেয় এমন সান্ত্বনায়।

অন্য দিকে, যে-নারী তার নারীত্ব উপভোগ করতে চায় নারীর বাহুবন্ধনে, সে গর্ববোধ করতে পারে যে সে কোনো প্রভুর আদেশ মানছে না। রেনি ভিভিয়েন ভীষণ ভালোবাসতেন নারীর সৌন্দর্য, এবং তিনি রূপসী হ'তে চাইতেন; তিনি নিজেকে সাজাতেন, গর্ববোধ করতেন নিজের দীর্ঘ চুলের; কিন্তু সুখ পেতেন স্বাধীন থাকতে, রক্ষণীয় থাকতে। তাঁর কবিতায় তিনি তিরষ্কার করেছেন সে-সব নারীকে, যারা বিয়ের মাধ্যমে পুরুষের দাসী হ'তে রাজি হয়। কড়া পানীয়র প্রতি তাঁর অনুরাগ, কখনো কখনো তাঁর অশ্লীল ভাষা প্রদর্শন করে তাঁর পৌরুষকামনা। অধিকাংশ যুগলেই প্রণয়স্পর্শ পারস্পরিক। তাই দুজন সঙ্গীর বিশেষ ভূমিকা কোনোক্রমেই সুনির্দিষ্টভাবে সুস্থিত নয় : শিশুসুলভ প্রকৃতির নারীটি ভূমিকা নিতে পারে সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত যুবকের, যে জড়িত আছে একজন নিরাপত্তাদাত্রী মাতৃর সাথে বা ভূমিকা নিতে পারে প্রেমিকের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ কোনো দয়িতার। তারা তাদের প্রেম উপভোগ করতে পারে সমান অবস্থানে থেকে। সঙ্গীরা যেহেতু সদৃশ, মূলত একই রকম, তাই সম্ভব সব ধরনের সমবায়, স্থানবিন্যাস, বিনিময়, *রঙ্গ*। দু-বন্ধুর প্রত্যেকের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুসারে তাদের সম্পর্ক হয়ে ওঠে ভারসাম্যপূর্ণ। যদি তাদের একজন অপরকে সাহায্য ও ভরণপোষণ করে, সে নেয় পুরুষের ভূমিকা : স্বৈরাচারী রক্ষক, শোষিত ছলনাকারী, শ্রদ্ধেয় প্রভু ও মনিব, এবং কখনো কখনো বেশ্যার দালালের; নৈতিক, সামাজিক, বা মননগত শ্রেষ্ঠত্ব তাকে দিতে পারে কর্তৃত্ব।

তবে এমন দৃষ্টান্ত বেশ দুর্লভ। অধিকাংশ নারীসমকামীই, যেমন আমরা দেখেছি, বাকসংযমের সাথে পুরুষদের এড়িয়ে চলে : কামশীতল নারীদের মতো তাদের মধ্যেও আছে একটা বিরক্তি, ভীরুতা, গর্বের বোধ; তারা নিজেদের পুরুষের সমকক্ষ ব'লে বোধ করে না; তাদের নারীসুলভ বিরক্তির সাথে যুক্ত হয় একটা পুরুষসুলভ হীনম্মন্যতাবোধ; পুরুষেরা এমন প্রতিপক্ষ, যারা পটিয়ে সম্ভোগের, অধিকারের, ও তাদের শিকারকে কবলে রাখার জন্যে উৎকৃষ্টতর রূপে সজ্জিত; পুরুষ নারীকে যেভাবে 'দূষিত' ক'রে, তা তারা অপছন্দ করে। পুরুষ পাচ্ছে সামাজিক সুযোগসুবিধা, এটা দেখে এবং পুরুষ তাদের থেকে শক্তিশালী, এটা অনুভব ক'রেও তারা ক্রুদ্ধ হয় : প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করতে না পারা, এটা জানা যে সে তোমাকে এক মুষ্টাঘাতে ধরাশায়ী করতে পারে, এটা জ্বালা দেয়ার মতো অবমাননা। এ-জটিল শত্রুতার কারণেই কিছু নারীসমকামী নিজেদের ক'রে তোলে দৃষ্টি-আকর্ষক; তারা একসঙ্গে জড়ো হয়; সামাজিকভাবে ও কামে তাদের কোনো দরকার নেই পুরুষের, এটা দেখানোর জন্যে তারা গ'ড়ে তোলে এক ধরনের সংঘ। এ থেকে শূন্যগর্ভ বড়াই ও অভিনয়ের স্তরে নেমে যাওয়া সহজ, যা উৎসারিত হয় আন্তরিকতাহীনতা থেকে।

নারীসমকামী প্রথমে অভিনয় করে যে সে পুরুষ; তারপর নারীসমকামী হওয়ায় সে পরিণত হয় একটা শিকারে; পুরুষের পোশাক, প্রথমে যা ছিলো একটি ছদ্মবেশ, তা পরে হয়ে ওঠে উর্দি; এবং পুরুষের পীড়ন এড়ানোর নামে সে দাসী হয়ে ওঠে সে-চরিত্রটির, যেটির সে অভিনয় করে; নারীর পরিস্থিতিতে বন্দী থাকতে না চেয়ে সে বন্দী হয়ে পড়ে নারীসমকামীর পরিস্থিতিতে।

সত্য হচ্ছে সমকামিতা যতোটা ভাগ্যের অভিশাপ ততোটা স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি নয়। এটা *এক বিশেষ পরিস্থিতিতে পছন্দ করা* মনোভাব– অর্থাৎ, এটা একই সময়ে প্রণোদিত ও স্বাধীনভাবে গৃহীত। এ-পছন্দকরণের সাথে জড়িত যে-সব ব্যাপার, সেগুলোর কোনোটিই– শারীরবৃত্তিক অবস্থা, মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস, সামাজিক পরিস্থিতি– নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান নয়, যদিও সবগুলোই এর ব্যাখ্যার জন্যে দরকার। নারীর পরিস্থিতি সাধারণভাবে যে-সমস্যা সৃষ্টি করে, এবং তার যৌন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে-বিশেষ সমস্যা, এটা তার সমাধানের অন্যতম উপায়। সমস্ত মানবিক আচরণের মতোই সমকামিতা নিয়ে যায় ভান, ভারসাম্যহীনতা, হতাশা, মিথ্যাচারের দিকে, বা উল্টোভাবে, এটা হয়ে ওঠে মূল্যবান অভিজ্ঞতাপুঞ্জের উৎস।

ভাগ ৫

পরিস্থিতি

পরিচ্ছেদ ১

বিবাহিত নারী

সমাজের দেয়া নারীর প্রথাগত নিয়তি হচ্ছে বিয়ে। এটা এখনো সত্য যে অধিকাংশ নারীই বিবাহিত, বা বিবাহিত ছিলো, বা বিয়ের পরিকল্পনা করছে, বা বিয়ে না হওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে। কুমারীব্রতী নারীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায়িত করতে হয় বিয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে, সে কি নিরাশ, না কি বিদ্রোহী, না কি ওই প্রথার প্রতি উদাসীন। আমাদের তাই বিয়ে বিশ্লেষণ ক'রেই এ-বিষয়ে অগ্রসর হ'তে হবে।

নারীর পরিস্থিতিতে যে-আর্থনীতিক বিবর্তন ঘটছে, তাতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে বিবাহপ্রথা : এটা হয়ে উঠছে দুটি স্বাধীন মানুষের নিজেদের সানন্দ সম্মতিতে উপনীত মিলন; চুক্তিকারী দু-পক্ষের বাধ্যবাধকতা ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক; ব্যভিচার উভয়ের জন্যেই একটা চুক্তিভঙ্গ; একই কারণে একজন বা অপরজন বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। নারী আর প্রজননের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ নয়, যা তার প্রাকৃতিক দাসীত্বের চরিত্র অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে এবং এখন প্রজনন গণ্য হচ্ছে একটি স্বেচ্ছাপালিত ভূমিকা হিশেবে; এবং এটি উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কেননা, অনেক ক্ষেত্রে, গর্ভধারণের জন্যে মা যে-সময়টা অবকাশ হিশেবে নেয়, তার ব্যয় বহন করে রাষ্ট্র বা নিয়োগকারী। তবুও আমরা বাস করছি যে-পর্বে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি একটি ক্রান্তিকাল। নারীজনসংখ্যার একটি অংশমাত্র নিয়োজিত উৎপাদনে, এবং এমনকি যারা নিয়োজিত, তারা অন্তর্ভুক্ত এমন সমাজের, যাতে প্রাচীন রীতিনীতি ও প্রাচীন কালের মূল্যবোধ আজো টিকে আছে। আধুনিক বিয়েকে বোঝা যাবে শুধু অতীতের আলোকে, যা নিজেকে স্থায়ী করতে চায়।

বিয়ে সব সময়ই নারী ও পুরুষের জন্যে খুবই ভিন্ন জিনিশ। দুটি লিঙ্গ পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়, কিন্তু এ-প্রয়োজন তাদের মধ্যে কখনোই পারস্পরিকতার অবস্থা সৃষ্টি করে নি; আমরা দেখেছি যে নারী কখনোই এমন একটি জাত হয়ে ওঠে নি, যারা সমান অবস্থানে থেকে পুরুষজাতের সাথে দেয়ানেয়া বা চুক্তি করেছে। পুরুষ সামাজিকভাবে এক স্বাধীন ও পরিপূর্ণ মানুষ; সর্বপ্রথম তাকে গণ্য করা হয় একজন

উৎপাদনকারীরূপে, গোত্রের জন্যে সে যে-কাজ করে, যা দিয়ে প্রতিপন্ন হয় তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য : আমরা দেখেছি প্রজননের ও গৃহস্থালির যে-ভূমিকায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে নারীকে, সেটা কেনো তাকে সমমর্যাদার নিশ্চয়তা দেয় নি। নারী, দাসী বা প্রজা হিশেবে, বিন্যস্ত হয়েছে পরিবারের মধ্যে, যাতে আধিপত্য করে পিতারা বা ভ্রাতারা, এবং তাকে সব সময়ই কোনো পুরুষ বিয়ে দিয়েছে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে। আদিম সমাজে পিতার গোত্র বস্তুর মতোই বর্জন করতো নারীদের : দু-গোত্রের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হতো নারী। বিবর্তনের ফলে বিয়ে যখন চুক্তির রূপ নেয়, তখনও পরিস্থিতির বিশেষ বদল ঘটে নি। দীর্ঘকাল ধ'রে চুক্তি সম্পন্ন হয় শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে নয়; একমাত্র বিধবাই তখন ভোগ করতো আর্থস্বাধীনতা। তরুণীর পছন্দের স্বাধীনতা সব সময়ই ছিলো খুবই সীমিত; আর কুমারীব্রত– এটা যখন পবিত্ররূপ ধারণ করতো, সেগুলো ছাড়া– তাকে পরিণত করতো পরগাছা ও অস্পৃশ্য সমাজচ্যুত মানুষে; বিয়েই তার ভরণপোষণের ও তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের একমাত্র উপায়। দু-কারণে তার ওপর দেয়া হতো এ-আদেশ।

প্রথম কারণ হচ্ছে সমাজকে নারীর দিতে হবে সন্তান; খুব কম সময়ই– যেমন স্পার্টায় ও কিছুটা নাটশিদের শাসনকালে– রাষ্ট্র নারীকে সরাসরি নিয়েছে নিজের অভিভাবকত্বে এবং তার কাছে চেয়েছে সে শুধু হবে মা। কিন্তু এমনকি আদিম সমাজগুলোও, যারা জানতো না প্রজননে পিতার ভূমিকা, তারাও দাবি করতো নারীর থাকতে হবে একটি স্বামী, এবং দ্বিতীয় যে-কারণে নারীর ওপর বিয়ের আদেশ দেয়া হয়, তা হচ্ছে পুরুষের কামক্ষুধা মেটানো এবং ঘরকন্নাও নারীর দায়িত্ব। সমাজ কর্তৃক নারীর ওপর অর্পিত এসব দায়িত্বকে ধরা হয় তার স্বামীর প্রতি *সেবাকর্ম* ব'লে : বিনিময়ে পুরুষটির নারীকে দিতে হবে উপহার, বা তাকে বিয়ে করতে হবে, এবং তার ভরণপোষণ করতে হবে। পুরুষের বহুবিবাহ সব সময়ই কম-বেশি অনুমোদন করা হয়েছে : পুরুষ সঙ্গম করতে পারে দাসী, উপপত্নী, রক্ষিতা, বেশ্যার সঙ্গে, কিন্তু তার বৈধ স্ত্রীর কিছু অধিকার তাকে মেনে নিতে হয়। যদি পীড়ন করা হয় স্ত্রীকে বা অন্যায় করা হয় তার প্রতি, তাহলে স্ত্রীর অধিকার আছে– কম-বেশি স্পষ্টভাবে যার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে– নিজের পরিবারে ফিরে যাওয়ার এবং পৃথক বাসের বা বিবাহবিচ্ছেদ লাভের।

তাই উভয় পক্ষের জন্যেই বিয়ে একই সময়ে ভার ও সুবিধা; কিন্তু দুটি লিঙ্গের পরিস্থিতির মধ্যে কোনো প্রতিসাম্য নেই; মেয়েদের সমাজে বিন্যস্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিয়ে, এবং যদি তারা থাকে অবাঞ্ছিত, তাহলে সামাজিকভাবে তাদের গণ্য করা হয় অপচয় ব'লে। এজন্যেই মায়েরা মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্যে সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকে। গত শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিয়ের ব্যাপারে নারীদের সঙ্গে আদৌ কোনো আলাপ করা হতো না।

এমন পরিস্থিতিতে মেয়েটি থাকে চূড়ান্তভাবে অক্রিয়; তাকে বিয়ে দেয়া হয়, পিতামাতারা তার বিয়ে *দেয়*। ছেলেরা বিয়ে *করে*, তারা পত্নী *গ্রহণ করে*। বিয়ের মধ্যে তারা চায় বৃদ্ধি, তাদের অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রতিপাদন, শুধু টিকে থাকার অধিকার নয়; এটা একটি দায়িত্ব, যা তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

বিয়ে ব'সে নারী নিজের ব'লে কিছুটা ভাগ পায় বিশ্বের; আইনগত অঙ্গীকার তাকে রক্ষা করে পুরুষের খামখেয়ালি কাজ থেকে; তবে সে হয়ে ওঠে পুরুষের ক্রীতদাসী। পুরুষটি এ-যৌথ উদ্যোগের আর্থনীতিক প্রধান; এবং এর পর থেকে সমাজের চোখে পুরুষটিই এ-উদ্যোগের প্রতিনিধিত্ব করে। নারীটি গ্রহণ করে পুরুষটির নাম; নারীটি অন্তর্ভুক্ত হয় পুরুষটির ধর্মে, তার শ্রেণীতে, তার সমাজে; নারীটি যোগ দেয় পুরুষটির পরিবারে, নারীটি হয়ে ওঠে পুরুষটির 'অর্ধেক'। পুরুষটি তার কাজের জন্যে যেখানে যায়, নারীটি সেখানে অনুসরণ করে তাকে এবং পুরুষটিই ঠিক করে তাদের বাসস্থান; নারীটি কম-বেশি চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করে অতীতের সাথে সম্পর্ক, সে তার স্বামীর জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়; নারীটি পুরুষটিকে দেয় তার দেহ, কুমারীত্ব এবং তাকে পালন করতে হয় কঠোর সতীত্ব। অবিবাহিত নারী আইনগতভাবে যা-কিছু অধিকার পায়, সে তা হারিয়ে ফেলে। রোমান আইন স্বামীর হাতে স্ত্রীকে ন্যস্ত করেছে *লোকো ফিলিয়ায়ে*, কন্যার স্থানে; উনিশ শতকের শুরুর দিকে রক্ষণশীল লেখক বোনাল্দ্ ঘোষণা করেছিলেন শিশু যেমন মায়ের কাছে তেমনি স্ত্রী তার স্বামীর কাছে; ১৯৪২-এর আগে পর্যন্ত ফরাশি আইন দাবি করতো যে স্ত্রীকে হ'তে হবে স্বামীর অনুগত; আইন ও প্রথা আজো স্বামীকে দেয় মহাকর্তৃত্ব।

স্বামীটিই যেহেতু উৎপাদনশীল কর্মী, তাই সে-ই পারিবারিক স্বার্থ পেরিয়ে ঢোকে সমাজের স্বার্থে, সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য উন্মুক্ত করে নিজের জন্যে একটি ভবিষ্যৎ; সে হয় সীমাতিক্রমণতার প্রতিমূর্তি। নারী নষ্ট হয় প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার এবং গৃহস্থালির কাজে— অর্থাৎ বলা যায়, সীমাবদ্ধতায়।

বিয়েতে আজো অনেকাংশে টিকে আছে এ-প্রথাগত রূপ। প্রথমত, যুবকের থেকে অনেক বেশি স্বৈরাচারিতার সাথে এটা চাপিয়ে দেয়া হয় যুবতীর ওপর। সমাজে আজো আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যেগুলোতে তরুণীর জন্যে আর কোনো ঘটনাপরম্পরা খোলা নেই; পল্লীর শ্রমিকদের মধ্যে অবিবাহিত নারী এক অস্পৃশ্য ব্রাত্য মানুষ; সে হয়ে থাকে তার পিতার, বা তার ভাইদের, বা তার দুলাভাইয়ের দাসী; যারা নগরে চ'লে যায়, সে তাদের সঙ্গে যেতে পারে না; বিয়ে তাকে একটি পুরুষের দাসী ক'রে তোলে, তবে এটা তাকে একটা গৃহের গৃহিণীও করে। মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু কিছু বৃত্তে তরুণী আজো নিজের জীবিকা অর্জনে অসমর্থ; সে পারে শুধু তার বাপের বাড়িতে একটা পরগাছা হয়ে থাকতে বা কোনো অচেনা মানুষের বাড়িতে নিতে পারে কায়িক শ্রমের কাজ। এমনকি যখন সে অনেকটা মুক্তও, তখনও পুরুষের আর্থিক সুবিধার কারণে সে কোনো কাজ করার থেকে বিয়েকেই বেশি পছন্দ করে : সে এমন একটি স্বামী খোঁজে, যে মর্যাদায় তার থেকে ওপরে বা যে তার থেকে দ্রুত বা বেশি সাফল্য লাভ করবে ব'লে সে আশা করে।

এখনো মেনে নেয়া হয় যে কামের ব্যাপারটি হচ্ছে, আমরা দেখেছি, পুরুষের প্রতি একটি সেবামূলক কর্ম; পুরুষ সম্ভোগ করে এবং নারীকে কিছুটা অর্থ পরিশোধ করে। নারীর দেহ একটা জিনিশ, যা সে ক্রয় করে; নারীর কাছে পুরুষটি হচ্ছে পুঁজি, যা সে শোষণ করতে পারে। অনেক সময় নারীটি পণ নিয়ে আসতে পারে; বা প্রায়ই নারীটি দায়িত্ব নেয় কিছু গৃহস্থালির কাজের : ঘর দেখাশোনার, সন্তান লালনপালনের। তা

যাই হোক, তার ভরণপোষণ লাভের অধিকার আছে এবং প্রথাগত নৈতিকতা এরই বিধান দেয়। স্বাভাবিকভাবেই সে প্ররোচিত হয় এ-সহজ উপায় দিয়ে, আরো অনেক বেশি প্ররোচিত হয় এ-কারণে যে নারীর জন্যে যে-সব পেশা খোলা আছে, সেগুলো অনুপযোগী ও সেগুলোতে বেতন খুবই কম; বিয়ে, এককথায়, আর সমস্ত থেকে অনেক বেশি সুবিধাজনক পেশা।

সামাজিক প্রথা অবিবাহিত নারীর যৌন স্বাধীনতা অর্জনকে আরো কঠিন ক'রে তোলে। ফ্রান্সে স্ত্রীর ব্যভিচারকে, আজ পর্যন্ত, গণ্য করা হয় আইনগত অপরাধ ব'লে, কিন্তু নারীর অবাধ যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ক'রে কোনো আইন নেই; তবুও অবিবাহিত নারী যদি প্রেমিক নিতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে বিয়ে বসতে হয়। এমনকি আজো অনেক সঠিক-আচরণশীল মধ্যবিত্ত তরুণী বিয়ে বসে 'শুধু স্বাধীন হওয়ার জন্যে'। বেশ কিছু মার্কিন তরুণী যৌন স্বাধীনতা লাভ করেছে; তবে তাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অনেকটা ম্যালিনোস্কির *দি সেক্সুয়াল লাইফ অফ দি স্যাভেজেজ*-এ বর্ণিত তরুণীদের মতো, যারা 'অবিবাহিত পুরুষদের গৃহ'-এ চর্চা করে অকিঞ্চিৎকর শৃঙ্গার : বোঝা যায় তারা পরে বিয়ে করবে যখন প্রাপ্তবয়স্ক ব'লে গণ্য হবে। আমেরিকায় কোনো একলা নারী নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করলেও সে একটি অসম্পূর্ণ সত্তা; যদি সে একজন মানুষের সম্পূর্ণ মর্যাদা অর্জন করতে চায় এবং লাভ করতে চায় তার পূর্ণ-অধিকার, তাকে পরতে হবে একটি বিয়ের আংটি। মাতৃত্ব সম্মানজনক শুধু বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রেই; অবিবাহিত মা জনমতের কাছে এক অপরাধী, এবং সারাজীবন তার শিশু তার জন্যে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা।

এসব কারণে বহু কিশোরীই– যেমন নতুন বিশ্বে তেমনি পুরোনোটিতে– যখন তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তারা আগের দিনের মতোই উত্তর দেয় : 'আমি বিয়ে করতে চাই।' কিন্তু কোনো যুবকই বিয়েকে তার মূল লক্ষ্য মনে করে না। আর্থিক সাফল্যই তাকে দেবে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মর্যাদা; এ-সাফল্যের মধ্যে বিয়ে থাকতে পারে– বিশেষ ক'রে কৃষকদের জন্যে– তবে এটা তাকে বিয়ে থেকে নিবৃত্তও করতে পারে। আধুনিক জীবনের অবস্থা– যা অতীত কালের থেকে কম সুস্থিত, অনেক বেশি অস্থির– যুবকের জন্যে বিয়ের শর্তগুলোকে বিশেষভাবে গুরুভার ক'রে তোলে। অন্য দিকে এর উপকারিতা অনেক ক'মে গেছে, কেননা এখন তার পক্ষে আহার ও বাসস্থান পাওয়া অনেক বেশি সহজ এবং যৌনপরিতৃপ্তি সাধারণভাবে সুলভ। সন্দেহ নেই বিয়ে দিতে পারে কিছু বস্তুগত ও যৌন সুবিধা : এটি ব্যক্তিকে মুক্তি দেয় নিঃসঙ্গতা থেকে, তাকে গৃহ ও সন্তান দিয়ে নিরাপত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করে স্থানে ও কালে; এটা তার অস্তিত্বের চূড়ান্ত চরিতার্থতা। তবে মোটের ওপর পুরুষদের চাহিদা নারীদের সরবরাহের থেকে কম। বলা যেতে পারে পিতারা কন্যা দান করে না, বরং মুক্তি পায় কন্যার ভার থেকে; স্বামীর খোঁজে থাকা মেয়ে পুরুষের চাহিদা অনুসারে সাড়া দেয় না, সে চেষ্টা করে একটা চাহিদা সৃষ্টি করতে।

ফ্রান্সে ঠিক-করা বিয়ে আজো অতীতের ব্যাপার নয়; একটা বিশাল সুদৃঢ় বুর্জোয়া শ্রেণী আজো এটি টিকিয়ে রেখেছে। নেপলিয়নের সমাধির চারপাশে, অপেরায়, বলনাচে, সৈকতে, চায়ের নিমন্ত্রণে বিবাহার্থী তরুণীটি, তার প্রতিটি চুল ঠিক জায়গায়

রেখে ও নতুন গাউন প'রে, ভীরুতার সাথে প্রদর্শন করে তার দেহের সৌন্দর্য ও বিনম্র আলাপচারিতা; পিতামাতা তাকে বলতে থাকে : 'নানাজনকে দেখে ইতিমধ্যেই তুমি আমার অনেক খরচ করিয়েছো; তুমি মন ঠিক করো। পরেরবার দেখানো হবে তোমার বোনকে।' অসুখী প্রার্থী বুঝতে পারে সে যতোই আইবুড়ো হবে, ততোই কমতে থাকবে তার সুযোগ; তাকে বিয়ে করার প্রার্থীর সংখ্যা কম : একপাল মেষের বিনিময়ে দান করা হয় যে-বেদুয়িন মেয়েটিকে, সে-মেয়েটির থেকে বেশি পছন্দের স্বাধীনতা তার নেই। কলেৎ এটা প্রকাশ করেছেন এভাবে : 'যে-মেয়ের কোনো ধনসম্পত্তি নেই বা নেই অর্থকরী পেশা... সে পারে শুধু সুযোগ এলে মুখ বুজে সেটি ধ'রে ফেলতে এবং বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে!'

তবে বিয়ের বাসনা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা প্রায়ই ভয় পায় বিয়েকে। তার জন্যে বিয়ে অনেক বেশি উপকারি পুরুষটির থেকে, তাই পুরুষটির থেকে মেয়েটি বেশি আগ্রহী হয় বিয়ের প্রতি; তবে এটা তার জন্যে অধিকতর আত্মবিসর্জনও, বিশেষ ক'রে এ-কারণে যে এর ফলে অতীতের সাথে তার সম্পর্কই ছিন্ন হয় প্রচণ্ডভাবে। আমরা দেখেছি বহু তরুণী বাপের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে; দিন যতোই ঘনিয়ে আসে যন্ত্রণা ততোই বাড়তে থাকে। এ-সময়েই অনেকের মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়; সে-যুবকের বেলাও একই ব্যাপার ঘটতে পারে, যে নতুন দায়িত্ব নিতে ভয় পায়; কিন্তু এটা অনেক বেশি ঘটে তরুণীদের ক্ষেত্রে, এটা ঘটার কারণ ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে, তবে এ-সংকট মুহূর্তে ওই কারণগুলো হয়ে ওঠে গুরুভার।

অনেক সময় বিয়েভীতির উদ্ভব ঘটে আগের কোনো অবিস্মরণীয় দুঃখজনক যৌন অভিজ্ঞতা থেকে, এবং প্রায়ই দেখা দেয় যে তার কুমারীত্বহানির ব্যাপারটি ধরা প'ড়ে যাবে, এ-ভয় থেকে। তবে একটি অচেনা পুরুষের কাছে নিজেকে দান করার ভাবনা যে প্রায়ই দুর্বহ হয়ে ওঠে, তার কারণ হচ্ছে বাপের বাড়ি ও পরিবারের সাথে মেয়েটির নিবিড় সম্পর্ক। এবং যারা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের অনেকে– কেননা এটা এমন কাজ, যা করতেই হবে, কেননা তাদের ওপর চাপ দেয়া হয়, কেননা এটাই একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সমাধান, কেননা স্ত্রী ও মা হিশেবে তারা চায় একটি স্বাভাবিক জীবন– তবুও তাদের মধ্যে থাকে একটা গোপন ও গভীরে-প্রোথিত প্রতিরোধের বোধ, যা বিবাহিত জীবনের শুরুর সময়টাকে কঠিন ক'রে তোলে, যা সুখকর ভারসাম্য অর্জনে চিরকাল বাধা দিতে পারে।

বিয়ে, তাই, সাধারণত প্রেমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ফ্রয়েড এটা প্রকাশ করেছেন এভাবে : 'স্বামীটি, বলতে গেলে, কখনোই প্রিয় পুরুষটির বিকল্প ছাড়া আর কিছু নয়, সে নিজে ওই পুরুষটি নয়।' এবং এ-পৃথকীকরণ কোনোভাবেই আকস্মিক ব্যাপার নয়। এ-প্রথার বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে এটা দ্যোতিত রয়েছে, যার লক্ষ্য পুরুষ ও নারীর আর্থিক ও যৌন মিলনের ফলে সমাজের স্বার্থ রক্ষা, তাদের ব্যক্তিগত সুখ নিশ্চিত করা নয়। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায়– যেমন আজো কিছু মুসলমানের মধ্যে– এমন হ'তে পারে যে পিতামাতারা যাদের বিয়ে ঠিক করেছে বিয়ের দিনের আগে তারা এমনকি পরস্পরের মুখও দেখে নি। সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবালুতা বা কামজ

কল্পনা ভিত্তি ক'রে একটা আজীবনের কর্মোদ্যোগ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না।

যেহেতু পুরুষটিই 'গ্রহণ করে' নারীটিকে, তাই তার পছন্দ-অপছন্দ করার কিছুটা বেশি সম্ভাবনা আছে– বিশেষ ক'রে যখন পাত্রীরা সংখ্যায় অজস্র। কিন্তু যৌনকর্মকে যেহেতু নারীর ওপর ন্যস্ত একটি *সেবামূলক* দায়িত্ব ব'লে গণ্য করা হয়, যার ভিত্তিতে তাকে দেয়া হয় সুযোগসুবিধা, তাই এটা যুক্তিসঙ্গত যে সে উপেক্ষা করবে তার ব্যক্তিগত বিশেষ অনুরাগগুলো। বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ হিশেবে নারীর স্বাধীনতা অস্বীকার করা; কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া যেহেতু প্রেমও থাকতে পারে না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও থাকতে পারে না, তাই নিজের জন্যে আজীবন কোনো একটি পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ লাভের ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্যে তাকে ছেড়ে দিতে হয় একটি বিশেষ ব্যক্তিকে ভালোবাসা। আমি এক পরিবারের এক ধার্মিক মাতাকে তার কন্যাদের বলতে শুনেছি 'প্রেম হচ্ছে পুরুষদের একটা স্থূল আবেগ এবং সাধ্বী নারীদের কাছে এটা অজানা।' নারীর সম্পর্কগুলো তার ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠে না, গ'ড়ে ওঠে সর্বজনীন অনুভূতির ভিত্তিতে; তাই তার পক্ষে পুরুষের মতো প্রাতিস্বিক কামনা পোষণ করা হচ্ছে তার জীবনবিধানকে দূষিত করা।

অর্থাৎ, একটি মনোনীত সঙ্গীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন নারীর কাজ নয়, তার কাজ হচ্ছে সাধারণভাবে নারীধর্মী ভূমিকাগুলো পালন করা; তাকে কামসুখ লাভ করতে হবে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট একটি রূপে, সেটা ব্যক্তিগত স্বভাবের হবে না। তার কামনিয়তির আছে দুটি অপরিহার্য পরিণতি : প্রথমত, বিবাহবহির্ভূত কোনো যৌন কর্মকাণ্ডের অধিকার তার নেই; যৌনসঙ্গম এভাবে হয়ে ওঠে একটি সংস্থা, সমাজের স্বার্থের কাছে গৌণ হয়ে ওঠে দুটি লিঙ্গেরই কামনা ও পরিতৃপ্তি; তবে কর্মী ও নাগরিক হিশেবে পুরুষ যেহেতু সর্বজনীনতার দিকে প্রসারিত, তাই সে বিয়ের আগে ও বিয়ের বাইরে উপভোগ করতে পারে আকস্মিক প্রমোদ।

নারীর কামহতাশাবোধকে পুরুষেরা সুচিন্তিতভাবে মেনে নিয়েছে; প্রকৃতিই দায়ী– এ-আশাবাদী দর্শন নির্ভর ক'রে তারা সহজেই মেনে নিয়েছে নারীর দুঃখকষ্ট : এটা তার ভাগ্য; বাইবেলের অভিশাপ তাদের এ-সুবিধাজনক মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গর্ভধারণের যন্ত্রণাদায়ক ভার– একটা ক্ষণিক ও অনিশ্চিত সুখের বিনিময়ে নারীর কাছে থেকে গুরুমূল্য আদায় ক'রে নেয়া– বিষয় হয়েছে বহু অশালীন ঠাট্টাবিদ্রূপের। 'পাঁচ মিনিটের সুখ : নয় মাসের কষ্ট', এবং 'বেরোনোর থেকে এটা ঢোকে সহজে'– এটা এক কৌতুককর প্রতিতুলনা। তবে এ-দর্শনের ভেতরে আছে ধর্ষকাম। অনেক পুরুষ উপভোগ করে নারীর কষ্ট এবং ভাবতেই অস্বীকার করে যে এটা দূর করা দরকার। তাই বোঝা যায় তাদের সঙ্গিনীদের কামসুখ অস্বীকার করতে পুরুষেরা বিবেকের অস্বস্তিও বোধ করে না।

একথা খুবই সত্য যে স্বামীটি যদি জাগিয়ে তোলে নারীর কাম, সে তা জাগায় সর্বজনীন রূপে, কেননা তাকে একজন ব্যক্তি হিশেবে পছন্দ ক'রে নেয়া হয় নি; তাই সে তার স্ত্রীকে প্রস্তুত করছে অন্যের বাহুর ভেতরে সুখ খোঁজার জন্যে। মঁতেইন এর সাথে একমত, তবে তিনি একথা স্বীকার ক'রে নেয়ার মতো সৎ যে পুরুষের পরিণামদর্শিতা নারীকে ফেলে দেয় এমন একটা পরিস্থিতিতে, যার জন্যে কোনো

প্রশংসা মেলে না : 'আমরা তাদের চাই স্বাস্থ্যবতী, তীব্র, সুডৌল, ও সতীরূপে, সব কিছু এক সাথে– অর্থাৎ, গরম ও ঠাণ্ডা উভয়ই।' প্রধোঁ অনেকটা কম অকপট : তাঁর মতে, বিয়ে থেকে প্রেম বর্জন করা হচ্ছে 'ন্যায়নিষ্ঠা'র ব্যাপার; 'সমস্ত প্রণয়ালাপ অশালীন, এমনকি যাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে বা যারা বিবাহিত, তাদের মধ্যেও; এটা গার্হস্থ্য শ্রদ্ধাবোধ, কর্মানুরাগ, ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্যে ধ্বংসাত্মক।'

তবে উনিশশতক ভ'রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারণাগুলো কিছুটা সংশোধিত হয়; একটা ব্যগ্র প্রচেষ্টা দেখা দেয় বিয়েকে সমর্থন ও সংরক্ষণের জন্যে; এবং, অন্য দিকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অগ্রগতির ফলে নারীর দাবি সহজে রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; সাঁৎ-সিমোঁ, ফুরিয়ের, জর্জ সাঁ, এবং সব রোম্যান্টিক প্রচণ্ডভাবে দাবি করেন প্রেমের অধিকার। প্রশ্নটি ওঠে বিয়ের সাথে ব্যক্তিগত আবেগ জড়ানো সম্বন্ধে, যা তখন পর্যন্ত ধীরস্থিরভাবে বর্জন করা হয়েছে। এ-সময়ই উদ্ভাবন করা হয় 'দাম্পত্য প্রেম'-এর সন্দেহজনক ধারণাটি, প্রথাগত সুবিধাজনক বিয়ের সে-অলৌকিক ফলটি। বালজাক প্রকাশ করেন রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত যুক্তিরহিত ধ্যানধারণাগুলো। তিনি স্বীকার করেন যে নীতিগতভাবে বিয়ে ও প্রেমের মধ্যে কোনো মিল নেই; তবে একটি শ্রদ্ধেয় সংস্থাকে একটা ব্যবসায়িক চুক্তির সাথে সমীকরণ করা, যাতে নারীকে গণ্য করা হয় বস্তু হিশেবে, তাঁর কাছে ঘৃণ্য মনে হয়। এভাবে তিনি পৌছেন তাঁর *ফিজিয়লজি দি মারিয়াজ*-এর বিব্রতকর অসম্বদ্ধতায়, যাতে তিনি বলেন বিয়ে একটি চুক্তি, অধিকাংশ মানুষ যা সম্পন্ন করে সন্তানদের বৈধ করার জন্যে, এবং তাতে প্রেম একটা বাজেকথা, এবং তারপর বলতে থাকেন 'আত্মার বিশুদ্ধ মিল' আর 'সুখ'-এর কথা, যা অর্জিত হয় মানুষের 'সম্মান ও শালীনতার বিধিবিধান' পালনের মাধ্যমে। 'প্রকৃতির গোপন সূত্র, যা পুষ্পিত করে অনুভূতি', তার প্রতি অনুগত থাকার জন্যে তিনি ডাক দেন, এবং প্রয়োজন বোধ করেন 'আন্তরিক প্রেম'-এর, এবং দাবি করেন এভাবে চর্চা করলে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ চিরস্থায়ী হ'তে পারে।

বিয়ে ও প্রেমের মধ্যে বিরোধ মেটানো এমন এক *তুর দ্য ফর্স*, যা সফল হ'তে পারে শুধু স্বর্গীয় হস্তক্ষেপই; নানা চাতুর্যপূর্ণ উপায়ে এ-সমাধানেই পৌচেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ। তিনি বলেন, প্রেম স্বতস্ফূর্ত; বিয়ে একটি সিদ্ধান্ত; তবে সকাম আকর্ষণ জাগাতে হবে বিয়ের মাধ্যমে বা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে। একজন প্রকৃত স্বামী, তিনি বলেন, 'এক অলৌকিক ব্যাপার'। আর স্ত্রীর কথা বলতে গেলে, যুক্তিশীলতা তার জন্যে নয়, সে 'চিন্তাশূন্য'; 'সে প্রেমের সদ্যস্কতা থেকে চ'লে যায় ধর্মের সদ্যস্কতায়'। সরল ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে প্রেমে পড়েছে এমন একটি পুরুষ বিধাতায় বিশ্বাসবশত বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়, ওই সিদ্ধান্তেরই নিশ্চয়তা দেয়ার কথা অনুভূতি ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে সঙ্গতিবিধানের; এবং কোনো নারী প্রেমে পড়লে সে বিয়ে করতে চায়। আমি এক সময় চিনতাম ক্যাথলিক বিশ্বাসের এক মহিলাকে, যে সরলভাবে বিশ্বাস করতো 'স্বর্গীয় বজ্রকরতালি'তে; সে ঘোষণা করেছিলো যখন দম্পতিটি বেদির পাদমূলে দাঁড়িয়ে বলে চরম শেষকথাটি যে 'আমি করি', তখন তারা অনুভব করে যে তাদের হৃদয়ে অলৌকিকভাবে জ্ব'লে উঠেছে পারস্পরিক প্রেমের শিখা। কিয়ের্কেগার্দ পুরোপুরি স্বীকার করেন যে থাকতে হবে একটা পূর্ব-'অনুরাগ';

তবে এটা যে সারাজীবন স্থায়ী হবে, তা কম অলৌকিক ব্যাপার নয়।

তবে ফ্রান্সে *ফ্যঁ দ্য সিয়্যক্‌ল্* ঔপনাসিক ও নাট্যকারেরা, যাঁরা স্বর্গীয় চুক্তির গুণাবলি সম্পর্কে ছিলেন একটু কম নিশ্চিত, তাঁরা দাম্পত্য সুখ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন অনেক বেশি খাঁটি মানবিক পদ্ধতিতে; বালজাকের থেকে অনেক বেশি সাহসের সাথে তাঁরা ভেবেছিলেন কামের সাথে বৈধ প্রেমের মিলন ঘটানোর সম্ভাবনার কথা। মার্সেল প্রিভস্ত তরুণ স্বামীকে পরামর্শ দেন নিজের স্ত্রীকে রক্ষিতার মতো দেখতে, এবং সতর্কতার সাথে তিনি আঁকেন বিবাহিত জীবনের সুখের ছবি। বার্নস্তেইন নিজেকে ক'রে তোলেন বৈধ প্রেমের নাট্যকার : অনৈতিক, মিথ্যাভাষী, ইন্দ্রিয়কাতর, চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী স্ত্রীর তুলনায় তাঁর স্বামীকে মনে হয় একজন জ্ঞানী ও উদার মানুষ; এবং বোঝা যায় সে একজন শক্তিশালী ও দক্ষ প্রেমিক। ব্যভিচারের উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় বিয়ের যথার্থতা প্রতিপাদন ক'রে বেরোয় অজস্র রোম্যান্টিক উপন্যাস। এমনকি কলেৎও নতি স্বীকার করেছিলেন নীতিবাক্য আওড়ানোর ঢলের কাছে, তাঁর *এঁজেনি লিব্যরত্যঁতে*, এক তরুণী স্ত্রী, যার সতীত্বমোচন করা হয়েছিলো অপরিণত বয়সে, তার দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা বর্ণনার পর যখন তিনি ঠিক করেন যে তিনি তাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন স্বামীর বাহুবন্ধনে কামসুখ লাভের সঙ্গে। মার্টিন মরিসের একটি উপন্যাসে তরুণী স্ত্রী কামকলা শেখে এক প্রেমিকের কাছে, তারপর সে ফিরে এসে স্বামীকে উপহার দেয় তার অভিজ্ঞতার সুফল।

অন্য কারণে এবং ভিন্ন এক উপায়ে আজকের মার্কিনিরা, যারা একই সাথে বিয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, কাম ও বিয়ের মধ্যে সংহতিসাধনের জন্যে বহু গুণে বাড়িয়ে চলছে তাদের প্রচেষ্টা। দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে বেরোচ্ছে বিপুল সংখ্যক বই, যেগুলোর উদ্দেশ্য দম্পতিকে পরস্পরের সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল শেখানো; বিশেষ ক'রে পুরুষটিকে শেখানো কী ক'রে সে স্ত্রীর সাথে স্থাপন করতে পারে একটা সুখকর সঙ্গতি। মনোবিশ্লেষকেরা ও চিকিৎসকেরা কাজ করছেন 'বিবাহ উপদেষ্টা'রূপে; সাধারণভাবে তাঁরা একমত যে নারীদের কামসুখের অধিকার আছে এবং পুরুষদের জানা দরকার যথোচিত কলাকৌশল। যদি তরুণটি বিশখানা বিবাহবিষয়ক সারগ্রন্থ মুখস্থও করে, তবুও তার পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে নববধুকে সে শেখাতে পারবে তাকে ভালোবাসতে। নারীটি সাড়া দেয় সমগ্র মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে। এবং প্রথাগত বিয়ের পক্ষে নারীর কাম জাগানো ও বিকশিত করার মতো অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি আদৌ সম্ভব নয়।

আগে, মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠিতে, বিয়ের সময় মেয়েটির কুমারীত্ব দাবি করা হতো না; এবং অতীন্দ্রিয় কারণে রীতি ছিলো যে বিয়ের আগে মেয়েটির সতীত্বমোচন ঘটাতে হবে। ফ্রান্সের কিছু পল্লী অঞ্চলে এ-প্রাচীন রীতি এখনো দেখা যায়; সেখানে বিবাহপূর্ব সতীত্ব চাওয়া হয় না; এবং এমনকি যারা ভুল পা ফেলেছে– অর্থাৎ, অবিবাহিত মায়েরা– তারা অনেক সময় অন্যদের থেকে অনেক সহজে পায় স্বামী। অন্য দিকে এও সত্য যে-সব বৃত্ত নারীমুক্তি স্বীকার ক'রে নিয়েছে, সেখানেও ছেলেদের মতোই যৌনস্বাধীনতা দেয়া হয় মেয়েদের। তবে পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতা আবশ্যিকভাবে দাবি করে কনেকে তার স্বামীর কাছে তুলে দিতে হবে কুমারী অবস্থায়; স্বামীটি নিশ্চিত

হ'তে চায় যে নারীটি অন্য কারো বীজ বহন করছে না; যে-দেহটিকে সে নিজের ক'রে নিচ্ছে, সে চায় তার একক ও একচেটিয়া মালিকানা; কুমারীত্ব পরিগ্রহ করেছে একটা নৈতিক, ধর্মীয়, ও অতীন্দ্রিয় মূল্য, এবং এ-মূল্য আজো সাধারণভাবে স্বীকৃত। ফ্রান্সে আছে কিছু এলাকা, যেখানে বরের বন্ধুরা অপেক্ষা ক'রে থাকে বাসরঘরের দরোজার আড়ালে, তারা হাসাহাসি করতে থাকে, গান গাইতে থাকে যে-পর্যন্ত না স্বামীটি বিজয়োল্লাসে বেরিয়ে আসে রক্তভেজা বিছানার চাদর দেখানোর জন্যে; বা মা-বাবারা পরের দিন ভোরে সেটা দেখায় প্রতিবেশীদের। কিছুটা কম স্থূলভাবে বাসররাত্রির প্রথা খুবই ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

শুধু প্রহসন ও বিচিত্রানুষ্ঠানেই আমরা দেখতে পাই না যে বাসররাত্রিতে অশ্রুপূর্ণ নববধু পালিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে মায়ের কাছে। মনোচিকিৎসার বইপত্রও এ-ধরনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ; এবং আমার কাছেও বলা হয়েছে এমন কয়েকটি কাহিনী : ওই মেয়েদের খুবই যত্নের সাথে লালনপালন করা হয়েছিলো, এবং তাদের যেহেতু কোনো যৌনশিক্ষা দেয়া হয় নি, তাই হঠাৎ কাম আবিষ্কার তাদের সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। মেয়েরা অনেক সময় বিশ্বাস করেছে যে চুমো খাওয়াই হচ্ছে সম্পূর্ণ যৌনমিলন, এবং স্টেকল এক নববধুর কথা বলেছেন যে তার স্বামীকে পাগল মনে করেছিলো, যেহেতু স্বামীটি মধুচন্দ্রিমার সময় করেছিলো খুবই স্বাভাবিক আচরণ। কোনো মেয়ে এমনকি একটি নারী বিপর্যস্তকে বিয়ে ক'রেও কোনো অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ না ক'রেই কয়েক বছর বাস করতে পারে তার সাথে।

অতিশয় উগ্রতা কুমারীকে ভীত করে, অতিশয় সশ্রদ্ধতা তাকে অবমানিত করে; নারীরা চিরকাল ঘৃণা করে সে-পুরুষকে, যে তাদের কষ্টের মূল্যে স্বার্থপরায়ণতার সাথে সুখ উপভোগ করে; কিন্তু তারা সে-সব পুরুষের প্রতি বোধ করে চিরন্তন ক্ষোভ, যারা তাদের অবজ্ঞা করেছে ব'লে মনে হয়, এবং প্রায়ই ক্ষোভ বোধ করে তাদের প্রতি, যারা প্রথম রাতেই তাদের সতীত্বমোচনের উদ্যোগ নেয় নি, বা ব্যর্থ হয়েছে। হেলেন ডয়েট্শ্ কিছু স্বামীর উল্লেখ করেছেন, যারা শক্তি বা সাহসের অভাবে চিকিৎসক দিয়ে নববধুদের সতীত্বমোচন করা বেশি পছন্দ করেছে, তাদের অভিযোগ হচ্ছে যে তাদের সঙ্গিনীদের সতীচ্ছদ অস্বাভাবিকভাবে প্রতিরোধক, যা সাধারণত অসত্য। এসব ক্ষেত্রে, তিনি বলেন, যে-পুরুষটি স্বাভাবিক রীতিতে তাকে বিদ্ধ করতে পারে নি, তার প্রতি নারীটি বোধ করে এমন ঘৃণা, যা কাটিয়ে ওঠা কঠিন।

বিয়ের রাত্রি কামকর্মটিকে রূপান্তরিত করে এক পরীক্ষায়, যাতে উভয়েই ভয় পায় যে তারা উত্তীর্ণ হ'তে পারবে না, প্রত্যেকেই নিজের সমস্যা নিয়ে এতো উদ্বিগ্ন থাকে যে অন্যের সম্পর্কে সদয়তার সাথে ভাবতেও পারে না। এটা ঘটনাটিকে দেয় ভীতিকর গাম্ভীর্য; এটা বিস্ময়কর নয় যে এ-ঘটনা নারীটিকে ক'রে তোলে স্থায়ীভাবে কামশীতল। স্বামীটি যে-কঠিন সমস্যায় পড়ে, তা হচ্ছে এই : আরিস্ততলের ভাষায়, যদি 'সে তার স্ত্রীকে অতিরিক্ত কামুকতার সাথে কামোদ্দীপ্ত করে', তাহলে স্ত্রীটি মর্মাহত ও অবমানিত বোধ করতে পারে; এ-ভয়ই বিহ্বল করে মার্কিন স্বামীদের। অন্য দিকে, তার স্বামী যদি তাকে 'মান্য' করে, তাহলে সে স্ত্রীর কাম জাগাতে ব্যর্থ হয়। এ-উভয়সংকট সৃষ্টি হয় নারীর মনোভাবের দ্ব্যর্থতার ফলে : তরুণী যুগপৎ

কামসুখ চায় ও পেতে অস্বীকার করে। যদি সে অসাধারণ ভাগ্যবান না হয়, তবে তরুণ স্বামীটিকে মনে হয় লম্পট অথবা একটা ভণ্ডুলকারী। তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে স্ত্রীর কাছে 'দাম্পত্য দায়িত্ব'কে প্রায়ই মনে হয় ক্লান্তিকর ও বিস্বাদ।

প্রকৃতপক্ষে, বহু নারী কখনো কামপুলক বোধ না ক'রেই বা আদৌ কামোত্তেজনা অনুভব না ক'রেই হয় মা ও দাদী; কখনো কখনো তারা চিকিৎসকের পরামর্শ বা অন্য কোনো অজুহাতে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে তাদের মর্যাদা লাঘবকারী 'দায়িত্ব'। কিন্সে বলেছেন বহু স্ত্রী 'জানিয়েছে তারা মনে করে তাদের সঙ্গমের পৌনপুনিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি এবং তারা চায় যে তাদের স্বামীরা যেনো এতো ঘনঘন সঙ্গম করতে না চায়। কিছু স্ত্রী কামনা করে আরো ঘনঘন সঙ্গম।' তবে আমরা দেখেছি যে নারীর কামসামর্থ্য প্রায় অসীম। এ-বিরোধ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে কামকে বিধিসম্মত করতে গিয়ে বিয়ে হত্যা করে নারীর কাম।

মনে হ'তে পারে যে বাগদানের সময়টিতে মেয়েটি ধীরেধীরে দীক্ষিত হবে; কিন্তু প্রথা অধিকাংশ সময়ই যুগলের ওপর চাপিয়ে দেয় কঠোর কৌমার্য। বাগদানের কালে কুমারী যখন 'জানে' তার ভবিষ্যৎ স্বামীকে, তখনও তার পরিস্থিতি তরুণী বিবাহিত নারীর থেকে বেশি ভিন্ন নয়; সে ধরা দেয় শুধু এ-কারণে যে তার কাছে বাগদানকে বিয়ের মতোই চূড়ান্ত ব্যাপার ব'লে মনে হয়, এবং তার প্রথম সঙ্গম তখনও একটি অগ্নিপরীক্ষা। একবার যখন সে নিজেকে দান করেছে– যদি সে গর্ভবতী নাও হয়, যা নিশ্চিতভাবেই হবে বিয়ের বাধ্যবাধকতা– তখন তার মন পরিবর্তন খুবই দুর্লভ ঘটনা।

সুবিধার ওপর ভিত্তি ক'রে প্রতিষ্ঠিত একটি মিলনের পক্ষে প্রেম উৎপন্ন করার বিশেষ সুযোগ আছে, এ-মত পোষণ নিতান্তই ভণ্ডামো; এটা নিতান্তই বাজেকথা যে দুটি বিবাহিত মানুষ, যারা আবদ্ধ ব্যবহারিক, সামাজিক, ও নৈতিক স্বার্থের বন্ধনে, তারা যতোদিন বাঁচবে ততোদিন কামসুখ দিতে থাকবে পরস্পরকে। তবে সকারণ বিয়ের প্রস্তাবকারীদের এটা দেখাতে কোনোই অসুবিধা হয় না যে প্রেমের বিয়েও দম্পতির সুখের কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে না। প্রথমত, তরুণী প্রায়ই যে-আদর্শ প্রেমের আবেগ বোধ করে, তা তাকে যৌন প্রেমের দিকে নিয়ে যায় না; তার প্লাতোয়ী মূর্তিপুজো, তার দিবাস্বপ্ন, তার শিশুসুলভ বা কৈশোরিক আবিষ্টতা প্রক্ষেপকারী সংরাগ, প্রাত্যহিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী নয়, সেগুলো দীর্ঘকাল স্থায়ীও হয় না। যদি তার ও তার প্রেমিকের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও আন্তরিক যৌন আকর্ষণ থাকেও, তবুও তা একটি সারাজীবনের উদ্যোগের দৃঢ় ভিত্তি নয়।

এমনকি যখন বিয়ের আগেও থাকে যৌন প্রেমসম্পর্ক বা জেগে ওঠে মধুচন্দ্রিমার সময়, খুব কম সময়ই তা টিকে থাকে পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধ'রে। সন্দেহ নেই যৌন প্রেমের জন্যে দরকার বিশ্বস্ততা, কেননা প্রেমে জড়িত দুটি মানুষ যে-কামনা বোধ করে, তা তাদের জড়িত করে ব্যক্তিরূপে; বাইরের কারো সাথে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে তারা একে অস্বীকার করতে চায় না; তারা পরস্পরকে পরস্পরের জন্যে মনে করে বিকল্পহীন; কিন্তু এ-বিশ্বস্ততার ততোটুকুই অর্থপূর্ণ যতোটা তা স্বতস্ফূর্ত; এবং কামের ইন্দ্রজাল বেশ দ্রুতই স্বতস্ফূর্তভাবে উবে যায়। অলৌকিক ব্যাপারটি হচ্ছে প্রত্যেক প্রেমিককে, ওই মুহূর্তে ও দেহে, এটা দান করে এমন একটি সত্তা, যার অস্তিত্ব ছড়িয়ে

পড়ে সীমাহীন সীমাতিক্রমণতায়; এ-সত্তাটিকে অধিকার ক'রে রাখা নিঃসন্দেহে অসম্ভব, তবে এক বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ও মর্মভেদী উপায়ে অন্তত সাধিত হয় সংস্পর্শ। কিন্তু ব্যক্তি দুটি যখন শত্রুতা, বিরক্তি, বা উদাসীনতাবশত আর এমন সংস্পর্শ কামনা করে না, তখন বিলীন হয়ে যায় যৌন আকর্ষণ।

সত্য হচ্ছে শারীরিক প্রেমকে যেমন চূড়ান্ত লক্ষ্য হিশেবে বিবেচনা করা যায় না, তেমনি একে নিতান্তই একটি লক্ষ্য অর্জনের উপায় ব'লেও গণ্য করা যায় না; এটা অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে পারে না; তবে অসংশ্লিষ্টরূপে এর যাথার্থ্যও প্রতিপাদন করা যায় না। অর্থাৎ, যে-কোনো মানুষের জীবনে এর পালন করা উচিত একটি কাহিনীমূলক ও স্বাধীন ভূমিকা। একথা বলার অর্থ হচ্ছে সর্বোপরি একে হ'তে হবে মুক্ত।

তাই বুর্জোয়া আশাবাদ বাগদত্তা একটি মেয়েকে যা দিতে পারে, তা নিশ্চিতভাবেই প্রেম নয়; তার সামনে তুলে ধ'রে রাখা হয় যে-উজ্জ্বল আদর্শ, তা হচ্ছে সুখের আদর্শ, যা বোঝায় সীমাবদ্ধতা ও পুনরাবৃত্তির জীবনে শান্ত ভারসাম্যের আদর্শ। সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার বিশেষ বিশেষ পর্বে সার্বিকভাবে এটাই হয়েছে মধ্যবিত্তের আদর্শ এবং বিশেষ ক'রে ভূসম্পত্তিশালীদের আদর্শ; ভবিষ্যৎ বা বিশ্বকে জয় করা তাদের লক্ষ্য ছিলো না, ছিলো অতীতকে শান্তিপূর্ণভাবে রক্ষা করা, *স্টেটাস কৌ* অক্ষুণ্ন রাখা। আকাঙ্খা ও সংরাগহীন এক কারুকার্যখচিত মাঝারিত্ব, নিরন্তর পুনরাবৃত্ত লক্ষ্যহীন দিনের পর দিন, যে-জীবন তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন না ক'রে ধীরেধীরে এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিকে– 'সুখ' বলতে তারা এই বুঝিয়েছে। এপিকিউরাস ও জেনোর দ্বারা অস্বচ্ছভাবে অনুপ্রাণিত এ-ভ্রান্ত প্রজ্ঞা আজকাল বাতিল হয়ে গেছে : বিশ্ব যেমন আছে তেমন টিকিয়ে রাখা ও চলতে দেয়া আকাঙ্খিতও নয় সম্ভবও নয়। পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হয় কর্মের; তার কাজ উৎপাদন, যুদ্ধ, সৃষ্টি, প্রগতি, নিজেকে বিশ্বের সমগ্রতা ও ভবিষ্যতের অনন্ততার দিকে সম্প্রসারিত করা; কিন্তু প্রথাগত বিয়ে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সীমাতিক্রমণতার জন্যে আমন্ত্রণ জানায় না; এটা নারীকে আটকে রাখে সীমাবদ্ধতায়, তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখে তার নিজের বৃত্তের ভেতরে। তাই একটি অপরিবর্তনীয় ভারসাম্যের জীবন, যাতে অতীতের ধারাবাহিকতারূপে বর্তমান এড়িয়ে চলে আগামীকালের বিপদগুলো, নারী সে-জীবন নির্মাণের বেশি আর কিছু করার কথা ভাবতে পারে না– অর্থাৎ, তৈরি করে সম্যকভাবে এক সুখের জীবন। প্রেমের বদলে নারী বোধ করবে এক বিনম্র ও সশ্রদ্ধ আবেগ, যার নাম দাম্পত্য প্রেম, পত্নীসুলভ প্রীতি; তাকে কাজ করতে হবে গৃহের দেয়ালের ভেতরে, সে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলবে তার বিশ্ব; অনন্তকাল ধ'রে সে যত্ন নিতে থাকবে মানবপ্রজাতির অনুবর্তনের।

সুখের আদর্শটি সব সময়ই বস্তুগত রূপ নিয়েছে একটি গৃহরূপে, তা কুটিরই হোক বা হোক ক্যাসল; এটা নির্দেশ করে চিরস্থায়িত্ব ও বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা। এর দেয়ালের অভ্যন্তরে পরিবারটি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি পৃথক খোপ বা একক গোষ্ঠিরূপে এবং প্রজন্ম আসে প্রজন্ম যায় এটি রক্ষা করে এর পরিচয়; অতীত, যা সংরক্ষিত হয় আসবাবপত্রের গঠন ও পূর্বপুরুষের চিত্রাবলিতে, প্রতিশ্রুতি দেয় এক নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের; বাগানে ভোজ্য শব্জি ফলিয়ে ঋতুগুলো প্রকাশ করে তাদের আশ্বস্তকর

চক্র; প্রতিবছর একই বসন্তকাল একই পুষ্পসহ ভবিষ্যদ্বাণী করে নিত্য গ্রীষ্মের ফিরে আসার, ভবিষ্যদ্বাণী করে শরতের, যার এবারের ফলগুলো ভিন্ন নয় অন্য কোনো শরতের ফলগুলো থেকে : কাল ও স্থান হঠাৎ তাদের কাজের রীতি বদল করে না, নির্দিষ্ট চক্রে তারা ফিরে ফিরে আসে। ভূসম্পত্তিভিত্তিক প্রতিটি সভ্যতায় বিপুল পরিমাণ সাহিত্য গায় চুলো ও গৃহের কবিতার গান। প্রায়ই ঘটে যে গৃহের কবিরা নারী, কেননা নারীর দায়িত্ব পরিবারপরিজনের সুখ নিশ্চিত করা; যখন রোমের *দমিনা*রা বসতো আত্রিউমে, সে-সময়ের মতো তার ভূমিকা হচ্ছে 'গৃহকর্ত্রী' হওয়া।

আজ গৃহ তার পিতৃতান্ত্রিক মহিমা হারিয়ে ফেলেছে; অধিকাংশ পুরুষের কাছে এটা থাকার জায়গা মাত্র, মৃত পূর্বপুরুষদের স্মৃতিতে সে আর ভীত নয়, এটা আর তার আগামী শতাব্দীগুলোকে বেষ্টন করে না। কিন্তু আজো নারী তার 'অভ্যন্তর'কে সে-অর্থ ও মূল্য দেয়ার জন্যে ব্যগ্র, একদা যে-অর্থ ও মূল্য ধারণ করতো প্রকৃত ঘর ও গৃহ। *ক্যানারি রোতে* স্টেইনবেক বর্ণনা করেছেন এক ছিন্নমূল নারীকে, যে স্বামীসহ বাস করতো একটি বাতিল ইঞ্জিন বয়লারে, ছেঁড়া কাপড় ও পর্দা দিয়ে ওটি সাজানোর জন্যে নারীটি ছিলো বদ্ধপরিকর; পুরুষটি আপত্তি করে পর্দার কোনো দরকার নেই– 'আমাদের কোনো জানালা নেই।'

এ-উদ্বেগ একান্তভাবেই নারীধর্মী। একটি স্বাভাবিক পুরুষ তার চারপাশের জিনিশপত্রকে হাতিয়ার ব'লে মনে করে; যে-উদ্দেশ্যে ওগুলো তৈরি করা হয়েছে সে ওগুলো বিন্যস্ত করে সেভাবে; তার কাছে 'গোছানো'র– নারী সেখানে প্রায়ই দেখতে পায় শুধু অগোছানো– অর্থ হচ্ছে তার সিগারেট, তার কাগজপত্র, তার যন্ত্রপাতি তার হাতের কাছে থাকা। আরো অনেকের মধ্যে আছে শিল্পীরা, যারা তাদের পছন্দের বস্তুর মাধ্যমে পুনর্সৃষ্টি করতে পারে বিশ্বকে– চিত্রকর ও ভাস্কররা– তারা যেখানে বাস করে তার প্রতিবেশ সম্পর্কে তারা থাকে অমনোযোগী। রদাঁ সম্পর্কে রিল্কে লিখেছেন :

> আমি যখন প্রথম রদাঁর কাছে আসি... আমি জানতাম তাঁর গৃহ তাঁর কাছে কিছুই নয়, হয়তো একটা তুচ্ছ ছোট্ট দরকার মাত্র, বৃষ্টির সময় ও ঘুমের জন্যে একটা ছাদ; এটা তাঁর কাছে কোনো উদ্বেগের ব্যাপার ছিলো না এবং তাঁর নির্জনতা ও স্থৈর্যের ওপর এটা কোনো ভার ছিলো না। নিজের গভীরে তিনি বইতেন একটি গৃহের অন্ধকার, আশ্রয়, ও শান্তি, এবং তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন এটির ওপরের আকাশ, এবং এর চারপাশের বনভূমি, এবং দূরত্ব ও মহানদী সব সময়ই পাশ দিয়ে বয়ে চলতো।

কেউ যদি নিজের ভেতরে পেতে চায় চুল্লি ও গৃহ, তাহলে প্রথমে তাকে আত্মসিদ্ধি লাভ করতে হয় তার সৃষ্টিতে বা কর্মে। পুরুষ তার অব্যবহিত প্রতিবেশের প্রতি কম আগ্রহী, কেননা সে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়ে। আর সেখানে নারী আটকে থাকে দাম্পত্য এলাকার মধ্যে; তারই দায়িত্ব ওই কারাগারটিকে একটি রাজ্যে পরিণত করা। যে-দ্বান্দ্বিকতা সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করে তার পরিস্থিতি, সে-একই দ্বান্দ্বিকতা নির্দেশ করে তার গৃহের প্রতি তার মনোভাব : সে গ্রহণ করে শিকার হয়ে, সে স্বাধীনতা পায় স্বাধীনতা ত্যাগ ক'রে : বিশ্বকে প্রত্যাখ্যান ক'রে সে জয় করতে চায় একটি বিশ্ব।

একটু অনুতাপের সাথেই তার পেছনে সে বন্ধ ক'রে দেয় তার নতুন গৃহের

দরোজা; যখন সে বালিকা ছিলো তখন সমগ্র পল্লীই ছিলো তার স্বদেশ; অরণ্য ছিলো তারই। এখন সে আটকে আছে এক সীমাবদ্ধ এলাকায়; প্রকৃতি ক্ষীণ হয়ে ধারণ করেছে ভাণ্ডে বোনা জারেনিয়ামের আকার; দেয়াল বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে দিগন্তকে। তবে সে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে এসব সীমাবদ্ধতা জয় করার জন্যে। কম বা বেশি দামি ব্রিক-আ-ব্র্যাকরূপে সে তার চারদেয়ালের ভেতরে জড়ো করেছে জগতের যতো প্রাণী ও উদ্ভিদকুল, তার আছে বিচিত্র দেশ ও অতীত কাল; তার আছে স্বামী, যে প্রতিনিধিত্ব করে মানবসমাজের, এবং তার আছে সন্তান, যে তাকে বহনযোগ্যরূপে দেয় সমগ্র ভবিষ্যৎ।

গৃহ হয়ে ওঠে বিশ্বের কেন্দ্র এবং এমনকি তার একমাত্র বাস্তবতা; 'এক ধরনের প্রতি-বিশ্ব বা বিরোধী অবস্থানে বিশ্ব' (বাশলার্দ); আশ্রয়, নির্জনবাস, গ্রটো, গর্ভ, এটা বাইরের বিপদ থেকে দেয় আশ্রয়; অলীক হয়ে ওঠে বিভ্রান্তিপূর্ণ বাহ্যজগত। এবং বিশেষভাবে সন্ধ্যাবেলা, যখন দরোজাজানালা বন্ধ, স্ত্রীর নিজেকে মনে হয় রাণী; যে-সূর্য জ্বলে সকলের জন্যে, দুপুরবেলা দিকে দিকে ছড়ানো তার আলোতে সে বিরক্ত হয়; রাত্রিতে সে আর নিঃস্ব নয়, কেননা সে পরিহার করেছে সে-সব কিছু, যা তার অধিকারে নয়; সে দেখতে পায় প্রদীপের ঢাকনার নিচে জ্বলছে একটা আলো, যা তার নিজের এবং যা একান্তভাবে আলোকিত করে শুধু তার গৃহকেই : আর কিছু নেই। গৃহের ভেতরে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে বাস্তবতাকে, আর তখন মনে হয় যেনো ভেঙেচুরে পড়ছে বাইরের জগত।

ধন্যবাদ মখমল ও রেশম ও চিনেমাটির বাসনকোসনকে, যা দিয়ে সে ঘিরে ফেলে নিজেকে, এসব দিয়ে নারী কিছুটা পরিতৃপ্ত করতে পারে সে-স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামকাতরতাকে, তার কামজীবন যা কদাচিৎ প্রশমিত করতে পারে। এ-গৃহসজ্জাও প্রকাশ করে তার ব্যক্তিত্বকে; সে-ই পছন্দ করেছে, তৈরি করেছে, খুঁজে বের করেছে সাজসজ্জা ও তুচ্ছ আসবাবপত্র, সে-ই এসব বিন্যাস করেছে এমন এক নান্দনিক নীতি অনুসারে, যাতে প্রতিসাম্য সাধারণত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; এগুলো প্রতিফলিত করে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আবার সবার চোখের কাছে প্রকাশ করে তার জীবনযাপনের মান। এভাবে তার গৃহ হচ্ছে তার পার্থিব ভাগ্য, তার সামাজিক মূল্যের ও তার সত্যতম সত্তার প্রকাশ। যেহেতু সে কিছুই *করে না*, তাই তার যা *আছে*, তার মাঝেই সে ব্যাকুলভাবে খোঁজে আত্মসিদ্ধি।

গৃহস্থালির কাজে, চাকরদের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে, নারী তার গৃহকে নিজের ক'রে নেয়, প্রতিপন্ন হয় তার সামাজিক যাথার্থ্য, এবং নিজের জন্যে পায় একটি পেশা, একটি কাজ, যা উপকারিতা ও পরিতোষের সঙ্গে জড়িত থাকে জিনিশপত্রের সাথে– ঝলমলে চুলো, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড়, উজ্জ্বল তাম্র, ঘষামাজা আসবাবপত্র– কিন্তু এগুলো সীমাবদ্ধতা থেকে কোনো মুক্তির উপায় দেয় না এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে সামান্যই। এসব কাজের আছে একটা ঋণাত্মক ভিত্তি : পরিষ্কার করা হচ্ছে ময়লা থেকে মুক্তি পাওয়া, গোছগাছ করা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা দূর করা। এবং দরিদ্র অবস্থায় কোনো সন্তোষই সম্ভব নয়; নারীর ঘাম ও অশ্রু সত্ত্বেও কুঁড়েঘর কুঁড়েঘরই থাকে; 'জগতের কিছুই তাকে সুন্দর করতে পারে না'। বিপুল

নারীবাহিনী লিপ্ত এ-অন্তহীন সংগ্রামে, কিন্তু তাতেও তারা ময়লা জয় করতে পারে না। এবং এমনকি সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্তের জন্যেও জয় কখনোই চূড়ান্ত নয়।

অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে ভরা গৃহস্থালির কাজের থেকে খুব কম কাজই সিসিফাসের পীড়নের মতো : পরিচ্ছন্ন জিনিশ নোংরা হয়ে ওঠে, নোংরা জিনিশকে পরিচ্ছন্ন করা হয়, বার বার, দিনের পর দিন। গৃহিণী নিজকে ক্ষয় ক'রে ফেলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাটিতে পদাঘাত করতে করতে : সে কিছু তৈরি করে না, শুধু স্থায়ী করে বর্তমানকে। সে কখনো কোনো ধনাত্মক শুভর জয় অনুভব করে না, বরং ঋণাত্মক অশুভর সাথে করতে থাকে অন্তহীন সংগ্রাম। এক তরুণী ছাত্রী তার প্রবন্ধে লিখেছে : 'আমি কখনো ঘর ঝাড়ামোছার দিন নেবো না'; সে ভবিষ্যৎকে মনে করে কোনো অজানা শিখরের দিকে ধারাবাহিক অগ্রসরণ; কিন্তু একদিন, তার মা যখন থালাবাসন ধুচ্ছিলো, হঠাৎ তার মনে হয় তারা দুজনেই আমৃত্যু আটকে পড়বে এ-ব্রতে। খাওয়া, ঘুমোনো, ধোয়ামোছা– বছরগুলো আর আকাশের দিকে ওঠে না, বরং ষাষ্টাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে, ধূসর ও অভিন্ন। ধুলোবালির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কখনো জয়লাভ ঘটে না।

ধোয়া, ইস্ত্রি করা, ঝাঁট দেয়া, কাপড়ের আলমারির নিচে থেকে ফেঁশো খুঁজে বের করা– এসব ক্ষয়রোধও জীবনকে অস্বীকার করা; কেননা জীবন একই সময়ে সৃষ্টি ও ধ্বংস করে, এবং এর ঋণাত্মক দিকটিই জড়িত গৃহিণীর সাথে। দার্শনিকভাবে দেখলে, তার অবস্থা ম্যানিকীয়বাদীর। ম্যানিকীয়বাদের সারকথা শুধু দুটি নীতি স্বীকার করা নয়, যার একটি শুভ, আরেকটি অশুভ; এটাও পোষণ করা হয় যে অশুভের বিলুপ্তির মাধ্যমেই অর্জিত হয় শুভ এবং কোনো সক্রিয় কাজের মাধ্যমে নয়। এ-অর্থে শয়তানের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্ম আদৌ ম্যানিকীয়বাদী নয়, কেননা এতে অশুভকে সরাসরি পরাভূত করার প্রয়াস মাধ্যমে নয়, বরং বিধাতার কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে লড়াই করতে হয় শয়তানের সঙ্গে। সীমাতিক্রমণতা ও মুক্তির যে-কোনো মতাদর্শ শুভর দিকে অগ্রসরণের নিচে স্থান দেয় অশুভকে পরাভূত করা। কিন্তু নারীকে উৎকৃষ্টতর বিশ্ব নির্মাণের জন্যে আহ্বান জানানো হয় না : তার এলাকা স্থিত এবং তার কাজ হচ্ছে তার এলাকায় ঢুকে পড়া অশুভ নীতির বিরুদ্ধে সমাপ্তিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া; ধুলো, দাগ, কাদা, এবং ময়লার বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে সে যুদ্ধ করে পাপের সাথে, কুস্তি লড়ে শয়তানের সাথে।

খাবার তৈরি করা, খাবার বাড়া, অনেক বেশি ধনাত্মক প্রকৃতির কাজ এবং প্রায়ই ঝাড়ামোছার কাজের থেকে অনেক বেশি প্রীতিকর। সবার আগে এটা বোঝায় বাজার করা, যা প্রায়ই হয়ে থাকে দিনের উজ্জ্বল স্থানটিতে। এবং শব্জি বাছতে বাছতে দরোজায় দাঁড়িয়ে গল্পগুজব হচ্ছে নিঃসঙ্গতা থেকে এক আনন্দজনক মুক্তি; জল আনতে যাওয়া আধা-নিঃসঙ্গ মুসলমান নারীদের জন্যে একটা বড়ো রোমাঞ্চ; বাজারে ও দোকানে নারীরা একই আগ্রহ নিয়ে নিজেদের একই দলের সদস্য মনে ক'রে আলাপ করে গৃহস্থালি সম্পর্কে, ওই মুহূর্তে যা পুরুষের দলের বিরোধী, যেমন অপরিহার্য বিরোধী পরিহার্যের। কেনাকাটা করা এক গভীর সুখ, একটি আবিষ্কার, প্রায় একটি উদ্ভাবন। যেমন জিদ তাঁর *জর্নাল*-এ বলেছেন, মুসলমানেরা জুয়োখেলা জানতো না ব'লে তার বদলে তারা আবিষ্কার করেছে গুপ্তধন; এটাই হচ্ছে বাণিজ্যিক

সভ্যতার কবিতা ও রোমাঞ্চ। গৃহিণী জুয়োর কিছুই জানে না, তবে একটি নিরেট বাঁধাকপি, একটা পাকা কাঁমবের এমন সম্পদ, যা চাতুর্যের সাথে জিতে নিতে হবে অনিচ্ছুক দোকানির থেকে; খেলাটি হচ্ছে সবচেয়ে কম টাকায় সবচেয়ে ভালোটা পাওয়া; মিতব্যয় ততোটা বাজেট সাশ্রয়ের জন্যে নয় যতোটা খেলায় জেতার জন্যে। যখন সে ভাবে তার পরিপূর্ণ ভাঁড়ারঘরের কথা সে সুখ পায় তার ক্ষণস্থায়ী বিজয়ে।

গ্যাস ও বিদ্যুৎ হনন করেছে অগ্নির ইন্দ্রজালকে, কিন্তু গ্রামে আজো বহু নারী উপভোগ করে জড় কাঠ থেকে জ্বলন্ত শিখা জ্বালানোর আনন্দ। যখন জ্ব'লে ওঠে তার আগুন, নারী হয়ে ওঠে অভিচারিণী; একবার হাত নেড়ে, যেমন সে মেশায় ডিম, বা আগুনের যাদুর মাধ্যমে, সে সম্পন্ন করে বস্তুর রূপান্তর : পদার্থ হয়ে ওঠে খাদ্য। এসব রসায়নের আছে মোহিনীশক্তি, কবিতা আছে খাবার সংরক্ষণ করার মধ্যে; চিনির ফাঁদের মধ্যে গৃহিণী ধ'রে ফেলেছে খাদ্যের স্থায়িত্বকাল, সে জীবনকে আটকে ফেলেছে বয়ামের ভেতরে। রান্না হচ্ছে প্রত্যাদেশ ও সৃষ্টি; এবং নারী সফলভাবে তৈরি একটি কেক বা পরতে পরতে তৈরি একটি পেস্ট্রিতে পেতে পারে বিশেষ সুখ, কেননা সবাই তা বানাতে পারে না : ক্ষমতা থাকা চাই।

এখানেও ছোটো মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করে বড়োদের অনুকরণ করতে, সে তৈরি করে কাদার পাই বা অমন কিছু, এবং রান্নাঘরে সাহায্য করে আসল ময়দার তাল বেলতে। তবে অন্যান্য গৃহস্থালির কাজের মতোই পুনরাবৃত্তি অচিরেই আনন্দ নষ্ট ক'রে দেয়। চুলোর যাদু বিশেষ আবেদন জাগাতে পারে না মেক্সিকি ইন্ডীয় নারীর কাছে, যারা জীবনের অর্ধেকটাই ব্যয় করে টর্টিলা বানাতে বানাতে, দিনের পর দিন, শতাব্দীর পর শতাব্দী একই রকমে। পুরুষ ও নারী লেখকেরা যারা গীতিময়রূপে এ-বিজয়কে তুরীয়লোকে উন্নীত করেন, তাঁরা কখনোই বা কদাচিৎ বাস্তবে গৃহস্থালির কাজ করেছেন। এটা জীবিকা হিশেবে ক্লান্তিকর, শূন্য, একঘেঁয়ে। তবে যদি কেউ এ-কাজ করার সাথে সাথে হয় একজন উৎপাদনকারী, একজন সৃষ্টিশীল কর্মী, তাহলে এটা জৈবিক ক্রিয়াগুলোর মতো স্বাভাবিকভাবেই সমন্বিত হয়ে যায় তার জীবনের সাথে; এ-কারণেই পুরুষেরা যখন গৃহস্থালির কাজ করে, তখন সেটা হয় অনেক কম নিরানন্দ; এটা তাদের কাছে একটা ঋণাত্মক ও অকিঞ্চিৎকর মুহূর্ত, যা থেকে তারা শিগগিরই মুক্তি পেয়ে যায়। স্ত্রী-চাকরানির ভাগ্যকে যা অপ্রীতিকর ক'রে তোলে, তা হচ্ছে সে-শ্রমবিভাজন, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে সাধারণ ও পরিহার্যের মধ্যে বদ্ধ ক'রে। বাসস্থান ও খাদ্য জীবনের জন্যে দরকার, তবে এটা কোনো তাৎপর্য দান করে না : গৃহিণীর অব্যবহিত লক্ষ্যগুলো উপায় মাত্র, প্রকৃত লক্ষ্য নয়। স্বাভাবিকভাবেই সে তার কাজকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেয়ার চেষ্টা করে এবং অপরিহার্য ক'রে তুলতে চায়। সে মনে করে যে তার কাজ আর কেউ তার মতো করতে পারতো না; তার আছে তার ব্রত, কুসংস্কার, ও কাজের ধরন। কিন্তু প্রায়সই তার 'ব্যক্তিগত সুর' হচ্ছে বিশৃঙ্খলার এক অস্পষ্ট ও নিরর্থক পুনর্বিন্যাস।

মৌলিকত্ব ও অনন্য উৎকর্ষ অর্জনের এ-ধরনের প্রাণপণ চেষ্টায় নারী নষ্ট করে প্রচুর সময় ও প্রয়াস; এটা তার কাজকে দেয় একটা খুঁটিনাটির প্রতি অতি-যত্নশীল, অবিন্যস্ত, ও সমাপ্তিহীন চরিত্র এবং এর ফলে গৃহস্থালির কাজের প্রকৃত ভার নির্ণয়

করা কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে যে বিবাহিত নারীরা গৃহস্থালির কাজ করে গড়ে সপ্তাহে তিরিশ ঘণ্টা, বা কোনো চাকুরিতে কর্মের সপ্তাহগুলোর চারভাগের তিন ভাগ। বেতনভুক্ত কোনো চাকুরির কাজের সাথে যদি এ-কাজও করতে হয়, তাহলে কাজ হয়ে ওঠে বিপুল, আর যদি নারীটির কিছু করার না থাকে, তাহলে কাজ হয় সামান্য। এর সাথে কয়েকটি শিশুর লালনপালন স্বাভাবিকভাবেই নারীর কাজ অনেক বাড়িয়ে দেয় : দরিদ্র মায়েরা সাধারণত সব সময়ই কাজ করে। অন্য দিকে, মধ্যবিত্ত নারীরা যারা কাজের লোক রাখে, তারা অনেকটা নিষ্কর্মা; তারা তাদের অবসরভোগের মূল্য পরিশোধ করে অবসাদে। যদি তাদের আর কোনো দিকে আগ্রহ না থাকে, তাহলে তারা তাদের গৃহস্থালির দায়িত্বকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে ও জটিল ক'রে তোলে, শুধু হাতে কিছু একটা কাজ থাকার জন্যে।

এর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে যে এ-শ্রমের স্থায়ী কোনো কিছু সৃষ্টির কোনো লক্ষ্য নেই। নারী প্রলুব্ধ হয়– যতো বেশি প্রলুব্ধ হয় ততো বেশি কঠোরভাবে সে খাটাখাটি করে– তার কাজকেই কাজের লক্ষ্য ব'লে গণ্য করতে। সদ্য উনুন থেকে বের ক'রে আনা একটা পুরো কেক দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে : 'ধিক, এই কেক খাওয়া!' এটা সত্যিই খুব জঘন্য ব্যাপার তার স্বামী ও সন্তানদের কাদামাখা পায়ে তার মোমমাজা শক্ত কাঠের মেঝের চারদিকে ভারি পদক্ষেপে হাঁটানো! জিনিশপত্র ব্যবহৃত হ'লে ময়লা হয় বা নষ্ট হয়– আমরা দেখেছি সে কতোখানি চেষ্টা করে যাতে ওগুলো ব্যবহৃত না হয়; সংরক্ষিত খাবার ছাতা-ধরা না পর্যন্ত সে জমিয়ে রাখে; সে বৈঠকখানা তালাবদ্ধ ক'রে রাখে। কিন্তু সময় নির্মমভাবে বয়ে চলে; খাদ্যদ্রব্য ইঁদুর আকৃষ্ট করে; ওগুলোতে পোকা ধ'রে; পতঙ্গরা আক্রমণ করে লেপকাঁথা কাপড়চোপড়। বিশ্বটি পাথরে খোদাই করা কোনো স্বপ্ন নয়, এটা তৈরি পচনশীল সন্দেহজনক বস্তুতে; খাদ্যদ্রব্য দালির মাংসল ঘড়ির মতোই দ্ব্যর্থবোধক : একে মনে হয় জড়, অজৈব, কিন্তু গোপন শুয়োপোকারা হয়তো একে পরিণত করেছে লাশে। যে-গৃহিণী নিজেকে হারিয়ে ফেলে বস্তুর মধ্যে, সে বস্তুর মতোই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সারা বিশ্বের ওপর : পোশাকপরিচ্ছদ ঝলসে যায়, রোস্ট পুড়ে যায়, চিনেমাটির বাসনকোসন ভাঙে; এগুলো চরম বিপর্যয়, কেননা যখন জিনিশপত্র ধ্বংস হয়, ওগুলো চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে যায়। ওগুলোর মাধ্যমে সম্ভবত চিরস্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব নয়।

তবে সব মিলিয়ে আজকাল বিয়ে হচ্ছে জীবনের মৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে টিকে থাকা একটি স্মৃতিচিহ্ন, আর স্ত্রীর পরিস্থিতি আগের থেকেও বেশি অপ্রীতিকর, কেননা আজো তার দায়িত্ব একই, তবে সেগুলো তাকে আর একই অধিকার, সুবিধা, ও সম্মান দেয় না। পুরুষ আজকাল বিয়ে করে সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটা নোঙর ফেলার স্থান পাওয়ার জন্যে, তবে সে নিজে সেখানে আটকে থাকতে চায় না; সে চুলো আর গৃহ চায়, কিন্তু সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বাধীনতাও তার আছে; সে ঘর বাঁধে, কিন্তু প্রায়ই অন্তরে থেকে যায় ভবঘুরে; সে গার্হস্থ্য সুখকে ঘৃণা করে না, তবে একেই লক্ষ্যে পরিণত করে না; পুনরাবৃত্তি তাকে ক্লান্ত করে; সে চায় অভিনবত্ব, ঝুঁকি, পরাভূত করার মতো বিরোধিতা, সঙ্গী ও বন্ধু যারা তাকে নিঃসঙ্গতা থেকে নিয়ে যায়

আ দো। শিশুরা এমনকি তাদের পিতার থেকেও বেশি চায় পরিবারের সীমার বাইরে চ'লে যেতে : তাদের জীবন আছে অন্য কোথাও, এটা তাদের সম্মুখে; শিশু সব সময়ই চায় ভিন্ন জিনিশ। নারী প্রতিষ্ঠা করতে চায় অবিনশ্বরতা ও অনুবর্তনের এক বিশ্ব; স্বামী ও শিশুরা চায় নারীর সৃষ্টিকরা পরিস্থিতির সীমা পেরিয়ে যেতে। এজন্যেই, যে-কাজে সে তার সারাটি জীবন নিয়োগ করেছে, সেগুলো যে অনিশ্চিত প্রকৃতির, তা স্বীকার করতে যদিও সে ঘৃণা করে, তবুও সে জোর ক'রে তার দায়িত্বগুলো চাপিয়ে দিতে চায় : সে মা ও গৃহিণী থেকে হয়ে ওঠে এক কঠোর সৎ মা ও খাণ্ডারি।

আজকাল এ-দুস্তর ব্যবধান এতোটা গভীর নয়, কেননা তরুণী এতোটা কৃত্রিম মানুষ নয়; সে অনেক ভালোভাবে অবহিত, জীবনের জন্যে অধিকতর ভালোভাবে প্রস্তুত। তবে আজো প্রায়ই সে তার স্বামীর থেকে অনেক ছোটো। এ-ব্যাপারটির ওপর যথোচিত গুরুত্ব দেয়া হয় নি; প্রায়ই যা আসলে অসম প্রাপ্তবয়স্কতার ব্যাপার, সেটাকে গণ্য করা হয় লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা ব'লে; অনেক ক্ষেত্রে নারীটি শিশু, এজন্যে নয় যে সে নারী, বরং এজন্যে যে আসলেই সে খুবই অল্পবয়স্ক। তার স্বামী ও তার বন্ধুদের ধীরস্থির মনস্কতা শ্বাসরুদ্ধকর, এর ভার মেয়েটিকে চেপে ধরে। তলস্তয়ের স্ত্রী, সোফি, তার বিয়ের এক বছর পর লিখেছেন :

> সে বৃদ্ধ, সে অতিশয় নিবিষ্ট, আর আমার প্রসঙ্গে আমি অনুভব করি এতো তারুণ্য এবং বোকামির দিকে আমার এতো ঝোঁক! শয্যায় যাওয়ার বদলে পাগলের মতো আমি নাচতে চাই, কিন্তু কার সাথে?
>
> বৃদ্ধ বয়সের জলবায়ু আমাকে ঘিরে আছে, আমার চারপাশের সবাই বুড়ো। আমি নিজেকে বাধ্য করি যৌবনের প্রতিটি বাসনা দমন করতে, এ-নিরাবেগ পরিবেশে মনে হয় আমি আছি খুবই অস্থানে।

স্বামীর দিক দিয়ে, স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যে দেখতে পায় একটি 'শিশু'; সে যেমন প্রত্যাশা করেছিলো তার স্ত্রী আর তেমন সঙ্গিনী নয় এবং সে স্ত্রীকে এটা বুঝিয়ে দেয়, এতে স্ত্রী অপমান বোধ করে। সন্দেহ নেই স্ত্রীটি নিজের বাড়ি ছাড়ার সময় একটি নতুন পথপ্রদর্শক পেয়ে খুশি হয়েছিলো, তবে সে চায় তাকেও গণ্য করা হোক 'প্রাপ্তবয়স্ক' ব'লে; সে শিশু থাকতে চায়, সে নারী হয়ে উঠতে চায়; একজন বেশি বয়সের স্বামী তার সাথে কখনোই পুরোপুরি সন্তোষজনক ব্যবহার করতে পারে না।

তবে যখন বয়সের ব্যবধান কম, তখনও একটি ব্যাপার থেকে যায় যে ওই তরুণ ও তরুণীটি লালিতপালিত হয়েছে বেশ ভিন্নভাবে; তরুণীটি এসেছে একটি নারীর জগত থেকে, যেখানে তাকে শেখানো হয়েছে নারীর সদাচরণ ও নারীর মূল্যবোধগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আর সেখানে তরুণটিকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে পুরুষের নীতিবোধের সূত্রানুসারে। প্রায়ই তাদের পক্ষে পরস্পরকে বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে এবং অচিরেই দেখা দেয় বিরোধ।

বিয়ে যেহেতু সাধারণত স্ত্রীকে স্বামীর অধীন করে, তাই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যাটি তীব্রতর হয়ে ওঠে নারীটির কাছেই। বিয়ের কূটভাষ এখানে যে এটা একই সাথে একটি কামমূলক ও সামাজিক কাজ : নারীটির চোখে স্বামীরূপে প্রতিফলিত হয় এ-পরস্পরবিপরীত মূল্য। স্বামীটি হচ্ছে পৌরুষের মর্যাদায় ভূষিত একটি নরদেবতা এবং সে গ্রহণ করবে স্ত্রীটির পিতার স্থান : রক্ষক, ভরণপোষণকারী, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক; তার ছায়ায়ই বিকশিত হবে স্ত্রীটির অস্তিত্ব; স্বামীটি মূল্যবোধের

প্রতিপালক, সত্যের রক্ষক, সে-ই প্রতিপাদন করে দম্পতিটির নৈতিক যথার্থতা। তবে সে একটি পুরুষও, যার সাথে স্ত্রীটিকে সঙ্গী হ'তে হবে এমন একটি অভিজ্ঞতায়, যা প্রায়ই লজ্জাজনক, উদ্ভট, আপত্তিকর, বা বিপর্যস্তকর, অনেকটা নৈমিত্তিক; স্বামীটি তার সাথে ইন্দ্রিয়চর্চায় মেতে ওঠার জন্যে স্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাবে, আবার সে-ই দৃঢ়ভাবে স্ত্রীকে পথ দেখিয়ে নেবে আদর্শের দিকে।

বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও ফনের মাঝামাঝি থাকতে পারে বহু সংকর রূপ। অনেক সময় পুরুষটি হয়ে ওঠে একই সঙ্গে পিতা ও প্রেমিক, যৌনকর্মটি হয়ে ওঠে এক পবিত্র কামোৎসব এবং অনুরাগিণী স্ত্রীটি সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করার মূল্যে লাভ করে চূড়ান্ত মোক্ষ। বিবাহিত জীবনে প্রীতিপূর্ণ সংরাগ খুবই দুর্লভ। অনেক সময়, আবার, স্ত্রীটি তার স্বামীকে ভালোবাসে প্লাতোয়ীভাবে, কিন্তু যে-পুরুষটিকে সে অতিশয় ভক্তি করে, তার বাহুবন্ধনে নিজেকে সমর্পণ করতে সে সম্মত হয় না, যেমন ঘটেছে একজন মহান শিল্পীর সাথে বিবাহিত এক নারীর বেলা, যে অনুরাগিণী ছিলো শিল্পীর, কিন্তু তাঁর সাথে সে ছিলো পুরোপুরি কামশীতল। এর বিপরীতে, স্ত্রীটি স্বামীর সাথে মিলে উপভোগ করতে পারে এমন কোনো আনন্দ, যা তার কাছে মনে হ'তে পারে উভয়ের জন্যেই এক নিচাশয়তা এবং এটা তার অনুরাগ ও ভক্তির জন্যে মারাত্মক। আবার, কামহতাশা তার স্বামীকে চিরকালের জন্যে নামিয়ে দিতে পারে একটা বর্বরের স্তরে : দেহরূপে সে ঘৃণিত, চৈতন্যরূপে সে অবজ্ঞার পাত্র; ব্যস্তানুরূপে, আমরা দেখেছি কীভাবে তিরষ্কার, পারস্পরিক বিদ্বেষ, বিরক্তি নারীকে ক'রে তুলতে পারে কামশীতল। যা প্রায়ই ঘটে, তা হচ্ছে প্রথমদের কামের অভিজ্ঞতার পর স্বামীটিকে থাকতে হয় একজন শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠতর মানুষ, যার পাশব দুর্বলতাগুলো ক্ষমার যোগ্য; উদাহরণস্বরূপ, এটাই হয়তো ঘটেছিলো ভিক্তর উগোর স্ত্রী আদেলের বেলা। অথবা স্বামীটি হ'তে পারে নিতান্তই একটি প্রীতিকর সঙ্গী, যার নেই বিশেষ কোনো মর্যাদা, একই সঙ্গে যে ভালোবাসা ও ঘৃণার পাত্র।

স্ত্রী প্রায়ই প্রেমের ভান করে নৈতিকতা, কপটতা, গর্ব, বা ভীরুতার মাধ্যমে। স্বামীর আধিপত্য এড়ানোর জন্যে তরুণী স্ত্রীর কম-বেশি প্রচণ্ড চেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তার প্রকৃত বিরূপতা। মধুচন্দ্রিমা ও পরবর্তী গোলমাল, যা প্রায়ই দেখা দেয়, সে-সময়টা কেটে যাওয়ার পর স্ত্রীটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে তার স্বাধীনতা, যা সহজ কাজ নয়। স্বামীটি প্রায়ই হয় বয়স্কতর, তার আছে পুরুষের মর্যাদা, আইনগতভাবে সে 'পরিবারের প্রধান', তার আছে একটা নৈতিক ও সামাজিক শ্রেষ্ঠতর অবস্থান; অধিকাংশ সময়ই, অন্তত, স্বামীটি হয় বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবেও শ্রেষ্ঠতর। তার আছে উৎকৃষ্টতর সংস্কৃতির সুবিধা, বা যা-ই হোক, তার আছে পেশাগত প্রশিক্ষণ; কৈশোর থেকে সে আগ্রহ পোষণ করেছে বৈশ্বিক ব্যাপারের প্রতি– এগুলো তারই ব্যাপার– সে কিছুটা আইন জানে, সে রাজনীতির সাথে তাল রেখে চলে, সে একটি দলের সদস্য, একটি সংঘের সদস্য, একটি সামাজিক সংস্থার সদস্য; কর্মী ও নাগরিক হিশেবে তার চিন্তাভাবনা কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। কঠোর বাস্তবের পরীক্ষার সাথে সে পরিচিত : অর্থাৎ, গড়পড়তা পুরুষের আছে যুক্তিপ্রয়োগের কৌশল, আছে সত্যঘটনা সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতাবোধ, কিছুটা সমালোচনার শক্তি।

বিপুল সংখ্যক নারীর মধ্যে এরই অভাব। এমনকি যদি তারা পড়াশোনা ক'রেও থাকে, বক্তৃতা শুনেও থাকে, কোনো কিছুতে পারদর্শিতা অর্জনের জন্যে অল্পসল্প ভাবনাচিন্তা ক'রেও থাকে, তবুও তাদের যাবতীয় তথ্য সংস্কৃতি হয়ে ওঠে না; এমন নয় যে তারা মানসিক ত্রুটিবশত ঠিকমতো যুক্তিপ্রয়োগে অসমর্থ, বরং এজন্যে যে অভিজ্ঞতা তাদের ঠিকমতো যুক্তিপ্রয়োগের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ করে নি; তাদের কাছে চিন্তাভাবনা হাতিয়ার নয়, একটা মজা; যদিও তারা বুদ্ধিমান, স্পর্শকাতর, আন্তরিক, তবুও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের অভাবে তারা তাদের অভিমত প্রকাশ করতে পারে না এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে না। এজন্যে তাদের স্বামীরা, তুলনামূলকভাবে মাঝারি ধীশক্তির হ'লেও, সহজেই তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এমনকি যখন তারা ভুলও করে, তখনও নিজেদের ঠিক ব'লে প্রমাণ করে। পুরুষের হাতে যুক্তিও অনেক সময় এক ধরনের হিংস্রতা, এক ধরনের প্রতারক স্বৈরাচার : স্বামীটি স্ত্রীটির থেকে বয়স্ক ও অধিকতর শিক্ষিত হ'লে যখন সে স্ত্রীর সাথে কোনো ব্যাপারে একমত হয় না, তখন তার এ-শ্রেষ্ঠতাবশত সে স্ত্রীর মতামতের কোনো মূল্যই দেয় না; অক্লান্তভাবে সে স্ত্রীর কাছে *প্রমাণ* করে যে সে-ই ঠিক। স্ত্রীর কথা বলতে গেলে, সে জেদি হয়ে ওঠে এবং স্বামীর যুক্তির মধ্যে যে কোনো সার আছে, তা স্বীকার করতে চায় না; স্বামীটি পুরোপুরি অটল থাকে তার ধারণায়। তাই তাদের মধ্যে গভীর ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেয়। নিজের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়াগুলোর সত্যতা প্রতিপাদনের মতো যথেষ্ট বুদ্ধি স্ত্রীটির নেই, যদিও সেগুলোর মূল তার ভেতরে গভীরভাবে প্রোথিত, স্বামীটি সেগুলো বোঝার কোনো চেষ্টাই করে না; স্ত্রীটি বুঝতে পারে না তার স্বামী যে-পণ্ডিতি যুক্তি দিয়ে তাকে বিহ্বল করে, তার পেছনের অপরিহার্য ব্যাপারটি কী। তখন নীরবতা, বা অশ্রু, বা হিংস্রতা ছাড়া স্ত্রীটির আর কোনো অবলম্বন থাকে না, এবং শেষে স্ত্রীটি কিছু একটা ছুঁড়ে মারে স্বামীটির দিকে।

কখনো কখনো স্ত্রীটি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। তবে প্রায়ই সে ইবসেনের *এ ডল্‌স্‌ হাউজ* নাটকের নোরার মতো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এটা ছেড়ে দেয়, এবং স্বামীকে সুযোগ দেয় তার সম্পর্কে ভাবার– অন্তত কিছু সময়ের জন্যে। সে তার স্বামীকে বলে : 'তুমি তোমার রুচি অনুসারেই সব কিছু করেছো– এবং আমার রুচিও ছিলো তোমার মতোই, বা আমি তার ভান করেছিলাম– আমি জানি না কোনটি– হয়তো দু-রকমেই– কখনো এটা, কখনো অন্যটা।' ভীরুতাবশত, বা বিব্রত বোধ করার জন্যে, বা আলস্যবশত স্ত্রীটি সমস্ত সাধারণ ও বিমূর্ত বিষয়ে তাদের যৌথ সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার স্বামীর ওপরই ছেড়ে দেয়। একজন বুদ্ধিমান, সুসংস্কৃত, স্বাধীন নারী, স্বামীকে যে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে ক'রে পনেরো বছর ধ'রে স্বামীর ওপর নির্ভর ক'রে এসেছে, এমন এক নারী আমাকে বলেছে, স্বামীর মৃত্যুর পর সে পীড়া বোধ করেছে যখন সে দেখতে পায় যে তার নিজের বিশ্বাস ও আচরণ সম্বন্ধে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে; সে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ভাবার চেষ্টা করে এ-ব্যাপারে তার স্বামী কী ভাবতো।

এ-বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় স্বাভাবিকভাবেই স্বামীটি সুখ বোধ করে। নোরার স্বামী তাকে নিশ্চয়তা দেয় : 'শুধু আমার ওপর নির্ভর করো– আমাকে

উপদেশ দিতে ও পথ দেখাতে দাও তোমাকে! আমি খাঁটি পুরুষ হতাম না, যদি না তোমার এ-নারীসুলভ অসহায়তা আমার চোখে দ্বিগুণ আকর্ষণীয় ক'রে তুলতো তোমাকে... তোমাকে রক্ষা করার জন্যে আমার আছে বিস্তৃত ডানা।' তার সমানদের সাথে সংগ্রামের একটি কঠিন দিনের পর, উর্ধ্বতনদের কাছে আত্মসমর্পণের পর, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সে নিজেকে অনুভব করতে চায় একজন পরম পুরুষ ও একজন অকাট্য সত্যদাতারূপে। সে বর্ণনা করে সারাদিনের ঘটনা, বিরোধীদের সঙ্গে যুক্তিতর্কে সে কতোটা নির্ভুল ছিলো, তা ব্যাখ্যা করে, সে সুখ পায় তার স্ত্রীর মধ্যে নিজের একটি ডবল পেয়ে, যে তার আত্মবিশ্বাসের প্রতি জানায় সমর্থন ও তাকে উৎসাহ দেয়; সে পত্রিকাগুলো ও রাজনীতিক সংবাদের ওপর তার মতামত দেয়, ইচ্ছে ক'রেই সে ওগুলো জোরে জোরে প'ড়ে শোনায় স্ত্রীকে, যাতে এমনকি সংস্কৃতির সাথেও তার স্ত্রীর সংস্পর্শ স্বাধীন না থাকে। সে নারীর অসামর্থ্যকে অতিরঞ্জিত করতে থাকে তার কর্তৃত্ব বাড়ানোর জন্যে; স্ত্রীটি কম-বেশি বশমানাভাবে মেনে নেয় এ-অধীন ভূমিকা। যে-সব নারীকে কিছু সময়ের জন্যে নিজেদের ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়, তারা স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আন্তরিকভাবেই আক্ষেপ বোধ করতে পারে, কিন্তু তারা প্রায়ই এটা আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত ও আনন্দিত হয় যে এমন পরিস্থিতিতে তাদের আছে অভাবিত সম্ভাবনা; তারা দায়িত্বভার গ্রহণ করে, সন্তান বড়ো করে, সিদ্ধান্ত নেয়, সাহায্য ছাড়াই চালিয়ে যায়। যখন তাদের পুরুষেরা ফিরে এসে আবার তাদের যোগ্যতাহীন ক'রে তোলে, সেটা তাদের জন্যে হয় বিরক্তিকর।

বিয়ে পুরুষকে প্ররোচিত করে এক খামখেয়ালপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদে : আধিপত্য করার প্রলোভন সত্যিকারভাবেই সর্বজনীন; যতো প্রলোভন আছে, এটা সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য; শিশুকে তার মায়ের কাছে সমর্পণ করা, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে সমর্পণ করা হচ্ছে বিশ্বে স্বৈরাচারকে উৎসাহিত করা। তার কথা মেনে নেয়া ও তার প্রতি অনুরাগ পোষণ করা, তাকে পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা, প্রায়ই এটা স্বামীর কাছে যথেষ্ট ব'লে মনে হয় না; সে আদেশ জারি করে, সে অভিনয় করে প্রভু ও মনিবের। বাল্যকালে ও পরবর্তী জীবনে তার মনে যতো ক্ষোভ জমেছে, যে-সব ক্ষোভ প্রতিদিন জমেছে অন্য পুরুষদের সাথে কাজ ক'রে, যে-সব পুরুষের অস্তিত্ব বোঝায় সে আছে শাসানোর নিচে ও আহত অবস্থায়– এ-সবেরই মোক্ষণ ঘটে যখন সে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর ওপর নির্বিচারে চালায় তার কর্তৃত্ব। সে বিধিবদ্ধ করে হিংস্রতা, ক্ষমতা, একরোখা সিদ্ধান্ত; সে কঠোর স্বরে নির্দেশ দিতে থাকে; সে চিৎকার করে এবং টেবিলের ওপর বাড়ি মারতে থাকে : এ-প্রহসন তার স্ত্রীর জন্যে এক প্রাত্যহিক বাস্তবতা। নিজের অধিকারে সে এতো অটল যে স্ত্রীর দিক থেকে স্বাধীনতার সামান্য ইঙ্গিতকেও তার কাছে মনে হয় বিদ্রোহ; তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে নিশ্বাস ফেলতে দিতেও সে রাজি নয়।

তবে স্ত্রীটি সত্যিই বিদ্রোহ করে। যদিও প্রথম দিকে সে মুগ্ধ হয়েছিলো পুরুষের মর্যাদায়, অচিরেই তার চোখধাঁধিয়ে যাওয়ার ভাবটা কেটে যায়। শিশু একদিন বুঝতে পারে যে তার পিতা একটি নিশ্চয়তাহীন মানুষ; স্ত্রীটি অবিলম্বে আবিষ্কার করে যে তার সামনে নেই কোনো প্রভু ও মনিবের মহান মূর্তি, আছে একটি পুরুষ; সে আর

স্বামীটির ক্রীড়নক হয়ে থাকার কোনো কারণই দেখতে পায় না; স্বামীটি তার কাছে হয়ে ওঠে অপ্রীতিকর ও অন্যায় দায়িত্বের প্রতিমূর্তি। মর্ষকামী সুখে কখনো কখনো সে বশ্যতা মেনে নেয় : সে নেয় একটি বলি-হয়ে-যাওয়া মানুষের ভূমিকা এবং বিনা প্রতিবাদে তার এটা মেনে নেয়া হচ্ছে এক দীর্ঘ, নিঃশব্দ ভর্ৎসনা; তবে কখনো কখনো এও ঘটতে পারে যে সে তার প্রভুর সাথে লিপ্ত হয় খোলাখুলি যুদ্ধে এবং স্বামীটির ওপর পাল্টা স্বৈরাচার চালাতে চেষ্টা করে।

একটা স্বামী 'ধরা' হচ্ছে শিল্পকলা; তাকে 'ধ'রে রাখা' হচ্ছে একটি চাকুরি– এবং এমন একটি, যার জন্যে দরকার অসামান্য দক্ষতা। এক বিজ্ঞ ভগ্নী তার বিরক্তিকর নববিবাহিত তরুণী বোনকে বলেছিলো : 'সাবধানে থেকো, মার্সেলের সাথে এসব দৃশ্য ঘটালে তুমি তোমার *চাকুরিটা* খোয়াবে।' যা বিপন্ন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : বস্তুগত ও নৈতিক নিরাপত্তা, নিজের একটা বাড়ি, স্ত্রীর গৌরব, প্রেম ও সুখের কম-বেশি সন্তোষজনক একটা বিকল্প। স্ত্রী শিগগিরই বুঝতে পারে তার যৌনাবেদন হচ্ছে তার অস্ত্রগুলোর মধ্যে দুর্বলতম; ঘনিষ্ঠতার ফলে এটা তিরোহিত হয়; আর আহা, চারদিকে আছে আরো কতো আকর্ষণীয় নারী। তবু, সে চেষ্টা করতে থাকে নিজেকে কামপ্রলুব্ধকর করার, চেষ্টা করতে থাকে খুশি করার; সে প্রায়ই ছিঁড়েফেড়ে যেতে থাকে গর্বে, যা তাকে নিয়ে যেতে থাকে কামশীতলতার দিকে ও এ-আশার মধ্যে যে তার কামনার ব্যগ্রতা হয়তো মুগ্ধ করবে তার স্বামীকে এবং স্বামীর কাছে তাকে প্রিয় ক'রে তুলবে। সে নির্ভর করে অভ্যাসের জোর, একটি সুখকর গৃহের মোহিনীশক্তি, বিশেষ খাদ্যের প্রতি স্বামীর আকর্ষণ, সন্তানদের প্রতি স্বামীর স্নেহের ওপরও; স্ত্রীটি তার আপ্যায়নের রীতি ও পোশাকপরিচ্ছদের সাহায্যেও চেষ্টা করে স্বামীটির সুনাম বাড়ানোর, এবং সে তার উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে স্বামীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে; তার পক্ষে যতোটা সম্ভব সে স্বামীর সামাজিক সাফল্য ও কাজের ক্ষেত্রে নিজেকে অপরিহার্য ক'রে তোলার চেষ্টা করে।

তবে, সর্বোপরি, সমগ্র প্রথাগত ঐতিহ্যধারা স্ত্রীদের ওপর নির্দেশ দেয় একটি পুরুষকে 'বশে রাখা'র শিল্পকলা শিখতে; এজন্যে স্ত্রীদের আবিষ্কার ও প্রশ্রয় দিতে হবে স্বামীর দুর্বলতাগুলো, এবং চতুরতার সাথে পরিমাণমতো প্রয়োগ করতে হবে তোষামোদ ও অবজ্ঞা, বাধ্যতা ও প্রতিরোধ, পাহারা ও ক্ষমাশীলতা। মনোভাবের শেষের মিশ্রণটি বিশেষভাবেই এক সুকুমার ব্যাপার। স্বামীকে খুব বেশি বা খুব কম স্বাধীনতা দিলে চলবে না। স্ত্রীটি যদি হয় অত্যন্ত বাধ্যগত, তাহলে সে দেখতে পাবে তার স্বামী পালাচ্ছে তাকে ছেড়ে; স্বামীটি যে-টাকা ও আবেগ নিয়োগ করে অন্য নারীদের ক্ষেত্রে, তা তার থেকেই নেয়া; এবং সে মুখোমুখি হয় একটা ঝুঁকির যে কোনো উপপত্নী তার স্বামীর ওপর এতো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারে যে সে তার স্বামীকে বাধ্য করতে পারে স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে অথবা অন্তত তার স্বামীর জীবনে অধিকার করতে পারে প্রথম স্থানটি। তবে সে যদি স্বামীকে কোনো রকম রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডই করতে না দেয়, যদি সে স্বামীকে জ্বালাতন করে সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে, আবেগের বিস্ফোরক দৃশ্য ঘটিয়ে, তার দাবি দিয়ে, তাহলে সে তার স্বামীকে ক্ষেপিয়ে তুলবে নিজের বিরুদ্ধে। কীভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'ছাড় দিতে

হয়', এটা জানতে হয়; যদি কারো স্বামী একটু 'ঠকায়', তাহলে তার চোখ বুজে থাকা ভালো; তবে অন্য সময় দু-চোখ খুলে রাখতে হবে বড়ো ক'রে। বিবাহিত নারী বিশেষ ক'রে পাহারা দেয় তরুণী নারীদের, যারা, সে মনে ক'রে, আনন্দের সাথেই তার কাছে থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারে তার 'চাকুরিটি'। একটি ভীতিকর প্রতিপক্ষের কবল থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে আনার জন্যে সে স্বামীকে নিয়ে দূরে কোথাও যায় অবকাশ কাটাতে, তাকে আমোদপ্রমোদ দেয়ার চেষ্টা করে; যদি দরকার হয়- মাদাম দ্য পঁপাদরের আদর্শে- তাহলে স্বামীর পেছনে লাগিয়ে দেয় একটি নতুন ও কম ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ। কিছুতেই কাজ না হ'লে সে আশ্রয় নেয় কান্নাকাটির, স্নায়ুদৌর্বল্যের, উদ্যোগ নেয় আত্মহত্যার, এবং এমন অনেক কিছুর; তবে খুব বেশি ভাবাবেগপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা ও পাল্টা অভিযোগ স্বামীকে দূর ক'রে দেবে বাড়ি থেকে। যে-মুহূর্তে স্ত্রীটির খুবই হওয়া দরকার কামপ্রলুব্ধকর, তখনই সে ঝুঁকি নেয় নিজেকে স্বামীর কাছে অসহ্য ক'রে তোলার; যদি সে খেলায় জিততে চায়, তাহলে তাকে সুকৌশলে মিশেল ঘটাতে হবে কপট অশ্রু ও সাহসী স্মিতহাসির, ধাপ্পা ও ছেনালিপনার।

বিয়ের ট্র্যাজেডি এটা নয় যে তা ব্যর্থ হয় নারীর প্রতি প্রতিশ্রুত সুখ নিশ্চিত করতে- সুখের ব্যাপারে নিশ্চয়তাবিধান ব'লে কোনো জিনিশ নেই- ট্র্যাজেডি হচ্ছে এটা বিকলাঙ্গ করে নারীকে; তাকে ধ্বংস করে পুনরাবৃত্তি ও নিত্যনৈমিত্তিকতায়। আমরা দেখেছি নারীর জীবনের প্রথম বিশটি বছর অসাধারণভাবে সমৃদ্ধ; সে আবিষ্কার করে বিশ্ব ও তার নিয়তি। বিশ বা তার কাছাকাছি বয়সে সে হয় একটি ঘরের গৃহিণী, স্থায়ীভাবে বাঁধা থাকে একটি পুরুষের সাথে, কোলে একটি শিশু, তখন তার জীবন চিরকালের জন্যে কার্যত শেষ। প্রকৃত কর্ম, প্রকৃত কাজ তার পুরুষটির বিশেষাধিকার : নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে তার আছে তুচ্ছ কাজ, যেগুলো অনেক সময় খুবই ক্লান্তিকর, কিন্তু কখনোই সন্তোষজনক নয়। তার আত্মবিসর্জন ও নিষ্ঠা প্রশংসা লাভ করেছে, কিন্তু 'দুটি মানুষের সেবাযত্ন ক'রে জীবন কাটিয়ে দেয়া'কে প্রায়ই তার মনে হয় অর্থহীন। নিজের কথা ভুলে থাকা খুবই চমৎকার, তবে মানুষের জানা দরকার কার জন্যে, কীসের জন্যে। এবং এর মাঝে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে যে তার নিষ্ঠাকেই অনেক সময় মনে হয় বিরক্তিকর, নাছোড়বান্দা ধরনের; এটা স্বামীর কাছে হয়ে ওঠে একটা স্বৈরাচার, যার থেকে সে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে; তবে স্বামীটিই এটা স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয় স্ত্রীর পরম, অনন্য যাথার্থ্য প্রতিপাদনরূপে। নারীটিকে বিয়ে ক'রে সে নারীটিকে বাধ্য করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তার কাছে দান করতে; তবে স্বামীটি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাধ্যবাধকতা মেনে নেয় না।

ভারসাম্যপূর্ণ দম্পতি কোনো ইউটোপীয় কল্পনা নয়; এমন দম্পতির অস্তিত্ব আছে, অনেক সময় আছে বিয়ের কাঠামোর মধ্যেই, তবে অধিকাংশ সময়ই বিয়ের বাইরে। কিছু সহচর মিলিত হয় তীব্র যৌন প্রেমে, যা তাদের স্বাধীন রাখে তাদের বন্ধুত্বে ও তাদের কর্মে; অন্যরা পরস্পরের সাথে জড়িত থাকে এমন বন্ধুত্বে, যা তাদের কামস্বাধীনতা খর্ব করে না; আরো কম সুলভ হচ্ছে তারা, যারা একই সাথে প্রেমিকপ্রেমিকা ও বন্ধু, তবে তারা পরস্পরের মধ্যেই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র

কারণ সন্ধান করে না। একটি পুরুষ ও একটি নারীর সম্পর্কের মধ্যে সম্ভব বহু সূক্ষ্ম দ্যোতনা; সহচারিতা, আনন্দ, বিশ্বাস, ভালো লাগা, সহযোগিতা, প্রেমে তারা পরস্পরের কাছে হ'তে পারে মানুষের পক্ষে লভ্য আনন্দোল্লাস, সমৃদ্ধি, ও শক্তির অপর্যাপ্ত উৎস। বিয়ের ব্যর্থতার জন্যে ব্যক্তিমানুষকে দোষ দেয়া ঠিক নয় : কোঁৎ ও তলস্তয়ের মতো প্রবক্তাদের দাবির বিপরীতে– দোষী সংস্থাটি নিজেই, যা শুরু থেকেই বিকৃত। একটি পুরুষ ও একটি নারী, যারা হয়তো পরস্পরকে নিজেদের পছন্দে বেছে নেয় নি, তারা পরস্পরকে জীবনভর সব রকমে তৃপ্ত করার জন্যে *দায়িত্বাবদ্ধ*, এ-ধারণা পোষণ ও ঘোষণা একটা পৈশাচিকতা, যা অবধারিতভাবে জন্ম দেয় ভণ্ডামো, মিথ্যাচার, শত্রুতা ও সুখহীনতার।

প্রথাগত বিয়ের রূপটি এখন বদলাচ্ছে, তবু এখনো এতে আছে পীড়ন, যা স্বামীস্ত্রী দুজনে ভোগ করে ভিন্নভাবে। তারা যে-বিমূর্ত, তাত্ত্বিক অধিকার উপভোগ করে, তাতে আজ তারা প্রায় সমান; তারা পরস্পরকে পছন্দ করার ব্যাপারে আগের থেকে অনেক বেশি স্বাধীন, তারা বিচ্ছিন্নও হ'তে পারে অনেক সহজে, বিশেষ ক'রে আমেরিকায়, যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ বিরল ব্যাপার নয়; একদা স্বামীস্ত্রীর বয়স ও সংস্কৃতির মধ্যে যে-পার্থক্য ছিলো, এখন তা সাধারণত কম দেখা যায়; এখন স্ত্রী যে-স্বাধীনতা দাবি করে, স্বামী তা অনেক বেশি স্বেচ্ছায় মেনে নেয়; তারা ঘরকন্নার কাজগুলো ভাগ ক'রে নিতে পারে সমভাবে; তারা আমোদপ্রমোদও উপভোগ করে একত্রে : শিবিরাবকাশ, সাইকেল চালানো, সাঁতারকাটা, গাড়িচালনা ইত্যাদি। স্ত্রী আর স্বামীর ফেরার প্রতীক্ষায় দিন কাটায় না; সে খেলাধুলো করতে যেতে পারে, কোনো ক্লাবের, সংঘের, সঙ্গীতদলের বা এমন কিছুর সদস্য হ'তে পারে, সে প্রায়ই ঘরের বাইরে ব্যস্ত থাকে, এমনকি তার থাকতে পারে কোনো কাজ, যাতে তার হাতে কিছু পয়সা আসে।

পরিচ্ছেদ ২

মা

মাতৃত্বে নারী পূর্ণ করে তার শারীরবৃত্তিক নিয়তি; এটা তার প্রাকৃতিক 'পেশা', কেননা তার সমগ্র জৈবসংগঠন প্রজাতির স্থায়িত্ববিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে আমরা দেখেছি মানবসমাজ কখনোই পুরোপুরি প্রকৃতির কাছে সমর্পিত হয় নি। এবং প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে বিশেষ ক'রে প্রজননের কাজটি আর শুধুই জৈব আকস্মিকতার ওপর নির্ভরশীল নয়; এটা মানুষের স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণের অধীনে এসে গেছে। কিছু কিছু দেশ সরকারিভাবে গ্রহণ করেছে জন্মনিরোধের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি; ক্যাথলিক প্রভাবের অধীন জাতিগুলোর মধ্যে এর চর্চা হয় গুপ্তভাবে : পুরুষটি হয়তো করে *বাহ্যিক বীর্যপাত* বা নারীটি সঙ্গমের পর তার দেহ থেকে বের ক'রে দেয় শুক্রাণু। এ-ধরনের নিরোধ প্রেমিকপ্রেমিকা বা বিবাহিত দম্পতির মধ্যে মাঝেমাঝেই সৃষ্টি করে বিরোধ ও ক্ষোভ; পুরুষটি অপছন্দ করে সুখের মুহূর্তে সতর্ক থাকতে; নারীটি ঘৃণা করে ডুশ করার অপ্রীতিকর কাজটি; পুরুষটি ক্ষুব্ধ থাকে নারীটির অতিশয় উর্বর দেহের ওপর; নারীটি ভয় পায় জীবনের বীজাণুগুলোকে, যেগুলোকে পুরুষটি ঝুঁকির সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার ভেতরে। আর এসব সাবধানতা সত্ত্বেও যখন নারীটি দেখে যে সে 'ধরা প'ড়ে গেছে', তখন উভয়েই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। যে-সব দেশে গর্ভনিরোধের পদ্ধতি আদিম, সেখানে এটা ঘটে প্রায়ই। তখন আশ্রয় নিতে হয় বিশেষভাবে বেপরোয়া এক প্রতিকারের : অর্থাৎ, গর্ভপাতের। যে-সব দেশে গর্ভনিরোধ অনুমোদিত, সেখানেও গর্ভপাত কম অবৈধ নয়, তবে সেখানে এটা খুবই কম দরকার পড়ে। কিন্তু ফ্রান্সে বহু নারী বাধ্য হয় এ-অস্ত্রোপচারের আশ্রয় নিতে এবং এটা তাদের অধিকাংশের প্রেণয়ের জীবনে হানা দিতে থাকে প্রেতের মতো।

খুব কম বিষয়ই আছে, যার সম্পর্কে বুর্জোয়া সমাজ দেখিয়ে থাকে এর থেকে বেশি ভণ্ডামো; গর্ভপাতকে গণ্য করা হয় একটি ঘৃণ্য অপরাধ ব'লে, যার উল্লেখ করাকেও অশোভন মনে করা হয়। একজন লেখক যখন বর্ণনা করেন কোনো নারীর সন্তান প্রসবের সময়ের আনন্দ ও যন্ত্রণা, সেটা চমৎকার; কিন্তু তিনি যদি বর্ণনা করেন একটি গর্ভপাতের ঘটনার, তখন তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় ময়লায় গড়াগড়ি দেয়ার এবং মানবজাতিকে এক শোচনীয় আলোতে উপস্থাপনের জন্যে। এখন, ফ্রান্সে প্রতি বছর যতোগুলো শিশু জন্মে গর্ভপাতও ঘটে ততোগুলোই। এটা এমন একটি ব্যাপক প্রপঞ্চ যে প্রকৃতপক্ষে এটাকে গণ্য করতে হবে নারীর পরিস্থিতির মধ্যে নিহিত ঝুঁকিগুলোর একটি ব'লে। তবুও আইন নাছোড়বান্দার মতো অটল একে একটি লঘু অপরাধ ব'লে গণ্য করার জন্যে এবং তাই এ-সুকুমার অস্ত্রোপচারটি গোপনে সম্পন্ন

করার দরকার হয়। গর্ভপাত বৈধকরণের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি উপস্থাপন করা হয়, সেগুলোর থেকে বাজেকথা আর কিছুই হ'তে পারে না। মত পোষণ করা হয় যে এটি একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্রোপচার। তবে মাগনাস হার্সফিল্ডের সাথে সৎ চিকিৎসকেরা স্বীকার করেন যে 'হাসপাতালে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ দিয়ে, যথোচিত সাবধানতার সাথে, গর্ভপাত ঘটালে, তাতে দণ্ডবিধি যে-ভয়ানক বিপদের দাবি করে, সে-ভয় থাকে না।' এর বিপরীতে, বর্তমান অবস্থায় এটা আসলে যেভাবে করা হয়, তা নারীর জন্যে এক ভীষণ ঝুঁকি। গর্ভপাতকারীদের দক্ষতার অভাবে এবং যে-খারাপ অবস্থার মধ্যে তারা অস্ত্রোপচার করে, তার ফলে ঘটে বহু দুর্ঘটনা, যার কোনো কোনোটি মারাত্মক।

আরোপিত মাতৃত্ব পৃথিবীতে নিয়ে আসে হতভাগ্য শিশুদের, মা-বাবারা যাদের ভরণপোষণ করতে পারবে না এবং যারা হবে সর্বসাধারণের তত্ত্বাবধানের শিকার বা 'শহিদ শিশু'। এটা উল্লেখ করা দরকার যে আমাদের সমাজ, যা খুবই উৎসাহী ভ্রূণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে, জন্মের পর শিশুর প্রতি আর কোনো আগ্রহ পোষণ করে না; 'জনসহায়তা' নামের অকীর্তিকর সংস্থাটিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ না নিয়ে সমাজ মামলা দায়ের করে গর্ভপাতকারীদের বিরুদ্ধে; শিশুদের যারা শিশুপীড়নকারীদের কাছে রক্ষণের জন্যে দায়ী, মুক্তি দেয় তাদের; সমাজ চোখ বুজে থাকে শিশু-আশ্রম ও ব্যক্তিপরিচালিত শিশু-অবাসের পশুতুল্য নির্দয়দের ভয়ঙ্কর নির্মমতার প্রতি। এবং যদি স্বীকার না করা হয় যে ভ্রূণটির মালিক সে-নারী যে ভ্রূণটি ধারণ করে, তাহলে অন্য দিকে স্বীকার করতে হয় যে শিশু এমন বস্তু, যার মালিক তারা পিতামাতা এবং তারা নির্ভরশীল তাদের কৃপার ওপর। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে একজন শল্যচিকিৎসক আত্মহত্যা করেছেন, কেননা গর্ভপাত করানোর অপরাধে তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন, আর একটি পিতা, যে তার ছেলেকে পিটিয়ে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো, তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে তিন মাস কারাদণ্ডে, তবে তার কারাদণ্ড স্থগিত রাখা হয়েছে। সম্প্রতি এক পিতা যত্ন না নিয়ে গলাফোলা রোগে মরতে দিয়েছে তারা পুত্রকে; এক মা তার কন্যার জন্যে ডাক্তার ডাকতে রাজি হয় নি, কেননা সে বিধাতার ইচ্ছের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে : সমাধিক্ষেত্রে শিশুরা তার দিকে পাথর ছুঁড়েছে; তবে যখন কয়েকজন সাংবাদিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তখন একদল গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিবাদ করেন যে পিতামাতারা তাদের শিশুদের মালিক, তাই বাইরে থেকে কোনো হস্তক্ষেপ সহ্য করা যায় না। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এ-মনোভাবের ফলে এক মিলিয়ন ফরাশি শিশু শারীরিক ও নৈতিক বিপদের সম্মুখীন। উত্তর আফ্রিকার আরব রমণীরা গর্ভপাতের আশ্রয় নিতে পারে না, এবং তাদের জন্ম দেয়া দশজন শিশুর মধ্যে সাত-আটজনই মারা যায়; তবু কেউই বিচলিত বোধ করে না, কেননা গর্ভধারণের এ-শোচনীয় ও উদ্ভট আধিক্য নষ্ট করে তাদের মাতৃসুলভ অনুভূতি। যদি এসব হয় নৈতিকতার অনুকূল, তাহলে এ-নৈতিকতা সম্পর্কে কী ভাবতে হবে? এর সঙ্গে আরো বলা দরকার যে-সব লোক ভ্রূণের জীবনের প্রতি পোষণ করে অতিশয় বিবেকপরায়ণ শ্রদ্ধা, তারাই আবার যুদ্ধে বয়স্কদের মৃত্যুদণ্ডিত করার জন্যে হয় অতিশয় ব্যগ্র।

গর্ভপাতের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বাস্তবিক বিচারবিবেচনাগুলো গুরুত্বহীন; নৈতিক

বিচারবিবেচনার দিক দিয়ে ওগুলো পরিশেষে হয়ে ওঠে ক্যাথলিকদের পুরোনো যুক্তির সমার্থক : অজাত শিশুটির আছে একটি আত্মা, যেটি স্বর্গে প্রবেশাধিকার পাবে না যদি অন্সুদীক্ষা ছাড়াই ব্যাহত হয় তার জীবন। এটা বিস্ময়কর যে গির্জা অনেক সময় বয়স্কদের হত্যা করা অনুমোদন করে, যেমন করে যুদ্ধে অথবা আইনানুগ মৃত্যুদণ্ডের বেলা; কিন্তু এটা ভ্রূণাবস্থার মানুষের জন্যে সংরক্ষণ করে এক আপোসহীন মানবহিতৈষণা। এখানে অভাব ঘটে অন্সুদীক্ষার মাধ্যমে পরিত্রাণের; তবে ধর্মযুদ্ধের সময় বিধর্মীরা ছিলো সমভাবে অন্সুদীক্ষাহীন, তবু পূর্ণোদ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছিলো তাদের নিধনকাণ্ডকে। সন্দেহ নেই আজ যে-অপরাধীকে গিলোটিনে বধ করা হয় এবং যে-সৈনিক মৃত্যুবরণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্মবিচারসভা কর্তৃক দণ্ডিতদের সবাই ধর্মে তাদের থেকে বেশি দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলো না। এসব ক্ষেত্রে গির্জা ব্যাপারটি ছেড়ে দেয় বিধাতার করুণার ওপর; এটা স্বীকার করে যে মানুষ বিধাতার হাতের নিতান্তই একটি হাতিয়ার এবং কোনো আত্মার পাপমোচনের ব্যাপারটি মীমাংসিত হয় ওই আত্মাটি ও বিধাতার মধ্যেই। সুতরাং ভ্রূণের আত্মাটিকে স্বর্গে গ্রহণ করতে কেনো নিষিদ্ধ করা হবে বিধাতাকে? যদি কোনো গির্জীয় অধিবেশন এটা অনুমোদন করে, তাহলে বিধাতা আর অস্বীকার করবে না যেমন সে অস্বীকার করে নি গৌরবান্বিত পর্বগুলোতে যখন বিধর্মীদের বলি দেয়া হতো ধার্মিকভাবে।

ঘটনা হচ্ছে যে এখানে প্রতিবন্ধকতাটি হচ্ছে একটি প্রাচীন, একগুঁয়ে প্রথা, যাতে নৈতিকতার কোনোই বালাই নেই। আমাদের অবশ্যই বোঝাপড়া করতে হবে সেই পুরুষধর্মী ধর্ষকামিতার সঙ্গে, যে-সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যেই কথা বলেছি। একটা চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে ডঃ রয়ের একটি বই, ১৯৪৩-এ যা উৎসর্গ করা হয় পেতাঁকে। পিতৃসুলভ উৎকণ্ঠায় লেখক দৃঢ়ভাবে কথা বলেছেন গর্ভপাতের বিপদ সম্পর্কে, তবে পেট কেটে প্রসবকেই তাঁর মনে হয়েছে সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ব'লে। গর্ভপাতকে দুষ্টাচরণ ব'লে গণ্য না ক'রে তিনি অপরাধ ব'লে গণ্য করার পক্ষপাতী; এমনকি তিনি একে একটি চিকিৎসাব্যবস্থা হিশেবেও নিষিদ্ধ দেখতে চান– অর্থাৎ গর্ভধারণ যখন মায়ের জীবন বা স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি। তিনি ঘোষণা করেন যে একটি জীবন ও আরেকটি জীবনের মধ্যে বাছবিছার করা অনৈতিক, এবং এ-যুক্তির বলে তিনি মাকে বলি দেয়ার পরামর্শ দেন। দৃঢ়ভাবে তিনি ঘোষণা করেন যে মা ভ্রূণের মালিক নয়, এটি এক স্বাধীন সত্তা। 'সচ্চিন্তাশীল' এ-চিকিৎসকগণ যখন মাতৃত্বের গুণকীর্তনে মুখর হন, তখন অবশ্য তাঁরা বলেন যে ভ্রূণ মায়ের দেহের একটি অংশ, অর্থাৎ এটি মায়ের মূল্যে বেড়ে ওঠা কোনো পরজীবী নয়। নারীবাদবিরোধিতা এখনো কতো জীবন্ত, তা দেখা যায় যা-কিছু নারীর মুক্তির অনুকূল, সে-সব প্রত্যাখ্যানের জন্যে কিছু লোকের ব্যগ্রতায়।

উপরন্তু, আইন– যা বহু নারীকে দণ্ডিত করে মৃত্যু, বন্ধ্যাত্ব, চিররুগ্নতায়– জন্মের সংখ্যাবৃদ্ধির নিশ্চয়তাবিধানে একেবারে অক্ষম। বৈধগর্ভপাতের শত্রু ও মিত্ররা যে-একটি ব্যাপারে একমত, তা হচ্ছে পীড়নমূলক আইনের চরম ব্যর্থতা। প্রামান্য বিশেষজ্ঞদের মতে ফ্রান্সে সম্প্রতি বছর গড়ে প্রায় দশ লক্ষ গর্ভপাত ঘটে। এর মধ্যে দু-তৃতীয়াংশই ঘটে বিবাহিত নারীদের। এসব গোপন ও প্রায়ই ভুল অস্ত্রোপচারের

ফলে ঘটে অজ্ঞাত, কিন্তু বিপুল সংখ্যক মৃত্যু ও অনিষ্ট।

গর্ভপাতকে অনেক সময় উল্লেখ করা হয় একটি 'শ্রেণী-অপরাধ' বলে, এবং এতে বেশ সত্যতা আছে। জন্মনিরোধের জ্ঞান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, এবং শ্রমিক ও চাষীদের বাড়িতে যেহেতু চলন্ত জলের ব্যবস্থা নেই, তাই স্নানাগার থাকায় তাদের থেকে মধ্যবিত্তদের পক্ষে এটা প্রয়োগ করা সহজ; অন্যদের থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা বেশি সতর্ক; এবং সচ্ছল লোকদের মধ্যে শিশু বিশেষ ভারি দায়িত্ব নয়। প্রায়সই গর্ভপাতের অতিশয় জরুরি কারণগুলোর মধ্যে আছে দারিদ্র্য, ঘিঞ্জি বসতি, এবং কাজ করার জন্যে নারীর বাইরে যাওয়ার আবশ্যকতা। প্রায়ই দেখা যায় যে দুটি সন্তানের পর দম্পতিরা সন্তানের জন্ম সীমিত করতে চায়; তাই দেখা যায় যে গর্ভপাত করা বিরক্তিপূর্ণ নারীটিই আবার একটি চমৎকার মাতা, যে বাহুতে দোলাচ্ছে দুটি স্বর্ণকেশী দেবদূত : একই ও অভিন্ন ব্যক্তিটি।

তবে, অন্য দিকে, কোনো একলা তরুণীর বিপজ্জনক পরিস্থিতির থেকে খুব কম পরিস্থিতিই অধিক শোচনীয়; টাকার অভাবে তার 'ভুল' সংশোধনের জন্যে সে বাধ্য হয় এক 'অপরাধমূলক' কাজ করতে, তার গোষ্ঠি যাকে মনে করে ক্ষমার অযোগ্য। ঠিক এটাই প্রতি বছর ঘটে ফ্রান্সের ৩০০,০০০ কর্মচারী, সেক্রেটারি, শ্রমিক, ও চাষী নারীর ক্ষেত্রে; অবৈধ মাতৃত্ব আজো এতো বিভীষিকাময় দোষ যে অনেকে অবিবাহিত মা হওয়ার থেকে আত্মহত্যা বা শিশুহত্যাকেই বরণ ক'রে নেয় : এর অর্থ হচ্ছে কোনো দণ্ডই তাদের নিবৃত্ত করতে পারবে না অজাত শিশুটির থেকে 'নিষ্কৃতি পাওয়া' থেকে। সাধারণভাবে প্রচলিত গল্পটি প্রলোভনের গল্প, যাতে একটি কম-বেশি অজ্ঞ মেয়ে প্রলুব্ধ হয় তার দায়িত্বহীন প্রেমিকের দ্বারা, একদিন যা ঘটার ঘটে অবধারিতভাবে, সে এটা গোপন ক'রে রাখে পরিবারের, বন্ধুদের, ও নিয়োগদাতার থেকে, এবং গর্ভপাতই হয় ভীতিকর, তবে মুক্তির একমাত্র কল্পনাসাধ্য উপায়।

প্রায়ই প্রলুব্ধকারী কামুকটি নিজেই নারীটিকে বোঝায় যে তাকে শিশুটির থেকে মুক্তি পেতেই হবে। অথবা এও হয় যে মেয়েটি যখন দেখে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে, তার আগেই পুরুষটি তাকে ছেড়ে চ'লে গেছে, বা মেয়েটি সহৃদয়ভাবে চায় তার কলঙ্ক পুরুষটির কাছে গোপন করতে, বা সে বুঝতে পারে যে পুরুষটি তাকে সাহায্য করতে অসমর্থ। অনেক সময় মেয়েটি অনুশোচনার সাথেই শিশুটিকে ধারণ করতে অস্বীকার করে; কোনো-না-কোনো কারণে– এমন হ'তে পারে যে এটিকে শেষ ক'রে দেয়ার সিদ্ধান্ত সে সঙ্গেসঙ্গেই গ্রহণ করে না, বা এ-কারণে যে সে একটা 'ভালো ঠিকানা' জানে না, বা এমন হ'তে পারে যে তার হাতে টাকা নেই এবং অকেজো ঔষধপত্র ব্যবহার ক'রে সে সময় নষ্ট ক'রে ফেলেছে– যখন সে পৌঁছে গেছে তার গর্ভের তৃতীয়, চতুর্থ, বা পঞ্চম মাসে, তখন এটা থেকে সে মুক্তির উদ্যোগ নেয়; আর তখন গর্ভপাত হয়ে ওঠে আগের মাসগুলোর থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক, যন্ত্রণাকর ও আপোশমূলক। নারীটি এটা জানে; সে উদ্বেগ ও হতাশার মধ্যে উদ্যোগ নেয় নিজেকে মুক্ত করার। গ্রামাঞ্চলে এষণীর প্রয়োগ আদৌ জানা যায় না; যে-পল্লীনারীর একটা 'স্খলন' ঘটেছে, সে হয়তো গোলাবাড়ির মই থেকে প'ড়ে মরে, বা সে লাফিয়ে পড়ে নিচের তলায়, এবং অনেক সময় নিরর্থক আহত হয়; এবং এও ঘটতে পারে যে

ঝোপের নিচে বা একটা খাদে পাওয়া যায় গলা টিপে মারা একটা ছোটো লাশ।

নগরে নারীরা পরস্পরকে সাহায্য ক'রে উদ্ধার করে। তবে একটা হাতুড়ে গর্ভপাতকারী পাওয়া সব সময় সহজ নয়, আরো কঠিন দরকারি টাকাপয়সা যোগাড় করা। তাই গর্ভিণী নারী সাহায্য চায় কোনো বান্ধবীর, বা নিজেই করে নিজের অস্ত্রোপচার। এ-অপেশাদার অস্ত্রোপচারকেরা প্রায়ই হয়ে থাকে অদক্ষ; তারা প্রায়ই ফুটো ক'রে ফেলে এষণী বা শেলাইয়ের সূচ দিয়ে। এক ডাক্তার এক অজ্ঞ রাঁধুনি সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন যে প্রক্ষেপণি দিয়ে সে তার জরায়ুতে ভিনেগার ঢুকোতে গিয়ে ঢুকিয়ে ফেলে মূত্রাশয়ে, যা ছিলো প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। স্থূলভাবে শুরু ও অতি অযত্নে সম্পন্ন করার ফলে গর্ভপাত সব সময়ই হয়ে থাকে স্বাভাবিক প্রসবের থেকে অনেক বেশি বেদনাদায়ক, এতে এমন স্নায়ুবিকার ঘটতে পারে যে দেখা দিতে পারে মূর্ছারোগ, ঘটতে পারে মারাত্মক আভ্যন্তর ব্যাধি, এবং মারাত্মক রক্তক্ষরণ।

কলেৎ তাঁর *গ্রিবিশ*-এ নৃত্যশালার এক নর্তকীর অসহ্য যন্ত্রণার বিবরণ দিয়েছেন, যা সে ভোগ করে অজ্ঞ মায়ের হাতে; তার মা বলে যে এর ঠিক প্রতিষেধক হচ্ছে সাবানের ঘনীভূত দ্রবণ পান করা এবং সিকি ঘণ্টা ধ'রে দৌড়ানো। শিশুটির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এমন চিকিৎসায় অনেক সময় মারা যায় মা-টি। আমি এক সাঁটলিপিকারের কথা শুনেছি, যে খাদ্য ও জল ছাড়া নিজের রক্তে স্নাত হয়ে চার ঘণ্টা আটকে থাকে তার ঘরে, কেননা কারো সাহায্য চাওয়ার সাহস তার হয় নি।

পুরুষেরা গর্ভপাতকে লঘুভাবে নিয়ে থাকে; তারা মনে করে যে ক্ষতিকর প্রকৃতি নারীর ওপর আরোপ করেছে যে-অজস্র বিপদ, এটা তার একটি, কিন্তু তারা এর মূল্যবোধ পুরোপুরি বুঝতে সমর্থ হয় না। যে-নারী গর্ভপাতের আশ্রয় নেয়, সে প্রত্যাখ্যান করে নারীর মূল্যবোধ, তার মূল্যবোধ, এবং একই সময়ে সে আমূলভাবে বিরোধিতা করে পুরুষের প্রতিষ্ঠিত নীতিবোধের। বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তার নৈতিকতার সমগ্র মহাবিশ্ব। বাল্যকাল থেকে নারীকে বারবার বলা হয় যে তাকে তৈরি করা হয়েছে সন্তান বিয়োনোর জন্যে, এবং তার কাছে সব সময় গাওয়া হয় মাতৃত্বের মহিমার গান। তার পরিস্থিতির অসুবিধাগুলো– ঋতুস্রাব, অসুখ, এবং আরো বহু কিছু– এবং গৃহস্থালির নীরস একঘেয়ে খাটুনির বিরক্তিকর ক্লান্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় তার এই চমকপ্রদ বিশেষাধিকার দিয়ে যে সে বিশ্বে নিয়ে আসে সন্তানদের। আর এখানে পুরুষ নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে নারী হিশেবে নারীকে ছেড়ে দিতে বলে তার বিজয়কে, যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় পুরুষের ভবিষ্যৎ, তার পেশার মঙ্গলের জন্যে!

শিশু আর অমূল্য সম্পদ নয়, জন্মদান আর পবিত্র কর্ম নয়; কোষের এ-দ্রুতবিস্তার হয়ে ওঠে আপতিক ও পীড়াদায়ক; এটা নারীর আরেকটি খুঁত। এর তুলনায় মাসিক বিরক্তিটাকে মনে হয় আশীর্বাদ : এখন উদ্বেগে চোখ রাখা হয় লাল ধারার ফিরে আসার ওপর, যে-ধারাকে বিভীষিকাকর মনে হয়েছে তরুণী মেয়ের এবং যার জন্যে মাতৃত্বের প্রতিশ্রুত আনন্দ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এমনকি যখন সে গর্ভপাতে সম্মতিও দেয়, এমনকি তা কামনাও করে, তখনও নারী এটাকে মনে করে তার নারীত্ব বিসর্জন : সে তার লিঙ্গে দেখতে বাধ্য হয় একটা অভিশাপ, এক ধরনের বৈকল্য, এবং একটা বিপদ। এ-অস্বীকৃতিকে একটা চরমে নিয়ে গিয়ে গর্ভপাতের

আঘাতজনিত স্নায়ুরোগের ফলে কিছু নারী হয়ে ওঠে সমকামী।

নারীর 'অনৈতিকতা'য়, নারীবিদ্বেষীদের যা একটি প্রিয় বিষয়, বিস্ময়ের কিছু নেই; কী ক'রে তারা একটা আন্তর অবিশ্বাস পোষণ না ক'রে পারে সে-সব অহঙ্কৃত নীতির প্রতি, পুরুষেরা যেগুলো প্রকাশ্যে ঘোষণা করে আর সংগোপনে অমান্য করে? পুরুষ যখন উচ্চপ্রশংসা করে নারীর বা যখন উচ্চপ্রশংসা করে পুরুষের, তখন পুরুষ যা বলে, তা অবিশ্বাস করতে শেখে নারীরা : যে-একটি জিনিশ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত, তা হচ্ছে এই খাঁজ কাটা ও ক্ষরণশীল জরায়ু, টকটকে লাল জীবনের এসব ছিন্নাংশ, এ-শিশু যে সেখানে নেই। নারী তার প্রথম গর্ভপাতের সময় শুরু করে 'জানতে'। অনেক নারীর কাছে বিশ্ব আর কখনোই আগের মতো থাকবে না। এবং তবু, সুলভ জন্মনিরোধের অভাবে, গর্ভপাতই ফ্রান্সে আজ সে-নারীদের একমাত্র আশ্রয়, যারা পৃথিবীতে আনতে চায় না সে-শিশুদের, যারা দণ্ডিত হবে দুর্দশা ও মৃত্যুতে।

জন্মনিরোধ ও বৈধ গর্ভপাত নারীকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে দেয় তার গর্ভধারণের দায়িত্ব। বর্তমান অবস্থায়, নারীর গর্ভধারণ আংশিক স্বেচ্ছাকৃত, আংশিক আকস্মিক। কৃত্রিমভাবে গর্ভধারণ যেহেতু এখনো সাধারণ ব্যাপার হয়ে ওঠে নি, তাই এমন হ'তে পারে যে কোনো নারী গর্ভধারণ করতে চায়, কিন্তু তার ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না– কেননা পুরুষের সাথে তার সংস্পর্শ নেই, বা তার স্বামী বন্ধ্যা, বা সে নিজেই গর্ভধারণে অক্ষম। আবার, অন্য দিকে, কোনো কোনো নারী তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বাধ্য হয় সন্তানপ্রজননে। নারীর প্রকৃত মনোভাব অনুসারে গর্ভধারণ ও মাতৃত্বের ব্যাপারগুলোর অভিজ্ঞতা হ'তে পারে খুবই বিচিত্র, তা হ'তে পারে বিদ্রোহের, বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়ার, সন্তুষ্টির, বা উদ্দীপনার। অবশ্যই বুঝতে হবে যে তরুণী মায়ের প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করা সিদ্ধান্ত ও ভাবাবেগ সব সময় তার গভীরতর বাসনার সাথে খাপ খায় না। তরুণী অবিবাহিত মা তার ওপর হঠাৎ চাপানো বস্তুগত ভারে বিহ্বল হয়ে উঠতে পারে এবং হ'তে পারে বাহ্যিকভাবে হতাশাগ্রস্ত, এবং তবুও সে তার সন্তানের মধ্যে দেখতে পারে তার গোপন স্বপ্নের বাস্তবায়ন। অন্য দিকে, কোনো বিবাহিত তরুণী, যে আনন্দে ও গর্বে স্বাগত জানায় তার গর্ভধারণকে, সে হয়তো অন্তর্গতভাবে একে ভয় পেতে পারে ও অপছন্দ করতে পারে, কারণ তার ওপর ভর ক'রে থাকতে পারে আবিষ্টতা, অলীক কল্পনা, ও বাল্যস্মৃতি, যা সে খোলাখুলি স্বীকার করতে চায় না। এ-ব্যাপারে নারীরা যে গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়, এটা তার অন্যতম কারণ। তাদের নীরবতা আংশিকভাবে উদ্ভূত হয় একটি অভিজ্ঞতা, যা একান্তভাবেই তাদের অধিকারে, সেটিকে রহস্যাবৃত ক'রে রাখার আনন্দ থেকে ; তবে এ-সময়ে তারা অনুভব করে যে-সব আভ্যন্তর বিরোধ ও সংঘর্ষ, সেগুলো দিয়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

নিজে মা হয়ে নারী এক অর্থে গ্রহণ করে তার নিজের মায়ের স্থান : এটা বোঝায় তার সম্পূর্ণ মুক্তি। যদি সে আন্তরিকভাবেই কামনা করে, তাহলে তার গর্ভধারণের ফলে সে হবে আনন্দিত এবং সাহস পাবে একলা নিজে এ-ভার বহনের; কিন্তু সে যদি এখনো স্বেচ্ছায় মায়ের অধীনে থাকে, তাহলে সে নিজেকে আবার তুলে দেয় মায়ের হাতে; নবজাত সন্তানকে তার নিজের সন্তান ব'লে মনে না হয়ে ওটিকে তার মনে

হবে একটি ভাই বা বোনের মতো। যদি সে একই সাথে মুক্তি পেতে চায় এবং নিজেকে মুক্ত করার সাহস না করে, তাহলে সে আশঙ্কা করতে থাকে যে শিশুটি তাকে বাঁচানোর বদলে আবার তার ওপর চাপিয়ে দেবে দাসত্বের জোয়াল, এবং এ-উদ্বেগের ফলে ঘটতে পারে গর্ভপাত।

তবে সর্বোপরি গর্ভধারণ এমন একটি নাটক, যা অভিনীত হয় নারীটির নিজের ভেতরেই। সে এটাকে একই সঙ্গে একটি সমৃদ্ধি ও একটি ক্ষত হিশেবে অনুভব করে; ভ্রূণটি তার দেহের একটি অংশ, এবং এটি একটি পরজীবী, যেটি বেঁচে থাকে তার দেহ খেয়ে; এটি তার অধিকারে এবং এটি দিয়ে সে অধিকৃত; এটি ভবিষ্যতের প্রতীক এবং এটি বহন ক'রে সে নিজেকে বিশ্বের মতো বিশাল ব'লে অনুভব করে; কিন্তু এ-প্রাচুর্যই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে দেয় তাকে, তার মনে হয় সে আর কিছু নয়। একটি নতুন জীবন প্রকাশ করতে যাচ্ছে নিজেকে এবং প্রতিপাদন করতে যাচ্ছে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, এজন্যে সে গর্ববোধ করে; তবে সে অনুভব করে যেনো সে দুলছে ও তাড়িত হচ্ছে, সে হয়ে উঠেছে দুর্বোধ্য শক্তিরাশির খেলার পুতুল। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে গর্ভবতী নারী তার দেহের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে ঠিক সে-মুহূর্তে যখন সেটি লাভ করছে সীমাতিক্রমণতা; তার দেহের প্রতি তার দেহের জন্যে বিবমিষা ও অস্বস্তি; তার দেহটি আর নিজের জন্যে অস্তিত্বশীল নয়, তাই দেহটি হয়ে ওঠে আগের থেকে অনেক বড়ো। প্রকৃতির প্রলোভনে প'ড়ে গর্ভবতী নারী হয়ে ওঠে উদ্ভিদ ও পশু, কোলয়েডের গুদামঘর, ডিমস্ফোটনযন্ত্র, ডিম; যে-শিশুরা গর্ববোধ করে তাদের তরুণ, সরলসোজা শরীর নিয়ে, তারা ভয় পায় তাকে দেখে, এবং তরুণেরা তাকে দেখে ঘৃণায় ফিক ক'রে হেসে ওঠে, কেননা সে এমন একটি মানুষ, একটি সচেতন ও স্বাধীন ব্যক্তি, যে হয়ে উঠেছে জীবনের অক্রিয় হাতিয়ার।

প্রসবের জন্যে সময় লাগতে পারে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে দুই বা তিন ঘণ্টা, তাই এ-সম্পর্কে কোনো সাধারণীকরণ করা যায় না। অনেক নারীর কাছে প্রসবের কাজটি হচ্ছে শহিদত্ব লাভ। এর বিপরীতে, অনেক নারী এ-যন্ত্রণাকে বেশ সহজে বহনযোগ্য ব'লেই মনে করে। কেউ কেউ এতে বোধ করে ইন্দ্রিয়সুখ। কিছু কিছু নারী বলে যে প্রসবের ব্যাপারটি তাদের দেয় এক ধরনের সৃষ্টিশীল শক্তির বোধ; তারা সত্যিই সম্পন্ন করেছে একটি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ও উৎপাদনশীল কাজ। অন্য চরম প্রান্তে অনেকে নিজেদের বোধ করে অক্রিয়– দুর্ভোগগ্রস্ত ও উৎপীড়িত যন্ত্র।

নবজাত শিশুর সাথে মায়ের প্রথম সম্পর্কগুলো একই রকমে বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাদের শরীরের ভেতরে এখন যে-শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কিছু নারী কষ্ট বোধ করে: তাদের মনে হয় চুরি হয়ে গেছে তাদের সম্পদ। সেসিল সভাজ তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন এ-অনুভূতি : 'আমি সে-মৌচাক, যেখান থেকে চ'লে গেছে মৌমাছির ঝাঁক'; এবং আবার : 'তার জন্ম হয়েছে, আমি হারিয়েছি আমার তরুণ প্রিয়তমকে, এখন জন্ম হয়েছে তার, আমি একলা।'

বারবার দাবি করা হয়েছে যে শিশুর মধ্যে শিশ্নের সমতুল্য একটি বস্তু পেয়ে নারী সুখী হয়ে ওঠে, তবে এটি কিছুতেই একটি যথাযথ বিবৃতি নয়। ঘটনা হচ্ছে একটি পুরুষ ছেলেবেলায় তার শিশ্নের মধ্যে যেমন একটি বিস্ময়কর খেলনা পেতো, বয়স্ক

পুরুষ তা আর পায় না; প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কাছে এর মূল্য হচ্ছে এটি তাকে তার কাম্য বস্তুরাশি অধিকার করতে দেয়। একইভাবে, প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষকে ঈর্ষা করে পুরুষের অধিকৃত শিকারগুলোর জন্যে, যে-হাতিয়ারটি দিয়ে পুরুষ এ-কাজ করে, নারী সে-হাতিয়ারটিকে ঈর্ষা করে না। শিশু ধারণ করে সমগ্র প্রকৃতির রূপ। কলেৎ অদ্রির নায়িকা আমাদের বলেছে যে সে তার শিশুর মধ্যে পেয়েছে 'আমার আঙুলগুলোর ছোঁয়ার জন্যে একটি ত্বক, সব বেড়ালছানা, সব পুষ্প যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, এ-ত্বক তা পূরণ করেছে'। নারীটি যখন ছিলো ছোটো মেয়ে, তখন সে যা চেয়েছিলো তার মায়ের মাংসে, এবং পরে সর্বত্র সব কিছুতে, শিশুর মাংসের আছে সে-কোমলতা, সে-উষ্ণ স্থিতিস্থাপকতা। শিশুটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও পশু, তার চোখে আছে বৃষ্টি ও নদী, সমুদ্র ও আকাশের নীল; তার আঙুলগুলো প্রবাল, তার চুল হচ্ছে রেশমের বিকাশ; এটি একটি জীবন্ত পুতুল, পাখি, বেড়ালছানা; 'আমার ফুল, আমার মুক্তো, আমার ছানা, আমার মেষ'। মা গুঞ্জন করতে থাকে অনেকটা প্রেমিকের শব্দপুঞ্জ, প্রেমিকের মতো লোলুপভাবে ব্যবহার করতে থাকে অধিকারমূলক কারকের; সে প্রয়োগ করে অধিকার করার একই অঙ্গভঙ্গি : স্পর্শাদর, চুম্বন; সে তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে, সে শিশুকে গরম রাখে নিজের কোলে ও বিছানায়। অনেক সময় এ-সম্পর্ক স্পষ্টভাবেই কামের ধরনের। স্টেকেল থেকে ইতিমধ্যে উদ্ধৃত স্বীকারোক্তিতে মা বলছে সে লজ্জা পায়, কেননা তার লালনপালনের মধ্যে আছে একটা কামের আভাস এবং তার শিশুর স্পর্শ তাকে সুখে শিউরে দেয়; যখন সে দু-বছরের ছিলো, তখন শিশুটি, প্রায় অপ্রতিরোধ্যভাবে, তাকে আদর করতো প্রেমিকের মতো এবং শিশুর শিশ্ন নাড়াচাড়ার প্রলোভন কাটানোর জন্যে লড়াই করতে হয়েছে তাকে।

আমাদের সংস্কৃতিতে যে-মহাবিপদ শিশুর ওপর হুমকিস্বরূপ, তা হচ্ছে যে-মায়ের ওপর সমস্ত ভার দেয়া হয় সম্পূর্ণরূপে অসহায় শিশুটির, সে-মা প্রায় সর্বদাই হয়ে থাকে একটি অতৃপ্ত নারী : কামে সে শীতল বা অপরিতৃপ্ত; সামাজিকভাবে সে নিজেকে মনে করে পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট; বিশ্বের বা ভবিষ্যতের ওপর স্বাধীনভাবে তার কোনো অধিকার নেই। এসব হতাশার সে ক্ষতিপূরণ করতে চায় তার সন্তানের মধ্য দিয়ে। যদি বুঝতে পারি যে নারীর বর্তমান পরিস্থিতিতে তার পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ কতোটা কঠিন, সংগোপনে সে লালন করে কতো অজস্র কামনা, বিদ্রোহী অনুভূতি, ন্যায়সঙ্গত দাবি, তখন এটা ভেবে ভয় পেতে হয় যে তারই ওপর ভার দেয়া হয়েছে অসহায় শিশুদের লালনপালনের। সেই যখন সে তার পুতুলগুলোকে একবার অত্যন্ত আদরযত্ন করতো, আবার করতো পীড়ন, তখন তার আচরণ ছিলো প্রতীকী; তবে তার সন্তানের জন্যে প্রতীক হয়ে ওঠে নির্মম বাস্তব। যে-মা তার সন্তানকে শাস্তি দেয়, সে শুধু একলা শিশুটিকে মারে না; এক অর্থে সে শিশুটিকে মারেই না : সে প্রতিশোধ নেয় একটি পুরুষের ওপর, পৃথিবীর ওপর, বা নিজের ওপর। এ-ধরনের মা প্রায়ই থাকে গভীর অনুশোচনাপূর্ণ এবং শিশুটি এতে ক্ষোভ বোধ নাও করতে পারে, তবে সে অনুভব করে মারপিটগুলো।

অধিকাংশ নারী যুগপৎ দাবি করে ও ঘৃণা করে তাদের নারীত্বের অবস্থাকে; একটা ক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা এটা যাপন ক'রে চলে। তাদের নিজেদের লিঙ্গের প্রতি

ঘৃণাবশত তারা তাদের কন্যাদের দিতে পারে পুরুষের শিক্ষা, তবে তারা খুব কম সময়ই হয়ে থাকে যথেষ্ট পরিমাণে উদার। একটি নারী জন্ম দিয়েছে ব'লে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে মা তার কন্যাকে স্বাগত জানায় এ-দ্ব্যর্থবোধক অভিশাপ দিয়ে : 'তুমি হবে একটা নারী।' সে যাকে মনে করে তার ডবল, তাকে একটি উৎকৃষ্টতর প্রাণীতে পরিণত ক'রে সে ক্ষতিপূরণ করতে চায় তার নিজের নিকৃষ্টতার; এবং যে-দুর্ভোগগুলো সে নিজে ভোগ করেছে, সেগুলোও চাপিয়ে দিতে চায় তার ওপর। অনেক সময় সে সন্তানের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় অবিকল তার নিজের নিয়তি : 'যা বেশ ভালো ছিলো আমার জন্যে, তা তোমার জন্যেও বেশ ভালো; আমি এভাবেই লালিতপালিত হয়েছিলাম, তুমি ভাগী হবে আমার ভাগ্যের।' এর বিপরীতে, অনেক সময় সে তার মতো না হওয়ার জন্যে কঠোর নির্দেশ দেয় সন্তানকে; সে চায় কিছুটা কাজে লাগুক তার অভিজ্ঞতা, এটা দ্বিতীয়বারের জন্যে সুযোগ পাওয়ার একটি উপায়। বেশ্যা তার মেয়েকে পাঠায় কোনো কনভেন্টে, মূর্খ নারীটি তাকে করে শিক্ষিত।

যখন মেয়েটি বড়ো হয়, তখন দেখা দেয় আসল বিরোধ; আমরা যেমন দেখেছি, মেয়েটি তার মায়ের থেকে মুক্তি লাভ ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার স্বাধীনতা। এটাকে একটা ঘৃণ্য অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ ব'লে মনে হয় তার মায়ের কাছে ; সে জেদের সঙ্গে চেষ্টা করে মেয়েটির মুক্তিলাভের ইচ্ছেকে বানচাল ক'রে দিতে; তার ডবল *একটি অপর* হয়ে উঠবে, এটা সে সহ্য করতে পারে না। নিজেকে পরম শ্রেষ্ঠ রূপে অনুভব করার আনন্দ– নারীর বেলা যা বোধ করে পুরুষেরা– কোনো নারী উপভোগ করতে পারে শুধু নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে তার মেয়েদের ক্ষেত্রে; যদি তাকে ছেড়ে দিতে হয় তার বিশেষাধিকার, তার কর্তৃত্ব, তাহলে সে খুবই ভেঙে পড়ে। মা স্নেহশীলই হোক বা হোক বৈরী, তার সন্তানদের স্বাধীনতা চুরমার ক'রে দেয় তার আশা। সে হয় দ্বিগুণ ঈর্ষান্বিত; বিশ্বের ওপর, যে তার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছে থেকে, এবং তার মেয়ের ওপর, যে বিশ্বের একটি অংশ জয় ক'রে সেটিকে অপহরণ ক'রে নিচ্ছে তার কাছে থেকে।

সন্তানদের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক রূপ লাভ করে তার জীবনের সমগ্রতার মধ্যে; এটা নির্ভর করে তার স্বামীর সাথে তার সম্পর্কের ওপর, তার অতীত, তার পেশা, তার নিজের ওপর; সন্তানকে একটি সর্বজনীন সর্বরোগের মহৌষধরূপে গণ্য করা যেমন ভুল তেমনি ক্ষতিকর তেমনি একটা বাজে ব্যাপার। হেলেন ডয়েট্‌শের গবেষণাগ্রন্থ, যেটি থেকে প্রায়ই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, সেটির সিদ্ধান্ত এটাই, যাতে তিনি তাঁর মনোচিকিৎসার অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করেছেন মাতৃত্বের প্রপঞ্চটি। নারী এর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আত্মচরিতার্থতা লাভ করে, একথায় আস্থা রেখে তিনি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ-ভূমিকাটির ওপর– তবে একটি শর্ত দিয়েছেন যে এটা স্বাধীনভাবে গৃহীত হ'তে হবে এবং *আন্তরিকভাবে* বাঞ্ছিত হ'তে হবে; তরুণী নারীটিকে থাকতে হবে এমন এক মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, ও বস্তুগত পরিস্থিতিতে, যা তাকে সামর্থ্য দেবে এ-উদ্যোগ গ্রহণের; অন্যথায় এর পরিণতি হবে বিপর্যয়কর। বিশেষ ক'রে, বিষাদগ্রস্ত উন্মাদরোগের বা মনোবৈকল্যের প্রতিষেধকরূপে সন্তান ধারণের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে অপরাধ; এর অর্থ মা ও শিশু উভয়েরই সুখহীনতা। শুধু

সে-নারী, যে ভারসাম্যপূর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, এবং নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, সে-ই পারে একজন 'ভালো' মা হ'তে।

দ্বিতীয় ভ্রান্ত পূর্বধারণাটি, যেটি প্রত্যক্ষভাবে দ্যোতিত প্রথমটি দিয়ে, সেটি হচ্ছে যে সন্তান নিশ্চিতভাবেই সুখ পাবে তার মায়ের বুকে। 'অস্বাভাবিক মা' ব'লে কোনো জিনিশ নেই, একথা সত্য, কেননা মাতৃস্নেহের মধ্যে 'স্বাভাবিক' ব'লে কিছু নেই; তবে, ঠিক এ-কারণেই, খারাপ মা আছে অনেক। মনোবিশ্লেষণ যে-সব সত্য ঘোষণা করেছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে শিশুদের জন্যে সে-সব পিতামাতারা বিপদজনক, যারা নিজেরা 'স্বাভাবিক'। প্রাপ্তবয়স্কদের গূঢ়ৈষা, আবিষ্টতা, ও মনোবৈকল্যের মূল নিহিত তাদের বাল্যকালের পারিবারিক জীবনের মধ্যে; যে-পিতামাতারা নিজেরাই জড়িত বিরোধে, যাদের মধ্যে ঘটে কলহ ও বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবতারণা, তারা শিশুর খুবই খারাপ সঙ্গী। বাল্যকালের পারিবারিক জীবনে গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ফলে তারা সন্তানদের সাথে সম্পর্ক পাতায় গূঢ়ৈষা ও হতাশাবোধের মধ্য দিয়ে; এবং অন্তহীনভাবে দীর্ঘতর হ'তে থাকে দুর্দশার এ-শেকল। বিশেষ ক'রে, মায়ের ধর্ষ-মর্ষকামিতা কন্যার মধ্যে সৃষ্টি করে এমন অপরাধবোধ, যা ধর্ষ-মর্ষকামী আচরণরূপে প্রকাশ পায় তার সন্তানদের সঙ্গে আচরণে, এবং চলতে থাকে অন্তহীনরূপে।

আমরা দেখেছি নারীর নিকৃষ্টতার উদ্ভব ঘটেছে প্রথমত জীবন পুনরাবৃত্তির কাজে সীমিত থাকার ফলে, আর সেখানে পুরুষ, তার দৃষ্টিতে, উদ্ভাবন করেছে শুধুই নিত্যনৈমিত্তিকভাবে অস্তিত্বশীল হয়ে থাকার থেকে আরো অপরিহার্য কারণ; নারীকে শুধু মাতৃত্ব লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে এ-অবস্থাকে চিরস্থায়ী করা। সে আজ সে-সব কাজে অংশগ্রহণের দাবি করছে, যে-সব কাজের মধ্য দিয়ে মানবজাতি ধারাবাহিকভাবে সীমাতিক্রমণতার মাধ্যমে, নতুন লক্ষ্য ও সাফল্য অর্জনের দিকে অগ্রগতির মাধ্যমে, চেষ্টা করে নিজের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের; যদি জীবনের কোনো অর্থ না থাকে, তাহলে সে জীবন প্রসব করার সম্মতি দিতে পারে না; সে এ-সময়ের আর্থনীতিক, রাজনীতিক, ও সামাজিক জীবনে ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টা না ক'রে মা হ'তে পারে না। কামানের ইন্ধন, ক্রীতদাস, বা শিকার উৎপাদন করা, ও অন্যদিকে স্বাধীন মানুষ সৃষ্টি করা এককথা নয়। একটি সুবিন্যস্ত সমাজে, যেখানে শিশুদের ভার প্রধানত নেবে সারা সমাজ, যেখানে যত্ন নেয়া হবে মায়ের এবং তাকে সাহায্য করা হবে, সেখানে নারীর জন্যে মাতৃত্ব ও জীবিকা সঙ্গতিহীন হবে না। এর বিপরীতে, যে নারী কাজ করে– যে কৃষক, রসায়নবিদ, বা লেখক– সে তার গর্ভধারণকে গ্রহণ করে সহজভাবেই, কেননা সে তার নিজের দেহে মগ্ন নয়; যে-নারী যাপন করে সমৃদ্ধতম ব্যক্তিগত জীবন, সে-ই তার সন্তানদের দিতে পারে সবচেয়ে বেশি এবং তাদের কাছে দাবি করে সবচেয়ে কম; উদ্যোগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অর্জন করে সত্যিকার মানবিক মূল্যবোধ, সে-ই সন্তানদের সবচেয়ে ভালোভাবে লালনপালনে সমর্থ।

মাতৃত্বের মধ্য দিয়েই নারী প্রকৃতপক্ষে সমান হয়ে ওঠে পুরুষের, এ-ধারণা পোষণ একটা প্রতারণা। মনোবিশ্লেষকেরা এটা দেখানোর জন্যে খুবই কষ্ট স্বীকার করেছেন যে সন্তান নারীকে সরবরাহ করে শিশ্নের সমতুল্য একটা বস্তু; পুরুষের এ-

গুণটি ঈর্ষণীয় হ'তে পারে, তবে এমন ছুতোতে কেউ বিশ্বাস করে না যে এরকম একটি বস্তুর নিতান্ত মালিক হওয়াই প্রতিপন্ন করতে পারে তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য, বা এ-ই হ'তে পারে অস্তিত্বের পরম লক্ষ্য। মায়ের পবিত্র অধিকার সম্পর্কে কথাবার্তারও কোনো কমতি নেই; তবে মা হিশেবে নারীরা ভোট দেয়ার অধিকার পায় নি, এবং অবিবাহিত মা এখনো নিন্দিত; মা গৌরব লাভ করে শুধু বিয়ের মধ্যেই– অর্থাৎ, শুধু তখন, যখন সে অধীন হয় একটি স্বামীর। পিতা যতো দিন থাকবে পরিবারের আর্থনীতিক কর্তা, ততো দিন সন্তানেরা মায়ের থেকে বাবার ওপরই থাকবে বেশি নির্ভরশীল, যদিও মা-ই বেশি ব্যস্ত থাকে সন্তানদের নিয়ে। এটাই তার কারণ, যেমন দেখেছি আমরা, কেনো বাবার সাথে মায়ের সম্পর্ক দিয়ে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত হয় সন্তানদের সাথে মায়ের সম্পর্ক।

তারপর আবার, 'ভালো' গৃহিণী থাকে জীবনের কর্মকাণ্ডের বিরোধী পক্ষে, যেমন আমরা দেখেছি : শিশু হচ্ছে মোমে-মাজা মেঝের শত্রু। ঘরবাড়ি সুসজ্জিত রাখার জন্যে মায়ের ভালোবাসা রূপ নিতে পারে ক্রুদ্ধ রাগারাগিতে। এটা বিস্ময়কর নয় যে-নারী লড়াই করে এসব বিরোধিতার মধ্যে, প্রায়সই সে তার দিন কাটায় স্নায়ুবিকারগ্রস্ত ও বদমেজাজি অবস্থায়; সে সব সময়ই হারে একভাবে বা অন্যভাবে, এবং তার প্রাপ্তিগুলো অনিশ্চিত, সেগুলো নিশ্চিতভাবে সাফল্য ব'লে পরিগণিত হয় না। সে কখনোই শুধু তার কাজের মধ্যে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না; এটা তাকে ব্যস্ত রাখে, কিন্তু তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে না, কেননা তার যাথার্থ্য প্রতিপাদন তার হাতে নির্ভর করে না, করে স্বাধীন ব্যক্তিদের হাতে। গৃহে বন্দী থেকে, নারী নিজে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না; ব্যক্তি হিশেবে দৃঢ়ভাবে আত্মঘোষণার জন্যে যে-সম্বল থাকা দরকার, তার তা নেই; এবং এর পরিণামে স্বীকৃতি দেয়া হয় না তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে। আরবদের ও ভারতীয়দের মধ্যে এবং বহু পল্লীজনগোষ্ঠির মধ্যে নারী হচ্ছে একটি গৃহপালিত মাদি পশু, সে যে-কাজটুকু করে তার জন্যে প্রশংসা পায় এবং সে অনুপস্থিত হয়ে গেলে কোনো আক্ষেপ ছাড়া তার স্থানে আরেকটি নেয়া হয়। আধুনিক সভ্যতায় তার স্বামীর চোখে সে কম-বেশি গণ্য হয় ব্যক্তি হিশেবে; তবে সে যদি তার অহংকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান না করে, *যুদ্ধ ও শান্তির* নাতাশার মতো সে যদি নিজেকে তার পরিবারের প্রতি সংরক্ত ও নির্মম আনুগত্যে গ্রাস না করে, তাহলে তাকে পর্যবসিত করা হয় এক শুদ্ধ সাধারণ্যে। সে হচ্ছে *একান্তভাবে* গৃহিণী, স্ত্রী, মাতা, অনন্য ও স্বাতন্ত্র্যহীন; এই চরম আত্ম-নীচতার মধ্যে নাতাশা বোধ করে পরমানন্দ। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য নারী, এর বিপরীতে, বোধ করে যে লোকজন তার স্বাতন্ত্র্য বুঝবে *এ*-স্ত্রী, *এ*-মাতা, *এ*-নারীরূপে। এ-সন্তুষ্টিই সে চাইবে সামাজিক জীবনে।

পরিচ্ছেদ ৩

সামাজিক জীবন

পরিবার কোনো বদ্ধ মানবগোষ্ঠি নয় : অন্যান্য সামাজিক এককের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এর বিচ্ছিন্নতা; গৃহ শুধু এমন কোনো 'অভ্যন্তর' নয়, যাতে রুদ্ধ হয়ে থাকে দম্পতিটি; এটি ওই দম্পতিটির জীবনযাত্রার মানের, তাদের আর্থিক মর্যাদার, তাদের রুচিরও প্রকাশ, এবং গৃহটি অন্যান্য লোকজনের কাছে প্রদর্শন করার মতোও একটি জিনিশ। বিশেষ ক'রে নারীর কাজ এ-সামাজিক জীবন পরিচালনা করা। পুরুষটি, উৎপাদনকারী ও নাগরিক হিশেবে, শ্রমবিভাজন ভিত্তি ক'রে এক জৈব সংহতির অঙ্গীকারসূত্রে সমাজের সাথে যুক্ত; পরিবার, শ্রেণী, সামাজিক বৃত্ত, এবং সেটি যে-জাতির অন্তর্ভুক্ত, তা দিয়ে সংজ্ঞায়িত একটি একক হচ্ছে দম্পতিটি, এবং যান্ত্রিক সংহতির অঙ্গীকারসূত্রে এটি জড়িত অনুরূপ সামাজিক পরিস্থিতির সাথে; স্ত্রীটি শুদ্ধতমরূপে হয়ে উঠতে পারে এ-সম্পর্কের মূর্তপ্রকাশ, কেননা স্বামীটির পেশাগত সংশ্লিষ্টতা অনেক সময় অসঙ্গতিপূর্ণ তার সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে, আর সেখানে স্ত্রীটির কোনো পেশাগত দায় নেই ব'লে, সে নিজেকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারে তার সমান যোগ্যতাসম্পন্নদের সমাজের মধ্যে। উপরন্তু, তার আছে 'একটু দেখা করতে গিয়ে' এবং 'বাড়িতে থেকে' সে-সব সম্পর্ক রক্ষা করার অবকাশ, যেগুলোর কোনো বাস্তবিক উপকারিতা নেই এবং যেগুলো অবশ্য সে-সব সামাজিক শ্রেণীতেই গুরুত্বপূর্ণ, যার সদস্যরা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের উচ্চস্থান রক্ষা করার জন্যে ব্যগ্র– অর্থাৎ বলা যায়, যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর মনে করে অন্যদের থেকে। নারীটি সুখ পায় তার 'অভ্যন্তর' দেখিয়ে, এমনকি তার নিজের আকার-অবয়ব দেখিয়ে, যা তার স্বামী ও সন্তানদের চোখে পড়ে না, কেননা তারা এর সাথে পরিচিত। তার সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে 'দারুণ দেখানো', এবং এর সাথে যুক্ত হয় তার নিজেকে প্রদর্শন করার আনন্দ।

এবং, প্রথমত, যেখানে সে নিজেই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে অবশ্যই তাকে 'দারুণ দেখাতে হবে'; বাড়িতে কাজকর্ম করার সময় সে প'রে থাকে আটপৌরে কাপড়চোপড়; যখন সে বাইরে যায়, যখন বাড়িতে কাউকে আপ্যায়ন করে, তখন সে 'সাজগোজ' করে। আনুষ্ঠানিক পোশাকপরিচ্ছদের আছে দ্বিগুণ ভূমিকা : এর কাজ নারীটির সামাজিক মর্যাদা নির্দেশ করা (তার জীবনযাপনের মান, তার ধনসম্পদ, যে-সামাজিক গোষ্ঠিগুলোর সে অন্তর্ভুক্ত, সে-সব), তবে একই সঙ্গে এটা হচ্ছে নারীর আত্মরতির মূর্তরূপ; এটা একটি উর্দি ও একটি আভরণ; যে-নারী কোনো কিছু *করা* থেকে বঞ্চিত, সে অনুভব করে সে যা, তা সে প্রকাশ করছে এর সাহায্যে। তার রূপের যত্ন নেয়া, সাজসজ্জা করা হচ্ছে এক ধরনের কাজ, যা তাকে সাহায্য করে

নিজের দেহের মালিকানা গ্রহণ করতে, যেমন সে গৃহস্থালির কাজের মধ্য দিয়ে মালিকানা গ্রহণ করে তার গৃহের; তখন তার মনে হয় যেনো সে নিজে বেছে নিয়েছে ও পুনর্সৃষ্টি করেছে তার অহংকে। সামাজিক রীতিনীতি আরো বাড়িয়ে দেয় নারীর অবয়ব-আকৃতির সাথে নিজেকে অভিন্ন ক'রে তোলার প্রবণতা। কোনো পুরুষের পোশাকের কাজ হচ্ছে, তার দেহের মতোই, তার সীমাতিক্রমণতা নির্দেশ করা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়; তার পোশাকের চমৎকারিত্ব ও সুন্দর চেহারা দিয়ে সে নিজেকে একটি বস্তু ব'লে প্রতিষ্ঠিত করে না; তা ছাড়াও, সে তার অবয়ব-আকৃতিকে সাধারণত নিজের অহংয়ের অভিব্যক্তি ব'লে গণ্য করে না।

এর উল্টো দিকে, সমাজও চায় যে নারী নিজেকে ক'রে তুলবে কামসামগ্রি। যে-ফ্যাশনের সে দাসী হয়ে উঠেছে, তাকে একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিশেবে প্রকাশ করা তার উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের কামনার কাছে তাকে একটি শিকাররূপে দান করা; তাই সমাজ তার কর্মোদ্যোগকে এগিয়ে দেয় না, বরং চেষ্টা করে সেগুলোকে ব্যাহত করার। স্কার্ট ট্রাউজারের থেকে কম সুবিধাজনক, উঁচুখুড়ের জুতো বাধা দেয় হাঁটতে; সবচেয়ে কম ব্যবহারিক যে-গাউন ও জুতো, সবেচেয়ে পলকা যে-হ্যাট ও মুজো, সেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে অভিজাত ধরনের; পোশাক দেহকে ছদ্মবেশ দিতে পারে, বিকৃত করতে পারে, বা তার বাঁকগুলোকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলতে পারে; তা যাই হোক, এটা দেহকে ক'রে তোলে প্রদর্শনের সামগ্রী। এজন্যেই ছোটো বালিকা, যে নিবিষ্টভাবে দেখতে ভালোবাসে নিজেকে, তার কাছে সাজসজ্জা এক মোহনীয় খেলা; হাল্কা রঙের মসলিন ও চকচকে চামড়ার জুতো সৃষ্টি করে যে-প্রতিবন্ধকতা, তার বিরুদ্ধে পরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার শিশুসুলভ স্বাধীনতা; কাঁচা বয়সে বালিকা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নিজেকে প্রদর্শন করার ইচ্ছে ও অনিচ্ছের মধ্যে; কিন্তু একবার যখন সে মেনে নেয় কামসামগ্রি হিশেবে নিজের বৃত্তি, সে আনন্দ পেতে থাকে নিজেকে সাজিয়েগুজিয়ে।

সাজসজ্জার মাধ্যমে, আমি আগেই দেখিয়েছি, নারী নিজেকে ক'রে তোলে প্রকৃতির সহচর, এবং সে প্রকৃতির কাছে নিয়ে আসে ধূর্ততার আবশ্যকতা; পুরুষের কাছে সে হয়ে ওঠে পুষ্প ও রত্ন– এবং নিজের কাছেও। পুরুষের ওপর জলের তরঙ্গিত প্রবাহ বিস্তার, পশমের উষ্ণ কোমলতা ছড়ানোর আগে, সে নিজে উপভোগ করে ওগুলো। তার টুকিটাকি গয়নাগাটি, তার গালিচাকম্বল, তার গদি, ও তার ফুলের তোড়ার সাথে তার সম্পর্ক অনেক কম অন্তরঙ্গ পালক, মুক্তো, বুটিদার রেশমি পোশাক, ও রেশমের সাথে তার সম্পর্কের থেকে, যা সে মিশিয়ে দেয় তার মাংসের সাথে; ওগুলোর বর্ণাঢ্যতা ও ওগুলোর কোমল বুনট ক্ষতিপূরণ করে কামের জগতের পরুষতার, যা তার ভাগ্য; যতো কম পরিতৃপ্ত হ'তে থাকে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সে ততোবেশি মূল্য দিতে থাকে ওগুলোকে। অনেক নারীসমকামী যে পুরুষের মতো পোশাক পরে, তা শুধু পুরুষদের অনুকরণ ও সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে নয়; তাদের কোনোই প্রয়োজন নেই মখমল ও সাটিনের সুখস্পর্শের, কেননা তারা নারীর শরীরেই লাভ করে একই ধরনের অক্রিয় গুণাবলি। বিষমকামী নারী, যে উৎসর্গিত পুরুষের স্থূল আলিঙ্গনের কাছে– যদি সে এটা পছন্দও করে আর যদি সে এটা পছন্দ

নাও করে– তার নিজের দেহ ছাড়া আর কোনো মাংসল শিকারকে আলিঙ্গন করার মতো তার কিছু নেই, তাই সে দেহকে একটি পুষ্পে রূপান্তরিত করার জন্যে সুগন্ধিত করে, এবং তার কণ্ঠহারের হীরের ঝলক মিলেমিশে যায় তার ত্বকের দ্যোতির সাথে; এগুলো অধিকার করার জন্যে বিশ্বের সমস্ত সম্পদের সাথে সে অভিন্ন ক'রে তোলে নিজেকে। সে শুধু ওগুলোর কামনাতুর সুখ কামনা করে না, অনেক সময় চায় ওগুলোর ভাবাবেগপূর্ণ ও আদর্শ মূল্যবোধগুলোও। এ-রত্নটি একটি স্মৃতিচিহ্ন, ওইটি একটি প্রতীক। অনেক নারী আছে, যারা নিজেদের ক'রে তোলে সুগন্ধি ফুলের তোড়া, একটি পক্ষীশালা; আরো অনেকে আছে, যারা হচ্ছে যাদুঘর, আরো নারী আছে, যারা গূঢ়লিপিধর্মী। জর্জেৎ লেবলাঁ তাঁর যৌবনের দিনগুলোর কথা স্মরণ ক'রে তাঁর *মেমওয়ারে*তে লিখেছেন :

আমি সব সময় প'রে থাকতাম ছবির মতো পোশাক। এক সপ্তাহ আমি থাকতাম ভান আইকের ছবির মতো, রুবেন্সের কোনো রূপকের মতো, বা মেমলিংয়ের *ভার্জিন*-এর মতো। আজো আমি দেখতে পাই শীতকালের এক দিন আমি পার হচ্ছি ব্রাসেলসের একটি রাস্তা, প'রে আছি অ্যামেথি মখমল, যা কোনো চ্যাজিউবল থেকে ধার ক'রে নেয়া রুপোর জরি দিয়ে বুনে পরিপাটি করা হয়েছে। আমার সোনালি চুল এঁটে আছে আমার হলদে পশমের শিরোবস্ত্রে, তবে সবচেয়ে অস্বাভাবিক জিনিশটি ছিলো আমার কপালের মাঝখানের হীরের বলয়টি। এসবের কী কারণ? আমি এটা উপভোগ করতাম পুরোপুরি এবং এতে আমার মনে হতো আমি অপ্রথাগতভাবে যাপন করছি জীবন। আমাকে যতোই উপহাস করা হতো আমার পোশাকপরিচ্ছদ হয়ে উঠতো ততোই কৌতুককর। আমি আমার অবয়বের সামান্যও বদলাতে লজ্জা পেতাম, কেননা তা করলে আমাকে নিয়ে পরিহাস করা হতো। এটা হতো একটা শোচনীয় পরাজয়স্বীকার... বাড়িতে সব কিছু ছিলো অন্য রকম।.আমার আদর্শ কাঠামো ছিলো গোজোলি ও ফ্রা অ্যাঞ্জিলিকোর দেবদূতেরা, বার্নে-জোন্স ও ওয়াটসের মানবমূর্তি। আমি সব সময় পরতাম নীল ও সোনালি রঙের পোশাক; আমার খুলে পড়া বস্ত্র আমার চারদিকে স্তরেস্তরে গড়াগড়ি খেতো।

বিশ্বকে এমন ঐন্দ্রজালিকভাবে আত্মসাৎকরণের সবেচেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় উন্মাদদের চিকিৎসানিকেতনে। যে-নারী মূল্যবান বস্তু ও প্রতীকদের প্রতি তার ভালোবাসা দমন করতে পারে না, সে ভুলে যায় নিজের আসল আকৃতি-অবয়ব এবং চেষ্টা করে অসংযত পোশাকপরিচ্ছদে সাজতে। তাই ছোটো বালিকা মনে করে সাজগোজ হচ্ছে এমন এক ছদ্মবেশ, যা তাকে পরিণত করে পরী, রাণী, বা ফুলে; সে যখন ভারাক্রান্ত থাকে ফুলমাল্যে ও ফিতায়, তখন সে নিজেকে মনে করে সুন্দর, কেননা সে নিজেকে অভিন্ন মনে করে এ-চমকপ্রদ জাঁকালো বস্ত্রের সাথে। কোনো জিনিশের রঙে বিমুগ্ধ সরল তরুণী মেয়ে খেয়াল করে না যে তার গাত্রবর্ণের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে পাংশুটে আভা। এ-বিলাসবহুল রুচিহীনতা দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও, যারা তাদের নিজেদের আকৃতি সম্বন্ধে সচেতন থাকার বদলে বেশি মুগ্ধ থাকে বাহ্যজগত দিয়ে; এ-প্রাচীন পোশাকপরিচ্ছদ, এ-প্রাচীন রত্নে মোহিত হয়ে তারা চীন বা মধ্যযুগকে ডেকে এনে সুখ পায় এবং দ্রুত পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিতে এক পলকে আয়নায় দেখে নিজেদের। অনেক সময় অবাক হ'তে হয় বৃদ্ধা রমণীদের অদ্ভুত জাঁকালো প্রতীক অলঙ্কার পরা দেখে : উষ্ণীষ, ফিতা, রুচিহীন চকচকে বস্ত্র, এবং প্রাচীন কণ্ঠহার; এগুলো দুঃখজনকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ওই নারীদের ভাঙাচোরা মুখমণ্ডলের প্রতি। কামপ্রলোভন জাগানোর শক্তি হারিয়ে ফেলে

এ-নারীদের অনেকে এমন এক স্থানে এসে পৌঁচেছে, যেখানে সাজগোজ করা এক নিরর্থক খেলা, যেমন নিরর্থক ছিলো তাদের কিশোরবেলায়। আভিজাত্যপূর্ণ কোনো নারী, অন্য দিকে, যদি দরকার হয় ইন্দ্রিয়গত বা নান্দনিক সুখ পেতে পারে তার প্রসাধনের মধ্যে, তবে সে একে অবশ্যই শোভন ক'রে রাখবে তার রূপের সাথে; তার গাউনের রঙ সুন্দর ক'রে তুলবে তার গাত্রবর্ণ, এর ছাঁটকাটের ধরন জোর দেবে বা সুন্দরতর ক'রে তুলবে তার দেহসৌষ্ঠবকে। তার কাছে মূল্যবান হচ্ছে নিজেকে অলঙ্করণ, যে-বস্তুগুলো তাকে অলঙ্কৃত করে, সেগুলো নয়।

প্রসাধন শুধু অলঙ্করণ নয়; আমি আগেই বলেছি, এটা নারীটির সামাজিক পরিস্থিতিও নির্দেশ করে। শুধু বেশ্যাই, যে একান্তভাবে কাজ করে কামসামগ্রিরূপে, নিজেকে প্রদর্শন করে এ-রূপে এবং অন্য কিছু রূপে নয়; প্রাচীন কালের কুঙ্কুমরঞ্জিত চুল ও ফুল-বিছানো বস্ত্রের মতো, আজকের উঁচুখুড়ের জুতো, শরীরের সাথে সেঁটে থাকা সাটিন, ভারি প্রসাধন, ও উগ্র সুগন্ধিদ্রব্য বিজ্ঞাপিত করে তার পেশা। অন্য ধরনের কোনো নারী যদি 'পথচারিণীর মতো পোশাক' পরে, তাহলে সমালোচনার সম্মুখিন হবে। যে-নারী দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে পুরুষের কামনা জাগায়, সে রুচিহীন; তবে যে এটা অস্বীকার করে সেও খুব প্রশংসনীয় নয়। লোকজন মনে করে সে পুরুষধর্মী হ'তে চায় এবং হয়তো সে নারীসমকামী, বা সে নিজেকে দর্শনীয় ক'রে তুলতে চায় এবং নিঃসন্দেহে সে একটি বাতিকগ্রস্ত নারী। বস্তু হিশেবে তার ভূমিকা অস্বীকার ক'রে সে অমান্য করছে সমাজকে; সে হয়তো একটি নৈরাজ্যবাদী। যদি সে নিতান্তই অগোচরে থাকতে চায়, তাহলে তাকে থাকতে হবে নারীসুলভ। প্রথাই ঠিক করে প্রদর্শনবাদ ও শালীনতাবোধের মধ্যে আপোষমীমাংসা; কোনো সময়ে দেখা যায় 'শালীন নারী'কে ঢেকে রাখতে হয় তার বক্ষদেশ, অন্য কোনো সময়ে ঢেকে রাখতে হয় গোড়ালি; কখনোবা পাত্র আকর্ষণের জন্যে তরুণী বিস্তার করতে পারে তার রূপের জাল, আর তখন বিবাহিত নারী ছেড়ে দেয় তার সব সাজসজ্জা, যেমন ঘটে বহু কৃষকসমাজে; কখনো তরুণীরা পরতে বাধ্য হয় রক্ষণশীল ছাঁটকাটের পাতলা, বর্ণিল ফ্রক, আর তখন বৃদ্ধ নারীরা পরে আঁটোসাঁটো গাউন, উজ্জ্বল রঙ, ও প্রলুব্ধকর ঢঙের পোশাক; ষোলো বছরের মেয়ে যদি পরে কৃষ্ণবর্ণের পোশাক, তাহলে এটাকে মনে হয় অতিশয় জমকালো, কেননা এ-বয়সে এটা পরে না।

এ-নিয়মগুলো অবশ্যই অমান্য করা যাবে না; তবে সব ক্ষেত্রেই, এমনকি সবচেয়ে কঠোর নীতিপরায়ণ গোষ্ঠিতেও, গুরুত্ব দেয়া হয় নারীর যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর; উদাহরণস্বরূপ, যাজকের স্ত্রীও তার চুলে ঢেউ খেলায়, লাগায় হাল্কা প্রসাধন, এবং সতর্কভাবে মেনে চলে রীতিটি, সে তার দৈহিক আকর্ষণীয়তার জন্যে যে-যত্ন নেয়, তা দিয়ে সে নির্দেশ করে যে নারী হিশেবে সে তার ভূমিকা মেনে নিয়েছে। সামাজিক জীবনের সাথে কামের এ-সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয় সান্ধ্য গাউনে। এটা যে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান, যার প্রধান লক্ষণই বিলাসিতা ও দর্শনীয় অপচয়, তা বোঝানোর জন্যে এ-গাউনগুলোকে হ'তে হয় দামি ও পলকা; এগুলোকে হ'তে হয় যথাসম্ভব অসুবিধাজনকও; স্কার্টগুলো এতো লম্বা ও এতো বিস্তীর্ণ বা এতোটা লেংচানো ধরনের হয় যে তাতে হাঁটাই অসম্ভব; নারীর রত্নাবলি, লাগানো

পাড়, চুমকি, পালক, এবং নকল চুলের নিচে নারী রূপান্তরিত হয় মাংসের পুতুলে। এমনকি এ-মাংসও প্রদর্শিত বস্তু; ফোটা, বিকশিত পুষ্পের মতো নারীরা প্রদর্শন করে তাদের কাঁধ, পিঠ ও স্তন। কামোন্মত্ত উৎসবে ছাড়া এসবের প্রতি পুরুষদের বেশি আগ্রহ দেখানো বিধেয় নয়; তারা আকস্মিকভাবে একটু তাকাতে পারে বা নাচের সময় জড়িয়ে ধরতে পারে; তবে তাদের প্রত্যেকে অনুভব করতে পারে এসব সুকুমার সম্পদপূর্ণ বিশ্বের রাজা হওয়ার মোহনীয়তা।

প্রসাধনের এ-সামাজিক তাৎপর্য তার বেশভূষার মধ্য দিয়ে নারীকে প্রকাশ করতে দেয় সমাজের প্রতি তার মনোভাব। যদি সে প্রচলিত নিয়মের অনুগত হয়, তাহলে সে গ্রহণ করবে সতর্ক ও কেতাদুরস্ত ব্যক্তিত্ব। এখানে আছে বহু সম্ভবপর সূক্ষ্ম দ্যোতনা : সে নিজেকে তুলে ধরতে পারে ভঙ্গুর, শিশুসুলভ, রহস্যময়ী, অকপট, অনাড়ম্বর, উচ্ছল, অচঞ্চল, বেশ সাহসী, প্রশান্ত গম্ভীর রূপে। অথবা, এর বিপরীতে, যদি সে প্রথা অমান্য করে, তাহলে সে তার মৌলিকত্ব দিয়ে দর্শনীয় ক'রে তুলবে সেটাকে। উল্লেখযোগ্য যে বহু উপন্যাসে 'মুক্তনারী' নিজের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে তার পোশাকের স্পর্ধার সাহায্যে, যা জোর দেয় কামসামগ্রি হিশেবে তার প্রকৃতির ওপর, সুতরাং তার পরনির্ভরশীলতার ওপর। উদাহরণস্বরূপ, এডিথ হোয়ার্টনের *দি এইজ অফ ইনসঙ্গ*-এ এক তরুণী বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্ত নারী, যার আছে এক রোমাঞ্চপূর্ণ অতীত ও একটি দুঃসাহসী হৃদয়, সে প্রথমে দেখা দেয় বুকের দিকে খুব বেশি ক'রে কাটা একটি পোশাক প'রে; সে যে কেলেঙ্কারির ঢেউ জাগিয়ে তোলে সেটা স্পষ্টভাবেই সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রতি তার ঘৃণার প্রকাশ। একই ধরনে, তরুণী মেয়ে আনন্দ পায় একজন পরিণত বয়সের নারীর মতো সাজতে, বৃদ্ধ নারী সুখ পায় ছোট্ট মেয়ের মতো সাজতে, বারবনিতা সাজতে পছন্দ করে ভদ্র সমাজের নারীর মতো, আর পরেরজন পছন্দ করে 'স্বৈরিণী'র মতো সাজতে।

প্রতিটি নারী যদি তার মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশভূষাও করে, তবু থাকে একটা অভিসন্ধি : ছদ্ম, শিল্পকলার মতোই, কল্পজগতের জিনিশ। শুধু কাঁচুলি, বক্ষবন্ধনি, কলপ, প্রসাধনই দেহ ও চেহারাকে ছদ্মবেশ দেয় না; নারীদের মধ্যে যে সবচেয়ে কম পরিশীলিত, সেও যখন 'বেশভূষা করে', সেও *নিজেকে* ধরা দেয় না পর্যবেক্ষণের কাছে; ছবি বা মূর্তির মতো, বা মঞ্চের কোনো অভিনেতার মতো সে হয়ে ওঠে এক প্রতিনিধি, যার মাধ্যমে নির্দেশ করা হয় অনুপস্থিত কাউকে– অর্থাৎ, সে-চরিত্রটিকে, যার সে উপস্থাপক, কিন্তু নিজে ওই চরিত্রটি নয়। অলীক, অটল, উপন্যাসের নায়কের মতো, কোনো প্রতিকৃতি বা আবক্ষ প্রতিমার মতো বিশুদ্ধ কিছুর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বোধ ক'রে সে সন্তোষ লাভ করে; সে প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে এ-মূর্তিটির সাথে অভিন্ন ক'রে তুলতে এবং এভাবে তার মনে হয় যেনো সে সুস্থিত করেছে নিজেকে, প্রতিপন্ন হয়েছে তার মহিমার যাথার্থ্য।

ঠিক এভাবেই, মারি বাশকির্তসেভের *এক্রিৎ এঁতিম*-এ আমরা দেখতে পাই তিনি পাতার পর পাতায় অক্লান্তভাবে বাড়িয়ে চলছেন তাঁর মূর্তি। তাঁর একটি পোশাকের কথা জানাতেও তিনি কৃপণতা করেন না; তাঁর মনে হয় যেনো তিনি রূপান্তরিত হয়ে গেছেন প্রতিটি নতুন বেশভূষায়, এবং নতুনভাবে জেগে ওঠে তাঁর আত্মপুজো।

দিনের পর দিন তিনি পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন এ-ধ্রুবপদটি : 'আমাকে মোহনীয় দেখাচ্ছিলো কৃষ্ণ পোশাকে... ধূসর পোশাকে আমাকে দেখাচ্ছিলো মোহনীয়... শুভ্র পোশাকে, আমি ছিলাম মোহনীয়।'

যেহেতু নারী একটি বস্তু, তাই বেশ বোঝা যায় যে তার সহজাত মূল্য প্রভাবিত হয় তার পোশাকের ধরন ও অলঙ্করণ দিয়ে। সে যে এতো গুরুত্ব দেয় তার রেশম বা নাইলনের মুজোর, দাস্তানার, হ্যাটের ওপর, এটা তার দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, কেননা অবস্থান ঠিক রাখার জন্যে এটা এক অত্যাবশ্যক বাধ্যবাধকতা। আমেরিকায় কর্মজীবী মেয়ের অর্থকোষের এক বড়ো অংশ ব্যয় হয় রূপচর্চায় ও পোশাকপরিচ্ছদে। ফ্রান্সে এ-ব্যয় কিছুটা কম; তবে কোনো নারীকে যতো বেশি দারুণ দেখায়, সে ততো বেশি সম্মান পায়; চৌকশ দেখানো হচ্ছে একটি অস্ত্র, একটি পতাকা, একটি প্রতিরক্ষা, একটি প্রশংসাপত্র।

পোশাকের চমৎকারিত্বও একটা দাসত্ব; এর উপকারিতা পাওয়ার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হয়; এবং ব্যয়টা এতো বেশি যে, মাঝেমাঝেই, সুগন্ধিদ্রব্য, রেশমি মুজো, অন্তর্বাস, বা এরকম কিছু চুরি করার সময় মনোহারি দোকানের গোয়েন্দার হাতে ধরা পড়ে কোনো-না-কোনো সচ্ছল নারী। সুবেশবাসের জন্যে বহু নারী লিপ্ত হয় বেশ্যাবৃত্তিতে, বা গ্রহণ করে আর্থিক 'সহায়তা'; প্রসাধনের জন্যেই তাদের দরকার হয় অতিরিক্ত অর্থের। সুবেশের জন্যে দরকার পড়ে সময় ও যত্নেরও; তবে এটা এমন কাজ, যা কখনো কখনো সদর্থক আনন্দও দিয়ে থাকে; এ-এলাকায়, যেমন পারিবারিক বাজার করার সময়, সম্ভাবনা আছে গুপ্তধন আবিষ্কারের, আছে মূল্যহ্রাসের খোঁজাখুঁজি, আছে ঠকানোর কৌশল, ফন্দি, এবং উদ্ভাবনপটুত্ব। যদি সে চতুর হয়, তাহলে কোনো নারী দ্রুত বাড়াতে পারে নিজের বস্ত্রসম্ভার। মূল্যহ্রাসের দিনগুলোতে চলে রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা। একটি নতুন বস্ত্র একটা উদযাপন। প্রসাধন বা কেশবিন্যাস হয়ে উঠতে পারে একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টির বিকল্প। আজ খেলাধুলো, শরীরচর্চা, স্নান, অঙ্গসংবাহন, ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের মাধ্যমে নারী আগের থেকে অনেক বেশি পায় নিজের শরীর গঠনের আনন্দ; সে-ই ঠিক করে কী হবে তার ওজন, দেহের মাপ, ও তার চামড়ার বর্ণ। আধুনিক নান্দনিক ধারণাগুলো তাদের সুযোগ দেয় সৌন্দর্যের সাথে কর্মের মিলন ঘটানোর : তার অধিকার আছে নিজের পেশি নিজের ইচ্ছেমতো গঠনের, সে মেদ জমতে দেয় না; শরীরচর্চার মধ্যে কর্তা হিশেবে সে লাভ করে দৃঢ়ভাবে আত্ম-ঘোষণা এবং কিছু পরিমাণে নিজেকে মুক্ত করে সে নিজের অনিশ্চিত মাংস থেকে; কিন্তু এ-মুক্তি সহজেই পিছু হ'টে হয়ে ওঠে পরনির্ভরশীল। হলিউডের তারকা জয় ঘোষণা করে প্রকৃতির ওপর, কিন্তু প্রযোজকের হাতে সে আবার হয়ে ওঠে একটি অক্রিয় বস্তু।

এসব জয়, যেগুলোর জন্যে নারী ন্যায়সঙ্গতভাবেই উল্লাস বোধ করতে পারে, সেগুলো ছাড়াও নিজেকে আকর্ষণীয় রাখা বোঝায়– গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের মতোই– স্থিতিকালের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ; কেননা তার শরীরও এমন একটি বস্তু, সময়ের সাথে সাথে যার অবনতি ঘটে। *অঁ জু পেরদায়* কলেৎ অদ্রি বর্ণনা করেছেন এ-লড়াই, যা ধুলোর সাথে গৃহিণীর যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় :

তা আর যৌবনের টানটান মাংস ছিলো না; তার বাহু ও উরুর পেশির গঠন দেখা যেতো শিথিল চামড়ায় ঢাকা মেদের একটা স্তরের নিচে। উদ্বিগ্ন হয়ে সে আবার বদলালো তার কর্মসূচি : সকালে আধঘণ্টা ব্যায়াম, এবং রাতে, শুতে যাওয়ার আগে, পনেরো মিনিট অঙ্গসংবাহন। সে প'ড়ে দেখতে লাগলো চিকিৎসাবিদ্যার বই ও ফ্যাশন ম্যাগাজিন, কটিরেখার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে। পান করার জন্যে সে ফলের জুস বানাতে লাগলো, মাঝেমাঝে জোলাপ নিতে লাগলো, এবং থালাবাসন ধোয়ার সময় সে রবারের দাস্তানা পরতে শুরু করলো। তার দুটো কাজ– তার দেহকে নবযৌবন দেয়া ও তার গৃহকে ঘ'ষেমেজে ঝকঝকে রাখা– অবশেষে হয়ে উঠলো একটি কাজ, তাই শেষে সে গিয়ে পৌঁছোলো এক ধরনের কানাকেন্দ্রে... বিশ্বটি যেনো থেমে গেছে, ঝুলে আছে বয়স ও ক্ষয়ের বাইরে... তার স্টাইলের উন্নতির জন্যে সে সাঁতারের দিঘিতে কঠোর রীতিতে সাঁতার শিখতে লাগলো, এবং রূপচর্চার সাময়িকীগুলো তার মনোযোগ কেড়ে নিলো ওগুলোর পুনরাবৃত্ত রূপচর্চার প্রণালি দিয়ে।

এখানে আবার নিত্যনৈমিত্তিকতার ফলে সৌন্দর্যচর্চা আর জামাকাপড় রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে ওঠে একটা নীরস একঘেয়ে খাটুনি। সব সজীব বিকাশেরই মূল্য হ্রাস পাওয়ার বিভীষিকা কিছু কিছু কামশীতল বা হতাশাগ্রস্ত নারীর মধ্যে জীবন সম্বন্ধেই জাগিয়ে তোলে বিভীষিকা : অন্যরা যেমন সংরক্ষণ করে আসবাবপত্র বা বইয়মে রক্ষিত খাদ্য, তারা তেমনভাবে প্রচেষ্টা চালায় নিজেদের সংরক্ষণের। এ-নেতিবাচক একগুঁয়েমি তাদের ক'রে তোলে নিজেদের অস্তিত্বের শত্রু এবং অন্যদের প্রতি বৈরী : সুখাদ্যে নষ্ট হয় দেহসৌষ্ঠব, মদে নষ্ট হয় গাত্রবর্ণ, বেশি হাসির ফলে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে, রোদে নষ্ট হয় ত্বক, ঘুমে হয়ে উঠতে হয় নিষ্প্রভ, কাজে জীর্ণ হয় দেহ, রমণের ফলে চোখের নিচে দাগ পড়ে, চুম্বনে লাল হয় গাল, স্পর্শাদরে নষ্ট হয় স্তনের গঠন, আলিঙ্গনে বিবর্ণ হয় মাংস, মাতৃত্ব বিকৃত করে চেহারা ও দেহ। আমরা জানি কতোটা রাগে তরুণী মা দূরে রাখে তার বলনাচের গাউনের প্রতি আকৃষ্ট শিশুকে : 'তোমার চটচটে হাতে আমাকে ছুঁয়ো না, তুমি আমার পোশাকটা নষ্ট করবে!' ছেনালও একই রকম রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে স্বামী বা প্রেমিকের ব্যাকুল প্রণয়নিবেদন। সে নিজেকে রক্ষা করতে চায় পুরুষ থেকে, বিশ্ব থেকে, সময় থেকে, যেমন লোকজন ঢাকনা লাগিয়ে রক্ষা করে আসবাবপত্র।

তবে এসব সাবধানতাও পাকা চুল ও কাকের পার (অর্থাৎ চোখের কোণের কাছে চামড়ার কুঞ্চন) আবির্ভাব প্রতিরোধ করতে পারে না। যৌবনকাল থেকেই নারী জানে যে এ-নিয়তি অনিবার্য। এবং তার সমস্ত দূরদর্শিতা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটবেই : তার পোশাকের ওপর ছলকে পড়ে মদ, কোনো একটি সিগারেটের আগুনে পোড়ে পোশাকটি; এর ফলে হারিয়ে যায় সে-বিলাসিনী ও উৎসবপরায়ণ প্রাণীটি, যে গর্বিত হাসি নিয়ে আসতো নাচঘরে, কেননা তার মুখে এখন গৃহিণীর রাশভারী কঠোর ভঙ্গি; অচিরেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার প্রসাধন বিশেষ একটি মুহূর্তকে অপরিমিত আলোতে ঝলকিত করার জন্যে কোনো আতশবাজির সমষ্টি ছিলো না, ছিলো না স্বল্পস্থায়ী উজ্জ্বলদীপ্তির ঝিলিক। এটা বরং এক সম্পদ, মূলধনীয় পণ্য, একটি বিনিয়োগ; এটা বুঝিয়েছে আত্মোৎসর্গ, এটার ক্ষতি এক সত্যিকার বিপর্যয়। দাগ, অশ্রু, যেমন-তেমন তালি মেরে তৈরি পোশাক, বিশ্রী কেশবিন্যাস অনেক বড়ো প্রলয় পোড়া রোস্ট বা একটা ভাঙা পুষ্পাধারের থেকে, কেননা ফ্যাশনপরায়ণ নারী বস্তুর মধ্যে নিজেকে শুধু প্রক্ষেপই করে না, সে নিজেকে ক'রে তুলতে চায় বস্তু, এবং এখন

বিশ্বে সে নিজেকে সরাসরি আক্রান্ত বোধ করছে। বস্ত্রপ্রস্তুতকারক ও টুপিবিক্রেতার সাথে তার সম্পর্ক, তার শারীরিক অস্থিরতা, কড়া চাহিদাগুলো– এসবই প্রকাশ করে তার গম্ভীর মনোভাব ও অনিরাপত্তাবোধ। একটা সুপ্রস্তুত গাউন তাকে ক'রে তোলে তার স্বপ্নের সম্ভ্রান্ত মানুষ; কিন্তু একই প্রসাধন দুবার ব্যবহার ক'রে, বা একটা বাজে প্রসাধন ব্যবহার ক'রে, নিজেকে তার মনে হয় সমাজচ্যুত। মারি বাশকির্তসেভ আমাদের বলেছেন যে তাঁর হাস্যরস, চালচলন, ও মুখের ভাব সবই নির্ভর করতো তাঁর গাউনের ওপর; যখন তিনি মানানসই পোশাক পরা থাকতেন না, তখন নিজেকে তাঁর মনে হতো বেঢপ, সাধারণ, এবং অবমানিত বোধ করতেন। খারাপ বেশে কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার থেকে অনেক নারী তাতে যাবেই না, যদিও সেখানে তাদের হয়তো পৃথকভাবে কেউ খেয়ালই করবে না।

কিছু নারী যদিও দাবি করে যে তারা 'নিজেদের জন্যে বেশভূষা করে', তবে আমরা দেখেছি এমনকি আত্মরতির মধ্যেও ইঙ্গিত থাকে যে অন্যরা তাদের দেখবে। পোশাকের প্রতি আসক্ত নারীরা, শুধু পাগল ছাড়া, কখনোই পুরোপুরি সুখ পায় না যদি না অন্যরা তাদের দেখে; সাধারণত তারা সাক্ষী চায়। বিয়ের দশ বছর পরও তলস্তয়ের স্ত্রী চাইতেন যে তাঁর দিকে মুগ্ধচোখে তাকাক লোকজন এবং তাঁর স্বামী এটা দেখুন। তিনি ফিতে ও অলঙ্কার পছন্দ করতেন এবং চাইতেন চুলে ঢেউ খেলাতে; এবং যদি কেউ খেয়াল না করতো, তাতে কী? কিন্তু তাঁর ইচ্ছে করতো চিৎকার ক'রে কাঁদতে।

সাক্ষীর এ-ভূমিকায় স্বামী ভালো নয়। এখানেও আবার তার আবশ্যকতাগুলো দ্ব্যর্থবোধক। তার স্ত্রীটি যদি অত্যন্ত রূপসী হয়, তাহলে সে ঈর্ষা বোধ করতে থাকে; তবে প্রতিটি স্বামীই কম-বেশি একেকটি রাজা কানদৌলেস; সে চায় তার স্ত্রী তার সুনাম বাড়াবে, এজন্যে তার স্ত্রীকে হ'তে হবে রুচিশীল, সুন্দরী, বা অন্তত 'চলনসই'; নইলে তারা যখন একসঙ্গে কোথাও যায় তখন সে হয় বদমজাজি ও শ্লেষপরায়ণ। আমরা দেখেছি বিয়েতে যৌন ও সামাজিক মূল্যবোধগুলোর সুসামঞ্জস্য ঘটে না, এবং এখানে প্রতিফলিত হয় এ-শত্রুভাবাপন্নতা। যে-নারী বাড়িয়ে তোলে তার যৌনাবেদন, সে রুচিহীনতার পরিচয় দেয়, তার স্বামীর মতে; অন্য নারীতে যা তার কাছে মনে হতো প্রলুব্ধকর, নিজের স্ত্রীতে সেই প্রগল্‌ভতা সে অনুমোদন করে না, এবং এই অননুমোদন নষ্ট ক'রে দেয় যে-কোনো কামনা, যা সে বোধ করতে পারতো ভিন্ন অবস্থায়। তার স্ত্রী সংযতভাবে বেশভূষা করলে সে তা অনুমোদন করে, তবে করে নিরুৎসুকভাবে : তখন স্ত্রীকে তার আকর্ষণীয় লাগে না এবং অস্পষ্টভাবে নিন্দনীয় মনে হয়। এজন্যে সে কদাচিৎ স্ত্রীকে দেখে নিজের চোখে; সে স্ত্রীকে দেখে অন্যদের চোখ দিয়ে। 'তার সম্বন্ধে লোকে কী বলবে?' তার অনুমানগুলো ঠিক হওয়ার কথা নয়, কেননা সে তার স্বামিত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যদের দেয় কৃতিত্ব।

যখন নারী দেখে তার বেলা যে-বেশভূষা ও আচরণকে তার স্বামী সমালোচনা করে, কিন্তু মুগ্ধ হয় অন্য নারীর বেলা, এর থেকে আর কিছুই নারীকে অধিকতর রুষ্ট করে না। অধিকন্তু, বলা দরকার স্বামীটি এতো কাছে থাকে যে সে তার স্ত্রীকে দেখে না; তার কাছে স্ত্রীর চেহারা সব সময় একই রকম; সে তার নতুন বেশভূষাও দেখে

না, কেশবিন্যাসের বদলও দেখতে পায় না। এমনকি প্রেমময় স্বামী বা ব্যাকুল প্রেমিকও প্রায়ই নির্বিকার থাকে নারীর বস্ত্রের প্রতি। যদি তারা তাকে নগ্নরূপে দেখতে ভালোবাসে, তাহলে এমনকি সবচেয়ে শোভন বস্ত্রটিও তাকে গোপন করার বেশি আর কিছু করে না; এবং সে চোখধাঁধানো থাকলেও তাদের কাছে যেমন প্রিয় থাকে, একই রকম প্রিয় থাকে খারাপ বস্ত্রে বা ক্লান্ত অবস্থায়। যদি তারা আর তাকে ভালো না বাসে, তাহলে অতিশয় রূপবাড়ানো বস্ত্রও কোনো কাজে আসে না। বস্ত্র হ'তে পারে বিজয়ের অস্ত্র, তবে এটা প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র নয়; এর কলা মরীচিকা সৃষ্টির, এটা চোখের সামনে উপস্থিত করে একটা কাল্পনিক বস্তু; তবে যেমন ঘটে প্রাত্যহিক জীবনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে, তেমনি রক্তমাংসের আলিঙ্গনের মধ্যে চোখের সামনে থেকে বিলীন হয়ে যায় সব মরীচিকা; দাম্পত্য হৃদয়ানুভূতি, শারীরিক প্রেমের মতোই, বিরাজ করে বাস্তবতার স্তরেই। যে-পুরুষটিকে সে ভালোবাসে, নারী তার জন্যে বেশভূষা করে না।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে নারীরা বেশভূষা করে অন্য নারীদের মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্যে, এবং এ-ঈর্ষা প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ : তবে এটাই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু নয়। ঈর্ষান্বিত বা বিমুগ্ধ অনুমোদনের মাধ্যমে সে ধ্রুব ঘোষণাকরতে চায় তার সৌন্দর্যের, পোশাকের চমৎকারিত্বের, তার রুচির– তার নিজের; সে নিজের কাছে প্রদর্শন করে যে সে নিজে দিয়েছে নিজের অস্তিত্ব। এতে সে নিজেকে দান করে এক বেদনাদায়ক পরনির্ভরতার কাছে; স্বীকৃতি না পেলেও গৃহিণীর বিশ্বস্ত সেবা উপকারী; ছেনালের উদ্যোগগুলো হয় ব্যর্থ যদি তা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। সে চায় নিজের এক সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন, এবং ধ্রুবর জন্যে তার এ-দাবিই তার সন্ধানকে ক'রে তোলে অত্যন্ত হয়রানিপূর্ণ; যদি নিন্দে করে শুধু একটি কণ্ঠ, তাহলে এ-হ্যাটটি হয়ে ওঠে বিশ্রী; একটি প্রশংসা তাকে সুখী করে কিন্তু একটা ব্যর্থতা তাকে ধ্বংস ক'রে দেয়; এবং ধ্রুব যেহেতু প্রকাশ পায় অজস্র ব্যাপারপরম্পরায়, তাই সে কখনোই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে না। এজন্যেই ফ্যাশনপরায়ণ নারী, ছেনাল, অতিশয় অরক্ষিত; এটাও ব্যাখ্যা করে কেনো কিছু কিছু সুন্দরী ও বহুলপ্রশংসিত নারী দুঃখের সাথে বিশ্বাস করে যে তারা সুন্দরীও নয় রুচিশীলও নয়, তারা যার অভাব বোধ করে, তা হচ্ছে একজন অজানা বিচারকের চূড়ান্ত অনুমোদন; কেননা তাদের লক্ষ্য একটা চিরস্থায়ী অস্তিত্বাবস্থা (*আঁ-সো*) যা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

'ভাবতেও কষ্ট লাগে,' লিখেছেন মিশেলে, 'নারী, সে-আপেক্ষিক সত্তা, যে বেঁচে থাকতে পারে শুধু একটি দম্পতির একটি সদস্য হিশেবে, সে প্রায়ই নিঃসঙ্গ থাকে পুরুষের থেকে অনেক বেশি। পুরুষ সবখানে সঙ্গী পায়, ধারাবাহিকভাবে পাতায় নতুন নতুন সম্পর্ক। পরিবার না থাকলে নারী কিছুই না। আর পরিবার হচ্ছে এক বিধ্বস্তকর বোঝা; তার সব ভার পড়ে নারীর ওপর।' এবং, সত্যিকারভাবেই, নারী তার সীমাবদ্ধ এলাকা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে জানতেও পারে না একই লক্ষ্যে কর্মরত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গলাভের আনন্দ; নারীর কাজ তার মনকে অধিকার ক'রে রাখে না, তার প্রশিক্ষণ তার মনে স্বাধীনতার জন্যে আকাঙ্ক্ষাও জাগায় না, স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার জন্যে কোনো অভিজ্ঞতাও দেয় না, এবং তবুও সে তার দিনগুলো কাটিয়ে দেয়

একাকীত্বের মধ্যে। বিয়ে তাকে হয়তো বহু দূরে সরিয়ে নিয়েছে তার নিজের পরিবার ও যৌবনকালের বন্ধুদের থেকে, এবং নতুন পরিচিতদের ও বাড়ি থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্র দিয়ে এ-উন্মূলতার ক্ষতিপূরণ করা কঠিন। এবং নববধূ ও তার পরিবারের মধ্যে প্রকৃত অন্তরঙ্গতা নাও থাকতে পারে, এমনকি তারা কাছাকাছি থাকলেও : তার মাও তার প্রকৃত বন্ধু নয় তার বোনেরাও নয়। বাসস্থানের অভাবে আজকাল অনেক তরুণ দম্পতি তাদের শ্বশুরশাশুড়ির সাথেই থাকে; কিন্তু এ-বাধ্যতাবশত একত্রবাস কোনোমতেই সব সময় বধুটির জন্যে প্রকৃত সাহচর্যের উৎস হয়ে ওঠে না।

কোনো নারী অন্য নারীদের সাথে যে-বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখে ও নতুন বন্ধুত্ব তৈরি করে, তা খুবই মূল্যবান তার কাছে, কিন্তু সেগুলো পুরুষদের মধ্যে সম্পর্কের থেকে প্রকৃতিতে খুবই ভিন্ন। পুরুষেরা তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে, এমন ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ করে ব্যক্তি হিশেবে, আর তখন নারীরা বন্দী থাকে তাদের সাধারণ নারীধর্মী ভাগ্যের মধ্যে এবং পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে এক ধরনের অন্তর্নিহিত দুষ্কর্মে সহযোগিতার মধ্যে। এবং তারা তাদের মধ্যে সবার আগে যা খোঁজে, তা হচ্ছে তাদের সবার জন্যে অভিন্ন যে-বিশ্ব, তার দৃঢ়ঘোষণা। তারা মতামত ও সাধারণ চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করে না, কিন্তু পরস্পরকে বিশ্বাস ক'রে তারা বিনিময় করে গোপন কথা ও কাঙ্ক্ষিত ফললাভের প্রণালি; তারা সংঘবদ্ধ হয় এক ধরনের একটি প্রতি-বিশ্ব সৃষ্টির জন্যে, যার মূল্যবোধগুলো গুরুত্বে ছাড়িয়ে যাবে পুরুষের মূল্যবোধগুলোকে। দলবদ্ধভাবে তারা শক্তি পায় তাদের শেকল ছুঁড়ে ফেলার; পরস্পরের কাছে নিজেদের কামশীতলতা স্বীকার ক'রে তারা অস্বীকার করে পুরুষের কামাধিপত্যকে, আর ব্যঙ্গ করে পুরুষের কামনাকে বা তাদের আনাড়িত্বকে; এবং শ্লেষের সাথে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের স্বামীদের এবং সাধারণভাবে সমস্ত পুরুষের নৈতিক ও মননগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে।

তারা তুলনা করে তাদের অভিজ্ঞতার; গর্ভধারণ, প্রসব, তাদের নিজেদের ও তাদের সন্তানদের অসুখবিসুখ, এবং গৃহস্থালির সেবাযত্ন হয়ে ওঠে মানবোপাখ্যানের অপরিহার্য ঘটনাবলি। তাদের কাজ কোনো কৌশলদক্ষতা নয়; রান্নার প্রণালি ও এ-ধরনের ব্যাপারগুলো একজনের কাছে থেকে আরেকজনে নিয়ে তারা একে ভূষিত করে মৌখিক ঐতিহ্যধারার এক গুপ্ত বিজ্ঞানের মর্যাদায়। কখনোবা তারা নৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। তারা কী নিয়ে কথা বলে নারীদের সাময়িকীগুলোর চিঠিপত্রের স্তম্ভগুলো তার ভালো উদাহরণ; শুধু পুরুষদের জন্যে আছে একটা 'নিঃসঙ্গ হৃদয়' স্তম্ভ, এটা ভাবাই যায় না; পুরুষেরা মিলিত হয় বিশ্বে, যা তাদেরই বিশ্ব, আর সেখানে নারীদের সংজ্ঞায়িত করতে হয়, পরিমাপ করতে হয়, ও পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয় তাদের বিশেষ এলাকা; তাদের চিঠিপত্রের বিষয় হচ্ছে রূপচর্চা সম্পর্কে পরামর্শ, রন্ধনপ্রণালি, সূচিকর্মের নির্দেশ; এবং তারা চায় উপদেশ; তাদের অনর্থক বকবকির ও নিজেকে প্রদর্শনের প্রবৃত্তির ভেতর দিয়ে কখনো কখনো প্রকাশ পায় প্রকৃত উদ্বেগ।

তবে অনেক স্ত্রী আছে, যারা অস্তিত্বধারণের অবলম্বন হিশেবে শুধু নৈতিক কর্তৃত্বেই সন্তুষ্ট নয়; তাদের জীবনে আছে প্রেমোন্মাদনার এক গভীর প্রয়োজন। তারা তাদের স্বামীদের যদি ঠকাতেও না চায় আবার ছাড়তেও না চায়, তখন তারা সে-

একই উপায় অবলম্বন করে, যা অবলম্বন করে রক্তমাংসের পুরুষের ভয়ে ভীত তরুণী : তারা কাল্পনিক সংরাগের কাছে সমর্পণ করে নিজেদের। স্টেকেল এরও দিয়েছেন নানা উদাহরণ। ভালো অবস্থানে আছে, এমন এক সম্ভ্রান্ত নারী প্রেমে পড়ে এক অপেরা গায়কের। সে তাকে ফুল ও চিঠি পাঠায়, তার ছবি কেনে, তার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন সে সুযোগ পায় তার সাথে দেখা করার, তখন সে দেখা করতে যায় না; সে তাকে শারীরিকভাবে চায় না, সে চায় স্ত্রী হিশেবে বিশ্বস্ত থেকে শুধু তাকে ভালোবাসতে। আরেক নারী ভালোবাসতো এক বিখ্যাত অভিনেতাকে এবং তার ছবিতে ও পত্রিকায় প্রকাশিত তার সম্পর্কিত বিবরণে সে ভ'রে ফেলেছিলো তার ঘর। যখন অভিনেতাটি মারা যায়, নারীটি এক বছর ধ'রে শোক পালন করে।

রুডল্ফ ভ্যালিন্টিনোর মৃত্যুর সময় কতো অশ্রু ঝরেছে, তা আমাদের বেশ মনে আছে। বিবাহিত নারীরা ও বালিকারা পুজো করে সিনেমার নায়কদের। একলা আনন্দ লাভের বা দাম্পত্য সঙ্গমের উদ্ভট কল্পনার সময় মনে জাগিয়ে রাখা হয় তাদের ছবি। এবং তারা জাগিয়ে তুলতে পারে কোনো শৈশবস্মৃতি, তাতে তারা ভূমিকা পালন করতে পারে পিতামহের, ভাইয়ের, শিক্ষকের, বা এমন অন্য কারো।

এবং এঙ্গেল্‌স্ বলেন :

> একপতিপত্নীক বিয়ে স্থায়ী হয়ে যাওয়ার পর, দেখা দেয় দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক চরিত্র : স্ত্রীর প্রেমিক ও ব্যভিচারী স্ত্রীর স্বামী... একপতিপত্নীক বিয়ে ও বেশ্যাবৃত্তির সাথে, ব্যভিচার হয়ে ওঠে একটি অবধারিত সামাজিক সংস্থা, নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দণ্ডিত, কিন্তু দমন অসম্ভব।

যদি দাম্পত্য শৃঙ্গার স্ত্রীটির ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি না ঘটিয়ে জাগিয়ে তোলে তার ঔৎসুক্য, তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে সে তার পাঠ সমাপ্ত করবে অন্য কোনো শয্যায়। যদি তার স্বামী সফল হয় তার কাম জাগিয়ে তুলতে, তাহলে সে অন্য কারো সাথে সম্ভোগ করতে চাইবে একই সুখ, কেননা স্বামীর জন্যে তার কোনো বিশেষ ধরনের প্রীতি নেই।

এমন হ'তে পারে যে তরুণী যেমন স্বপ্ন দেখে একটি ত্রাতার, যে এসে তাকে হরণ ক'রে নেবে তার পরিবার থেকে, তেমনি স্ত্রীও প্রতীক্ষা করে সে-প্রেমিকের, যে তাকে উদ্ধার করবে বৈবাহিক জোয়াল থেকে। একটি প্রায়স-ব্যবহৃত বিষয় হচ্ছে যখন উপপত্নী বলতে শুরু করে বিয়ের কথা, তখন শীতল হয়ে ওঠে ও বিদায় নেয় ব্যাকুল প্রেমিক; নারীটি প্রায়ই আহত বোধ করে প্রেমিকের এ-সাবধান আচরণে, এবং তাদের সম্পর্ক বিকৃত হয়ে ওঠে বিক্ষোভে ও শত্রুতায়। যখন কোনো অবৈধ কামসম্পর্ক স্থিতি লাভ করে, তাহলে প্রায়ই পরিশেষে তা রূপ নেয় একটি পরিচিত, দাম্পত্য চরিত্রে; এতে আবার পাওয়া যাবে বিয়ের সমস্ত পাপগুলো : অবসাদ, ঈর্ষা, হিশেবনিকেশ, প্রতারণা প্রভৃতি। আর নারীটি আবার স্বপ্ন দেখতে থাকবে একটি পুরুষের, যে তাকে উদ্ধার করবে এ-নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম থেকে।

এছাড়াও পরিস্থিতি ও প্রথা অনুসারে ব্যভিচার ধারণ করে নানা বৈশিষ্ট্য। আমাদের সভ্যতায়, যেখানে টিকে আছে পিতৃতান্ত্রিক প্রথা, বৈবাহিক অবিশ্বস্ততা আজো স্বামীর থেকে স্ত্রীর জন্যে অনেক বেশি জঘন্য।

এ-কঠোরতার আদিকারণগুলো আমরা আলোচনা করেছি : স্ত্রীর ব্যভিচার পরিবারে

নিয়ে আসতে পারে কোনো অজানা পুরুষের পুত্র, এবং প্রবঞ্চিত করতে পারে বৈধ উত্তরাধিকারীদের; স্বামী হচ্ছে প্রভু, স্ত্রী তার সম্পত্তি। সামাজিক পরিবর্তন, জন্মনিয়ন্ত্রণ চর্চা হরণ করেছে এসব অভিপ্রায়ের বহু শক্তি। কিন্তু নারীকে পরনির্ভর অবস্থায় রাখার ধারাবাহিক বাসনা আজো স্থায়ী ক'রে রেখেছে তাকে ঘিরে রাখা নিষেধগুলোকে। সে প্রায়ই আত্মস্থ করে ওগুলো; সে চোখ বুজে থাকে তার স্বামীর বৈবাহিক খেয়ালখুশির দিকে, যদিও তার ধর্ম, তার নৈতিকতা, তার 'সতীত্ব', তাকে নিষেধ করে নিজে ওই ধরনের আচরণ করতে। তার সহচররা চাপিয়ে দেয় যে-সব নিয়ন্ত্রণ– বিশেষ ক'রে প্রাচীন ও নব বিশ্বের ছোটো ছোটো শহরগুলোতে– সেগুলো তার স্বামীর জন্যে যতোটা তার থেকে অনেক বেশি কঠোর তার জন্যে : তার স্বামী অনেক বেশি বাইরে যায়, সে ভ্রমণে যায়, এবং আনুগত্য ক্ষুণ্ন করলে তাকে অনেক বেশি প্রশ্রয় দেয়া হয়; নারীর ঝুঁকি থাকে বিবাহিত নারী হিশেবে তার সুনাম ও মর্যাদা হারানোর। যে-সব ছলে নারী এসব পাহারা ভণ্ডুল করতে সমর্থ হয়, তা প্রায়ই বর্ণনা করা হয়েছে; এবং আমি নিজেই জানি প্রাচীন কঠোর নীতিপরায়ণ একটি ছোটো পর্তুগিজ শহরের কথা, যেখানে তরুণী স্ত্রীরা শাশুড়ি বা ননদকে সঙ্গে না নিয়ে কখনো বাইরে যায় না; তবে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কেশবিন্যাসকারীর কাছে, যেখানে প্রেমিকপ্রেমিকারা স্বল্পকালের জন্যে মিলন উপভোগ করতে পারে। বড়ো নগরে স্ত্রীর কারারক্ষকদের সংখ্যা খুবই কম; তবে নতুন পরিচিতদের একটি ছোটো বৃত্তে অবৈধ সম্পর্কের সুযোগ বেশি নেই। ত্বরিত ও গোপন ব্যভিচার মানবিক ও মুক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করে না; বিয়ের মধ্যে সমস্ত মর্যাদা ধ্বংস ক'রে সমাপ্তি ঘটে এর মিথ্যাচারের।

পার্থক্যটি ঘটে প্রথা ও আজকের সমাজের নির্দেশিত পুরুষ ও নারীর সামগ্রিক কামপরিস্থিতিবশত। নারীর প্রেমকে আজো গণ্য করা হয় পুরুষের প্রতি একটি *সেবামূলক কাজ* ব'লে, তাই এটা পুরুষটিকে প্রতিভাত করে নারীটির প্রভু ব'লে। আমরা দেখেছি, পুরুষ নিম্নস্তরের একটি নারীকে *নিতে* পারে সব সময়ই, কিন্তু কোনো নারী যদি তার থেকে নিম্ন সামাজিক স্তরের কোনো পুরুষের কাছে *দান করে নিজেকে* তাহলে তা একটা অধঃপতন, দু-ক্ষেত্রেই তার সম্মতি হচ্ছে আত্মবিলোপ, অধঃপতন। তাদের স্বামীদের অধিকারে আছে অন্য নারীরা, এটা স্ত্রীরা প্রায়ই স্বেচ্ছায় মেনে নেয়; এমনকি তারা অনেক সময় শ্লাঘাও বোধ করতে পারে : কিছু নারী অনেক সময় এতো দূর যায় যে তারা অনুকরণ করে মাদাম দ্য পঁপাদুরকে এবং কুটনির অভিনয়ও করে। অন্য দিকে, প্রেমিকের আলিঙ্গনে নারীটি রূপান্তরিত হয় একটি বস্তুতে, শিকারে; তার স্বামীর কাছে মনে হয় যেনো তার স্ত্রীর ওপর ভর করেছে একটি বাহ্যিক মানা, সে আর তার নয়, তার কাছে থেকে অপহরণ ক'রে নেয়া হয়েছে স্ত্রীকে। যতো দিন নারী নিজেকে ক'রে রাখবে দাসী এবং প্রতিফলিত করবে সে-পুরুষটিকে, যার কাছে সে 'দান করেছে নিজেকে', ততো দিন তাকে মেনে নিতে হবে যে তার ব্যভিচার তার স্বামীর ব্যভিচারগুলোর থেকে অনেক বেশি মারাত্মকভাবে বিপর্যয়কর।

পরিচ্ছেদ ৪

বেশ্যারা ও হেতাইরারা

বিয়ে ও বেশ্যাবৃত্তি, আমরা দেখেছি, সরাসরিভাবে পরস্পরসম্পর্কিত; বলা হয়ে থাকে যে প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি পরিবারপ্রথার ওপর একটি তমিস্র ছায়ার মতো অনুসরণ করছে মানবজাতিকে। পুরুষ, দূরদর্শিতাবশত, তার স্ত্রীকে দীক্ষিত করে সতীত্বব্রতে, কিন্তু সে নিজে সন্তুষ্ট নয় স্ত্রীর ওপর আরোপ করা ব্যবস্থায়। মঁতেইন একে সমর্থন ক'রে আমাদের বলেছেন :

> পারস্যের রাজারা ভোজোৎসবে তাদের স্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানাতে অভ্যস্ত ছিলো; তবে মদ যখন তাদের সুচারুরূপে উত্তেজিত ক'রে তুলতো এবং যখন তারা প্ররোচিত হতো কামের লাগাম ঢিলে ক'রে দিতে, তখন স্ত্রীদের তারা পাঠিয়ে দিতো তাদের নিজেদের শয়নকক্ষে, যাতে তারা অংশ নিতে না পারে তাদের অসংযত কামক্ষুধায়, এবং তাদের বদলে আনার ব্যবস্থা করতো অন্য নারীদের, যাদের প্রতি তারা এমন সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করতো না।

গির্জার পিতাদের মতে, প্রাসাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্যে পয়ঃপ্রণালি দরকার। এবং প্রায়ই বলা হয় যে নারীদের একাংশকে রক্ষা এবং এর থেকেও নিকৃষ্ট বিপদ প্রতিরোধের জন্যে দরকার আরেক অংশকে বলি দেয়া। দাসত্বপ্রথার পক্ষে মার্কিন দাসত্বপ্রথার সমর্থকদের একটি যুক্তি ছিলো যে দক্ষিণাঞ্চলের শাদারা সবাই যেহেতু মুক্ত ছিলো দাসত্বের দায়িত্বগুলো থেকে, তাই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো সর্বাধিক গণতান্ত্রিক ও পরিশীলিত সম্পর্কগুলো রক্ষা করা; একইভাবে, একগোত্র 'নির্লজ্জ নারী' থাকলে 'সতীনারীদের' প্রতি চরম বীরত্বব্যঞ্জক সম্মান দেখানো সম্ভব হয়। বেশ্যা একটি বলির পাঠা; পুরুষ তার দুশ্চরিত্রতার নির্গমন ঘটায় বেশ্যার ওপর, এবং তাকে বর্জন করে। তাকে আইনগতভাবে পুলিশের তত্ত্বাবধানেই রাখা হোক বা সে অবৈধভাবে গোপনেই কাজ করুক, তাকে গণ্য করা হয় ব্রাত্য রূপেই।

অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে তার অবস্থান বিবাহিত নারীর অবস্থানের সমতুল্য। *ল্য পিউবার্তে*তে মারো বলেন : 'যারা নিজেদের বিক্রি করে বেশ্যাবৃত্তিতে ও যারা নিজেদের বিক্রি করে বিয়েতে, তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু দামে ও চুক্তির সময়ের দৈর্ঘ্যে।' উভয়ের জন্যেই যৌনকর্ম একটা সেবামূলক কাজ; একজনকে একটি পুরুষ ভাড়া করে সারাজীবনের জন্যে; আরেকজনের আছে নানা খদ্দের, যারা প্রত্যেকবার তাকে মজুরি দেয়। একজনকে অন্যান্য পুরুষ থেকে রক্ষা করে একটি পুরুষ; আরেকজনকে তারা সবাই রক্ষা করে তাদের প্রত্যেকের স্বৈরাচার থেকে। যা-ই ঘটুক না কেনো তাদের দেহদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে বিদ্যমান প্রতিযোগিতার ফলে; স্বামীটি জানে যে সে গ্রহণ করতে পারতো ভিন্ন একটি স্ত্রী; 'দাম্পত্য দায়িত্ব' পালন একটা ব্যক্তিগত অনুগ্রহ নয়, এটা একটি চুক্তিপূরণ।

বেশ্যাবৃত্তিতে, পুরুষের কাম চরিতার্থ হ'তে পারে যে-কোনো দেহে, কেননা এ-কামনা বিশেষ হ'লেও তা কোনো নির্দিষ্ট বস্তু চায় না। একটি পুরুষকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে স্ত্রীও পারে না হেতাইরাও পারে না, যদি না স্ত্রীটি বা হেতাইরাটি পুরুষটির ওপর তার প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে বৈধ স্ত্রী, যে উৎপীড়িত হয় বিবাহিত নারী হিশেবে, সে একটি মানুষ হিশেবে সম্মান পায়। যতো দিন বেশ্যা মানুষ হিশেবে তার অধিকার না পাবে, ততো দিন সে একাধারে নির্দেশ করবে নারীর সব ধরনের দাসীত্ব।

কী প্রেষণা নারীকে চালিত করে বেশ্যাবৃত্তিতে, এ-সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করা বোকামি; আজকাল আমরা আর মেনে নিই না লোম্ব্রোসের সে-তত্ত্ব, যা বেশ্যা ও অপরাধীদের জড়ো করে এক জায়গায় এবং উভয়ের মধ্যেই দেখতে পায় অধঃপতিতদের; হ'তে পারে, পরিসংখ্যান যেমন নির্দেশ করে, যে বেশ্যাদের মানসিক স্তর গড়মানের থেকে কিছুটা নিচে এবং তাদের মধ্যে কিছু নিশ্চিতভাবেই দুর্বলচিত্ত, কেননা মানসিক প্রতিবন্ধী নারীরা বেছে নিতে চাইবে এমন পেশা, যাতে কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের দরকার পড়ে না; তবে তাদের অধিকাংশই স্বাভাবিক, কিছু আছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তাদের নেই কোনো বংশগতিক দোষ, কোনো শারীরবৃত্তিক ত্রুটি। সত্য হচ্ছে যে এমন একটি বিশ্বে, যেখানে দুর্দশা ও বেকারত্ব ব্যাপক, সেখানে যে-পেশাই খোলা পাওয়া যায় তাতেই ঢুকতে চাইবে কিছু মানুষ; যতো দিন আছে পুলিশবাহিনী ও বেশ্যাবৃত্তি ততো দিন থাকবে পুলিশ ও বেশ্যারা, আরো বিশেষভাবে এজন্যে যে এ-পেশায় অন্য বহু পেশার থেকে আয় বেশ ভালো। পুরুষের চাহিদা যে-সরবরাহ উদ্দীপ্ত করে, তাতে বিস্ময় বোধ করা নিছক ভণ্ডামো; এটা নিতান্তই এক প্রাথমিক ও সর্বজনীন আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার ক্রিয়া। 'পতিতাবৃত্তির সমস্ত কারণের মধ্যে', ১৮৫৭ অব্দে তাঁর প্রতিবেদনে পারেঁ-দুশাতেলে লিখেছেন, 'কম মজুরির ফলে উৎপন্ন বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের থেকে অন্য কিছুই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।' সচ্চিন্তাশীল নীতিবানেরা বিদ্রূপের হাসি হেসে অবজ্ঞাভরে উত্তর দেন যে বেশ্যাদের কাঁদুনে-কাহিনীগুলো অনভিজ্ঞ খদ্দেরদের সুবিধার জন্যে অলীক কল্পনারঞ্জিত বর্ণনামাত্র। এটা সত্য যে বেশ্যারা অনেকেই অন্য উপায়েও জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। তবে সে যে-পথটি বেছে নিয়েছে, তা যদি তার কাছে নিকৃষ্টতম মনে না হয়, তাহলে প্রমাণ হয় না যে তার রক্তেই আছে পাপ; এটা বরং নিন্দা জ্ঞাপন করে সে-সমাজের প্রতি, যে-সমাজে এ-পেশাটি এখনো সে-সব পেশার অন্যতম, যা বহু নারীর কাছে মনে হয় ন্যূনতমভাবে অনাকর্ষণীয়। প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয় : কেনো সে এটা বেছে নিয়েছে? বরং প্রশ্নটি হচ্ছে : সে কেনো এটা বেছে নেয় নি?

এটা উল্লেখযোগ্য যে, একদিকে, বেশ্যাদের একটি বড়ো অংশ প্রাক্তন চাকরানি। কোনো চাকরানির ঘরের দিকে একবার তাকালেই এর কারণ বোঝা যায়। শোষিত, দাসীত্বে আবদ্ধ, যাকে মানুষ হিশেবে না দেখে দেখা হয় বস্তু হিশেবে, সব ধরনের কাজের এ-চাকরানি, শয্যাকক্ষের পরিচারিকা, ভবিষ্যতে তার নিজের ভাগ্যের কোনো উন্নতির লক্ষণই সে দেখতে পায় না; অনেক সময় তার ওপর পড়ে গৃহস্বামীর চোখ, তাকে তা মেনে নিতে হয়। এ-ধরনের গার্হস্থ্য দাসীত্ব ও যৌন অধীনতা থেকে সে

পিছলে পড়ে এমন এক দাসত্বে, যা আগের থেকে হীন নয় এবং সে স্বপ্ন দেখে যে এটা হবে অনেক বেশি সুখের। তাছাড়া, গৃহদাসীরা থাকে তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে; হিশেব ক'রে দেখা গেছে যে প্যারিসের শতকরা ৮০ ভাগ বেশ্যাই আসে দূরাঞ্চল বা গ্রাম থেকে। পরিবারপরিজন যদি কাছাকাছি থাকে, তাহলে কোনো নারী সর্বজনীনভাবে ধিকৃত একটি পেশায় ঢুকতে গেলে বাধার সম্মুখিন হয় এবং তাকে তার মানসম্মান রক্ষা ক'রে চলতে হয়; কিন্তু সে যখন হারিয়ে যায় কোনো মহানগরে এবং সমাজের সঙ্গে সংহতি লাভ করে না, তখন 'নৈতিকতা'র বিমূর্ত ধারণাটি আর কোনো বাধাই হয় না।

যতো কাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যৌনক্রিয়াকে– বিশেষ ক'রে কুমারীত্বকে– ঘিরে রাখবে প্রচণ্ড ট্যাবুতে, ততো কাল বহু কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একে মনে হবে একটা ঔদাসীন্যের ব্যাপার। অজস্র অনুসন্ধান একমত যে বিপুল সংখ্যক তরুণী প্রথম আগন্তুকের কাছেই সতীত্বমোচনের জন্যে দান করে নিজেদের এবং তারপর যে-কারো কাছে দেহদান তাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। ডঃ বিজার একশো বেশ্যাকে তদন্ত ক'রে পেয়েছেন এ-তথ্য : একজন তার কুমারীত্ব হারায় সাত বছর বয়সে, দুজন বারো বছর বয়সে, দুজন তেরো বছর বয়সে, ছ-জন চোদ্দো বছর বয়সে, সাতজন পনেরোতে, একুশজন ষোলোতে, উনিশজন সতেরোতে, সতেরোজন আঠারোতে, ছ-জন উনিশে; বাকিরা একুশ বছর বয়সের পর। তাই পাঁচ শতাংশ কুমারীত্ব হারিয়েছে বয়ঃসন্ধির আগেই। অর্ধেকের বেশি বলেছে যে তারা প্রেমের জন্যে দেহদান করেছে, কেননা তারা দেহদান করতে চেয়েছে; অন্যরা দেহদান করেছে অজ্ঞতাবশত। প্রথম রমণকারী প্রায়শই হয়ে থাকে অল্পবয়স্ক। সাধারণত সে হয়ে থাকে কোনো দোকান বা কর্মস্থলের সহকর্মী, বা কোনো বাল্যবন্ধু; তারপর পৌনপুনিকভাবে আসে সৈনিকেরা, শ্রমিকপ্রধানেরা, পরিচারকেরা, এবং ছাত্ররা; ডঃ বিজারের তালিকায় আছে দুজন আইনজীবী, একজন স্থপতি, একজন ডাক্তার, এবং একজন ঔষধবিদ। নিয়োগদাতার নিজের এ-ভূমিকা পালনের ঘটনা বরং দুর্লভ, যদিও জনপ্রিয় কিংবদন্তিতে এটা ব্যাপক; তবে প্রায়ই এ-কাজটি করে তার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বা তার কোনো বন্ধু। অন্য একটি সন্দর্ভে কমেঁজ বারো থেকে সতেরো বছরের পঁয়তাল্লিশটি তরুণীর কথা বলেছেন যাদের সতীত্বমোচন ঘটে এমন অপরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা, যাদের সঙ্গে তাদের আর কখনো দেখা হয় নি; তারা নিরাসক্তভাবে দেহদান করেছে, কোনো সুখ পায় নি। এসব প্রতিবেদনে প্রত্যেকের ঘটনার যে-বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় কতো ঘন ঘন এবং কতো বিচিত্র পরিস্থিতিতে মেয়েরা ও তরুণী নারীরা দেহদান করে হঠাৎ আগন্তুকদের, নতুন পরিচিতদের, ও বয়স্ক আত্মীয়দের কাছে, এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তারা থাকে অজ্ঞ বা উদাসীন।

এ-মেয়েরা অক্রিয়ভাবে দেহদান করলেও সতীচ্ছদছিন্নকরণের যন্ত্রণা তারা ঠিকই ভোগ করেছে, আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি; জানা বাঞ্ছনীয় এ-পাশব অভিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যতের ওপর ফেলেছে কী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব; তবে বেশ্যাদের মনোবিশ্লেষণ প্রথানুগ নয়, এবং আত্ম-বর্ণনায় তারা বিশেষ ভালো নয়, সাধারণত তারা আশ্রয় নিয়ে

থাকে বাঁধাবুলির। কিছু ক্ষেত্রে প্রথম আগন্তুকের কাছেই তাদের দেহদানের আগ্রহকে ব্যাখ্যা করতে হবে আমার উল্লেখিত বেশ্যাবৃত্তি-ফ্যান্টাসির সাহায্যে, কেননা বহু অতি অল্পবয়স্ক মেয়ে তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থেকে, তাদের নবোদিত কামের বিভীষিকায়, বা প্রাপ্তবয়স্কের ভূমিকা নেয়ার বাসনায় অনুকরণ করে বেশ্যাদের। তারা উগ্র প্রসাধন করে, ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে, ছেনালিপনাপূর্ণ ও প্ররোচনাদায়ক আচরণ করে। যারা এখনো শিশুসুলভ, অযৌন, শীতল, তারা মনে করে আগুন নিয়ে তারা খেলতে পারে নিরাপদে; একদিন কোনো পুরুষ তাদের কথা পুরোপুরি সত্য ব'লে গ্রহণ করে, এবং তারা স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে বাস্তবে।

'যখন কোনো দরোজা একবার ভেঙেচুরে খোলা হয়েছে, তখন সেটি বন্ধ রাখা কঠিন,' বলেছে চোদ্দো বছরের এক কিশোরী বেশ্যা, যা উদ্ধৃত করেছেন মারো। তবে অল্প বয়সের কোনো মেয়ে সতীত্বমোচনের সাথে সাথেই কদাচিৎ শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক সময় সে অনুরক্ত থাকে তার প্রথম প্রেমিকের প্রতি এবং তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকে; সে একটা 'নিয়মানুগ' চাকুরি নেয়; প্রেমিক তাকে ছেড়ে গেলে সে আরেকটিকে ধ'রে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। এখন যেহেতু সে আর কোনো একটি পুরুষের সম্পত্তি নয়, সে বোধ করে সে সকলের কাছে দান করতে পারে নিজেকে; অনেক সময় তার প্রেমিকটিই– প্রথম বা দ্বিতীয়টি– পরামর্শ দেয় এ-পথে অর্থ উপার্জনের। বহু মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তিতে লাগায় তাদের পিতামাতারা; কিছু পরিবারে– আমেরিকার বিখ্যাত জিউকদের মতো– সব নারীর নিয়তিই এ-ব্যবসা। তরুণী নারী-ভবঘুরের মধ্যে আছে বহু ছোটো বালিকা, যাদের ত্যাগ করেছে তাদের আত্মীয়রা; তারা ভিক্ষা করতে শুরু ক'রে ঢুকে যায় বেশ্যাবৃত্তিতে। তাঁর যে-সন্দর্ভের প্রতি ইতিমধ্যেই নির্দেশ করা হয়েছে, তাতে পারেঁ-দুশাতেলে দেখিয়েছেন যে ৫,০০০ বেশ্যার মধ্যে ১,৪৪১ জন বেশ্যা হয়েছিলো দারিদ্র্যের কারণে, ১,৪২৫ জন হয়েছিলো ধর্ষিত ও পরিত্যক্ত, ১,২৫৫ জন ভরণপোষণের কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই পরিত্যক্ত হয়েছিলো পিতামাতাদের দিয়ে। এটা ঘটেছিলো ১৮৫৭ অব্দে, তবে সমসাময়িক সন্দর্ভগুলো নির্দেশ করে প্রায় একই ফলাফল। অসুস্থতা প্রায়ই সে-নারীদের ঠেলে দেয় বেশ্যাবৃত্তিতে, যারা দৈহিক কাজ করতে পারে না বা যারা চাকুরি হারিয়েছে; এটা বিপর্যস্ত ক'রে দেয় নাজুকভাবে তৈরি সুষম বাজেট এবং নারীদের বাধ্য করে দ্রুত নতুন অর্থসম্পদ সংগ্রহ করতে। অবৈধ সন্তান ধারণের ফলও একই। সাঁৎ-লাজার কারাগারে অর্ধেকেরও বেশি নারীর ছিলো একটি ক'রে সন্তান, কমপক্ষে। অনেকের ছিলো তিন থেকে ছ-টি, অনেকের আরো বেশি। কমসংখ্যক নারীই ত্যাগ করে তাদের সন্তানদের; প্রকৃতপক্ষে, কিছু অবিবাহিত মা তাদের সন্তান লালনপালনের জন্যেই ঢোকে বেশ্যাবৃত্তিতে। এটা সুবিদিত যে যুদ্ধ ও পরবর্তী সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময় বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি পায়।

মারি তেরেস ছদ্মনামে এক বেশ্যা *তেম্প মদার্নে* সাময়িকীতে বর্ণনা করেছে তার জীবনকাহিনী; তার শুরুটা এমন :

ষোলো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিলো আমার থেকে তেরো বছরের বড়ো একটি লোকের সাথে। বাড়ি থেকে চ'লে যাওয়ার জন্যে আমি এটা করেছিলাম। আমার স্বামীর একমাত্র চিন্তা ছিলো

আমার পেট বানিয়ে রাখা, 'যাতে আমি বাড়িতে থাকি', সে বলতো। সে ছিলো প্রসাধনের ও সিনেমার বিপক্ষে, এবং আমার শাশুড়ি সব সময়ই আমাকে বলতো আমার স্বামীই ঠিক। দু-বছরে আমার দুটো বাচ্চা হয়... আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং সেবিকা হওয়ার শিক্ষা নিই, যা ছিলো আমার পছন্দ... হাসপাতালে এক বেহায়া তরুণী সেবিকা আমাকে এমন কিছু কথা বলে, যা আমি জানতাম না, কিন্তু ছ-মাস আমি পুরুষদের সাথে কিছু করি নি। একদিন একটা স্থূল, তবে সুদর্শন যুবক আমার ঘরে আসে এবং আমাকে বোঝায় যে আমি আমার জীবন বদলে দিতে পারি, তার সাথে প্যারিসে যেতে পারি, আমাকে আর কোনো কাজ করতে হবে না... মাসখানেক তার সাথে আমি সত্যিই সুখী ছিলাম। একদিন সে একটি ফিটফাট মহিলাকে নিয়ে আসে, সে বলে যে ওই মহিলা নিজেকে নিজেই চালাতে পারে। প্রথমে আমি রাজি হই নি। আমি রাস্তায় যাবো না এটা দেখানোর জন্যে এমনকি আমি একটি ক্লিনিকেও কাজ নিই। তবে আমি বেশি দিন বাধা দিতে পারি নি। সে বলে যে আমি তাকে ভালোবাসি না, নইলে তার জন্যে আমি কাজ করতাম। আমি চিৎকার করতে থাকি; ক্লিনিকে আমি সব সময় বিষণ্ন থাকতাম। শেষে আমি রাজি হই, সে আমাকে কেশবিন্যাসকারীর কাছে নিয়ে যায়... আমি 'সংক্ষিপ্ত কাজ' করতে শুরু করি! জুলো আমাকে পিছে পিছে অনুসরণ করে, এটা দেখার জন্য আমি ঠিকঠাক কাজ করছি কি-না এবং পুলিশ এলে আমাকে সাবধান ক'রে দেয়ার জন্যে।

এটি অনেকটা খাপ খায় সে-মেয়ের চিরায়ত গল্পের সাথে, যাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে তার দালাল। কখনো কখনো স্বামীই পালন করে এ-ভূমিকা। কখনোবা পালন করে কোনো নারী। ৫১০জন তরুণী বেশ্যাসম্পর্কিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে ২৮৪জন থাকে একলা, ১৩২জন থাকে কোনো পুরুষ বন্ধুর সাথে, এবং ৯৪জন থাকে কোনো নারীর সাথে, যার সঙ্গে তারা সাধারণত সমকামী সম্পর্কে জড়িত। এ-মেয়েদের অনেকে বলেছে যে তারা চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে অন্য নারীদের দ্বারা, এবং তাদের কেউ কেউ বেশ্যাবৃত্তি করেছে নারীদের কাছে।

সাহিত্য 'জুলো'কে পরিণত করেছে একটি সুপরিচিত চরিত্রে। সে বেশ্যার জীবনে পালন করে রক্ষকের ভূমিকা। কাপড়চোপড় কেনার জন্যে সে টাকা অগ্রিম দেয়, তারপর নারীটিকে রক্ষা করে অন্য নারীদের প্রতিযোগিতা থেকে, পুলিশের থেকে– অনেক সময় সে নিজেই পুলিশ– এবং তার খদ্দেরদের থেকে, যারা খুবই সুখ পায় নারীটির প্রাপ্য টাকা শোধ না করতে এবং তাদের অনেকে পরিতৃপ্তি পেতে চায় তার ওপর তাদের ধর্ষকাম চরিতার্থ ক'রে। কয়েক বছর আগে মাদ্রিদের ফ্যাশিবাদী শৌখিন বিত্তবান যুবসম্প্রদায় মজা পেতো শীতের রাতে বেশ্যাদের নদীতে ছুঁড়ে ফেলে : ফ্রান্সে অনেক সময় ছাত্ররা প্রমোদের উদ্দেশ্যে মেয়েদের নিয়ে যায় পল্লীগ্রামে এবং সেখানে তাদের ফেলে রেখে আসে, ন্যাংটো। টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তার জন্যে এবং পীড়ন এড়ানোর জন্যে বেশ্যাদের একটি পুরুষ দরকার পড়ে। পুরুষটি তাদের নৈতিক সমর্থনও দেয়। বেশ্যাটি প্রায়ই থাকে তার সাথে প্রেমে জড়িত; এবং প্রেমের মাধ্যমেই সে এসেছে এ-কাজে, বা প্রেম দিয়েই সে তার কাজের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। তার পরিবেশে পুরুষ নারীর থেকে বিপুলভাবে শ্রেষ্ঠ, এবং এ-বিচ্ছিন্ন প্রতিবেশে গ'ড়ে ওঠে এক ধরনের প্রেম-ধর্ম, এটাই ব্যাখ্যা করে কোনো কোনো বেশ্যার সংরাগপূর্ণ আত্মবলিদানকে। এ-ধরনের মেয়ে তার পুরুষটির বল ও হিংস্রতার মধ্যে দেখতে পায় তার পৌরুষের লক্ষণ এবং অবলীলায় আত্মসমর্পণ করে তার কাছে। তার সাথে থেকে সে বোধ করে ঈর্ষা ও যন্ত্রণা, তবে পায় প্রেমিকার সুখও।

তবে বেশ্যা অনেক সময় তার পুরুষটির প্রতি বোধ করে শত্রুতা ও বিরক্তি; তবে

ভয়ে সে থাকে তার পুরুষটির অধীনে, কেননা পুরুষটি তার ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে রাখে। তাই অনেক সময় তার খদ্দেরদের মধ্যে থেকে একটি প্রেমিক নিয়ে সে সান্ত্বনা দেয় নিজেকে। মারি-তেরেস লিখেছেন :

> তাদের জুলোরা ছাড়াও সব মেয়েরই ছিলো প্রেমিক; এবং আমারও। সে ছিলো নাবিক, খুবই চমৎকার মানুষ। যদিও সে ছিলো একটি ভালো প্রেমিক, তবু আমি তার সাথে জড়িয়ে পড়তে পারি নি, তবে আমরা ভালো বন্ধু ছিলাম। সে প্রায়ই আমার সাথে ওপরতলায় আসতো, সঙ্গম নয় শুধু কথা বলার জন্যে; সে বলতো যে আমার ওখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত, ওটা আমার উপযুক্ত স্থান নয়।

তারা প্রায়ই আকৃষ্ট হয় নারীদের প্রতি। বহু বেশ্যাই সমকামী। আমরা দেখেছি যে মেয়েদের জীবনের শুরুতে প্রায়ই ঘটে সমকামিতার অভিজ্ঞতা এবং অনেকে বসবাস করতে থাকে কোনো বান্ধবীর সাথে। আন্না রিউলিংয়ের মতে জর্মনির প্রায় বিশ শতাংশ বেশ্যা সমকামী। ফাইর্ভ জানিয়েছেন কারাগারে তরুণী নারী-বন্দীরা বিনিময় করে অশ্লীলবৃত্তিক চিঠিপত্র, যেগুলোর স্বরগ্রাম খুবই সংরাগপূর্ণ, এবং তাতে স্বাক্ষর থাকে 'আজীবন তোমার'। এসব চিঠি 'প্রেম-ভাবে-ভাবিত' বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চিঠির মতো; পরেরগুলো অনেক কম অভিজ্ঞ, অধিকতর ভীরু; আগেরগুলো অনিয়ন্ত্রিত তাদের আবেগে, যেমন শব্দে তেমনি কর্মে।

মারি-তেরেসের জীবনে– যিনি এতে দীক্ষিত হয়েছিলেন একটি নারীর দ্বারা– আমরা দেখতে পাই ঘৃণ্য খদ্দের ও স্বৈরাচারী দালালের থেকে কতোটা বিশেষ সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করে বান্ধবী।

> জুলো একটি মেয়েকে নিয়ে এলো, একটা গরিব গৃহস্থঘরের মেয়ে, যার পায়ে এমনকি জুতোও ছিলো না। তার দরকারি সব জিনিশপত্র কেনা হলো একটা পুরোনো জিনিশের দোকান থেকে, এবং তারপর সে আমার সাথে কাজ করতে এলো। সে খুবই প্রীতিকর ছিলো, উপরন্তু, সে যেহেতু নারীদের ভালোবাসতো, তাই আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হলো। সেবিকাটির কাছে আমি যা-কিছু শিখেছিলাম, সে তার সব কিছু আমার মনে পড়িয়ে দিলো। আমরা প্রায়ই মজা করতাম এবং, কাজের বদলে, সিনেমায় যেতাম। আমাদের মাঝে তাকে পেয়ে আমি খুশি হয়েছিলাম।

যে-'সতী' নারী বাস করে নারীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তার পুরুষ প্রেমিকটি যে-ভূমিকা পালন করে, বেশ্যার বান্ধবীও পালন করে প্রায়ই একই ভূমিকা : সে প্রমোদের সঙ্গী, সে এমন একটি মানুষ যার সাথে সম্পর্কগুলো অবাধ ও নিরাসক্ত, তাই অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত। পুরুষে ক্লান্ত হয়ে, তাদের ওপর বিরক্ত হয়ে বা নিতান্তই নিছক একটু ভিন্নতার জন্যে বেশ্যা বিনোদন ও সুখ খোঁজে নারীর বাহুতে। তা যা-ই হোক, যে-দুষ্কর্মে সহযোগিতার কথা আমি বলেছি, যা সরাসরি সম্মিলিত করে নারীদের, তা অন্য কোনোখানের থেকে এখানে বিরাজ করে অনেক বেশি সবলভাবে। মানবজাতির অর্ধেকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যেহেতু ব্যবসার ধরনের এবং সমাজ যেহেতু সামগ্রিকভাবে তাদের গণ্য করে ব্রাত্যরূপে, বেশ্যাদের নিজেদের মধ্যে থাকে একটা দৃঢ় সংহতি; তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে, ঈর্ষাবোধ করতে পারে, পরস্পরকে অপমান করতে পারে, মারামারি করতে পারে; তবে একটা প্রতি-বিশ্ব তৈরির জন্যে তারা সুগভীরভাবে বোধ করে পরস্পরের প্রয়োজন, যে-বিশ্বে তারা ফিরে পায় তাদের মানবিক মর্যাদা। সহযোদ্ধাই বিশ্বাসভাজন ও সাক্ষী হিশেবে শ্রেয়।

বেশ্যা ও তার খদ্দেরদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে মতামত বহুবিচিত্র এবং সন্দেহ নেই যে আছে নানা ভিন্নতা। প্রায়ই জোর দিয়ে বলা হয় যে স্বেচ্ছাকৃত প্রীতির নিদর্শন হিশেবে বেশ্যা শুধু তার প্রেমিকের জন্যেই সংরক্ষিত রাখে মুখচুম্বন, এবং সে প্রেমের আলিঙ্গন ও পেশাগত আলিঙ্গনকে দুটি ভিন্ন জিনিশ ব'লেই গণ্য করে। পুরুষেরা যে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেয়, সেগুলো সন্দেহজনক, কেননা তাদের অহমিকার ফলে তারা সহজেই বোকা বনে মেয়েটির আনন্দ উপভোগের ভান দিয়ে। বলা দরকার যে ব্যাপারটি যখন দ্রুত ও ক্লান্তিকরভাবে এক খদ্দের থেকে আরেক খদ্দেরে যাওয়ার, বা একজন পরিচিত খদ্দেরের সাথে বারবার সম্পর্কের, তখন সব কিছুই ভিন্ন। মারি-তেরেস সাধারণত তাঁর ব্যবসা চালাতেন উদাসীনভাবে, তবে তাঁর মনে পড়ে যে কিছু কিছু রাত ছিলো আনন্দদায়ক। এটা অজানা নয় যে কোনো কোনো মেয়ে টাকা নিতে অস্বীকার করে তার সে-খদ্দেরের থেকে, যে তাকে সুখ দিয়েছে, এবং অনেক সময়, খদ্দেরটি যদি অর্থসংকটে পড়ে, তখন মেয়েটি তাকে উদ্ধার করে টাকা দিয়ে।

তবে সাধারণভাবে পেশাগত কাজের সময় নারী থাকে 'শীতল' ও ঘৃণাভরে, তাদের অনেকে তাদের সমগ্র খদ্দেরপালের প্রতি নিরাসক্তি ছাড়া আর কিছু বোধ করে না। 'আহা, পুরুষ কী রকম বেকুব! নারীদের যা ইচ্ছে হয় তাতেই পুরুষের মাথা ভরাট তোলা নারীদের পক্ষে কতো সহজ!' লিখেছেন মারি-তেরেস। কিন্তু অনেকেই পুরুষের প্রতি পোষণ করে তিক্ত ক্ষোভ; একদিকে, তাদের বমি পায় পুরুষের অস্বাভাবিক রুচি বা 'অনাচার'-এ। পুরুষ তাদের কলুষিত রুচি, যা তারা স্ত্রীদের বা উপপত্নীদের কাছে স্বীকার করতে সাহস করে না, তা চরিতার্থ করার জন্যেই বেশ্যালয়ে যাক, বা বেশ্যালয়ে যাওয়ার ফলেই মুহূর্তের ঝোঁকে তারা অনাচারের নতুন ফন্দি আঁটুক, সত্য হচ্ছে যে বহু পুরুষ চায় যে নারীরা অংশ নিক বিচিত্র বিকৃতিতে। মারি-তেরেস অভিযোগ করেছেন যে ফরাশি পুরুষদের, বিশেষ ক'রে, আছে চির-অতৃপ্ত কল্পনাপ্রতিভা। বেশ্যারা সহানুভূতিশীল চিকিৎসকের কাছে বলবে যে 'সব পুরুষই কম বা বেশি কলুষিত'।

আমার এক বন্ধু বজোঁ হাসপাতালে দীর্ঘ সময় ধ'রে আলাপ করেছে এক তরুণী বেশ্যার সাথে; সে ছিলো খুবই বুদ্ধিমান, সে কাজ শুরু করেছিলো চাকরানি হিশেবে, এবং থাকতো একটি দালালের সাথে, যার প্রতি সে পোষণ করতো অনুরাগ। 'প্রত্যেক পুরুষই নষ্ট,' সে বলেছে, 'শুধু আমারটি ছাড়া। এজন্যেই আমি তাকে ভালোবাসি। তার মধ্যে কখনো কোনো পাপের চিহ্ন দেখা গেলে আমি তাকে ছেড়ে দেবো। খদ্দের প্রথমবার সব সময় যা-তা করার সাহস করে না, সে স্বাভাবিক থাকে; কিন্তু যখন সে আবার আসে, তখন সে এমন সব কাজ করতে চায়... তুমি বলছো যে তোমার স্বামীর কোনো দোষ নেই, কিন্তু তুমি একদিন দেখতে পাবে। তার আছে সব দোষই।' এসব দোষের জন্যে সে অপছন্দ করতো তার খদ্দেরদের। আমার আরেক বন্ধু ফ্রেসনেতে ১৯৪৩ অব্দে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে একটি বেশ্যার সাথে। ওই মেয়েটি বলে যে তার খদ্দেরদের শতকরা নব্বুই ভাগই নষ্ট, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পায়ুকামী।

এসব নারী তাদের খদ্দেরদের প্রতি যে-বৈরিতা বোধ করে, তাতে প্রায়ই থাকে শ্রেণীগত ক্ষোভের ব্যাপার। হেলেন ডয়েট্শ্ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন রূপসী আন্নার

ইতিহাস, যে সাধারণত ছিলো ভদ্র, কিন্তু মাঝেমাঝে ক্রোধে হয়ে উঠতো উন্মত্ত, বিশেষ ক'রে কর্মকর্তাদের ওপর, যার ফলে তাকে চিকিৎসার জন্যে আনা হয় একটি মানসিক হাসপাতালে। সংক্ষেপে, তার গৃহজীবন এতো অসুখী ছিলো যে চমৎকার সুযোগ সত্ত্বেও সে কখনোই বিয়ে করতে রাজি হয় নি। সে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলো তার বেশ্যার জীবনের সাথে, তবে যক্ষ্মার জন্যে তাকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। সে চিকিৎসকদের ঘৃণা করতো, যেমন ঘৃণা করতো সমস্ত 'সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তিদের। 'কেনো নয়?' সে বলতো। 'আমরা কি অন্য যে-কারো থেকে ভালোভাবে জানি না যে এসব লোক কতো সহজেই ছুঁড়ে ফেলে তাদের ভদ্রতা, আত্মসংযম, ও প্রতিপত্তির মুখোশ এবং পশুদের মতো আচরণ করে?' এ-মনোভাব ছাড়া সে ছিলো মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। আরেকজন তরুণী বেশ্যা, জুলিয়া, পনেরো বছর বয়স থেকেই যে ছিলো কাম-উচ্ছৃঙ্খল, সে শুধু তাদের প্রতিই ছিলো কোমল, মধুর, ও উপকারী, যাদের সে মনে করতো দুর্বল, বা দরিদ্র এবং অসহায়। 'সে অন্যদের মনে করতো নীতিবিগর্হিত পশু, যাদের প্রাপ্য কঠোর শাস্তি'।

অধিকাংশ বেশ্যাই নৈতিকভাবে খাপ খাইয়ে নেয় তাদের জীবনধারার সাথে। এমন নয় যে তারা জন্মত বা উত্তরাধিকারসূত্রে অনৈতিক, তবে যৌক্তিকভাবেই তারা সে-সমাজের সাথে নিজেদের সংহত মনে করে, যেখানে তাদের সেবার চাহিদা আছে। তারা বেশ ভালোভাবেই জানে যে পুলিশ সার্জেন্টের নৈতিক উন্নতিসাধক শব্দবহুল গলাবাজিভরা বক্তৃতা আর বেশ্যালয়ের বাইরে তাদের খদ্দেরদের ঘোষিত মহৎ ভাবাবেগগুলো তাদের বিশেষ ভয় দেখাতে পারে না। মারি-তেরেস ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁকে টাকা দেয়া হোক বা না হোক, তাঁকে একই রকমে বেশ্যাই বলা হয়, তবে যদি টাকা দেয়া হয়, তখন তাঁকে বলা হয় একটা অতিচতুর বেশ্যা; যখন তিনি টাকা চান, তখন লোকটি ভান করে যে সে তাঁকে *ওই* ধরনের মেয়ে মনে করে নি।

তাদের নৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি যে বেশ্যাদের ভাগ্যকে দুর্বহ ক'রে তোলে, তা নয়। তাদের পার্থিব অবস্থাই অধিকাংশ সময় শোচনীয়। তাদের দালাল ও বাড়িওয়ালিদের দ্বারা শোষিত হয়ে তারা বাস করে একটা নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে, এবং তাদের তিন-চতুর্থাংশই থাকে কপর্দকহীন। যে-চিকিৎসকেরা হাজার হাজার বেশ্যা পরীক্ষা করেছেন, তাঁদের মতে জীবনের পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ আক্রান্ত হয় উপদংশে। অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্করা, উদাহরণস্বরূপ, ভয়াবহভাবে সংক্রমণগ্রাহী; পঁচিশ শতাংশকে অস্ত্রোপচার করতে হয় গনরিয়াঘটিত জটিলতার জন্যে। বিশজনের মধ্যে একজনের আছে যক্ষ্মা; ষাট শতাংশ হয়ে ওঠে অতিপানাসক্ত বা মাদকাসক্ত; চল্লিশ শতাংশ মারা যায় চল্লিশ বছর বয়সের আগেই। আরো বলা দরকার যে, পূর্বসতর্কতা সত্ত্বেও, যখন তখন তারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তারা নিজেরা নিজেদের অস্ত্রোপচার করে, সাধারণত খুবই খারাপ পরিবেশে। সাধারণ বেশ্যাবৃত্তি একটা শোচনীয় বৃত্তি, যাতে যৌন ও আর্থিকভাবে শোষিত হয়ে, পুলিশের স্বেচ্ছাচারের শিকার হয়ে, অপমানজনক চিকিৎসামূলক পরিদর্শনের নিচে থেকে, খদ্দেরদের খেয়ালখুশির খাদ্য হয়ে, অবধারিত সংক্রমণ ও ব্যাধি, দুর্দশায় আক্রান্ত হয়ে নারী প্রকৃত অর্থেই হীন হয়ে নেমে যায় বস্তুর স্তরে।

সাধারণ বেশ্যা ও উচ্চ-শ্রেণীর হেতাইরার মধ্যে আছে বহু মাত্রাভেদ। মৌলিক পার্থক্যটি এখানে যে প্রথমটি ব্যবসা চালায় সরল সাধারণত্বের মধ্যে– নারী হিশেবে– যার ফল হচ্ছে প্রতিযোগিতা তাকে আটকে রাখে শোচনীয় অস্তিত্বের স্তরে; আর সেখানে দ্বিতীয়টি প্রচেষ্টা চালায় নিজের স্বীকৃতি লাভের জন্যে– একজন ব্যক্তি হিশেবে– এবং যদি সে সফল হয়, তাহলে সে উচ্চাভিলাষ পোষণ করতে পারে। রূপ ও মোহনীয়তা বা যৌনাবেদন এখানে আবশ্যক, তবে তা-ই যথেষ্ট নয় : নারীটিকে অবশ্যই হ'তে হবে *বিশিষ্ট*। একথা সত্য, তার গুণাবলি প্রায়ই প্রকাশিত হ'তে হবে কোনো পুরুষের কামনার মধ্য দিয়ে; তবে সে তখই 'পৌছোবে', তখনই সূচনা হবে তার কর্মজীবনের, বলতে গেলে, যখন পুরুষটি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করবে তার যোগ্যতার প্রতি। গত শতকে তার নিজ শহরের বাড়ি, তার গাড়ি, তার মণিমুক্তো সাক্ষ্য দিতো রক্ষকের ওপর 'রক্ষিতা নারী'র প্রভাবের এবং তাকে উন্নীত করতো দেমি-মঁদের স্তরে; যতো দিন পুরুষেরা তার জন্যে ধ্বংস করতে থাকতো নিজেদের ততো দিন দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হতো তার যোগ্যতা। সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তন লোপ করেছে এ-জৌলুসপূর্ণ ধরনটি। এখন আর এমন কোনো দেমি-মঁদ নেই, যার মধ্যে কোনো খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। উচ্চাভিলাষী নারীরা আজকাল খ্যাতি অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় একটা ভিন্ন রীতিতে। হেতাইরার সাম্প্রতিক প্রতিমূর্তি চিত্রতারকা। পাশে একটি স্বামী নিয়ে– যা কঠোরভাবে আবশ্যক হলিউডে– বা একটি দায়িত্বশীল পুরুষ বন্ধু নিয়ে, সে আছে ফ্রাইনি ও ইম্পেরিয়ার ধারায়। পুরুষের স্বপ্নে সে দান করে নারী, আর পুরুষ এর মূল্য পরিশোধ করে তাকে অর্থ ও খ্যাতি দিয়ে।

বেশ্যাবৃত্তি ও শিল্পকলার মধ্যে সব সময়ই আছে এক অস্পষ্ট সম্পর্ক, এ-কারণে যে সৌন্দর্য ও কামসুখ দ্ব্যর্থবোধকভাবে সম্পর্কিত। তবে, প্রকৃতপক্ষে, সৌন্দর্য কামনা জাগায় না; তবে প্রেমের প্লাতোনীয় তত্ত্ব কামুকতার যে-সত্যতাপ্রতিপাদন প্রস্তাব করেছে, তা ভণ্ডামোপূর্ণ। ফ্রাইনি যখন অ্যাথেন্সের আরিওপাগাসের বিচারকদের সামনে উন্মোচন করে তার বক্ষ এবং নিরপরাধ মুক্তি লাভ করে, তখন সে তাদের নিবিষ্টভাবে অবলোকন করতে দেয় একটি বিশুদ্ধ ভাব। অনাবৃত একটি দেহপ্রদর্শন হয়ে ওঠে এক শিল্পকলা প্রদর্শনী; মার্কিন বার্লেস্ক ন্যাংটো হওয়াকে পরিণত করেছে নাটকে। 'নগ্নিকা নিষ্পাপ,' ঘোষণা করে সে-বুড়ো ভদ্রলোকেরা, যারা 'শিল্পসম্মত নগ্নিকা'র নামে সংগ্রহ করে অশ্লীল ছবি। বেশ্যালয়ে বাছাইয়ের প্রথম দৃশ্যটি হচ্ছে একদল লোকের প্রদর্শনী; তা যদি একটু বেশি জটিল হয়, তাহলে এসব প্রদর্শনী খদ্দেরদের কাছে হয়ে ওঠে **'জীবন্ত ছবি'** বা **'শিল্পভঙ্গি'**।

যে-বেশ্যা ব্যক্তিগত মূল্য অর্জন করতে চায়, সে নিজেকে অক্রিয় মাংস প্রদর্শনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; সে চেষ্টা করে বিশেষ প্রতিভা দেখানোর। প্রাচীন গ্রিসের মেয়ে বাঁশরিবাদকেরা নাচগানে মুগ্ধ করতো পুরুষদের। আলজেরিয়ার আরব নারীরা দেখায় *দাঁস দ্য ভাঁত্র* (উদরনৃত্য); স্পেনের যে-মেয়েরা নাচে ও গান গায় বারিও চীনোতে, তারা নিতান্তই সুকুমারভাবে নিজেদের দান করে রসজ্ঞদের কাছে। জোলার নানা মঞ্চে আবির্ভূত হয় 'রক্ষক' পাওয়ার জন্যে। কিছু সঙ্গীতশালা– আগে যেমন ছিলো কিছু নৈশক্লাব– নিতান্তই বেশ্যালয়। যে-সব বৃত্তিতে নারীরা প্রদর্শনীয়, সেগুলো

ব্যবহার করা যেতে পারে নাগরালির জন্যে। প্রশ্নাতীতভাবে আছে অনেক মেয়ে– ট্যাক্সি নর্তকীরা, ফ্যান নর্তকীরা, ডিকয় মেয়েরা, দেয়ালে টাঙানোর ছবির মেয়েরা, মডেলরা, গায়িকারা, অভিনেত্রীরা– যারা পৃথক রাখে প্রেমের জীবন ও পেশা; পেশায় যতো বেশি দরকার পড়ে কৌশল ও সৃষ্টিশীলতা, তখন তাকেই লক্ষ্য ব'লে গণ্য করা যায়; কিন্তু যে-নারী জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয় জীবিকার জন্যে প্রায়ই সে তার রূপকে অধিকতর অন্তরঙ্গভাবে ব্যবসায় খাটানোর প্ররোচনা বোধ করে। উল্টোভাবে, বারবনিতা তার আসল ব্যবসা ঢাকার জন্যে চায় একটা বৃত্তি রাখতে। কলেতের লি, এক বন্ধু যাকে সম্বোধন করেছে 'প্রিয় শিল্পী', তার মতো কমই আছে যে উত্তর দিতে পারে : 'শিল্পী? সত্যিই, আমার প্রেমিকেরা চরম অবিবেচক!' আমরা দেখেছি যে হেতাইরার খ্যাতিই তাকে দেয় বিপণনযোগ্য দাম, এবং আজকাল মঞ্চে বা পর্দায়ই এমন একটা 'নাম' করা যায়, যা হয়ে উঠবে ব্যবসার পুঁজি।

সিন্ডেরেলা সব সময় মনোহর রাজকুমারের স্বপ্ন দেখে না: স্বামী বা প্রেমিক যা-ই হোক, নারী ভয় পায় যে তারা পরিণত হ'তে পারে স্বৈরাচারীতে; সে অনেক বেশি পছন্দ করে এটা স্বপ্ন দেখতে যে বিশাল প্রেক্ষাগারের দরোজার পাশে লাগানো আছে তার সহাস্য মুখচ্ছবি। তবে প্রায় অধিকাংশ সময়ই সে তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে পারে পুরুষের 'রক্ষণ'-এর মাধ্যমে; এবং পুরুষেরাই– স্বামী, প্রেমিক, প্রণয়প্রার্থীরা– তাকে বিজয়মুকুটে শোভিত ক'রে তাদের অর্থ বা খ্যাতির অংশী ক'রে। বিভিন্ন ব্যক্তি, বা জনতাকে খুশি করার এ-আবশ্যকতাই 'তারকা'কে সম্পর্কিত করে হেতাইরার সঙ্গে। তারা সমাজে পালন করে সমতুল্য ভূমিকা।

হেতাইরা শব্দটি আমি ব্যবহার করি সে-সব নারীদের বোঝানোর জন্যে, যারা শুধু দেহ নয়, বরং তাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়োগ করে শোষণের পুঁজি হিশেবে। হেতাইরা বিশ্বকে প্রকাশ করে না, সে মানবিক সীমাতিক্রমণতার কোনো সরণি উন্মুক্ত করে না; এর বিপরীতে, সে নিজের লাভের জন্যে সম্মোহিত করতে চায় বিশ্বকে। অনুরাগীদের কাছে সম্ভোগের জন্যে নিজেকে দান ক'রে, সে ত্যাজ্য করে না তার সে- অক্রিয় নারীত্বকে, যা তাকে উৎসর্গিত করে পুরুষের কাছে : সে একে সমৃদ্ধ করে এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায়, যা তাকে সমর্থ করে পুরুষদের তার রূপের ফাঁদে ধরতে ও তাদের ওপর ফায়দা লুটতে; সে নিজের সঙ্গে তাদের গ্রাস করে সীমাবদ্ধতায়।

যদি সে এ-পথ ধরে, তাহলে নারী সফল হয় কিছুটা স্বাধীনতা অর্জনে। বহু পুরুষের কাছে নিজেকে ভাড়া দিয়ে সে বিশেষ কারো অধীনে থাকে না; সে জমায় যে-টাকা ও যে-নাম 'বিক্রি করে', যেমন কেউ বিক্রি করে পণ্যসামগ্রী, তা তার আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। প্রাচীন গ্রিসের নারীদের মধ্যে যারা সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ করতো, তারা মাতৃকাও ছিলো না সাধারণ বেশ্যাও ছিলো না, তারা ছিলো হেতাইরা। রেনেসাঁসের বারবনিতারা ও জাপানের গেইশারা তাদের কালের অন্য নারীদের থেকে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতো। যে-ফরাশি নারীর স্বাধীনতাকে আমাদের কাছে পুরুষের স্বাধীনতার সমতুল্য ব'লে সবচেয়ে বেশি মনে হয়, তিনি সম্ভবত সতেরো শতকের বুদ্ধিমান ও রূপসী নারী নিনোঁ দ্য লঁক্ল। স্ববিরোধীরূপে, যে-নারীরা তাদের নারীত্বকে চূড়ান্তরূপে ব্যবহার করে, তারা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি

করে নিজেদের জন্যে, যা প্রায় পুরুষের পরিস্থিতির সমতুল্য; তারা শুরু করে সে-লিঙ্গ দিয়ে, যা তাদের কর্মরূপে সমর্পণ করে পুরুষদের কাছে, তারপর তারা হয়ে ওঠে কর্তা। তারা শুধু পুরুষদের মতো নিজেদের জীবিকাই অর্জন করে না, তারা বিরাজ করে এমন এক গোষ্ঠির ভেতরে, যা প্রায়-একান্তভাবে পুরুষের; তারা আচরণে ও আলাপচারিতায় স্বাধীন, তারা অর্জন করতে পারে– নিনোঁ দ্য লঁক্লর মতো– বিরলতম বুদ্ধিবৃত্তিগত মুক্তি। সবচেয়ে সম্মানিতরা প্রায়ই পরিবৃত থাকে শিল্পী ও লেখকদের দিয়ে, যারা ক্লান্তি বোধ করে 'সতী' নারীতে।

পুরুষদের কিংবদন্তি চরম মনোমোহন প্রতিমূর্তি লাভ করে হেতাইরায়; দেহে ও চেতনায় সে সকলের অপ্রাপণীয়, সে প্রতিমা, অনুপ্রেরণা, শিল্পকলার দেবী; চিত্রকর ও ভাস্কররা তাকে চাইবে মডেলরূপে; সে স্বপ্ন যোগাবে কবিদের মনে; তার ভেতরের বুদ্ধিজীবীটি সদ্ব্যবহার করবে নারীর 'বোধি'র সম্পদগুলো। মাতৃকার থেকে তার পক্ষে বুদ্ধিমান হওয়া সহজ, কেননা তার ভণ্ডামো কম। তাদের মধ্যে যারা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ, তারা শুধু পুরুষদের বিশ্বস্ত মন্ত্রণাদাতা ইজেরিয়ার ভূমিকায়ই সন্তুষ্ট থাকবে না; তারা চাইবে তাদের অক্রিয় গুণগুলোকে কর্মে রূপান্তরিত করতে। সার্বভৌম কর্তারূপে বিশ্বে বেরিয়ে এসে, তারা লেখে কবিতা ও গদ্য, ছবি আঁকে, সঙ্গীত সৃষ্টি করে। এভাবে ইতালীয় বারবনিতাদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ইম্পেরিয়া। নারীর পক্ষে পুরুষকে হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করা এবং পুরুষটির সহায়তায় তার পক্ষে পুরুষের কাজ সম্পন্ন করাও সম্ভব; ক্ষমতাশালী পুরুষদের প্রিয় রক্ষিতারা, তাদের শক্তিমান প্রেমিকদের মাধ্যমে, সব সময়ই অংশ নিয়েছে বিশ্বশাসনে।

এ-ধরনের নারীমুক্তি সার্থক হ'তে পারে কামের স্তরেও। পুরুষের থেকে সে পায় যে-অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা, তা দিয়ে সে ক্ষতিপূরণ করতে পারে তার নারীধর্মী হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষার; টাকার আছে একটি পবিত্রকর ভূমিকা; এটা অবসান ঘটায় দু-লিঙ্গের যুদ্ধের। বহু নারী, যারা পেশাদার নয়, তারা যখন তাদের প্রেমিকদের কাছে থেকে চেক ও উপহার লাভের জন্যে চাপ দেয়, তারা এটা শুধু ধনসম্পত্তির লোভে করে না; কেননা পুরুষটিকে অর্থ ব্যয়ে বাধ্য করা– এবং তার জন্যেও ব্যয় করা, আমরা দেখতে পাবো– হচ্ছে তাকে একটি হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা। এভাবে নারীটি এড়িয়ে যায় তার নারী হওয়ার ব্যাপারটি। পুরুষটি হয়তো ভাবতে পারে যে নারীটি 'আছে' তার, তবে এ-যৌন অধিকারকরণ একটি প্রতিভাস; বরং অধিকতর দৃঢ় আর্থিক ক্ষেত্রে নারীটির অধিকারেই আছে পুরুষটি। তৃপ্ত হয়েছে নারীটির গর্ব। সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে প্রেমিকের আলিঙ্গনে; এমন কোনো ইচ্ছের কাছে সে ধরা দিচ্ছে না, যা তার নিজের নয়; তার সুখ কোনো অর্থেই তার ওপর 'হানা' যাবে না; বরং এটাকে মনে হবে একটি অতিরিক্ত সুবিধা; সে 'নীত' হবে না, কেননা এর জন্যে তাকে দাম দেয়া হয়েছে।

বারবনিতা, অবশ্য, সুখ্যাত কামশীতল ব'লে। তার হৃদয় ও তার কামের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারা তার জন্যে উপকারী, কেননা সে যদি ভাবাবেগী বা কামনাপরায়ণ হয়, তাহলে তার ঝুঁকি থাকে একটা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে চ'লে যাওয়ার, যে তাকে শোষণ করবে বা তার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে বা তাকে দুঃখযন্ত্রণা

দেবে। যে-সব আলিঙ্গন সে গ্রহণ করে– বিশেষ ক'রে তার কর্মজীবনের শুরুতে– সেগুলোর অনেকগুলোই অবমাননাকর; পুরুষের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ প্রকাশ পায় তার কামশীতলতায়। হেতাইরারা, মাতৃকাদের মতো, যথেচ্ছ নির্ভর করে 'ছলচাতুরী'র ওপর, এর ফলে তারা ভাওতাবাজের মতো আচরণ করে। পুরুষদের প্রতি এ-ঘৃণা, এ-বিরাগ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে শোষক-শোষিতের খেলায় জয় সম্পর্কে এ-নারীরা আদৌ নিশ্চিত নয়। এবং, প্রকৃতপক্ষে, পরনির্ভরতা এখনো তাদের বিপুলসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাগ্য।

কোনো পুরুষই চূড়ান্তরূপে তাদের প্রভু নয়। কিন্তু পুরুষ পাওয়া তাদের জন্যে অতিশয় জরুরি। বারবনিতা তার ভরণপোষণের উপায় পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে যদি পুরুষ তার প্রতি আর কামনা বোধ না করে। নতুন পেশাগ্রহণকারী জানে তার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ পুরুষের হাতে; এমনকি পুরুষের সমর্থন বঞ্চিত হয়ে চিত্রতারকাও দেখতে পায় যে ম্লান হয়ে উঠছে তার মর্যাদা। এমনকি সবচেয়ে রূপসীটিও কখনো আগামী কালের জন্যে নিশ্চিত থাকতে পারে না, কেননা তার অস্ত্রগুলো যাদুধর্মী, আর যাদু অস্থিরমতি। সে দৃঢ়ভাবে বাঁধা তার রক্ষকের– স্বামী বা প্রেমিকের– সাথে, যেমন 'সতী' স্ত্রী বাঁধা থাকে স্বামীর সাথে। শয্যাসঙ্গিনী হিশেবেই সে শুধু পুরুষটিকে তার সেবাদানে বাধ্য নয়, তাকে সহ্য করতে হয় পুরুষটির চালচলন, তার আলাপচারিতা, তার বন্ধুদের, এবং বিশেষ ক'রে তার শ্লাঘার দাবিগুলো। মেয়েটির উঁচুখুড়ের জুতো বা সাটিনের স্কার্টের দাম শোধ ক'রে তার পৃষ্ঠপোষক বিনিয়োগ করে একটা পুঁজি, যা থেকে সে লাভ তুলবে; শিল্পপতি, প্রযোজক তার রক্ষিতাকে মুক্তো ও পশমে ঢেকে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে করে নিজের সম্পদ ও ক্ষমতার ঘোষণা; তবে নারীটি টাকা বানানোর একটা উপায়ই হোক বা টাকা ব্যয়ের একটা ছুতোই হোক, দাসত্বশৃঙ্খলটা একই। তার ওপর ঢেলে দেয়া উপহারগুলো শৃঙ্খল। আর এ-গাউনগুলো, এ-রত্নাবলি, যা সে পরে, সে কি আসলেই তার মালিক? অনেক সময় সম্পর্কচ্ছেদের পর পুরুষটি সেগুলো ফেরত চায়, যদিও খুবই ভদ্রভাবে।

তার আনন্দগুলো ছেড়ে না দিয়ে তার রক্ষককে 'ধ'রে রাখা'র জন্যে নারীটি প্রয়োগ করবে একই কূটকৌশল, ছলচাতুরি, মিথ্যাচার, ভণ্ডামো, যেগুলো কলুষিত করে বিবাহিত জীবনকে; সে যে শুধু ভান করে দাসত্বের, তার কারণ এ-খেলাটিই দাসত্বের। যতো দিন সে টিকিয়ে রাখে তার রূপ ও সুখ্যাতি, যদি তখনকার প্রভু ঘৃণ্য হয়ে ওঠে, তাহলে সে তার স্থানে নিতে পারে আরেকটি। তবে রূপ একটা দুশ্চিন্তা, এটা একটি ঠুনকো সম্পদ; হেতাইরা একান্তভাবেই নির্ভর করে তার দেহের ওপর, সময়ের সাথে নির্মমভাবে যার দাম প'ড়ে যায়; বুড়ো হওয়ার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ধারণ করে চরম নাটকীয় রূপ। যদি তার মহামর্যাদা থাকে, তাহলে সে তার মুখমণ্ডল ও দেহকাঠামোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পরও টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু খ্যাতি টিকিয়ে রাখা, যা তার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি, তাকে অধীনস্থ করে নিকৃষ্টতম স্বেচ্ছাচারিতার : জনমতের। হলিউডের তারকাদের অধীনতা সুবিদিত। তাদের দেহ তাদের নিজেদের নয়: প্রযোজক ঠিক করে তাদের চুলের রঙ, তাদের ওজন, তাদের দেহবল্লরী, তাদের ধরন; গালের বাঁক বদল করার জন্যে তুলে ফেলা হ'তে পারে তাদের দাঁত। স্বল্পাহার,

শরীরচর্চা, লাগসই থাকা, হয়ে ওঠে এক দৈনিক ভার। পার্টিতে যাওয়া ও ফষ্টিনষ্টি করার নাম দেয়া হয় 'সশরীরে আত্মপ্রকাশ'; ব্যক্তিগত জীবন হয়ে ওঠে বাহ্যজীবনের একটি দিক। ফ্রান্সে কোনো লিখিত নিয়ম নেই, তবে ধূর্ত ও চতুর নারী জানে তার 'প্রচার' কী দাবি করে তার কাছে। যে-তারকা এসব প্রয়োজনের কাছে সুনম্য হ'তে অস্বীকার করে, সে ভোগ করে একটি নৃশংস বা ধীর, তবে অবধারিত, সিংহাসনচ্যুতি। জনগণের মনোরঞ্জন যে-নারীর পেশা, তার থেকে সম্ভবত কম ক্রীতদাস একটি বেশ্যা, যে দান করে তার দেহ। কোনো নারী, যে 'আবির্ভূত' হয়েছে এবং যাকে বিশেষ কোনো পেশায়– অভিনয়, গান, নাচে– প্রতিভাসম্পন্ন ব'লে গণ্য করা হয়, সে মুক্তি পায় হেতাইরার অবস্থান থেকে; সে উপভোগ করতে পারে প্রকৃত স্বাধীনতা। কিন্তু অধিকাংশই তাদের জীবনভর থাকে এক আশঙ্কাজনক অবস্থায়, তারা থাকে জনগণের ও পুরুষদের নব নবরূপে মনোরঞ্জনের অন্তহীন আবশ্যকতার নিচে।

প্রায়ই রক্ষিতা নারী আত্মস্থ ক'রে নেয় তার পরনির্ভরতা; জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সে মেনে নেয় এর মূল্যবোধগুলো; সে অনুরাগী হয় ফ্যাশনদুরস্ত সমাজের এবং গ্রহণ করে এর রীতিনীতি; সে চায় যে তাকে মূল্যায়ন করা হোক বুর্জোয়া মানদণ্ডের ভিত্তিতে। ধনশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর একটি পরগাছা হয়ে সে গ্রহণ করে মধ্যবিত্তের ভাবনাচিন্তা; সে 'সৎ-চিন্তাশীল'; কিছুকাল আগে সে তার কন্যাকে পড়াতো কনভেন্টে এবং বুড়ো হওয়ার পর, যথোচিত প্রচারের মধ্যে ধর্মান্তরগ্রহণ ক'রে, যোগ দিতো খ্রিস্টের নৈশভোজপর্ব উদযাপনে। সে থাকে রক্ষণশীলদের পক্ষে। জোলা এ-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন *নানার* নায়িকার মধ্যে :

> বই ও নাটকের বিষয় সম্পর্কে নানার ছিলো সুনির্দিষ্ট মত : সে চাইতো কোমল ও মানসিক উন্নতিসাধক শৈলির বই, এমন সব জিনিশ যা তাকে স্বপ্ন দেখাতো ও তার আত্মার নৈতিক উন্নতিসাধন করতো... সে ক্ষুব্ধ ছিলো প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। ওই শুয়োরগুলো যারা কখনো স্নান করতো না, কী তারা চেয়েছিলো? জনগণ কি সুখী ছিলো না, সম্রাট কি সব কিছু করে নি তাদের জন্যে? আস্ত শুয়োরের পাল, এই জনগণ! সে তাদের চিনতো, সে আপনাকে তাদের সম্পর্কে সব কিছু ব'লে দিতে পারতো... না, সত্যিই, তাদের প্রজাতন্ত্র সকলের জন্যে হতো একটা মহাবিপর্যয়। হে আমার ঈশ্বর, যতো কাল সম্ভব আমার সম্রাটকে রক্ষা করো।

যুদ্ধের সময় এ-সহজ সতী নারীদের থেকে অধিকতর আক্রমণাত্মক দেশপ্রেম আর কেউ দেখায় না; ভাবালুতার যে-প্রভাব তারা বিস্তার করে, তা দিয়ে তারা আশা করে তারা উঠবে ডাচিসের স্তরে। জনসভায় তাদের বক্তৃতার ভিত্তি হয় গতানুগতিকতা, বহুলব্যবহৃত ধরতাই বুলি, পক্ষপাতদুষ্টতা, এবং প্রথাসম্মত ভাবাবেগ, এবং প্রায়ই তারা হারিয়ে ফেলে আন্তর আন্তরিকতা। মিথ্যাচারিতা ও অতিরঞ্জনের মধ্যে তাদের ভাষা হারিয়ে ফেলে সর্ববিধ অর্থ। হেতাইরার সমগ্র জীবনটিই একটা প্রদর্শনী; তার মন্তব্যরাশির, তার তোতাপাখির মতো বুলি আবৃত্তির লক্ষ্য চিন্তা প্রকাশ করা নয়, বরং একটা প্রভাব সৃষ্টি করা। তার রক্ষকের সাথে সে অভিনয় করে প্রেমের কমেডির। কখনো কখনো সে এটাকে গ্রহণ করে গুরুত্বের সাথে। জনমতের কাছে সে অভিনয় করে শ্রদ্ধেয় ও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কমেডির, এবং পরিশেষে সে বিশ্বাস করতে থাকে যে সে নিজে হচ্ছে সদগুণের পরমোৎকর্ষের এক মূর্ত রূপ এবং একটি পবিত্র

মূর্তি। প্রতারণা করার এক অনড় উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করে তার আন্তর জীবনকে এবং তার ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারগুলোকে প্রতিভাত করে সত্য ব'লে।

হেতাইরার সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য শুধু এটাই নয় যে তার স্বাধীনতা হচ্ছে সহস্র পরাশ্রিততার প্রতারণামূলক মুদ্রার নকশাখচিত পিঠ, বরং এটাও যে এ-স্বাধীনতা নিজেই নেতিবাচক। রাশেলের মতো অভিনেত্রীদের, আইসোডোরা ডাঙ্কানের মতো নর্তকীদের, যদিও তাঁরা পুরুষদের আনুকূল্য পেয়েছিলেন, আছে এমন এক পেশা, যার জন্যে দরকার যোগ্যতা এবং এটাই তাঁদের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। তাঁরা যে-কাজ করেন ও ভালোবাসেন, তার মধ্যে অর্জন করেন সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক স্বাধীনতা। তবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর জন্যে কোনো শিল্পকলা, কোনো পেশা, একটা উপায় মাত্র : এর চর্চার মধ্যে তারা কোনো প্রকৃত কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকে না। বিশেষ ক'রে চলচ্চিত্রে, যাতে তারকা থাকে পরিচালকের অধীনে, তার পক্ষে কোনো উদ্ভাবনই সম্ভব নয়, কোনো সৃষ্টিশীল কাজ সম্ভব নয়। সে যা, তা ব্যবহার করে *অন্য কেউ*; সে নতুন কিছু সৃষ্টি করে না। তবু নারীর পক্ষে তারকা হওয়াও খুবই বিরল ঘটনা। নাগরালির ক্ষেত্রে সীমাতিক্রমণতার অভিমুখে কোনো রকমের পথ খোলা নেই। এখানে আবার সীমাবদ্ধতায় বন্দী নারীর সঙ্গী হয়ে ওঠে অবসাদ। নানা সম্পর্কে জোলা এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন :

> কিন্তু তার বিলাসব্যসনের মধ্যে, এ-রাজসভার মধ্যে, নানা বোধ করতো মৃত্যুর ক্লান্তি। রাতের প্রতিটি মুহূর্তে তার পাশে ছিলো পুরুষ এবং সবখানে ছিলো টাকা, এমনকি তার আলমারির দেরাজের ভেতরেও, কিন্তু এসব আর তাকে সুখী করতো না, সে বোধ করতো একটা আন্তর শূন্যতা, এমন একটা শূন্যতাবোধ যাতে সে হাই তুলতো। একই একঘেয়ে সময়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আলস্যের মধ্যে মন্থরগতিতে চলতো তার জীবন... সে সময় কাটতো তুচ্ছ হাস্যকৌতুকের মধ্যে তার একমাত্র প্রত্যাশায়, পুরুষের।

মার্কিন সাহিত্যে পাওয়া যায় এ-ঘন অবসাদের বহু বর্ণনা, যা বিহ্বল করে হলিউডকে ও পৌম্পেয়োর সাথেসাথে দখল করে ভ্রমণকারীকে। অভিনয়কারীরা এবং অতিরিক্তরাও ক্লান্ত হয়ে ওঠে সে-নারীদের মতো, যাদের পরিস্থিতির তারা অংশীদার। যেমন ঘটে ফ্রান্সে, অফিসীয় পার্টিগুলোর প্রকৃতি প্রায়ই হয় ক্লান্তিকর দায়িত্বপালন। কোনো 'ক্ষুদে তারকা'র জীবন নিয়ন্ত্রণ করে যে-পৃষ্ঠপোষক, সে সাধারণত হয় বয়স্ক পুরুষ, যার বন্ধুরা তার বয়সের; তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো তরুণীটির কাছে অপরিচিত, তাদের আলাপচারিতা ভয়াবহ; সাধারণ বিয়ের থেকেও গভীরতর একটি ফারাক থাকে বিশ বছরের একটি শিক্ষানবিশ ও পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি ব্যাংকব্যবসাদারের মধ্যে, যারা একত্রে কাটায় তাদের রাত্রিগুলো।

হেতাইরা যে-মোলোকের কাছে উৎসর্গ করে তার সুখ, প্রেম, স্বাধীনতা, তা হচ্ছে তার কর্মজীবন। মাতৃর আদর্শ হচ্ছে সুখসমৃদ্ধির একটি স্থিত জলবায়ু, যা ঢেকে রাখে স্বামী ও সন্তানদের সাথে তার সম্পর্ককে। 'কর্মজীবন' সময়ের সাথে বৃদ্ধি পায়, তবে এটাও একটি সীমাবদ্ধ লক্ষ্য, যা সংহতরূপ নেয় একটি নামে। সামাজিক মানদণ্ড বেয়ে যতোই ওপর থেকে ওপরে উঠতে থাকে নামটি ততোই বৃহত্তর হ'তে থাকে বিজ্ঞাপনমঞ্চে ও সর্বসাধারণের মুখে। আরোহণকারিণী তার ব্যবসা চালিয়ে যেতে

থাকে, তার মেজাজ অনুসারে, দূরদর্শিতা বা স্পর্ধার সাথে। এক নারী তার কর্মজীবনে আলমারিতে চমৎকার পোশাকপরিচ্ছদ ভাঁজ ক'রে রেখে উপভোগ করে গৃহিণীর সুখ; আরেকজন, উপভোগ করে অভিযাত্রার মাদকতা। কিছু নারী নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে নিরন্তর আক্রান্ত একটি পরিস্থিতিকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার জন্যে, যা অনেক সময় ভেঙেচুরে পড়ে; অন্যরা অন্তহীনভাবে গড়তে থাকে তাদের খ্যাতি, আকাশ-অভিমুখি বাবেলের অট্টালিকার মতো নিরর্থকভাবে। অনেকে, যারা নাগরালির সাথে যুক্ত করে তাদের অন্যান্য কর্ম, তাদেরই মনে হয় প্রকৃত অভিযাত্রিণী : এরা হচ্ছে গুপ্তচর, মাতা হারির মতো, বা নিজ সরকারের পক্ষে গুপ্তচর। সাধারণভাবে তাদের পরিকল্পনাগুলো সূচনার দায় তাদের নয়, তারা বরং পুরুষের হাতে হাতিয়ারের মতো। তবে, মোটের ওপর, হেতাইরার মনোভাব কম-বেশি অভিযাত্রীর মনোভাবের সমগোত্রীয়; তার মতো, সে প্রায়ই *একাগ্রচিত্ত* ও *রোমাঞ্চ*-এর মাঝামাঝি; তার লক্ষ্য গতানুগতিক মূল্যবোধ, যেমন টাকা ও খ্যাতি। পুরুষের প্রতি নিবেদিত নারীর নিয়তি হচ্ছে তার মনে হানা দিতে থাকে প্রেম; তবে যে-নারী শোষণ করে পুরুষকে, সে তার নিজের প্রতি ভক্তিনিবেদনের ফলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তার খ্যাতির কারণে যদি সে বিবেচিত হয় অতিশয় মূল্যবান ব'লে, তবে তা একান্তভাবে আর্থিক কারণে নয়– সে খ্যাতির মধ্যে চায় তার আত্মরতিকে মহিমান্বিত করতে।

পরিচ্ছেদ ৫

প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য

নারীর ব্যক্তিগত জীবন-ইতিহাস– কেননা সে আজো বদ্ধ তার নারীধর্মী ভূমিকায়– পুরুষের থেকে অনেক বেশি মাত্রায় নির্ভর করে তার শারীরবৃত্তিক নিয়তির ওপর; এবং এ-নিয়তির বক্ররেখা অনেক বেশি বিষম, অধিকতর অধারাবাহিক পুরুষের নিয়তির বক্ররেখার থেকে। নারীর জীবনের প্রতিটি পর্ব সমরূপ ও একঘেয়ে; তবে স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়ার ক্রান্তিকালগুলো বিপজ্জনকভাবে আকস্মিক; এগুলো দেখা দেয় সংকটরূপে– বয়ঃসন্ধি, কামদীক্ষা, ঋতুবন্ধ– পুরুষের মধ্যে যা ঘটে, তার থেকে এগুলো অনেক বেশি চূড়ান্তধর্মী। পুরুষ যেখানে ধীরেধীরে বৃদ্ধ হয়, সেখানে নারী হঠাৎ বঞ্চিত হয় তার নারীত্ব থেকে; সমাজের ও তার নিজের দৃষ্টিতে যা প্রতিপন্ন করে তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য ও তার সুখলাভের সুযোগ, সে-কামাবেদনশীলতা ও উর্বরতা সে হারায় আপেক্ষিকভাবে তরুণ বয়সেই। ভবিষ্যৎহীন, তখনো তার সামনে বেঁচে থাকার জন্যে প'ড়ে থাকে তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের প্রায় অর্ধেকটা।

'বিপজ্জনক বয়স'টা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে কিছু জৈবিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে, তবে এগুলোকে যা গুরুত্বপূর্ণ ক'রে তোলে, তা হচ্ছে এগুলোর প্রতীকী তাৎপর্য। 'জীবন বদল'-এর সংকট অনেক কম তীব্রভাবে অনুভব করে সে-সব নারী, যারা তাদের সব কিছু বাজি ধরে নি নারীত্বের ওপর; যারা গুরুভার কাজে নিয়োজিত– ঘরে বা বাইরে– তারা এ-মাসিক ভার লোপ পাওয়াকে স্বস্তির সাথে স্বাগত জানায়; কৃষক নারী, শ্রমজীবীর স্ত্রী, যারা ধারাবাহিকভাবে থাকে নতুন গর্ভধারণের ভীতির নিচে, তারা সুখবোধ করে, যখন অবশেষে তাদের আর বিপদের ঝুঁকি থাকে না।

পরিণামের অঙ্গচ্ছেদের অনেক আগে থেকেই নারীর ভেতরে হানা দিতে থাকে বুড়ো হওয়ার ভয়। প্রৌঢ় পুরুষ ব্যস্ত থাকে প্রেমের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর্মোদ্যোগে; এ-সময়ে তার কামের ব্যগ্রতা অনেক কম থাকে যৌবনের থেকে; এবং যেহেতু তার মধ্যে থাকে না বস্তুর অক্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলো, তাই তার মুখমণ্ডল ও শরীরের বদলে তার আকর্ষণীয়তা নষ্ট হয় না। এর বিপরীতে, সাধারণত পঁয়ত্রিশ বছরের দিকে, অবশেষে যখন জয় করা হয়েছে সব সঙ্কোচ, তখন নারীর মধ্যে অর্জিত হয় কামের পূর্ণবিকাশ। তখনই তার কামাবেগগুলো হয় তীব্রতম এবং সে প্রবলতমভাবে কামনা করে সেগুলোর পরিতৃপ্তি। কী হবে তার, যদি তার পুরুষটির ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকে? সে উদ্বেগের সাথে নিজেকে জিজ্ঞেস করে এ-প্রশ্নটিই, যখন অসহায়ভাবে সে দেখতে থাকে অবক্ষয়গ্রস্ত হচ্ছে সে-মাংসল বস্তুটি, যার সাথে সে অভিন্ন ক'রে তুলেছে নিজেকে। সে শুরু করে একটা যুদ্ধ। তবে কখনোই চুলের

কলপ, ত্বকচর্চা, রূপাস্ত্রোপচার কিছুতেই তার মুমূর্ষু যৌবনকে প্রলম্বিত করার বেশি কিছু করতে পারে না। তবে সে অন্তত তার আয়নাটিকে ফাঁকি দিতে পারে। কিন্তু যখন প্রথম আভাস দেখা দেয় নিয়তিনির্ধারিত ও অনিবর্তনীয় সে-প্রক্রিয়ার, যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে দেবে বয়ঃসন্ধির কালে নির্মিত সৌধটি, সে বোধ করে মৃত্যুর আপন করাল স্পর্শ।

কারো কারো মনে হ'তে পারে যে-নারী তার যৌবন ও রূপে বোধ করে অতি-আকুল পরমানন্দ, সে-ই হবে সবচেয়ে বিপর্যস্ত; তবে আদৌ তা নয় : আত্মরতিবতী তার দেহ সম্পর্কে এতো ভাবিত থাকে যে তার পক্ষে তার দেহের অবধারিত অবক্ষয়ের ব্যাপারটি আগেই না-জানার এবং পিছু হটার জন্যে প্রস্তুতি না-নেয়ার কথা নয়। এটা সত্য তার অঙ্গহানিতে সে কষ্ট পাবে, তবে অন্তত সে অতর্কিতে ধরা পড়বে না, এবং সে অবিলম্বেই নিজেকে মানিয়ে নেবে। যে-নারী ছিলো আত্মবিস্মৃত, একান্তভাবে নিয়োজিত, আত্মোৎসর্গকারী, সে বরং অনেক বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এ-আকস্মিক গুপ্তকথা প্রকাশ পাওয়ায় : 'যাপনের জন্যে আমার ছিলো মাত্র একটি জীবন; ভেবো দ্যাখো কী ছিলো আমার ভাগ্য, আর এখন তাকিয়ে দ্যাখো আমার দিকে!' বিস্ময়ে সবাই দেখতে পায় তার মধ্যে ঘটছে এক আমূল পরিবর্তন : যা ঘটেছে তা হচ্ছে, যে-বৃত্তি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো, সেটা থেকে উৎখাত হয়ে, তার পরিকল্পনাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে, নিরুপায়ভাবে সে হঠাৎ নিজের মুখোমুখি দেখতে পায় নিজেকে। যে-মাইলফলকে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সে প'ড়ে গেছে, তার মনে হয় সেটি পেরিয়ে তার সুদিনগুলোর পর বেঁচে থাকা ছাড়া তার জন্যে করার মতো আর কিছু রইলো না; তার দেহ কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে না; যে-সব স্বপ্ন, যে-সব আকুল আকাঙ্খা অপূর্ণ রয়ে গেছে, সেগুলো চিরকাল অপূর্ণ রয়ে যাবে। এ-পরিপ্রেক্ষিতে সে বিচার করে অতীতকে; খাতার এক দিক থেকে অন্য দিকে টানতে হবে একটি রেখা, তার হিশেব মেলাতে হবে; সে মেলায় তার বইগুলো। এবং জীবন তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে যে-সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা, তাতে সে মর্মহত হয়।

শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে, নারী ফিরে ফিরে স্মরণ করে তার যৌবনের গল্পগুলো, এবং মা-বাবা, তার ভাইবোনের জন্যে যে-ভাবাবেগগুলো ঘুমিয়ে ছিলো দীর্ঘকাল ধ'রে, সেগুলো এখন আবার জেগে ওঠে। অনেক সময় সে নিজেকে সমর্পণ করে স্বপ্নাতুর ও অক্রিয় বিষণ্নতার কাছে। তবে প্রায়ই সে হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে ওঠে তার হারানো অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। সে বেশ ঘটা ক'রে প্রদর্শন করতে থাকে তার এ-ব্যক্তিত্ব, যা সে তার ভাগ্যের হীনতার সঙ্গে তুলনা ক'রে এইমাত্র আবিষ্কার করেছে; সে ঘোষণা করে এর গুণাবলি, সে উদ্ধতভাবে সুবিচার দাবি করে। অভিজ্ঞতায় পরিপক্ব হয়ে, সে বোধ করে যে অবশেষে সে যোগ্য হয়ে উঠেছে বিখ্যাত হওয়ার; সে আবার কাজে নামবে। এবং সর্বপ্রথম, সকরুণ ব্যগ্রতায় সে ফেরাতে চায় সময়ের প্রবাহ। মাতৃধর্মী নারী দাবি করবে সে এখনো সন্তানধারণে সক্ষম : সে সংরক্তভাবে চেষ্টা করে আবার জীবন সৃষ্টির। ইন্দ্রিয়াতুর নারী প্রয়াস চালাবে আরেকটি প্রেমিককে ফাঁদে ফেলতে। ছেনাল এ-সময় আগের থেকে অনেক বেশি চেষ্টা করবে অন্যদের খুশি করার। তারা ঘোষণা করে যে এতো তারুণ্য তারা

আগে আর কখনো বোধ করে নি। তারা অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে সময়ের প্রবাহ আসলেই তাদের স্পর্শ করতে পারে নি; তারা 'তরুণী সাজতে' শুরু করে, তারা শিশুসুলভ হাবভাব ধরে। বার্ধক্যের দিকে অগ্রসরমাণ নারী বেশ জানে যদি সে আর কামসামগ্রি না থাকে, তা শুধু এজন্যে নয় যে পুরুষদের দেয়ার মতো তার মাংসের আর টাটকা অপরিমেয় সম্পদ নেই; বরং এজন্যেও যে তার অতীত, তার অভিজ্ঞতা তাকে, ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয়, পরিণত করেছে একটি ব্যক্তিতে; সে নিজের জন্যে সংগ্রাম করেছে, ভালোবেসেছে, ইচ্ছে পোষণ করেছে, উপভোগ করেছে। এ-স্বাধীনতা ভীতিপ্রদ; সে এটা অস্বীকার করতে চায়; সে তার নারীত্বকে অতিরঞ্জিত ক'রে তোলে, সে নিজেকে সাজায়, সে সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে নিজেকে ক'রে তুলতে চায় মনোমোহিনী, রূপসী, বিশুদ্ধ সীমাবদ্ধতা। সে পুরুষদের সাথে শিশুসুলভ আধো-আধোভাবে কথা বলে এবং তাকায় সরল অনুরাগের দৃষ্টিতে, এবং সে ছোটো মেয়েটির মতো অনর্থক বকবক করতে থাকে; কথা বলার বদলে সে কিচিরমিচির করে, সে করতালি দেয়, সে হাসিতে ফেটে পড়ে। এক ধরনের আন্তরিকতার সাথেই সে অভিনয় করে এ-কমেডির। তার নতুন আগ্রহগুলো, পুরোনো নিত্যনৈমিত্তকতা থেকে তার মুক্তি পাওয়ার ও নতুনভাবে শুরু করার বাসনা তাকে এমন অনুভূতি দেয় যেনো সে আবার শুরু করছে জীবন।

কিন্তু আসলে প্রকৃত শুরুর প্রশ্নই ওঠে না; বিশ্বে সে এমন কোনো লক্ষ্য দেখতে পায় না মুক্ত ও কার্যকর রীতিতে যে-দিকে সে এগোতে পারে। তার কার্যকলাপ ধারণ করে বাতিকগ্রস্ত, অসমঞ্জস, ও নিষ্ফল রূপ, কেননা সে অতীতের ভুল ও ব্যর্থতাগুলোর ক্ষতিপূরণ করতে পারে শুধু প্রতীকী উপায়ে। একদিকে, যে-বয়সের নারীর কথা আমরা বিবেচনা করছি, খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে সে পূরণ করার চেষ্টা করবে তার শৈশব ও কৈশোরের সাধগুলো : সে ফিরে যেতে পারে তার পিয়ানোর কাছে, শুরু করতে পারে ভাস্কর্য, লেখা, ভ্রমণ, সে স্কি-করা শিখতে শুরু করতে পারে বা শিখতে পারে বিদেশি ভাষা। সে এখন দু-বাহু মেলে স্বাগত জানায়– আবারও খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে– সে-সব কিছুকে, যা থেকে আগে সে বঞ্চিত করেছে নিজেকে। যে-পতিকে সে আগে সহ্য করতে পারতো, তার প্রতি এখন সে বিরক্ত এবং কামশীতল হয়ে ওঠে তার সঙ্গে; বা, এর বিপরীতে, সে প্রকাশ করতে থাকে প্রবল আবেগ, যা সে আগে বশে রাখতো এবং তার দাবিদাওয়ায় বিহ্বল ক'রে তোলে স্বামীকে; সে শুরু করে হস্তমৈথুন, শৈশব থেকে যার চর্চা সে ছেড়ে দিয়েছে। সমকামী প্রবণতা– ছদ্মবেশী রূপে যা বিরাজ করে সব নারীর মধ্যে– এখন দেখা দেয়। সে প্রায়ই এটা নিয়োগ করে তার কন্যার প্রতি; তবে অনেক সময় এ-অনভ্যস্ত আবেগ চালিত হয় কোনো বান্ধবীর প্রতি। *কাম, জীবন, ও ধর্মবিশ্বাস*-এ রোঁ লাঁদো বলেছেন নিচের গল্পটি, যা তাঁকে বিশ্বাস ক'রে বলেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি :

মিসেস ক... এগোচ্ছিলেন পঞ্চাশের দিকে; পঁচিশ বছর ধ'রে তিনি বিবাহিত, তিনটি বড়ো সন্তান ছিলো, এবং তিনি বিশিষ্ট ছিলেন সামাজিক ও দাতব্য কর্মকাণ্ডে। লন্ডনে তাঁর দেখা হয় তাঁর থেকে দশ বছরের ছোটো এক মহিলার সাথে, যাঁর ছিলো একই ধরনের আগ্রহ, মিসেস খ, যিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর বাড়িতে। নিমন্ত্রণের দ্বিতীয় সন্ধ্যায় মিসেস ক হঠাৎ দেখেন তিনি সংরক্তভাবে আলিঙ্গন

ক'রে আছেন তাঁর নিমন্ত্রণকর্ত্রীকে; তিনি তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং রাতটি তাঁর সাথে যাপন করেন, তারপর আতঙ্কিত হয়ে গৃহে ফেরেন। এ-পর্যন্ত তিনি সমকাম সম্পর্কে অজ্ঞই ছিলেন, জানতেন না যে 'এমন জিনিশ' আছে। তিনি সংরক্তভাবে ভাবতে থাকেন মিসেস খ-র কথা এবং জীবনে এই প্রথম তাঁর স্বামীর অভ্যস্ত চুম্বন ও স্পর্শাদর তাঁর কাছে অপ্রীতিকর লাগে। 'সব কিছু সমাধান করার জন্যে' তিনি আবার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে মনস্থ করেন, এবং এতে শুধু তাঁর সংরাগ বাড়তেই থাকে; এ-পর্যন্ত যা কিছু তিনি উপভোগ করেছেন তার থেকে অনেক বেশি সুখকর ছিলো তাঁদের সম্পর্ক। তিনি পাপ করেছেন, এ-ভাবনায় পীড়া বোধ করতে থাকেন এবং তার অবস্থার 'কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' আছে কি-না এবং নৈতিকভাবে তার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা যায় কি-না এটা জানার জন্যে তিনি দেখা করেন একজন চিকিৎসকের সাথে।

এ-ক্ষেত্রে বিষয়ী সাড়া দিয়েছে এক স্বতস্ফূর্ত প্রবর্তনার প্রতি এবং নিজে এতে বিপর্যস্ত হয়েছে গভীরভাবে। তবে প্রায়ই নারী স্বেচ্ছায় লাভ করতে চায় তার অজ্ঞাত সে-রোমাঞ্চকর ঘটনার বাস্তবিক অভিজ্ঞতা, শিগগিরই যা লাভের সামর্থ তার থাকবে না। সে কখনো কখনো অনুপস্থিত থাকে তার বাড়ি থেকে, কেননা তার মনে হয় বাড়িটা তার অযোগ্য এবং যেহেতু সে একলা থাকতে চায়, এবং কখনো কখনো অনুপস্থিত থাকে রোমাঞ্চকর ঘটনার খোঁজে। সে যদি তা পায়, তাহলে তাতে নিজেকে ছুঁড়ে দেয় উন্মুখতার সঙ্গে। এমন ঘটে স্টেকেলের এক রোগীর ক্ষেত্রে :

চল্লিশ বছরের এক নারী, বিশ বছর ধ'রে বিবাহিত ও যার আছে বড়ো সন্তান, সে বোধ করতে শুরু করে যে সে মূল্য পায় নি এবং সে তার জীবন অপচয় করেছে। সে নতুন কর্মকাণ্ড শুরু করে এবং, একদিকে, স্কি করার জন্যে যায় পর্বতে। সেখানে তার পরিচয় হয় তিরিশ বছরের একটি পুরুষের সাথে এবং সে হয়ে ওঠে তার রক্ষিতা।

যে-নারী থাকে সুরুচি ও মানমর্যাদার কঠোর প্রথার প্রভাবের ভেতরে, সে সব সময় বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটানোর মতো চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় না। তবে তার স্বপ্নগুলো ভরা থাকে কামাতুর ছায়ামূর্তিতে, যেগুলোকে সে জাগ্রত অবস্থায়ও মনে মনে ভাবে; সে তার সন্তানদের প্রতি দেখায় অতি ব্যাকুল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্নেহ; সে নিজের পুত্রের প্রতি লালন করে অজাচারী আবিষ্টতা; সে গোপনে একের পর এক যুবকের প্রেমে পড়তে থাকে; কিশোরীর মতো তার মনে হানা দিতে থাকে ধর্ষিত হওয়ার ভাবনা; বেশ্যাবৃত্তি করার উন্মত্ত বাসনাও তাকে পেয়ে বসে। তার বাসনা ও ভীতির পরস্পর বিপরীত মূল্য সৃষ্টি করে এমন উদ্বেগ, যার ফলে ঘটতে পারে মনোবিকলন : তখন সে তার অদ্ভুত আচরণ দিয়ে মর্মাহত করে আত্মীয়স্বজনদের, যা আসলে তার কাল্পনিক জীবনের প্রকাশ মাত্র।

এ-বিঘ্নিত সময়ে কাল্পনিক ও বাস্তবিকের মধ্যবর্তী সীমানা অনেক বেশি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে বয়ঃসন্ধির কালের থেকেও। বার্ধক্যের দিকে অগ্রসরমাণ নারীর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিব্যক্তিকীকরণবোধ, যা নষ্ট ক'রে দেয় তার সমস্ত বস্তুনিষ্ঠতা। যে-সব স্বাস্থ্যবান মানুষও মৃত্যুর কাছাকাছি উপনীত হয়েছে, তারাও বলে যে তারা বোধ করেছে এক ধরনের উদ্ভট দ্বৈতানুভূতি; যখন কেউ নিজেকে বোধ করে একটি সচেতন, সক্রিয়, স্বাধীন সত্তা, তখন যে-অক্রিয় বস্তুর ওপর ক্রিয়া করতে থাকে চরম বিপর্যয়, সেটিকে মনে হয় যেনো আরেকজন : একটা গাড়ি যাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, সে আমি নই; আয়নায় দেখা যাচ্ছে যে-বুড়ীকে, সে আমি হ'তে পারি না!

যে-নারী 'তার জীবনে কখনো এতো তারুণ্য অনুভব করে নি' এবং যে নিজেকে কখনো এতো বুড়ো দেখে নি, সে তার এ-দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সফল হয় না; যেনো একটা স্বপ্নের মধ্যে সময় উড়ে চ'লে যায় এবং সময়কালটা অতর্কিতে হামলা চালায় তার ওপর। তাই বাস্তবতা পিছু হটে ও ক্ষীণ হয়ে ওঠে, এবং একই সময়ে একে আর প্রতিভাস থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করা যায় না। এ-অদ্ভুত বিশ্বে যেখানে সময় বয়ে চলে পেছনের দিকে, যেখানে তার ডবলকে আর তার মতো দেখায় না, যেখানে পরিণতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সাথে, তাতে আস্থা পোষণ না ক'রে বরং সে আস্থা পোষণ করে তাতে, যা স্পষ্ট তার আন্তর দৃষ্টির কাছে। তাই তার ঘটতে থাকে তুরীয়ানন্দবোধ, সে হ'তে থাকে অনুপ্রাণিত, বোধ করতে থাকে ক্ষিপ্ত উন্মত্ততা। এবং যেহেতু আগের যে-কোনো সময়ের থেকে এ-সময়ে তার প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রেম, তাই তার পক্ষে স্বাভাবিক এ-প্রতিভাসকে আলিঙ্গন করা যে কেউ তাকে ভালোবাসে। দশজনের মধ্যে ন-জন কামোন্মাদই নারী, এবং এদের অধিকাংশই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক।

তবে এতোটা সাহসে বাস্তবতার দেয়াল ডিঙোনোর সামর্থ্য সকলের থাকে না। এমনকি স্বপ্নেও সমস্ত মানবিক প্রেমবঞ্চিত হয়ে বহু নারী সাহায্যের জন্যে নির্ভর করে বিধাতার ওপর; ঠিক ঋতুস্রাবনিবৃত্তির সময়টিতেই ছেনাল, নাগরালির নারী, চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে ওঠে ধর্মপরায়ণ; নিয়তি সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা, রহস্য, এবং স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে যখন শুরু হয় নারীর হেমন্তকাল, তখন সে ধর্মের মধ্যে লাভ করে একটা মননগত একীভবন। ধর্মভক্ত মনে করে যে তার নষ্ট জীবনটা ছিলো তাকে নিয়ে বিধাতার এক পরীক্ষা; দুর্দশা থেকে তার আত্মা লাভ করেছে সে-সব অসাধারণ গুণ, যার ফলে সে যোগ্য হয়ে উঠেছে করুণাময় বিধাতার বিশেষ পরিদর্শন লাভের; সে অবলীলায় বিশ্বাস করে যে সে পায় স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা, বা এমনকি বিধাতা তার ওপর অর্পণ করেছে এক জরুরি দায়িত্বভার।

কম-বেশি পুরোপুরিভাবে বাস্তববোধ হারিয়ে ফেলার ফলে এ-সংকটের সময় নারী গ্রহণ করে সব ধরনের পরামর্শ, তাই কোনো স্বীকারোক্তিগ্রহণকারী এমন অবস্থানে থাকে যে সে নারীটির আত্মার ওপর ফেলতে পারে শক্তিশালী প্রভাব। উপরন্তু, প্রবল উৎসাহে সে মেনে নেবে অতিশয় প্রশ্নসাপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের; সে একটি পূর্বনির্ধারিত শিকার হয়ে ওঠে ধর্মগোত্রগুলোর, মৃত-আত্মার-বাণীপ্রাপকদের, দৈবজ্ঞদের, বিশ্বাসে ব্যাধিনিরাময়কারীদের, যে-কোনো ও প্রতিটি শার্লাটানের। এর কারণ হচ্ছে বাস্তব বিশ্বের সাথে সংস্পর্শ হারিয়ে সে শুধু বিচারবিবেচনার সব শক্তিই হারিয়ে ফেলে নি, বরং ব্যগ্র হয়ে উঠেছে একটা চূড়ান্ত সত্যের জন্যে : তাকে অবশ্যই পেতে হবে একটা প্রতিষেধক, একটা সূত্র, একটা চাবি, যা হঠাৎ রক্ষা করবে তাকে যেমন রক্ষা করবে মহাবিশ্বকে। যে-যুক্তি তার বিশেষ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে অপ্রযোজ্য, সেটিকে সে আগের থেকে অনেক বেশি ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে; শুধু যে-সব প্রমাণ বিশেষভাবে তারই জন্যে তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো তার কাছে মনে হয় বিশ্বাসযোগ্য : তাকে ঘিরে পুষ্পিত হ'তে থাকে গুপ্তবাণীলাভ, অনুপ্রেরণা, বার্তা, এমনকি অলৌকিক ঘটনা। তার আবিষ্কারগুলো অনেক সময় তাকে কর্মে প্রণোদিত করে : সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যবসায়,

কর্মোদ্যোগ, দুঃসাহসিক কর্মে, তাকে যা করার পরামর্শ দিয়েছে কোনো উপদেশক বা তার আন্তর কণ্ঠস্বর। নিজেকে সমস্ত ধ্রুব সত্য ও প্রজ্ঞার আধার ব'লে গণ্য ক'রে সে সন্তোষ বোধ করে অন্যান্য সব ব্যাপারে।

সক্রিয়ই হোক বা হোক ধ্যানমগ্ন, তার মনোভাবের মধ্যে জড়িত থাকে অতিশয় ব্যাকুল পরমানন্দ। ঋতুস্রাবনিবৃত্তির সংকট নারীর জীবনকে নিষ্ঠুরভাবে দু-টুকরো ক'রে ফেলে; এর ফলে ঘটে যে অবসান, তাই নারীকে দেয় একটা 'নতুন জীবন'-এর প্রতিভাস; তার সামনে উন্মুক্ত হয় *আরেকটি* কাল, তাই সে এর ভেতরে ঢোকে এক ধর্মান্তরিতের উদ্দীপনা নিয়ে; সে বিশ্বাস স্থাপন করে প্রেমে, পুণ্যজীবনে, শিল্পকলায়, মানবতায়; এসব জিনিশের মধ্যে সে নিজেকে লুপ্ত করে ও অতিশায়িত করে নিজেকে। সে ম'রে গিয়েছিলো এবং সেখান থেকে ফিরে এসেছে, সে বিশ্বকে দেখে এমন এক দৃষ্টিতে, যা ভেদ করেছে অতিসুদূরের গুপ্তসত্য, এবং সে মনে করে যে সে স্বপ্নাতীত শীর্ষলোকে আরোহণ করতে যাচ্ছে।

কিন্তু বিশ্ব বদলায় নি; চুড়োগুলো রয়ে গেছে অগম্য; যে-সব বার্তা পাওয়া গেছে– সেগুলোকে যতোই উজ্জ্বল মনে হোক– সেগুলোর পাঠোদ্ধার দুরূহ; অন্তর্গত উদ্ভাসনগুলো নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে; আয়নার সামনে দাঁড়ায় এমন এক নারী, সব কিছু সত্ত্বেও গতকালের থেকে যার একদিন বয়স বেড়েছে। পরমানন্দের মুহূর্তগুলোর পর দেখা দেয় বিষাদগ্রস্ততার বেদনাদায়ক প্রহরগুলো। এ-প্রাণীসত্তাটি প্রকাশ করে এ-তাললয়, কেননা নারী-হরমোন হ্রাসের ক্ষতিপূরণের জন্যে অতিশয় সক্রিয় হয়ে ওঠে হরমোনক্ষরক গ্রন্থিটি; তবে সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করে মেজাজের এ-পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। কেননা নারীর অস্থিরতা, তার প্রতিভাসগুলো, তার উদ্দীপনা, এসব হচ্ছে যা ঘটেছে সে-কর্তৃত্বশীল চরম সর্বনাশের বিরুদ্ধে নিতান্তই আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া। আবার তীব্র মনোকষ্ট জমা হয় নারীর কণ্ঠনালিতে, মৃত্যু যাকে নেয়ার আগেই যার জীবন শেষ হয়ে গেছে। হতাশা জয়ের চেষ্টার বদলে, প্রায়ই সে ধরা দেয় এর মাদকতার কাছে। সে নিরন্তর প্যানর প্যানর করতে থাকে তার ভুলগুলো, খেদগুলো, কটুবাক্যগুলো; সে কল্পনা করে তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা তার বিরুদ্ধে ক'রে চলছে কুটিল ষড়যন্ত্র; যদি তার জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে সমবয়সী কোনো বোন বা বান্ধবী, তাহলে তারা দুজনে মিলে পুঞ্জীভূত ক'রে তোলে যন্ত্রণাভোগের ব্যামোহ। তবে বিশেষ ক'রে সে রুগ্নভাবে তার স্বামীকে ঈর্ষা করতে শুরু করে, এবং এ-ঈর্ষা সে চালিত করে তার বন্ধুদের প্রতি, তার বোনদের প্রতি, তার ব্যবসার প্রতি; সঠিক বা ভুলভাবে সে তার দুঃখকষ্টের জন্যে দায়ী করতে থাকে কোনো একটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নো বছর বয়সের মধ্যে অজস্র ঘটে বিকারগ্রস্ত ঈর্ষাকাতরতার ঘটনা।

যে-নারী বুড়ো হওয়া সম্পর্কে মনস্থির ক'রে উঠতে পারে না, তার রজোনিবৃত্তির বিপদগুলো চলতে থাকে– অনেক সময় আমৃত্যু; যদি তার শারীরিক সৌন্দর্য খাটানো ছাড়া আর কোনো সম্পদ না থাকে, তাহলে সে পদে পদে লড়াই করতে থাকবে ওগুলো বজায় রাখার জন্যে; যদি তার যৌন কামনাগুলো প্রাণবন্ত থাকে, যা আদৌ বিরল নয়, তাহলে সে যুদ্ধ করবে পাগলের মতো। কোন বয়সে নারী আর তার

মাংসের জ্বালা বোধ করে না, জিজ্ঞেস করা হ'লে রাজকুমারী মেটারনিক উত্তর দিয়েছিলেন : 'আমি জানি না, আমার বয়স মাত্র পঁয়ষট্টি।' বিয়ে, মঁতেইনের মতে যা 'টুকিটাকি জিনিশের' বেশি কিছু নারীকে দিতে পারে না, সেটা ক্রমাগত হয়ে উঠতে থাকে এক অকার্যকর প্রতিষেধক, নারী যতোই বুড়ো হ'তে থাকে; তার যৌবনের সংবাধের, শীতলতার ক্ষতি তাকে প্রায়ই পূরণ করতে হয় পরিণত অবস্থায়; পরিশেষে সে যখন কামনার জ্বর বোধ করতে শুরু করে, তার অনেক আগে থেকেই তার স্বামী বিনা প্রতিবাদে স'য়ে যেতে শুরু করেছে তার উদাসীনতা এবং মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ঘনিষ্ঠতা ও কালপ্রবাহের ফলে যৌনাবেদন হারিয়ে ফেলে স্ত্রীর পক্ষে দাম্পত্য শিখা আবার জ্বালানোর আর কোনো সুযোগই থাকে না। ক্লিষ্ট, 'তার জীবনযাপনে' বদ্ধপরিকর, প্রেমিক ধরার ব্যাপারে– যদি একটা সুযোগ পাওয়া যায়– হ্রাস পায় তার বিবেকের অস্বস্তি; তাদের ধরতেই হবে : এটা এক পুরুষ-মৃগয়া। সে প্রয়োগ করে হাজারো ছলাকলা : নিজেকে দান করার ভান ক'রে সে চাপিয়ে দেয় নিজেকে; বিনয়, বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতাবোধকে সে পরিণত করে ফাঁদে। তারুণ্যদীপ্ত মাংসের সজীবতা ভালো লাগে ব'লেই শুধু সে যুবকদের আক্রমণ করে না : তাদের থেকে সে প্রত্যাশা করতে পারে শুধু সে-নিরাসক্ত প্রীতি, যা অনেক সময় কিশোর বোধ করে মাতৃতুল্য রক্ষিতার প্রতি। সে নিজে হয়ে উঠেছে আক্রমণাত্মক; এবং যুবকের সুদর্শন রূপ যতোটা সুখী করে বৃদ্ধাদের, তেমনি তাদের বশ্যতাও অনেক সময় তাদের ততোটাই সুখী করে; মাদাম দ্য স্তেল যখন ছিলেন চল্লিশোত্তর, তিনি পছন্দ করতেন অর্বাচীন যুবকদের, যারা বিহ্বল বোধ করতো তাঁর মর্যাদায়। এবং যা-ই ঘটুক না কেনো, একটি ভীরু নবিশ ধরা অনেক সহজ।

প্রলোভন ও মন্ত্রণা বেশি বিফল ব'লে প্রমাণিত হয়, তখন একগুঁয়ে অধ্যবসায়ী নারীর বাকি থাকে একটি সম্পদ : অর্থাৎ, সেবার জন্যে টাকা দেয়া। মধ্যযুগে জনপ্রিয় *কানিভেত* নামের ছোটো ছুরিকার গল্পে চিত্রিত হয়ে আছে এসব চির-অতৃপ্ত রাক্ষসিনীদের ভাগ্য : এক যুবতী নারী তার অনুগ্রহ বিতরণের বিনিময়ে তার প্রত্যেক প্রেমিকের কাছে থেকে নিতো একটি ক'রে ছোটো *কানিভেত*, এবং ওগুলো জমাতো তার হাড়িপাতিল রাখার আলমারিতে। এমন একদিন আসে যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তার আলমারি; তবে তখন থেকে প্রত্যেক রাতের প্রেমের শেষে তার প্রেমিকেরা সগর্বে উপহাররূপে নিতে থাকে একটি ক'রে ছুরিকা। শিগগিরই আলমারি খালি হয়ে যায়; সব *কানিভেত* হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, এবং তাই তাকে কিনতে হয় নতুন কানিভেত। কিছু নারী এ-পরিস্থিতিকে দেখে সিনিকীয় দৃষ্টিতে : একদা তাদের দিন ছিলো, এখন তাদের সময় এসেছে *'কানিভেত* দেয়ার'। বারবনিতার কাছে টাকা যে-ভূমিকা পালন করে, এ-নারীদের চোখে টাকা পালন করে তার বিপরীত ভূমিকা, তবে এ-ভূমিকাও সমান পবিত্রকর : এটা পুরুষটিকে রূপান্তরিত করে হাতিয়ারে এবং নারীটিকে দেয় সে-কামস্বাধীনতা, যা সে যৌবনের গরিমায় একদা প্রত্যাখ্যান করেছে।

যেদিন থেকে নারী বৃদ্ধ হ'তে সম্মত হয়, তখন বদলে যায় তার পরিস্থিতি। এ-সময় পর্যন্তও সে ছিলো এক তরুণী, যে সংগ্রামে একাগ্র ছিলো সে-দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে,

যা তাকে বিকৃত ও কদাকার ক'রে তুলছিলো বিস্ময়করভাবে; এখন সে হয়ে উঠেছে এক ভিন্ন সত্তা, অলৈঙ্গিক তবে সম্পূর্ণ : বৃদ্ধ নারী। মনে করা যেতে পারে তার 'বিপজ্জনক বয়স'-এর সংকট কেটে গেছে। তবে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে এর পর থেকে তার জীবন হবে সহজ। যখন সে সময়ের বিপর্যয়করতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত্যাগ করে, তখন শুরু হয় আরেক লড়াই : তাকে একটি জায়গা রাখতে হবে পৃথিবীতে।

জীবনের হেমন্ত ও শীতকালে নারী মুক্তি পায় তার শৃঙ্খল থেকে; তার ওপর চেপে থাকা বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে সুযোগ নেয় তার বয়সের; তার স্বামীকে সে এখন জানে ভালোভাবেই, তার থেকে আর ভয় নেই, সে এড়িয়ে যায় স্বামীর আলিঙ্গন, স্বামীর পাশে সে গুছিয়ে তোলে তার নিজের জীবন– বন্ধুত্ব, ঔদাসীন্য, বা বৈরিতার মধ্যে। যদি তার থেকে তার স্বামীর শরীরক্ষয় দ্রুত হ'তে থাকে, তাহলে সে নেয় তাদের যৌথ কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব। সে ফ্যাশন করা এবং 'লোকে কী বলবে'টাকেও অস্বীকার করতে পারে; সে মুক্ত সামাজিক দায়ভার, স্বল্পাহার, ও রূপচর্চা থেকে। তার সন্তানদের কথা বলতে গেলে, তারা এতোটা বড়ো হয়েছে যে তাকে ছাড়াই চলতে পারে, তারা বিয়ে করছে, বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সে অবশেষে মুক্তি পায়। দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিটি নারীর গল্পে ফিরে আসে সে-ঘটনা, যার সত্যতা আমরা দেখতে পেয়েছি নারীর ইতিহাসব্যাপী : সে তখনই পায় এ-স্বাধীনতা যখন এটা তার কোনো কাজে লাগে না। এ-পৌনঃপুনিকতা কোনোমতেই আকস্মিকতাবশত নয় : পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর সমস্ত কাজকে দিয়েছে সেবামূলক কাজের বৈশিষ্ট্য, এবং নারী তখনই মুক্ত হয় ক্রীতদাসত্ব থেকে, যখন সে হারিয়ে ফেলে সমস্ত কার্যকারিতা। পঞ্চাশের কাছাকাছি সে থাকে তার সমস্ত শক্তিসম্পন্ন; সে বোধ করে যে সে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ; অর্থাৎ যে-বয়সে পুরুষ অর্জন করে উচ্চতম অবস্থান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ; নারীর কথা বলতে গেলে, তখন তাকে দেয়া হয় অবসর। তাকে শেখানো হয়েছে শুধু নিজেকে কারো প্রতি নিয়োজিত রাখতে, এবং এখন আর কেউ তার আত্মনিয়োজন চায় না। অপ্রয়োজনীয়, অযথার্থ, সে তাকিয়ে থাকে সে-দীর্ঘ, সম্ভাবনাহীন বছরগুলোর দিকে, যে-সময়টা তাকে বেঁচে থাকতে হবে, এবং সে বিড়বিড় করতে থাকে : 'আমাকে কারো দরকার নেই!'

সে সঙ্গে সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে এসব ব্যাপার মেনে নেয় না। অনেক সময় নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে সে আঁকড়ে ধরে স্বামীকে; আগের থেকে অনেক বেশি কর্তৃত্বের সাথে সেবাযত্নে স্বামীর শ্বাসরোধ ক'রে তোলে; তবে বিবাহিত জীবনের নিত্যনৈমিত্তিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত; হয়তো সে জানে যে অনেক আগেই সে স্বামীর কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে, বা স্বামীকে তার উদ্যোগগুলোর যোগ্য মনে হয় না। তাদের একত্রজীবন রক্ষা ক'রে চলা একলা বুড়ো হওয়ার মতোই এক নৈমিত্তিক কঠিন কাজ। আশাপ্রদভাবে সে যা করতে পারে, তা হচ্ছে সে মনোযোগ দিতে পারে সন্তানদের প্রতি; তাদের ছাঁচ এখনো ঢালাই হয় নি; এখনো তাদের সামনে খোলা আছে বিশ্ব, ভবিষ্যৎ; সে সানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের পেছনে। যে-নারী আকস্মিকভাবে বেশ দেরিতে সন্তান প্রসব করেছে, তার আছে একটি বিশেষ সুবিধা : সে তখনো এক তরুণী মা যখন অন্য

নারীরা দাদী-নানী। নারী তার জীবনের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে সাধারণত দেখতে পায় যে তার সন্তানেরা হয়ে উঠছে প্রাপ্তবয়স্ক। ঠিক যখন সন্তানেরা মুক্ত হয়ে যেতে থাকে তার থেকে, তখন সে সংরক্তভাবে উদ্যোগ নেয় সন্তানদের মধ্যে বেঁচে থাকার।

তার পরিত্রাণের জন্যে সে নির্ভর করতে চায় পুত্র না কন্যার ওপর, সে-অনুসারে তার মনোভাব হয়ে থাকে বিভিন্ন; সাধারণত সে তার সবচেয়ে সযত্নলালিত আশাগুলো স্থাপন করে আগেরটির ওপর। তার অতীতের অতলতা থেকে অবশেষে পুত্রের মধ্যে দেখা সে-পুরুষটি, যার মহিমান্বিত আবির্ভাব দেখার জন্যে সে একদা তাকিয়ে থেকেছে দূরদিগন্তের দিকে; নবজাত পুত্রের প্রথম কান্না থেকেই সে অপেক্ষা ক'রে আছে সে-দিনের জন্যে, যে-দিন পুত্র তার ওপর বর্ষণ করবে সমস্ত ধনরত্ন, যা পুত্রটির পিতা তার ওপর বর্ষণ করতে পারে নি। এর মাঝে সে পুত্রকে চড়থাপ্পড় মেরেছে ও শোধন করেছে, তবে এসব ভুলে গেছে; এই যে পুরুষটি, যাকে সে বহন করেছে তার হৃদয়তলে, সে এরই মাঝে হয়ে উঠেছে সেই নরদেবতাদের একজন, যারা শাসন করে বিশ্ব এবং নিয়ন্ত্রণ করে নারীর নিয়তি; এখন সে তাকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ মহিমায়। পুত্রটি তাকে রক্ষা করবে তার স্বামীর আধিপত্য থেকে, তার যে-সব প্রেমিক ছিলো ও ছিলো না, তাদের ওপর চরিতার্থ করবে প্রতিশোধ; সে হবে তার মুক্তিদাতা, তার ত্রাতা। পুত্রের সঙ্গে সে পুনরায় শুরু করে সেই তরুণীর প্রলুব্ধকর ও জাঁকালো আচরণ, যে তার চোখ মেলে রেখেছিলো মনোহর রাজকুমারের জন্যে; যখন সে হাঁটে পুত্রের পাশে, মার্জিত, এখনো আকর্ষণীয়, তার মনে হয় তাকে দেখাচ্ছে পুত্রের বড়ো বোনের মতো; সে পুলক বোধ করে, যদি তার পুত্র– নিজেকে মার্কিন ছায়াছবির নায়কদের আদলে গ'ড়ে তুলে– তার সাথে ঠাট্টামশকরা করে ও রসিকতা ক'রে তাকে জ্বালায়, সহাস্যে ও সম্মানের সাথে। সগর্ব বিনম্রতায় সে মেনে নেয় এ-পুরুষটির, যে একদা ছিলো তার শিশু, তার পৌরুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

এ-হৃদয়ানুভূতিগুলোকে কতোটা অজাচারী বলে গণ্য করা যায়? সন্দেহ নেই যখন সে আত্মতৃপ্তির সাথে নিজেকে কল্পনা করে পুত্রের বাহুবন্ধনে, তখন *বড়ো বোন* নামটি হয়ে ওঠে দ্ব্যর্থবোধক কল্পনার একটা সংযত বর্ম; সে যখন নিদ্রিত, সে যখন অসতর্ক, সে যখন স্বপ্নপ্রয়াণে, অনেক সময় সে অত্যাধিক্যই করে; তবে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে স্বপ্ন ও উদ্ভট কল্পনাগুলো কোনোক্রমেই কোনো বাস্তবিক কর্মের সংগোপন বাসনার অবিকার্য প্রকাশ নয়। অনেক সময় ওগুলো নিজে নিজেই সম্পূর্ণ, ওগুলো এমন বাসনার পরিতৃপ্তি, যা কাল্পনিক তৃপ্তির বেশি কিছু দাবি করে না। যখন কোনো মা কম-বেশি ছদ্মবেশি রীতিতে পুত্রের মধ্যে প্রেমিককে দেখতে পাওয়ার খেলা খেলে, তখন তা নিতান্তই খেলা। কাম শব্দটি সত্যিকার অর্থে যা বোঝায়, এ-সম্পর্কের মধ্যে তার বিশেষ কোনো স্থান নেই।

তবে এ-দুজন গঠন করে একটি যুগল; মা তার নারীত্বের গভীরতা থেকে সম্ভাষণ জানায় তার পুত্রের মধ্যে নিহিত সার্বভৌম পুরুষকে; প্রণয়িনী নারীর সমস্ত ঐকান্তিকতা নিয়ে সে নিজেকে তুলে দেয় পুত্রের হাতে, এবং, এ-উপহারের বিনিময়ে, সে প্রত্যাশা করে সে একটি আসন পাবে বিধাতার ডান পাশে। এই সশরীরে স্বর্গে

প্রবেশের জন্যে প্রণয়িনী নারী আবেদন জানায় তার প্রেমিকের স্বাধীন ক্রিয়ার কাছে; সে অকুতোভয়ে একটি ঝুঁকি নেয়, এবং তার পুরস্কার নিহিত থাকে প্রেমিকের ব্যগ্র দাবিদাওয়ার মধ্যে। অন্য দিকে, মা বোধ করে যে শুধু জন্মদানের মাধ্যমেই সে অর্জন করেছে অলঙ্ঘ্য অধিকার; পুত্রকে তার জীব হিশেবে, তার সম্পত্তি হিশেবে গণ্য করার জন্যে তার প্রতি পুত্রের ঋণ স্বীকারের জন্যে সে অপেক্ষা করে না। প্রণয়িনী নারীর থেকে তার দাবিদাওয়া কম, কেননা তার মধ্যে প্রশান্ত আন্তরিকতাহীনতা বেশি; অর্থাৎ, তার আত্ম-অধিকারত্যাগ অনেক কম উদ্বেগগ্রস্ত; একটি রক্তমাংসের সত্তা তৈরি ক'রে সে নিজের ব'লে দখল করে একটি অস্তিত্বের মালিকানা : সে আত্মসাৎ করে এর কাজ, এর কর্ম, এর উৎকর্ষ। তার পেটের ফলটিকে উন্নীত ক'রে সে নিজেকে উন্নীত করে আকাশমণ্ডলে।

প্রতিনিধিত্ব ক'রে জীবনধারণ সব সময়ই একটা আশঙ্কাজনক কৌশল। যেমন আশা করা হয়েছিলো, সব কিছু তেমন নাও ঘটতে পারে। অধিকাংশ সময়ই পুত্রটি হয় অপদার্থ, একটা গুণ্ডা, একটা ব্যর্থ মানুষ, একটা গবা, একটা অকৃতজ্ঞ। পুত্রটি হবে কোন বীরের প্রতিমূর্তি, সে-সম্পর্কে মায়ের নিজস্ব ধারণা আছে। যে-মা তার শিশুর মধ্যে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করে মানুষের প্রতি, যে এমনকি পুত্রের ব্যর্থতার মধ্যেও মেনে নেয় তার স্বাধীনতা, যে পুত্রের সঙ্গে মেনে নেয় সাফল্য অর্জনের সমস্ত বাধাবিপত্তিও, তার থেকে আর কিছুই বেশি দুর্লভ নয়। আমরা খুবই মুখোমুখি হই সে-সব মায়ের, যারা সমকক্ষ হ'তে বা এমনকি ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে সেই অতিপ্রশংসিত স্পার্টানকে, যে সানন্দে নিজের পুত্রকে সমর্পণ করতো জয় অথবা মৃত্যুর কাছে; মনে হতো যেনো পৃথিবীতে পুত্রের কাজ হচ্ছে এসব অর্জন ক'রে তার মার অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা, তাদের উভয়ের লাভের জন্যে, মার কাছে যা মূল্যবান ব'লে মনে হয়। মা চায় শিশু-দেবতাটির কর্মোদ্যোগগুলো হবে তার নিজের ভাবাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে তার সাফল্য হবে সুনিশ্চিত। প্রতিটি নারীই জন্ম দিতে চায় একটি বীর, একটি প্রতিভা; তবে সব প্রকৃত বীর ও প্রতিভাদের মারাই প্রথমে অভিযোগ করেছে যে তাদের পুত্ররা তাদের মনে খুবই কষ্ট দিয়েছে। সত্য হচ্ছে যে পুরুষ অধিকাংশ সময় তার মার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই জয় করে সে-সব ট্রোফি, তার মা যা পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে ব্যক্তিগত আভরণরূপে এবং যখন তার পুত্র সেগুলো রাখে তার পদতলে সেগুলোকে সে চিনতেও পারে না। নীতিগতভাবে যদিও সে তার পুত্রের উদ্যোগগুলো অনুমোদন করে, তবুও সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এমন এক বিরোধিতায়, যা প্রণয়িনী নারীর বিরোধিতার প্রতিসম, যা পীড়ন করে প্রণয়িনী নারীকে। নিজের– এবং তার মায়ের– জীবনের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্যে তাকে এগোতে হয় সামনের দিকে, তার জীবনের সীমাতিক্রমণ করতে হয় কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে; এবং সেটা অর্জনের জন্যে বিপদের মুখোমুখি তাকে ঝুঁকি নিয়ে হয় তার স্বাস্থ্যের। কিন্তু যখন সে নিতান্ত জীবনধারণ করা থেকে গুরুত্ব দেয় কিছু লক্ষ্যের ওপর, তখন সে তার মার উপহারের মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ধরে। মা এতে আহত হয়; পুরুষের ওপর শুধু তখনই সে সার্বভৌম, যখন তার জন্ম দেয়া এ-মাংস পুত্রের জন্যে হয় পরম শুভ। তা ধ্বংস করার কোনো অধিকার নেই পুত্রের, যা সে উৎপাদন

করেছে প্রসববেদনার মধ্য দিয়ে। 'তুমি নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলছো, তুমি অসুখে পড়বে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে,' সে ক্রমাগত পুত্রের কানে ঢোকাতে চেষ্টা করে।

অবশ্য সে ভালোভাবেই জানে যে শুধু বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়, তাহলে প্রজনন ব্যাপারটিই হতো অনর্থক। তার সন্তান নিষ্কর্মা, ক্লীব, হ'লে সে-ই প্রথম আপত্তি জানায়। তার মন স্থির থাকে না। যখন পুত্র যুদ্ধে যায়, সে চায় যে তার ছেলে জীবিত ফিরে আসবে– তবে পদকখচিত হয়ে। সে চায় পুত্র সফল হবে কর্মজীবনে, তবে ভয় পায় যদি ছেলে বেশি কাজ করে। ছেলে যা-ই করে, মা সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকে, সে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে একটি কর্মজীবনের দিকে, যা তার পুত্রের, যে-কাজের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে ভয় পায় পুত্র হয়তো পথভ্রষ্ট হবে, হয়তো বিফল হবে, হয়তো সফল হওয়ার চেষ্টায় তার দেহ ক্ষয় ক'রে ফেলবে। যদি পুত্রের ওপর তার আস্থাও থাকে, তাহলেও বয়স ও লিঙ্গের ভিন্নতা বাধা দেয় মা ও ছেলের মধ্যে কোনো প্রকৃত সহযোগিতা সৃষ্টিতে; পুত্রের কাজের বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই; তার কাছে কোনো সহযোগিতা চাওয়া হয় না।

এটাই ব্যাখ্যা করে কেনো মা থাকে অসন্তুষ্ট, এমনকি পুত্রকে নিয়ে সে অপরিমিত গর্ব বোধ করলেও। সে শুধু একটি জীবন্ত দেহই জন্ম দেয় নি, সে একটি অতিশয় জরুরি অস্তিত্বকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে, একথা বিশ্বাস ক'রে সে যখন অতীত ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন সে নিজেকে ন্যায্য হ'লে মনে করে; তবে তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন কোনো বৃত্তি নয় : তার দিনগুলোকে কাজে ভ'রে রাখার জন্যে সে দরকার বোধ করে তার বদান্যতাপূর্ণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার; সে বোধ করতে চায় যে তার দেবতার জন্যে সে অপরিহার্য। তাকে যে-ধোঁকা দেয়া হয় এ-ক্ষেত্রে তা উন্মোচিত হয় নিষ্ঠুরতম রীতিতে : পুত্রের স্ত্রী তাকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছে তার কাজগুলো থেকে। যে-অপরিচিত নারী তার শিশুকে 'কেড়ে নিচ্ছে' তার থেকে, তার প্রতি সে যে-শত্রুতা বোধ করে, তা প্রায়ই বর্ণিত হয়েছে। মা গুণ্ডাটিকে উন্নীত করেছে এক স্বর্গীয় রহস্যের উচ্চতায়, এবং সে এটা মেনে নিতে রাজি নয় যে একটা মানবিক সিদ্ধান্তের থাকতে পারে বেশি গুরুত্ব। তার চোখে মূল্যবোধগুলো ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেগুলো উদ্ভূত হয় প্রকৃতিতে, অতীতকালে : সে ভুল বোঝে স্বাধীনভাবে গৃহীত একটি বাধ্যবাধকতার বিশেষ মূল্যকে। তার পুত্র জীবনের জন্যে তার কাছে ঋণী; গতকালও যে-নারী পুত্রের কাছে ছিলো অচেনা, পুত্র কী ধার ধারে তার কাছে?

প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার প্রতি মায়ের মনোভাব অতিশয় পরস্পরবিপরীত মূল্যসম্পন্ন : পুত্রের মধ্যে সে দেখতে চায় একটি দেবতা; তার কন্যার মধ্যে সে পায় একটি ডবল। ডবল একটি সন্দেহজনক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যে হত্যা করে তার আসলটিকে, যেমন আমরা দেখতে পাই, উদাহরণস্বরূপ, পোর কাহিনীগুলোতে এবং ওয়াইল্ডের *দি পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে*তে। তাই নারী হ'তে গিয়ে কন্যা মৃত্যুদণ্ডিত করে তার মাকে; এবং তবুও সে তাকে বেঁচে থাকতে দেয়। সে ধ্বংসের আভাস দেখতে পায়, না-কি কন্যার বিকাশের মধ্যে দেখে পুনরুজ্জীবন, সে-অনুসারে মায়ের আচরণ হয় বহুবিচিত্র।

বহু মা কঠোর হয় শত্রুতায়; সে মেনে নেয় না সে-অকৃতজ্ঞের দ্বারা অপসারিত হওয়া, যে তার জীবনের জন্যে ঋণী তার কাছে। সজীব কিশোরী মেয়ে, যে উদ্ঘাটিত

ক'রে দেয় ছেনালের ছলচাতুরি, তার প্রতি ছেনালের ঈর্ষার ব্যাপারটি প্রায়ই পরিলক্ষ করা হয়েছে : প্রত্যেক নারীর মধ্যেই যে দেখতে পেয়েছে একটি ক'রে ঘৃণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, সে তা-ই আবার দেখতে পাবে এমনকি নিজের কন্যার মধ্যে; সে মেয়েকে দূরে পাঠিয়ে দেয় বা চোখের আড়ালে রাখে, বা সে তাকে সামাজিক সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত করার ফন্দি খোঁজে। সে নিজে দৃষ্টান্তমূলক ও অনন্য ধরনে স্ত্রী হয়ে, মা হয়ে বোধ করেছে গর্ব, তবু সে নিজের সিংহাসনচ্যুতির বিরুদ্ধে চালায় প্রচণ্ড যুদ্ধ। সে বলতে থাকে যে তার মেয়ে নিতান্তই শিশু, তার উদ্যোগগুলোকে সে মনে করে বাল্যকালের খেলা; বিয়ের জন্যে সে খুবই ছোটো, প্রজননের জন্যে অতিশয় সুকুমার। যদি মেয়ে স্বামী, গৃহ, সন্তান লাভের জন্যে চাপ দিতে থাকে, এগুলোকে মায়ের কাছে ভানের থেকে বেশি কিছু ব'লে মনে হয় না। মা কখনোই মেয়েকে সমালোচনা করতে, অবজ্ঞা করতে, তার বিপদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ক্লান্ত হয় না। যদি এটা করতে তাকে অনুমতিও দেয়া হয়, তবুও সে তার মেয়েকে দণ্ডিত করে শাশ্বত শৈশবে : যদি তা না পারে, তাহলে অন্যজন যে-প্রাপ্তবয়স্ক জীবন সাহসের সঙ্গে দাবি করছে, সে চেষ্টা করে তা ধ্বংস ক'রে দিতে। আমরা দেখেছি যে এ-কাজে সে প্রায়ই সফল হয় : এ-অশুভ প্রভাবের ফলে বহু তরুণী নারী থাকে বন্ধ্যা, তাদের ঘটে গর্ভপাত, সন্তান লালনপালনে বা নিজেদের সংসারের দায়িত্ব নিতে তারা ব্যর্থ হয়। দাম্পত্য জীবনকে ক'রে তোলা হয় অসম্ভব। অসুখী, একলা, সে আশ্রয় খোঁজে তার মার সার্বভৌম বাহুতে। যদি সে প্রতিরোধ করে, তাহলে তারা মুখোমুখি হয় নিরন্তর বৈরিতায়; তার কন্যার ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বাধীনতা হতাশাগ্রস্ত মার মনে জাগিয়ে তোলে যে-ক্ষোভ, তার অধিকাংশ সে স্থানান্তরিত করে পুত্রবধূর ওপর।

যে-মা নিজেকে সংরক্তভাবে অভিন্ন ক'রে তোলে নিজের কন্যার সাথে, সেও কম স্বৈরাচারী নয়; সে যা চায়, তা হচ্ছে তার পরিপক্ক অভিজ্ঞতার সুবিধা নিয়ে তার যৌবনকে আবার যাপন করতে, এভাবে নিজেকে এর থেকে বাঁচিয়ে তার অতীতকে উদ্ধার করতে। সে যে-ধরনের স্বামীর স্বপ্ন দেখেছিলো, কিন্তু কখনো পায় নি, তার সাথে খাপ খাইয়ে সে নিজে পছন্দ করবে একটি জামাতা; ছেনালিপূর্ণ, স্নেহপরায়ণ, সে সহজেই কল্পনা করবে যে জামাতা তার নিজের অন্তরের গোপন কোণে বিয়ে করছে তাকেই; কন্যার মাধ্যমে সে পূরণ করবে ধন, সাফল্য, ও খ্যাতির জন্যে তার পুরোনো কামনাগুলো। প্রায়ই চিত্রিত হয়েছে এসব নারী, যারা ব্যাকুলভাবে তাদের কন্যাদের ঠেলে দেয় নাগরালির পথে, চলচ্চিত্রে, বা নাট্যমঞ্চে; কন্যাদের পাহারা দেয়ার অজুহাতে তারা অধিকার ক'রে নেয় কন্যাদের জীবন। আমাকে এমন কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে, যারা এতো দূর পর্যন্ত যায় যে তারা তাদের তরুণী কন্যাদের পাণিপ্রার্থীদের নেয় নিজেদের বিছানায়। কিন্তু কন্যার পক্ষে এ-অভিভাবকত্ব দীর্ঘকাল সহ্য করা সম্ভব হয় না; যখন সে একটি স্বামী বা একটি দায়িত্বশীল রক্ষক পেয়ে যায়, তখন সে বিদ্রোহ করে। যে-শাশুড়ি শুরু করেছিলো জামাতাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে সে তখন হয়ে ওঠে বৈরী; সে মানুষের অকৃতজ্ঞতায় গোঙাতে থাকে, নিজেকে দাবি করতে থাকে শহিদ ব'লে; সে হয়ে ওঠে একটি বৈরী মা।

এসব আশাভঙ্গের কথা আগেই বুঝতে পেরে অনেক নারী যখন দেখে যে তাদের

কন্যারা বড়ো হচ্ছে, তখন তারা গ্রহণ করে উদাসীন মনোভাব; তবে এমন করলেও এতে তারা বিশেষ সুখ পায় না। সন্তানদের জীবনের মানোন্নয়নের জন্যে মার জন্যে দরকার পড়ে বদান্যতা ও নিরাসক্তির এক দুর্লভ সমন্বয়, যাতে সে সন্তানদের কাছে স্বৈরাচারী না হয়ে ওঠে বা সন্তানদের না ক'রে তোলে তার যন্ত্রণাদানকারী।

এমন ঘটতে পারে যে নারীটির কোনো উত্তরাধিকারী নেই বা বংশধর লাভের জন্যে তার আগ্রহ নেই; সন্তান ও সন্ততির সাথে স্বাভাবিক বন্ধনের অভাবে সে কখনো কখনো চেষ্টা করে এর সমতুল্য কৃত্রিম সম্পর্ক সৃষ্টির। সে অল্পবয়স্কদের প্রতি দেখাতে থাকে মাতৃস্নেহ; তার প্রেম প্লাতোয়ী হোক বা না হোক, যখন সে বলে যে সে কোনো একটি অনুগ্রহভাজনকে 'পুত্রের মতো ভালোবাসে', তখন সে পুরোপুরি কপটতাপূর্ণ নয় : মায়ের আবেগ, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কম বা বেশি কামনাতুর। এবং প্রায়ই মাতৃধর্মী নারীরা মেয়ে দত্তক নেয়। এখানে আবার সম্পর্কগুলো যে-রূপ ধারণ করে, তা কম-বেশি স্পষ্টভাবে যৌন; প্লাতোয়ীভাবেই হোক আর শারীরিকভাবেই হোক, অনুগ্রহভাজনের মধ্যে চাওয়া হয় একটি ডবল, অলৌকিকভাবে নবযৌবনপ্রাপ্ত।

অভিনেত্রী, নর্তকী, গায়িকা হয়ে ওঠে শিক্ষক : তারা লালাই করে শিক্ষার্থীদের; বুদ্ধিজীবী– তাঁর কলোম্বীয় নির্জনাবাসে মাদাম দ্য শারিয়েরের মতো– ভাবাদর্শে দীক্ষিত করেন তাঁর শিষ্যদের; ধর্মভক্ত চারদিকে জড়ো করে আধ্যাত্মিক কন্যাদের; নাগরালির নারী হয়ে ওঠে মাসি। তাদের ধর্মান্তরিতকরণের প্রতি তারা ব্যাকুল আগ্রহ সৃষ্টি করলেও তা কখনোই উদ্যোগগ্রহণের প্রতি আকর্ষণবশত ঘটে না; সংরক্তভাবে তারা যা চায়, তা হচ্ছে তাদের আশ্রিতদের পুনর্জন্ম। তাদের স্বৈরাচারী বদান্যতা সৃষ্টি করে প্রায় একই বিরোধ, যা দেখা দেয় রক্তের বন্ধনে জড়িত মা ও মেয়েদের মধ্যে। পৌত্রপৌত্রী দত্তক নেয়াও সম্ভব, এবং চাচাতো দাদীরাও নির্দ্বিধায় পালন করে পিতামহীর মতো ভূমিকা। তা যা-ই হোক, নারীর পক্ষে তার– স্বাভাবিক ও দত্তক– উত্তরাধিকারীর মধ্যে তার ক্ষীয়মান বছরগুলোর যাথার্থ্যপ্রতিপাদন লাভ দুর্লভ : সে এই তরুণ অস্তিত্বদের সত্যিকারভাবে নিজের জীবনে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়।

এখানে আমরা মুখোমুখি হই বৃদ্ধ নারীর করুণ ট্র্যাজেডির : সে বুঝতে পারে যে সে অপ্রয়োজনীয়; সারাজীবন ভ'রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীকে প্রায়ই সমাধান করতে হয়েছে সে কীভাবে সময় কাটাবে এ-হাস্যকর সমস্যাটি। তবে যখন সন্তানেরা বড়ো হয়ে গেছে, স্বামী একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ বা অন্তত স্থির হয়ে বসেছে, তখনো তাকে কোনো উপায়ে সময় কাটাতে হবে। সূচের কারুকর্ম উদ্ভাবিত হয়েছিলো তাদের ভয়ঙ্কর আলস্যকে ঢাকা দেয়ার জন্যেই; হাত নকশি করে, হাত বোনে; হাত সচল। এটা কোনো প্রকৃত কাজ নয়, কেননা উৎপাদিত পণ্যটি লক্ষ্যবস্তু নয়; এর গুরুত্ব তুচ্ছ, এবং এটা দিয়ে কী করা হবে, সেটাই অনেক সময় সমস্যা– এটা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, হয়তো, কোনো বন্ধুকে বা কোনো দাতব্য সংস্থায় দান ক'রে, বা ম্যান্টলপিস বা মধ্যবর্তী টেবিলের ওপর গাদাগাদি ক'রে রেখে। এটা আর খেলা নয় যে এর অপ্রয়োজনীয়তাই প্রকাশ করবে জীবনধারণের বিশুদ্ধ আনন্দ; এটা আদৌ পলায়নও নয়, কেননা মনটা থাকে শূন্য। এটা পাস্কালের বর্ণিত 'উদ্ভট কৌতুক'; সূচ বা কুশিকাঁটা দিয়ে নারী বিষণ্ণভাবে বোনে তার দিনগুলোর শূন্যতা। জলরঙ, সঙ্গীত,

বইপড়া কাজ করে একইভাবে; কর্মহীন নারী নিজেকে এসব ব্যাপারে নিয়োগ ক'রে পৃথিবীর ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে না, শুধু দূর করতে চায় তার অবসাদগ্রস্ততা। কোনো কর্ম যদি ভবিষ্যৎকে উন্মুক্ত না করে, তাহলে সেটা ভেঙে পড়ে নিরর্থ সীমাবদ্ধতায়; কর্মহীন নারী বই খোলে এবং একপাশে ফেলে রাখে, পিয়ানো খোলে শুধু বন্ধ করার জন্যে, আবার শুরু করে তার নকশি তোলার কাজ, হাই তোলে এবং শেষে তুলে ধরে টেলিফোন।

বৃদ্ধ নারী সাধারণত প্রশান্ত হয় জীবনের একেবারে শেষ দিকে, যখন সে ত্যাগ করেছে লড়াই, যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে আসতে তাকে মুক্তি দেয় ভবিষ্যতের সব ভাবনা থেকে। তার স্বামী সাধারণত তার থেকে বুড়ো, এবং সে নিঃশব্দে আশ মিটিয়ে দেখে তার স্বামীর ক্রমবিনাশ– এটা তার প্রতিশোধগ্রহণ। স্বামী আগে মারা গেলে সে প্রফুল্লভাবে স্বীকার ক'রে নেয় এ-ক্ষতি; প্রায়ই দেখা গেছে যে বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষেরা বেশি কষ্ট পায় স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীদের কষ্টের থেকে; স্বামীরা বিয়েতে বেশি লাভবান হয় স্ত্রীদের থেকে, বিশেষ ক'রে বুড়ো বয়সে। কেননা তখন বিশ্ব কেন্দ্রীভূত হয় গৃহের সীমানার মধ্যে; বর্তমান তখন আর ভবিষ্যতের সীমান্তবর্তী নয়। এ-সময়ে স্ত্রী আধিপত্য করে দিনগুলোর ওপর এবং রক্ষা করে তাদের সহজ ছন্দোস্পন্দ। পুরুষটি যখন তার চাকুরিবাকুরি ছেড়ে দেয়, তখন সে হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়; তার স্ত্রী অন্তত তখন ঘরসংসার দেখাশোনা করে, স্ত্রীটিকে তার স্বামীর দরকার, আর সেখানে স্বামীটি নিতান্তই একটা উৎপাত।

বৃদ্ধ নারীরা তাদের স্বাধীনতার গর্ববোধ করে; অবশেষে তারা বিশ্বটিকে তাদের নিজেদের চোখে দেখতে শুরু করে; তারা লক্ষ্য করে যে সারাজীবন ভ'রে তাদের বোকা বানানো হয়েছে ও প্রবঞ্চনা করা হয়েছে; প্রকৃতিস্থ ও সন্দিগ্ধ, প্রায়ই তাদের মধ্যে দেখা দেয় একটা তিক্ত সিনিসিজম। বিশেষ ক'রে, যে-নারী 'জীবন যাপন করেছে', সে পুরুষদের এমনভাবে জানে, যা কোনো পুরুষ জানে না, কেননা সে পুরুষের মধ্যে জনগণের কাছে তার যে-ভাবমূর্তি, তা দেখতে পায় নি, বরং দেখেছে ঘটনাচক্রজাত একটি ব্যক্তিকে, পরিস্থিতির প্রাণীটিকে। সে নারীদেরও জানে, কেননা তারা অসংযমের সাথে নিজেদের প্রকাশ করে শুধু অন্য নারীদের কাছে : সে দৃশ্যের আড়ালে থেকেছে। তবে তার অভিজ্ঞতা তাকে প্রতারণা ও মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে ফেলতে সমর্থ করলেও ওই অভিজ্ঞতা সত্য প্রদর্শন করার মতো যথোপযুক্ত নয়। সে হাসিখুশি থাক বা থাক তিক্ত, বৃদ্ধ নারীর প্রজ্ঞা তখনো থাকে পুরোপুরি নেতিবাচক : এর স্বভাব বিরোধিতাকরণ, অভিযুক্তকরণ, অস্বীকারকরণ; এটা বন্ধ্যা। যেমন তার কাজে তেমনি তার ভাবনাচিন্তায় নারী-পরগাছার পক্ষে লভ্য মুক্তির শ্রেষ্ঠতম রূপ হচ্ছে স্টোয়িকধর্মী বিরুদ্ধাচরণ বা সংশয়বাদী বক্রোক্তি। জীবনের কোনো সময়েই সে একই সঙ্গে কার্যকর ও স্বাধীন থাকতে সমর্থ হয় না।

পরিচ্ছেদ ৬

নারীর পরিস্থিতি ও চরিত্র

এখন আমরা বুঝতে পারছি গ্রিকদের থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত নারীর বিরুদ্ধে যতো অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কেনো আছে এতো বেশি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও নারীর অবস্থা র'য়ে গেছে একই, আর এ-অবস্থাই নির্ধারণ করে তা, যাকে বলা হয় নারীর 'চরিত্র' : সে 'সীমাবদ্ধতায় আনন্দ পায়', সে বিপরীত। সে সতর্ক ও ক্ষুদ্র, তার কোনো তথ্যবোধ বা যথাযথতাবোধ নেই, তার আছে নৈতিকতার অভাব, সে ঘৃণ্য উপযোগিতাবাদী, সে মিথ্যে, নাটকীয়, স্বার্থান্বেষী ইত্যাদি। এর সব কিছুতেই আছে কিছুটা সত্যতা। তবে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে বিচিত্র যে-সব আচরণের বিবরণ পাওয়া গেছে, সেগুলো তার হরমোন কর্তৃক নারীর ওপর আরোপিত হয় নি বা নারীর মস্তিষ্কসংগঠনে সেগুলো পূর্বনির্ধারিত নয় : তার পরিস্থিতিই সেগুলোকে রূপ দিয়েছে ছাঁচে ঢালাই করার মতো ক'রে। এ-প্রেক্ষিতেই আমরা চেষ্টা করবো নারীর পরিস্থিতির ওপর একটি সমন্বিত জরিপের। এতে ঘটবে কিছুটা পুনরাবৃত্তি, তবে তার সামগ্রিক আর্থনীতিক, সামাজিক, ও ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চিরন্তনী নারীকে বুঝতে এটা আমাদের সাহায্য করবে।

'নারীর জগত'কে কখনো কখনো প্রতিতুলনা করা হয় পুরুষের বিশ্বের সাথে, তবে আমাদের আবার এর ওপর জোর দিতে হবে যে নারীরা কখনোই একটি বদ্ধ ও স্বাধীন সমাজ গঠন করে নি; তারা একটি অচ্ছেদ্য অংশ সে-গোষ্ঠির, যা শাসিত হয় পুরুষদের দ্বারা এবং যাতে তাদের আছে একটি অধস্তন স্থান। নিতান্ত সাদৃশ্যবশতই তারা মিলিত একটা যান্ত্রিক সংহতিতে, কিন্তু তাদের অভাব সে-জৈব সংহতির, যার ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠে প্রতিটি সংহত জনগোষ্ঠি; তাদের সব সময়ই দলবদ্ধ হ'তে বাধ্য করা হয়– যেমন করা হতো এলিউসিসের রহস্যের কালে তেমনি আজো ক্লাবে, সালঁয়, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে– একটা প্রতিপক্ষীয় সেবা গ'ড়ে তোলার জন্যে, তবে তারা সব সময়ই এটা স্থাপন করে পুরুষের বিশ্বের কাঠামোর মধ্যেই। এজন্যেই ঘটে তাদের পরিস্থিতির স্ববিরোধ : তারা অচ্ছেদ্যভাবে ও একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত পুরুষের বিশ্বের এবং এমন এক এলাকার, যেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় পুরুষের বিশ্বের বিপক্ষে; তাদের নিজেদের জগতে বন্দী হয়ে থেকে, অন্য জগত দিয়ে পরিবেষ্টিত থেকে, তারা কোথাও শান্তিতে স্থির হয়ে বসতে পারে না। তাদের বশ্যতাকে সব সময় অবশ্যই খাপ খাওয়াতে হয় প্রত্যাখ্যান করার সাথে, তাদের প্রত্যাখ্যান করাকে খাপ খাওয়াতে হয় গ্রহণ করার সাথে, এ-ব্যাপারে তাদের মনোভাব অনেকটা তরুণী মেয়ের মনোভাবের মতো, তবে এটা রক্ষা করা অনেক বেশি কঠিন,

কেননা প্রাপ্তবয়স্ক নারীর কাছে এটা নিতান্তই প্রতীকের মাধ্যমে জীবনের স্বপ্ন দেখার ব্যাপার নয়, বরং এটা বাস্তবিকভাবে যাপনের ব্যাপার।

নারী নিজেই মেনে নেয় যে সার্বিকভাবে বিশ্বটি পুরুষেরই; যারা এটিকে রূপায়িত করেছে, শাসন করেছে, এবং আজো এটির ওপর আধিপত্য করছে, তারা পুরুষ। তার দিক থেকে, সে নিজেকে এর জন্যে দায়ী মনে করে না; এটা সত্য যে সে নিকৃষ্ট ও পরনির্ভর; সে হিংস্রতার পাঠ নেয় নি, সে কখনো গোষ্ঠির অন্য সদস্যদের কাছে নিজেকে কর্তা হিশেবে দাঁড় করায় নি। তার মাংসে, তার গৃহে বন্দী থেকে মানুষের মুখাবয়বসম্পন্ন সে-দেবতাদের সামনে, যারা নির্দেশ করে লক্ষ্য ও প্রতিষ্ঠা করে মূল্যবোধ, সে নিজেকে দেখে অক্রিয়রূপে। এ-অর্থে সত্যতা আছে সে-প্রবাদের, যা তাকে নির্দেশ করে 'চিরশিশু' ব'লে। শ্রমিকদের, কালো ক্রীতদাসদের, উপনিবেশের অধিবাসীদেরও– যতো দিন তারা ভীতিকর ছিলো না– বলা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক শিশু; এটা বোঝাতো যে অন্য মানুষদের প্রণীত শাশ্বত সত্য ও বিধিবিধান তাদের মেনে নিতে হবে বিনাপ্রতিবাদে। নারীর ভাগ্য হচ্ছে একটা সম্মানজনক আনুগত্য। এমনকি চিন্তাভাবনায়ও তার চারদিকের বাস্তবতার ওপর তার কোনো অধিকার নেই। তার চোখে এটা অনচ্ছ।

এবং একথা সত্য যে তার নেই প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, যা দিয়ে সে কর্তৃত্ব করতে পারতো পদার্থের ওপর। তার দিক থেকে, সে পদার্থ দিয়ে অধিকার করে না, করে জীবন দিয়ে; এবং হাতিয়ার দিয়ে জীবনকে আয়ত্ত করা যায় না : মানুষ পারে শুধু এর গুপ্ত নিয়মের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে। নারীর কাছে বিশ্বকে তার ইচ্ছে ও তার লক্ষ্যের মাঝামাঝি 'একটি হাতিয়ারের সন্নিবেশ', যেমন একে সংজ্ঞায়িত করেছেন হাইডেগার, ব'লে মনে হয় না; এর বিপরীতে এটা এমন জিনিশ, যা একগুঁয়েভাবে প্রতিরোধক, অজেয়; এর ওপরে আধিপত্য করে চরম বিপর্যয় ও এটি রহস্যময় চাপল্যে পরিপূর্ণ। একটি রক্তাপ্লুত স্ট্রোবেরির এ-রহস্য, যা মায়ের ভেতরে রূপান্তরিত হয় একটি মানুষে, এটি এমন এক রহস্য, যা কোনো গণিত সমীকরণরূপে প্রকাশ করতে পারে না, কোনো যন্ত্র একে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করতে পারে না; নারী বোধ করে ধারাবাহিকতার এমন শক্তি, যা সবচেয়ে উদ্ভাবনকুশল যন্ত্রপাতিও ভাগ বা গুণ করতে অসমর্থ; চান্দ্রস্পন্দনের দ্বারা আন্দোলিত হয়ে সে একে অনুভব করে নিজের দেহের ভেতরে; প্রথমে পেকে, তারপর প'চে, বছরের পর বছর ধ'রে। প্রতিদিন রান্নাঘরটিও তাকে শেখায় ধৈর্য ও অক্রিয়তা; এখানে আছে রসায়ন; মেনে চলতে হয় আগুনকে, জলকে, অপেক্ষা করতে হয় চিনি গলার জন্যে, দলা ময়দার তাল ফুলে ওঠার জন্যে। ঘরকন্নার কাজগুলো অনেকটা প্রযুক্তিগত কর্মপদ্ধতির কাছাকাছি, তবে নারীর কাছে যান্ত্রিক কার্যকারণ প্রমাণ করার জন্যে ওগুলো খুবই প্রারম্ভিক, অতি একঘেয়ে। এছাড়াও, এখানেও জিনিশপত্র চাপল্যপূর্ণ; কিছু জিনিশ ধোলাই সহ্য করে কিছু সহ্য করে না, কিছু দাগ ওঠানো যায় কিছু লেগেই থাকে, কিছু জিনিশ নিজে থেকেই ভেঙে যায়, ধুলো গজিয়ে ওঠে উদ্ভিদের মতো।

নারীর মানসিকতা চিরস্থায়ী ক'রে রাখে কৃষিসভ্যতার মানসিকতা, যে-সভ্যতাগুলো পুজো করতো ভূমির যাদুশক্তির : নারী বিশ্বাস করে যাদুতে। তার অক্রিয় কাম তার

কামনাকে এমন রূপ দেয় যে তাতে কামকে তার কাছে ইচ্ছে ও আক্রমণ ব'লে মনে হয় না, বরং মনে হয় এক আকর্ষণ, যা সগোত্র সে-প্রক্রিয়ার, যার ফলে নিমজ্জিত হয় গণকের দণ্ড; তার মাংসের সামান্য উপস্থিতিতেই স্ফীত ও দৃঢ় হয়ে ওঠে পুরুষের লিঙ্গ; তাই গুপ্ত জলধারা কেনো কাঁপাবে না হেজেলের দণ্ডকে? সে অনুভব করে যে সে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে ঢেউ, বিকিরণ, অতীন্দ্রিয় তরল পদার্থ দিয়ে; সে বিশ্বাস করে টেলিপ্যাথিতে, জ্যোতিষশাস্ত্রে, রেডিওথেরাপিতে, সম্মোহনে, থিয়সফিতে, টেবিল-কাত করাতে, অলোকদৃষ্টিতে, বিশ্বাসের-জোরে-নিরাময়কারীতে; তার ধর্ম আদিম কুসংস্কারে পরিপূর্ণ : মোমবাতি, উত্তরদত্ত প্রার্থনা; সে বিশ্বাস করে সন্তরা হচ্ছে প্রকৃতির প্রাচীন চেতনারাশির মূর্তরূপ : এটি রক্ষা করে ভ্রমণকারীদের, ওটি রক্ষা করে প্রসূতিকে, অন্য একটি ফিরিয়ে দেয় হারানো জিনিশ, এবং কোনো মহাশ্চর্য বস্তুই তাকে বিস্মিত করতে পারে না। তার মনোভাব যাদু ও প্রার্থনার; বিশেষ ফল লাভের জন্যে সে পালন করে বিশেষ ধরনের পরীক্ষিত ব্রতানুষ্ঠান।

কেনো নারীরা শক্তভাবে লেগে থাকে নিত্যনৈমিত্তিকতায়, তা বোঝা বেশ সহজ; তার কাছে সময়ের মধ্যে বিশেষ অভিনবত্বের ব্যাপার নেই, এটা সৃষ্টিশীল প্রবাহ নয়; সে যেহেতু পুনরাবৃত্তিতে দণ্ডিত, ভবিষ্যতের মধ্যে সে দেখতে পায় শুধু অতীতের প্রতিলিপিকরণ। যদি জানা যায় শব্দ ও সূত্র, তাহলে কালের ব্যাপ্তি সম্পর্কিত হয় উর্বরতার শক্তির সাথে– তবে এটা নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয় মাস ও ঋতুর ছন্দোস্পন্দ দিয়ে; গর্ভধারণের, ফুল ফোটার প্রতিটি চক্র যথাযথভাবে পুনরাবৃত্তি করে পূর্ববর্তী চক্রটির। চক্রাবর্তনশীল প্রপঞ্চের এ-খেলায় সময়ের একান্ত কাজ হচ্ছে ধীরভাবে বিনাশ করা; এটা যেমন নষ্ট করে আসবাবপত্র ও পোশাকপরিচ্ছদ, তেমনি এটা নষ্ট করে মুখমণ্ডল; বছরের পর বছর কাটার সঙ্গে ধীরেধীরে ধ্বংস হয় প্রজননের শক্তি। তাই নারী এই নিরন্তর ধ্বংসের শক্তির ওপর কোনো আস্থা রাখে না।

প্রকৃত কর্ম কী এবং কীভাবে বদলানো যায় বিশ্বের মুখমণ্ডল, সে-সম্পর্কে সে শুধু অজ্ঞই নয়, সে এমনভাবে লীন হয়ে আছে বিশ্বের মাঝে যেনো সে আছে এক বিপুল, অস্পষ্ট নীহারিকার মর্মলোকে। পুরুষের যুক্তি প্রয়োগের সাথে সে পরিচিত নয়। পুরুষের বিশ্বে তার চিন্তাভাবনা কোনো কর্মোদ্যোগের দিকে এগোয় না, কেননা সে কিছুই *করে* না, তাই তার চিন্তাভাবনাকে দিবাস্বপ্নের থেকে পৃথক করা যায় না। কার্যকারিতার অভাবে বাস্তব সত্য সম্পর্কে তার ধারণা নেই; শব্দ ও মানসচিত্র ছাড়া আর কিছু দিয়ে সে অনুধাবন করে না, এজন্যেই অতিশয় বিপরীতধর্মী দাবিগুলোও তাকে কোনো অস্বস্তি দেয় না; যা সব দিক দিয়েই তার শক্তির সীমার বাইরে, তেমন এলাকার রহস্য ব্যাখ্যা করার জন্যে সে সামান্যও চেষ্টা করে না। তার অভীষ্টের জন্যে চূড়ান্ত অস্বচ্ছ ধারণা নিয়েই সে তৃপ্ত, সে গুলিয়ে ফেলে দল, মতামত, স্থান, ব্যক্তি, ঘটনা; তার মাথা ভরাট অদ্ভুত তালগোল পাকানো বস্তুতে।

তবে, সব সত্ত্বেও, সুস্পষ্টভাবে কিছু দেখা তো তার কাজ নয়, কেননা তাকে শেখানো হয়েছে পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নিতে। তাই সে ছেড়ে দেয় নিজে সমালোচনা করা, অনুসন্ধান করা, বিচার করা, এবং এসব ছেড়ে দেয় উৎকৃষ্টতর বর্ণের ওপর। তাই পুরুষের বিশ্বকে তার কাছে মনে হয় এক সীমাতিক্রান্ত সত্য, এক ধ্রুব বস্তু।

'পুরুষ দেবতা তৈরি করে,' ফ্রেজার বলেন, 'তাদের পুজো করে নারীরা।' পুরুষ যে-সব মূর্তি তৈরি করেছে, সেগুলোর সামনে তারা পূর্ণ বিশ্বাসে নতজানু হ'তে পারে না; কিন্তু নারীরা যখন রাস্তায় মুখোমুখি হয় এসব শক্তিশালী মূর্তির, তারা মনে করে এগুলো হাত দিয়ে তৈরি করা হয় নি, এবং বাধ্যতার সাথে নত করে মাথা। বিশেষ ক'রে নেতার মধ্যে তারা মূর্ত দেখতে চায় শৃঙ্খলা ও অধিকার। প্রত্যেক অলিম্পাসেই আছে একটি পরম দেবতা; পুরুষের ঐন্দ্রজালিক সারসত্তা সংহত হ'তে হবে একটি আদিরূপের মধ্যে, যার নিতান্ত অস্বচ্ছ প্রতিফলন হচ্ছে পিতা, স্বামী, প্রেমিকেরা। তাদের এ-মহাটোটেম পুজো যৌন প্রকৃতির, একথা বলা হবে বিদ্রূপাত্মক; তবে একথা সত্য যে এ-পুজোর মধ্যে তারা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করে তাদের শৈশবের বিনাপ্রতিবাদে নতজানু হওয়ার স্বপ্ন। ফ্রান্সে বলঁজে, পেতাঁ, ও দ্য গলের মতো সেনাপতিরা সর্বদাই পেয়েছে নারীদের সমর্থন; মনে পড়ে সাম্যবাদী পত্রিকা *ল'ইয়মানিতে*র নারী সাংবাদিকেরা কিছুকাল আগে কী রকম ধড়ফড়ে কলমে স্তব লিখেছেন টিটো ও তার জমকালো উর্দির। তীক্ষ্ণ-চক্ষু, চারকোণা-চোয়ালের সেনাপতি, একনায়ক হচ্ছে সব গভীর সদচিন্তাশীলদের প্রার্থিত দিব্য পিতা, সব মূল্যবোধের পরম নিশ্চয়তাবিধায়ক। বীরদের ও পুরুষের বিশ্বের বিধিবিধানের প্রতি নারীরা যে শ্রদ্ধাশীল হয়, তার কারণ তাদের অকার্যকারিতা ও অজ্ঞতা; তারা এগুলোকে সুষ্ঠু চিন্তার মাধ্যমে গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে বিশ্বাস দিয়ে– আর বিশ্বাস তার উগ্র যুক্তিহীন গোঁড়ামির শক্তি পায় এ-ঘটনা থেকে যে এটা কোনো জ্ঞান নয় : এটা অন্ধ, আবেগাতুর, একগুঁয়ে, নির্বোধ; এটা যা ঘোষণা করে, ঘোষণা করে নিঃশর্তভাবে, যুক্তিশীলতার বিরুদ্ধে, ইতিহাসের বিরুদ্ধে, সমস্ত অস্বীকারের বিরুদ্ধে।

এ-একগুঁয়ে ভক্তি পরিস্থিতি অনুসারে নিতে পারে দুটি রূপের মধ্যে একটি রূপ : হ'তে পারে যে নারী সংরক্ষণভাবেই অনুগত বিধানটির আধেয়র বা সে অনুগত নিতান্তই তার শূন্যগর্ভ রূপের। যদি সে অন্তর্ভুক্ত হয় সুবিধাভোগী *অভিজাতশ্রেণী*র, যারা লাভবান হয় প্রচলিত সমাজব্যবস্থায়, তাহলে সে চায় ব্যবস্থাটি থাকবে অটল এবং এ-বাসনায় সে থাকবে লক্ষণীয়ভাবে অনমনীয়। পুরুষ জানে যে সে বিকাশ ঘটাতে পারে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, আরেক জীবনবিধানের, নতুন আইনগত বিধির; যা আছে তা অতিক্রম ক'রে যাওয়ার নিজের সামর্থ সম্পর্কে সে সচেতন, তাই সে ইতিহাসকে গণ্য করে এক ধরনের হয়ে-ওঠা ব'লে। সবচেয়ে রক্ষণশীল পুরুষও জানে কোনো-না-কোনো ধরনের বিবর্তন অনিবার্য এবং বুঝতে পারে তাকে ওই বিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে তার কর্মকে ও তার চিন্তাকে; কিন্তু নারী ইতিহাসে অংশ নেয় না ব'লে সে এর প্রয়োজনীয়তাগুলো বুঝতে ব্যর্থ হয়; ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে সন্দেহজনকভাবে সন্দিগ্ধ এবং রোধ করতে চায় সময়ের প্রবাহ। যদি তার পিতার, তার ভ্রাতাদের, তার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করা হয়, তাহলে স্বর্গকে আবার অধ্যুষিত করার কোনো পথ সে দেখতে পায় না; প্রচণ্ড তীব্রভাবে সে ছোটে পুরোনো দেবতাদের রক্ষা করার জন্যে।

মার্কিন বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধের সময় দাসপ্রথা টিকিয়ে রাখার জন্যে কোনো দক্ষিণীই নারীদের থেকে প্রবলতরভাবে আবেগোদ্দীপ্ত ছিলো না। বুয়োর যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডে,

কম্যিউনের সময় ফ্রান্সে, নারীরাই প্রজ্বলিত হয়েছিলো সবচেয়ে যুদ্ধংদেহিভাবে। তারা তাদের নিষ্ক্রিয়তার ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিলো তাদের প্রদর্শিত আবেগের তীব্রতা দিয়ে। যখন জয় হয়, তখন তারা হায়েনার মতো ছুটে গিয়ে পড়ে পরাভূত শত্রুর ওপর; পরাজয়ে, তারা তিক্ততার সাথে প্রত্যাখ্যান করে মীমাংসার যে-কোনো প্রচেষ্টা। তাদের ভাবনাচিন্তাগুলো যেহেতু নিতান্ত মনোভাব মাত্র, তাই তারা নির্বিকারভাবে সমর্থন করে অতিশয় বাতিল ব্যাপারগুলো : ১৯১৪তে তারা হ'তে পারে বৈধতাবাদী, ১৯৫৩তে জারবাদী। পুরুষেরা অনেক সময় সহাস্যে তাদের উৎসাহিত করতে পারে, কেননা তাদের সংযত ভাষায় প্রকাশিত ভাবনাচিন্তা নারীদের মধ্যে কী উগ্ররূপ ধারণ করতে পারে, তা দেখে তারা কৌতুক বোধ করে; তবে তাদের ভাবনাচিন্তা এমন নির্বোধ, একগুঁয়ে রূপ ধারণ করেছে দেখে তারা বিরক্তও বোধ করতে পারে।

নারী এ-অদম্য মনোভাব পোষণ করে শুধু শক্তভাবে সংহত সভ্যতায় ও সামাজিক শ্রেণীতে। আরো সাধারণভাবে, সে আইনকে শ্রদ্ধা করে কেননা তা আইন, যেহেতু তার বিশ্বাস অন্ধ; আইন বদলে গেলেও এটা টিকিয়ে রাখে তার যাদুমন্ত্র। নারীর চোখে জোরই অধিকার, কেননা পুরুষের যে-অধিকারগুলো সে স্বীকার করে, সেগুলো তাদের শক্তির ওপর নির্ভরশীল। তাই যখন ভেঙে পড়ে কোনো সমাজ, তখন নারীরাই প্রথম নিজেদের ছুঁড়ে দেয় বিজয়ীর পদতলে। সার্বিকভাবে, যা আছে, তা তারা মেনে নেয়। তাদের অন্যতম স্বাতন্ত্র্যনির্দেশক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়া। পম্পেইর ধ্বংসস্তূপ যখন খোঁড়া হয়, তখন দেখা যায় যে স্বর্গকে অমান্য ক'রে বা পালানোর চেষ্টায় পুরুষদের ভস্মীভূত দেহগুলো স্থির হয়ে আছে বিদ্রোহের ভঙ্গিতে, সেখানে নারীদের দেহগুলো, দু'ভাঁজ হয়ে, মাথা নত ক'রে মুখ ঠেকিয়ে আছে মাটিতে। নারীরা বোধ করে যে তারা বিভিন্ন বস্তু : অগ্নিগিরি, পুলিশ, পৃষ্ঠপোষক, পুরুষের বিরুদ্ধে শক্তিহীন। 'নারী জন্মেছে দুঃখভোগের জন্যে,' তারা বলে; 'এ-ই জীবন– এর আর কিছু করা যাবে না।'

এ-বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়ার ফলে দেখা দেয় নারীর বহুলপ্রশংসিত ধৈর্যশীলতা। তারা পুরুষের থেকে অনেক বেশি দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে; পরিস্থিতির প্রয়োজনে তারা ধারণ করতে পারে স্টোয়িকধর্মী সাহস; পুরুষের আক্রমণাত্মক ঔদ্ধত্য তাদের নেই ব'লে বহু নারী তাদের অক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে দেখিয়ে থাকে প্রশান্ত ধৈর্যশীলতা। স্বামীদের থেকে অনেক বেশি উদ্যমের সাথে তারা সহ্য করতে পারে সংকট, দারিদ্র্য, দুর্ভোগ। কোনো কর্মোদ্যোগে যখন তারা নিয়োগ করে তাদের নিঃশব্দ অটলতা, তখন তারা কখনো কখনো অর্জন করে চমকপ্রদ সাফল্য। 'নারীর শক্তিকে কখনো কমিয়ে দেখো না।' দয়াবতী নারীর মধ্যে বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়ার ব্যাপারটি রূপ নেয় তিতিক্ষার : সে সব কিছু সহ্য করে, কারো দোষ দেয় না, কেননা সে মনে করে কোনো মানুষ বা জিনিশ যেমন আছে, তেমন ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না। গর্বিত কোনো নারী তার বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়ার ব্যাপারটিকে মহৎ গুণে পরিণত করতে পারে, যেমন করেছিলেন মাদাম দ্য শারিয়ের। তবে এটা এক ধরনের বন্ধ্যা পরিণামদর্শিতারও জন্ম দেয়; নারীরা ধ্বংস করা ও নতুন ক'রে তৈরি করার বদলে সব সময়ই চেষ্টা করে সংরক্ষণ করার, খাপ খাওয়ানোর, বিন্যাস করার;

বিপ্লবের থেকে তারা বেশি পছন্দ করে আপোষমীমাংসা ও খাপ খাওয়ানো।

উনিশশতকে শ্রমিকদের মুক্তির প্রচেষ্টার পথে নারীরা ছিলো অন্যতম বৃহৎ বাধা : একজন ফ্লোরা ত্রিস্তান, একজন লুইস মিশেলের বিপরীতে কতো অজস্র নারী ঝুঁকি না নেয়ার জন্যে অনুনয় করেছে তাদের স্বামীদের কাছে! তারা শুধু ধর্মঘট, বেকারত্ব, ও দারিদ্র্যকেই ভয় করতো না : তারা ভয় করতো যে বিদ্রোহটাই হয়তো একটা ভুল।

নারীর নিয়তি পচনশীল বস্তুর নিয়তির সাথে বাঁধা; ওগুলো হারিয়ে তারা সব কিছু হারিয়ে ফেলে। শুধু একজন স্বাধীন কর্তা, যে নিজেকে দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করে বস্তুরাশির স্থায়িত্বকালের থেকে উর্ধ্বে ও অনেক সুদূরে, সে-ই শুধু রোধ করতে পারে সমস্ত পচন; নারী বঞ্চিত হয়েছে এ-পরম আশ্রয় থেকে। কেনো সে মুক্তিতে বিশ্বাস করে না, তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে সে কখনো মুক্তির শক্তিগুলো পরখ করে নি; তার কাছে মনে হয় বিশ্ব যেনো শাসিত হয় একটা অবোধ্য নিয়তির দ্বারা, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ধৃষ্টতা। যে-সব বিপজ্জনক পথে তাকে চলতে বলা হয়, সেগুলো সে নিজে বেছে নেয় নি, তাই ওই পথে উদ্দীপনার সঙ্গে না ঝাঁপিয়ে পড়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তার সামনে ভবিষ্যৎকে খুলে দাও, তখন সে আর মরিয়া হয়ে অতীত আঁকড়ে থাকবে না। যখন বাস্তব কাজের জন্যে ডাকা হয় নারীদের, যখন তারা নির্ধারিত লক্ষ্যের মধ্যে দেখতে পায় নিজেদের স্বার্থ, তখন তারা পুরুষের মতোই সাহসী ও নির্ভীক।

বহু ত্রুটি– মাঝারিত্ব, আলস্য, লঘুচিত্ততা, দাস্যভাব– যে-সবের জন্যে নিন্দা করা হয় নারীদের, সেগুলো শুধু এ-সত্য প্রকাশ করে যে তাদের দিগন্ত রুদ্ধ। বলা হয়ে থাকে নারী কামাতুর, সে গড়াগড়ি খায় সীমাবদ্ধতায়; কিন্তু প্রথমে তাকে তো আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে এরই মধ্যে। হারেমের দাসী কোনো অসুস্থ সংরাগ পোষণ করে না সংরক্ষিত গোলাপ ও সুবাসিত স্নানের জন্যে : তাকে সময় কাটাতে হবে। যখন নারীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে কোনো নিরানন্দ গাইনিকিউমে– বেশ্যালয়ে বা মধ্যবিত্ত গৃহে– সে তখন বাধ্য হয় আরামআয়েশ ও সুখসমৃদ্ধির আশ্রয় নিতে; তাছাড়াও, যদি সে কামসুখলাভের জন্যে ব্যাকুলও হয়, তার কারণ হচ্ছে প্রায়ই সে বঞ্চিত থাকে কামসুখ থেকে। কামে অপরিতৃপ্ত, পুরুষের স্থূলতায় দণ্ডপ্রাপ্ত, 'পুরুষের কদর্যতায় দণ্ডিত', সে সান্ত্বনা খোঁজে তেলতেলে চাটনিতে, উৎকট মদে, মখমলে, জলের, রোদের, নারী বন্ধুর, তরুণ প্রেমিকের স্পর্শাদরের মধ্যে। যদি তাকে এতোই 'দৈহিক' প্রাণী ব'লে মনে হয় পুরুষের, তার কারণ হচ্ছে তার পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে তার পাশবিক প্রকৃতির ওপর চরম গুরুত্ব দিতে। মাংসের ডাকের শব্দ তার মধ্যে পুরুষের থেকে উচ্চ নয়, তবে সে এর ক্ষীণতম গুঞ্জরণকেও ধ'রে ফেলে এবং বাড়িয়ে তোলে সেগুলোর ধ্বনি। কামসুখ, বিদীর্ণকর যন্ত্রণার মতো, নির্দেশ করে অব্যবহিতের অপূর্বসুন্দর বিজয়োল্লাস; তাৎক্ষণিকের হিংস্রতার মধ্যে প্রত্যাখ্যান করা হয় ভবিষ্যৎকে ও মহাবিশ্বকে; দেহাগ্নিশিখার বাইরে যা কিছু আছে তা কিচ্ছু নয়; মোক্ষলাভের এ-ক্ষণিক মুহূর্তে নারী আর বিকলাঙ্গ ও হতাশাগ্রস্ত থাকে না। তবে সীমাবদ্ধতার এসব বিজয়োল্লাসকে সে মূল্যবান মনে করে শুধু এ-কারণে যে সীমাবদ্ধতাই তার ভাগ্য।

যে-কারণে ঘটে তার 'শোচনীয় বস্তুবাদ', সে-একই কারণে ঘটে তার লঘুচিত্ততা; মহৎ জিনিশে তার প্রবেশাধিকার নেই ব'লে ক্ষুদ্র জিনিশকেই সে মনে করে গুরুত্বপূর্ণ,

এবং যে-অন্তঃসারশূন্যতা ভ'রে রাখে তার দিনগুলোকে সাধারণত সেগুলোই হয় তার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ব্যাপার। তার মোহনীয়তা ও সুযোগসুবিধার জন্যে সে ঋণী তার পোশাক ও রূপের কাছে। প্রায়ই তাকে মনে হয় অলস, নিরুদ্যম; তবে তার জন্যে আছে যে-সব কাজকর্ম, সেগুলো বিশুদ্ধ কালপ্রবাহের মতোই শূন্য। সে যে অনর্থক বকবক করে, লেখে হিজিবিজি ক'রে, সে তা করে তার অলস সময় কাটানোর জন্যে : অসম্ভব কাজের বদলে সে ব্যবহার করে শব্দপুঞ্জ। সত্য কথা হচ্ছে কোনো নারী যখন মানুষের উপযুক্ত কোনো কাজে নিযুক্ত হয়, তখন সে হয়ে উঠতে পারে পুরুষের মতোই সক্রিয়, দক্ষ, মিতবাক– ও কৃচ্ছ্রব্রতী।

তাকে অভিযুক্ত করা হয় দাস্যস্বভাবসম্পন্ন ব'লে; বলা হয়ে থাকে যে প্রভুর পায়ে পড়ার জন্যে ও যে-হাত তাকে আঘাত করে, তাকে চুমো খাওয়ার জন্যে সে সব সময়ই প্রস্তুত, এবং এটা সত্য যে তার অভাব আছে প্রকৃত গর্ববোধের। 'প্রেমাতুরদের প্রতি উপদেশ', প্রবঞ্চিত স্ত্রী ও পরিত্যক্ত প্রেমিকাদের প্রতি হিতোপদেশ দেয়া হয় যে-স্তম্ভগুলোতে, সেগুলো ভরা থাকে শোচনীয় বশ্যতাস্বীকারের চেতনায়। নারী নিজেকে শ্রান্ত ক'রে তোলে উদ্ধত ভাবাবেগপূর্ণ দৃশ্য ঘটিয়ে, কিন্তু শেষে কুড়িয়ে নেয় তার দিকে অবহেলায় পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া ক্ষুদকুঁড়ো। কিন্তু পুরুষের সাহায্য ছাড়া নারী কী করতে পারে, যার কাছে পুরুষ হচ্ছে জীবনধারণের একমাত্র উপায় ও কারণ? সে প্রতিটি অবমাননা ভোগ করতে বাধ্য; ক্রীতদাসের থাকতে পারে না মানুষের মর্যাদাবোধ; নিজের চামড়া বাঁচাতে পারলেই দাসের জন্যে যথেষ্ট।

এবং পরিশেষে, নারী যদি হয়েই থাকে পার্থিব প্রবৃত্তিসম্পন্ন, বৈশিষ্ট্যহীন, স্থূল উপযোগিতাবাদী, তার কারণ হচ্ছে তাকে বাধ্য করা হয়েছে রান্নাবান্না ও ডাইয়াপার ধোয়ার কাজে তার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়োগ করতে– এটা মহিমান্বিত বোধ করার পথ নয়! তার দায়িত্ব হচ্ছে জীবনের সমস্ত মূঢ়োচিত কাজগুলো নিয়ে জীবনের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত করা। নারীর পক্ষে পুনরাবৃত্তি করা, উদ্ভাবন না ক'রে আবার শুরু করা স্বাভাবিক, তার কারণ সময়কে তার মনে হয় শুধু আবর্তন ও আবর্তন, যা কখনো কোনো অভিমুখে অগ্রসর হয় না। সে কখনো কিছু না *ক'রেই* ব্যস্ত থাকে, এবং তাই তার যা *আছে* তার সাথেই সে অভিন্ন ক'রে তোলে নিজেকে। বস্তুর ওপর এ-নির্ভরশীলতা, যা পুরুষ তাকে যে-পরনির্ভরতায় রাখে তারই পরিণতি, ব্যাখ্যা করে তার মিতব্যয়িতার, তার ধনসম্পত্তির লালসার কারণ। তার জীবন কখনোই কোনো লক্ষ্যের অভিমুখি নয় : সে নিবিষ্ট বস্তু উৎপাদনে ও সেবাযত্নে, যেমন খাবার, পোশাকপরিচ্ছদ, ও আশ্রয়, যেগুলো উপায়ের থেকে বেশি কিছু নয়। এসব বস্তু হচ্ছে পাশবিক জীবন ও স্বাধীন অস্তিত্বের মাঝে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগের মাধ্যম। অপ্রয়োজনীয় উপায়গুলোর সাথে যুক্ত হয় যে-একটি মাত্র মূল্য, তা হচ্ছে উপযোগিতা; গৃহিণী বেঁচে থাকে উপযোগিতার স্তরেই, আর সে একথা ভেবে শ্লাঘা বোধ করে না যে সে তার জাতির কাছে একটি উপকারী লোকের থেকে বেশি কিছু।

কিন্তু কোনো অস্তিত্বশীলই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না একটি অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন ক'রে, কেননা তা অবিলম্বে উপায়কেই ক'রে তোলে লক্ষ্য– যা দেখা যায়, উদাহরণ হিশেবে, রাজনীতিবিদদের মধ্যে– এবং উপায়ের মূল্যকেই ধ্রুব মূল্য ব'লে

মনে হ'তে থাকে। তাই সত্য, সৌন্দর্য, স্বাধীনতার উর্ধ্বে গৃহিণীর স্বর্গে রাজত্ব করে উপযোগিতা; এবং এ-পরিপ্রেক্ষিতেই সে মনে মনে আঁকে সমগ্র বিশ্বের ছবি। এজন্যেই সে গ্রহণ করে সোনালি মধ্যপন্থার আরিস্ততলীয় নৈতিকতা– অর্থাৎ মাঝারিত্বের নৈতিকতা। তাহলে কী ক'রে তার কাছে প্রত্যাশা করা যায় যে সে দেখাবে স্পর্ধা, উৎসাহ, নিরাসক্তি, মহিমা? এসব গুণ তখনই দেখা দেয় যখন কোনো মুক্ত মানুষ অগ্রসর হয় মুক্ত ভবিষ্যতের ভেতর দিয়ে, অনেক পেছনে ফেলে রেখে যায় বিদ্যমান বাস্তবতা। নারীকে আটকে রাখা হয়েছে রান্নাঘরে বা নারীদের খাসমহলে, এবং তারপরও বিস্ময় প্রকাশ করা হয় যে তার দিগন্ত সীমাবদ্ধ। তার ডানা ছেঁটে দেয়া হয়েছে, তারপরও মনস্তাপ করা হয় যে সে উড়তে পারে না। তার সামনে খুলে দেয়া হোক ভবিষ্যৎ, তখন সে আর বাধ্য হবে না বর্তমানের মধ্যে কালবিলম্ব করতে।

তার অহমিকার বা গৃহের সীমানার মধ্যে তাকে বন্দী ক'রে রেখে যখন তাকে নিন্দা করা হয় তার আত্মরতি, তার আত্মপ্রচার, ও এগুলোর সব সহবৈশিষ্ট্য : আত্মশ্লাঘা, অভিমান, বিদ্বেষ প্রভৃতির জন্যে, তখন প্রদর্শন করা হয় একই অসামঞ্জস্য। তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে অন্যদের সাথে যোগাযোগের সমস্ত বাস্তব সম্ভাবনা থেকে; তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই সংহতির আবেদন বা লাভ সম্পর্কে, কেননা তাকে, এককভাবে বিচ্ছিন্ন রেখে, সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা হয়েছে তার পরিবারের কাছে। তাই আদৌ তার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না যে সে নিজেকে পেরিয়ে এগোবে সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে। সে একগুঁয়েভাবে অবস্থান করে সে-এলাকায়, যা তার কাছে পরিচিত, যেখানে সে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং যার মাঝে অবস্থান ক'রে সে উপভোগ করে এক ধরনের আশঙ্কাজনক সার্বভৌমত্ব।

সে দরোজায় তালা লাগায় এবং ঝাপ বন্ধ ক'রে দেয়, তবুও নারী তার গৃহে পুরোপুরি নিরাপত্তা বোধ করে না। এটা পরিবৃত হয়ে আছে পুরুষের সে-বিশ্ব দিয়ে, যার ভেতরে ঢোকার স্পর্ধা না ক'রে যাকে সে দূর থেকে শ্রদ্ধা করে। এবং যেহেতু সে কৌশলগত দক্ষতা, সুষ্ঠু যুক্তি, এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানের সাহায্যে এটিকে বুঝতে পারে না, তাই সে, শিশু ও অসভ্যের মতো, মনে করে যে সে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে বিপজ্জনক রহস্য দিয়ে। বাস্তবতা সম্পর্কে তার ঐন্দ্রজালিক ধারণাগুলো সে প্রক্ষেপ করে পুংবিশ্বের ওপর; তার কাছে ঘটনাক্রমগুলোকে মনে হয় অনিবার্য এবং তারপরও ঘটতে পারে যা-কিছু; সে স্পষ্টভাবে সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং প্রস্তুত থাকে সব কিছু বিশ্বাস করার জন্যে, তা যা-ই হোক-না-কেনো। সে গুজবে কান দেয় এবং গুজব ছড়ায় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এমনকি যখন সব কিছু শান্ত, তখনও সে উদ্বিগ্ন বোধ করে; রাতে আধোঘুমের মধ্যে প'ড়ে থেকে তার বিশ্রাম বিঘ্নিত হয় দুঃস্বপ্নের যে-সব রূপ নিয়ে দেখা দেয় বাস্তবতা, সেগুলো দিয়ে; এবং এভাবে অক্রিয়তায় দণ্ডিত নারীর দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যতের ভেতরে হানা দিতে থাকে যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য; কোনো কাজ করতে না পেরে সে থাকে দুশ্চিন্তায়। তার স্বামী, তার পুত্র, যখন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে বা মুখোমুখি হয় কোনো জরুরি অবস্থার, তখন তারা নিজেরা ঝুঁকি নেয়; তারা নেয় যে-সব পরিকল্পনা, বিধিবিধান, সেগুলো নির্দেশ করে দুর্বোধ্যতার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত পথ। কিন্তু নারী নাকানিচোবানি

খেতে থাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় ও অন্ধকারে; সে এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, কেননা সে কিছুই করে না; তার কল্পনায় সব সম্ভাবনাই সমান বাস্তব : রেলগাড়ি রেলচ্যুত হ'তে পারে, ভুল হ'তে পারে অস্ত্রোপচারে, ব্যবসায় ক্ষতি হ'তে পারে। তার আঁধার রোমন্থনের মধ্যে সে যা প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চালায়, তা তার নিজের শক্তিহীনতার প্রেতচ্ছায়া।

তার দুশ্চিন্তা বিদ্যমান বিশ্বের ওপর তার সন্দেহের প্রকাশ; একে যে তার কাছে মনে হয় আশঙ্কাজনক, ধ্বংসোন্মুখ, তার কারণ সে এর মাঝে অসুখী। অধিকাংশ সময়ই সে বিনা প্রতিবাদে সব কিছু সয়ে যাওয়া সহ্য করে না; সে খুব ভালোভাবেই জানে যে সে কষ্ট পাচ্ছে, কেননা সে কাজ করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে : সে নারী, কিন্তু এ-ব্যাপারে তার সাথে আলাপ করা হয় নি। সে বিদ্রোহ করার সাহস পায় না; সে অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে; তার মনোভাব নিরন্তর ভর্ৎসনার। যাদের কাছে নারীরা তাদের গোপন কথা বলে– চিকিৎসক, পুরোহিত, সমাজকর্মী– তারা সবাই জানে যে নারীদের নিত্যদিনের স্বর হচ্ছে অভিযোগের স্বর। বন্ধুদের মধ্যে নারী তার নিজের সমস্যা নিয়ে কাতর আর্তনাদ করে, এবং তারা সবাই সমস্বরে অভিযোগ জানাতে থাকে ভাগ্যের, বিশ্বের, এবং সাধারণভাবে পুরুষের অবিচার সম্বন্ধে।

একটি স্বাধীন মানুষ তার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করে শুধু নিজেকে, সে নেয় এগুলোর দায়দায়িত্ব; কিন্তু নারীর বেলা সব কিছুই ঘটে অন্যদের মাধ্যমে, সুতরাং এ-অন্যরা দায়ী তার দুঃখকষ্টের জন্যে। তার উন্মত্ত হতাশা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে সব প্রতিবিধান; যে-নারী অভিযোগপরায়ণ, তার কাছে প্রতিবিধানের প্রস্তাব ক'রে কোনো ফল হয় না : সে কোনো প্রতিবিধানকেই গ্রহণযোগ্য মনে করে না। সে জেদের সাথে জীবনযাপন করতে চায় যে-পরিস্থিতিতে সে আছে, তাতেই– অর্থাৎ একটা ক্লীব ক্রোধের অবস্থার মধ্যে। কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হ'লে সে আতঙ্কে দু-হাত ওপরে তোলে : 'ওটিই শেষ খড়কুটো!' সে জানে তার তোলা অজুহাতগুলো যে-সমস্যার ইঙ্গিত করে, তার সমস্যাগুলো তার থেকে আরো অনেক গভীর, এবং সে জানে এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে কৌশলের থেকেও বেশি কিছু দরকার। সে সমগ্র বিশ্বকে দায়ী মনে করে, কেননা এটি তৈরি করা হয়েছে তাকে ছাড়া, ও তার বিরুদ্ধে; বয়ঃসন্ধি থেকেই, এমনকি শৈশব থেকেই সে অভিযোগ ক'রে আসছে তার অবস্থার বিরুদ্ধে। তাকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যদি সে তার সৌভাগ্য অর্পণ করে পুরুষের হাতে, তাহলে তা শতগুণে ফিরিয়ে দেয়া হবে– এবং সে অনুভব করে তার সাথে জোচ্চুরি করা হয়েছে। সে অভিযুক্ত করে সমগ্র পুংবিশ্বকে। অসন্তুষ্টি হচ্ছে পরনির্ভরতার উল্টো পিঠ : যখন কেউ সব দান করে, প্রতিদানে সে যথেষ্ট পায় না।

নারী, অবশ্য, পুরুষের বিশ্বকে কিছুটা ভক্তির সঙ্গে মেনে নিতে বাধ্য; যদি সে পুরোপুরি বিরুদ্ধে থাকতো, তাহলে তার মাথার ওপরে একটা চালের অভাবে সে বিপদ বোধ করতো; সুতরাং সে নেয় একটা ম্যানিকীয়বাদী অবস্থান– শুভ ও অশুভর একটা সুস্পষ্ট পৃথককরণ– গৃহিণী হিশেবে তার অভিজ্ঞতাও এটাই নির্দেশ করে। যে-ব্যক্তি কাজ করে, সে অন্যদের মতো নিজেকেও দায়ী করে শুভ ও অশুভ উভয়েরই

জন্যে, সে জানে তাকেই স্থির করতে হবে লক্ষ্য, তাকেই সফল করতে হবে সেগুলো; কর্মের মাধ্যমে সে সচেতন হয় সব প্রতিবিধানের দ্ব্যর্থবোধকতা সম্পর্কে; ন্যায় ও অন্যায়, লাভ ও ক্ষতি অচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত। কিন্তু যে অক্রিয়, সে থাকে খেলার বাইরে এবং চিন্তার মধ্যেও নৈতিক প্রশ্নগুলো তুলতে অস্বীকার করে : শুভকে বাস্তবায়িত *হ'তেই হবে*, যদি তা না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ করা হয়েছে, তার জন্যে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। শিশুর মতোই নারী শুভ ও অশুভকে দেখে সরল মূর্তিতে, সহাবস্থানরত, পৃথক সত্তারূপে; তার এ-ম্যানিকীয়বাদ কঠিন সিদ্ধান্তগ্রহণের উদ্বেগ দূর ক'রে তার মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত ক'রে তোলে। কোনটি অশুভ ও কোনটি কম অশুভ, বর্তমানের শুভ ও ভবিষ্যতের বৃহত্তর শুভর মধ্যে কোনটি কাম্য, পরাজয় কী ও বিজয় কী, তা নিজে স্থির করা– এসবের মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি। ম্যানিকীয়বাদীর কাছে ভালো গম সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন আগাছার থেকে, তাই আগাছাগুলো তুলে ফেলে দিলেই হলো; ধুলো স্বনিন্দিত এবং পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ধুলোর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি; গৃহ পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে ময়লা ও আবর্জনা তাড়ানো।

তাই নারী মনে করে 'সব দোষই ইহুদিদের', অথবা ফ্রিম্যাসনদের অথবা বলশেভিকদের, বা সরকারের; সে সব সময়ই থাকে কোনো বা কোনো কিছুর *বিরুদ্ধে*। তারা সব সময় জানে না কোথায় নিহিত থাকতে পারে অশুভ নীতিটি, তবে একটি 'ভালো সরকার'-এর কাছে তারা চায় যে সরকার অশুভকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলবে যেমন তারা বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে ধুলোময়লা।

তবে সব সময়ই এসব হচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা; এ-অবসরে অশুভ ক্ষয় করতে থাকে শুভকে; এবং সে যেহেতু ইহুদি, ফ্রিম্যাসন, বলশেভিকদের ওপর তার হাত তুলতে পারে না, তাই নারী এর জন্যে দোষী ব'লে খোঁজে এমন একজনকে, যার বিরুদ্ধে সে তার রোষ প্রকাশ করতে পারে মূর্তভাবে। তার স্বামীটি এ-পছন্দসই বলি। স্বামীটি পুরুষের বিশ্বের প্রতিমূর্তি, যার মাধ্যমে পুরুষের সমাজ গ্রহণ করেছে তার দায়িত্ব ও তার সাথে জোচ্চুরি করেছে। স্বামীটি ধারণ করে বিশ্বের ভর, এবং কিছু বিগড়ে গেলে সেটা তার দোষ। স্বামীটি যখন রাতে বাড়ি ফেরে, সে তার কাছে অভিযোগ করে সন্তানদের, দোকানদানদের সম্বন্ধে, জীবনযাপনের ব্যয়, তার বাতের ব্যথা, আবহাওয়া সম্পর্কে– এবং চায় যে এর জন্যে স্বামীটি দোষী বোধ করুক। সে মাঝেমাঝেই স্বামীকে মনে করে দুঃখদুর্দশার বিশেষ কারণ ব'লে; তবে তার প্রথম অপরাধ হচ্ছে সে পুরুষ। স্বামীটির নিজেরই থাকতে পারে অসুস্থতা ও উদ্বেগ– 'সেটা ভিন্ন'– তবে স্বামীটির আছে এমন এক বিশেষাধিকার, যা তার কাছে নিরন্তর একটা অবিচার ব'লে মনে হয়। এটা লক্ষণীয় জিনিশ যে স্বামী বা প্রেমিকের প্রতি সে যে-বৈরিতা বোধ করে, সেটা তাকে স্বামী বা প্রেমিকের থেকে বিচ্ছিন্ন করার বদলে তাদের প্রতি অনুরক্ত করে। যে-পুরুষ তার পত্নী বা উপপত্নীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, সে চেষ্টা করে তাদের থেকে দূরে স'রে যেতে; কিন্তু নারী যে-পুরুষকে ঘৃণা করে, তাকে সে হাতের কাছাকাছি চায়, যাতে তাকে সে ব্যয় বহন করতে বাধ্য করতে পারে। প্রত্যভিযোগ তার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির নয়, বরং তাতে গড়াগড়ি দেয়ার উপায়; স্ত্রীর পরম সান্ত্বনা নিজেকে শহিদ হিশেবে দাবি করা। জীবন, পুরুষ, তাকে

পরাজিত করেছে : পরাজয়কেই সে পরিণত করবে বিজয়ে। এটাই ব্যাখ্যা করে কেনো সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে অশ্রুপাত ও দৃশ্যসৃষ্টির কাছে, যেমন সে করতো তার শৈশবে।

নারীর অবলীলায় অশ্রুপাতের অর্জিত ক্ষমতা, নিঃসন্দেহে, অনেকাংশে আসে এ-ঘটনা থেকে যে তার জীবন স্থাপিত একটা বন্ধ্যা বিদ্রোহের ভিত্তির ওপর; এটাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে শারীরবৃত্তিকভাবে পুরুষের থেকে তার স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ কম এবং তার শিক্ষা তাকে শিখিয়েছে অবলীলাক্রমে ভেঙে পড়তে। শিক্ষা, বা প্রথার এ-প্রভাব খুবই স্পষ্ট, কেননা অতীতে, উদাহরণস্বরূপ, বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট ও দিদরোর মতো পুরুষেরাও অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিতেন, এবং তারপর পুরুষেরা কাঁদাকাটি করা থামিয়ে দেয়, যখন এটা আর পুরুষসম্মত থাকে না। তবে, সর্বোপরি, সত্য কথা হচ্ছে বিশ্বের প্রতি একটা নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাব পোষণ করার জন্যে নারী সব সময়ই তৈরি, কেননা সে কখনো একে অকপটে মেনে নেয় নি। কোনো পুরুষ বিশ্বকে মেনে নেয় না; এমনকি দুর্ভাগ্যও তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, সে এর মুখোমুখি দাঁড়ায়, সে 'ছেড়ে দেয়' না; আর সেখানে অল্পতেই নারীর মনে পড়ে যায় তার বিরুদ্ধে বিশ্বের বৈরিতা এবং তার প্রতি ভাগ্যের অবিচারের কথা। তখন সে দ্রুত অবসর নেয় তার সবচেয়ে সুনিশ্চিত আশ্রয়স্থলে : নিজের ভেতরে। তার এ-গাল লাল হয়ে ওঠা, এ-রক্তাভ চোখ, এগুলো তার তীব্র শোকাহত আত্মার দৃষ্টিগ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কী? তার ত্বকের কাছে স্নিগ্ধশীতল, বড়ো জোর জিভে একটু নোনতা লাগে, একটু তিক্ত হ'লেও অশ্রু এক রকম মৃদু আদর; এ-দয়ালু ধারার নিচে দগ্ধ হয় তার মুখমণ্ডল। অশ্রু একই সঙ্গে অভিযোগ ও সান্ত্বনা, জ্বর ও শান্তিদায়ক প্রশমন। অশ্রু নারীর পরমতম অজুহাত: ঝোড়ো বাতাসের মতো আকস্মিক, থেকে থেকে দেখা দিয়ে, তুফানের মতো, এপ্রিলের বর্ষণের মতো, অশ্রু নারীকে ক'রে তোলে একটি বিলাপাতুর ফোয়ারা, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশ। তার দু-চোখ অন্ধ, কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসে; দৃষ্টিহীন, চোখ বিগলিত হয় বৃষ্টিধারায়; অন্ধ, সে ফিরে আসে প্রাকৃতিক বস্তুর অক্রিয়তায়। কেউ তাকে জয় করতে চায়, কিন্তু সে নিমজ্জিত হয়ে থাকে তার পরাজয়ের মধ্যে; সে পাথরের মতো নিমজ্জিত হয়, ডুবে মৃত্যুবরণ করে, যে-পুরুষ তার ধ্যান করে তাকে সে এড়িয়ে চলে, যেনো সে কোনো জলপ্রপাতের মুখোমুখি অসহায়। পুরুষটি একে মনে করে অন্যায় কাজ; কিন্তু নারী শুরু থেকেই এ-সংগ্রামকে অন্যায় মনে করে, কেননা তার হাতে আর কোনো কার্যকর অস্ত্র তুলে দেয় হয় নি। সে আরেকবার নিয়েছে যাদুর আশ্রয়। এবং তার ফুঁপিয়ে কান্না যে পুরুষকে রাগিয়ে তোলে, তাও তার ফুঁপিয়ে কান্নার আরেক কারণ।

যখন অশ্রু তার বিদ্রোহের প্রকাশের জন্যে অপ্রতুল হয়ে ওঠে, তখন সে এমন সব অসম্বদ্ধ হিংস্রতার দৃশ্য ঘটায়, যা পুরুষকে আরো বিব্রত ক'রে তোলে। কোনো কোনো সামাজিক বৃত্তে স্বামী তার স্ত্রীকে সত্যিই ঘুষি মারতে পারে; অন্যান্য বৃত্তে সে হিংস্রতার আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকে শুধু এ-কারণে যে সে অধিকতর শক্তিশালী এবং তার মুষ্টি একটা কার্যকর অস্ত্র। কিন্তু নারী, শিশুর মতো, ফেটে পড়ে প্রতীকী বিস্ফোরণে : সে আক্রমণ করতে পারে পুরুষটিকে, তাকে মারতে পারে খামচাতে

২২

পারে, তবে এটা একটা ইঙ্গিত মাত্র। তবে স্নায়বিক সংকটের নির্বাক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে সে-অবাধ্যতা, যা সে বাস্তবে পালন করতে পারে না। তার ভয়ানক বিক্ষুব্ধ আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর প্রবণতার শারীরবৃত্তিক কারণ ছাড়াও আছে অন্যান্য কারণ : ভয়ানক বিক্ষুব্ধ আলোড়ন হচ্ছে শক্তির অভ্যন্তরণীকরণ, যা বাইরের দিকে চালিত করার পর সেখানে কোনো বস্তুর ওপর ক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়; এটা হচ্ছে পরিস্থিতিজাত সমস্ত নঞর্থক শক্তির লক্ষ্যহীন বর্ষণ। ছোটো সন্তানদের সাথে মায়ের স্নায়বিক সংকট ঘটেই না, কেননা সে তাদের শাস্তি দিতে পারে, মারতে পারে; বরং তার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে, তার স্বামী, বা তার প্রেমিক, যাদের ওপর তার কোনো সত্যিকার ক্ষমতা নেই, তাদের সঙ্গেই নারীর ঘটে উন্মত্ত বদমেজাজের ঘোর। মাদাম তলস্তয়ের স্নায়ুবিকারগ্রস্ত আবেগের বিস্ফোরণ ঘটানোর দৃশ্যগুলো তাৎপর্যপূর্ণ; সন্দেহ নেই কখনোই তাঁর স্বামীকে বোঝার চেষ্টা না ক'রে তিনি খুব ভুল করেছিলেন, এবং তাঁর দিনপঞ্জির আলোকে তাঁকে মনে হয় অনুদার, সংবেদনাহীন, এবং আন্তরিকতাহীন, তাঁকে কিছুতেই আকর্ষণীয় মানুষ মনে হয় না। তবে তিনি ঠিক ছিলেন না ভুল করেছিলেন, তা যা-ই হোক, তাতে তাঁর পরিস্থিতির বিভীষিকার বদল ঘটে না। সারাজীবন ভ'রে তিনি কিছু করেন নি, নিরন্তর নিন্দার মধ্যে, বৈবাহিক বিধির মধ্যে, তাঁকে শুধু সহ্য করতে হয়েছে মাতৃত্ব, নৈঃসঙ্গ, এবং তাঁর ওপর তাঁর স্বামীর চাপিয়ে দেয়া জীবনের ধরন। তলস্তয়ের নতুন কোনো হুকুম যখন বিরোধকে তীব্রতর ক'রে তুলতো, তলস্তয়ের নির্মম ইচ্ছের সামনে তিনি অসহায় হয়ে পড়তেন, তিনি তখন তাঁর সমস্ত অক্ষম শক্তি দিয়ে তার বিরোধিতা করতেন; তিনি ফেটে পড়তেন অস্বীকার করার নাটকীয়তায়– ভান করতেন আত্মহননের, ভান করতেন পালানোর, ভান করতেন অসুস্থতার, এবং আরো এমন বহু কিছুর– এসব তাঁর চারপাশের লোকজনের কাছে মনে হতো উৎকট এবং তাঁর নিজের জন্যে ছিলো ক্ষতিকর। তাঁর পক্ষে এ-ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব ছিলো, এটা মনে করা খুবই কঠিন, কেননা তাঁর বিদ্রোহের অনুভূতিগুলো গোপন ক'রে রাখার মতো কোনো সদর্থক কারণ তাঁর ছিলো না, এবং সেগুলোকে কার্যকররূপে প্রকাশের কোনো উপায়ও তাঁর ছিলো না।

যে-নারী পৌঁছে গেছে তার প্রতিরোধের সীমান্তে, তার সামনে খোলা আছে মুক্তির একটি পথ– সেটা আত্মহত্যা। তবে মনে হয় যেনো পুরুষের থেকে নারী এর আশ্রয় নেয় কম। এখানে পরিসংখ্যান খুবই দ্ব্যর্থবোধক। সফল আত্মহত্যার ঘটনা নারীর থেকে পুরুষের ক্ষেত্রে ঘটে অনেক বেশি, তবে নিজেদের জীবন শেষ ক'রে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ নারীদের ক্ষেত্রে ঘটে অনেক বেশি। এটা হয়তো এ-কারণে যে নারীরা ভাব দেখিয়েই বেশ তৃপ্তি বোধ করে : প্রকৃতপক্ষে তারা যতোটা *চায়* তার চেয়ে অনেক বেশি *ভান করে* আত্মবিনাশের। এটা আংশিকভাবে এ-কারণেও যে প্রচলিত নৃশংস পদ্ধতিগুলো বিকর্ষণীয় : নারীরা প্রায় কখনোই ছুরিকা ও তরবারি বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে না। তারা, ওফেলিয়ার মতো, সাধারণত জলে ডুবে মরে, একথা প্রমাণ ক'রে যে জলের সাথে নারীর আছে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেখানে, নিথর অন্ধকারে, জীবনের অক্রিয় অবসান ঘটবে ব'লে মনে হয়। সাধারণভাবে এখানে আমরা আবার দেখতে

পাই সে-দ্ব্যর্থবোধকতা, যার প্রতি আমি আগেই ইঙ্গিত করেছি : নারী যা তীব্রভাবে ঘৃণা করে, নারী তা সততার সঙ্গে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করে না। সে সম্পর্কচ্ছেদের ভাব করে, কিন্তু পরিশেষে থাকে সে-পুরুষটির সাথেই, যে তার সমস্ত দুঃখকষ্টের কারণ; যে-জীবন তাকে কষ্ট দেয়, সেটি সে ত্যাগ করার ভান করে, কিন্তু তার পক্ষে নিজেকে হত্যা করার সাফল্য লাভ তুলনামূলকভাবে দুর্লভ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার বিশেষ রুচি নেই। পুরুষের বিরুদ্ধে, জীবনের বিরুদ্ধে, তার পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করে, কিন্তু সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে না।

নারীর আচরণের বহু দিক আছে, যেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে প্রতিবাদের নানা রূপ হিশেবে। আমরা দেখেছি নারী প্রায়ই তার স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করে প্রকাশ্যে অবাধ্যতা দেখিয়ে এবং তা আনন্দের জন্যে নয়; এবং সে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসাবধান ও অপব্যয়ী হ'তে পারে, কেননা তার স্বামী সুশৃঙ্খল ও মিতব্যয়ী। যে-নারীবিদ্বেষীরা অভিযোগ করে যে নারীরা সব সময়ই দেরি করে, তারা মনে করে নারীর সময়ানুবর্তিতার বোধ নেই; তবে আমরা দেখেছি সত্য হচ্ছে যে নারী সময়ের দাবির সঙ্গে নিজেকে ভালোভাবেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যখন সে দেরি করে, তখন উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা থেকেই দেরি করে। কিন্তু ছেনাল নারী মনে করে এভাবে তারা উদ্দীপ্ত করে পুরুষের কামনা এবং তাদের উপস্থিতিকে ক'রে তোলে অতিশয় আকর্ষণীয়; কিন্তু একটি পুরুষকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে বাধ্য ক'রে নারী সর্বোপরি প্রতিবাদ জানায় সে-দীর্ঘ প্রতীক্ষার বিরুদ্ধে : তার জীবনের বিরুদ্ধে।

এক অর্থে তার সমগ্র অস্তিত্বই হচ্ছে প্রতীক্ষা, কেননা সে আটকে আছে সীমাবদ্ধতা ও অনিশ্চিত সম্ভাবনার অবহেলিত অবস্থার মধ্যে; এবং যেহেতু তার যাথার্থ্য প্রতিপাদন সব সময়ই অন্যদের হাতে। সে প্রতীক্ষা করে পুরুষের শ্রদ্ধাঞ্জলির, অনুমোদনের, সে প্রতীক্ষা করে প্রেমের, সে প্রতীক্ষা করে তার স্বামী বা তার প্রেমিকের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার। সে তার জীবিকার প্রতীক্ষা করে, যা আসে পুরুষের কাছে থেকে; সে নিজে চেক-বই রাখুক বা স্বামীর কাছে থেকে নিতান্তই সাপ্তাহিক বা মাসিক ভাতা পাক, নারীটিকে দোকানদারের পাওনা শোধের জন্যে বা নিজের জন্যে একটি নতুন পোশাক কেনার জন্যে পুরুষটির দরকার হয় বেতন তোলা। নিজের মুখ দেখানোর জন্যে সে পুরুষের প্রতীক্ষা করে, কেননা তার আর্থিক পরনির্ভরতা তাকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখে; পুরুষের জীবনের সে একটি উপাদান মাত্র, আর পুরুষ তার সমগ্র অস্তিত্ব। ঘরের বাইরে স্বামীটির আছে নিজের পেশা, এবং স্ত্রীটিকে দিনভর সহ্য করতে হয় তার অনুপস্থিতি; আর প্রেমিক– যদিও সে সংরক্ত– তবু সে-ই নিজের সুবিধা অনুসারে ঠিক করে কখন তাদের দেখা হবে ও বিচ্ছেদ ঘটবে। বিছানায়, সে প্রতীক্ষায় থাকে পুরুষের কামনার, সে কামনা করে– অনেক সময় উদ্বেগভরে– তার আপন সুখের।

মোট সে যা করতে পারে, তা হচ্ছে তার প্রেমিক অভিসারের জন্যে যে-স্থান ঠিক করেছে, সেখানে দেরি ক'রে উপস্থিত হ'তে পারে, তার স্বামী যে-সময়ে তাকে তৈরি হ'তে বলেছে, সে-সময়ে সে তৈরি না হ'তে পারে; ওই উপায়ে সে জ্ঞাপন করে তার নিজের বৃত্তির গুরুত্ব, সে জোর দিয়ে জ্ঞাপন করে তার স্বাধীনতা; এবং ওই মুহূর্তে সে

হয়ে ওঠে অপরিহার্য কর্তা, যার ইচ্ছের কাছে অন্যজন অক্রিয়ভাবে আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু এসব হচ্ছে প্রতিশোধ নেয়ার ভীরু উদ্যোগ; পুরুষদের প্রতীক্ষায় রাখার জন্যে সে নাছোড়বান্দার মতো যতোই অটল থাকুক না কেনো, সে কিছুতেই সে-অন্তহীন ঘণ্টাগুলোর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না, যা সে ব্যয় করেছে পুরুষের শুভ ইচ্ছের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থেকে ও আশায় আশায়।

পুরুষের বিশ্বকে নারী উপলব্ধি করতে পারে না, কেননা তাদের অভিজ্ঞতা তাদের যুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করতে শেখায় না; এর বিপরীতে, পুরুষের যন্ত্রপাতি নারীর রাজ্যের সীমান্তে এসে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মানব-অভিজ্ঞতার আছে একটি সমগ্র এলাকা, যা পুরুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করতে চায়, কেননা সে তা *ভাবতে* পারে না : যে-অভিজ্ঞতা *যাপন করে* নারী। যে-প্রকৌশলী তার রেখাচিত্র তৈরির সময় খুবই যথাযথ, বাড়িতে সে আচরণ করে একটা গৌণ দেবতার মতো : একটা শব্দ, আর দ্যাখো, তার খাবার দেয়া হয়ে গেছে, তার জামা ইস্ত্রি হয়ে গেছে, তার সন্তানেরা চুপ হয়ে গেছে; জন্মদান মুসার যাদুদণ্ড দোলানোর মতোই এক দ্রুতগতিশীল কর্ম; সে এসব অলৌকিক কাণ্ডের মধ্যে স্তম্ভিত হওয়ার মতো কিছু দেখতে পায় না। অলৌকিক কাণ্ডের ধারণা ইন্দ্রজালের বোধ থেকে ভিন্ন : যৌক্তিক কার্যকারণের মধ্যে এটা উপস্থিত করে কারণহীন ঘটনার এক আমূল ধারাবাহিকতাহীনতা, যার মুখোমুখি ভেঙেচুরে পড়ে চিন্তাভাবনার অস্ত্রগুলো; আর সেখানে ঐন্দ্রজালিক প্রপঞ্চগুলো সমন্বিত হয় গুপ্ত শক্তিরাশির দ্বারা, যার ধারাবাহিকতা– না বুঝেও– গ্রাহ্য হ'তে পারে সহজ-বশ-মানা একটি মনের কাছে। নবজাতক শিশু পিতৃসুলভ গৌণ দেবতাটির কাছে এক অলৌকিক ব্যাপার, আর সে-মায়ের কাছে এটা এক ঐন্দ্রজালিক ঘটনা, যে তার পেটের ভেতরে এর সঙ্গে আপোষমীমাংসায় পৌঁছোনোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পুরুষটির অভিজ্ঞতা বোধগম্য, তবে বিঘ্নিত হয় নানা ফাঁক দিয়ে; নারীর অভিজ্ঞতা, এর সীমার মধ্যে, রহস্যময় ও অবোধ্য, তবে পূর্ণাঙ্গ। এ-অবোধ্যতা তাকে ক'রে তোলে গুরুভার; নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে পুরুষটিকে মনে হয় লঘু : পুরুষটির লঘুত্ব হচ্ছে একনায়কদের, সেনাপতিদের, বিচারকদের, আমলাদের, আইনের বিধানের, ও বিমূর্ত নীতিমালার লঘুত্ব। যখন এক গৃহিণী তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছে, 'পুরুষ, তারা চিন্তা করে না!', তখন সে নিঃসন্দেহে এটাই বুঝিয়েছে। নারী আরো বলে :'পুরুষ, তারা জানে না, তারা জীবনকে জানে না।' আরাধনারত ম্যান্টিসের কিংবদন্তির বিপরীতে নারী তুলে ধরে চপল ও অনধিকারচর্চাপ্রবণ পুং মৌমাছির প্রতীক।

পুরুষ তার কর্তৃত্বের পক্ষে সানন্দে মেনে নেয় হেগেলের ধারণা যে কোনো নাগরিক নিজেকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বজনীনের দিকে প্রসারিত হওয়ার মধ্যেই লাভ করে তার নৈতিক মর্যাদা, তবে ব্যক্তিমানুষ হিশেবে তার অধিকার আছে কামনা পোষণের ও আনন্দ লাভের। তাই নারীর সাথে তার সম্পর্ক অবস্থিত একটি ঘটনাচক্রজাত এলাকায়, যেখানে নৈতিকতা আর কাজ করে না, যেখানে আচরণ এক অনীহার ব্যাপার। অন্যান্য পুরুষের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে আছে মূল্যবোধ; সে একজন স্বাধীন সংঘটক, যে সকলের কাছে সম্পূর্ণ স্বীকৃত বিধান

অনুসারে সম্মুখিন হয় আরেক স্বাধীন সংঘটকের; কিন্তু নারীর সাথে সম্পর্কের মধ্যে– নারীকে উদ্ভাবন করা হয়েছিলো এ-উদ্দেশ্যেই– সে বর্জন করে অস্তিত্বের দায়িত্ব, সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে তার *আঁ-সোর* কাছে, বা স্থির, হীনতর প্রকৃতির কাছে, সে নিজেকে স্থাপন করে অসত্যতার স্তরে। সে দেখা দেয় স্বৈরাচারী, ধর্ষকামী, হিংস্র, বা বালসুলভ, মর্ষকামী, কলহপ্রিয় রূপে; সে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে তার আবিষ্টতা ও খেয়াল; সামাজিক জীবনে তার অর্জিত অধিকারগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সে 'আরামে থাকে', সে 'অবসর যাপন করে'।

তার স্ত্রী প্রায়ই অবাক হয় স্বামীর প্রকাশ্যে উচ্চারিত চমৎকার কণ্ঠস্বর ও আচরণ, এবং 'অন্ধকারের ভেতরে তার অধ্যবসায়ী উদ্ভাবন'-এর বৈপরীত্য দেখে। সে উচ্চ জন্মহারের পক্ষে প্রচার চালায়, কিন্তু নিজের জন্যে যতোটা সুবিধাজনক তার থেকে বেশি সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে সে থাকে সুকৌশলী। সে গুণকীর্তন করে সতী ও বিশ্বাসিনী স্ত্রীর, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ডাকে ব্যভিচারের জন্যে। আমরা দেখেছি পুরুষ কতোটা ভণ্ডামোর সাথে গর্ভপাতকে একটি অপরাধমূলক কাজ ব'লে হুকুম জারি করে, আর সেখানে ফ্রান্সে প্রতিবছর পুরুষেরা এক মিলিয়ন নারীকে ফেলে গর্ভপাতের অবস্থানে; স্বামী বা প্রেমিক প্রায়ই চায় এ-সমাধান; এছাড়াও প্রায়ই তারা মৌনভাবে ধ'রে নেয় যে দরকার হ'লে এটাই করতে হবে। তারা খোলাখুলিভাবে নির্ভর করে এর ওপর, যাতে নারী স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিজেকে ক'রে তোলে অপরাধী : পুরুষের শ্রদ্ধেয় নৈতিক সমাজের সঙ্গতিবিধানের জন্যে নারীর 'অনৈতিকতা' দরকার।

এ-কপটতার সবচেয়ে জাজ্বল্যমান উদাহরণ হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তির প্রতি পুরুষের মনোভাব, কেননা তার প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয় এ-সরবরাহ। আমি উল্লেখ করেছি কী রকম ঘৃণ্য সন্দিগ্ধচিত্ততার সাথে বেশ্যারা দেখে থাকে সম্মানিত ভদ্রলোকদের, যারা সাধারণত এ-পাপের নিন্দা করে, কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সাথে; তবুও যে-সব মেয়ে নিজেদের দেহ ব্যবহার ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের তারা গণ্য করে বিকৃত ও ভ্রষ্টা ব'লে, কিন্তু যে-পুরুষেরা তাদের ব্যবহার করে, তাদের নয়। একটি সত্য কাহিনী চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেয় এ-মানসিকতা। এ-শতকের শুরুতে বারো ও তেরো বছরের দুটি ছোটো মেয়েকে পুলিশ পায় একটি বেশ্যালয়ে; বিচারে সাক্ষী দেয়ার সময় মেয়ে দুটি তাদের খদ্দেরদের কথা বলে, যারা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এবং একটি মেয়ে তাদের একজনের নামও বলতে যায়। বিচারক তখনই তাকে থামিয়ে দেয় : 'তুমি একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষের নামকে কালিমালিপ্ত করতে পারো না।' *লেজিওঁ দ'অনর* উপাধিভূষিত ভদ্রলোক একটি ছোটো মেয়ের সতীত্বমোচনের সময়ও থাকেন সম্ভ্রান্ত পুরুষ; তাঁর একটু দুর্বলতা থাকতে পারে, তা কার নেই? আর সেখানে ওই ছোটো মেয়েটি, যার কোনো উচ্চাকাঙ্খা নেই বিশ্বজনীন নৈতিকতার জগতের দিকে এগোনোর– যে ম্যাজিস্ট্রেট নয়, বা জেনারেল নয়, বা একজন মহান ফরাশি নয়, একটা ছোট্ট মেয়ে ছাড়া যে আর কিছু নয়– তারই নৈতিকতা বিপন্ন হয় কামের অনিশ্চিত এলাকায় : সে বিকৃত, দূষিত, পাপিষ্ঠ, সে মানসিক ও নৈতিক সংশোধন গারদে বন্দী থাকার যোগ্য।

নারী পালন করে সে-সব গুপ্তচরের ভূমিকা, ধরা পড়লে যাদের তুলে দেয়া হয় গুলিবর্ষী সেনাদলের সামনে, এবং সফল হ'লে বোঝাই করা হয় পুরস্কারে; পুরুষের সমস্ত অনৈতিকতা কাঁধে তুলে নেয়া তার দায়িত্ব : শুধু বেশ্যারাই নয়, সব নারীই পয়ঃপ্রণালির কাজ করে সে-ঝলমলে, স্বাস্থ্যকর সৌধের, যাতে বসবাস করেন সম্ভ্রান্ত ভদ্রজনেরা। তারপর যখন এ-নারীদের কাছে কেউ বলে মর্যাদা, সম্মান, আনুগত্য, পুরুষের সমস্ত অত্যুচ্চ গুণাবলির কথা, তখন এতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না যদি তারা 'এক মত' না হয়। তারা পরিহাসের হাসি হাসে বিশেষ ক'রে যখন পুণ্যবান পুরুষেরা তাদের তিরষ্কার করেন নিরাসক্ত না হওয়ার জন্যে, ছল-অভিনয়ের জন্যে, মিথ্যাচারের জন্যে। তারা ভালোভাবেই জানে যে তাদের সামনে মুক্তির আর কোনো পথ খোলা নেই। পুরুষও টাকা ও সাফল্যের ব্যাপারে 'নিরাসক্ত' নয়, তবে তার কাজের মধ্যে এগুলো অর্জনের উপায় তার আছে। নারীর জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে পরজীবীর ভূমিকা– এবং প্রতিটি পরজীবীই শোষক। নারীর পুরুষ দরকার মানবিক মর্যাদার জন্যে, খাওয়ার জন্যে, জীবন উপভোগের জন্যে, জন্মদানের জন্যে; সে এসব উপকার পেয়ে থাকে লিঙ্গের সেবাদানের মাধ্যমে; সে যেহেতু এসব ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই সে পুরোপুরিভাবে শোষণের এক নিমিত্তত্ব।

পুরুষের প্রতি নারীর অনুভূতির এ-দ্ব্যর্থবোধকতার পরিচয় আবারো পাওয়া যায় নিজের ও বিশ্বের প্রতি তার সাধারণ মনোভাবের মধ্যে। যে-এলাকায় সে বন্দী হয়ে আছে, সেটিকে বেষ্টন ক'রে আছে পুরুষের জগত, কিন্তু সে-জগতে হানা দেয় এমন সব দুর্বোধ্য শক্তি, যেগুলোর কাছে পুরুষেরা নিজেরাই ক্রীড়নক; নারী এসব যাদুকরী শক্তির সাথে মৈত্রির সম্পর্ক পাতায়, কারণ যখন তার পালা আসবে তখন সে ক্ষমতাশীল হবে। সমাজ দাসত্বে বন্দী করে প্রকৃতিকে; কিন্তু প্রকৃতি প্রাধান্য করে তার ওপর। চেতনা দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে জীবনকে অতিক্রম ক'রে যায়, কিন্তু জীবন যখন আর তাকে সমর্থন করে না, তখন তা আর জ্বলে না। নারীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয় এ-দ্ব্যর্থকতা দিয়ে যে নারী অনেক বেশি সত্যতা দেখতে পায় একটি নগরের থেকে একটি বাগানে, একটি ভাবনার থেকে একটি ব্যাধিতে, একটি বিপ্লবের থেকে একটি জন্মের মধ্যে; সে আবার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার জন্যে অপ্রয়োজনীয়র বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সে প্রয়াস চালায় পৃথিবীর, মহামাতার, রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন বাখোফেন। পুরুষ বাস করে একটি সমঞ্জস বিশ্বে, যা এমন এক বাস্তবতা ভাবনাচিন্তা দিয়ে যা উপলব্ধি করা যায়। নারী সম্পর্কিত এক যাদুবাস্তবতার সাথে, যা অমান্য করে চিন্তাভাবনাকে, এবং সে এটি থেকে মুক্তি পায় এমন চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে, যার কোনো সত্যিকারের আধেয় নেই। নিজের অস্তিত্বকে এগিয়ে নেয়ার বদলে সে অলীক ধ্যান করে তার নিয়তির বিশুদ্ধ ভাব সম্পর্কে; কাজ করার বদলে সে কল্পলোকে স্থাপন করে নিজের মূর্তি : অর্থাৎ যুক্তিপ্রয়োগের বদলে সে স্বপ্ন দেখে। এ থেকেই এটা ঘটে যে 'প্রাকৃতিক' হয়েও সে আবার কৃত্রিমও, এবং পার্থিব হয়েও সে নিজেকে ক'রে তোলে বায়বীয়। তার জীবন কেটে যায় হাড়িপাতিল ধুয়ে, এবং এটা এক ঝলমলে উপন্যাস; সে পুরুষের অনুগত দাস, তবু সে মনে করে যে সে পুরুষের আরাধ্য মূর্তি; দৈহিকভাবে সে অবমানিত, কিন্তু সে তীব্রভাবে প্রেমের

পক্ষে। সে যেহেতু শুধু জীবনের বাস্তব ঘটনাচক্রে জড়িয়ে থাকার জন্যেই দণ্ডিত, তাই সে নিজেকে ক'রে তোলে পরম আদর্শের যাজিকা।

নারী যেভাবে দেখে তার দেহকে, তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ-পরস্পরবিপরীত মূল্য। এটি একটি বোঝা : প্রজাতির সেবায় জীর্ণ হয়ে, প্রতিমাসে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে, অক্রিয়ভাবে বেড়ে উঠে, এটা তার কাছে বিশ্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের বিশুদ্ধ হাতিয়ার নয়, বরং এটা এক জড় শারীরিক রূপ; এটা আনন্দের সুনিশ্চিত উৎস নয় এবং এটা সৃষ্টি করে ক্ষতের যন্ত্রণা; এটা ধারণ করে বিপদ : নারী তার 'অভ্যন্তর' দিয়ে বিপন্ন বোধ করে। অন্তর ক্ষরণক্রিয়ার সঙ্গে স্নায়বিক ও সহানুভূতিশীল সংশ্রয়গুলো, যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে পেশি ও অন্ত্রতন্ত্র, সেগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে এটা এক 'স্নায়ুবিকারগ্রস্ত' দেহ। তার দেহ প্রদর্শন করে এমন প্রতিক্রিয়া, যার দায় নিতে নারী অস্বীকার করে; ফুঁপিয়ে কান্নায়, বমনে, শরীরের ভয়ানক আলোড়নে, এটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে যায়, এটা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; এটা তার অন্তরঙ্গতম সত্য, কিন্তু এটা এক লজ্জাজনক সত্য, যাকে সে গোপনে রাখে। এবং তবু এটি তার মহিমান্বিত ডবল; আয়নায় একে দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়; এটা প্রতিশ্রুত সুখ, শিল্পকর্ম, জীবন্ত ভাস্কর্য; সে এটিকে রূপায়িত করে, অলঙ্কৃত করে, প্রদর্শন করে। সে যখন আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে, তখন সে ভুলে যায় তার রক্তমাংসের আকস্মিকতাকে; প্রেমের আলিঙ্গনে, মাতৃত্বে তার মূর্তি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু প্রায়ই, যখন সে তন্ময় হয়ে ভাবে নিজের সম্পর্কে, সে বিস্মিত হয় যে একই সময়ে সে সেই নায়িকা ও সেই মাংস।

রান্নাঘর সরবরাহ ক'রে ও অতীন্দ্রিয় অপ্রতিরোধ্য ভাবোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে একইভাবে প্রকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে একটি দ্বৈত মুখ। যখন সে গৃহিণী ও মা হয়, তখন সে ছেড়ে দেয় বনেবাদাড়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ, তখন সে বেশি পছন্দ করে নীরবে শক্তির বাগান চাষ করা, সে ফুলদানিতে ফুল সাজায় : তবুও সে অভিভূত হয় চন্দ্রালোক ও সূর্যাস্ত দিয়ে। পার্থিব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সব কিছুর আগে সে দেখে খাদ্য ও অলঙ্কার; কিন্তু তাদের ভেতরে সঞ্চালিত হয় একটি রস, যা হচ্ছে মহত্ত্ব ও ইন্দ্রজাল। জীবন শুধু সীমাবদ্ধতা ও পুনরাবৃত্তি নয় : এর আলোতে চোখ-ধাঁধানো একটি মুখও আছে; পুষ্পিত উদ্যানে এটা দেখা দেয় সৌন্দর্যরূপে। তার জরায়ুর উর্বরতা দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা প'ড়ে নারী ভেসে যায় এর প্রাণসঞ্চারক মৃদুমন্দ বায়ুতেও, যা হচ্ছে চৈতন্য। এবং যতোটা সে থাকে অতৃপ্ত এবং, তরুণীর মতো, যতোটা সে বোধ করে অচরিতার্থ ও অসীম, তার আত্মাও ততোটাই হারিয়ে যাবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে অসীম দিগন্তের দিকে প্রসারিত পথের দৃশ্য দেখে। তার স্বামী, তার সন্তান, তার গৃহের কাছে দাসীত্বে বন্দী থেকে নিজেকে একাকী, সার্বভৌমরূপে পাহাড়ের ধারে দেখতে পাওয়া হচ্ছে পরমানন্দ; সে তখন আর মা, স্ত্রী, গৃহিণী নয়, সে একটি মানুষ; সে অক্রিয় বিশ্বকে নিবিষ্টভাবে অবলোকন করে, এবং তার মনে পড়ে যে সে একটি পূর্ণাঙ্গ সচেতন সত্তা, একটি অপর্যবসেয় স্বাধীন ব্যক্তি। জলের রহস্য ও পর্বতশিখরের গগনমুখিতার সামনে পুরুষের আধিপত্য মিলিয়ে যায়। যখন সে হাঁটে চিরহরিৎ গুল্মের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, তার হাত ডুবোয় স্রোতধারায়,

তখন সে অন্যের জন্যে বাঁচে না, বাঁচে নিজের জন্যে। যে-নারী তার সমস্ত দাসীত্বের মধ্যেও বজায় রেখেছে তার স্বাধীনতা, সে প্রকৃতির মধ্যে তার স্বাধীনতাকে ভালোবাসবে অতিশয় আকুল হয়ে। অন্যরা সেখানে অজুহাত পাবে শুধু মার্জিত তুরীয় আনন্দের; এবং গোধূলিবেলায় তারা দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে ঠাণ্ডা লাগার বিপদ ও আত্মার পরমোল্লাসের মধ্যে।

স্বাধীনতার বিকাশ ঘটানো– এমনকি নারীর জন্যেও– আধুনিক সভ্যতার একটি দায়িত্ব; এ-সভ্যতায় ধর্ম যতোটা বাধ্যকরণের হাতিয়ার তার চেয়ে অনেক বেশি ধোঁকা দেয়ার হাতিয়ার। বিধাতার নামে নিজেকে পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট ব'লে মেনে নেয়ার জন্যে নারীকে ততোটা আর আদেশ দেয়া হয় না, বরং, বিধাতাকে ধন্যবাদ, তাকে বিশ্বাস করতে বলা হয় যে সে প্রভুসুলভ পুরুষের সমান; এমনকি বিদ্রোহ করার প্রলোভনকেও দমন করা হয় এ-দাবি ক'রে যে অবিচার যা হয়েছিলো, তা দূরীভূত হয়েছে। নারীকে আর সীমাতিক্রমণতা থেকে বঞ্চিত করা হয় না, কেননা নারীকে তার সীমাবদ্ধতা উৎসর্গ করতে হবে বিধাতার কাছে; আত্মার বিশেষ মূল্য পরিমাপ করা হবে শুধু স্বর্গে, পৃথিবীতে তাদের সিদ্ধি অনুসারে নয়। যেমন বলেছেন দস্তয়েভস্কি, এ-নিম্নলোকে এটা নানা ধরনের কাজের ব্যাপার মাত্র : জুতো পালিশ করার বা একটা সেতু নির্মাণের, সবই একই রকমের অসার দম্ভ; সামাজিক বৈষম্যের থেকে উর্ধ্বস্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু-লিঙ্গের সাম্য। এ-কারণেই ছোটো মেয়ে ও কিশোরী তাদের ভাইদের থেকে অনেক বেশি ঐকান্তিকভাবে ধর্মের ভক্ত; বিধাতার চোখ, যা বালকের সীমাতিক্রমণতাকে অতিক্রম ক'রে যায়, বালকটিকে লজ্জিত করে : এ-মহাশক্তির অভিভাবকত্বের নিচে সে চিরকাল থাকবে শিশু; তার পিতার অস্তিত্ব নপুংসকীকরণের যে-ভয় দেখিয়েছিলো তাকে, এটা তার থেকেও বেশি আমূলবাদী নপুংসকীকরণ। তবে 'চিরশিশু'টি যদি হয় স্ত্রীলিঙ্গ, তাহলে সে এ-চোখের কাছে পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে, যা তাকে রূপান্তরিত করে দেবদূতদের বোনে। এটা রহিত করে শিশ্নের সুবিধা। হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষা এড়োনোয় ছোটো বালিকার জন্যে আন্তরিক ধর্মবিশ্বাস একটা বিশাল উপকার : সে পুরুষও নয় নারীও নয়, সে বিধাতার জীব।

সত্য হচ্ছে নারীরা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের বাসনা পরিতৃপ্ত করার একটি ছুতো হিশেবে। সে কি কামশীতল, মর্ষকামী, ধর্ষকামী? মাংসকে অস্বীকার ক'রে, শহিদের অভিনয় ক'রে, তার চারদিকের সমস্ত জীবন্ত প্রণোদনাকে ধ্বংস ক'রে সে লাভ করে সাধুতা। নিজেকে বিকলাঙ্গ ক'রে, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে সে কয়েক ডিগ্রি ওপরে ওঠে মনোনীতদের স্তরক্রমে; যখন সমস্ত পার্থিব সুখ থেকে বঞ্চিত ক'রে সে শহিদ করে তার স্বামী ও সন্তানদের, তখন সে স্বর্গে তাদের জন্যে তৈরি করতে থাকে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান। তাঁর ধার্মিক জীবনীকারের বর্ণনানুসারে 'নিজের পাপের জন্যে নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে' কর্তোনার মার্গারেত নির্দয় আচরণ করতেন তাঁর অবৈধ সন্তানের সাথে; সমস্ত ভবঘুরে ভিখিরিদের খাওয়ানোর পরই শুধু তিনি ছেলেটিকে খেতে দিতেন। আমরা দেখেছি, অবাঞ্ছিত সন্তানের প্রতি ঘৃণা এক সাধারণ ঘটনা : এটা দৈববর– আক্ষরিকার্থেই– তাই এর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ক্রোধ দেখানো যায়। তার দিকে থেকে, সহজ সতী নারীরা সহজেই বিধাতার সাথে সব কিছু ঠিকঠাক ক'রে

নেয়; আগামীকাল সে ঘোষণা পাবে তার পাপমুক্তির, এ-আত্মপ্রত্যয় ধার্মিক নারীকে প্রায়ই সাহায্য করে তার আজকের বিবেকের অস্বস্তি জয় করতে।

তাই 'চিরন্তন' পুরুষ বলা যেমন বাজেকথা, তেমনি 'নারী' সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনো কিছু বলাও বাজেকথা। আমরা বুঝতে পারি কেনো সমস্ত তুলনা নিরর্থক, যেগুলো দেখাতে চায় নারী পুরুষের থেকে শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, বা সমান, কেননা তাদের পরিস্থিতি গভীরভাবে ভিন্ন। আমরা যদি পরিস্থিতির অন্তর্গত মানুষদের মধ্যে তুলনা না ক'রে এ-পরিস্থিতিগুলোর তুলনা করি, আমরা স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই যে পুরুষ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য; এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বে তার স্বাধীনতা প্রয়োগের জন্যে পুরুষের সুযোগ অনেক বেশি। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে পুরুষের সিদ্ধি নারীর সিদ্ধির থেকে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ, কেননা বাস্তবিক কোনো কিছু *করা* নারীদের জন্যে নিষিদ্ধ। তাছাড়া, তাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে নারী ও পুরুষ তাদের মুক্তিকে কীভাবে কাজে লাগায়, তার তুলনা করা *কারণকার্যগতভাবে* একটা নিরর্থক প্রচেষ্টা, কেননা তারা যা করে, তা হচ্ছে মুক্তিকে তারা স্বাধীনভাবে কাজে লাগায়। তবে নারীর স্বাধীনতা এখনো বিমূর্ত ও শূন্যগর্ভ ব'লে সে এটা প্রয়োগ করতে পারে শুধু বিদ্রোহে, যাদের গঠনমূলক কিছু করার কোনো সুযোগ নেই তাদের সামনে খোলা এটাই একমাত্র পথ। বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেয়া নিতান্তই অধিকারত্যাগ ও পলায়ন, নিজের মুক্তির জন্যে কাজ করা ছাড়া নারীর আর কোনো পথ নেই।

এ-মুক্তি অবশ্যই হ'তে হবে যৌথ, এবং এর জন্যে সবার আগে সম্পন্ন করতে হবে নারীর অবস্থার আর্থনীতিক বিবর্তন। আগেও অনেকে করেছে, এবং এখনো অনেক নারী একক উদ্যোগে চেষ্টা করেছে ব্যক্তিগত পরিত্রাণের। তাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তারা চেষ্টা করছে নিজেদের অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের– অর্থাৎ বাস্তবায়িত করতে চাচ্ছে সীমাবদ্ধতার মধ্যে সীমাতিক্রমণ। এটা কখনো কখনো হাস্যকর, প্রায়ই করুণ, তবে এটা হচ্ছে তার কারাগারকে গৌরবের স্বর্গে, তার দাসত্বকে সার্বভৌম মুক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে কারারুদ্ধ নারীর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, যা আমরা দেখতে পাবো আত্মরতিবতীতে, প্রণয়িনী নারীতে, অতীন্দ্রিয়বাদীতে।

ভাগ ৬

যাথার্থ্য প্রতিপাদন

পরিচ্ছেদ ১

আত্মরতিবতী

কখনো কখনো ধারণা পোষণ করা হয়েছে যে আত্মরতি হচ্ছে সব নারীর মৌলিক মনোভাব; কিন্তু এ-ধারণাকে বেশি দূর বাড়ানো হচ্ছে একে ধ্বংস করা, যেমন ল্য রশফুকো ধ্বংস করেছেন অহংবাদের ধারণা। আত্মরতি হচ্ছে অভেদত্ববোধের একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, যাতে অহংকে গণ্য করা হয় একটি ধ্রুব লক্ষ্য ব'লে এবং পাত্র নিজের থেকে স'রে আশ্রয় নেয় অহংয়ে। আরো অনেক মনোভাব– সত্য বা মিথ্যে– দেখা যায় নারীর মধ্যে, যার কিছু কিছু আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তবে একথা সত্য যে অবস্থা পুরুষের থেকে নারীকে অনেক বেশি চালিত করে নিজেকে নিজের প্রতি নিবদ্ধ করতে এবং তার প্রেমকে নিজের প্রতি নিয়োগ করতে।

প্রেমে দরকার পড়ে কর্তা ও কর্মের এক দ্বৈততা। আত্মরতির দিকে নারী চালিত হয় একই গন্তব্য-অভিমুখি দুটি পথ দিয়ে। কর্তা হিশেবে সে বোধ করে ব্যর্থতা; যখন সে খুবই ছোটো, তখনই তার অভাব সে-*বিকল্প অহং*য়ের, বালক যা পায় তার শিশ্নে; এর পরে তার আক্রমণাত্মক কাম থেকে যায় অতৃপ্ত। এবং যা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে পুরুষসুলভ কাজগুলো তার জন্যে নিষিদ্ধ। সে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সে কিছুই *করে* না; স্ত্রী, মা, গৃহিণী হিশেবে কাজ ক'রে সে একজন ব্যক্তি হিশেবে স্বীকৃতি পায় না। পুরুষের বাস্তবতা সে যে-গৃহগুলো তৈরি করে, যে-অরণ্যগুলো পরিষ্কার করে, যে-সব ব্যাধি সে নিরাময় করে, তার মধ্যে; কিন্তু পরিকল্পিত কোনো কর্ম ও লক্ষ্যের মাধ্যমে নিজেকে চরিতার্থ করতে না পেরে নারী বাধ্য হয় নিজের দেহের সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিজের বাস্তবতা খুঁজতে। সিয়েসের উক্তি ব্যঙ্গ ক'রে মারি বাশকির্তসেভ লিখেছিলেন : 'আমি কী? কিছুই না। আমি কী হবো? সব কিছু।' যেহেতু তারা কিছুই নয়, তাই বহু নারী চাপা ক্রোধে নিজেদের সমস্ত আগ্রহ নিবদ্ধ করে শুধু তাদের অহংয়ের প্রতি এবং সেগুলোকে এতোটা ফুলিয়ে তোলে যে সেগুলোকে তারা সব কিছুর সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। আবার, মারি বাশকির্তসেভ বলেছেন, 'আমি আমার নিজের নায়িকা।' যে-পুরুষ কাজ করে, সে নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে বাধ্য হয়। অকার্যকর, বিচ্ছিন্ন, নারী নিজের জন্যে কোনো স্থানও পায় না

নিজের সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ধারণাও করতে পারে না; সে নিজের ওপর আরোপ করে পরম গুরুত্ব, কেননা কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিশেই তার প্রবেশাধিকার নেই।

সে যে *নিজেকে* দান করতে পারে নিজের কামনাবাসনার কাছে, তার কারণ হচ্ছে শিশুকাল থেকেই সে নিজেকে একটি বস্তু হিশেবে বোধ ক'রে এসেছে। তার শিক্ষা তাকে বলেছে নিজেকে তার সম্পূর্ণ শরীরের সাথে অভিন্ন ক'রে তুলতে, বয়ঃসন্ধি এ-দেহকে বিকশিত করেছে অক্রিয় ও কামনার বস্তু ব'লে; এটা এমন বস্তু, যা সে সাটিন বা মখমলের মতো ছুঁতে পারে, এবং প্রেমিকের দৃষ্টিতে নিবিষ্টভাবে অবলোকন করতে পারে। একলা আনন্দের সময় নারী নিজেকে একটি পুরুষ কর্তা ও নারী কর্মরূপে দু-ভাগে ভাগ করতে পারে; দালবিজের এক রোগী ইরেন এ-ভঙ্গিতেই কথা বলতো নিজের সাথে নিজে; 'আমি নিজেকে ভালোবাসতে যাচ্ছি,' বা আরো সংরাগের সাথে বলতো : 'আমি নিজের সাথে সঙ্গম করতে যাচ্ছি,' বা বেদনার প্রবল বিস্ফোরণের সময় বলতো : 'আমি নিজেকে গর্ভবতী করতে যাচ্ছি।' মারি বাশকির্তসেভ যুগপৎ হয়ে ওঠেন কর্তা ও কর্ম যখন তিনি লেখেন : 'কী দুঃখ কেউ আমার বাহু ও দেহ দেখতে পায় না, এ-সজীবতা ও যৌবন।'

প্রকৃতপক্ষে, *কারো* পক্ষেই বাস্তবিকভাবে একজন *অপর* হয়ে ওঠা এবং নিজেকে সচেতনভাবে একটি বস্তু হিশেবে দেখা অসম্ভব। এ-দ্বৈততা নিতান্তই স্বপ্ন। শিশুর কাছে এ-স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় পুতুলরূপে; সে নিজের দেহে যেভাবে দেখে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মূর্তরূপে নিজেকে দেখে পুতুলের মধ্যে, কেননা সে আর পুতুল বাস্তবিকভাবে পরস্পরপৃথক। নিজের সঙ্গে নিজের একটা প্রীতিপূর্ণ সংলাপ চালানোর জন্যে দরকার পড়ে নিজে দুজন হওয়া, যা, উদাহরণস্বরূপ, প্রকাশ করেছেন মাদাম আনা দ্য নোয়াইলে তাঁর *লিভ্র দ্য মঁ ভি*-এ :

> আমি পুতুল ভালোবাসতাম; সেগুলোকে আমি আমার মতোই জীবন্ত ব'লে কল্পনা করতাম; আমার চাদরের নিচে উষ্ণভাবে আমি ঘুমোতে পারতাম না, যদি না সেগুলোকে পশম ও মখমলের কাপড়ে ভালোভাবে জড়িয়ে নিতাম... আমি কল্পনা করতাম আমি বাস্তবিকভাবেই উপভোগ করছি বিশুদ্ধ দ্বৈত নির্জনতা... শৈশবের শুরুতে আমি তীব্রভাবে অনুভব করতাম এই পূর্ণাঙ্গ থাকার, নিজে দুজন হওয়ার প্রয়োজন। ... আহা, বেদনার মুহূর্তগুলোতে যখন আমার স্বপ্নাতুর মৃদুতা হয়ে উঠতো তিক্ত অশ্রুর বলি, তখন আমার পাশে আমি কতো যে চাইতাম আরেকটি ছোটো আনাকে, যে জড়িয়ে ধরবে আমার গলা, আমাকে সান্ত্বনা দেবে, আমাকে বুঝবে! ... পরবর্তী জীবনে আমি তাকে পাই আমার হৃদয়ে এবং তাকে আমি শক্ত ক'রে ধ'রে রাখি; সে আমাকে যে-সহায়তা দিতো, তা সান্ত্বনারূপে নয়, যেমন আমি আশা করতাম, বরং দিতো সাহসরূপে।

কিশোরী তার পুতুল ছেড়ে দেয়। কিন্তু নিজেকে প্রক্ষেপ করার প্রচেষ্টায় ও তারপর আত্মপরিচয় লাভে জীবনভর নারী একটা প্রচণ্ড সহায়তা পায় তার আয়নার ইন্দ্রজালের কাছে। কিংবদন্তি ও স্বপ্নে আয়না ও ডবলের মধ্যে সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন মনোবিশ্লেষক অটো র‍্যাংক। বিশেষ ক'রে নারীতে, প্রতিবিম্বটিকে শনাক্ত করা হয় অহংরূপে। পুরুষে সুদর্শন আকৃতি নির্দেশ করে সীমাতিক্রমণতা; নারীতে, সীমাবদ্ধতার অক্রিয়তা; শুধু দ্বিতীয়টির কাজ হচ্ছে স্থির দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এজন্যে একে ধরা যেতে পারে গতিহীন, রুপোলি ফাঁদে। পুরুষ নিজেকে সক্রিয়, কর্তা রূপে অনুভব ও কামনা ক'রে নিজেকে সে একটা স্থির মূর্তিতে দেখে না; তার

কাছে এর আবেদন খুব কম, কেননা তার কাছে পুরুষের দেহকে একটি কাম্যবস্তু ব'লে মনে হয় না; আর তখন নারী, নিজেকে একটি বস্তু হিশেবে বোধ ক'রে ও তৈরি ক'রে, বিশ্বাস করে যে আয়নায় সে সত্যিই দেখছে *নিজেকে*। প্রতিবিম্বটি এক অক্রিয় ও বিদ্যমান ঘটনা, যা তার নিজের মতোই একটি বস্তু; এবং সে যেহেতু লালসা করে মাংস, তার মাংস, তাই সে দেখে যে-কাল্পনিক গুণগুলো, সেগুলোকে সে জীবন্ত ক'রে তোলে তার অনুরাগ ও কামনার মাধ্যমে। মাদাম দ্য নোয়াইলে, যিনি এ-ব্যাপারে বুঝতেন নিজেকে, আমাদের বিশ্বাস ক'রে সে-গোপনকথা বলেছেন নিম্নরূপে :

আমার ঘন ঘন-ব্যবহৃত আয়নাটিতে প্রতিফলিত হতো যে-প্রতিবিম্ব, তার থেকে আমি কম অহঙ্কার পোষণ করতাম আমার মেধাগত ক্ষমতা সম্পর্কে, যেগুলো এতো তীব্র ছিলো যে সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিলো না... শুধু শারীরিক সুখই পুরোপুরি পরিতৃপ্ত করে আত্মাকে।

শারীরিক সুখ কথাগুলো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অস্পষ্ট ও অশুদ্ধভাবে। আত্মাকে যা পরিতৃপ্ত করে, তা হচ্ছে যখন মনকে প্রমাণ করতে হবে নিজেকে, তখন সেখানে, আজ, কল্পিত মুখভাবটি আছে এক নিঃসন্দিগ্ধ, বিদ্যমান ঘটনারূপে। সমগ্র ভবিষ্যৎ সংহত হয়ে আছে সে-আলোকপাতের মধ্যে, যা হচ্ছে আয়নার ফ্রেমে বন্দী এক মহাবিশ্ব; এ-সংকীর্ণ সীমার বাইরে সব কিছু এক বিশৃঙ্খল গোলমাল; বিশ্ব পর্যবসিত হয়েছে এ-আয়নার পাতে, যাতে স্থির হয়ে আছে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল মূর্তি : অনন্যা। প্রতিটি নারী, যে তন্ময় হয়ে পড়ে তার প্রতিফলনে, একা, সার্বভৌমরূপে শাসন করে স্থান ও কালের ওপর; তার সমস্ত অধিকার আছে পুরুষ ও সম্পদ, খ্যাতি ও বিনোদ লাভের। মারি বাশকির্তসেভ তাঁর রূপের প্রেমে এতোই মুগ্ধ ছিলেন যে তিনি একে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন অবিনাশী মর্মরে; যখন তিনি লিখেছিলেন এ-শব্দগুলো, তখন তিনি নিজেকেই দান করেছিলেন অমরত্ব :

বাড়ি ফেরার পর আমি পোশাক খুলে ফেলি এবং আমার নগ্ন সৌন্দর্য দেখে মোহিত হই যেনো একে আমি আগে কখনো দেখি নি। আমার একটি ভাস্কর্য অবশ্যই তৈরি করতে হবে, কিন্তু কীভাবে? বিয়ে না করলে এটা একেবারেই অসম্ভব। কুৎসিত হয়ে উঠে একে নষ্ট করার আগে এটা অবশ্যই করতে হবে... শুধু ভাস্কর্যটি তৈরির জন্যে হ'লেও আমাকে একটি স্বামী পেতেই হবে।

অভিসারে যাওয়ার জন্যে তৈরি হওয়ার সময় সেসিল সোরেল নিজেকে চিত্রিত করেছেন এভাবে :

আমি আমার আয়নার সামনে। আমাকে আরো রূপসী দেখাতে হবে। আমি আমার সিংহের কেশর নিয়ে খাটাখাটি করতে থাকি। আমার চিরুনি থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোতে থাকে। আমার মাথাটি সোনালি রশ্মিতে ঘেরা একটি সূর্য।

আমার মনে পড়ছে আরেক তরুণীকে, যাকে আমি এক সকালবেলা দেখেছিলাম একটি কাফের প্রসাধনঘরে; তার হাতে ছিলো একটি গোলাপ এবং তাকে একটু নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিলো; সে আয়নায় তার ঠোঁট লাগায় যেনো সে পান করতে চায় তার প্রতিবিম্বটিকে, এবং স্মিত হেসে সে গুঞ্জন ক'রে ওঠে : 'মোহিনী, আমি একেবারে মনোমোহিনী!' একই সঙ্গে যাজিকা ও মূর্তি, আত্মরতিবতী গৌরবের জ্যোতিশ্চক্র প'রে চিরন্তন ভুবনের ভেতর দিয়ে উড়াল দিয়ে উঠতে থাকে ওপরে, এবং মেঘমণ্ডলের নিচে মোহিত হয়ে নতজানু হয় প্রাণীরা; সে হচ্ছে আত্মধ্যানে নিমগ্ন

বিধাতা। 'আমি নিজেকে ভালোবাসি, আমি আমার বিধাতা!' বলেছিলেন মাদাম মিয়েরোস্কি। যে-তরুণী তার আয়নায় দেখতে পেয়েছে তার নিজের দেহের গঠনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে রূপ, বাসনা, প্রেম, সুখ, সে তার সমগ্র চেতনা দিয়ে বিশ্বাস করে এ-দীপ্ত প্রত্যাদেশ টিকে থাকবে সারাজীবন। নারীটি যদি নিখুঁত রূপসী নাও হয়, তবুও সে দেখতে পায় তার মুখাবয়বে দীপ্ত হয়ে উঠেছে তার আত্মার বিশেষ সৌন্দর্য, এবং তাকে নেশাগ্রস্ত করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। 'তার রূপের জন্যে তাকে পছন্দ নাও করতে পারে, তবে তার আছে বিশেষ এক অপরূপ যাদু...'

এটা বিস্ময়কর নয় যারা কম ভাগ্যবান, তারাও অনেক সময় ভাগ পায় আয়নার পরমোল্লাসের, কেননা তারা আবেগ বোধ করে নিতান্ত এ-ঘটনায়ই যে তারা একটি মাংসের বস্তু, যা তারা সত্যিই; যেমন ঘটে পুরুষের বেলা, তরুণীর রমণীয় মাংসের বিশুদ্ধ প্রাচুর্য তাদের বিস্ময়াভিভূত করার জন্যে যথেষ্ট; এবং তারা যেহেতু নিজেদের স্বতন্ত্র কর্তা ব'লে বোধ করে, তাই তারা একটু আত্মপ্রবঞ্চনার মাধ্যমে তাদের বিশেষ গুণাবলিকে দিতে পারে একটি ব্যক্তিগত আকর্ষণীয়তা; তারা মুখে বা দেহে আবিষ্কার করবে কোনো মাধুর্যময়, অস্বাভাবিক, বা উত্তেজক কিন্তু সুখকর বৈশিষ্ট্য। তারা বিশ্বাস করে তারা যেহেতু অনুভব করে যে তারা নারী, শুধু এ-কারণেই তারা রূপসী।

এছাড়াও, ডবল লাভের জন্যে আয়নাই একমাত্র উপায় নয়, যদিও এটাই সবচেয়ে প্রিয়। অন্তর্গত সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যেকেই সৃষ্টি করতে পারে তার একটি যমজ। সে প্রায় সারাদিন ভ'রে নিঃসঙ্গ, ক'রে চলছে একঘেয়ে গৃহস্থালির কাজ, কল্পনায় একটি উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ আছে নারীর। যখন সে ছিলো অল্প বয়সী বালিকা, তখন সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে; এখন অন্তহীন বর্তমানে বন্দী থেকে সে স্মরণ করে তার ইতিহাস; সে একে আবার এমনভাবে সংশোধন করে যে একে দেয় নান্দনিক শৃঙ্খলা, মৃত্যুর আগেই সে তার অনিশ্চিত জীবনকে রূপান্তরিত করে একটি নিয়তিতে।

পুরুষদের থেকে নারীরা অনেক বেশি এঁটে থাকে বাল্যস্মৃতির সাথে : 'যখন আমি ছোট্ট মেয়ে ছিলাম...' তারা স্মরণ করে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে তারা স্বাধীন ছিলো, তাদের সামনে ছড়ানো ছিলো মুক্ত ভবিষ্যৎ; এখন তারা কম নিরাপদ, এবং তারা বর্তমানের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে আছে চাকর বা বস্তুর মতো; একদা তাদের সামনে ছিলো জয় করার জন্যে বিশ্ব, এখন তারা পরিণত হয়েছে সাধারণ্যে : লাখ লাখ স্ত্রী ও গৃহিণীর একটিতে। সে হয়ে উঠেছে যে-নারী, সে আক্ষেপ করে সে-মানুষটির জন্যে, যা সে ছিলো এক সময়, এবং সে আবার দেখতে চায় তার ভেতরের মৃত শিশুটিকে, এমনকি পুনর্জীবিত করতে চায় তাকে। তাই সে ভাবার চেষ্টা করে যে তার রুচি, ভাবনা, আবেগের মধ্যে এখনো আছে একটা অসাধারণ সজীবতা, এমনকি আছে কিছুটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বকে না মানার ঔদ্ধত্য : 'তুমি আমাকে চেনো'; 'ওই দিক দিয়ে আমি অদ্ভুত'; 'আমাকে ঘিরে আমি ফুল চাই'; ইত্যাদি। তার আছে একটি প্রিয় রঙ, একজন প্রিয় গায়ক, বিশেষ বিশ্বাস ও কুসংস্কার, যা সাধারণ্যের থেকে ওপরের। তার অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় বস্ত্রে ও তার 'অভ্যন্তর'-এ; সে তৈরি করে একটি ডবল, যা প্রায়ই রেখাচিত্রিক, তবে কখনো কখনো সেটি হয়ে ওঠে একটি নির্দিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যার ভূমিকায় নারীটি জীবনভর অভিনয় করছে। বহু নারী নিজেদের

দেখতে পায় সাহিত্যের নায়িকাদের মধ্যে : 'সে একেবারে আমার মতো!' এ-ধরনের অভিন্নতা সে বোধ করতে পারে রূপসী, রোম্যান্টিক নায়িকাদের বা শহিদ নায়িকাদের সাথে। নারী প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে আমাদের দুঃখিনী রমণীর বা অনাদৃত স্ত্রীর : 'আমি জগতের সবচেয়ে হতভাগিনী নারী।' স্টেকেল এ-ধরনের এক রোগিণী সম্পর্কে বলেছেন : 'সে আনন্দ পেতো এ-বিষাদান্তক ভূমিকায় অভিনয় ক'রে।'

একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণভাবে দেখা যায় এসব নারীর মধ্যে, তা হচ্ছে তারা মনে করে তাদের ভুল বোঝা হচ্ছে; তাদের চারপাশের লোকজন তাদের বিশেষ গুণাবলি বুঝতে ব্যর্থ; তাদের প্রতি অন্যদের এ-অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্যকে তারা অনুবাদ করে এ-ধারণায় যে তাদের অন্তরে তারা ধারণ করে কিছু গূঢ় সত্য। ঘটনা হচ্ছে তাদের অধিকাংশই নীরবে সমাহিত করেছে তাদের শৈশবের বা যৌবনের কিছু উপাখ্যান, যেগুলোর অতিশয় গুরুত্ব ছিলো তাদের জীবনে; তারা জানে তাদের আনুষ্ঠানিক জীবনীগুলোকে তাদের প্রকৃত জীবনকাহিনী ব'লে মনে করা ঠিক নয়। তবে প্রায় সময়ই আত্মরতিপরায়ণ নারীর নায়িকা নিতান্তই কাল্পনিক, কেননা সে বাস্তবিক জীবনে আত্মসিদ্ধি লাভ করে না; মূর্ত বিশ্ব তাকে দান করে নি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য : এটা এক সংগুপ্ত নীতি, ফ্লোজিস্টনের মতোই অবোধ্য এক ধরনের 'শক্তি' বা 'গুণ'। নারী তার নায়িকার বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করে, কিন্তু সে যদি তাকে প্রকাশ করতে চাইতো অন্যদের সামনে, তাহলে সে তেমন বিব্রত হতো স্পর্শাতীত অপরাধের স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে যেমন বিব্রত হয় স্নায়ুবিকল ব্যক্তি। উভয়ের ক্ষেত্রেই 'গূঢ় সত্য'টি ক'মে পরিণত হয় শূন্যগর্ভ একটি প্রত্যয়ে যে অনুভূতি ও ক্রিয়াগুলোর পাঠোদ্ধার ও সত্যতা প্রতিপাদনের জন্যে তাদের অন্তরের অন্তস্তলে আছে একটা চাবি। তাদের ইচ্ছাশক্তির রুগ্ন অভাব, জড়তা, স্নায়ুবিকল ব্যক্তিদের মধ্যে সৃষ্টি করে এ-মতিবিভ্রম; এবং দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার অসামর্থ্যই নারীকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে তার অন্তরেও আছে এক অনির্বচনীয় রহস্য। নারীর রহস্যময়তার বিখ্যাত কিংবদন্তিটি উৎসাহিত করে এ-বিশ্বাসকে এবং পালাক্রমে এর দ্বারা দৃঢ়তরভাবে বলবৎ হয়।

তার ভুল-বোঝা সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে, তার নিজের দৃষ্টিতে, বিয়োগান্তক নায়কের প্রয়োজন হয় যেমন একটা প্রধান নিয়তি, তার অংশীদার হয়ে ওঠে নারী। তার সমগ্র জীবনকে দেয়া হয় একটি আদর্শায়িত মূর্তি এবং সেটি হয়ে ওঠে এক পবিত্র নাটক। তার ভাবগম্ভীরভাবে নির্বাচিত গাউনের ভেতরে সে দাঁড়ায়, যাজকীয় বস্ত্রে যুগপৎ সে একজন যাজিকা এবং বিশ্বাসীদের হাতে শ্রীমণ্ডিত ও ভক্তদের পুজোর জন্যে উপস্থাপিত এক মূর্তি। তার গৃহ হয়ে ওঠে মন্দির, যেখানে সম্পন্ন হয় তার পুজো। আত্মরতিপরায়ণ নারী তার বস্ত্রের প্রতি যতোটা যত্নশীল ততোটাই যত্নশীল সে-সব আসবাব ও অলঙ্কারের প্রতি, যা তাকে ঘিরে থাকে।

যখন সে নিজেকে প্রদর্শন করে অন্যদের কাছে বা নিজেকে সমর্পণ করে প্রেমিকের বাহুবন্ধনে, নারী সিদ্ধ করে তার ব্রত : সে হয়ে ওঠে ভেনাস, যে তার রূপের অমূল্য সম্পদ দান করছে বিশ্বকে। সেসিল সোরেল যখন বিবের ব্যঙ্গচিত্রের কাঁচের ঢাকনাটি ভাঙেন, তখন তিনি নিজের নয়, পক্ষ নিয়েছিলেন সৌন্দর্যের; তাঁর *মেমওয়ার*-এ

দেখতে পাই সারাজীবন তিনি মরগণকে ডেকেছেন শিল্পকলা আরাধনার জন্যে। আইসোডোরা ডাঙ্কানও তা-ই করেছেন, এভাবে তিনি নিজেকে চিত্রিত করেছেন *মাই লাইফ*-এ :

> একেকটা অনুষ্ঠানের পর, আমি টিউনিক পরা, আমার চুল গোলাপে ঢাকা, আমাকে এতো রূপসী দেখাতো। কেনো উপভোগ করা হবে না এ-সৌন্দর্য?... যে-পুরুষ সারাদিন পরিশ্রম করে মগজের... তাকে কেনো নেয়া হবে না এ-সুন্দর বাহুতে এবং মুক্তি পাবে না তার কষ্ট থেকে এবং কয়েক ঘণ্টার জন্যে ভোগ করবে না সৌন্দর্য ও বিস্মরণ?

আত্মরতিবতীর সহৃদয়তা তার জন্যে একটি লাভের জন্ম দেয় : আয়নার থেকে অনেক বেশি ভালোভাবে অন্যদের চোখের ভেতরে সে দেখতে পায় গৌরবের জ্যোতিশ্চক্রখচিত তার ডবলকে। যদি সে কোনো অনুরক্ত দর্শকশ্রোতামণ্ডলি না পায়, তাহলে সে তার মন খুলে দেয় কোনো স্বীকারোক্তিগ্রহণকারীর কাছে, চিকিৎসকের কাছে, মনোচিকিৎসকের কাছে; সে যায় হস্তরেখাবিদ ও অলোকদ্রষ্টার কাছে। 'এমন নয় যে আমি তাদের বিশ্বাস করি,' বলেছে চলচ্চিত্রের একটি 'ক্ষুদেতারকা', 'তবে আমি ভালোবাসি কেউ আমার কাছে আমার নিজের সম্পর্কে কথা বলুক!' সে তার বন্ধুর কাছে বলে তার সম্পর্কে সমস্ত কথা; অন্য যে-কোনো লোকের থেকে বেশি ব্যাকুলভাবে সে তার প্রেমিকের মধ্যে খোঁজে একটি শ্রোতা। সত্যিকার প্রেমে পড়েছে যে-নারী, সে অবিলম্বে ভুলে যায় তার অহংকে। তবে বহু নারী খাঁটি প্রেমে জড়িয়ে পড়তে অসমর্থ, শুধু এ-কারণে যে তারা কখনো নিজেদের ভুলতে পারে না। তারা নিভৃত কক্ষের অন্তরঙ্গতার থেকে বেশি পছন্দ করে বড়োসড়ো মঞ্চ। এজন্যেই তাদের কাছে সমাজের গুরুত্ব : তাদের দিকে তাকানোর জন্যে তাদের দরকার চোখ, তাদের কথা শোনার জন্যে তাদের দরকার কান; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিশেবে তাদের দরকার যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ শ্রোতৃমণ্ডলি। তার নিজের ঘরের বর্ণনা ক'রে মারি বাশকির্তসেভ অবাধে করেছেন এ-স্বীকারোক্তিই : 'এভাবে লোকজন যখন এসে দেখে আমি লিখছি তখন আমি থাকি *মঞ্চেই*।' এবং আরো : 'আমি ঠিক করেছি আমি নিজেকে দেখবো *মঞ্চরূপেই*। আমি নগরে সারার থেকে উৎকৃষ্টতর একটি বাড়ি, ও বড়ো স্টুডিও তৈরি করবো।'

তাঁর ব্যাপারে, মাদাম দ্য নোয়াইলে লিখেছেন : 'আমি মুক্তাঙ্গন ভালোবাসতাম এবং এখনো ভালোবাসি... বহু অতিথি সমাগমে যারা ভয় পেতো যে এতে আমি বিরক্ত হ'তে পারি, প্রায়ই আমি ক্ষমা চেয়ে সে-বন্ধুদের আশ্বস্ত করতে সমর্থ হয়েছি এ-আন্তরিক অবাধ প্রকাশ্য স্বীকৃতির মাধ্যমে : 'আমি *খালি আসনের সামনে অভিনয় করতে* পছন্দ করি না।'

পোশাক ও কথোপকথন অনেকাংশে তৃপ্ত করে এ-নারীসুলভ প্রদর্শনের রুচি। তবে কোনো উচ্চাভিলাষী আত্মরতিবতী নিজেকে প্রদর্শন করতে চাইবে আরো কম সাধারণ ও বহুবিচিত্র রীতিতে। বিশেষ ক'রে, সে প্রায়ই নিজের জীবনকেই ক'রে তুলবে জনগণের হর্ষধ্বনির কাছে উপস্থাপিত একটি প্রদর্শনীরূপে এবং ঐকান্তিকভাবে ঢুকবে মঞ্চে। *কোরিন*-এ মাদাম দ্য স্তাল আমাদের বিস্তারিতভাবে বলেছেন হার্পসহযোগে কবিতা আবৃত্তি ক'রে তিনি কীভাবে অভিভূত করেছিলেন ইতালীয় ভিড়কে। কোপেতে

তাঁর সুইস পল্লীভবনে তাঁর একটি প্রিয় বিনোদন ছিলো বিয়োগান্তক চরিত্রের ঢঙে কথা বলা; তিনি পছন্দ করতেন ফেদ্র সেজে হিপোলিতের পোশাকপরিহিত এক বা আরেক প্রেমিকের কাছে অতিশয় ব্যাকুলভাবে প্রণয় নিবেদন করতে। পরিস্থিতি অনুকূল হ'লে অভিনয়-মঞ্চের কাছে প্রকাশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার থেকে আর কিছুই এতো গভীরভাবে তৃপ্ত করে না আত্মরতিবতীকে। 'অভিনয়-মঞ্চ,' বলেছেন জর্জেৎ লেব্লাঁ, 'আমাকে তা দেয়, যা আমি দীর্ঘকাল ধ'রে চেয়েছি : পরমানন্দ লাভের একটি কারণ। আজ একে আমার মনে হয় *ক্রিয়ার ব্যঙ্গরূপ*, এমন একটা কিছু, যা অতিরিক্ত মেজাজের জন্যে অপরিহার্য।'

তিনি যে-বাকভঙ্গিটি প্রয়োগ করেন, তা চমকপ্রদ। কাজের অভাবে নারী আবিষ্কার করে কাজের বিকল্প; কারো কারো কাছে অভিনয়-মঞ্চ একটি প্রিয় বিকল্প। অভিনেত্রীরা, অধিকন্তু, পোষণ করতে পারে নানা লক্ষ্য। কারো কারো কাছে অভিনয় হচ্ছে জীবিকার একটা উপায়, নিতান্তই একটি পেশা; অন্যদের কাছে এটা এনে দেয় এমন খ্যাতি, যা ব্যবহার করা যেতে পারে নাগরালির কাজে; আরো অন্যদের কাছে, এটা এনে দেয় তার আত্মরতির বিজয়োল্লাস। বড়ো অভিনেত্রীরা– রাশেল, দুস– খাঁটি শিল্পী, যাঁরা বিভিন্ন ভূমিকায় সীমাতিক্রমণ করেন নিজেদের; কিন্তু তৃতীয়-মানেরটি, এর বিপরীতে, সে কী অর্জন করছে তাতে উৎসাহী নয়, বরং এটা তার জন্যে যে-গৌরব বয়ে আনছে, তাতে উৎসাহী; সবার আগে সে জোর দিতে চায় তার নিজের গুরুত্বের ওপর। নিজেকে সমর্পণ করার অসামর্থ্যবশত একগুঁয়ে আত্মরতিবতী প্রেমে যেমন সীমাবদ্ধ শিল্পকলায়ও তেমনি সীমাবদ্ধ।

এ-ত্রুটির সাংঘাতিক প্রভাব পড়বে তার সমস্ত কাজের ওপরই। সে প্রলোভন বোধ করবে যে-কোনো ও প্রতিটি পথের প্রতি, যা তাকে নিয়ে যাবে খ্যাতির দিকে, কিন্তু সে কখনোই সর্বান্তকরণে কোনো একটিতে নিজেকে নিয়োজিত করবে না। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সাহিত্য, আর সমস্ত জ্ঞানের শাখা, যাতে দরকার পড়ে কঠোর শিক্ষানবিশি ও একলা প্রচেষ্টা; বহু নারী এগুলো চেষ্টা ক'রে দেখে, কিন্তু অবিলম্বে তারা এগুলো ছেড়ে দেয় যদি না তারা চালিত হয় সৃষ্টি করার ইতিবাচক বাসনা দিয়ে; অনেকে অধ্যবসায় চালিয়ে যায়, তবে তারা কাজের নামে খেলার বেশি কিছু করে না। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইজেলের সামনে কাটাতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের এতো মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসে যে চিত্রকলার প্রতি তাদের কোনো প্রকৃত ভালোবাসা থাকে না এবং তাই তারা পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। যখন কোনো নারী, মাদাম দ্য স্তাল ও মাদাম দ্য নোয়াইলের মতো, ভালো কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, তখন ব্যাপার হচ্ছে সে একান্তভাবে আত্মপুজোয়ই মগ্ন থাকে নি; তবে অজস্র নারী লেখককে অধঃপতিত করে যে-সব ত্রুটি, তার একটি হচ্ছে তাদের আত্মপ্রেম, যা তাদের আন্তরিকতাকে দূষিত করে, তাদের সীমাবদ্ধ করে, এবং তাদের মর্যাদা হ্রাস করে।

তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি প্রত্যয়শীল বহু নারী, অবশ্য, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব জগতের কাছে প্রকাশ করতে পারে না; তখন তাদের উচ্চাভিলাস দেখা দেয় কোনো একটি পুরুষ, যাকে তারা মুগ্ধ করতে পারে তাদের গুণে, তাকে মধ্যস্থতাকারীরূপে ব্যবহার করার। এমন নারী তার নিজের মূল্যবোধ অনুসারে তার স্বাধীন পরিকল্পনার

মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে না; সে তার অহংয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চায় গতানুগতিক ভাবনাচিন্তা; তাই নিজেকে প্রেরণা, কলালক্ষ্মী, এজেরিয়ারূপে পুরুষের প্রভাব ও খ্যাতির সঙ্গে অভিন্ন ক'রে তোলার আশায় সে আশ্রয় নেয় সে-সব পুরুষের, যাদের আছে প্রভাব ও খ্যাতি। লরেন্সের সঙ্গে সম্পর্কে মাবেল ডজ লুহান পরিচয় দিয়েছেন এর এক চমকপ্রদ উদাহরণের : তিনি চেয়েছেন 'লরেন্সের মনকে প্রলুব্ধ করতে, কিছু উৎপাদনে তাঁর মনকে বাধ্য করতে'; তাঁর দরকার ছিলো লরেন্সের স্বপ্নাবিভাব, তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনাপ্রতিভা; *তাঁর নিজের কিছু করার ছিলো না* ব'লে এ-দুঃখের এক ধরনের ক্ষতিপূরণ হিশেবে লরেন্সকে দিয়ে কাজ করিয়ে তিনি এক ধরনের সক্রিয়তা বোধ করতেন। তাঁর তাওসমূহের সুফল লাভের জন্যে, তিনি চাইতেন লরেন্স জয় করবে *তাঁর* মাধ্যমে। একই উপায়ে জর্জেৎ লেব্লাঁ হ'তে চেয়েছিলেন মেটারলিংকের 'খাদ্য ও শিখা'; তবে তিনি মেটারলিংকের বইয়ে তাঁর নিজের নামও চেয়েছিলেন। এখানে আমরা পাচ্ছি না সে-উচ্চাভিলাষী নারীদের, যারা নিজেদের লক্ষ্য সাধনের জন্যে ব্যবহার করে পুরুষদের, বরং পাচ্ছি সে-নারীদের, যারা *গুরুত্বলাভের* একটা মন্ময় বাসনা দ্বারা উদ্দীপিত, যার কোনো বস্তুগত লক্ষ্য নেই, এবং যারা অন্যের সীমাতিক্রমণতা চুরি করার জন্যে একাগ্রচিত্ত। তারা কোনোক্রমেই সব সময় সফল হয় না; তবে তারা নিজেদের কাছে নিজেদের ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে এবং তাদের অপ্রতিরোধ্য প্রলুব্ধকরতায় নিজেদের প্ররোচিত করতে নিপুণ। নিজেদের তারা ভালোবাসার যোগ্য, কাম্য, প্রশংসনীয় জেনে নিশ্চিত থাকে যে অন্যরা তাদের ভালোবাসছে, কামনা করছে, এবং প্রশংসা করছে।

এসব মোহ ঘটাতে পারে প্রকৃত মস্তিষ্কবিকৃতি, এবং ক্লেরাম্বল কামক্ষিপ্ততাকে অকারণে 'এক ধরনের পেশাগত ব্যাধি' ব'লে গণ্য করেন নি; নিজেকে নারী ব'লে বোধ করা হচ্ছে নিজেকে একটি কামনার বস্তু ব'লে বোধ করা, নিজেকে কাম্য ও প্রেমাস্পদ ব'লে বোধ করা। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে যে-রোগীরা এ-মোহে ভোগে যে তাদের কেউ ভালোবাসে, তাদের দশজনের মধ্যে ন-জনই নারী। এটা বেশ স্পষ্ট যে কাল্পনিক প্রেমিকের মধ্যে তারা যা চায়, তা হচ্ছে তাদের আত্মরতির মহিমান্বিতকরণ। তারা চায় একে দেয়া হোক একটা অবিসম্বাদিত মূল্য, কোনো পুরোহিত, চিকিৎসক, আইনজীবী, বা কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষ দ্বারা। এবং পুরুষটির আচরণ প্রকাশ করে যে-নিরঙ্কুশ সত্য, তা হচ্ছে পুরুষটির কল্পনার দয়িতা সর্বোপরি সমস্ত নারীর থেকে অপ্রতিরোধ্য ও শ্রেষ্ঠতর গুণাবলিতে পরিপূর্ণ।

কামক্ষিপ্ততা দেখা দিতে পারে বিচিত্র ধরনের মনোবৈকল্যের সঙ্গে, তবে এর আধেয় সব সময়ই এক। ব্যক্তিটি দীপ্তিময়ভাবে মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে এমন একজন বিখ্যাত পুরুষের প্রেম দ্বারা, যে হঠাৎ তার আকর্ষণীয়তায় মুগ্ধ হয়েছে– যখন সে এ-ধরনের কিছুই প্রত্যাশা করছিলো না– এবং যে তার আবেগ প্রকাশ করে পরোক্ষ তবে সনির্বন্ধ রীতিতে। এ-সম্পর্ক অনেক সময় থেকে যায় আদর্শ স্তরে এবং অনেক সময় ধারণ করে যৌন ধাঁচ; তবে এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নারীটি যতোটা প্রেমে পড়েছে, বিখ্যাত ও শক্তিশালী নরদেবতাটি প্রেমে পড়েছে তার থেকে বেশি এবং সে তার সংরাগ প্রকাশ করে অদ্ভুত ও দ্ব্যর্থবোধক রীতিতে।

তবে আত্মরতির কমেডি অভিনীত হয় বাস্তবতার মূল্যে; একটি কাল্পনিক চরিত্র এক কাল্পনিক জনগণের কাছে প্রশস্তিবোধের সনির্বন্ধ আবেদন জানায়; তার অহংয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে সে বাস্তবিক জগতের ওপর সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলে, অন্যদের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কোনো আগ্রহ তার থাকে না। তাঁর 'অনুরাগী'রা রাতে তাদের নোটবইয়ে লিখবে যে-সব বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য, সেগুলোর কথা যদি আগেই বুঝতেন মাদাম দ্য স্তাল, তাহলে তিনি অনেক কম উৎসাহে কথা বলতেন *ফেদ্রর* ঢঙে। তবে আত্মরতিবতী একথা মানতে অস্বীকার করে যে সে নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করে, লোকজন তাকে সে থেকে ভিন্নভাবেও দেখতে পারে, এটাই ব্যাখ্যা করে একথা যে যদিও সে সব সময়ই মগ্ন থাকে আত্মধ্যানে, তবু কেনো সে হয়ে থাকে নিজের নিকৃষ্ট বিচারক, এবং কেনো সে অতি সহজেই হাস্যকর হয়ে ওঠে। সে আর শোনে না, সে বলে; এবং যখন সে বলে তখন সে তার ভূমিকা বলে।

মারি বাশকির্তসেভ লিখেছেন : 'এটা আমাকে আমোদ দেয়। আমি তার সাথে আলাপ করি না, আমি *অভিনয় করি*, এবং আমি আছি যথার্থ-মূল্য-বুঝতে-সমর্থ এক দর্শকমণ্ডলির সামনে, এটা অনুভব ক'রে আমি দক্ষ হয়ে উঠি শিশুসুলভ ও খেয়ালি স্বরে কথা বলতে এবং ঢংয়ে।'

সে নিজেকে এতো বেশি দেখে যে সে কিছুই দেখতে পায় না; সে অন্যদের মধ্যে যেটুকু নিজের মতো ব'লে চেনে, শুধু সেটুকুই বুঝতে পারে; যা কিছু তার নিজের সঙ্গে, তার নিজের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, তা র'য়ে যায় তার বোধগম্যতার বাইরে। সে তার অভিজ্ঞতাগুলোকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে ভালোবাসে; সে জানতে চায় প্রেমের মাতলামো ও যন্ত্রণা, মাতৃত্বের, বন্ধুত্বের, নির্জনতার, অশ্রুর ও হাস্যের বিশুদ্ধ আনন্দ; তবে সে যেহেতু নিজেকে দান করতে পারে না, তাই তার আবেগগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি। সন্দেহ নেই যে তাঁর সন্তানদের মৃত্যুতে আইসোরা ডাঙ্কান সত্যিকার অশ্রু ফেলেছেন। কিন্তু যখন তিনি মস্ত যাত্রাভিনয়ের ভঙ্গিতে তাদের ভস্ম সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চান, তখন তিনি হয়ে ওঠেন একটি অভিনেত্রী মাত্র; এবং কারো পক্ষে বিবেকের অস্বস্তি ছাড়া *আমার জীবন*-এর এ-অংশটুক পড়া সম্ভব নয়, যাতে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর দুঃখের :

আমি অনুভব করি আমার নিজের দেহের উষ্ণতা। আমি তাকাই আমার নগ্ন পায়ের দিকে– ওগুলো ছড়িয়ে দিই। আমার স্তনের কোমলতা, আমার বাহু, যেগুলো কখনো স্থির নয়, বরং কোমলভাবে তরঙ্গিত হয়ে নিরন্তর দুলে যাচ্ছে, এবং আমি বুঝতে পারি যে বারো বছর ধ'রে আমি ক্লান্ত, এ-বক্ষ মনে মনে পোষণ করেছে এক অশেষ যন্ত্রণা, আমার এ-হাত দুটিতে লেগে আছে দুঃখের দাগ, আর যখন আমি একলা থাকি, তখন এ-চোখ দুটি কদাচিৎ শুষ্ক থাকে।

কিশোরী তার আত্মপুজো থেকে উদ্বিগ্নকর ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস সংগ্রহ করতে পারে; তবে তাকে অবিলম্বে পেরিয়ে যেতে হয় এ-স্তর, নইলে ভবিষ্যৎ রুদ্ধ হয়ে যায়। যে-নারী তার প্রেমিককে বন্দী করে যুগলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে, সে তার প্রেমিক ও নিজেকে বিপর্যস্ত করে মৃত্যুতে; এবং যে-আত্মরতিবতী নিজেকে অভিন্ন ক'রে তোলে তার কাল্পনিক ডবলের সাথে, সে ধ্বংস করে নিজেকে। তার স্মৃতিগুলো হয়ে ওঠে অনড়, তার আচরণ ছকবাঁধা; সে কথার পুনরুক্তি করে, সে পুনরাবৃত্তি করে

আন্তরিকতাহীন নাটকীয় আচরণের, যেগুলো ধীরেধীরে সব অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, তাই নারীদের লেখা বহু দিনপঞ্জি ও আত্মজীবনীর এমন দরিদ্রদশা; নিজের জন্যে ধূপ জ্বালানোয় পুরোপুরি নিয়োজিত থেকে, যে-নারী কিছুই করে না সে নিজেকে কিছুই ক'রে তুলতে পারে না এবং ধূপ জ্বালায় একটি অসত্তার জন্যে।

তার দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, তার সমস্ত আন্তরিকতাহীনতা সত্ত্বেও, সে সচেতন এ-অসারতা সম্পর্কে। একটি ব্যক্তি ও তার ডবলের মধ্যে কোনো সত্যিকার সম্পর্ক থাকতে পারে না, কেননা এ-ডবলের কোনো অস্তিত্ব নেই। আত্মরতিবতী হঠাৎ মুখোমুখি হয় এক মৌল হতাশার। সে একটি সমগ্রতারূপে মনে মনে নিজের ছবি আঁকতে পারে না, *পুর-সো- আঁ-সো* হওয়ার প্রতিভাস রক্ষা করতে সে অসমর্থ হয়। তার বিচ্ছিন্নতা, প্রতিটি মানুষের বিচ্ছিন্নতার মতোই, আকস্মিকতা ও নিঃসহায় পরিত্যাগরূপে অনুভূত হয়। এবং এজন্যেই- যদি সে না বদলায়- নিজের জন্যে কথা বলার জন্যে সে দণ্ডিত হয় ভিড়ের কাছে, অন্যদের কাছে, অস্থিরভাবে পালিয়ে যেতে। একথা মনে করা খুব ভুল হবে যে নিজেকে পরম লক্ষ্যরূপে গণ্য ক'রে সে মুক্তি পায় পরনির্ভরতা থেকে; বরং এর বিপরীতে, সে নিজেকে ধ্বংস ক'রে অতিশয় সার্বিক দাসত্বে। সে স্বাধীনভাবে দাঁড়ায় না, বরং নিজেকে ক'রে তোলে একটি বস্তু, যা বিপন্ন হয় বিশ্ব ও অন্য সচেতন সত্তাদের দ্বারা।

আত্মরতিবতী, প্রকৃতপক্ষে, হেতাইরার মতোই পরনির্ভর। বিশেষ একটি পুরুষের স্বৈরাচার এড়িয়ে গেলেও সে মেনে নেয় জনমতের স্বৈরাচার। এ-বন্ধন, যা তাকে বেঁধে রাখে অন্যদের সাথে, তাতে নেই বিনিময়ের পারস্পরিকতা, কেননা সে আর আত্মরতিবতী থাকতো না, যদি সে চাইতো যে অন্যরা স্বাধীনভাবে মূল্যায়ন ক'রে তাকে স্বীকৃতি দিক, এবং যদি সে এ-মূল্যায়নকে নিজের কর্মের দ্বারা অর্জনীয় লক্ষ্য ব'লে মনে করতো। তার মনোভাবের বিসঙ্গতিটি এখানে যে সে এমন এক বিশ্বের কাছে থেকে মূল্য পেতে চায়, যাকে সে নিজে মূল্যহীন মনে করে, কেননা তার বিচারে একমাত্র সে-ই মূল্যবান। অন্যদের অনুমোদন হচ্ছে একটা অমানবিক শক্তি, রহস্যময় ও চপল, এবং এটা অর্জনের যে-কোনো উদ্যোগ নিতে হবে যাদুর মাধ্যমে। তার অগভীর ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও, আত্মরতিবতী তার অনিশ্চিত অবস্থান বুঝতে পারে; এবং এ-ই ব্যাখ্যা করে কেনো সে অস্থির, অতিস্পর্শকাতর, খিটখিটে, সব সময় সম্ভাব্য বিপদের দিকে লক্ষ্য রাখে; তার অহমিকা চির-অতৃপ্ত। যতোই সে বুড়ো হ'তে থাকে, ততোই ব্যগ্রভাবে সে কামনা করে স্তুতি ও সাফল্য এবং সে আরো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে তার চারদিকের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে; বিহ্বল, আবিষ্ট, সে আত্মগোপন করে আন্তরিকতাহীনতার তমসায় এবং প্রায়ই নিজেকে ঘিরে বিকারগ্রস্ত মানসিক বৈকল্যের একটি খোলক তৈরি ক'রে পরিসমাপ্তি লাভ করে। একটি প্রবাদ আছে, যা একান্তভাবে তার বেলা যথোচিত : 'যে জীবন লাভ করেছে, সে তা হারাবে।'

পরিচ্ছেদ ২

প্রণয়িনী নারী

প্রেম শব্দটি উভয় লিঙ্গের কাছে কোনোক্রমেই একই অর্থ বোঝায় না, এবং এটাই তাদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির একটি কারণ, যা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে মতানৈক্য। বায়রন চমৎকারভাবে বলেছেন : 'পুরুষের প্রেম পুরুষের জীবনের থেকে দূরের জিনিশ, এটা নারীর সমগ্র অস্তিত্ব।' নিটশে *দি গে সায়েন্স*-এ ব্যক্ত করেছেন একই ধারণা :

> প্রেম শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও নারীর কাছে বোঝায় দুটি ভিন্ন জিনিশ। নারী প্রেম বলতে যা বোঝে, তা খুবই স্পষ্ট : এটা শুধু গভীর অনুরক্তি নয়, এটা দেহ ও আত্মার এক সামগ্রিক দান, যাতে নেই কোনো মনোভাবসংবরণ, নেই অন্য কিছু বিচারবিবেচনা। নারীর প্রেমের এ-শর্তহীন প্রকৃতি একে ক'রে তোলে একটি *ধর্মবিশ্বাস*, তার একমাত্র বিশ্বাস। পুরুষের কথা বলতে গেলে, সে কোনো নারীকে ভালোবাসলে, সে যা চায় তা হচ্ছে নারীটির প্রেম; যদি পুরুষ থেকে থাকে যারা বোধ ক'রে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বাসনা, তাহলে আমি আমার সম্মানের দোহাই দিয়ে বলছি, তারা পুরুষ নয়।

পুরুষেরা তাদের জীবনের বিশেষ কোনো সময়ে সংরক্ত প্রেমিক হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে বলা যেতে পারে 'মহাপ্রেমিক'; তীব্রতম আবেগে আত্মহারা অবস্থায়ও তারা কখনো সম্পূর্ণরূপে অধিকার ত্যাগ করে না; এমনকি দয়িতার সামনে নতজানু অবস্থায়ও তারা যা চায়, তা হচ্ছে দয়িতাকে দখল করতে; তাদের জীবনের মর্মমূলে তারা রয়ে যায় সার্বভৌম কর্তা; প্রিয়তমাটি আরো বহু মূল্যবান বস্তুর মধ্যে একটি মাত্র; তারা দয়িতাকে সন্নিবিষ্ট করতে চায় তাদের অস্তিত্বের মধ্যে এবং তার অস্তিত্বকে দয়িতার জন্যে পুরোপুরি অপব্যয় করতে চায় না। অন্য দিকে, নারীর প্রেমে পড়া হচ্ছে প্রভুর কল্যাণের জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া। যেমন বলেছেন সেসিল সভাজ : 'যখন সে প্রেমে পড়ে নারীকে ভুলে যেতে হয় তার ব্যক্তিত্ব। এটা প্রকৃতির বিধান। একটি প্রভু ছাড়া নারী অস্তিত্বহীন। একটি প্রভু ছাড়া নারী একটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফুলের তোড়া।'

সত্য হচ্ছে এখানে প্রকৃতির বিধানের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই। প্রেম সম্পর্কে পুরুষ ও নারীর ধারণার মধ্যে যে-ভিন্নতা দেখা যায়, তাতে প্রতিফলিত হয় তাদের পরিস্থিতির ভিন্নতা। যে-ব্যক্তিটি কর্তা, যে নিজে, যদি সীমাতিক্রমণতার দিকে তার থাকে সাহসী প্রবণতা, তাহলে সে প্রয়াস চালায় বিশ্বের ওপর তার অধিকার সম্প্রসারণের : সে উচ্চাভিলাষী, সে কাজ করে। কিন্তু একটি অপ্রয়োজনীয় প্রাণী অসমর্থ তার মন্ময়তার মর্মমূলের ধ্রুবকে অনুভব করতে; সীমাবদ্ধতায় দণ্ডিত কোনো সত্তা কর্মের মধ্যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। আপেক্ষিকতার জগতে বন্দী হয়ে, শৈশব থেকে পুরুষের জন্যে পূর্বনির্ধারিত হয়ে, পুরুষের মধ্যে একটি অসাধারণ

সত্তাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে, যে-পুরুষের সমকক্ষ সে হয়তো হবে না, যে-নারী তার মনুষ্যত্বের দাবি ত্যাগ করে নি, সে স্বপ্ন দেখবে সে নিজের সত্তাকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেছে এসব শ্রেষ্ঠ সত্তার কোনো একটির প্রতি, সে স্বপ্ন দেখবে নিজেকে সে মিশিয়ে দিচ্ছে সার্বভৌম কর্তার সাথে। যাকে তার কাছে উপস্থিত করা হয়েছে ধ্রুবর, অনিবার্যের প্রতীকরূপে, তার মধ্যে দেহে-মনে নিজেকে হারিয়ে ফেলা ছাড়া তার মুক্তির আর কোনো পথ নেই। যেহেতু সে কোনো-না-কোনোভাবে পরনির্ভরতায় দণ্ডিত, তাই সে স্বৈরাচারীদের– পিতামাতা, স্বামী, বা রক্ষককে মান্য করার থেকে একটি দেবতার পুজো করতেই বেশি পছন্দ করবে। সে তার দাসত্ববন্ধনকে এতো ব্যগ্রভাবে কামনা করে যে একেই মনে হয় তার স্বাধীনতার অভিব্যক্তি ব'লে; সে যে অপ্রয়োজনীয় বস্তু, এটা পুরোপুরি স্বীকার ক'রে নিয়ে সে অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিশেবে তার পরিস্থিতির উর্ধ্বে ওঠার জন্যে চেষ্টা করে; তার মাংস, অনুভূতি, আচরণের মাধ্যমে সে প্রেমিককে অধিষ্ঠিত করে পরম মূল্য ও বাস্তবতা রূপে। প্রেমিকের সামনে নিজেকে অধম ক'রে তুলে সে নিজেকে ক'রে তোলে শূন্যতা। প্রেম তার কাছে হয়ে ওঠে ধর্ম।

আমরা যেমন দেখেছি, কিশোরী মেয়ে প্রথমে নিজেকে অভিন্ন ক'রে তুলতে চায় পুরুষের সাথে; যখন সে এটা ছেড়ে দেয়, তখন সে পুরুষদের পুরুষত্বের অংশীদার হ'তে চায় তাদের একটিকে তার প্রেমে আবদ্ধ ক'রে; এমন নয় যে সে আকৃষ্ট হয় এটির বা ওটির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি; সে প্রেমে পড়ে সর্বসাধারণ পুরুষের। অবশ্য পুরুষটিকে হ'তে হয় তার শ্রেণীর ও জাতির, কেননা এ-কাঠামোর মধ্যেই চলে কামের খেলা। পুরুষকে নরদেবতা হ'তে হ'লে প্রথমে তাকে হ'তে হবে মানুষ, আর ঔপনিবেশিক কর্মকর্তার কন্যার কাছে উপনিবেশের আদিবাসীরা মানুষ নয়। কোনো তরুণী যদি নিজেকে দান করে কোনো 'নিকৃষ্ট'-এর কাছে, তাহলে সে তা করে এ-কারণে যে সে নিজেকে অধঃপতিত করতে চায়, কেননা সে বিশ্বাস করে সে কারো প্রেম লাভের অনুপযুক্ত; তবে স্বাভাবিকভাবে সে খোঁজে থাকে এমন একটি পুরুষের, যে তার কাছে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। অবিলম্বে সে বুঝে ফেলে যে অনুগ্রহপ্রাপ্ত লিঙ্গের অনেকেই দুঃখজনকভাবে ঘটনাচক্রজাত ও পার্থিব, তবে প্রথম দিকে তার অনুমানগুলো থাকে পুরুষের অনুকূলেই। সরল তরুণী মুগ্ধ হয় পৌরুষের ছটায়, এবং তার দৃষ্টিতে পুরুষের যোগ্যতা, পরিস্থিতি অনুসারে, প্রতিভাত হয় শারীরিক শক্তিতে, আচরণের আভিজাত্যে, ধনসম্পদে, সংস্কৃতিতে, বুদ্ধিতে, কর্তৃত্বে, সামাজিক মর্যাদায়, সামরিক উর্দিতে; তবে সে যা সব সময় চায়, তা হচ্ছে তার প্রেমিক হবে পুরুষত্বের সারসত্তার প্রতীক।

ঘনিষ্ঠতা প্রায়ই পুরুষের মর্যাদা বিনষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট; এটা ধ'সে পড়তে পারে প্রথম চুম্বনেই, বা দৈনন্দিন সাহচর্যে, বা বিয়ের রাত্রিতে। তবে দূরে দূরে থেকে ভালোবাসা হচ্ছে নিতান্তই একটা উদ্ভট কল্পনা, তা প্রকৃত অভিজ্ঞতা নয়। প্রেমের জন্যে কামনা তখনই শুধু হয়ে ওঠে সংরক্ত প্রেম, যখন তা শারীরিকভাবে চরিতার্থ হয়। এর বিপরীতে, দৈহিক সঙ্গম থেকে উদ্ভূত হ'তে পারে প্রেম; এ-ক্ষেত্রে কামগতভাবে অধীনস্থ নারীটির কাছে পুরুষটি প্রতিভাত হয় অসাধারণ ব'লে, যাকে

প্রথমে নারীটির কাছে মনে হয়েছিলো খুবই তুচ্ছ।

তবে এটা প্রায়ই ঘটে যে কোনো নারী যে-সমস্ত পুরুষকে জানে, তাদের কারো ওপরই দেবত্ব আরোপ করতে সে সফল হয় না। সাধারণত যা ধারণা করা হয়ে থাকে, তার থেকে নারীর জীবনে প্রেমের স্থান অনেক কম। স্বামী, সন্তান, গৃহ, হাস্যকৌতুক, সামাজিক দায়িত্ব, অহমিকা, কাম, কর্মজীবন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ নারী স্বপ্ন দেখে একটা *মহাপ্রেমের*, একটা আত্মাবিবশকর প্রেমের। তারা এর বিকল্পের সাথে পরিচিত হয়েছে, তারা এর কাছাকাছি এসেছে; এটা তাদের কাছে এসেছে আংশিক, ক্ষতবিক্ষত, হাস্যকর, অশুদ্ধ, মিথ্যে রূপ ধ'রে; তবে খুব কম নারীই এর প্রতি উৎসর্গ করেছে তাদের জীবন। সে-সব নারীই সাধারণত হয় *মহাপ্রেমিকা*, যারা কৈশোরিক প্রেমে নিজেদের লক্ষ্যহীনভাবে অপচয় করে নি; তারা প্রথমে মেনে নিয়েছে নারীর প্রথাগত নিয়তি : স্বামী, গৃহ, সন্তান; অথবা তারা বেছে নিয়েছে নির্মম নিঃসঙ্গতা; বা তারা নির্ভর করেছে কোনো কর্মোদ্যোগের ওপর, যা কম-বেশি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যখন তারা কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে জীবন উৎসর্গ ক'রে তাদের ব্যর্থ জীবনকে পুনরুদ্ধার করার সুযোগ দেখতে পায়, তখন তারা মরিয়া হয়ে এ-আশার প্রতি নিয়োগ করে নিজেদের। মাদমোয়াজেল আইসি, জুলিয়েত দ্রো, ও মাদাম দ'আগল ছিলেন তিরিশ বছর বয়সের কাছাকাছি, যখন শুরু হয় তাঁদের প্রেম-জীবন, জুলি দ্য লেসপিনাস ছিলেন চল্লিশের কাছাকাছি। মূল্যবান মনে হ'তে পারে এমন আর কোনো লক্ষ্যই তখন তাঁদের সামনে ছিলো না, প্রেমই ছিলো তাঁদের কাছে একমাত্র মুক্তির পথ।

এমনকি স্বাধীনতা বেছে নিতে পারলেও অধিকাংশ নারীর কাছে এ-পথটিকেই মনে হয় আকর্ষণীয় : নিজের জীবনের ভার নেয়া নারীর কাছে যন্ত্রণাদায়ক। বয়ঃসন্ধিকালে এমনকি পুরুষও পথনির্দেশ, শিক্ষা, মাতৃসুলভ লালনের জন্যে বয়স্ক নারীর মুখাপেক্ষী হ'তে ইচ্ছুক হয়; কিন্তু প্রথানুগ মনোভাব, বালকের প্রশিক্ষণ, এবং তার নিজের আন্তর প্রণোদনা পরিশেষে তাকে বারণ করে অধিকার ত্যাগের সহজ সমাধান গ্রহণ ক'রে পরিতৃপ্ত বোধ করতে; তার কাছে বয়স্ক নারীর সঙ্গে এ-ধরনের সম্পর্ক নিতান্তই তার পথযাত্রার একটি পর্ব। পুরুষের এটা এক সৌভাগ্য যে– যেমন শৈশবে তেমনি প্রাপ্তবয়স্কতার কালে– তাকে নিতে হয় সর্বাধিক দুঃসাধ্য, তবে সবচেয়ে সুনিশ্চিত, পথ; নারীর এটা এক দুর্ভাগ্য যে সে পরিবেষ্টিত থাকে অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন দিয়ে; সব কিছুই তাকে সহজ ঢাল বেয়ে নামতে প্ররোচিত করে; নিজের পথ তৈরির সংগ্রামে আহ্বান জানানোর বদলে তাকে বলা হয় তার কাজ শুধু নিজেকে পিছলে দেয়া এবং তাহলেই সে পৌছোবে মনোহর স্বর্গগুলোতে। যখন সে বুঝতে পারে সে মরীচিকা দিয়ে প্রতারিত হয়েছে, তখন খুবই দেরি হয়ে গেছে; তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে একটি অবধারিতভাবে ব্যর্থ, ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে।

মনোবিশ্লেষকেরা একথা ঘোষণা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে নারী প্রেমিকের মধ্যে খোঁজে পিতার ভাবমূর্তি; তবে এটা এ-কারণে যে পিতা একটি পুরুষ ব'লে, সে পিতা ব'লে নয়; সে বিস্ময়বিহ্বল করে ছোটো মেয়েকে, এবং প্রত্যেক পুরুষেরই আছে এ-যাদুকরী শক্তি। নারী বিশেষ একটি ব্যক্তিকে অন্য একটি ব্যক্তির মধ্যে

প্রতিমূর্ত করতে চায় না, সে পুনর্গঠন করতে চায় একটি পরিস্থিতি : সে-পরিস্থিতি, যার অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছে ছোটো মেয়ে হিশেবে, প্রাপ্তবয়স্কের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে। সে গভীরভাবে বিন্যস্ত হয়েছিলো গৃহে ও পরিবারে, সে জেনেছে দৃশ্যত-অক্রিয়তার শান্তি। প্রেম তাকে ফিরিয়ে দেবে তার মাকে ও পিতাকে, এটা তাকে ফিরিয়ে দেবে তার শৈশব। সে যা পুনরুদ্ধার করতে চায়, তা হচ্ছে তার মাথার ওপর একটি ছাদ; দেয়াল, যা তাকে বুঝতে দেবে না যে সে পরিত্যক্ত হয়েছে বিশাল বিশ্বলোকে; কর্তৃত্ব, যা তাকে রক্ষা করবে তার মুক্তি থেকে। এ-শিশুসুলভ নাটক হানা দেয় বহু নারীর প্রেমে; তারা সুখী হয় 'আমার ছোট্ট মেয়ে, আমার প্রিয় শিশু' ধরনের ডাকে; পুরুষেরা জানে যে এ-শব্দগুলো : 'তুমি একেবারে একটি ছোট্ট মেয়ের মতো' সে-সবের অন্যতম, যা নিশ্চিতভাবে ছোঁয় নারীর হৃদয়। আমরা দেখেছি বহু নারী প্রাপ্তবয়স্ক হ'তে গিয়ে কষ্ট পায়; তাই বিপুলসংখ্যক নারী একগুঁয়েভাবে রয়ে যায় 'শিশুসুলভ', আচরণে ও পোশাকে তারা শৈশবকে প্রলম্বিত করতে থাকে অনির্দিষ্ট কাল ধ'রে। পুরুষের বাহুবন্ধনে আবার শিশু হয়ে উঠতে পেরে আনন্দে ভ'রে ওঠে তাদের পেয়ালা। ব্যবহারজীর্ণ বিষয়টি : 'প্রিয়, তোমার বাহুর মধ্যে নিজেকে এতো ছোটো লাগে', ফিরে ফিরে আসে প্রেমাতুর সংলাপে ও প্রেমপত্রে। 'শিশু আমার,' গুনগুন করে প্রেমিক, নারীটি নিজেকে বলে 'তোমার ছোট্টটি', ইত্যাদি। তরুণী লেখে : 'কখন আসবে সে, যে আধিপত্য করবে আমার ওপর?' আর যখন সে আসে, তখন নারী ভালোবাসে তার পুরুষসুলভ শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতে। জেনেটের পর্যেষিত স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত এক রোগী খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এ-মনোভাব :

আমি যতো বোকামির কর্ম ও ভালো কাজ করেছি, সেগুলোর পেছনে আছে একই কারণ : একটি বিশুদ্ধ ও আদর্শ প্রেমের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, যাতে আমি পুরোপুরি দান করতে পারি নিজেকে, আমার নিজের সত্তার ভার তুলে দিতে পারি আরেকজনের, বিধাতা, পুরুষ, বা নারীর, হাতে, যিনি আমার থেকে এতো শ্রেষ্ঠ যে জীবনে আমি কী করবো, তা আর আমার ভাবার দরকার পড়বে না বা নিজেকে রক্ষা করতে হবে না... এমন একজন, যাঁকে মান্য করা যায় অন্ধভাবে ও আস্থার সঙ্গে... যিনি আমাকে লালন করবেন এবং আলতোভাবে ও প্রেমময়ভাবে নিয়ে যাবেন উৎকর্ষের দিকে। আমি কী যে ঈর্ষা করি মেরি ম্যাগডালেন ও জেসাসের আদর্শ প্রেমকে : একজন পূজ্য ও যোগ্য প্রভুর অতিশয় আকুল ভক্ত হওয়ার জন্যে; আমার দেবমূর্তি, তাঁর জন্যে বাঁচতে ও মরতে, পশুর ওপর অবশেষে দেবদূতের জয় লাভের জন্যে, তাঁর সুরক্ষাপূর্ণ বাহুতে আশ্রয় নিতে, এতো ক্ষুদ্র, তাঁর প্রেমময় যত্নের মধ্যে এতো বিলুপ্ত, এতো পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর যে আমার আর অস্তিত্ব নেই।

বহু উদাহরণ আমাদের ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে যে আত্মনিশ্চিহ্নকরণের এ-স্বপ্ন আসলে বেঁচে থাকার এক লোলুপ ইচ্ছে। সব ধর্মেই বিধাতার পুজোর সাথে মিশে থাকে পুজোরীর নিজের পরিত্রাণের বাসনা; নারী যখন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে তার আরাধ্যের কাছে, তখন নারীটি আশা করে পুরুষটি তাকে একই সাথে দেবে তার নিজের ওপর নিজের দখল ও পুরুষটি যে-বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে, তার অধিকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সে প্রেমিকের কাছে চায় তার অহংয়ের সত্যতা প্রতিপাদন ও উন্নয়ন। বহু নারী প্রেমের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে না, যদি না তার বদলে তারা প্রেম পায়; এবং কখনো কখনো তাদের প্রতি যে-প্রেম দেখানো হয়, তা-ই তাদের প্রেম জাগানোর জন্যে যথেষ্ট। পুরুষের চোখে তাকে যেমন দেখাবে তরুণী

নিজেকে স্বপ্নে দেখেছে সেভাবে, এবং নারীটি বিশ্বাস করে অবশেষে পুরুষের চোখেই সে খুঁজে পেয়েছে নিজেকে।

মিডলটন মারিকে লেখা চিঠিগুলোর একটিতে ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্ড লিখেছেন যে তিনি এইমাত্র একটা দুর্দান্ত উজ্জ্বল বেগুনি রঙের কর্সেট কিনেছেন; সাথে সাথে তিনি যোগ করেছেন : 'খুবই দুঃখের কথা যে এটা *দেখার* জন্যে কেউ নেই!' নিজেকে পুষ্প, সুগন্ধি, রত্ন ব'লে অনুভব করা, কিন্তু সেটি কারো বাসনার বস্তু নয়, এর চেয়ে বেশি যাতনার বিষয় আর কিছু হ'তে পারে না : এটা কেমন সম্পদ, যা আমাকে সমৃদ্ধ করে না এবং কেউ চায় না যার দান? প্রেম হচ্ছে সে-ছবি পরিস্ফুটকারী, যে ঘোলাটে নেগেটিভকে পরিস্ফুট করে সুস্পষ্ট অনুপুঙ্খ পজিটিভরূপে, নইলে এটা একটি শূন্য আলোকসম্পাতের মতোই মূল্যহীন। নারীর মুখমণ্ডল, তার দেহের বাঁকগুলো, তার শৈশবের স্মৃতিপুঞ্জ, তার পূর্বতন অশ্রুরাশি, তার গাউন, তার অভ্যস্ত পথ, তার বিশ্ব, তার যা কিছু আছে, যা কিছু তার অধিকারে, প্রেমের ভেতর দিয়ে সে-সব মুক্তি পায় অনিশ্চয়তা থেকে এবং হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয় : তার দেবতার বেদিমূলে সে একটি বিস্ময়কর অর্ঘ্য।

শুধু প্রেমেই নারী কাম ও আত্মরতির মধ্যে মিলন ঘটাতে পারে বৈরিতামুক্তভাবে; আমরা দেখেছি এ-আবেগগুলো এমন বিপরীত যে তার যৌন নিয়তির সাথে খাপ খাওয়ানো নারীর পক্ষে খুবই কঠিন। নিজেকে একটি শারীর বস্তুতে পরিণত করা, আরেকজনের শিকারে পরিণত করা, তার আত্মপুজোর সাথে বিসঙ্গত : তার মনে হয় আলিঙ্গন তার দেহকে বিবর্ণ ও কলঙ্কিত করে বা অধঃপতিত করে তার আত্মাকে। এজন্যেই কিছু নারী শরণ নেয় কামশীলতার, তারা মনে করে এভাবেই রক্ষা করতে পারবে তাদের অহংয়ের শুদ্ধতা। অন্যরা বিশ্লিষ্ট ক'রে নেয় পাশবিক সুখ থেকে উন্নত আবেগকে। স্টেকেলের এক রোগিণী তার শ্রদ্ধেয় ও বিখ্যাত স্বামীর সাথে ছিলো কামশীতল, এবং তাঁর মৃত্যুর পর, একজন সমতুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ, একজন মহৎ সঙ্গীতস্রষ্টা, যাঁকে সে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতো, তাঁর সাথেও ছিলো কামশীতল। কিন্তু হঠাৎ একটি স্থূল, বর্বর বনরক্ষকের সাথে সে লাভ করে পরিপূর্ণ শারীরিক তৃপ্তি, 'এক বন্য নেশাগ্রস্ততার পর দেখা দেয় এক অবর্ণনীয় ঘৃণা', যখন সে তার প্রেমিকের কথা ভাবে। স্টেকেল মন্তব্য করেছেন 'অনেক নারীর জন্যে পাশবিকতায় নেমে যাওয়া পুলকের আবশ্যক শর্ত'। এ-ধরনের নারীরা শারীরিক প্রেমে দেখতে পায় এক অধঃপতন, যা অসমঞ্জস শ্রদ্ধাবোধ ও প্রীতির সাথে।

অন্য নারীদের মধ্যে, উল্টোভাবে, পুরুষটির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, প্রীতি, ও অনুরাগই শুধু পারে অধঃপতনের বোধ দূর করতে। সে-পুরুষের কাছে তারা নিজেদের সমর্পণ করে না, যদি না তারা বিশ্বাস করে যে পুরুষটি তাদের ভালোবাসে গভীরভাবে। দৈহিক সম্পর্ককে আনন্দের বিনিময় হিশেবে গণ্য করার জন্যে, যা দিয়ে উভয় সাথীই সমভাবে উপকৃত হয়, এটা বোধ করার জন্যে নারীর থাকা দরকার যথেষ্ট পরিমাণে সিনিসিজম, ঔদাসীন্য, বা গর্ববোধ। নারীর সমপরিমাণেই– সম্ভবত তার থেকেও বেশি– পুরুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার বিরুদ্ধে, যে তাকে যৌন শোষণ করতে চায়; তবে সাধারণত নারীই বোধ করে যে তার সঙ্গীটি তাকে ব্যবহার করছে একটি

করণরূপে। আর কিছুই নয়, শুধু অতিশয় প্রশস্তিবোধই পারে সে-কর্মের গ্লানির ক্ষতিপূরণ করতে, যাকে নারী একটি পরাজয় ব'লে মনে করে।

আমরা দেখেছি সঙ্গমে নারীর দরকার পড়ে সুগভীর আত্মবিসর্জন; সে স্নাত হয় অক্রিয় অবসন্নতায়; নিমীলিত চোখে সে নামপরিচয়হীন, বিলুপ্ত, তার মনে হয় যেনো সে ভেসে যাচ্ছে ঢেউয়ে, বিক্ষিপ্ত হচ্ছে ঝঞ্ঝায়, ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকারে : মাংস, জরায়ু, কবরের অন্ধকার। নিশ্চিহ্ন হয়ে এক হয়ে ওঠে সে সমগ্রের সাথে, বিলুপ্ত হয়ে যায় অহং। তবে পুরুষটি যখন তার থেকে স'রে যায়, সে নিজেকে ফিরে আবার দেখতে পায় পৃথিবীতে, শয্যায়, আলোতে; সে আবার একটি নাম পায়, মুখমণ্ডল পায় : সে পরাস্ত একজন, শিকার, বস্তু।

এটা এমন এক মুহূর্ত, যখন প্রেম হয়ে ওঠে এক আবশ্যিকতা। দুধ ছাড়ার পর শিশু যেমন খোঁজে তার পিতামাতার আশ্বস্তকর দৃষ্টি, তেমনি নারী পুরুষটির প্রেমময় অনুভবের মধ্যে বোধ করে সে এখনো এক হয়ে আছে সমগ্রের সাথে, যার থেকে তার মাংস বেদনাদায়কভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এমনকি পুলক লাভ করলেও নারী খুব কম সময়ই পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়, সে তার মাংসের যাদুমন্ত্র থেকে পুরোপুরি মুক্তি পায় না; প্রীতিরূপে তার বাসনা চলতেই থাকে। তাকে সুখ দিয়ে পুরুষটি বাড়িয়ে তোলে তার আসক্তি, পুরুষটি তাকে মুক্তিদান করে না। পুরুষটির দিক থেকে, সে আর নারীটিকে কামনা করে না; কিন্তু নারীটি তার এ-ক্ষণিক ঔদাসীন্যকে ক্ষমা করবে না যদি না পুরুষটি তার প্রতি নিবেদন করে কোনো চিরন্তন ও পরম আবেগ। তখন ওই মুহূর্তটির সীমাবদ্ধতা লাভ করে সীমাতিক্রমণতা; তীব্র স্মৃতিগুলো আর মনস্তাপ হয়ে থাকে না, বরং হয়ে ওঠে মূল্যবান সুখ; সুখের হ্রাসপ্রাপ্তি হয়ে ওঠে আশা ও প্রতিশ্রুতি; প্রতিপন্ন হয় আনন্দভোগের যাথার্থ্য; নারী সগৌরবে মেনে নিতে পারে তার কামকে, কেননা সে একে অতিক্রম ক'রে যায়; উত্তেজনা, আনন্দ, কামনা আর মানসিক অবস্থারূপে থাকে না, বরং হয়ে ওঠে হিতসাধন; তার দেহ আর বস্তু নয় : এটি একটি স্তোত্র, একটি শিখা।

তারপর সংরাগের সাথে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে কামের যাদুর কাছে; অন্ধকার হয়ে ওঠে আলো; তখন প্রণয়িনী নারী মেলতে পারে তার চোখ, তাকাতে পারে সে-পুরুষের দিকে, যে তাকে ভালোবাসে এবং যার দৃষ্টি তাকে গৌরবান্বিত করে; তার মাধ্যমে শূন্যতা হয়ে ওঠে অস্তিত্বের পূর্ণতা, এবং অস্তিত্ব হয়ে ওঠে মূল্যবান; সে আর ছায়ার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় না, বরং উড়তে থাকে পাখায় ভর ক'রে, ওঠে সুউচ্চ আকাশমণ্ডলে। ক্ষান্তি হয়ে ওঠে পবিত্র তুরীয়ানন্দ। যখন নারী *গ্রহণ* করে তার প্রিয়তমকে, তখন নারীর ওপর সেভাবে অধিষ্ঠিত হয়, নারী সেভাবে সাক্ষাৎ লাভ করে, যেভাবে কুমারী মেরির ওপর ভর করেছে, কুমারী মেরি সাক্ষাৎ লাভ করেছে পবিত্র প্রেতের, যেভাবে ধর্মবিশ্বাসী লাভ করে খ্রিস্টান্ন। এটাই ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় স্তোত্র ও কামগীতির অশ্লীল সাদৃশ্য; এমন নয় যে অতীন্দ্রিয় প্রেমের সব সময়ই থাকে একটা যৌন চরিত্র, বরং ঘটনা হচ্ছে প্রণয়িনী নারীর কাম রঞ্জিত থাকে অতীন্দ্রিয়বাদে। 'আমার বিধাতা, আমার আরাধ্য, আমার প্রভু ও পালক'– একই শব্দরাশি ঝ'রে পড়ে নতজানু সন্তের এবং শয্যায় প্রণয়িনী নারীর ওষ্ঠ থেকে; এক

নারী তার মাংস নিবেদন করে খ্রিস্টের বজ্রের কাছে, সে তার হাত বাড়িয়ে দেয় ক্রুশের কলঙ্কদাগ গ্রহণের জন্যে, সে চায় স্বর্গীয় প্রেমের জ্বলন্ত উপস্থিতি; অন্যজনও অর্ঘ্যদান করে ও অপেক্ষা করে; বজ্র, তীব্রবেগ, বাণ মূর্ত হয়ে ওঠে পুরুষের যৌনাঙ্গে। উভয় নারীতেই থাকে একই স্বপ্ন, শৈশবস্বপ্ন, অতীন্দ্রিয় স্বপ্ন, প্রেমের স্বপ্ন : অপরের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত ক'রে পরম অস্তিত্ব অর্জনের স্বপ্ন।

অনেক সময় এটা দাবি করা হয়েছে যে নিশ্চিহ্নকরণের এ-বাসনা চালিত করে মর্ষকামের দিকে। কিন্তু আমি কামের প্রসঙ্গে যেমন উল্লেখ করেছি, একে মর্ষকাম বলা যেতে পারে শুধু তখনই যখন আমি চেষ্টা করি 'বস্তু হিশেবে আমার নিজের অবস্থান দিয়ে মুগ্ধ হ'তে, অন্যদের সংঘটনার মাধ্যমে'; অর্থাৎ বলা যায় যখন বিষয়ীর চৈতন্য পেছনমুখো হয়ে চালিত হয় অহংয়ের দিকে, একে হীনাবস্থায় দেখার জন্যে। এখন, প্রণয়িনী নারী একান্ত ও সম্পূর্ণরূপে তার অহংয়ের সাথে অভিন্ন আত্মরতিবতী নয়; সে বোধ করে নিজেকে অতিক্রম করার এক সংরক্ত বাসনা এবং যার প্রবেশাধিকার আছে অনন্ত বাস্তবে, তার সহযোগিতায় সে হ'তে চায় অনন্ত। নারী নিজেকে *রক্ষা করার জন্যে* নিজেকে বিসর্জন করে প্রেমে; তবে মূর্তিপুজোরী প্রেমের স্ববিরোধ এখানে যে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গিয়ে পরিশেষে *সে নিজেকে অস্বীকার* করে শোচনীয়ভাবে। তার অনুভূতিগুলো লাভ করে একটি অতীন্দ্রিয় মাত্রা; তার বিধাতা তার অনুরাগী থাকুক ও তাকে অনুমোদন করুক, এটা আর তার দরকার পড়ে না; সে মিশে যেতে চায় তার সাথে, নিজেকে হারিয়ে যেতে চায় তার বাহুবন্ধনে। 'আমি হ'তে চাই প্রেমের সন্ত,' লিখেছেন মাদাম দ আগুল। 'এ-উন্নয়ন ও তপশ্চর্যাপূর্ণ ক্ষিপ্ততার মুহূর্তে আমি লাভ করতে চাই শহিদত্ব।' এসব কথা থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা হচ্ছে যে-সীমারেখা পৃথক ক'রে রাখে তাকে ও তার প্রিয়তমকে, সে-সীমারেখা বিলুপ্ত ক'রে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার বাসনা। এখানে মর্ষকামের কোনো ব্যাপার নেই, আছে এক পরমোল্লাসদায়ক মিলনের স্বপ্ন।

এ-স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে প্রথমে নারী যা চা'য়, তা হচ্ছে সে সেবা করতে চায়; কেননা প্রেমিকের দাবিদাওয়া মেটাতে গিয়ে নারী অনুভব করে যে সে প্রয়োজনীয়; সে সুসংহতি লাভ করবে প্রেমিকের অস্তিত্বের মধ্যে, সে অংশীদার হবে তার প্রেমিকের বিশেষ মূল্যের, তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। অ্যাঞ্জেলাস সিলেসিউসের মতে এমনকি অতীন্দ্রিয়বাদীরাও বিশ্বাস করে যে বিধাতার মানুষ দরকার; নইলে তারা যে নিজেদের দান করছে, তা বৃথা হয়ে যাবে। পুরুষ যতো দাবি জানাতে থাকে, নারী ততো সন্তোষ বোধ করে। ভিক্তর উগো জুলিয়েত দ্রোর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে-নিঃসঙ্গতা, তা যদিও ওই তরুণীর জন্যে দুর্বহ হয়ে উঠেছিলো, তবু মনে হয় যেনো তরুণীটি উগোকে মান্য ক'রে সুখই পেতো : উনোনের পাশে থাকা হচ্ছে প্রভুর সুখের জন্যে কিছু করা। সে চেষ্টা করে উগোর কাছে সদর্থকভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে। সে উগোর জন্যে পছন্দের খাবার তৈরি করে এবং গুছিয়ে রাখে ছোটো একটি বাসা, যেখানে উগো আরাম করতে পারে; সে উগোর কাপড়চোপড়ের যত্ন নেয়। 'আমি চাই তুমি যতোটা পারো তোমার কাপড়চোপড় ছেঁড়ো,' উগোকে সে লেখে, 'এবং আমি নিজে সেগুলো শেলাই করতে ও ধুতে চাই।'

কোনো *মহাসংরাগের* প্রথম দিকের দিনগুলোতে নারীটি হয়ে ওঠে আগের থেকে সুশ্রী, অনেক বেশি রুচিশীল : 'যখন আদেল আমার চুল বাঁধে, আমি তাকিয়ে থাকি আমার ললাটের দিকে, কেননা তুমি এটি ভালোবাসো,' লিখেছেন মাদাম দ'আগল। এই মুখ, এই দেহ, এই ঘর, এই আমি– সে এ-সবের জন্যে পেয়েছে একটি *লক্ষ্য ও যাথার্থ্য প্রতিপাদন*, সে এগুলোকে হৃদয়ে পোষণ করে এ-প্রিয় মানুষটির মধ্যস্থতায়, যে তাকে ভালোবাসে। কিন্তু কিছু পরে সে ত্যাগ করে সব ছলাকলা; যদি তার প্রেমিক চায়, তাহলে সে বদলে ফেলে সে-ভাবমূর্তি, প্রথম দিকে যা ছিলো প্রেমের থেকেও মূল্যবান; সে এতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে; সে যা, তার যা আছে, তার সব কিছুকে সে পরিণত করে প্রভুর প্রজায়; যাতে তার প্রেমিকের আগ্রহ নেই, সে ত্যাগ করে সে-সব। প্রেমিকের প্রতি সে উৎসর্গ করে প্রতিটি হৃদস্পন্দন, তার প্রতিটি রক্তবিন্দু, তার অস্থির মজ্জা; এবং এটাই প্রকাশ পায় শহিদত্বলাভের স্বপ্নের মধ্যে : উৎপীড়ন বরণ ক'রেও, মৃত্যুবরণ ক'রেও সে বাড়িয়ে দেবে তার দান, সে হয়ে উঠবে তার প্রেমিকের পদতলের ভূমি। প্রেমিকের কাছে যা কিছু অপ্রয়োজনীয়, সে মাতালের মতো ধ্বংস করে সে-সব। নিজেকে সে যে-দান হিশেবে দিয়েছে, তা সর্বান্তকরণে গৃহীত হ'লে কোনো মর্ষকাম দেখা দেয় না; এর সামান্যই দেখা যায়, উদাহরণ হিশেবে, জুলিয়েত দ্রোর মধ্যে। ভক্তির আতিশয্যে সে কখনো কখনো নতজানু হয়েছে কবির প্রতিকৃতির সামনে এবং যদি সে কখনো কোনো অপরাধ ক'রে থাকে, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করেছে; সে নিজের ওপর ক্রোধ বোধ করে নি।

যে-নারী পুরুষের খেয়ালখুশির কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে সুখ পায়, তার ওপর চালানো স্বৈরাচারের মধ্যে একটি সার্বভৌম স্বাধীন সত্তার সুস্পষ্ট কর্মের প্রতি সে মুগ্ধতাও বোধ করে। উল্লেখ করা দরকার যে যদি কোনো কারণে প্রেমিকের মর্যাদা লোপ পায়, তাহলে তার খুশি ও যাচঞাগুলো হয়ে ওঠে ঘৃণ্য; সেগুলো শুধু তখনই মহার্ঘ, যখন সেগুলো প্রকাশ করে প্রেমাস্পদের দেবত্ব। ওগুলো তা প্রকাশ করলে সে নিজেকে আরেকজনের স্বাধীন ক্রিয়ার শিকার ব'লে বোধ ক'রে পায় মাদকতাপূর্ণ আনন্দ। আরেকজনের পরিবর্তনশীল ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক ইচ্ছের মাধ্যমে নিজের যাথার্থ্য প্রতিপাদনকে একটি অস্তিত্বশীলের কাছে মনে হয় এক অতিশয় বিস্ময়বিহ্বলকর রোমাঞ্চকর কর্ম ব'লে; সব সময় একই চামড়ায় থাকা ক্লান্তিকর, এবং অন্ধ আনগত্যই মানুষের জ্ঞাত আমূল রূপান্তরের একমাত্র সুযোগ। তার প্রেমিকের ক্ষণকালীন স্বপ্ন, তার কর্তৃত্বপরায়ণ আদেশ অনুসারে নারী তাই হয়ে ওঠে ক্রীতদাসী, রাণী, পুষ্প, হরিণী, স্বচ্ছ রঙমিশ্রিত কাচের জানালা, খেয়ালি, দাসী, বারবনিতা, শিল্পদেবী, সহচরী, মা, বোন, সন্তান। যতো কাল সে বোঝে না যে সব সময়ই তার ঠোঁটে লেগে ছিলো আনুগত্যের পরিবর্তনহীন স্বাদ, ততো কাল সে বিমুগ্ধচিত্তে নিজেকে সমর্পণ করে এসব রূপান্তরের কাছে। প্রেমের স্তরে, যেমন কামের স্তরে, এটা সুস্পষ্ট যে মর্ষকাম হচ্ছে সে-ঘুরপথগুলোর একটি, যে-পথে যায় অতৃপ্ত নারীরা, যারা হতাশ প্রেমে ও কামে এবং নিজের ওপর; তবে এটা সময়োপযোগী দাবিত্যাগের স্বাভাবিক প্রবণতা নয়। মর্ষকাম অহংয়ের বিদ্যমানতাকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখে এক ক্ষতবিক্ষত ও অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে; প্রেম অপরিহার্য কর্তার অনুকূলে আনে আত্ম-বিস্মৃতি।

মানবিক প্রেমের পরম লক্ষ্য, অতীন্দ্রিয় প্রেমের মতোই, প্রিয়তমের সঙ্গে অভিন্নতাবোধ। প্রিয়তমের চৈতন্যে আছে মূল্যবোধের মানদণ্ড, বিশ্বের সত্য; তাই তার সেবা করাই যথেষ্ট নয়। প্রণয়িনী নারী প্রেমিকের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে; প্রেমিক যে-সব বই পড়ে সে পড়ে সে-বই, সে পছন্দ করে সে-সব ছবি ও সঙ্গীত, যা প্রেমিক পছন্দ করে; সে শুধু সে-সব ভূদৃশ্যের প্রতিই আগ্রহ বোধ করে যা সে দেখে প্রেমিকের সাথে, সে আগ্রহ বোধ করে সে-সব ভাবনাচিন্তার প্রতি যা আসে প্রেমিকের কাছে থেকে; সে গ্রহণ করে তার বন্ধুদের, তার শত্রুদের, তার মতামত; যখন সে নিজেকে প্রশ্ন করে, তখন সে শুধু প্রেমিকের উত্তরটিই শুনতে চায়; সে নিশ্বাসে নিতে চায় সে- বায়ু, প্রেমিক যা এরই মাঝে নিশ্বাসে নিয়েছে; যে-সব ফল ও ফুল প্রেমিকের হাত দিয়ে আসে নি, তার কাছে সে-সবের কোনো স্বাদ ও সুগন্ধ নেই। তার স্থানবোধও বিপর্যস্ত হয় : সে যেখানে আছে, তা আর বিশ্বের কেন্দ্র নয়, বরং তার প্রেমিক যেখানে আছে, সেটিই বিশ্বের কেন্দ্র; সব পথই তার প্রেমিকের গৃহমুখি এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সব পথ। সে ব্যবহার করে তার প্রেমিকের ভাষা, অনুকরণ করে তার অঙ্গভঙ্গি, আয়ত্ত করে তার বাতিক ও তার মুখের খিচুনি। 'আমি হিথক্লিফ,' বলে *উদারিং হাইট্স্*-এর ক্যাথেরিন; এটাই সব প্রণয়িনী নারীর আর্তনাদ; সে তার প্রিয়তমের এক প্রতিমূর্তি, তার প্রতিফলন, তার ডবল : সে হচ্ছে সে (প্রেমিক)। সে তার নিজের বিশ্বকে আকস্মিকতায় ভেঙে পড়তে দেয়, কেননা সত্যিকারভাবে সে বাস করে তার প্রেমিকের বিশ্বে।

তবে এ-মহিমামণ্ডিত পরম সুখ কদাচিৎ স্থায়ী হয়। কোনো পুরুষই আসলে বিধাতা নয়। অতীন্দ্রিয়বাদী নারী ঐশী অনুপস্থিতির সঙ্গে যে-সম্পর্ক পাতায়, তা নির্ভর করে একলা তারই অনুভূতির উত্তাপের ওপর; কিন্তু দেবত্বে অধিষ্ঠিত পুরুষটি, যে বিধাতা নয়, উপস্থিত। এবং এ-ঘটনা থেকেই উৎপন্ন হয় প্রণয়িনী নারীর নিদারুণ যন্ত্রণা। তার চরম সাধারণ নিয়তির সারকথা প্রকাশ পেয়েছে জুলি দ্য লেসপিনাসের বিখ্যাত উক্তিতে : 'সর্বদা, আমার প্রিয় বন্ধু, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি কষ্ট পাই এবং আমি তোমার অপেক্ষায় থাকি।' এটা সত্য, পুরুষের কাছেও প্রেমের সঙ্গে জড়িত থাকে কষ্ট; তবে তাদের যন্ত্রণাগুলো স্বল্পকালস্থায়ী বা খুব তীব্র নয়। মাদাম রেকামিয়ের জন্যে ম'রে যেতে চেয়েছিলেন বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট : তিনি সেরে উঠেছিলেন এক বারো মাসেই। স্তঁদাল বহু বছর আক্ষেপ করেছিলেন মেতিলদের জন্যে, তবে এটা এমন এক আক্ষেপ, যা তাঁর জীবনকে ধ্বংস না ক'রে সুরভিত ক'রে তুলেছিলো। আর সেখানে নারী, অপ্রয়োজনীয়রূপে নিজের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে, একটা সামগ্রিক পরনির্ভরতা স্বীকার ক'রে নিয়ে, তার জীবনকে ক'রে তোলে নারকীয়। প্রতিটি প্রণয়িনী নারী নিজেকে দেখতে পায় হ্যান্স অ্যান্ডারসেনের ছোট্ট মৎস্যকন্যার মধ্যে, যে প্রেমে প'ড়ে নারীর পায়ের সঙ্গে বিনিময় ক'রে নিয়েছিলো তার মাছের লেজ এবং তারপর দেখতে পেয়েছিলো সে হাঁটছে সুচ ও জ্বলন্ত কয়লার ওপর। একথা সত্য নয় যে প্রেমাস্পদ পুরুষটি চূড়ান্তরূপে অত্যাবশ্যক, আকস্মিকতা ও পরিস্থিতির ওপরে, এবং নারীটি তার কাছে আবশ্যক নয়; আসলে পুরুষটি এমন অবস্থানে নেই যে সে যাথার্থ্য প্রতিপাদন করবে সে-নারীসত্তাটির, যে উৎসর্গিত হয়েছে তার পুজোয়,

এবং সে নারীটি দিয়ে আবিষ্ট হওয়াতে সে নিজেকে সম্মত করতে পারে না।

পতিত দেবতা পুরুষ নয় : সে একটা প্রবঞ্চক; সে সত্যিসত্যিই এই রাজা, যে গ্রহণ করছে স্তুতি, এটা প্রমাণ করা ছাড়া প্রেমিকের আর কোনো বিকল্প নেই– বা নিজেকে একটা জবরদখলকারী ব'লে তাকে স্বীকারোক্তি করতে হবে। যদি সে আর আরাধ্য না হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই পায়ে মাড়াতে হবে। সে তার প্রেমিকের ললাটে পরিয়ে দিয়েছে যে-মহিমার জ্যোতিশ্চক্র, তার জন্যেই প্রণয়িনী নারী প্রেমিকের জন্যে নিষিদ্ধ করে যে-কোনো চারিত্রিক ত্রুটি; সে প্রেমিকের যে-মূর্তি তৈরি করেছে, প্রেমিক তা রক্ষা করতে না পারলে সে হতাশ ও বিরক্ত হয়। যদি প্রেমিক ক্লান্তিবোধ করে বা অসতর্ক হয়, যদি তার অসময়ে ক্ষুধা পায় ও তৃষ্ণা লাগে, যদি সে কোনো একটা ভুল করে বা স্ববিরোধিতা করে, তাহলে নারী দাবি করে যে সে আর 'সে নেই' এবং একেই সে দুঃখের একটা কারণে পরিণত করে। এ-পরোক্ষ পথে সে এতোটা যায় যে প্রেমিকের প্রতিটি উদ্যোগ, যা সে সমর্থন করে না, তার জন্যে সে তিরষ্কার করে তার প্রেমিককে; সে বিচারকের বিচার করে, এবং প্রেমিক যে তার প্রভু থাকতে চাইবে, তার সে-স্বাধীনতা সে অস্বীকার করে। প্রেমিকের উপস্থিতির থেকে অনুপস্থিতিতেই অনেক সময় তার পুজোয় পাওয়া যায় বেশি পরিতৃপ্তি; আমরা যেমন দেখেছি, বহু নারী নিজেদের নিবেদন করে মৃত বা অন্য কোনোভাবে অগম্য বীরদের প্রতি, যাতে কখনোই দৈহিকভাবে তাদের মুখোমুখি হ'তে না হয়, কেননা রক্তমাংসের পুরুষ মারাত্মকভাবে তাদের স্বপ্নের বিপরীত। এ-কারণেই জন্মেছে এসব সুখস্বপ্নভঙ্গ-জাত উক্তি : 'মোহন রাজকুমারকে বিশ্বাস কোরো না। পুরুষেরা নিতান্তই দীনহীন জীব,' এবং এমন আরো অনেক। অন্যের বামন মনে হতো না যদি না তাদের দৈত্য হ'তে বলা হতো।

প্রথম দিকে প্রণয়িনী নারী উল্লাস বোধ করে তার প্রেমিকের কামনা পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ ক'রে; পরে– সেই বিখ্যাত দমকল কর্মীর মতো, যে তার পেশার প্রতি প্রেমে সর্বত্র আগুন লাগিয়েছিলো– সে নিজেকে নিযুক্ত করে এ-কামনা জাগিয়ে তোলার কাজে, যাতে সে তা চরিতার্থ করতে পারে। এ-উদ্যোগে সফল না হ'লে সে নিজেকে এতো অপমানিত ও অপদার্থ মনে করে যে তার প্রেমিক যে-উষ্ণ আবেগ বোধ করে না, তার ভান করে। প্রেমিককে মুগ্ধ করার সুনিশ্চিততম উপায়টি সে পেয়েছে নিজেকে একটি ক্রীতদাসী বানিয়ে। আমরা এখানে দেখতে পাই প্রেমের আরেক প্রতারণামূলক কাজ, যা বহু পুরুষ– উদাহরণস্বরূপ, লরেন্স ও মঁতেরলঁ– ক্ষুব্ধভাবে অনাবৃত ক'রে দেখিয়েছেন : এটা আসে দানের রূপ ধ'রে, যদিও আসলে এটা এক স্বৈরাচার। নারীর ওই অতিশয় মহৎ সংরাগ কীভাবে পুরুষকে ঘিরে শেকল জড়ায়, তা *আদল্‌ফ্*-এ তিক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট। 'সে তার ত্যাগস্বীকারগুলোর আগে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নি, কেননা সে ব্যগ্র ছিলো আমাকে ওগুলো গ্রহণে বাধ্য করতে,' এলিওনোর সম্পর্কে নিষ্ঠুরভাবে বলেছেন তিনি।

গ্রহণ আসলে একটা বাধ্যবাধকতা, যা প্রেমিকের জন্যে এমন একটি শর্ত, যাতে সে যে একজন দাতা তেমন মনে হওয়ারও সুযোগ থাকে না; নারী চায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রেমিক গ্রহণ করবে সে-বোঝা, যার চাপে সে ভেঙেচুরে ফেলে প্রেমিককে। এবং

তার স্বৈরাচার চির-অতৃপ্ত। প্রণয়ী পুরুষ স্বৈরাচারপরায়ণ, তবে সে যা চায়, তা পেয়ে গেলে সে তৃপ্তিবোধ করে; আর সেখানে নারীর অত্যধিক দাবিপূর্ণ অনুরক্তির কোনো সীমাপরিসীমা নেই। যে-প্রেমিকের আস্থা আছে তার দয়িতার ওপর, দয়িতা যদি অনুপস্থিত থাকে, তার কাছে থেকে দূরে কোথাও কাজে নিয়োজিত থাকে, তাহলে সে অসন্তোষ বোধ করে না; দয়িতা তারই আছে এ-বোধে নিশ্চিত থেকে সে একটা বস্তুর মালিক হওয়ার থেকে একটি স্বাধীন সত্তার মালিক হ'তে বেশি পছন্দ করে। নারীর কাছে, এর বিপরীতে, তার প্রেমিকের অনুপস্থিতি সব সময়ই একটা পীড়ন; প্রেমিক একটি চোখ, একজন বিচারক, আর যখনই সে প্রেমিকাকে ছাড়া আর কিছুর দিকে তাকায়, সে হতাশ করে তার প্রেমিকাকে; যা কিছু সে দেখে, তার থেকেই সে প্রেমিকাকে বঞ্চিত করে; যখন সে দূরে থাকে প্রেমিকার থেকে, প্রেমিকাটি একই সঙ্গে অধিকারবঞ্চিত হয় নিজের ও বিশ্বের; এমনকি যখন তার পাশে ব'সে প্রেমিক পড়ে বা লেখে, তখনও সে প্রেমিকাকে ত্যাগ করছে, তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সে প্রেমিকের ঘুমকেও ঘৃণা করে। কিন্তু বদলেয়ার দয়ালু হয়ে উঠেছেন তাঁর নারীকে ঘুমন্ত দেখে : 'তোমার সুন্দর চোখ দুটি ক্লান্ত, আমার নিঃস্ব প্রিয়তমা'; এবং প্রুস্ত মুগ্ধ হয়েছেন আলবার্তিনকে নিদ্রিত দেখে। বিষয়টি এই যে পুরুষের ঈর্ষা হচ্ছে নিতান্ত একান্তভাবে অধিকারের ইচ্ছা; প্রিয়তমা নারী, নিদ্রিত অবস্থায় যে ফিরিয়ে আনে শৈশবের নিরস্ত্র সারল্য, কারো অধিকারে নয় : ওই নিশ্চয়তাই যথেষ্ট। কিন্তু দেবতার, প্রভুর, উচিত নয় সীমাবদ্ধতার ঘুমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা; নারী প্রেমিকের সীমাতিক্রমণতাকে দেখে বৈরী দৃষ্টিতে; সে তীব্রভাবে ঘৃণা করে এ-দেহের পাশব জড়তাকে, যা আর *তার* থাকে না, থাকে *নিজের*, পরিত্যক্ত থাকে এমন এক আকস্মিকতায় যার মূল্য হচ্ছে তার আকস্মিকতা।

পুরুষেরা পরস্পরের সাথে পাল্লা দিয়ে ঘোষণা করে যে প্রেম হচ্ছে নারীর পরম সিদ্ধি। 'যে-নারী ভালোবাসে, নারী হিশেবে সে হয়ে ওঠে আরো নারীধর্মী,' বলেছেন নিটশে, এবং বালজাক বলেছেন : 'উৎকৃষ্ট পুরুষের জীবন হচ্ছে খ্যাতি, নারীর জীবন হচ্ছে প্রেম। নারী তখনই সমতুল্য হয়ে ওঠে পুরুষের, যখন সে তার জীবনকে ক'রে তোলে এক বিরতিহীন অর্ঘ্য, যেমন পুরুষের জীবন এক বিরতিহীন কর্ম।' কিন্তু এতে আছে এক নিষ্ঠুর প্রতারণা, কেননা নারী যা দান করে, পুরুষ তা কোনোক্রমেই গ্রহণের জন্যে ব্যগ্র নয়। যেদিন নারীর পক্ষে তার দুর্বলতায় নয় বরং তার শক্তিতে ভালোবাসা সম্ভব হবে, নিজের থেকে পলায়ন নয় বরং নিজেকে লাভ করা সম্ভব হবে, নিজেকে অধঃপতিত নয় বরং নিজেকে জ্ঞাপন করা সম্ভব হবে– সেদিনই পুরুষের মতো তার জন্যে প্রেম হয়ে উঠবে জীবনের এক উৎস এবং তা আর মারাত্মক বিপদ হয়ে থাকবে না। তার আগে প্রেম হচ্ছে নারীর ওপর চেপে থাকা এক ভয়ঙ্কর মর্মস্পর্শী অভিশাপ, যে-নারী বন্দী হয়ে আছে এক নারীর জগতে, যে বিকলাঙ্গ নারী, যে পর্যাপ্ত নয় নিজের জন্যে।

পরিচ্ছেদ ৩

অতীন্দ্রিয়বাদী

প্রেমকে নারীর জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে তার পরম বৃত্তিরূপে, এবং যখন সে এটা চালিত করে একটি পুরুষের দিকে, তখন সে পুরুষটির মধ্যে খোঁজে বিধাতাকে; তবে পরিস্থিতির কারণে সে যদি বঞ্চিত হয় মানবিক প্রেম থেকে, যদি সে হয় ব্যর্থ বা খুঁতখুঁতে, তাহলে সে বিধাতাকে আরাধনা করতে পারে বিধাতার স্বরূপেই। একথা সত্য, অনেক পুরুষও ছিলো, যারা এ-শিখায় জ্বলেছে, তবে তারা বিরল এবং তাদের ঐকান্তিকতা অতিশয় পরিশীলিত মননশীল ছাঁচের; আর সেখানে যে-নারীরা নিজেদের উৎসর্গ করে ঐশী বিবাহের সুখের কাছে, তারা বিপুলসংখ্যক, এবং তাদের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবেই আবেগী প্রকৃতির। নারী নতজানু হয়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত; সাধারণত সে আশা করে তার পরিত্রাণ নেমে আসবে স্বর্গ থেকে, যেখানে পুরুষ অধিষ্ঠিত সিংহাসনে। তারাও মেঘ দিয়ে পরিবেষ্টিত : তাদের শারীরিক উপস্থিতির যবনিকার অন্তরাল থেকে প্রকাশ পায় তাদের রাজকীয় অবয়ব। প্রিয়তমটি কম-বেশি সব সময়ই থাকে অনুপস্থিত: সে দুর্বোধ্য সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তার পুজোরীর সাথে: নারী তার প্রিয়তমের হৃদয়কে জানে শুধু বিশ্বাসে; নারীর কাছে তাকে যতো বেশি শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তার আচরণকে ততো বেশি মনে হয় দুর্ভেদ্য। আমরা দেখেছি কামবাতিকগ্রস্ততায় এ-বিশ্বাস প্রতিরোধ করে সব স্ববিরোধকে। তার পাশে উপস্থিতি বোধের জন্যে নারীর স্পর্শের দরকার পড়ে না, দেখারও দরকার পড়ে না। সে হোক চিকিৎসক, পুরোহিত, বা হোক বিধাতা, নারী অনুভব করবে একই ধরনের প্রশ্নাতীত নিশ্চয়তা, পরিচারিকা হিশেবে সে তার হৃদয়ে গ্রহণ করবে সে-প্রেম, যা উর্ধ্বলোক থেকে বন্যার মতো বয়ে আসবে। পরস্পরমিশ্রিত হয়ে যায় মানবিক প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেম, এ-কারণে নয় যে পরেরটি আগেরটির এক শোধিত রূপ, বরং এজন্যে যে প্রথমটি হচ্ছে এক পরমের দিকে, ধ্রুবর দিকে যাত্রা। উভয় ক্ষেত্রেই এটা প্রণয়িনী নারীর অনিশ্চিত অস্তিত্ব থেকে পরিত্রাণ লাভের ব্যাপার, এটা ঘটে সমগ্রের সাথে তার মিলনের মাধ্যমে, যা মূর্ত হয়ে আছে এক পরম পুরুষের মধ্যে।

এ-দ্ব্যর্থতা দর্শনীয় অনেক ক্ষেত্রেই– ব্যাধিগ্রস্ত বা স্বাভাবিকে– যাতে প্রেমিকের ওপর আরোপ করা হয় দেবত্ব, বা বিধাতাকে দেয়া হয় মানবিক বৈশিষ্ট্য।

আমরা এখানে বিবেচনা করছি একটি ব্যাধিগ্রস্তকে। তবে অনেক ভক্তের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই এমন তালগোল পাকিয়ে তোলা হয়েছে পুরুষ ও বিধাতার মধ্যে যে তার জট খোলা অসম্ভব। বিশেষ ক'রে স্বীকারোক্তিগ্রহণকারীটি অধিকার ক'রে থাকে পৃথিবী ও স্বর্গের মাঝামাঝি একটি দ্ব্যর্থবোধক স্থান। যখন অনুতাপকারিণী খুলে ধরে তার আত্মা, তখন স্বীকারোক্তিগ্রহণকারীটি মানবিক কানেই তা শোনে, তবে তার

স্থিরদৃষ্টি নারীটিকে ঢেকে দেয় এক অতিপ্রাকৃত আলোতে; সে বিধাতার পুরুষ, সে মানুষের অবয়বে উপস্থিত বিধাতা। মাদাম গুয়োঁ ফাদার ল্য কঁবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : 'মনে হলো যেনো আত্মার গভীর আভ্যন্তর পথ বেয়ে তাঁর থেকে আমার দিকে আসছে ঐশ্বরিক করুণার শক্তি এবং আমার থেকে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছে এমনভাবে যেনো সে বোধ করছে একই প্রভাব।' ওই সন্ন্যাসীর মধ্যস্থতার কাজ ছিলো মাদাম গুয়োঁর দীর্ঘকালব্যাপী আত্মার বন্ধ্যাত্ব নিরাময় করা এবং তাঁর আত্মাকে নবঐকান্তিকতায় প্রজ্জ্বলিত করা। তিনি ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে থেকেছেন তাঁর অতীন্দ্রিয়তার মহাপর্ব ভ'রে। এবং তিনি ঘোষণা করেছেন : 'এটা শুধু একটা সম্পূর্ণ ঐক্যই ছিলো না; আমি তাঁকে বিধাতার থেকে পৃথক করতে পারি নি।' একথা বলা হবে অতিসরলীকরণ যে তিনি আসলে প্রেমে পড়েছিলেন একটি পুরুষের এবং ভান করেছিলেন বিধাতাকে ভালোবাসার; তিনি পুরুষটিকে ভালোবাসতেন, কেননা গুয়োঁর চোখে পুরুষটি ছিলো পুরুষটির থেকে ভিন্ন কেউ। ফার্দিয়েরের রোগিণীর মতোই গুয়োঁ যা অস্পষ্টভাবে লাভ করতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে মূল্যবোধের পরম উৎসধারা। এটাই প্রকৃতপক্ষে যে-কোনো অতীন্দ্রিয়বাদীর লক্ষ্য। নিঃসঙ্গ আকাশের দিকে তার উড়ালের শুরুতে কখনো কখনো পুরুষ মধ্যস্থতাকারী তার উপকারে আসে, তবে পুরুষটি অপরিহার্য নয়। ভান থেকে বাস্তবতাকে, যাদু থেকে কর্মকে, কাল্পনিক থেকে বস্তুনিষ্ঠতাকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করতে না পেরে নারী অনুপস্থিতকে নিজের শরীরে বাস্তবায়িত করার জন্যে থাকে বিশেষভাবে উন্মুখ। অতীন্দ্রিয়তাবাদ ও কামবাতিকগ্রস্ততাকে কখনো কখনো অভিন্ন ক'রে দেখা হয়, তবে এ-দেখাটা অনেক কম সন্দেহজনক ব্যাপার। কামবাতিকগ্রস্ত নারী বোধ করে সে মূল্যবান হয়ে ওঠে একটি সার্বভৌম সত্তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে; পুরুষটি উদ্যোগ গ্রহণ করে কামসম্পর্কে, পুরুষটি যতোটা ভালোবাসা পায় সে ভালোবাসে তার থেকে বেশি; সে তার আবেগ প্রকাশ করে দৃষ্টিগ্রাহ্য তবে গোপন সংকেতের মাধ্যমে। এসবই দেখা যায় অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে।

আজকাল সবাই একমত যে কামবাতিকগ্রস্ততা দেখা দিতে পারে প্লাতোয়ীরূপে বা যৌনরূপে। এটা ঠিক, বিধাতার প্রতি অতীন্দ্রিয়বাদীর আবেগানুভূতিতে শরীর পালন করতে পারে ছোটো বা বড়ো ভূমিকা। নারীর ভাবোচ্ছ্বাস বিকশিত হয় পার্থিব প্রেমিকার ভাবোচ্ছ্বাসের ছাঁচ ভিত্তি ক'রেই। খ্রিস্ট তাঁর বাহুবন্ধনে ধ'রে আছেন সেইন্ট ফ্রান্সিসকে, যখন এমন একটি মূর্তির ধ্যান করছিলেন ফোলিগনোর অ্যাঞ্জেলা, তখন খ্রিস্ট অ্যাঞ্জেলাকে বলেন : 'এভাবেই তোমাকে আমি আলিঙ্গনে বাঁধবো, এবং এর থেকেও অনেক বেশি, যা মরচক্ষে দেখা যাবে না... আমি কখনো তোমাকে ত্যাগ করবো না যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো।' মাদাম গুয়োঁ লিখেছেন : 'প্রেম আমাকে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম দেয় না। আমি তাকে বলি : "হে আমার প্রিয়তম, যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে মুক্তি দাও।"... আমি চাই সে-প্রেম, যা অনির্বচনীয় শিহরণ পাঠায় আত্মার ভেতর দিয়ে, সে-প্রেম যা আমাকে মূর্ছিত করে।... হে বিধাতা, আমি যা অনুভব করছি, তুমি যদি তা অনুভব করতে দিতে চরম কামপরায়ণ নারীদের, তাহলে অবিলম্বে তারা তাদের মিথ্যে সুখ ছেড়ে দিতো এ-প্রকৃত সুখ উপভোগের জন্যে।'

ধার্মিকভাবে কখনো কখনো মনে করা হয় যে ভাষার দীনতাই অতীন্দ্রিয়বাদীকে বাধ্য করে এ-কামপরায়ণ শব্দভাণ্ডার থেকে ধার করতে; কিন্তু তার অধিকারে আছে মাত্র একটি শরীরও; তাই সে পার্থিব প্রেম থেকে শুধু শব্দ ধার করে না, ধার করে শারীরিক প্রবণতাও; কোনো পুরুষের কাছে নিজেকে দান করার সময় সে যে-আচরণ করে, বিধাতাকে দেয়ার জন্যেও তার আছে একই আচরণ। তবে এটা কিছুতেই তার আবেগানুভূতির মূল্য হ্রাস করে না। ফোলিগনোর অ্যাঞ্জেলা যখন তাঁর হৃদয়ের অবস্থা অনুসারে একবার হয়ে ওঠেন 'মলিন ও কৃশ', আবার 'সুডৌল ও রক্তিমাভ', যখন তিনি এমন তপ্ত অশ্রুপাত করতে থাকেন যে তাঁর ওপর ঠাণ্ডা জল ঢালতে হয়, যেমন আমাদের বলেছেন তাঁর এক জীবনীকার, যখন তিনি অবলুণ্ঠিত হতেন ভূমিতে, তাঁর এ-প্রপঞ্চগুলোকে আদৌ বিশুদ্ধভাবে 'আধ্যাত্মিক' ব'লে গণ্য করতে পারি না; তবে এগুলোকে যদি শুধু তাঁর অতিরিক্ত 'আবেগপরায়ণতা'র সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আফিমচারার 'নিদ্রাকর গুণ'-এর কাছে; দেহ কখনোই বিষয়ীর অভিজ্ঞতার কারণ নয়, কেননা কর্তা নিজেই থাকে তার কর্ম বৈশিষ্ট্যে : কর্তা তার অস্তিত্বের ঐক্যের মধ্যে যাপন করে তার প্রবণতা।

অতীন্দ্রিয়বাদীদের শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষই মনে করে সেইন্ট তেরেসার পরমোল্লাসমত্ততাগুলোকে কামধর্মী ব'লে গণ্য করা হ'লে তাঁকে নামিয়ে দেয়া হয় মূর্ছারোগগ্রস্তের স্তরে। তবে মূর্ছারোগগ্রস্তকে যা অধঃপতিত করে, তা এ নয় যে তার শরীর সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করে তার আবিষ্টতাগুলো, বরং এ-ব্যাপার যে সে আবিষ্ট, তার স্বাধীনতা সম্মোহিত ও অকার্যকর। ভারতীয় কোনো ফকির যে-নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে তার শরীরের ওপর, তা তাকে তার দেহের দাস ক'রে তোলে না; দৈহিক অনুকৃতি কোনো প্রকৃতিস্থ, সুস্থ চৈতন্যের *প্রাণাবেগের* উপাদান হ'তে পারে। সেইন্ট তেরেসার রচনাবলি কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না, এবং এগুলো যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে বার্নিনির মূর্তিটির, যাতে আমরা দেখতে পাই সন্তটি মূর্ছিত হচ্ছেন পরম ইন্দ্রিয়সুখকরতার আতিশয্যে। তাঁর আবেগকে যদি সরলভাবে 'কামের পরিশোধন' হিশেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলেও তাতে কম ভুল হয় না; প্রথমে থাকে না কোনো অব্যক্ত কামনা, যা পরে রূপ ধারণ করে ঐশী প্রেমের। *প্রেমপরায়ণা* নিজে প্রথমে এমন কোনো বস্তুহীন বাসনার শিকার থাকে না, যা পরে নিবদ্ধ হয় একটি বিশেষ পুরুষের প্রতি; প্রেমিকের উপস্থিতিই তার ভেতরে জাগিয়ে তোলে বাসনা, যা সরাসরি ধাবিত হয় প্রেমিকের দিকে। একইভাবে, সেইন্ট তেরেসা একটিমাত্র প্রক্রিয়ায় মিলিত হ'তে চান বিধাতার সাথে এবং ওই মিলন যাপন করেন তাঁর শরীরের মধ্যে; তিনি তাঁর স্নায়ু ও হরমোনরাশির দাসী নন : প্রশংসা করতেই হয় তাঁর বিশ্বাসের তীব্রতাকে, যা বিদ্ধ করে তার দেহের অন্তরঙ্গতম অঞ্চলগুলোকে।

ঐশী প্রেমে নারী খোঁজে তা-ই, *প্রেমপরায়ণা* যা খোঁজে একটি পুরুষের মধ্যে : তার আত্মরতির উন্নয়ন; তার ওপর মনোযোগ দিয়ে, কামনার সাথে নিবদ্ধ হয়ে আছে সার্বভৌম স্থিরদৃষ্টিটি, এটা এক অলৌকিক দৈববর। তাঁর প্রথম জীবন ভ'রে, কিশোরী ও তরুণী রূপে, মাদাম গুয়োঁ প্রেম ও অনুরাগ লাভের বাসনায় সব সময়ই পেয়েছেন নিদারুণ যন্ত্রণা। একজন আধুনিক প্রোটেস্ট্যান্ট অতীন্দ্রিয়বাদী মাদমোয়াজেল ভি

লিখেছেন : 'আমার প্রতি কেউই বিশেষ আগ্রহ পোষণ করে না বা আমার ভেতরে কী ঘ'টে চলছে, তার প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ নয়, এর থেকে আর কিছুই আমাকে বেশি অসুখী করে না।' সাঁৎ-বভ মাদাম ক্রুদেনের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি কল্পনা করতেন বিধাতা তাঁকে নিয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত, এমন হতো যে প্রেমিকের সাথে তীব্র সংকটের মুহূর্তগুলোতে তিনি যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠতেন : 'বিধাতা আমার, আমি কী যে সুখী! আমার সুখের আতিশয্যের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।' আমরা বুঝতে পারি এটা কতোটা নেশাকর হয়ে ওঠে আত্মরতিবতীর জন্যে, যখন সারা আকাশ হয়ে ওঠে তার দর্পণ; তার দেবত্বপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে বিধাতার নিজের মতোই অনন্ত, এবং এটা কখনো বিবর্ণ হবে না।

অধিকাংশ নারী অতীন্দ্রিয়বাদী বিধাতার কাছে নিজেদের অক্রিয়ভাবে সমর্পণ ক'রে তৃপ্ত হয় না : তারা তাদের দেহ বিনাশ ক'রে সক্রিয়ভাবে নিশ্চিহ্ন করতে চায় নিজেদের। সন্দেহ নেই, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতেরা চর্চা করেছে কৃচ্ছ্রব্রতের, তবে যে-উন্মত্ত ক্রোধে নারী অবজ্ঞা করে তার দেহকে, তা ধারণ করে বিশেষ ও উৎকট রূপ। তার দেহের প্রতি নারীর মনোভাবের দ্ব্যর্থতার কথা আমরা উল্লেখ করেছি : অবমাননা ও দুঃখভোগের মাধ্যমে সে একে রূপান্তরিত করে একটি শ্রদ্ধা ও গৌরবের বস্তুতে। সম্ভোগের বস্তুরূপে প্রেমিকের কাছে এটি দান ক'রে সে হয়ে ওঠে একটি মন্দির, একটি প্রতিমা; প্রসবের যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়ে সে সৃষ্টি করে বীরদের। অতীন্দ্রিয়বাদী তার দেহকে পীড়ন করে এর ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে; এটিকে শোচনীয় ক'রে তুলে সে এটিকে উন্নীত করে পরিত্রাণের হাতিয়ারের স্তরে। কোনো কোনো সন্ত যে-আতিশয্য করেছেন, তা ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবেই। ফোলিগনোর সেইন্ট অ্যাঞ্জেলা আমাদের বলেছেন যে-জলে তিনি কিছুক্ষণ আগে ধুয়েছেন কুষ্ঠরোগীর হাত-পা, সে-জল তিনি পান করেছেন আনন্দে :

> এ-পানীয় আমাদের এমন সুমিষ্টতায় প্লাবিত করে যে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত ওই আনন্দ অনুসরণ করে আমাদের। এতো সুখে আগে কখনো আমি পান করি নি। আমার গলায় আটকে গিয়েছিলো কুষ্ঠরোগীর ঘায়ের এক টুকরো আঁশটে চামড়া। ওটি থেকে মুক্তি পাওয়ার বদলে আমি চেষ্টা করি ওটি গিলে ফেলতে এবং আমি সমর্থ হই। আমার মনে হয় যেনো আমি এই মাত্র অংশ নিয়েছি খ্রিস্টের শেষ ভোজ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে। আমাকে প্লাবিত করে যে-উল্লাস, তা আমি কখনো প্রকাশ করতে সমর্থ হবো না।

পরমোল্লাসমত্ততা, স্বপ্নাবিভাব, বিধাতার সাথে আলাপ– এ-আন্তর অভিজ্ঞতাই কিছু নারীর জন্যে যথেষ্ট। অন্যরা চাপ বোধ করে তাদের কাজের মাধ্যমে এটা বিশ্বকে জানানোর। কর্ম ও ধ্যানের সম্পর্ক ধারণ করে দুটি ভিন্ন রূপ। সেইন্ট ক্যাথেরিন, সেইন্ট তেরেসা, জোয়ান অফ আর্কের মতো কর্মযোগী নারীরা আছেন, যাঁরা ভালোভাবেই জানেন তাঁদের মনে আছে কী লক্ষ্য এবং তাঁরা তা অর্জনের চমৎকার উপায়ও উদ্ভাবন করেন।

ভাগ ৭

মুক্তির অভিমুখে

পরিচ্ছেদ ১

স্বাধীন নারী

ফরাশি আইন অনুসারে, আনুগত্য আর স্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, এবং প্রতিটি নারী নাগরিকের আছে ভোটাধিকার; কিন্তু এসব নাগরিক অধিকার রয়ে যায় তাত্ত্বিক, যতো দিন না এগুলোর সাথে যুক্ত হয় আর্থনীতিক স্বাধীনতা। পুরুষ ভরণপোষণ করে যে-নারীর– স্ত্রী বা বারবনিতা– ভোটাধিকার পেয়েছে ব'লেই সে পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্ত, এমন নয়; সামাজিক রীতিনীতি আগের থেকে এখন কম বাধা সৃষ্টি করলেও নেতিবাচক স্বাধীনতা নারীর পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পরিবর্তিত করে নি; সে এখনো বাঁধা প'ড়ে আছে তার দাসত্বের অবস্থায়। নারী-পুরুষকে পৃথক ক'রে রেখেছে যে-দূরত্ব, অর্থকর চাকুরির মাধ্যমেই নারী সে-দূরত্বের অধিকাংশ পেরিয়ে এসেছে; এবং বাস্তবে এ ছাড়া আর কিছুই নারীর মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যখন সে আর পরজীবী নয়, তখন ভেঙে পড়ে তার পরনির্ভরতা ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠা সংশ্রয়; তার ও বিশ্বের মাঝে আর কোনো পুরুষ মধ্যস্থতাকারীর দরকার পড়ে না।

দাসী হিশেবে তার ওপর চেপে আছে যে-অভিশাপ, আমরা দেখেছি, তার কারণ হচ্ছে তাকে কিছু করতে দেয়া হয় না; তাই সে আত্মরতি, প্রেম, বা ধর্মের মাধ্যমে নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে তার জীবনকে সার্থক করার ব্যর্থ প্রয়াসে। যখন সে হয় উৎপাদনশীল, সক্রিয়, তখন সে পুনরুদ্ধার করে তার সীমাতিক্রমণতা; তার কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে সে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করে কর্তা হিশেবে তার মর্যাদা; সে যে-সব লক্ষ্যে কাজ করে, সে অধিকারী হয় যে-অর্থ ও অধিকারের, তা দিয়ে সে তার দায়িত্বভারের পরীক্ষানিরীক্ষা করে ও গুরুত্ব বোঝে। বহু নারী এসব সুবিধা সম্পর্কে সচেতন, এমনকি খুবই সামান্য অবস্থানে আছে যারা, তারাও বোঝে। এক হোটেলের পাথুরে মেঝে মাজতে মাজতে এক ঠিকা-ঝিকে আমি বলতে শুনেছি : 'আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাই নি; আমি নিজেই নিজের সব কিছু করেছি।' একজন রকফেলারের মতোই সে গর্বিত ছিলো নিজের স্বাবলম্বিতা সম্পর্কে। তবে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে ভোটাধিকার ও একটি চাকুরিই হচ্ছে সম্পূর্ণ মুক্তি : কাজ করা, আজ, মুক্তি নয়। নারীর অবস্থার বদলের ফলে সামাজিক সংগঠনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি; এ-বিশ্ব সব সময়ই ছিলো পুরুষের অধিকারে, পুরুষ একে যে-রূপ দিয়েছে এটি এখনো আছে সে-রূপেই।

যে-সব ব্যাপার নারীর শ্রমের বিষয়টিকে জটিল ক'রে তোলে, সেগুলোর কথা ভুলে গেলে চলবে না। একজন গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিবেচক নারী রেনল কারখানাগুলোর নারীদের সম্পর্কে সম্প্রতি একটি পর্যেষণা সম্পন্ন করেছেন; তিনি বিবৃত করেছেন যে কারখানায় কাজের থেকে বাড়িতে থাকতেই তারা বেশি পছন্দ করতো। সন্দেহ নেই যে তারা আর্থনীতিক স্বাধীনতা লাভ করে শুধু একটি শ্রেণীর সদস্য হিশেবে, যেটি আর্থনীতিকভাবে নির্যাতিত; এবং, অন্য দিকে, কারখানায় তাদের কাজ গৃহস্থালির ভার থেকে তাদের মুক্তি দেয় না। অধিকাংশ নারীই মুক্তি পায় না প্রথাগত নারীর জগত থেকে; বস্তুগতভাবে পুরুষের সমান হওয়ার জন্যে তাদের যে-সহায়তা পাওয়া দরকার, তা তারা সমাজের কাছে থেকেও পায় না তাদের স্বামীদের কাছে থেকেও পায় না। শুধু সে-সব নারী, যাদের আছে রাজনীতিক বিশ্বাস, যারা সংঘে জঙ্গি কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে, যাদের বিশ্বাস আছে তাদের ভবিষ্যতের ওপর, তারাই শুধু সে-প্রাত্যহিক শ্রমকে দিতে পারে একটা নৈতিক অর্থ, যে-শ্রমে ধন্যবাদও মেলে না। কিন্তু অবকাশহীন, একটা প্রথাগত বশবর্তিতার উত্তরাধিকারী হয়ে, নারীরা সবেমাত্র একটা রাজনীতিক ও সামাজিক বোধের বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছে। এবং তাদের কাজের বিনিময়ে তাদের যে-নৈতিক ও সামাজিক সুবিধা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্য, তা না পেয়ে তারা নিরুৎসাহে নতি স্বীকার করছে এর চাপের কাছে।

এও বেশ বোধগম্য যে নারীবস্ত্রপ্রস্তুতকারীর শিক্ষানবিশটি, দোকানের কর্মচারী মেয়েটি, সহকারিণীটি পুরুষের ভরণপোষণের সুবিধা ছাড়তে চাইবে না। ইতিমধ্যেই আমি উল্লেখ করেছি যে একটি সুবিধাভোগী গোত্রের অস্তিত্ব থাকা তরুণীর কাছে একটি প্রায়-অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন, কেননা শুধু নিজের দেহ সমর্পণ ক'রেই সে যোগ দিতে পারে ওই গোত্রে, তার নিয়তিই হচ্ছে 'বীরপুরুষ'-এর কাছে নিজেকে দান করা, এজন্যে যে তার মজুরি ন্যূনতম, আর সেখানে সমাজ তার কাছে জীবনযাপনের যে-মান প্রত্যাশা করে, তা খুবই উচ্চ। যদি সে নিজের মজুরি দিয়েই চালাতে চায়, তাহলে সে হয়ে ওঠে একটা অস্পৃশ্য মানুষ : খারাপ বাসা, খারাপ পোশাক, সে বঞ্চিত হবে সমস্ত আমোদপ্রমোদ, এবং এমনকি প্রেম, থেকে। ধার্মিকেরা তাকে দেয় কৃচ্ছ্রব্রতের উপদেশ, এবং আসলেই তার খাবারদাবার অধিকাংশ সময়ই কার্মেলীয় তপস্বিনীর খাবারের মতোই বিশুদ্ধ। দুর্ভাগ্যবশত, বিধাতাকে সবাই প্রেমিক হিশেবে নিতে পারে না : নারী হিশেবে সে যদি জীবনে সফল হ'তে চায়, তাহলে তাকে সুখী করতে হবে একটি পুরুষকে। তাই সে সাহায্য নেবে, এবং তাকে অনাহারে থাকার মতো মজুরি দেয়ার সময় এর ওপরই সিনিকের মতো নির্ভর করে তার নিয়োগদাতা। এ-সাহায্য কখনো কখনো তার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে এবং প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে সহায়তা করে; তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে, সে ছেড়ে দেবে তার কাজ এবং হয়ে উঠবে একটি রক্ষিতা নারী। সে প্রায়ই রক্ষা করে আয়ের উভয় উৎসকেই এবং এর প্রতিটি কম-বেশি কাজ করে অন্যটির থেকে মুক্তির উপায়রূপে; তবে প্রকৃতপক্ষে সে থাকে দ্বিগুণ দাসত্বে : কাজের কাছে ও রক্ষকের কাছে। বিবাহিত নারীর কাছে তার মজুরিকে মনে হয় টুকিটাকি জিনিশ কেনার টাকা; যে-মেয়েটি 'পাশ থেকে একটু আয় করে', তার কাছে পুরুষের দানের টাকাকেই মনে হয় অতিরিক্ত; তবে নিজের চেষ্টায়

তাদের কেউই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে না।

তবে আছে প্রচুর সংখ্যক বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত নারী, যারা আর্থনীতিক ও সামাজিক স্বায়ত্তশাসনের একটি উপায় লাভ করে তাদের পেশার মধ্যে। নারীর সম্ভাবনা ও তার ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতে গেলে এগুলোর কথা মনে আসে। যদিও এখনো তারা নিতান্তই সংখ্যালঘু, তবু এ-কারণেই তাদের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক; নারীবাদী ও নারীবাদবিরোধীদের মধ্যে তারা একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। পরের দলটি দাবি করে যে আজকের মুক্তিপ্রাপ্ত নারীরা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ক'রে উঠতে পারে নি এবং নিজেদের আন্তর ভারসাম্য অর্জন করাও তাদের পক্ষে কঠিন। আগের দলটি অতিরঞ্জিত করে পেশাজীবী নারীদের সাফল্যকে এবং দেখতে পায় না তাদের আন্তর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। প্রকৃতপক্ষে, তারা ভুল পথে আছে বলার বিশেষ কারণ নেই; এবং তবু এটা নিশ্চিত যে তারা তাদের এলাকায় প্রশান্তভাবে স্থিত হয় নি : এখন পর্যন্ত ওই দিকে তারা আধাপথ এগিয়েছে। যে-নারী আর্থনীতিকভাবে মুক্তি পেয়েছে পুরুষের থেকে, সে পুরুষের সাথে অভিন্ন নৈতিক, সামাজিক, ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে অবস্থান করে না। যেভাবে সে কাজ করে তার পেশায় এবং পেশার প্রতি দেয় যে-মনোযোগ, তা নির্ভর করে তার সমগ্র জীবনপদ্ধতি তাকে দিয়েছে যে-পরিস্থিতি, তার ওপর; কেননা সে যখন তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবন শুরু করে, তখন তার পেছনে থাকে না একই অতীত, যা থাকে একটি ছেলের পেছনে; সমাজ তাকে একইভাবে দেখে না; বিশ্ব তার সামনে উপস্থিত হয় ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। নারী হওয়া আজ একটি স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের সামনে উপস্থিত করে বিশেষ ধরনের সমস্যা।

পুরুষ ভোগ করে যে-সুবিধা, যা সে বোধ করে শৈশব থেকেই, সেটা হচ্ছে মানুষ হিশেবে তার বৃত্তি কিছুতেই পুরুষ হিশেবে তার নিয়তির বিপক্ষে যায় না। শিশ্ন ও সীমাতিক্রমণতার সমীকরণের মাধমে এটা এমন রূপ নেয় যে তার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সাফল্য তাকে ভূষিত করে এক পৌরুষেয় মর্যাদায়। সে খণ্ডিত নয়। আর সেখানে নারীর নারীত্বকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নিজেকে তার আবশ্যিকভাবে ক'রে তুলতে হয় বস্তু ও শিকার, এর অর্থ হচ্ছে তাকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে সার্বভৌম কর্তা হিশেবে তার দাবি। এ-বিরোধই বিশেষভাবে লক্ষণীয় ক'রে তোলে মুক্তিপ্রাপ্ত নারীর পরিস্থিতিকে। সে অস্বীকার করে নারী হিশেবে তার ভূমিকায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে, কেননা সে বিকলাঙ্গতাকে মেনে নেবে না; তবে তার লিঙ্গকে অস্বীকার করাও হবে একটি বিকলাঙ্গতা। পুরুষ একটি কামসম্পন্ন মানুষ; নারীও তখনই হয়ে ওঠে পুরুষের সমান একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তি, শুধু যখন সে হয় একটি কামসম্পন্ন মানুষ। তার নারীত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে তার মনুষ্যত্বের একটি অংশকে অস্বীকার করা। 'নিজেদের অবহেলা' করার জন্যে নারীবিদ্বেষীরা প্রায়ই ভর্ৎসনা করেছে বুদ্ধিজীবী নারীদের; তবে তারা নারীদের কাছে প্রচার করেছে এ-মতবাদ : যদি তোমরা সমান হ'তে চাও আমাদের, তাহলে প্রসাধন আর চারিমিনা ছাড়ো।

এ-উপদেশ একটা বাজেকথা। নারীত্বের ধারণাটি যেহেতু কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছে প্রথা ও ফ্যাশন দিয়ে, তাই এটা বাইর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় প্রতিটি নারীর

ওপর; তাকে ধীরেধীরে রূপান্তরিত করা সম্ভব যাতে তার শোভনতা-শালীনতাবোধের বিধিবিধান হয়ে ওঠে পুরুষের গৃহীত বিধিবিধানের মতো: সমুদ্রসৈকতে– এবং প্রায়ই অন্যত্র– ট্রাউজার হয়ে উঠেছে নারীসুলভ। এটা বিষয়টির কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটায় না : ব্যক্তিটি এখনো ইচ্ছেমতো তার নারীত্বের ধারণাকে রূপায়িত করার মতো স্বাধীন নয়। যে-নারী খাপ খায় না, সে লৈঙ্গিকভাবে করে নিজের অবমূল্যায়ন, সুতরাং অবমূল্যায়ন করে সামাজিকভাবে, কেননা লৈঙ্গিক মূল্যবোধ সমাজের একটি অচ্ছেদ্য অংশ। নারীর গুণাবলি প্রত্যাখ্যান করলেই কেউ পৌরুষেয় গুণাবলির অধিকারী হয় না; এমনকি পুরুষের পোশাক পরে যে-নারী, সেও নিজেকে পুরুষ ক'রে তুলতে পারে না– সে পুরুষের ব্যঙ্গরূপ। আমরা যেমন দেখেছি, সমকাম হচ্ছে একটি বিশেষ মনোভাব : নিরপেক্ষতা অসম্ভব। এমন কোনো নেতিবাচক মনোভাব নেই, যা নির্দেশ করে না একটি ইতিবাচক প্রতিরূপকে। কিশোরী মেয়ে প্রায়ই মনে করে যে প্রথাকে সে অবজ্ঞা ক'রে যেতে পারে; তবে সেখানেও সে বিজড়িত প্রকাশ্য বিক্ষোভে; সে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, যার পরিণতির দায় অবশ্যই তাকে নিতে হয়। যখন কেউ একটা গৃহীত বিধানের সঙ্গে সেঁটে থাকতে ব্যর্থ হয়, তখন সে হয়ে ওঠে একটি বিদ্রোহী। অদ্ভুত ধরনের বেশবাস করে যে-নারী, সে যখন সরল ভঙ্গিতে দৃঢ়তার সাথে বলে যে তাকে যে-পোশাকে মানায়, সে তা-ই পরে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়, তখন সে মিথ্যে কথা বলে। সে খুব ভালোভাবেই জানে যে মানানোর জন্যে তাকে হ'তে হবে অদ্ভুত।

এর বিপরীতে, যে-নারী নিজেকে বাতিকগ্রস্তরূপে দেখাতে চায় না, সে খাপ খাওয়াবে প্রচলিত রীতির সাথে। যদি ইতিবাচকভাবে কার্যকর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত না থাকে, তাহলে একটা উদ্ধত মনোভাব গ্রহণ করা অবিবেচনাপ্রসূত : এটা যতোটা সময় ও শক্তি বাঁচায়, তার চেয়ে অনেক বেশি অপচয় করে। যে-নারীর আহত করার বা নিজেকে সামাজিকভাবে হেয় করার কোনো সাধ নেই, সে তার নারীধর্মী পরিস্থিতিতে নারীধর্মী রীতিতেই জীবন যাপন করবে; এবং অধিকাংশ সময় এজন্যে যে তার পেশাগত সাফল্য এটা দাবি করে। তবে পুরুষের জন্যে খাপখাওয়ানো যেখানে খুবই স্বাভাবিক– প্রথা যেহেতু একজন স্বাধীন ও সক্রিয় ব্যক্তি হিশেবে তারই প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে– আর সেখানে যে-নারীও যখন কর্তা, সক্রিয়, তখনও তার দরকার পড়বে নিজেকে ধীরে ধীরে সুকৌশলে সে-বিশ্বে প্রবেশ করানো, যা তাকে দণ্ডিত করেছে অক্রিয়তায়। এটাকে ক'রে তোলা হয় আরো বেশি দুর্বহ, কেননা নারীর এলাকায় আটকে থাকা নারীরা এর গুরুত্ব ভীষণভাবে বহু গুণে বাড়িয়ে তুলেছে : তারা বেশবাস ও গৃহস্থালির কাজকে পরিণত করেছে দুরূহ কলায়। পুরুষকে তার পোশাকের কথা ভাবতেই হয় না, কেননা তার পোশাক সুবিধাজনক, তার সক্রিয় জীবনের উপযোগী, ওগুলো অপরিহার্যরূপে মার্জিত নয়; ওগুলো তার ব্যক্তিত্বের কোনো অংশই নয়। এছাড়া, কেউ আশা করে না যে সে নিজে যত্ন নেবে তার পোশাকের : কোনো একটি সহৃদয় ইচ্ছুক বা ভাড়া করা নারী তাকে রেহাই দেয় এ-জ্বালাতন থেকে।

নারী, এর বিপরীতে, জানে যে যখন কেউ তাকায় তার দিকে, তখন সে তাকে

তার আকৃতির থেকে ভিন্ন ক'রে দেখে না : তাকে বিচার, শ্রদ্ধা, কামনা করা হয় তার প্রসাধন দিয়ে ও প্রসাধনের মাধ্যমে। তার পোশাকের মূল উদ্দেশ্য ছিলো তাকে ক্লীব ক'রে তোলা, এবং সেগুলো রয়ে গেছে ব্যবহারের অনুপযোগী : লম্বা মোজা ফেঁসে যায়, নিচু হয়ে যায় জুতোর খুড়ের দিকটা, ময়লা হয়ে যায় হাল্কা রঙের ব্লাউজ ও ফ্রক, কাপড়ের ভাঁজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে সারাইয়ের অধিকাংশ কাজ করতে হয় তার নিজেকেই; অন্য নারীরা দয়াপরবশ হয়ে তাকে সাহায্য করতে আসবে না এবং যে-কাজ সে নিজে করতে পারে, তার জন্যে সে টাকা ব্যয় করতে চাইবে না : দীর্ঘস্থায়ীগুলোতে, কেশবিন্যাসে, প্রসাধনসামগ্রিতে, নতুন পোশাকে এরমাঝেই অনেক খরচ হয়ে গেছে। সারাদিনের কাজের পর যখন ঘরে ফেরে ছাত্রী ও সহকারিণীরা, তখন তারা সব সময়ই পায় একটা লম্বা মোজা, যেটা ছিঁড়ে গেছে ব'লে রিপু করতে হবে, একটা ব্লাউজ, যা ধুতে হবে, একটা স্কার্ট, যা ইস্ত্রি করতে হবে। যে-নারী ভালো আয় করে, সে নিজেকে মুক্তি দেবে এসব নীরস একঘেয়ে খাটুনি থেকে, তবে তাকে রক্ষা করতে হবে আরো জটিল আভিজাত্য; তার সময় নষ্ট হবে কেশকাটায়, পোশাক মানানসই করায়, ও আরো বহু কিছুতে। প্রথা আরো চায় এমনকি একলা নারীকেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে তার বাসস্থানের প্রতি। নতুন কোনো নগরে দায়িত্ব পেয়েছে, এমন কোনো কর্মকর্তা সহজেই একটি হোটেলে আবাসন পাবে; কিন্তু একই পদের একটি নারী চাইবে থাকার জন্যে তার নিজের একটি জায়গা। তাকে এটা রাখতে হবে নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন, কেননা লোকজন নারীর বেলা অবহেলা ক্ষমা করবে না, যা তারা স্বাভাবিক ব'লেই মনে করবে পুরুষের বেলা।

যে-নারী তার শক্তি ব্যয় করে, যার আছে দায়িত্ব, যে জানে বিশ্বের বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কতো কঠোর, পুরুষের মতোই– শুধু বাস্তব কামনা পরিতৃপ্ত করলেই তার চলে না, তার আরো দরকার পড়ে প্রীতিকর যৌন রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে বিনোদন ও আমোদপ্রমোদ উপভোগ। এখন, আজো আছে বহু সামাজিক বৃত্ত, যেখানে এ-ব্যাপারে তার স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে স্বীকার ক'রে নেয়া হয় নি; সে এটা প্রয়োগ করলে তার ঝুঁকি থাকে মানসম্মান, চাকুরি হারানোর; কমপক্ষে তাকে করতে হয় একটা ক্লেশকর ভণ্ডামো। সমাজে যতো বেশি দৃঢ়ভাবে সে প্রতিষ্ঠা করে তার অবস্থান, লোকজন ততো বেশি প্রস্তুত থাকে চোখ বুজে থাকতে; কিন্তু বিশেষ ক'রে মফস্বল অঞ্চলগুলোতে সচরাচর তার ওপর চোখ রাখা হয় চরম কঠোরভাবে। এমনকি সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশে– যেখানে জনমতের ভীতি সামান্য– সেখানেও এ-ব্যাপারে তার পরিস্থিতি পুরুষের সমতুল্য নয়। এ-পার্থক্য নির্ভর করে প্রথাগত মনোভাব ও নারীর কামের বিশেষ প্রকৃতি উভয়েরই ওপর।

নারীর জন্যে একটি সম্ভবপর সমাধান হচ্ছে রাস্তা থেকে এক রাত বা এক ঘণ্টার জন্যে একটি সঙ্গী নিয়ে আসা– মনে করা যাক নারীটি যেহেতু সংরাগপূর্ণ ধাতের এবং সে কাটিয়ে উঠেছে তার সব সংকোচ, তাই সে ঘেন্না না ক'রে এটা মনস্থ করতে পারে– তবে এ-সমাধান পুরুষের জন্যে যতোটা বিপজ্জনক নারীর জন্যে তার থেকে অনেক বেশি। তার যৌনব্যাধির ঝুঁকি গুরুতর, কেননা পুরুষটিরই দায়িত্ব সংক্রমণের বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনের; এবং যতোই সাবধান হোক-না-কেনো নারীটি

কখনোই গর্ভধারণের বিপদ থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত নয়। কিন্তু অপরিচিতদের মধ্যে এমন সম্পর্কে– যে-সম্পর্ক স্থাপিত একটা বর্বরতার স্তরে– যা সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে তাদের শারীরিক শক্তির পার্থক্য। পুরুষ যে-নারীটিকে বাসায় আনে, তার থেকে পুরুষটির ভয় পাওয়ার বিশেষ কিছু নেই; তাকে নিতান্তই যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রস্তুত থাকতে হয় আত্মরক্ষার জন্যে। যে-নারী বাসায় পুরুষ আনে, তার জন্যে এটা একই ব্যাপার নয়। আমাকে দুটি নারীর কথা বলা হয়েছিলো, যারা সদ্য এসেছিলো প্যারিসে এবং আগ্রহ বোধ করেছিলো 'জীবন দেখা'র জন্যে; তারা রাতে একটু ঘোরাঘুরির পর দুটি আকর্ষণীয় মঁৎমার্ৎ চরিত্রকে নিমন্ত্রণ করে রাতের ভোজে। ভোরবেলা তারা দেখে ডাকাতি হচ্ছে বাসায়, তাদের প্রহার করা হচ্ছে, এবং গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেয়ার ভয় দেখানো হচ্ছে। আরো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে চল্লিশ বছর বয়স্ক, বিচ্ছেদপ্রাপ্ত, এক নারীর ক্ষেত্রে, যে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতো তিনটি সন্তান ও বুড়ো পিতামাতাকে পালনের জন্যে। তখনো সে আকর্ষণীয়, কিন্তু সামাজিক জীবনের জন্যে বা ছেনালিপনার জন্যে এবং একটা প্রেমের সম্পর্ক তৈরির জন্যে প্রথানুসারী কার্যকলাপের জন্যে তার একটুও সময় ছিলো না। তবে তার ছিলো তীব্র অনুভূতি, এবং সে বিশ্বাস করতো যে তার অধিকার আছে ওগুলো পরিতৃপ্ত করার। তাই সে মাঝেমাঝে রাতে বেরোতো রাস্তায় এবং একটা পুরুষ ধরতো। তবে এক রাতে, বোই দ্য বলনের ঝোপঝাড়ে দু-এক-ঘণ্টা কাটানোর পর, তার ক্ষণিকের প্রেমিক তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। একসাথে বাসের ব্যবস্থা করার জন্যে সে চায় নারীটির নাম ও ঠিকানা, আবার দেখা করতে চায় তার সাথে। নারীটি রাজি না হওয়ায় পুরুষটি তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে এবং শেষে তাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে প্রায় মৃত্যুর আতঙ্কে ফেলে রেখে চ'লে যায়।

পুরুষ যেমন প্রায়ই রক্ষিতা রাখে, সেভাবে একটি স্থায়ী প্রেমিক রাখা, এবং তার ভরণপোষণ করা বা আর্থিকভাবে তাকে সাহায্য করা সম্ভব শুধু ধনাঢ্য নারীদের পক্ষে। অনেকে আছে, যারা এ-ব্যবস্থাকে প্রীতিকর মনে করে; টাকা দিয়ে তারা পুরুষটিকে পরিণত করে নিতান্তই একটি হাতিয়ারে এবং তাকে ব্যবহার করতে পারে ঘৃণ্য অসংযমের সাথে। তবে সাধারণত, কাম ও আবেগকে এতোটা স্থূলভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ওই নারীদের হ'তে হয় বুড়ো। অনেক পুরুষ আছে, যারা কখনো দেহ ও চৈতন্যকে পৃথক করা মেনে নেয় না; এবং আরো অধিক কারণবশত অধিকাংশ নারীই এটা গ্রহণ করতে সম্মত হবে না। তাছাড়াও, এতে আছে প্রতারণা, যার প্রতি তারা পুরুষের থেকেও বেশি সংবেদনশীল; কেননা টাকা ব্যয় করে যে-খরিদ্দার, সে নিজেও হয়ে ওঠে একটি হাতিয়ার, কেননা তার সঙ্গী তাকে ব্যবহার করে জীবিকার উপায় হিশেবে। উপায় থাকলেও একটি পুরুষ ক্রয় করাকে নারী কখনোই একটি সন্তোষজনক সমাধানরূপে মেনে নেবে না।

আছে একটি নারীধর্মী কাজ, যা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে সম্পন্ন করা বাস্তবিকভাবে প্রায়-অসম্ভব। এটা মাতৃত্ব। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এবং অন্য কিছু দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কল্যাণে কোনো নারী নিজের ইচ্ছে অনুসারে অন্তত গর্ভধারণে রাজি নাও হ'তে পারে। ফ্রান্সে তাকে প্রায়ই ঠেলে দেয়া হয় যন্ত্রণাদায়ক ও ব্যয়বহুল গর্ভপাতের

দিকে; নইলে তাকে বহন করতে হয় একটি অবাঞ্ছিত সন্তানের দায়, যা ধ্বংস ক'রে দিতে পারে তার পেশাগত জীবন। এটা যে একটি ভারি দায়ভার, তার কারণ হচ্ছে প্রথা নারীকে তার যখন ইচ্ছে তখন সন্তান জন্ম দিতে দেয় না। অবিবাহিত মা সমাজের একটি কেলেঙ্কারি; এবং অবৈধ জন্ম শিশুটির জন্যে একটি কলঙ্ক; বিয়ের শেকল না প'রে বা গোত্রচ্যুত না হয়ে মা হওয়া খুব কম সময়ই সম্ভব। কৃত্রিম পরিনিষেকের ধারণাটি যে বহু নারীকেই আকৃষ্ট করে, তার কারণ এ নয় যে তারা পুরুষের সাথে সঙ্গম এড়াতে চায়; এর কারণ হচ্ছে তারা আশা করে অবশেষে সমাজ স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে মাতৃত্বের স্বাধীনতাকে। এ-সাথে বলা দরকার যে সুবিধাজনক দিবা শিশুপালনকেন্দ্র ও কিন্ডারগার্টেন থাকা সত্ত্বেও একটি শিশু থাকা নারীর কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করার জন্যে যথেষ্ট; সে শুধু তখনই কাজে যেতে পারে যদি সে একে রেখে যেতে পারে আত্মীয়দের, বন্ধুদের, বা ভৃত্যদের কাছে। সে বেছে নিতে বাধ্য হয় বন্ধ্যাত্ব, যা প্রায়ই অনুভূত হয় একটি যন্ত্রণাদায়ক হতাশা, বা এমন বোঝারূপে, যা কর্মজীবনের সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এভাবেই আজকের স্বাধীন নারী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার পেশাগত আগ্রহ ও তার কামজীবনের সমস্যার মধ্যে; এ-দুয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করা তার পক্ষে কঠিন; যদি সে পারে, তাহলে এটা করতে হয় অধিকার ছাড় ও ত্যাগস্বীকারের মূল্যে, যার ফলে তাকে থাকতে হয় এক স্থায়ী স্নায়বিক চাপের মধ্যে। শারীরবৃত্তিক তথ্যে নয়, এখানেই খুঁজতে হবে সে-স্নায়ুদৌর্বল্য ও ভঙ্গুরতার কারণ, যা প্রায়ই দেখা যায় তার মধ্যে। নারীর শারীরিক গঠন তার জন্যে কতোটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা নির্ণয় করা কঠিন। মাঝেমাঝেই অনুসন্ধান চালানো হয়, উদাহরণস্বরূপ, ঋতুস্রাব কতোটা বাধা সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে। যে-নারীরা প্রকাশনা বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা এর ওপর খুবই কম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ব'লে মনে হয়। এর কারণ কি, প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা তাঁদের সাফল্যের জন্যে ঋণী তাঁদের আপেক্ষিকভাবে কিঞ্চিৎ মাসিক অসুস্থতার কাছে? প্রশ্ন করা যায় এটা কি এ-কারণে নয় যে, এর বিপরীতে, তাদের সক্রিয় ও উচ্চাভিলাষী জীবনই আছে এ-সুবিধার মূলে; নারী তার ব্যাধির প্রতি বোধ করে যে-আগ্রহ, তাই বাড়িয়ে তোলে ব্যাধির প্রকোপ। যে-নারীরা খেলাধুলো ও অন্যান্য সক্রিয় কর্মকাণ্ডে জড়িত, তারা অন্যদের থেকে ব্যাধিতে কম ভোগে, কেননা তারা এর দিকে বিশেষ খেয়ালই করে না। জৈবিক কারণও রয়েছে নিশ্চিতভাবেই, এবং অতি-উদ্যমী নারীদেরও আমি মাসে একবার চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে বিছানায় কাটাতে দেখেছি, তখন তারা নির্মম পীড়নের এক শিকার; কিন্তু এ-বিপদ তাদের কর্মকাণ্ডে সাফল্য লাভকে ব্যাহত করতে পারে নি।

যখন আমরা নারীর পেশাগত সাফল্য বিচার করি, এবং তার ভিত্তিতে নারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুর্দান্তভাবে অনুমান করি, তখন এসব ব্যাপার ভুলে গেলে চলবে না। সে কর্মজীবন শুরু করে মানসিকভাবে উৎপীড়িত অবস্থার মধ্যে এবং যখন সে আছে প্রথাগতভাবে নারীত্ব ব্যক্তিগতভাবে তার ওপর যে-বোঝা চাপিয়ে দেয়, তার ভারের নিচে। বাস্তব পরিস্থিতিগুলোও তার অনুকূল নয়। এমন একটি সমাজ, যা বৈরী, বা কমপক্ষে সন্দিগ্ধ, তার ভেতর দিয়ে একটি নতুন পথ তৈরির চেষ্টা নবাগতের জন্যে

সব সময়ই কঠিন। *ব্ল্যাক বয়*-এ রিচার্ড রাইট দেখিয়েছেন শুরু থেকেই কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে একটি মার্কিন নিগ্রো তরুণের উচ্চাভিলাষ এবং যে-স্তরে শাদাদের সমস্যা শুরু হয়, সে-স্তরে উঠতেই তাকে কী লড়াই করতে হয়েছে। আফ্রিকা থেকে ফ্রান্সে আগত নিগ্রোরাও মুখোমুখি হয় এমন বাধার– তাদের নিজেদের সাথে ও চারপাশের সঙ্গে– যেগুলো, নারীরা যে-সব বাধার মুখোমুখি হয়, সেগুলোর মতো।

তার শিক্ষানবিশির পর্বে নারী নিজেকে দেখতে পায় এক হীনতার অবস্থানে, তরুণীর প্রসঙ্গে যে-বিষয়টি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তা এখন আরো যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। তার পড়াশুনোর কালে ও তার কর্মজীবনের প্রথম নিশ্চায়ক বছরগুলোতে, খুব কম সময়ই নারী তার সুযোগগুলো সরাসরি ব্যবহার করে এবং তাই প্রায়ই খারাপভাবে শুরু ক'রে পরে সে হয় প্রতিবন্ধকতাগ্রস্ত। যে-সব সংঘাতের কথা আমি বলেছি, সেগুলো, প্রকৃতপক্ষে, সর্বাধিক তীব্রতায় পৌঁছে আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে, ঠিক সে-সময়ে, যখন পেশাগত ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে। নারীটি তার পরিবারের সঙ্গেই থাকুক বা বিবাহিতই হোক, তার পরিবার পুরুষের কাজের প্রতি যে-শ্রদ্ধা দেখায়, তার কাজের প্রতি কদাচিৎ দেখায় সমান শ্রদ্ধা: তারা তার ওপর চাপিয়ে দেয় নানা দায়িত্ব ও কাজ এবং খর্ব করে তার স্বাধীনতা। সে নিজেই গভীরভাবে প্রভাবিত থাকে তার লালনপালন দিয়ে, বড়োরা যে-সব মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছে, সেগুলোর প্রতি সে থাকে শ্রদ্ধাশীল, থাকে তার শৈশব ও বয়ঃসন্ধির স্বপ্ন দিয়ে গ্রস্ত; তার অতীতের উত্তরাধিকার ও তার ভবিষ্যতের আগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে সে পড়ে বিপদে। অনেক সময় সে প্রকাশ্যে শপথ নেয় তার নারীত্ব পরিহারের, সে দ্বিধান্বিত থাকে সতীত্ব, সমকামিতা, ও একটা আক্রমণাত্মক রণচণ্ডী মনোভাবের মধ্যে; সে বাজে বেশবাস করে বা পুরুষের পোশাক পরে; এবং এ-ক্ষেত্রে সে প্রচুর সময় নষ্ট করে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে, ভাব দেখিয়ে, রাগে ফুঁসে উঠে। অধিকাংশ সময়েই সে জোর দিতে চায় তার নারীসুলভ গুণাবলির ওপর : সে হয় ছেনালধর্মী, সে বাইরে যায়, সে ফষ্টিনষ্টি করে, সে প্রেমে পড়ে, দুলতে থাকে মর্ষকাম ও আক্রমণাত্মকতার মধ্যে। সে প্রশ্ন করে, বিক্ষুব্ধ হয়, দিকে দিকে সে বিক্ষিপ্ত করে নিজেকে। এসব বাহ্যিক কর্মকাণ্ডই তাকে তার কর্মোদ্যোগে পুরোপুরি নিবিষ্ট হওয়ায় বাধা দেয়ার জন্যে যথেষ্ট; সে এ দিয়ে যতো কম উপকৃত হয়, সে ততো বেশি প্ররোচিত বোধ করে এটা ছেড়ে দিতে।

যে-নারীর লক্ষ্য স্বাবলম্বী হওয়া, তার জন্যে যা চরমভাবে মনোবল ভেঙে দেয়ার মতো ব্যাপার, তা হচ্ছে তার একই মর্যাদার অন্যান্য নারীদের অস্তিত্ব, শুরুর দিকে যাদের ছিলো একই পরিস্থিতি ও একই সুযোগসুবিধা, যারা আছে পরগাছার মতো। পুরুষ ক্ষোভ বোধ করতে পারে বিশেষ সুবিধাভোগী পুরুষের প্রতি, তবে সে সংহতি বোধ করে তার শ্রেণীর সাথে; সাধারণত যারা একই সুযোগসুবিধা নিয়ে শুরু করে জীবনে, তারা একই সাফল্য অর্জন করে। আর সেখানে একই পরিস্থিতির নারীরা পুরুষের মধ্যস্থতায় অর্জন করতে পারে খুবই ভিন্ন ধরনের সৌভাগ্য। যে-নারী নিজে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করছে, তার পথে একটা প্রলোভন হয়ে দেখা দেয় আরামদায়কভাবে বিবাহিত বা পুরুষের ভরণপোষণপ্রাপ্ত কোনো একটি বান্ধবী; সে

বোধ করে যে অত্যন্ত কঠোর পথে যাত্রা ক'রে সে নিজেকে অযৌক্তিকভাবে নষ্ট করছে; প্রতিটি বাধার মুখে সে ভাবে ভিন্ন পথ নেয়াই হয়তো ভালো ছিলো। 'যখন আমি ভাবি যে আমার নিজের মগজ দিয়েই আমাকে পেতে হবে সব কিছু!' যেনো ওই চিন্তা তাকে বিমূঢ় ক'রে ফেলেছে, এমনভাবে একটি দারিদ্র্যগ্রস্ত ছাত্রী আমাকে একথা বলেছিলো। পুরুষ মেনে চলে এক অত্যাবশ্যক জরুরি প্রয়োজনকে; নারীকে অবিরত দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করতে হয় তার অভিপ্রায়। সে একটি লক্ষ্যের ওপর স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সামনের দিকে এগোয় না, বরং তার চারদিকের প্রতিটি অভিমুখে ঘুরতে থাকে তার দৃষ্টি; এবং তার চলার ভঙ্গিও ভীরু ও অনিশ্চিত। যতোই সে নিজের পথে এগাতে থাকে ব'লে মনে হয় ততোই তার অন্য সুযোগগুলো লোপ পেতে থাকে; একটি নীলমুজো হয়ে, মস্তিষ্কশীল নারী হয়ে, সে সাধারণত পুরুষের কাছে নিজেকে ক'রে তুলবে আকর্ষণহীন, বা অসাধারণ সাফল্য অর্জন ক'রে সে অবমানিত করবে তার স্বামী বা প্রেমিককে। তাই সে আরো বেশি ক'রে আভিজাত্য ও চটুলতাই শুধু দেখাতে থাকবে না, সে নিয়ন্ত্রণ করবে তার উচ্চাকাঙ্খা। নিজের দায়িত্ব নিজে নেয়া থেকে একদিন সে মুক্তি পাবে, এ-আশা এবং যদি কখনো তা পায়, তাহলে তা হারিয়ে ফেলার ভয় একত্র হয়ে তাকে বাধা দেয় নিঃশেষে নিজেকে তার পড়াশুনোয় ও তার কর্মজীবনে নিয়োজিত করতে।

নারী যতোটা নারী হ'তে চায়, তার স্বাধীন মর্যাদা ততোটা সৃষ্টি করে হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষা : অন্য দিকে, তার নারীত্ব তাকে সন্দেহী ক'রে তোলে তার পেশাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। এটা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা দেখেছি যে চোদ্দো বছরের মেয়েরা একজন অনুসন্ধানকারীর কাছে ঘোষণা করেছে : 'ছেলেরা মেয়েদের থেকে শ্রেষ্ঠ; তারা অধিকতর ভালো কর্মী।' তরুণী মেয়ে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে তার সামর্থ সীমিত। পিতামাতারা ও শিক্ষকেরা যেহেতু স্বীকার করে যে মেয়েদের মেধার স্তর ছেলেদের থেকে নিম্ন, ছাত্রছাত্রীরাও তা অবিলম্বে স্বীকার ক'রে নেয়; এবং বাস্তবিকপক্ষে, সমান পাঠক্রম সত্ত্বেও, ফ্রান্সের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের শিক্ষাগত সাফল্য অনেক নিচে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, দর্শনে মেয়েদের শ্রেণীর সব সদস্য, উদাহরণস্বরূপ, সুস্পষ্টভাবেই ছেলেদের শ্রেণীর নিচে। ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ আর পড়াশুনো চালাতে চায় না, এবং খাটে অগভীরভাবে; আর অন্যদের অভাব রয়েছে সমকক্ষ হওয়ার সাধনা করার উদ্দীপকের। খুব সহজ পরীক্ষায় তাদের অযোগ্যতা অতিশয় স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে না, তবে কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছাত্রীটি সচেতন হয়ে উঠবে তার দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে। সে এজন্যে তার প্রশিক্ষণের মাঝারিত্বকে দায়ী করবে না, দায়ী করবে তার নারীত্বের অন্যায় অভিশাপকে; নিজেকে এ-অসাম্যের কাছে সমর্পণ ক'রে সে বাড়িয়ে তোলে এটি; তাকে প্ররোচিত করা হয় যে তার সাফল্যের সুযোগ আসতে পারে শুধু তার ধৈর্য ও প্রয়োগের মধ্যে; সে গ্রহণ করে তার সময় ও শক্তির ব্যাপারে যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হওয়ার দৃঢ়সংকল্প– নিশ্চিতভাবেই একটা খারাপ পরিকল্পনা।

এ-পরাজয়বাদের পরিণতিরূপে নারী সহজেই মেনে নেয় পরিমিত সাফল্য; সে অতিশয় উচ্চ লক্ষ্য পোষণের সাহস করে না। অগভীর প্রস্তুতি নিয়ে তার পেশায় ঢুকে

নারী অবিলম্বে নির্ধারণ করে তার অভিলাষের সীমা। নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করতে পারলেই নিজেকে তার যথেষ্ট মেধাবী মনে হয়; আরো অনেকের মতো সে একটি পুরুষের কাছে সমর্পণ করতে পারতো তার ভাগ্য। তার স্বাধীনতা লাভের বাসনা পোষণ ক'রে যাওয়ার জন্যে দরকার পড়ে একটা প্রচেষ্টা, এতে সে গর্ববোধ করে, কিন্তু এটা তাকে শেষ ক'রে ফেলে। তার মনে হয় সে কিছু করতে মনস্থ ক'রেই যথেষ্ট ক'রে ফেলেছে। 'এটাই একটি নারীর জন্যে বিশেষ মন্দ নয়,' সে ভাবে। এক নারী, যে কাজ করছিলো একটা অপ্রথাগত পেশায়, একবার বলেছিলো : 'যদি আমি পুরুষ হতাম, তাহলে আমি শীর্ষে পৌছোনোর কথা ভাবতাম; তবে এমন একটি পদে অধিষ্ঠিত ফ্রান্সে আমিই একমাত্র নারী : এ-ই আমার জন্যে যথেষ্ট।' এ-পরিমিতিবোধের মধ্যে দূরদর্শিতা রয়েছে। নারী ভয় পায় বেশি দূরে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে সে তার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবে।

বলা আবশ্যক যে স্বাধীন নারী ন্যায্যভাবেই বিচলিত বোধ করে একথা ভেবে যে তার ওপর লোকজনের আস্থা নেই। সাধারণভাবে, উচ্চবর্ণ বিরূপ থাকে নিম্নবর্ণ থেকে আসা নবাগতের প্রতি : শাদা মানুষেরা কোনো নিগ্রো চিকিৎসক দেখাবে না, পুরুষেরা দেখাবে না কোনো নারী ডাক্তার; কিন্তু নিম্নবর্ণের লোকেরা, তাদের বিশেষ নিকৃষ্টতা সম্পর্কে ধারণাবশত এবং তাদের বর্ণের যে-লোকটি তার প্রথাগত ভাগ্যের ওপরে উঠেছে, তার প্রতি তীব্র বিরাগবশত, তারাও পছন্দ করবে প্রভুদের কাছে যেতে। অধিকাংশ নারী পুরুষের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির ফলে ব্যগ্রভাবে পুরুষ খোঁজে ডাক্তারের মধ্যে, আইনজীবীর মধ্যে, অফিসের ব্যবস্থাপক প্রভৃতির মধ্যে। একজন নারীর অধীনে পুরুষও থাকতে চায় না নারীও থাকতে চায় না। তার উর্ধ্বতনেরা তার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও সব সময়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে কিছুটা প্রসন্নতা দেখাবে তার প্রতি; নারী হওয়া একটা ত্রুটি না হ'লেও অন্তত একটা অদ্ভুতত্ব। নারীকে অবিরাম অর্জন করতে হয় আস্থা, যা প্রথম তার প্রতি পোষণ করা হয় না : শুরুতে সে হয় সন্দেহের পাত্র, তাকে প্রমাণ করতে হয় তার যোগ্যতা। যোগ্যতা থাকলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারা এরকম বলে। তবে যোগ্যতা কোনো পূর্বদত্ত সারবস্তু নয়; এটা একটি সফল বিকাশের পরিণতি। কোনো একজনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূল পূর্বসংস্কারের ভার বোধ করা খুব কম সময়ই তাকে তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। প্রারম্ভিক হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষা সাধারণত তাকে চালিত করে প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ার দিকে, যা ধারণ করে একটি অতিরঞ্জিত কর্তৃত্বের কৃত্রিম আচরণের রূপ।

অধিকাংশ নারী চিকিৎসক, উদাহরণস্বরূপ, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অস্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত বা অতিশয় কম কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ করেন। যদি তাঁরা স্বাভাবিক আচরণ করেন, তাঁরা ব্যর্থ হন নিয়ন্ত্রণে, কেননা সামগ্রিকভাবে জীবন তাঁদের প্রস্তুত করে প্রলুব্ধ করার জন্যে, কর্তৃত্ব করার জন্যে নয়; যে-রোগী শাসিত হ'তে চায়, সে হতাশ হবে সরলভাবে দেয়া পরামর্শে। এ-ব্যাপারে সচেতন হয়ে নারী চিকিৎসকেরা কথা বলেন গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে, চরম কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে; তবে এতে তিনি হারিয়ে ফেলেন সে-রুক্ষ কিন্তু সরল ও স্পষ্টবাদী স্বভাব, যা নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত চিকিৎসকের আকর্ষণীয়তা।

পুরুষ নিজের অধিকার দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে অভ্যস্ত; তার খরিদ্দাররা বিশ্বাস করে তার যোগ্যতায়; সে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে : সে অভ্রান্তভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নারী একই রকম নিরাপত্তার বোধ জাগায় না; সে অহঙ্কারী আচরণের ভাব করে, তা ছেড়ে দেয়, সে এটা অতিরঞ্জিত করে। ব্যবসায়, প্রশাসনিক কাজে, সে যথাযথ, খুঁৎখুঁতে, সে সহজেই দেখায় আগ্রাসিতা। যেমন তার পড়াশুনোয়, তার অভাব স্বাচ্ছন্দ্য, তেজস্বিতা, দুঃসাহসের। সাফল্য অর্জনের প্রয়াসে সে হয়ে ওঠে উত্তেজিত। তার কর্মকাণ্ড হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতার ও আত্মঘোষণার পরম্পরা। এটাই সে-সাংঘাতিক ত্রুটি, যা উদ্ভূত হয় আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে : কর্তা ভুলতে পারে না নিজেকে। সে অকুতোভয়ে কোনো লক্ষ্যের দিকে নিবিষ্ট থাকে না : নির্ধারিত পথেই সে বরং উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। সাহসের সাথে লক্ষ্যের দিকে এগোনোর মধ্যে মানুষ ঝুঁকি নেয় আশাভঙ্গের, তবে সে অভাবিত ফলও লাভ করে; সাবধানতা দণ্ডিত করে মাঝারিত্বে।

খুব কম সময়ই স্বাধীন নারীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই দুঃসাহসিক অভিযাত্রা এবং অভিজ্ঞতার জন্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের রুচি, বা কোনো নিরাসক্ত ঔৎসুক্য; সে অর্জনের চেষ্টা করে একটি 'কর্মজীবন' যেমন অন্য নারীরা গ'ড়ে তোলে সুখের নীড়; সে নিয়ন্ত্রিত, পরিবৃত থাকে পুরুষের জগত দিয়ে, তার দুঃসাহস নেই এর ছাদ ভেঙেচুরে বেরিয়ে যাওয়ার, সে সংরক্তভাবে নিজেকে তার কর্মপরিকল্পনায় নিয়োগ করে না। এখনও সে তার জীবনকে গণ্য করে একটা সীমাবদ্ধ কর্মোদ্যোগরূপে : কোনো বস্তুগত লক্ষ্য অর্জন তার উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুর মাধ্যমে তার মন্ময় সাফল্য অর্জন করা। এ-মনোভাব, উদাহরণস্বরূপ, খুবই দেখা যায় মার্কিন নারীদের মধ্যে; তারা এটা প্রমাণ করতে খুবই পছন্দ করে যে তারা একটি চাকুরি করতে এবং এটা খুবই ভালোভাবে সমাধা করতে সমর্থ; তবে তারা তাদের কাজের *আধেয়র* প্রতি সংরক্তভাবে আকর্ষণ বোধ করে না। একই রকমে নারীর প্রবণতা আছে যে সে অতিশয় গুরুত্ব দেয় ছোটোখাটো বাধাবিপত্তি ও সামান্য সাফল্যের ওপর; সে পদে পদে নিরুৎসিত হয় বা অহমিকায় স্ফীত হয়ে ওঠে। যখন কোনো সাফল্যের প্রত্যাশা দেখা দেয়, তখন মানুষ তা ধীরভাবে গ্রহণ করে; কিন্তু যখন এটা লাভ সম্পর্কে সে ছিলো সন্দেহপরায়ণ, তখন এটা হয় এক মাদকতাপূর্ণ বিজয়োল্লাস। এটাই সে-অজুহাত, যখন নারীরা তালগোল পাকিয়ে ফেলে প্রতিপত্তিতে এবং জাঁকালো গৌরব বোধ করে তাদের তুচ্ছ সাফল্যে। তারা কতো দূর এসেছে, তা দেখার জন্যে তারা সব সময়ই পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকে, এবং ব্যাহত করে তাদের অগ্রগতি। এ-পদ্ধতিতে তারা সম্মানজনক সাফল্য অর্জন করতে পারে কর্মজীবনে, কিন্তু অসাধারণ কিছু অর্জন করতে পারে না। এটাও বলা করা দরকার যে বহু পুরুষও কর্মজীবনে মাঝারি সাফল্যের বেশি কিছু অর্জন করতে পারে না। শুধু পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে তুলনায়ই– অতিশয় দুর্লভ ব্যতিক্রমগুলো বাদে– নারী পেছনে প'ড়ে আছে ব'লে আমাদের মনে হয়। আমি যে-কারণগুলো দেখিয়েছি, সেগুলোই এটা ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করে, এবং কোনোক্রমেই সেগুলো বন্ধক দেয় না ভবিষ্যৎকে। অসামান্য কোনো কাজ করার জন্যে নারী আজ মূলত যার অভাব বোধ

করে, তা হচ্ছে তার আত্মবিস্মৃতি; কিন্তু নিজেকে ভুলে যাওয়ার জন্যে প্রথমে যা দরকার, তা হচ্ছে এটা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যে এখন এবং ভবিষ্যতের জন্যে সে লাভ করেছে নিজেকে। পুরুষের বিশ্বে ভিন্নভাবে এসে, তাদের দ্বারা স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে দীনহীন কাজে নিযুক্ত হয়ে, নারী আজো আত্মানুসন্ধানে ব্যস্ত।

এক শ্রেণীর নারী আছে, যাদের ক্ষেত্রে এসব মন্তব্য প্রযোজ্য নয়, কেননা তাদের কর্মজীবন তাদের নারীত্বকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং দৃঢ়তর করে। তারা সে-নারী, যারা শৈল্পিক প্রকাশের মাধ্যমে পেরিয়ে যেতে চায় তাদের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো; তারা অভিনেত্রী, নর্তকী, ও গায়িকা। তিন শতাব্দী ধ'রে তারাই শুধু সে-নারী, যারা সমাজে রক্ষা ক'রে এসেছে মূর্ত স্বাধীনতা, এবং বর্তমানেও তারা সমাজে বজায় রাখছে একটা বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত স্থান। গির্জার কাছে আগে অভিনেত্রীরা ছিলো এক অভিশপ্ত বস্তু, এবং ওই কঠোরতার আতিশয্য সব সময়ই তাদের দিয়েছে আচরণের বিরাট স্বাধীনতা। তারা প্রায়ই প্রান্তবর্তী হয় নাগরালির এলাকার এবং, বারবনিতাদের মতো, তারা তাদের অধিকাংশ সময় কাটায় পুরুষের সংস্পর্শে; তবে নিজেদের জীবিকা অর্জন ক'রে ও তাদের কর্মের মধ্যে তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ক'রে, তারা মুক্ত থাকে পুরুষের জোয়াল থেকে। তাদের বড়ো সুবিধা হচ্ছে যে তাদের পেশাগত সাফল্য– পুরুষদের সাফল্যের মতোই– বাড়িয়ে তোলে তাদের লৈঙ্গিক মূল্য: তাদের আত্মসিদ্ধির মধ্যে, মানুষ হিশেবে নিজেদের বৈধতাপ্রতিপাদনের মধ্যে, নারী হিশেবে তারা লাভ করে আত্মচরিতার্থতা : তারা পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষায় ছিন্নভিন্ন হয় না। বরং তাদের কাজের মধ্যে তারা লাভ করে তাদের আত্মরতির যাথার্থ্য প্রতিপাদন; পোশাক, রূপচর্চা, মোহনীয়তা তাদের পেশাগত দায়িত্বের অংশ। নিজের ভাবমূর্তির প্রেমমুগ্ধ নারীর কাছে এটা এক বড়ো সন্তোষের ব্যাপার হচ্ছে সে যা, শুধু তা প্রদর্শন করাই একটা কিছু করা; এবং একটা কাজের বিকল্প রূপে মনে হওয়ার জন্যে, যেমন বলেছেন জর্জেৎ লেব্লা, এ-প্রদর্শনীর জন্যে দরকার পড়ে যথেষ্ট পর্যেষণা ও দক্ষতা। একজন বড়ো অভিনেত্রীর লক্ষ্য আরো উচ্চ : তিনি বিদ্যমানকে প্রকাশ করতে গিয়ে বিদ্যমানকে অতিক্রম ক'রে যাবেন; তিনি হবেন প্রকৃতই একজন শিল্পী, একজন স্রষ্টা, যিনি বিশ্বকে অর্থপূর্ণ ক'রে অর্থপূর্ণ করেন নিজের জীবনকে।

তবে এসব অসাধারণ সুবিধা ফাঁদগুলো লুকিয়ে রাখে : তার আত্মরতিপরায়ণ আত্ম-প্রশ্রয় ও লৈঙ্গিক স্বাধীনতাকে তার শৈল্পিক জীবনের সঙ্গে সংহতিবিধানের বদলে অভিনেত্রী প্রায়ই ডুবে যায় আত্মপুজোয় বা নাগরালিতে; আমি ইতিমধ্যেই সে-সব ছদ্মশিল্পীদের কথা বলেছি, যারা চলচ্চিত্রে বা রঙ্গমঞ্চে নিজেদের জন্যে একটা নাম করতে চায়, যা হয়ে ওঠে পুরুষের বাহুর ভেতরে শোষণের একটি পুঁজি। কর্মজীবনের ঝুঁকি ও সব ধরনের প্রকৃত কাজের নিয়মানুবর্তিতার তুলনায় অনেক বেশি প্রলোভন জাগায় পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা। নারীধর্মী নিয়তির বাসনা– স্বামী, গৃহ, সন্তান– এবং প্রেমের মোহিনীশক্তির সঙ্গে সাফল্য লাভের ইচ্ছের সঙ্গতিবিধান সহজ নয়। তবে, সর্বোপরি, তার অহমিকার প্রতি তার মুগ্ধতাবোধ বহু ক্ষেত্রে সীমিত করে অভিনেত্রীর সাফল্যকে; তার সশরীরে উপস্থিতির মূল্য সম্পর্কে সে এতো বেশি মোহাচ্ছন্ন থাকে যে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাজকে মনে হয় নিরর্থক। সব কিছুর ওপরে

সে ব্যস্ত থাকে জনগণের চোখের সামনে নিজেকে তুলে ধরতে এবং রঙ্গমঞ্চীয় হাতুড়েপনার কাছে সে বলি দেয় সে-চরিত্রটিকে, যেটিকে সে ব্যাখ্যা করছে। তার অভাব আছে নিজেকে ভুলে থাকার সহৃদয়তার; সত্যিই দুর্লভ রাশেলরা, দুশেরা, যাঁরা এড়িয়ে যান এসব শৈলশিরা এবং শিল্পকলার মধ্যে তাঁদের অহমিকার একটি সেবককে দেখার বদলে তাঁরা তাঁদের দেহকে ক'রে তোলেন শিল্পকলার হাতিয়ার। উপরন্তু, একটি নিকৃষ্ট অভিনেত্রী তার ব্যক্তিগত জীবনে অতিশায়িত ক'রে তুলবে তার সমস্ত আত্মরতিপরায়ণ ত্রুটিগুলো : সে নিজেকে প্রদর্শন করবে অসার, বিরক্তিকর, নাটকীয়ভাবে; সে সমগ্র বিশ্বকে গণ্য করবে একটি রঙ্গমঞ্চ।

আজকাল অভিনয়কলাই শুধু উন্মুক্ত নয় নারীর সামনে; অনেকেই চালাচ্ছে বিচিত্র ধরনের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের প্রচেষ্টা। নারীর পরিস্থিতি নারীকে প্রবৃত্ত করে সাহিত্য ও শিল্পকলায় নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে। পুরুষের জগতের প্রান্তিক অবস্থানে বাস ক'রে সে একে এর বিশ্বজনীন রূপে দেখতে পায় না, দেখে তার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। তার কাছে এটা হাতিয়ার ও ধারণার একত্রীভবন নয়, বরং এটা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আবেগের এক উৎস; বিভিন্ন বস্তুর গুণাবলির প্রতি সে আকৃষ্ট হয় ওই সব বস্তুর ভিত্তিহীন ও গুপ্ত উপাদান দ্বারা। একটা নেতিবাচক ও অস্বীকারের মনোভাব গ্রহণ ক'রে সে আসল বস্তুতে নিবিষ্ট হয় না : সে প্রতিবাদ করে এর বিরুদ্ধে, শব্দ দিয়ে। প্রকৃতির ভেতর দিয়ে সে খোঁজে তার আত্মার প্রতিমা, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে স্বপ্নপ্রয়াণে, সে অর্জন করতে চায় তার *সত্তা*– কিন্তু সে হয় হতাশাগ্রস্ত; সে এটা ফিরে পেতে পারে শুধু কল্পনার রাজ্যে। একটি আন্তর জীবন, যার কোনো *ব্যবহার্য* লক্ষ্য নেই, সেটিকে শূন্যতায় ডুবে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে, দুর্দমনীয়ভাবে সে সহ্য করে যে-বিদ্যমান অবস্থা, তার বিরুদ্ধে নিজেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার জন্যে, যে-বিশ্বে তার সত্তা সে চরিতার্থ করতে পারে না, তার থেকে ভিন্ন একটি বিশ্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে, তাকে আশ্রয় নিতে হয় *আত্ম-প্রকাশের*। তারপরও, সকলেই জানে যে সে এক অনর্থক বকবককারী ও হিজিবিজিলেখক; কথোপকথনে, চিঠিপত্রে, অন্তরঙ্গ দিনপঞ্জিতে সে খুলে ধরে নিজের বক্ষ। একটু উচ্চাভিলাষ থাকলে সে শুরু করবে স্মৃতিকথা লেখা, তার জীবনীকে পরিণত করবে উপন্যাসে, কবিতায় সে প্রকাশ করবে তার অনুভূতি। যে-বিপুল অবকাশ সে উপভোগ করে, তা এসব কর্মকাণ্ডের অনুকূল।

তবে যে-পরিস্থিতিগুলো নারীকে সৃষ্টিশীল কাজে প্রবৃত্ত করে, সেগুলোই হয়ে ওঠে এমন বাধা, যা কাটিয়ে উঠতে নারী প্রায়ই অসমর্থ হয়। যখন সে শুধু তার কর্মহীন দিনগুলোকে ভ'রে তোলার জন্যে ছবি আঁকার বা লেখার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ছবি আঁকা বা লেখাকে গণ্য করা হবে শখের কাজ ব'লে; সে ওগুলোর প্রতি বিশেষ সময় ও যত্ন নিয়োগ করবে না, এবং ওগুলো হবে একই মূল্যের। প্রায়ই ঋতুবিরতির সময় তার অস্তিত্বের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করার জন্যে নারী স্থির করে হাতে তুলি বা কলম তুলে নেয়া; তবে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে, এবং সনিষ্ঠ প্রশিক্ষণের অভাবে সে কখনোই একটি আনাড়ির বেশি কিছু হবে না। এমনকি সে যখন বেশ আগেই শুরু করে, তখনও কদাচিৎ সে শিল্পকলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব'লে কল্পনা করে; আলস্যে অভ্যস্ত হয়ে, তার জীবনের ধরনের মধ্যে কখনো কঠোর নিয়মানুবর্তিতার

আবশ্যকতা বোধ না ক'রে, সে কখনোই অব্যাহত ও অটল উদ্যোগ গ্রহণে সমর্থ হবে না, সে কখনো একটি সুষম কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না। সে বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে সে-কাজের প্রতি, যাতে নিরর্থকভাবে, নিঃসঙ্গ অন্ধের মতো হাতড়ে ফিরতে হয়, যে-কাজ কখনো দিনের আলো দেখতে পায় না, যা অবশ্যই নষ্ট করতে হবে এবং শত বার সম্পন্ন করতে হবে; অন্যদের খুশি করার জন্যে শৈশব থেকে যেমন তাকে শেখানো হয়েছে ছলচাতুরি করতে, তেমনি সে 'উতরে যেতে' চায় কিছু কৌশল প্রয়োগ ক'রে। মারি বাশকির্তসেভ স্বীকার করেন ঠিক এটাই : 'হ্যাঁ, আমি কখনো ছবি আঁকার কষ্ট স্বীকার করি না। আমি আজ নিজেকে দেখেছি। আমি *ঠকাই*।' নারী কাজ কাজ *খেলতে* খুবই প্রস্তুত, কিন্তু সে কাজ করে না; অক্রিয়তার যাদুকরী গুণাবলিতে বিশ্বাসী হয়ে সে তালগোল পাকিয়ে ফেলে মন্ত্রোচ্চারণ ও কর্মের মধ্যে, প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি ও কার্যকর আচরণের মধ্যে। সে চারুকলার ছাত্র হওয়ার ভান করে, সে নিজেকে সজ্জিত করে তুলির সাজসরঞ্জামে; কিন্তু যেই সে বসে ইজেলের সামনে, তার চোখ নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়ায় শাদা কাপড় থেকে তার আয়না পর্যন্ত; তবে ফুলের গুচ্ছটি বা আপেলের ডালাটি নিজেদের ইচ্ছেয় গিয়ে দেখা দেবে না চিত্রপটে। তার ডেস্কের সামনে ব'সে, তার অস্পষ্ট গল্পগুলোকে মনে মনে আন্দোলন ক'রে, নারী উপভোগ করে এ-সহজ ভানটা যে সে লেখক; কিন্তু তাকে বাস্তবিকভাবে শাদা কাগজের ওপর কাটতে হবে কালো দাগ, তাকে ওগুলোকে অন্যদের চোখের কাছে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। তখনই ধরা পড়ে প্রতারণাটি। খুশি করার জন্যে মরীচিকা সৃষ্টি করাই যথেষ্ট; তবে শিল্পকলা কোনো মরীচিকা নয়, এটা এক কঠিন বস্তু; এটা রূপায়িত করার জন্যে জানতে হবে এর রীতিনীতি।

শুধু তাঁর প্রতিভা ও মেজাজের কারণেই কলেৎ একজন মহৎ লেখক হয়ে ওঠেন নি; তাঁর কলম প্রায়ই হয়ে উঠেছে তাঁর অবলম্বনের উপায়, এবং দক্ষ কারিগর যেমন তার হাতিয়ারের কাছে প্রত্যাশা করে ভালো কাজ, তিনিও এর কাছে চেয়েছেন একই রকম ভালো কাজ। *ক্লদিন* থেকে *নেসাঁস দ্য জুর*-এর মধ্যে শৌখিন লেখকটি হয়ে ওঠেন পেশাদার, এবং এ-ক্রান্তিকাল একটা কঠোর প্রশিক্ষণ পর্বের উপকারগুলো দীপ্তভাবে প্রদর্শন করে। তাদের যোগাযোগের বাসনা যে-সব সমস্যা উপস্থিত করে, অধিকাংশ নারী, অবশ্য, সেগুলো বুঝতে পারে না; এবং এর মূলে বেশির ভাগই আছে তাদের আলস্য। সব সময়ই তারা নিজেদের *দত্ত* ব'লে গণ্য করে; তারা মনে করে যে তাদের যোগ্যতা উৎসারিত হয় কোনো অন্তর্নিহিত বর থেকে এবং ভাবে না যে যোগ্যতাকে জয় করা যায়। প্রলুব্ধ করার জন্যে তারা জানে শুধু নিজেদের প্রদর্শনের রীতি; এতে তাদের মোহনীয়তা কাজ করে বা করে না, এর সাফল্য বা ব্যর্থতায় তাদের সত্যিকার কোনো হাত নেই। সদৃশ রীতিতে তারা অনুমান করে যে একজন কী, তা দেখানোই প্রকাশের জন্যে, যোগাযোগের জন্যে যথেষ্ট; ভাবনাচিন্তার সাহায্যে তাদের লেখাকে বিশদ করার বদলে তারা নির্ভর করে স্বতস্ফূর্ততার ওপর। লেখা ও মৃদুহাসি তাদের কাছে একই জিনিশ; তারা তাদের ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখে, সাফল্য আসবে বা আসবে না। যদি আত্মবিশ্বাসী হয়, তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই ধ'রে নেয় যে বইটি বা চিত্রটি কোনো প্রয়াস ছাড়াই সাফল্যমণ্ডিত হবে; যদি ভীরু হয়, তাদের

সমালোচনায় তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তারা জানে না যে একটা ভুল উন্মোচিত ক'রে দিতে পারে অগ্রগতির পথ, ভুলকে তারা বিকলাঙ্গতার মতো অসংশোধনীয় মহাবিপর্যয় ব'লে গণ্য করে। এজন্যে তারা প্রায়ই দেখিয়ে থাকে একটা বিপর্যয়কর যুক্তিহীন অস্থিরতা : তারা তাদের ভুলগুলো থেকে লাভজনক শিক্ষা নেয়ার বদলে ভুলগুলোকে গ্রহণ করে বিরক্তি ও নিরুৎসাহের সঙ্গে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বতস্ফূর্ততা আয়ত্ত করা যতোটা সহজ ব'লে মনে হয় ততোটা সহজ নয় : গতানুগতিকের কূটাভাস হচ্ছে যে– যেমন *ফ্ল্যর দ্য তারবে*তে পলহাঁ ব্যাখ্যা করেছেন– মন্ময় বোধের সরাসরি উপস্থাপনের সঙ্গে একে প্রায়ই তালগোল পাকিয়ে তোলা হয়। তাই একজন হবু-লেখিকা, অন্যদের গোণার মধ্যে না ধ'রে, যে-মুহূর্তে মনে করে যে তার নিজের মনে যে-ছবিটি গ'ড়ে উঠেছে, সেটি সে উপস্থাপন করেছে অতিশয় মৌলিকভাবে, তখন সে আসলে একটা মামুলি অতিব্যবহৃত বুলি পুনরুদ্ভাবনের বেশি কিছু করে না। কেউ তাকে একথা বললে সে বিস্মিত হয়; সে অস্থির হয়ে ওঠে ও তার কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়; সে এটা বোঝে না যে জনগণ পড়ে চোখ ও ভাবনাকে অন্তর্মুখি ক'রে এবং সামগ্রিকভাবে টাটকা একটা প্রকাশভঙ্গি মনে জাগিয়ে তুলতে পারে নানা প্রিয় স্মৃতি। নিজের মনের ভেতরে ছিপ ফেলে কিছু পাওয়া ও সেগুলোকে প্রাণবন্ত প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে ভাষার বাইরের স্তরে নিয়ে আসতে পারা সত্যিই এক বহুমূল্য সহজাত ক্ষমতা। আমরা শ্রদ্ধা করি কলেতের স্বতস্ফূর্ততাকে, যা কোনো পুরুষ লেখকের মধ্যে দেখা যায় না; তবে তাঁর মধ্যে আমরা পাই এক সুচিন্তিত স্বতস্ফূর্ততা– যদিও এ-দুটি শব্দকে পরস্পরবিরোধী মনে হয়। তিনি তাঁর বিষয়ের কিছু রাখেন এবং বাকিটা সব সময়ই জেনে-শুনে বাদ দেন। আনাড়ি লেখিকা শব্দকে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের, অন্যদের অনুভূতিতে নাড়া দেয়ার একটি উপায় ব'লে গণ্য না ক'রে তার নিজের অনুভূতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ ব'লে গণ্য করে; বাছাই করা, মুছে ফেলাকে তার কাছে তার নিজের একটি অংশকে ত্যাজ্য করা ব'লে মনে হয়; সে তার শব্দরাশির কোনোটিকেই ত্যাগ করতে চায় না, এটা যুগপৎ এজন্যে যে সে যা, তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট এবং এ-কারণে যে অন্য কিছু হওয়ার কোনো আশা তার নেই। তার বন্ধ্যা অহমিকা উদ্ভূত হয় এ-ঘটনা থেকে যে সে অত্যন্ত ভালোবাসে নিজেকে, নিজেকে বিশ্লেষণের সাহস না ক'রে।

সুতরাং, যে-নারীবাহিনী শিল্পসাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই অধ্যবসায়ী হয়; এবং এমনকি যাঁরা পেরিয়ে যান এ-প্রথম বাধা, তাঁরাও প্রায়ই ছিন্নভিন্ন হন তাঁদের আত্মরতি ও হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষার মধ্যে। নিজেদের ভুলে যাওয়ার অসামর্থ্য এমন এক ত্রুটি, যা অন্যান্য পেশার নারীদের ওপর যতোটা চেপে থাকে, তাঁদের ওপর চেপে থাকে অনেক বেশি; যদি সত্তার বিমূর্ত সুনিশ্চিত ঘোষণা, সাফল্যের আনুষ্ঠানিক সন্তোষ হয় তাঁদের মূল লক্ষ্য, তাহলে তাঁরা বিশ্ব সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনায় নিজেদের নিয়োজিত করবেন না : তাঁরা একে পুনর্সৃষ্টি করতে অসমর্থ হবেন শিল্পকলায়। মারি বাশকির্তসেভ ছবি আঁকবেন ব'লে ঠিক করেন, কেননা তিনি বিখ্যাত হ'তে চেয়েছিলেন; তাঁর খ্যাতির আবেশ এসে দাঁড়ায় তাঁর ও বাস্তবতার মাঝখানে। তিনি আসলে ছবি আঁকা পছন্দ করেন না : শিল্পকলা একটা উপায় মাত্র;

তাঁর উচ্চাভিলাষী ও শূন্যগর্ভ স্বপ্নগুলো একটি রঙের বা মুখের তাৎপর্য প্রকাশ করবে না তাঁর কাছে। নারী যে-কাজের ভার নেয়, তাতে নিজেকে উজাড় ক'রে দেয়ার বদলে প্রায়ই সে একে মনে করে তার জীবনের নিতান্ত একটা অলঙ্করণ, বই বা চিত্র হচ্ছে জনগণের কাছে সে-অপরিহার্য সত্য প্রদর্শনের পরিহার্য উপায় : তার নিজের সত্তা। উপরন্তু, তার নিজের সত্তাই তার আগ্রহের প্রধান– অনেক সময় অনন্য– বিষয় : মাদাম ভিগি-লেব্রুঁ কখনোই তাঁর মৃদুহাস্যরত মাতৃত্বকে তাঁর চিত্রপটে উপস্থাপনে ক্লান্ত হন নি। কোনো লেখিকা যখন সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলেন, তখনও তিনি নিজের সম্পর্কেই কথা বলেন : লেখিকার দেহগঠন ও অত্যধিক মাংসলতা, তাঁর চুলের রঙ, এবং তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে না জেনে কারো পক্ষে কোনো কোনো নাটকীয় মন্তব্য পড়া সম্ভব নয়।

একথা সত্য, অহং সব সময়ই কদর্য নয়। কিছু স্বীকারোক্তির থেকে বেশি চাঞ্চল্যকর বই কমই আছে, তবে ওগুলোকে সৎ হ'তে হবে, এবং স্বীকারোক্তির মতো কিছু থাকতে হবে লেখকের। নারীর আত্মরতি তাকে সমৃদ্ধ করার বদলে দীনতর ক'রে তোলে; কিছু না ক'রে শুধু নিজের ধ্যান ক'রে নারী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে ফেলে; এমনকি তার আত্মপ্রেমও ছকবাঁধা : তার লেখায় সে অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে না, বরং প্রকাশ করে গতানুগতিক বুলিতে তৈরি এক কাল্পনিক মূর্তি। কনস্ট্যান্ট বা স্তেঁদাল যেভাবে করেছেন, সেভাবে সে যদি নিজেকে প্রক্ষেপ করে তার উপন্যাসে, তাহলে কেউ তাকে তিরস্কার করতে পারে না; কিন্তু বিপদ এখানে যে সে নিজেও প্রায়ই তার ইতিহাসকে দেখে একটা নির্বোধ রূপকথারূপে। কল্পনার সহায়তায় অল্পবয়স্ক মেয়ে নিজের কাছে গোপন ক'রে রাখে সে-বাস্তবতা, যার স্থূলতায় সে সন্ত্রস্ত বোধ করে, তবে এটা শোচনীয় যে যখন সে নারী হয়ে ওঠে তখনও সে বিশ্বকে, তার চরিত্রগুলোকে, এবং নিজেকে নিমজ্জিত করে কাব্যিক কুয়াশায়। যখন এ-ছদ্মবেশের ভেতর থেকে সত্য প্রকাশ পায়, তখন কখনো কখনো অর্জিত হয় আনন্দদায়ক ফল: তবে তখনও একটি *ডাস্টি অ্যাঙ্গার* ও একটি *কনস্ট্যান্ট নিম্ফ*-এর জায়গায় পাওয়া যায় কতোশতো নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ পলায়নের উপন্যাস!

নারীর জন্যে খুবই স্বাভাবিক যে সে পালানোর উদ্যোগ নেবে এ-বিশ্ব থেকে, যেখানে সে প্রায়ই বোধ করে যে তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে ও ভুল বোঝা হচ্ছে; তবে আক্ষেপের কথা হচ্ছে সে একজন জেরার দ্য নেরভাল, একজন এডগার অ্যালান পোর মতো দুঃসাহসী পলায়নের ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেয় না। তার ভীরুতার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। খুশি করাই হচ্ছে তার প্রথম কাজ; এবং প্রায়ই সে ভয় পায় যে সে লেখে, শুধু এ-কারণেই নারী হিশেবে সে বিরক্তিকর হয়ে উঠবে; *নীলমুজো* অভিধাটি, যদিও নিরর্থক হয়ে উঠেছে, তবু এটা এক অপ্রীতিকর দ্যোতনা জ্ঞাপন ক'রে চলছে; এছাড়া, লেখক হিশেবে বিরক্তিকর হওয়ার সাহস তার নেই। মৌলিকত্বসম্পন্ন লেখক, যদি মৃত না হয়, সব সময়ই অতি জঘন্য, কলঙ্ককর; অভিনবত্ব বিঘ্ন সৃষ্টি করে ও বীতস্পৃহা জাগায়। চিন্তার জগতে, শিল্পকলার জগতে– একটি পুরুষের জগতে প্রবেশ ক'রে নারী আজো বিস্ময় ও শ্লাঘা বোধ করে। সে সুশীলতম আচরণ করে; সে ভয় পায় বিশৃঙ্খলা ঘটাতে, অনুসন্ধান করতে, ফেটে পড়তে; সে মনে করে তার

সাহিত্যিক অভিমানের জন্যে সে মার্জনা চেয়ে নেবে তার বিনয় ও সুরুচির সাহায্যে। সে ভরসা করে প্রথাগত রীতি অনুসরণের নিশ্চিত মূল্যের ওপর; সাহিত্যকে সে ঠিকঠাকভাবে দান করে সে-সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যা তার কাছে প্রত্যাশা করা হয়, যা আমাদের মনে পড়িয়ে দেবে যে সে নারী, যার আছে সুচয়িত কিছু সৌষ্ঠব, মেকি আচরণ, ও কৃত্রিমতা। এসবই তাকে সাহায্য করে বেস্ট-সেলার উৎপাদনে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে; কিন্তু আমরা তার কাছে বিস্ময়কর পথে দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ার আশা করবো না।

এমন নয় যে এ-স্বাধীন নারীদের আচরণ বা অনুভূতির মধ্যে মৌলিকত্বের অভাব আছে; বরং, তাদের অনেকে এতো অসাধারণ যে তাদের তালাবদ্ধ ক'রে রাখা উচিত; সব মিলিয়ে, তাদের মধ্যে আছে বহু, যারা অনেক বেশি খামখেয়ালপূর্ণ, অনেক বেশি বাতিকগ্রস্ত পুরুষদের থেকে, যাদের শৃঙ্খলা তারা প্রত্যাখ্যান করে। তবে তাদের জীবনপদ্ধতিতে, কথোপকথনে, ও চিঠিপত্রে তারা তাদের প্রতিভাকে প্রয়োগ করে অস্বাভাবিকতার কাজে; যদি তারা লিখতে শুরু করে, তাহলে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে সংস্কৃতির বিশ্ব দিয়ে, কেননা এটা পুরুষের বিশ্ব, সুতরাং তারা পারে শুধু তোতলাতে। অন্য দিকে, নিজেকে প্রকাশের জন্যে যে-নারী পুরুষের কলাকৌশল অনুযায়ী বেছে নিতে চায় যুক্তি, সে শ্বাসরোধ ক'রে তুলবে সে-মৌলিকত্বের, যাকে অবিশ্বাস করার তার কারণ আছে; ছাত্রীর মতো, তার আছে পড়ুয়া ও পণ্ডিতসুলভ হওয়ার প্রবণতা; সে অনুকরণ করবে পুরুষের কঠোরতা ও বলিষ্ঠতার। সে হয়ে উঠতে পারে একজন চমৎকার তাত্ত্বিক, আয়ত্ত করতে পারে প্রকৃত যোগ্যতা; তবে সে বাধ্য হবে তার মধ্যে 'ভিন্ন' যা-কিছু আছে, তা অস্বীকার করতে। বহু নারী আছে, যারা পাগল এবং যুক্তিনির্ভর ধরনের নারী আছে বহু; এমন কেউ নেই, যার ধরনের মধ্যে আছে সেই পাগলামো, যাকে আমরা বলি প্রতিভা।

সর্বোপরি, এ-যুক্তিযুক্ত পরিমিতিবোধই এ-পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে নারীপ্রতিভার সীমা। বহু নারী এড়িয়ে গেছে– এবং এখন উত্তরোত্তর এড়িয়ে যাচ্ছে– আত্মরতি ও ভ্রান্ত যাদুর ফাঁদ; কিন্তু বিদ্যমান বিশ্বের বাইরে *আবির্ভূত* হওয়ার চেষ্টায় কেউই কখনো সমস্ত বিমৃষ্যকারিতাকে পায়ে মাড়িয়ে যায় নি। প্রথমে, অবশ্যই আছে অনেকে, যারা সমাজ যেমন আছে তেমনভাবেই মেনে নেয়; তাদের মধ্যে বুর্জোয়াধারার মহিলা কবিরা সর্বপ্রধান, কেননা এ-হুমকিগ্রস্ত সমাজের সবচেয়ে রক্ষণশীল উপাদানের তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন। সুনির্বাচিত বিশেষণের সাহায্যে তাঁরা মনে জাগিয়ে তোলেন এমন এক সমাজের পরিশীলনের কথা, যাকে নির্দেশ করা হয় 'উৎকর্ষ'-এর সভ্যতা ব'লে; তাঁরা মহিমান্বিত করেন কল্যাণের মধ্যবিত্তসুলভ আদর্শকে এবং কাব্যিক রঙ চড়িয়ে তাঁরা ঢেকে রাখেন তাঁদের শ্রেণীর স্বার্থকে; তাঁরা সংযোগ করেন সে-মহারহস্যীকরণের সুর, যার লক্ষ্য নারীকে 'নারীধর্মী থাকতে' প্ররোচিত করা। প্রাচীন গৃহ, ভেড়ার খোঁয়াড় ও শব্জি বাগান, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বুড়োরা, পাজি শিশুরা, ধোয়া, সংরক্ষণ, পারিবারিক উৎসব, প্রসাধন, বসার ঘর, বলনাচ, অসুখী তবে আদর্শ স্ত্রীরা, ভক্তি ও ত্যাগের সৌন্দর্য, দাম্পত্য প্রেমের ছোটোখাটো দুঃখ ও বিরাট সুখ, যৌবনের স্বপ্ন, বার্ধক্যের দাবিত্যাগ– ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নারী ঔপন্যাসিকেরা এসব

বিষয় ব্যবহার করেছেন তলানি পর্যন্ত; এভাবে তাঁরা খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেছেন, তবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের বিশ্বদৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেন নি।

অনেক বেশি আকর্ষণীয় সে-সব বিদ্রোহী নারীরা, যাঁরা দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছেন এ-অসৎ সমাজকে; প্রতিবাদের সাহিত্য জন্ম দিতে পারে আন্তরিক ও শক্তিশালী গ্রন্থ; তাঁর বিদ্রোহের উৎস থেকে জর্জ এলিয়ট এঁকেছেন ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের রূপ, যা একই সঙ্গে অনুপুঙ্খ ও নাটকীয়; তবে, ভার্জিনিয়া উল্ফ্ যেমন দেখিয়েছেন আমাদের, জেইন অস্টিনকে, ব্রোন্টি বোনদের, জর্জ এলিয়টকে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্যে নেতিবাচকভাবে এতোটা শক্তি ব্যয় করতে হয় যে তাঁদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে সে-স্তরে পৌছোতে, যেখানে থেকে মহাপরিসরসম্পন্ন পুরুষ লেখকেরা শুরু করেন যাত্রা; তাঁদের বিজয়ে লাভবান হওয়ার এবং যে-সব রজ্জু তাঁদের বেঁধে রেখেছে, সেগুলো ছেঁড়ার মতো যথেষ্ট শক্তি আর তাঁদের অবশিষ্ট থাকে না। তাঁদের মধ্যে আমরা পাই না, উদাহরণস্বরূপ, একজন স্তেঁদালের বজ্রাঘাত, সাবলীলতা, তাঁর প্রশান্ত আন্তরিকতাও পাই না। তাঁদের ছিলো না একজন দস্তোয়েভ্স্কির, একজন তলস্তয়ের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিও : এটাই ব্যাখ্যা করে চমৎকার *মিডলমার্চ* কেনো *ওয়ার অ্যান্ড পিস্*-এর সমতুল্য নয়; তার মহিমা সত্ত্বেও কেনো *উদারিং হাইট্স্*-এ নেই *দি ব্রাদার্স কারামাজোভ*-এর নিরন্তর অব্যাহত প্রবাহ।

সে-পুরুষদেরই আমরা মহৎ বলি, যাঁরা– একভাবে বা অন্যভাবে– নিজেদের কাঁধে নিয়েছে বিশ্বের ভার; তাঁরা উৎকৃষ্টতর কাজ করেছেন বা নিকৃষ্ট কাজ করেছেন; তাঁরা একে পুনর্সৃষ্টি করতে সফল হয়েছেন বা ব্যর্থ হয়েছেন; কিন্তু প্রথমে তাঁরা ধারণ করেছেন ওই বিপুল ভার; এটাই সে-কাজ, যা কোনো নারী কখনো করে নি, যা তারা কেউ করতে *পারে নি*। বিশ্বকে নিজের ব'লে গণ্য করা, এর ত্রুটিগুলোর জন্যে নিজেকে দোষী করা এবং এর অগ্রগতির জন্যে নিজে গৌরব বোধ করার জন্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত হ'তে হয় সুবিধাপ্রাপ্ত বর্ণের; বিশ্বকে বদলে দিয়ে, এর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ক'রে, একে উদ্ঘাটিতে ক'রে এর যাথার্থ্য প্রতিপাদন শুধু তাদেরই দায়িত্ব, যারা আছে কর্তৃত্বে; শুধু তারাই নিজেদের চিনতে পারে এর ভেতরে এবং প্রয়াস চালাতে পারে এখানে বিখ্যাত হওয়ার। এ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে নিজেকে মূর্ত করা সম্ভব হয়েছে পুরুষের মধ্যে, নারীর মধ্যে নয়। কেননা যে-ব্যক্তিদের আমাদের অসাধারণ মনে হয়, যাঁদের প্রতিভা নামে সম্মান করা হয়, তাঁরা হচ্ছেন সে-সব পুরুষ, যাঁরা চেয়েছেন সমগ্র মানবমণ্ডলির ভাগ্য নিজেদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের মধ্যে রূপায়িত করতে, এবং কোনো নারীই বিশ্বাস করে নি যে এটা করার অধিকার তার আছে।

কী ক'রে ভ্যান গগ জন্ম নিতে পারতেন নারীরূপে? কোনো নারীকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হতো না বোরিনাজে বেলজিয়ামের কয়লা খনিতে, তাই সে কখনোই খনিশ্রমিকদের দুর্দশাকে বোধ করতো না নিজের অপরাধ ব'লে, সে চাই তো না পরিত্রাণ; সুতরাং সে কখনো আঁকতো না ভ্যান গগের সূর্যমুখি। উল্লেখ করার দরকার নেই যে ওই চিত্রকরের জীবনপদ্ধতি– আর্লেতে তাঁর নিঃসঙ্গতা, কাফেতে ও বেশ্যালয়ে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত, যা কিছু ভ্যান গগের সংবেদনশীলতাকে পুষ্ট ক'রে পুষ্ট করেছে তাঁর চিত্রকলাকে– নিষিদ্ধ হতো তার জন্যে। কোনো নারী কখনোই হ'তে

পারতো না কাফকা : তার সন্দেহ ও তার উদ্বেগের মধ্যে সে কখনোই বুঝতে পারতো না স্বর্গচ্যুত মানুষের নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা। সেইন্ট তেরেসা ছাড়া কদাচিৎ আছে এমন নারী, যে সম্পূর্ণ পরিত্যাগের মধ্যে পেরিয়ে গেছে মানুষের পরিস্থিতি : আমরা দেখেছি কেনো। পার্থিব স্তরক্রমের বাইরে তাঁর অবস্থান গ্রহণ ক'রে, ক্রুশের সেইন্ট জনের মতো, তিনি নিজের মাথার ওপর কোনো আশ্বাসদায়ক চালের উপস্থিতি অনুভব করেন নি। উভয়ের জন্যেই ছিলো একই অন্ধকার, একই আলোর ঝলকানি, সত্তায় একই শূন্যতা, বিধাতায় একই প্রাচুর্য। যখন অবশেষে প্রতিটি মানুষের পক্ষে, স্বাধীন অস্তিত্বের শ্রমসাধ্য মহিমায়, সম্ভব হবে তার গর্বকে লৈঙ্গিক বৈষম্যের বাইরে স্থাপন করতে, তখনই শুধু নারী সমর্থ হবে তার ব্যক্তিগত ইতিহাসকে, তার সমস্যাগুলোকে, তার সন্দেহগুলোকে সমগ্র মানবমণ্ডলির ইতিহাস, সমস্যা, সন্দেহের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে বুঝতে; তখনই শুধু সে সমর্থ হবে তার জীবন ও কর্মের মধ্যে শুধু তার ব্যক্তিগত সত্তাকে নয়, সমগ্র বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে। যতো কাল তাকে মানুষ হয়ে ওঠার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে, ততো কাল সে স্রষ্টা হয়ে উঠতে পারবে না।

আর একবার, নারীর সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যার জন্যে আবাহন করতে হবে নারীর পরিস্থিতিকে, কোনো রহস্যময় সারসত্তাকে নয়; তাই ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই উন্মুক্ত। এ-বিষয়ের লেখকেরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অটলভাবে মত পোষণ করেন যে নারীদের 'সৃষ্টিশীল প্রতিভা' নেই; এ-তত্ত্বই সমর্থন করেছেন মাদাম মার্থে বোরেলি, এক কুখ্যাত নারীবাদবিরোধী; তবে বলা যায় তাঁর বইগুলো এতো স্ববিরোধী যে তিনি ওগুলোকে ক'রে তুলতে চেয়েছেন নারীসুলভ অযৌক্তিকতা ও নির্বুদ্ধিতার জীবন্ত প্রমাণ। এছাড়াও, 'নারী চিরন্তনী' ধারণাটির মতোই, সত্যিকার অস্তিত্বশীল বস্তুর পুরোনো তালিকা থেকে, বর্জন করতে হবে সৃষ্টিশীল 'সহজাত প্রবৃত্তি'র ধারণাটি। কিছু কিছু নারীবিদ্বেষী জোরের সঙ্গে, কিছুটা বেশি সুনির্দিষ্টভাবে, ঘোষণা করেন নারী, যেহেতু স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত, মূল্যবান কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; তবে প্রায়ই ওই একই লোকেরা প্রতিভাকে এক ধরনের স্নায়ুবৈকল্য ব'লে ঘোষণা করেন। তা যা-ই হোক, প্রুস্তের উদাহরণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে মনোশারীরিক ভারসাম্যহীনতা ক্ষমতার অভাবও দ্যোতনা করে না, মাঝারিত্বও দ্যোতনা করে না।

ইতিহাস থেকে নেয়া যুক্তিটির কথা বলতে গেলে, ওইটি সম্পর্কে কী মনে করবো আমরা ঠিক তা-ই বিবেচনা করছিলাম; ঐতিহাসিক সত্য কোনো চিরন্তন সত্য প্রতিষ্ঠা করে না; এটা নির্দেশ করতে পারে শুধু একটা পরিস্থিতি, যা ঐতিহাসিক প্রকৃতির, বিশেষ ক'রে এ-কারণে যে এটা এখন বদলে যাচ্ছে। কী ক'রে কখনো থাকতে পারতো নারীর প্রতিভা, যখন তাদের কোনো প্রতিভাজাত শিল্পকর্ম– বা শুধুই একটি শিল্পকর্ম– সম্পন্ন করার সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? প্রাচীন ইউরোপ আগেকার দিনে ঘৃণা ঢেলে দিতো মার্কিন বর্বরদের ওপর, গর্ব করার মতো যাদের কোনো চিত্রকরও ছিলো না লেখকও ছিলো না। 'আমাদের অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করার আগে আমাদের অস্তিত্বশীল হ'তে দাও,' জেফারসন উত্তর দিয়েছেন, সত্যিকার অর্থে। কখনো একজন হুইটম্যান বা একজন মেলভিল জন্ম দেয় নি ব'লে নিগ্রোদের তিরস্কার করে যে-জাতিশ্রেষ্ঠতাবাদীরা, নিগ্রোরা তাদের দেয় একই উত্তর। ফরাশি

সর্বহারারাও উপস্থিত করতে পারে না রাসিন বা মালার্মের সঙ্গে তুলনীয় কোনো নাম।

মুক্ত নারী সবে মাত্র জন্ম নিচ্ছে; যখন সে জয় করবে নিজের মালিকানা তখনই হয়তো ফলবে র‍্যাবোর ভবিষ্যদ্বাণী : 'কবিরা থাকবে! যখন নারীর অমিত দাসত্ব ভাঙবে, যখন সে নিজের জন্যে ও নিজের মাধ্যমে বাঁচবে, পুরুষ– এ-পর্যন্ত ঘৃণ্য– তাকে মুক্তি দেবে, তখন সেও হবে কবি! নারী জানতে পাবে অজানাকে! তার ভাবনাগত বিশ্বগুলো কি ভিন্ন হবে আমাদেরগুলো থেকে? সে মুখোমুখি হবে অদ্ভুত, অতল, অনাকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক জিনিশের; আমরা তাদের গ্রহণ করবো, আমরা তাদের উপলব্ধি করবো।' এটা নিশ্চিত নয় যে তার 'ভাবনাগত বিশ্বগুলো' ভিন্ন হবে পুরুষেরগুলো থেকে, কেননা পুরুষের মতো একই পরিস্থিতি লাভ করার মাধ্যমেই সে পাবে মুক্তি; কতোটা মাত্রায় সে ভিন্ন থাকবে, এ-ভিন্নতাগুলো কতোটা মাত্রায় রক্ষা করবে তাদের গুরুত্ব, সে-কথা বলা– এটা দুঃসাহসিক ভবিষ্যদ্বাণীর ঝুঁকি নেয়া হবে বটে। যা নিশ্চিত, তা হচ্ছে এ-পর্যন্ত নারীর সম্ভাবনাগুলো নিরুদ্ধ করা হয়েছে এবং হারিয়ে গেছে মানবমণ্ডলির থেকে, এবং তার নিজের স্বার্থে এবং সকলের স্বার্থে তাকে তার সুযোগগুলো গ্রহণের অনুমতি দেয়ার এখখুনি সময়।

উপসংহার

'না, নারী আমাদের ভাই নয়; আলস্য ও কপটতার মাধ্যমে আমরা ক'রে তুলেছি তাকে একটি ভিন্ন সত্তা, অজ্ঞাত, তার কাম ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই, যা শুধু নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহই বোঝায় না বরং বোঝায় অন্যায় যুদ্ধ– ভক্তি বা ঘৃণা, কিন্তু কখনোই সোজাসুজি বন্ধু নয়, একটি সত্তা *এসপ্রি দ্য কর্প* ও সহমর্মীদের সঙ্গে অসংখ্যের এক বাহিনী – চিরন্তন ক্ষুদ্র দাসের স্পর্ধিত ভঙ্গি।'

বহু পুরুষ আজো একমত হবে লাফর্গের এসব কথার সাথে; অনেকে মনে করে সব সময়ই ঘটবে 'দ্বন্দ্ব ও কলহ', যেমন বলেছেন মঁতেইন, এবং কখনোই সম্ভবপর হবে না ভ্রাতৃত্ব। সত্য হচ্ছে আজকাল পুরুষ বা নারী কেউই পরস্পরকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু এটা জানা দরকার যে রয়েছে কি-না কোনো আদি অভিশাপ, যা তাদের বাধ্য করে পরস্পরকে বিদীর্ণ করতে, না-কি তারা পরস্পরবিরোধী যে-বিরুদ্ধতায়, সেগুলো নিতান্তই চিহ্নিত করে মানব-ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালীন মুহূর্তকে।

কিংবদন্তি সত্ত্বেও, কোনো শারীরবৃত্তিক নিয়তি নারী ও পুরুষের মধ্যে চিরন্তন বৈরিতা চাপিয়ে দেয় নি; এমনকি বিখ্যাত আরাধনাকারী ম্যান্টিসও পুরুষটিকে খায় শুধু অন্য খাদ্যের অভাবে এবং প্রজাতির কল্যাণে : প্রাণীজীবনের মাপদণ্ডের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই প্রজাতির অধীন। এছাড়া, মানবমণ্ডলি নিতান্ত একটি প্রজাতির থেকেও বেশি কিছু : এটা এক ঐতিহাসিক বিবর্তন; এটি কী আচরণ করে তার প্রাকৃতিক, স্থির বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে, এর *ফাকতিসিতে*র সাথে, সে-অনুসারে একে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সত্যিই, এমনকি চরম প্রতারণার উদ্দেশ্যে হ'লেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত কোনো শারীরবৃত্তিধর্মী বৈরিতার অস্তিত্ব দেখানো অসম্ভব। আরো, তাদের বৈরিতা হয়তো বণ্টন করা হয়েছে জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের মাঝামাঝি এক অঞ্চলে : মনোবিশ্লেষণে। নারী, বলা হয়েছে আমাদের, পুরুষকে ঈর্ষা করে তার শিশ্নের জন্যে এবং খোজা করতে চায় তাকে; কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর জীবনে শিশ্নের জন্যে বালখিল্য বাসনা তখনই শুধু গুরুত্বপূর্ণ যখন সে তার নারীত্বকে মনে করে একটি অঙ্গহানি ব'লে; এবং তখন সে এটিকে পুরুষের সমস্ত সুযোগসুবিধার প্রতীক হিশেবে ধ'রে আত্মসাৎ করতে চায় পুরুষের লিঙ্গটি। আমরা এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত যে তার খোজা করার স্বপ্নের আছে এ-প্রতীকী তাৎপর্য : মনে করা হয় যে সে চায় পুরুষকে তার সীমাতিক্রমণতা থেকে বঞ্চিত করতে।

কিন্তু তার বাসনা, যেমন দেখেছি আমরা, অনেক বেশি দ্ব্যর্থবোধক : সে চায়, একটি স্ববিরোধী রীতিতে, এ-সীমাতিক্রমণতা *পেতে*, এতে মনে করা যায় সে একই সাথে একে শ্রদ্ধা করে ও অস্বীকার করে, একই সঙ্গে সে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে

চায় এবং একে রাখতে চায় নিজের মধ্যে। এর অর্থ হচ্ছে লৈঙ্গিক স্তরে নাটকটি উন্মোচিত হয় না; আরো, লৈঙ্গিক পরিচয় কখনোই নিজের মধ্যে মানবাচরণের চাবি সরবরাহ ক'রে একটি নিয়তি নির্দেশ করে ব'লে আমাদের মনে হয় নি, বরং এটি প্রকাশ করে একটি পরিস্থিতির সমগ্রতা, যাকে সংজ্ঞায়িত করতে এটি সাহায্য করে। পুরুষ ও নারীর দেহসংস্থানে নিহিত নেই লিঙ্গের সংগ্রাম। সত্য হচ্ছে যখন কেউ এর আশ্রয় নেয়, তখন সে এটাকে অবধারিত ব'লে মনে করে যে ভাবনার জগতে অনন্ত কাল ধ'রে যুদ্ধ চলছে চিরন্তন নারী ও চিরন্তন পুরুষ নামের দুটি অস্বচ্ছ সারসত্তার মধ্যে; এবং সে এ-সত্যটি উপেক্ষা করে যে ইতিহাসের দুটি ভিন্ন মুহূর্তের সাথে সঙ্গতি রেখে পৃথিবীতে এ-দানবিক দ্বৈরথ পরিগ্রহ করে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ।

যে-নারী আটকে আছে সীমাবদ্ধতায়, সে পুরুষকেও আবদ্ধ করতে চায় ওই কারাগারে; এভাবে কারাগার হয়ে উঠবে বিশ্বের সাথে পরস্পরপরিবর্তনীয়, এবং নারী আর ভোগ করবে না সেখানে বন্দী হয়ে থাকার যন্ত্রণা : মা, স্ত্রী, প্রিয়া হচ্ছে কারারক্ষক। পুরুষদের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়ে সমাজ বিধান জারি করে যে নারী নিকৃষ্ট : সে এ-নিকৃষ্টতা এড়াতে পারে শুধু পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস ক'রে। সে লেগে যায় পুরুষের অঙ্গহানি করতে, পুরুষের ওপর আধিপত্য করতে, সে পুরুষের বিরোধিতা করে, সে অস্বীকার করে পুরুষের সত্য ও মূল্যবোধ। কিন্তু এটা করতে গিয়ে সে শুধু নিরাপত্তাবিধান করছে নিজের; কোনো অপরিবর্তনীয় সারসত্তা বা ভুলক্রমে বাছাই তাকে সীমাবদ্ধতায়, নিকৃষ্টতায় দণ্ডিত করে নি। এগুলো চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার ওপর। সব অত্যাচারই সৃষ্টি করে একটি যুদ্ধাবস্থা। এবং এটিও কোনো ব্যতিক্রম নয়। যে-অস্তিমানকে গণ্য করা হয় অপ্রয়োজনীয়, সে তার সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি না জানিয়ে থাকতে পারে না।

আজ দ্বৈরথটি নিয়েছে এক ভিন্ন আকার; পুরুষকে কারাগারে ঢোকানোর ইচ্ছের বদলে নারী মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে কারাগার থেকে; সে আর পুরুষকে সীমাবদ্ধতার রাজ্যে টেনে নিতে চায় না, বরং সে নিজে বেরিয়ে আসতে চায় সীমাতিক্রমণতার আলোতে। এখন পুরুষের মনোভাব সৃষ্টি করে একটি নতুন বিরোধ : পুরুষ নারীকে মুক্তি দিতে চায় অনিচ্ছেয়। সে নিজে সুখ পায় সার্বভৌম কর্তা, পরম শ্রেষ্ঠ, অপরিহার্য সত্তারূপে থাকতে; সে তার সঙ্গীকে বাস্তবিকভাবে তার সমান ব'লে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তার ওপর পুরুষের আস্থাহীনতার জবাব দেয় সে একটি আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ ক'রে। এটা আর সে-ব্যক্তিদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপার নয়, যারা প্রত্যেকে আটকে আছে তার নিজের এলাকায় : একটি জাত আক্রমণ করে তার অধিকার দাবি ক'রে এবং প্রতিহত হয় সুবিধাভোগী জাতটি দিয়ে। এখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুটি সীমাতিক্রমণতা; পরস্পরকে স্বীকার ক'রে নেয়ার বদলে একটি মুক্ত সত্তা আধিপত্য করতে চায় অন্যটির ওপর।

মনোভাবের এ-পার্থক্য প্রকাশ পায় যেমন লৈঙ্গিক স্তরে, তেমনি আধ্যাত্মিক স্তরে। 'নারীধর্মী' নারী নিজেকে শিকারের বস্তু ক'রে তুলতে গিয়ে চেষ্টা করে পুরুষকেও তার দৈহিক অক্রিয়তায় পর্যবসিত করতে; সে নিজেকে ব্যস্ত রাখে পুরুষকে তার ফাঁদে ফেলার জন্যে, সে পুরুষের মধ্যে জাগায় যে-কামনা, তা দিয়ে নিজেকে একটি অনুগত

বস্তু ক'রে তুলে সে শৃঙ্খলিত করতে চায় পুরুষকে। মুক্তিপ্রাপ্ত নারী, এর বিপরীতে, হ'তে চায় সক্রিয়, একজন গ্রহীতা, এবং সে মেনে নেয় না সে-অক্রিয়তা, পুরুষ যা চাপাতে চায় তার ওপর। 'আধুনিক' নারী গ্রহণ করে পুরুষের মূল্যবোধ : পুরুষের মতো একই শর্তে সে গর্ববোধ করে চিন্তায়, ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে, কাজ ক'রে, সৃষ্টি ক'রে; পুরুষদের অবজ্ঞা না ক'রে সে নিজেকে ঘোষণা করে তাদের সমান ব'লে।

পুরুষ ও নারী যতো কাল পরস্পরকে সমান ব'লে গণ্য করতে ব্যর্থ হবে, ততো কাল চলবে এ-কলহ; এর অর্থ হচ্ছে, যতো কাল যেমন আছে তেমন অবস্থায়ই স্থায়ী ক'রে রাখা হবে নারীদের। কোন লিঙ্গটি বেশি ব্যগ্র এটা বজায় রাখার জন্যে? নারী, যে মুক্তি পাচ্ছে এর থেকে, সেও বজায় রাখতে চায় এর বিশেষ সুবিধাগুলো; এবং পুরুষ, সে-ক্ষেত্রে, চায় যে নারী ধারণ করবে এর সীমাবদ্ধতাগুলো। 'অন্য লিঙ্গটিকে ক্ষমা করার থেকে একটি লিঙ্গকে অভিযুক্ত করা সহজ,' বলেছেন মঁতেইন। প্রশংসা ও নিন্দা ভাগাভাগি করা বৃথা। সত্য হচ্ছে দুষ্টচক্রটি ভাঙা যে এতো কঠিন, তার কারণ দুটি লিঙ্গ একই সঙ্গে পরস্পরের ও নিজের শিকার। শুদ্ধ স্বাধীনভাবে পরস্পরের মুখোমুখি দুটি প্রতিপক্ষের মধ্যে সহজেই একটি চুক্তিতে পৌঁছোনো যেতো : আরো বেশি সম্ভব হতো, কেননা যুদ্ধে কেউই লাভবান হবে না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটি এজন্যেই জটিল হয়ে ওঠে যে প্রতিটি শিবিরই সাহায্য ও আরাম দেয় শত্রুদের; নারী রত থাকছে আনুগত্যের স্বপ্নে, পুরুষ রত থাকছে একাত্মতাবোধের স্বপ্নে। যথার্থতার অভাব থেকে উপকার পাওয়া যায় না : সহজ পথের প্রলোভনে প'ড়ে পুরুষ বা নারী যে-অসুখ বোধ করেছে, তার জন্যে তারা পরস্পরকে দোষী করে; পুরুষ ও নারী পরস্পরের মধ্যে যা অপছন্দ করে, তা হচ্ছে প্রত্যেকের নিজের প্রতারণা ও হীনতার ভেঙে চুরমার করার মতো হতাশা।

আমরা দেখেছি পুরুষ কেনো প্রথমে নারীদের দাসত্বে আবদ্ধ করেছিলো; নারীদের অবমূল্যায়ন ছিলো মানুষের বিকাশের এক অত্যাবশ্যক পর্যায়, তবে এটা দুটি লিঙ্গের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করতে পারতো; যে-অপরকে সে চূড়ান্তরূপে পীড়ন করে, তার সঙ্গে একাত্মতাবোধের মাধ্যমে অস্তিমানের নিজের থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে পীড়নকে। প্রতিটি পুরুষের মধ্যে আজ বিরাজ করে ওই প্রবণতা; এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরা এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। স্ত্রীর মধ্যে স্বামী পেতে চায় নিজেকে, দয়িতার মধ্যে প্রেমিক পেতে চায় নিজেকে, একটা প্রস্তরমূর্তিরূপে; নারীর মধ্যে সে খোঁজে তার পৌরুষের, তার সার্বভৌমত্বের, তার অব্যবহিত বাস্তবতার কিংবদন্তি। কিন্তু সে ক্রীতদাস তার নিজের ডবলের : কী প্রয়াস তার একটি মূর্তি তৈরির, যার মধ্যে সব সময় সে বিপন্ন! সব কিছু সত্ত্বেও এতে তার সাফল্য নির্ভর করে নারীর চপল স্বাধীনতার ওপর : এ-শুভকে তার কাছে রাখার জন্যে তাকে অবিরত চেষ্টা চালাতে হয়। নিজেকে পুরুষ, গুরুত্বপূর্ণ, শ্রেষ্ঠরূপে দেখানোর প্রয়াসে পুরুষ ব্যস্ত; সে এর ছল করে বিনিময়ে ছল পাওয়ার জন্যে; সেও আগ্রাসী, অস্থির; সে নারীদের প্রতি শত্রুতা বোধ করে, কেননা সে তাদের ভয় করে, সে তাদের ভয় করে, কেননা সে ভয় করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে, মূর্তিকে, যার সঙ্গে সে অভিন্ন ক'রে তোলে নিজেকে। কতো সময় ও শক্তি যে সে অপচয় করে গূঢ়ৈষাগুলোকে খতম

করতে, উর্ধ্বগামী করতে, স্থানান্তরিত করতে, নারীদের সম্পর্কে কথা ব'লে, তাদের কামে প্রলুব্ধ ক'রে, তাদের ভয় ক'রে! নারীদের মুক্তির মধ্যে সে পাবে নিজের মুক্তি। তবে ঠিক এটাকেই সে ভয় করে। তাই নারীদের শৃঙ্খলিত রাখার লক্ষ্যে রহস্যীকরণে সে রত থাকে একগুঁয়েভাবে।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে উৎপীড়নকারীরা সাধারণত উৎপীড়িতদের কাছে থেকে দুষ্কর্মে যতোটা সহযোগিতা পায়, পুরুষেরা নারীর মধ্যে সহযোগিতা পায় তার থেকে অনেক বেশি। এবং এটা থেকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একথা ঘোষণার অধিকার পায় যে নারীর ওপর তারা যে-নিয়তি আরোপ করেছে, তা নারী *কামনা করেছে*। আমরা দেখেছি যে নারীর প্রশিক্ষণের সবগুলো দিক মিলিত হয়ে তাকে বাধা দেয় বিদ্রোহ ও দুঃসাহসিক কর্মের পথে। সমাজ সাধারণভাবে– তার শ্রদ্ধেয় পিতামাতাদের থেকে শুরু ক'রে– প্রেম, ভক্তি, তার নিজের গুণের সুউচ্চ মূল্যের প্রশংসা ক'রে তার কাছে মিথ্যা কথা বলে, এবং তার কাছে একথা গোপন ক'রে রাখে যে এগুলোর গুরুভার বইতে তার প্রেমিকও রাজি হবে না, স্বামীও রাজি হবে না, এমনকি তার সন্তানেরাও রাজি হবে না। সে আনন্দে বিশ্বাস করে এসব মিথ্যায়, কেননা এগুলো তাকে আমন্ত্রণ করে সহজ ঢাল বেয়ে নেমে যেতে : তার বিরুদ্ধে এতে জঘন্যতম অন্যায় করে অন্যেরা; শৈশব থেকে তার জীবনভর, তারা তাকে নষ্ট ও দূষিত করে এটা নির্দেশ ক'রে যে এ-আনুগত্যই তার প্রকৃত বৃত্তি, স্বাধীনতার মধ্যে প্রতিটি অস্তিমানের যা প্রলোভন। যদি কোনো শিশুকে সারাদিন আমোদে রেখে আলস্য শেখানো হয় এবং তাকে কখনো পড়াশুনোয় মন দিতে বলা না হয়, বা এর উপকারিতা দেখানো না হয়, তাহলে বলাই বাহুল্য যে বড়ো হয়ে সে হবে অপদার্থ ও মূর্খ; তবে এভাবেই লালনপালন করা হয় নারীদের, তার নিজের অস্তিত্বের ভার নিজে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তাকে কখনো বোঝানো হয় না। তাই সে সানন্দে নিজেকে অর্পণ করে অন্যদের সুরক্ষা, প্রেম, সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের কাছে, সে কিছু না *ক'রে* আত্মসিদ্ধির আশায় মোহিত হয়। এ-প্রলোভনে সাড়া দিয়ে সে ভুল করে; তবে পুরুষ তাকে দোষী করার মতো অবস্থানে নেই, কেননা সে-ই এ-প্রলোভনে তাকে প্রলুব্ধ করেছে। যখন তাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধে, এ-পরিস্থিতির জন্যে একজন দায়ী করে অন্যজনকে; নারী যা হয়েছে তার জন্যে বকবে পুরুষকে : 'কেউ আমাকে যুক্তি প্রয়োগ করতে বা আমার নিজের জীবিকা অর্জন করতে শেখায় নি'; এ-পরিণতি স্বীকার ক'রে নেয়ার জন্যে পুরুষ তাকে বকবে : 'তুমি কিচ্ছু জানো না, তুমি একটা অপদার্থ,' এবং এমন আরো। প্রতিটি লিঙ্গ মনে করে আক্রমণ ক'রে সে নিজের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে পারে; তবে একজনের অন্যায় কাজ আরেকজনকে নিরপরাধ করে না।

এ-অসাম্য বিশেষভাবে প্রকাশ পায় এ-ঘটনায় যে তারা যে-সময়টুকু একত্রে কাটায়– যা বিভ্রান্তিকরভাবে একই সময় ব'লে মনে হয়– সেটার মূল্য উভয় সঙ্গীর কাছে এক নয়। প্রেমিক তার দয়িতার সঙ্গে কাটায় যে-সন্ধ্যাটি, সে-সময়টায় সে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ক'রে, ব্যবসায়িক সম্পর্ক পাতিয়ে, বিনোদন খুঁজে তার কর্মজীবনের জন্যে সুবিধাজনক কিছু একটা করতে পারতো; সমাজে স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত পুরুষের কাছে সময় একটি ইতিবাচক মূল্য : অর্থ, খ্যাতি, বিনোদন। অলস,

একঘেয়েমিক্লান্ত নারীর কাছে, এর বিপরীতে, এটা এক বোঝা, যার থেকে সে মুক্তি পেতে চায়; যখন সে সফল হয় সময় কাটাতে, তখন সেটা তার জন্যে একটা উপকার : পুরুষটির উপস্থিতি হচ্ছে খাঁটি লাভ। একটি অবৈধ যৌন সম্পর্কের মধ্যে পুরুষকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে যা আকৃষ্ট করে, অনেক ক্ষেত্রে, তা হচ্ছে এর থেকে সে যে-যৌন উপকার লাভ করে, সেটা : দরকার হ'লে, যৌনকর্মের জন্যে যতোটা সময় দরকার তার থেকে বেশি সময় দয়িতার সঙ্গে না কাটাতে হ'লেই সে সুখ পায়; কিন্তু– কিছু ব্যতিক্রম বাদে– দয়িতা চায় তার হাতে যে-অতিরিক্ত সময় আছে, সেটা কাটাতে; এবং– সেই শজিবিক্রেতার মতো ক্রেতা শালগম না কিনলে যে আলু বিক্রি করবে না– সে দেহদান করবে না যদি না তার প্রেমিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে কথাবার্তায় এবং একটা 'রফা' করে। একটা আপোসরফায় পোঁছোনো হয় যদি না, সব কিছু মিলে, পুরুষটির কাছে খরচটা খুব বেশি মনে হয়, এবং এটা অবশ্যই নির্ভর করে তার কামনার তীব্রতা এবং সে যা ত্যাগ করছে, তার ওপর সে কতোটা গুরুত্ব দেয়, তার ওপর। কিন্তু নারীটি যদি চায়– দেয়– খুব বেশি সময়, তাহলে নারীটি, তীরপ্লাবী নদীর মতো, হয়ে ওঠে পুরোপুরি অবাঞ্ছিতপ্রবেশী, এবং পুরুষটি তখন অতি বেশি পাওয়ার থেকে কিছু না পেতেই বেশি পছন্দ করবে। তখন নারীটি কমিয়ে আনে তার দাবিদাওয়া; তবে প্রায়ই দ্বিগুণ স্নায়বিক চাপের মধ্যে পৌছোনো হয় মীমাংসায় : নারীটি বোধ করে যে পুরুষটি তাকে সুলভ মূল্যে 'পেয়েছে', এবং পুরুষটি মনে করে নারীটির দাম অত্যন্ত বেশি। এ-বিশ্লেষণ, অবশ্য, করা হয়েছে কিছুটা কৌতুককর ভাষায়; তবে– সে-সব ঈর্ষাকাতর ও একান্ত কামনার ক্ষেত্র বাদে, যাতে পুরুষটি চায় নারীটির পুরোপুরি মালিকানা– এ বিরোধ অবিরাম দেখা দেয় স্নেহ, কামনা, এমনকি প্রেমের বেলা। পুরুষটির সময়ের মধ্যে সব সময়ই 'অন্য কিছু করার আছে'; আর নারীটির আছে বিপুল সময়, যা তাকে কাটাতে হবে; এবং পুরুষটি মনে করে নারীটি তাকে যে-সময় দেয়, তার অধিকাংশই উপহার নয়, বরং ভার।

পুরুষটি সাধারণত ভারগ্রহণে সম্মত হয়, কেননা সে ভালোভাবেই জানে যে সে আছে সুবিধাজনক ধারে, সে বিবেকহীন; এবং যদি সে মোটামুটি বিবেকবান হয়, তাহলে উদারভাবে সে অসাম্যের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। তবে সে তার করুণার জন্যে গর্ববোধ করে, এবং প্রথমবার অমিল হওয়ার সঙ্গেই সে নারীকে গণ্য করে অকৃতজ্ঞ ব'লে এবং বিরক্তির সঙ্গে ভাবে : 'আমি তার জন্যে বেশি ভালো।' নারীটি বোধ করে সে আচরণ করছে ভিখিরির মতো, যদিও সে নিশ্চিত যে তার আছে অসাধারণ গুণাবলি, এবং এটা তাকে অবমানিত করে।

এমন একটি বিশ্ব, যেখানে পুরুষ ও নারী হবে সমান, তার রূপ মনশ্চক্ষে দেখা বেশ সহজ, কেননা সোভিয়েত বিপ্লব দিয়েছে ঠিক তারই *প্রতিশ্রুতি* : পুরুষের মতো একইভাবে লালিতপালিত ও প্রশিক্ষিত নারীরা কাজ করবে একই অবস্থায় এবং পাবে একই মজুরি। কামস্বাধীনতা অবশ্য স্বীকৃত হ'তে হবে সমাজকে দিয়ে, তবে যৌনকর্মকে বিবেচনা করা যাবে না এমন একটি 'সেবা' ব'লে, যার জন্যে অর্থ পরিশোধ করতে হবে; নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্যে নারীকে গ্রহণ করতে হবে অন্য কোনো উপায়; বিয়ের ভিত্তি হবে একটি স্বাধীন চুক্তি, যা চুক্তিবদ্ধ পক্ষরা নিজেদের

ইচ্ছেমতো ভাঙতে পারবে; মাতৃত্ব হবে ঐচ্ছিক, যার অর্থ হচ্ছে জন্মনিরোধ ও গর্ভপাত হবে অনুমোদিত এবং বিয়ের মধ্যে বা বাইরে সব মা ও সন্তানের থাকবে ঠিক একই অধিকার; গর্ভধারণের ছুটির ব্যয় বইবে রাষ্ট্র, যে দায়িত্ব নেবে সন্তানদের, যার তাৎপর্য এ নয় যে তাদের বাবা-মার কাছে থেকে *ছিনিয়ে নেয়া* হবে সন্তানদের, বরং এটা যে সন্তানদের *পরিত্যাগ করা* হবে না তাদের মা-বাবার কাছে।

তবে পুরুষ ও নারীদের প্রকৃতভাবে সমান হওয়ার জন্যে আইন, প্রতিষ্ঠান, প্রথা, জনমত, এবং সমগ্র সামাজিক পরিস্থিতি বদলানোই কি যথেষ্ট? 'নারীরা চিরকালই থাকবে নারী,' ব'লে থাকে সংশয়বাদীরা। অন্য দ্রষ্টারা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে নারীরা নিজেদের পুরুষ ক'রে তুলতে পারবে না, বরং তারা হয়ে উঠবে দানব। এর মানে হচ্ছে একথা স্বীকার ক'রে নেয়া যে আজকের নারী প্রকৃতির সৃষ্টি; একথা আরেকবার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক যে মানবসমাজে কিছুই প্রাকৃতিক নয় এবং নারী, অন্য অনেক কিছুর মতোই, সভ্যতার উৎপাদিত একটি সামগ্রি। তার নিয়তিতে অন্যদের হস্তক্ষেপ এক মৌল ব্যাপার : এ-প্রক্রিয়া যদি যেতো অন্য দিকে, তাহলে এর ফল হতো বেশ ভিন্ন। নারী তার হরমোন বা রহস্যময় প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত সে-রীতি দিয়ে, যার ফলে তার নিজের ছাড়া অন্যদের কর্মকাণ্ড দিয়ে পরিবর্তিত হয় তার শরীর ও বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক। যে-অতল গহ্বর বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে কিশোর ও কিশোরীকে, তাদের মধ্যে সেটা স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রসারিত করা হয় আদিশৈশব থেকেই; তারপর, নারীকে *যে-রূপে তৈরি করা হয়েছে*, নারী তার থেকে অন্য কিছু হ'তে পারতো না, এবং অতীত অবশ্যই জীবনভর ছায়াপাত করবে তার ওপর। যদি আমরা এর প্রভাব বুঝতে পারি, তাহলে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে তার নিয়তি চিরকালের জন্যে পূর্বনির্ধারিত নয়।

আমাদের, নিশ্চিতভাবে, একথা বিশ্বাস করলে চলবে না যে তাকে রূপান্তরিত করার জন্যে শুধু নারীর আর্থনীতিক অবস্থার বদলই যথেষ্ট, যদিও এ-ব্যাপারটি তার বিকাশে ছিলো এবং এখনো আছে মৌল ব্যাপার হয়ে; তবে যে-পর্যন্ত না এটা নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও অন্যান্য পরিণতি সংঘটিত করবে, এটা যার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এর জন্যে যা দরকার, সে-পর্যন্ত নতুন নারী দেখা দিতে পারে না। এ-মুহূর্তে এগুলো কোথাও বাস্তবায়িত হয় নি, রাশিয়ায়ও নয়, ফ্রান্সে বা যুক্তরাষ্ট্রেও নয়; এবং এটাই ব্যাখ্যা করে কেনো আজকের নারী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে। পুরুষের ছদ্মবেশে প্রায়ই সে দেখা দেয় 'খাঁটি নারী'রূপে, এবং সে নিজের দেহে যেমন অস্বস্তি বোধ করে তেমনি অস্বস্তি বোধ করে পুরুষের পোশাকে। তাকে ছেড়ে দিতে হবে তার পুরোনো খোলস এবং বানাতে হবে নিজের নতুন পোশাক। এটা সে করতে পারতো শুধু একটা সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে। কোনো একক শিক্ষকই আজ এমন একটি *নারী মানুষ* তৈরি করতে পারবেন না যে হবে একটি *পুরুষ মানুষ*-এর যথাযথ তুল্যরূপ; তাকে যদি ছেলের মতো লালনপালন করা হয়, তাহলে বালিকা মনে করে সে একটি অদ্ভুত জিনিশ এবং তাই তাকে দেয়া হয় একটা নতুন ধরনের লিঙ্গ পরিচয়। স্তেঁদাল এটা বুঝেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন : 'হঠাৎ গাছ বুনতে হবে অরণ্যে।' কিন্তু আমরা যদি, এর বিপরীতে, কল্পনা করি এমন একটি

সমাজের, যাতে বস্তুগতভাবে বাস্তবায়িত হবে লৈঙ্গিক সাম্য, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এ-সাম্য লাভ করবে নতুন প্রকাশ।

ছোটো মেয়েকে, তার ভাইদের মতো, যদি শুরু থেকেই বড়ো করা হতো একই দাবি ও পুরস্কার, একই কঠোরতা ও একই স্বাধীনতার মধ্যে, যদি তাকে অংশ নিতে দেয়া হতো একই পড়াশুনোয়, একই খেলাধুলোয়, তাকে যদি প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো একই ভবিষ্যতের, যদি তার চারপাশের নারী ও পুরুষদের তার কাছে নিঃসন্দেহে সমান মনে হতো, তাহলে গভীরভাবে বদলে যেতো খোজা গূঢ়ৈষা ও ইডিপাস গূঢ়ৈষার অর্থ। পিতার সঙ্গে একই ভিত্তিতে দম্পতির বস্তুগত ও নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে মাও উপভোগ করতো একই স্থায়ী মর্যাদা; শিশু তার চারদিকে দেখতে পেতো, পুরুষের জগত নয়, একটি নারীর জগত। যদি সে তার পিতার দিকে আবেগগতভাবে বেশি আকৃষ্ট হতো– যা এমনকি নিশ্চিত নয়– তাহলে পিতার প্রতি তার প্রেম রঞ্জিত হতো পিতার সমকক্ষ হওয়ার সাধনার ইচ্ছে দিয়ে, শক্তিহীনতার বোধ দিয়ে নয়; অক্রিয়তার দিকে সে চালিত হতো না। ছেলেদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ ও খেলার অনুমতি পেয়ে সে শিশ্নের অভাবকে– সন্তান লাভের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যার ক্ষতিপূরণ করা হয়– হীনম্মন্যতা গূঢ়ৈষা জন্ম দেয়ার জন্যে যথেষ্ট মনে করতো না; পরস্পর-সম্পর্কিতভাবে ছেলেরও থাকতো না একটা শ্রেষ্ঠত্বগূঢ়ৈষা, যদি না তা ঢুকিয়ে দেয়া হতো তার ভেতরে এবং যদি সে পুরুষদের মতো নারীদেরও সমান শ্রদ্ধা করতো। বালিকা বন্ধ্যা ক্ষতিপূরণ খুঁজতো না আত্মরতি ও স্বপ্নের মধ্যে, সে তার ভাগ্যকে অবধারিত ব'লে মনে করতো না; সে যা *করছে* তার প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করতো, নিজেকে সংবরণ না ক'রে সে ঝাঁপিয়ে পড়তো কর্মোদ্যোগে।

নারী কোনো রহস্যময় নিয়তির শিকার নয়; যে-সব বিশিষ্টতা তাকে নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে নারী ব'লে, সেগুলোর ওপর আরোপ করা হয় যে-তাৎপর্য, তারই জন্যে গুরুত্ব লাভ করে সেগুলো। অদূর ভবিষ্যতে যখন এগুলোকে বিচার করা হবে নতুন প্রেক্ষিতে, তখন এগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। তাই, আমরা যেমন দেখেছি, তার কামের অভিজ্ঞতার ভেতরে নারী বোধ করে– এবং প্রায়ই তীব্রভাবে ঘৃণা করে– পুরুষের আধিপত্য; তবে এজন্যে কিছুতেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি না যে তার ডিম্বাশয় তাকে দণ্ডিত করে চিরকাল নতজানু অবস্থায় বেঁচে থাকায়। পুরুষধর্মী আক্রমণাত্মকতাকে একটা প্রভুসুলভ সুবিধা ব'লে মনে হয় শুধু সে-সংশ্রয়ে, যেটি সার্বিক চক্রান্ত চালায় পুরুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে; এবং যৌনকর্মে নারী নিজেকে গভীরভাবে অক্রিয় *বোধ করে* শুধু এ-কারণে যে সে আগে থেকেই নিজেকে এমন *মনে করে*। বহু আধুনিক নারী, যারা মর্যাদা বোধ করে মানুষ হিশেবে, তারা এখনো তাদের কামজীবনকে দেখে দাসত্বপ্রথার দৃষ্টিকোণ থেকে : একটি পুরুষের নিচে শোয়া, তার দ্বারা বিদ্ধ হওয়া তাদের কাছে অবমাননাকর মনে হয় ব'লে তারা হয়ে ওঠে কামশীতল। কিন্তু বাস্তবতাটি যদি ভিন্ন হতো, তাহলে কামের ভঙ্গি ও আসনের দ্যোতিত প্রতীকী অর্থও হতো ভিন্ন; উদাহরণস্বরূপ, যে-নারী টাকা দেয় তার প্রেমিককে ও আধিপত্য করে তার ওপর, সে গর্ববোধ করে তার চমৎকার আলস্যে এবং মনে করে সে ক্রীতদাস ক'রে তুলেছে পুরুষটিকে, যে খাটিয়ে চলছে নিজেকে।

এবং এখনই আছে বহু ভারসাম্যপূর্ণ যুগল, জয় ও পরাজয় সম্পর্কে যাদের ধারণার স্থানে দেখা দিচ্ছে বিনিময়ের ধারণা।

বাস্তবিকপক্ষে, পুরুষ, নারীর মতোই, মাংস, সুতরাং অক্রিয়, তার হরমোন ও প্রজাতির ক্রীড়নক, তার কামনার অস্থির শিকার। এবং নারী, পুরুষের মতোই, রক্তমাংসের জ্বরের মধ্যে, একটি সম্মতিদাত্রী, একটি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত দান, একটি কর্ম; তাদের বিচিত্র রীতিতে তারা যাপন করে অস্তিত্বের এ-অদ্ভুত দ্ব্যর্থতা, যা রূপ নিয়েছে শরীরের। ওই সমস্ত দ্বৈরথে, যাতে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয় ব'লে মনে করে, তাতে আসলে তারা প্রত্যেকে সংগ্রাম করে নিজের বিরুদ্ধে, তাদের নিজের যে-অংশটিকে তারা নিজের ব'লে অস্বীকার করে, সেটিকে তারা প্রক্ষেপ করে সঙ্গীটির ওপর; তাদের পরিস্থিতির দ্বৈততাগুলো যাপন করার বদলে, তারা একে অন্যকে বাধ্য করে হীনতা বইতে এবং চেষ্টা করে সম্মানটুকু নিজের জন্যে রাখতে। তবে উভয়েই যদি এ-দ্ব্যর্থতার ভার নিতো বিচক্ষণ সংযমের সাথে, একটি সত্যিকার গর্বের সাথে, যা পরস্পরসম্পর্কযুক্ত, তাহলে পরস্পরকে দেখতো সমান হিশেবে এবং তাদের কামের নাটক যাপন করতো বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে। আমরা যে মানুষ এটা নিরতিশয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে-সব বিশিষ্টতার থেকে, যা মানুষকে পরস্পরের থেকে পৃথক ক'রে রাখে; বিদ্যমানতা কখনোই শ্রেষ্ঠত্বসমূহ দান করে না। 'সদ্‌গুণ', প্রাচীনেরা একে যেমন নাম দিতেন, সংজ্ঞায়িত হয় 'যা আমাদের ওপর নির্ভরশীল', তার স্তরে। উভয় লিঙ্গের মধ্যেই অভিনীত হচ্ছে মাংস ও চৈতন্যের, সসীমতা ও সীমাতিক্রমণতার একই নাটক; উভয়ই ক্ষয় হচ্ছে সময় দিয়ে এবং অপেক্ষা করছে মৃত্যুর, তাদের উভয়েরই আছে পরস্পরের জন্যে একই অপরিহার্য আবশ্যকতা; এবং তাদের স্বাধীনতা থেকে তারা লাভ করতে পারে একই গৌরব। যদি তারা এর স্বাদ নিতে চাইতো, তাহলে তারা আর বিভ্রান্তিকর বিশেষাধিকার নিয়ে বিতর্কে প্ররোচিত হতো না, এবং তাদের মধ্যে দেখা দিতো ভ্রাতৃত্ববোধ।

আমাকে বলা হবে এসবই ইউটোপীয় অলীক কল্পনা, কেননা নারী রূপান্তরিত হ'তে পারে না যদি না সমাজ প্রথমে নারীকে প্রকৃতভাবে পুরুষের সমান ক'রে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে রক্ষণশীলেরা কখনো সে-দুষ্টচক্রের শরণ নিতে ভুল করে নি; ইতিহাস, অবশ্য, চক্রাকারে ঘোরে না। একটি জাতকে যদি হীনতার অবস্থায় রাখা হয়, সন্দেহ নেই সেটি থাকে হীনতার অবস্থায়ই; তবে স্বাধীনতা ওই চক্রটি ভাঙতে পারে। নিগ্রোদের ভোটাধিকার দাও, তাহলে তারা ভোটাধিকারের উপযুক্ত হয়ে উঠবে; নারীকে দায়িত্বভার দেয়া হোক এবং সেও পালন করতে পারবে সেগুলো। সত্য হচ্ছে যে উৎপীড়নকারীদের কাছে বিনামূল্যে মহত্ত্ব প্রত্যাশা করা যায় না; তবে এক সময় উৎপীড়িতদের বিদ্রোহ, আরেক সময় বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত জাতটির নিজের বিবর্তন, নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে; তাই পুরুষেরা নিজের স্বার্থে নারীদের আংশিক মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে : নারীদের দায়িত্ব ওই সমুত্থান চালিয়ে যাওয়া, এবং তারা যে-সাফল্য অর্জন করছে এটা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তা-ই তাদের জন্যে একটি উৎসাহ। এটা প্রায় নিশ্চিত যে আজই হোক বা কালই হোক তারা পুরোপুরি আর্থনীতিক ও সামাজিক সাম্যে পৌছোবে, যা ঘটাবে একটা আন্তর রূপান্তর।

তবে তা যা-ই হোক, কেউ কেউ যুক্তি দেখাবে যে এমন একটি বিশ্ব সম্ভবপর হ'লেও কাম্য হ'তে পারে না। যদি নারী 'একই সমান' হয় তার পুরুষের, তাহলে জীবন হারিয়ে ফেলবে তার স্বাদ ও গন্ধ। এ-যুক্তিও তার অভিনবত্ব হারিয়ে ফেলেছে : যারা বর্তমান অবস্থা চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে আগ্রহী, তারা সব সময়ই নবভবিষ্যৎকে হাসিমুখে গ্রহণের বদলে অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে বিলীয়মান বিস্ময়কর অতীতের জন্যে। এটা খুবই সত্য যে দাসব্যবসা বাতিল হওয়ার অর্থ ছিলো আজেলিয়া ও ক্যামেলিয়ায় সমৃদ্ধ জমকালো বিশাল চা, তুলো, আখ, তামাকের বাগানগুলোর মৃত্যু, এর অর্থ ছিলো সংস্কৃত দক্ষিণি সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস। সময়ের চিলেকোঠায় সিস্টান *কাস্ত্রাতি*র নির্মল শুদ্ধ কণ্ঠের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দুর্লভ পুরোনো কারুকার্যময় ফিতে, এবং আছে এক রকম 'নারীর মোহনীয়তা', তাও যাত্রা করেছে একই রকম ধুলোপূর্ণ গুদামের পথে। আমি একমত যে সে ছিলো সত্যিই বর্বর, যে মুগ্ধ হতো না অপরূপ পুষ্প, দুর্লভ ফিতে, খোজাদের স্ফটিকস্বচ্ছ স্বর, ও নারীর মোহনীয়তায়।

যখন তার সমস্ত চমৎকারিত্ব নিয়ে দেখা দেয় 'মোহিনী নারী', সে তখন অনেক বেশি পরমানন্দদায়ক বস্তু ওইসব 'নির্বোধ চিত্রকলা, তোরণ, দৃশ্য, বিনোদনকারীর চটকালো সংকেত, জনপ্রিয় অবিকল নকল চিত্র'-এর থেকে, যা উত্তেজিত করেছে র‍্যাবোকে; অতিশয় আধুনিক দক্ষতায় ভূষিত হয়ে, নতুনতম কৌশলে প্রসাধিত হয়ে, সে আসে সুদূর যুগযুগান্ত থেকে, থিবি থেকে, ক্রিট থেকে, শিশেন-ইটজা থেকে; এবং সে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত টোটেমও; সে হেলিকপ্টার এবং সে পাখি; এবং এখানে আছে সব বিস্ময়ের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় : তার ছোপলাগানো কেশরাজির নিচে আরণ্যক গুঞ্জন হয়ে ওঠে চিন্তা, এবং তার স্তনযুগল থেকে উৎসারিত হয় শব্দমালা। পুরুষেরা লোলুপ হাত বাড়ায় এ-বিস্ময়ের দিকে, কিন্তু যখন তারা এটি আঁকড়ে ধরে, তখনই এটি বিলীন হয়ে যায়; স্ত্রী, দয়িতা অন্য সকলের মতোই কথা বলে তাদের মুখ দিয়ে : তাদের কথার মূল্য তা-ই, যা ওগুলোর মূল্য: তাদের স্তনযুগলেরও। এমন একটি পলাতক অলৌকিকত্ব– এবং যা এতোই দুর্লভ– তা কি ন্যায়সঙ্গতভাবে আমাদের দিয়ে চিরস্থায়ী করাতে পারে এমন একটি পরিস্থিতি, যা উভয় লিঙ্গের জন্যেই অশুভ? আমরা উপভোগ করতে পারি পুষ্পের সৌন্দর্য, নারীর মোহনীয়তা, এবং তাদের প্রকৃত গুণের জন্যে দিতে পারি প্রভূত মূল্য; যদি এসব সম্পদ রক্তপাত বা দুর্দশা ঘটায়, তাহলে ওগুলোকে বলি দিতেই হবে।

প্রথম স্থানে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে সব সময়ই থাকবে বিশেষ কিছু পার্থক্য; নারীর কামের, তাই তার কামের জগতের, থাকবে একটি বিশেষ নিজস্ব রূপ এবং তাই এটা এক বিশেষ প্রকৃতির ইন্দ্রিয়পরায়ণতার, সংবেদনশীলতার কারণ না হয়ে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে তার নিজের শরীরের সাথে, পুরুষটির সাথে, শিশুটির সাথে তার সম্পর্ক কখনোই অভিন্ন হবে না তার সাথে, পুরুষটি যা বোধ করে তার শরীরের সাথে, নারীটির সাথে, এবং শিশুটির সাথে: যারা 'ভিন্নতার মধ্যে সাম্য'কে বড়ো ক'রে তোলে তারা স্বেচ্ছায় আমার কাছে সাম্যের মধ্যে ভিন্নতা থাকার সম্ভবপরতা স্বীকার না ক'রে পারে নি। তারপর আবার, প্রতিষ্ঠানগুলোই সৃষ্টি করে অসাম্য। হারেমের ক্রীতদাসীরা, যুবতী ও রূপসী, সুলতানের আলিঙ্গনের ভেতরে তারা সবাই অভিন্ন;

খ্রিস্টধর্ম যখন একটি নারীকে অধিকারী করেছে একটি আত্মার, তখন কামকে দিয়েছে পাপের ও কিংবদন্তির স্বাদগন্ধ; সমাজ নারীকে তার সার্বভৌম ব্যক্তিতা ফিরিয়ে দিলে ধ্বংস হবে না হৃদয়কে আলোড়িত করার জন্যে প্রেমের আলিঙ্গনের শক্তি।

পুরুষ ও নারী বাস্তব ব্যাপারগুলোতে সমান হ'লে সম্ভব হবে না হৈচৈ ক'রে আনন্দোপভোগ, পাপ, পরমোল্লাসমত্ততা, সংরাগ, একথা বলা আহাম্মকি; চৈতন্যের বিপরীতে দেহ, মহাকালের বিপরীতে মুহূর্ত, সীমাতিক্রমণতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপরীতে সীমাবদ্ধতার মূর্ছা, বিস্মৃতির শূন্যতার বিপরীতে পরমানন্দের বিরোধের কখনো মীমাংসা হবে না; কামের মধ্যে চিরকালই থাকবে স্নায়বিক চাপ, তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, আনন্দ, হতাশা, ও অস্তিত্বের বিজয়োল্লাস। নারীকে মুক্ত করা হচ্ছে পুরুষের সাথে সে বহন করে যে-সব সম্পর্ক, সেগুলোতে আটকে থাকাকে অস্বীকার করা, তার সাথে ওই সম্পর্কগুলোকে অস্বীকার করা নয়; তাকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে দাও, তাহলে সে বেঁচে থাকবে পুরুষের জন্যেও : পরস্পরকে কর্তারূপে মেনে নিয়ে তারা প্রত্যেকে অপরের জন্যে হয়ে থাকবে *অপর*। তাদের সম্পর্কের পারস্পরিকতা নষ্ট করবে না ওই অলৌকিকতাগুলোকে– কামনা, অধিকার, প্রেম, স্বপ্ন, রোমাঞ্চকে, যেগুলো তৈরি করা হয়েছিলো মানুষকে দুটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে; এবং যে-সব শব্দ আলোড়িত করে আমাদের– দান, জয়, মিলন– হারাবে না তাদের অর্থ। বরং এর বিপরীতে, যখন আমরা লোপ করবো মানবমণ্ডলির অর্ধেকের দাসত্ব, এবং তার সাথে লোপ করবো তার অন্তর্নিহিত ভণ্ডামো, তখনই মানবমণ্ডলির 'বিভাজন' প্রকাশ করবে তার শুদ্ধ তাৎপর্য এবং মানব-যুগল পাবে তার সত্যিকার রূপ। 'মানবপ্রাণীর প্রত্যক্ষ, স্বাভাবিক, আবশ্যিক সম্পর্ক হচ্ছে *নারীর সাথে পুরুষের সম্পর্ক*,' বলেছেন মার্ক্স। 'এ-সম্পর্কের প্রকৃতিই স্থির করে কতো দূর পর্যন্ত পুরুষ নিজে গণ্য হবে একটি *গোষ্ঠিগত সত্তা* হিশেবে, মানবরূপে; নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক সম্পর্ক। এটা দিয়েই, সুতরাং, প্রদর্শিত হয় পুরুষের *স্বাভাবিক* আচরণ হয়ে উঠেছে কতো দূর *মানবিক* বা কতো দূর পর্যন্ত *মানবিক* সত্তা হয়ে উঠেছে তার *স্বাভাবিক* সত্তা, কতো দূর পর্যন্ত *মানবিক স্বভাব* হয়ে উঠেছে তার *স্বভাব*।'

বিষয়টি এর থেকে আর ভালোভাবে বিবৃত করা সম্ভব নয়। পুরুষকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিদ্যমান বিশ্বের মাঝে মুক্তির রাজত্ব। পরম বিজয় লাভের জন্যে, এক দিকে, এটা দরকার যে পুরুষ ও নারীরা তাদের প্রাকৃতিক পার্থক্যকরণের সাহায্যে ও মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করবে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ।